বিভূতি-রচনাবলী

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সপ্তম খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৩

উপদেষ্টা পরিষদ :

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রী কালিদাস রায়

ডঃ সুকুমার সেন

শ্রী প্রমথনাথ বিশী

শ্রী জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক :

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রী চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় ঃ শ্রী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে এস. এন.
রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও আর. রায় কর্তৃক সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
৫১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত

॥ সূচীপত্র ॥

ভূমিকা	…	পরিমল গোস্বামী	৵০
অনুবর্তন	…	…	১
নবাগত			
দ্রবময়ীর কাশীবাস	…	…	১৭৯
ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল	…	…	১৯৬
পারমিট	…	…	২০৭
মুক্তি	…	…	২১৬
গায়ে হলুদ	…	…	২২৮
ঠাকুরদার গল্প	…	…	২৩৬
ভিড়	…	…	২৪৩
আরক	…	…	২৪৮
থিয়েটারের টিকিট	…	…	২৫৪
পার্থক্য	…	…	২৫৭
স্বপ্ন-বাসুদেব	…	…	২৬০
অসাধারণ			
অসাধারণ	…	…	২৮১
নদীর ধারের বাড়ী	…	…	২৮৮
বিপদ	…	…	২৯৭
জন্মদিন	…	…	৩০৪
কাঠবিক্রি বুড়ো	…	…	৩১২
হারুণ অল রসিদের বিপদ	…	…	৩১৫
সুলেখা	…	…	৩২০
রূপো বাঙাল	…	…	৩২৬
তেঁতুলতলার ঘাট	…	…	৩৩২
দুই দিন	…	…	৩৩৯
মাকাল-লতার কাহিনী	…	…	৩৪৫
বংশলতিকার সন্ধানে	…	…	৩৪৯
কমপিটিশান	…	…	৩৫৯
ব্ল্যাক মার্কেট দমন কর	…	…	৩৬৬
তুচ্ছ	…	…	৩৭০
পিদিমের নিচে	…	…	৩৭২
হে অরণ্য কথা কও	…	…	৩৮৭

বি, র—৭ম

ভূমিকা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাদি বিষয়ে ইতিপূর্বে যাঁরা ভূমিকা লিখেছেন তাঁরা নানাভাবে তাঁর লেখা বিশ্লেষণ করেছেন। এবং তা পাণ্ডিত্যপূর্ণ। আমি বর্তমান খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত উপন্যাস বা গল্প বা অরণ্যকথা বিষয়ে যা বলতে যাচ্ছি তা একটু অন্যরকম হবে, কারণ আমি রচনার চেয়েও রচনা-লেখকের মূল বৈশিষ্ট্যটা আমার এই ভূমিকায় আবিষ্কারের চেষ্টা করব। আমার পক্ষে এ কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হতে পারে এ জন্য যে, আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে মিশেছি এবং কখনো বা ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি। অবশ্য তা করলেই যে, কোনো মানুষকে সম্পূর্ণ জানা যায় তা নয়, তবে আমি অনুভূতির সেন্‌সিটিভ প্লেটে তাঁর জীবন ও জীবনদর্শনের ছাপ ধরার চেষ্টা করেছি সব সময়। এবং আমি আমার সে অনুভূতিকে বলব সহানুভূতি। তার সঙ্গে শ্রদ্ধা ও প্রীতি যোগ করা যেতে পারে। অতএব তাঁর প্রতি আমার অভিগম বা অ্যাপ্রোচ হবে অনেকটা হৃদয়ের পথে, যদিও সবখানি নয়।

বিভূতিবাবুর চরিত্রে এমন অনেক ছোটখাটো পরস্পর-বিরোধিতা স্পষ্ট রূপে প্রকট, যার জন্য আমি তাঁর চরিত্রকে আচরণকে কৌতুকের দৃষ্টিতেও দেখেছি, এবং একটি ভ্রমণকাহিনীতে তা বিস্তারিতভাবে উদ্‌ঘাটিত করে তাঁকে পড়েও শুনিয়েছি। কিন্তু এখানে তাঁর আচরণ-বৈশিষ্ট্য বিষয়ে বিশেষ কিছুই বলব না। এখানে যে মানুষটি শিল্পী, যিনি কবি, যিনি দার্শনিক, যিনি প্রকৃতিপ্রেমিক, সেই বিচিত্র মানুষটির মনের গভীরে কি আছে (যা অবশ্য সম্পূর্ণ করে কেউ জানবে না কোনো দিন, এবং তিনি নিজেও যা সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারেন নি, কেউ পারে না) সেইটি দেখার চেষ্টা করব মাত্র। "চেষ্টা করব" কথাটার পুনরুক্তি করছি।

সেজন্য প্রথমেই অনুবর্তন উপন্যাসখানি নিয়ে আলোচনা শুরু করছি। কাহিনীটিতে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন বাইরে থেকে দেখা কয়েকটি চরিত্রের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। তা মনে হলে অন্যায় হবে না কিছু। তবু আসলে অনুবর্তনের অনেকখানি তাঁর নিজেরই কথা। তিনি শিক্ষক ছিলেন, তিনি দরিদ্র ছিলেন, তিনি বহুদিন মাসে ৩৬ টাকা বেতনে কাজ করেছেন, টিউশন করেছেন, অন্য দরিদ্র শিক্ষকদের সান্নিধ্যে বাস করেছেন, এবং এ কাহিনীতে যতগুলি শিক্ষককে চিত্রিত করেছেন (তাঁদের মধ্যে ক্লার্কওয়েল, আলম ও রামেন্দু ছাড়া) তারা সবাই অল্পবিত্তর বিভূতিবাবুরই নানা খণ্ডিত সত্তা। তিনি নিজেকে এদের মধ্যে ভাগ করে দেখেছেন। ক্লার্কওয়েলের যিনি প্রোটোটাইপ (ক্লারিজ সাহেব) তাঁর চরিত্র যেন একটি ফোটোগ্রাফ, বিভূতিবাবু এখানে দর্শক, নিজে তার মধ্যে নেই। এ চরিত্রটি অপরূপ, বর্ণনা করার স্থানাভাব। কোন্ চরিত্রটাই বা অপরূপ নয় অনুবর্তনে। প্রত্যেকে এক গোষ্ঠীভুক্ত হয়েও পরস্পর থেকে এমন স্বতন্ত্র যে এদের চরিত্র আঁকতে বিভূতিবাবুর এক অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে।

অনুবর্তনের হাই স্কুলটি কলকাতা শহরের এবং শিক্ষকদেরও বাস শহরেই। কিন্তু তারা এমনি হতচ্ছাড়া এবং দারিদ্র্যপীড়িত যে তারা যেন শহরে নয়, কোন্ এক ভাঙা গ্রামে বাস

করছে। এবং বিভূতিবাবুও ঠিক এমনি পরিবেশেই নিজের আসল শিল্প ক্ষেত্রটিকে খুঁজে পান। এই পরিবেশে শিল্পীরূপে তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। সেইজন্যই শহরের বড় রাস্তা থেকে তিনি গলির ভিতরে প্রবেশ করে শিক্ষকদের অথবা দরিদ্র পাঠ্যপুস্তক-লেখকের প্রকৃত অবস্থার মধ্যে পাঠককে টেনে নিয়ে গেছেন বারবার। এমন কি কারো বা দম-বন্ধকরা রান্নাঘরের মধ্যেও প্রবেশ করে তিনি তার দৈন্যের চেহারাটা উদ্‌ঘাটিত করেছেন। এজন্য তিনি যদুমাস্টারকে পাড়াগাঁ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছেন। শিক্ষকেরা কেউ বা তার হীনতাকে মেনে নিয়েছে, তা নিয়ে কারো বিরুদ্ধে তাদের বিশেষ কোনো অভিযোগ নেই। কেউ বা তাদের দুরবস্থার প্রতিকার চায় অথচ প্রতিকার আদায়ের সাহস নেই, সামর্থ্য নেই। কত নিচের ধাপে নামলে একজন শিক্ষক ছাত্রের জন্য খাদ্য পয়সা অথবা খাবার চুরি করতে পারে সে দৃশ্য অতি করুণ। প্রবীণ নারান মাস্টার সৎ লোক, কিন্তু টিউশন করতে গিয়ে ধনী গৃহিণীর অপমান নীরবে মেনে নেয়, এর প্রধান কারণ ছাত্র চুনির প্রতি তার বাৎসল্যের আকর্ষণ। (এই ঘটনাটি বিভূতিবাবুর তখনকার নিজের অপূর্ণ বাৎসল্যের স্পষ্ট প্রতিফলন। তিনি নিজে ক্লাসঘরে দুএকজন ছাত্রের প্রতি বিষম আকৃষ্ট ছিলেন। সবার সামনে তাদের কাছে ডেকে আপন সন্তানের মতো আদর করতেন। আমাকে সেকথা অনেকবার তিনি বলেছেন।) স্নেহ-কাঙাল হৃদয় সর্বত্র এরই সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু এটি তাঁর চরিত্রের একটি দিক মাত্র। দশ দিকের খবর এটা নয়।

যেখানে তিনি শিল্পী, সেখানে দেখা যাবে সবার সকল পরিবেশে তাঁর মানসবাস স্থায়ী নয়। যেখানে তাঁর পূর্ণ প্রতিষ্ঠা সে হচ্ছে দীনহীন হতভাগ্যদের পরিবেশ। অথবা এলোমেলো প্রকৃতি-পরিবেশ। এইখানে তিনি তাদের একজন, তাদের পরম আত্মীয়। এই পরিবেশে তিনি পরম নিশ্চিন্ত।

হতভাগ্য যদু মুখুজ্জের মতো একটি ট্র্যাজিক চরিত্র সৃষ্টি বিভূতিবাবুর অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয়। এবং সে হতভাগ্য বলেই তা এমন জীবন্ত, এমন human, এমন সফল। সে কোনো অপমানে বিচলিত হয়না, অভাবের জ্বালায় স্ত্রীকে আর এক দরিদ্র আত্মীয়ের বাড়িতে ফেলে আসে, উদ্ধারের নামও করে না, চিঠি দিলে উত্তর দেয় না। অবনী নামক আর এক হতভাগাকে এর সঙ্গে জুড়ে অদ্ভুত এক লুকোচুরির ছবি আঁকা হয়েছে। যদুমাস্টার যত ট্র্যাজিক, ততটাই কমিকও।

যদুমাস্টার স্মরণীয় চরিত্র। অন্তিমকালে সে চিন্তা করছে :

"দুই একটা অন্যায় কাজ, দুই একটা—চুরি ঠিক বলা যায় না—চুরি নয়, তবে হাঁ, একটু-আধটু খারাপ কাজ যে না করিয়াছেন এমন নয়। তিনি তাহা স্বীকারই করিতেছেন। ভগবান গরিব মানুষের অপরাধ ক্ষমা করিবেন।"

এ অসামান্য সমাপ্তি। এ শুধু যদু মুখুজ্জের নিজের প্রতি করুণা নয়, যদু মুখুজ্জের প্রতি বিভূতিবাবুরও এটি এক উদার করুণা।

এই কথা ক'টি পড়ে আমি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। বিভূতিবাবুর মানুষের প্রতি মমত্ববোধ

কত গভীরে পরিব্যাপ্ত, তা ভাবতে গিয়ে মন বিস্ময়ে আনন্দে ভরে উঠেছিল। 'এইখানে বিভূতি-বাবু শিল্পীরূপে এক অজানা উচ্চতায় উঠে গেছেন। যদু মুখুজ্জের মরণকালের ঐ একটুখানি আত্মচিন্তার মধ্যে বিভূতিবাবুকে যদি কেউ আবিষ্কার করতে না পারেন তবে তিনি বিভূতিবাবুকে সম্পূর্ণরূপে পেলেন না।

ছোটগল্পেও বিভূতিবাবুর অসামান্য কৃতিত্ব। তাঁর অনেক ছোট গল্প যথার্থ ছোট গল্প, আবার অনেকগুলি শুধুই গল্প। তা ছোট গল্প হওয়ার আগেই তিনি থামিয়ে দিয়েছেন, ছোটগল্পের পরিচিত চেহারাও সে সব গল্পে পরিকল্পিত হয়নি, গল্প বলতে বলতে যেখানে গিয়ে থামে। গল্পের আয়োজন, নতুন কোনো চেহারায় ফুটে উঠল কিনা, সে দিকে খেয়াল নেই। অর্থাৎ vignette-এর মাত্রাটা একটু বেশি। এই গল্পগুলি প্রমথ চৌধুরীর অনেক গল্পকে স্মরণ করিয়ে দেয়। পড়তে ভাল লাগে এটাই এদের পরিচয়। বাকি আর সব ছোট গল্প, এবং তৃপ্তিদায়ক ছোটগল্প। ছোটর মধ্যে মহত্ত্ব আবিষ্কার এক যুগে চমকপ্রদ ছিল। বিভূতিবাবুর কয়েকটি গল্পে এই পরিকল্পনাটা আছে, কিন্তু তার অনেকগুলি ভঙ্গিসর্বস্ব হওয়াতে dated হয়ে গেছে। যেগুলি হয়নি, তা চমকপ্রদ; আজও, এবং পরেও চমকপ্রদই থাকবে।

আমি 'নবাগত' ও 'অসাধারণ' এই দুখানা বই থেকে দুটি গল্প বিভূতিবাবুকে ব্যাখ্যা করার জন্য বেছে নিচ্ছি। এর সঙ্গে 'হে অরণ্য কথা কও', এবং 'অসাধারণ' বইয়ের একটি রচনা— 'মাকাল-লতার কাহিনী'। গল্প দুটি হচ্ছে দ্রবময়ীর কাশীবাস ও পিদিমের নিচে। আমার মনে হয় এই দুটি গল্পের ভিতর দিয়ে বিভূতিবাবুর একটি ধর্মমতও পাওয়া যাবে। এ ধর্ম আনুষ্ঠানিক কোনো আচার পালনের ধর্ম নয়। শিল্পী তাঁর শিল্প সাধনার ভিতর দিয়ে জীবনের একটা সত্যে এসে পৌছন, তা তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি। প্রত্যেক বড় শিল্পীরই এই উপলব্ধি ঘটে বা ঘটা সম্ভব। আচার পালনের জটিলতার মধ্যে জীবনের প্রাপ্তি কিছুই নেই, দ্রবময়ী গল্পের ভিতর আছে এই ইঙ্গিতটি। এটি সজ্ঞান কোনো প্রচার বা ইঙ্গিত নয়। একটি বাস্তব ছবির ভিতরে এটি আপনা থেকেই ফুটে উঠেছে। ছোট গল্পের ভিতর কোনো প্রচার-প্রচেষ্টা থাকলে শিল্পরূপে তা সার্থক হয় না। বিভূতিবাবু নিজে যা পেয়েছেন, তা দ্রবময়ীর মধ্যে দেখেছেন, এই মাত্র বলা যায়। আর 'পিদিমের নিচে' গল্পে পাগলা ঠাকুরের মধ্যে দেখেছেন সেই সরল সত্যের প্রকাশ।' তাই তিনি তাঁর অজ্ঞাতসারেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। গল্প দুটি আমি বিশ্লেষণ করব না, পাঠককে বলি পড়তে এবং অনুভব করতে। দ্রবময়ী ও পাগলা ঠাকুর সরল বিশ্বাসের ভিতর দিয়ে সত্যে উত্তীর্ণ। বিভূতিবাবু শিল্পীরূপেও ঠিক এই পথেই পেয়েছেন তাঁর ঈশ্বরকে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পরিবেশে অভিভূত হয়ে তিনি বার বার একথা স্বীকার করেছেন।

'অসাধারণ' বইয়ের মাকাল-লতার কাহিনী গল্প নয়। দার্শনিকতা ও কাব্যময়তা মিলিয়ে এ কাহিনীটি প্রকৃতি-পূজার একটি মনোভাব মাত্র। এ বইতে এ রচনা একটি প্রক্ষিপ্ত অধ্যায় মনে হয়। সম্ভবত যা কিছু অসাধারণ মনে হয়েছে, তারই স্থান 'অসাধারণ' বইতে দেওয়া হয়েছে, যদিও আমার মতে সব অসাধারণ নয়।

প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ বিভূতিবাবুর একটা গূঢ় (এবং মূঢ়ও বটে) অবচেতন আকর্ষণ, তার মূল খুঁজতে হবে তাঁর অন্তরের গভীর প্রদেশে। প্রকৃতি তাঁর মনে সাড়া জাগায় যেমন পৃথিবীর বুকে সাড়া জাগায় প্রতিটি ঋতু। এ সাড়া কেন জাগে সে জিজ্ঞাসা তাঁর মনে নেই। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর মনের যে নিগূঢ় যোগ আছে, তারই জন্য প্রকৃতির সৌন্দর্য তাঁর মনে গানের ঝঙ্কার তোলে। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-চেতনার সঙ্গে বিভূতিবাবুর প্রকৃতি-চেতনার মিল আছে। উপরন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণের পিছনে একটা বিশেষ বৈজ্ঞানিক চেতনা আছে, যা বিভূতিবাবুর নেই।) বিবর্তন ও সৃষ্টির সমস্ত ধাপের ছবিটা রবীন্দ্রনাথের মনে গাঁথা হয়ে আছে। এই চেতনা ও এর বিস্ময় থেকে রবীন্দ্রনাথের মুক্তি নেই। তাঁর অধিকাংশ গান বা কাব্যের কেন্দ্রে এই চেতনা প্রচ্ছন্ন থেকে ক্রিয়া প্রকাশ করে, বাইরে অনেক সময় সহজে ধরা না পড়লেও তা থাকে। এর ফলে রবীন্দ্রনাথ যে এককালে অর্থাৎ পৃথিবীর সৃষ্টির কালে, এরই অণুপরমাণুর সঙ্গে, অণুপরমাণু রূপে, এক হয়ে মিলিয়ে ছিলেন, এই বোধ থেকে প্রকৃতির তিনি আত্মীয়। এবং তার বিস্ময় অনেকখানি এ থেকেই এসেছে। বিভূতিবাবুর ক্ষেত্রে প্রকৃতি পরম স্রষ্টার সঙ্গে Commune করার একটি উপায়। এবং প্রকৃতির মধ্যেই তাঁর ঈশ্বর প্রকাশিত এবং এই বোধ থেকেই তাঁর আনন্দ। কিন্তু উপভোগের দিক থেকে বিভূতিবাবুর সেজন্য যে কিছু অভাব ঘটেছে তা নয়। বরং বিভূতিবাবুর ভাষা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশি আবেগময়। রবীন্দ্রনাথের উগ্র আনন্দ, পরম বিস্ময়, প্রকৃতির প্রতি নাড়ির টানের চেতনা, এবং এর জন্য অনেক সময়েই প্রকৃতিকে তিনি humanize করে তাদের আত্মার সঙ্গে একাত্মকতা অনুভব করেছেন। (Pathetic fallacy-র সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই কিছু।) রবীন্দ্রনাথের এই বিস্ময় বা আনন্দ যত উগ্রই হোক তা ভাবার বন্ধনে বাঁধা, এবং তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণেই। কিন্তু বিভূতিবাবুর আনন্দ যে তাঁর কনফেশন! এতে মাত্রা ঠিক রাখার প্রশ্নই ওঠে না। সবটাই যে সরল প্রাণের স্বীকারোক্তি। অর্থাৎ আমি আনন্দ পেয়েছি, সে কথা তোমরা সবাই শোন। আমার সঙ্গে এসো, দেখ, উপভোগ কর। কিন্তু কে বা দেখে, কে বা শোনে! এ দুঃখও তিনি একাধিকবার প্রকাশ করেছেন। তাই রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে বিভূতিবাবুর কনফেশনের তুলনা করে লাভ নেই।

তুলনা করব না, কারণ বিশ্ব বা বিশ্বপ্রকৃতিজাত যে বিস্ময় তা দুজনেরই এক। অন্তত পৃথক নয়। শুধু দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রকাশের যেটুকু পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ যখন গেয়ে ওঠেন—

"দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া তোমায় আমায়
জনম জনম এই চলেছে, মরণ কভু তারে থামায় ?"

তখন তিনি বিশ্বের সঙ্গে স্রষ্টার সঙ্গে এবং পৃথিবীর সঙ্গে দেওয়া-নেওয়া রূপ চির দান ও গ্রহণের এবং দান নিয়ে আবার তা ফিরিয়ে দেওয়ার—একটি চিরদিনের চক্রকেই উপলব্ধি করেন। যে ঈশ্বরকে সম্বোধন করে এ গান, সে ঈশ্বর এই যুক্তিপূর্ণ সম্পর্কের সার্থকতার জন্য কবি বা শিল্পীর অনিবার্য সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের এই কল্পনার মূলে আছে বিবর্তনের বিস্ময়। প্রকৃতির অনেক

গানে প্রকৃতির মধ্যে তিনি নিজেই আছেন। বিভূতিবাবুর ঈশ্বরও বিশ্বব্যাপী, তিনি তাঁর সৃষ্টির দীনতম বস্তুতেও প্রকাশিত। তিনি সমগ্র প্রকৃতির ভিতরে প্রকাশিত। প্রকৃতির সৌন্দর্য তাঁকে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়। তিনি এই সৌন্দর্যের ভিতর দিয়েই তাঁর সঙ্গে commune করতে থাকেন। এর মূলে বিবর্তনের চেতনা নেই, কিন্তু বিশ্ববোধ বিদ্যমান—অনন্ত কোটি গ্রহ-নক্ষত্র মিলিয়ে যে বিশ্ব। আমি মাকাল-লতার কাহিনী থেকে আগে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি, এ থেকে তাঁর চিন্তার ধারাটি অনুসরণ করা যাবে।

"কার মহতী কল্পনার মধ্যে এ সুন্দর মাকাল-লতার দুলুনি, এর শ্যামপত্রগুচ্ছ, এর টুকটুকে রাঙা সুগোল সুঠাম ফলগুলো ছিল বীজরূপে অধিষ্ঠিত? বাষ্পাগ্নিপ্রোজ্জ্বল শতশত সহস্র সহস্র লক্ষকোটি নীহারিকা যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই মহারুদ্রের ভয়াল রূপ কোথায় মহাশূন্যে দূর প্রান্তে; আর কোথায় এই পৃথিবী-গ্রহের এক কোণে সুনিভৃত নির্জন লতাবিতান, সূর্যের সে বিরাট হাওয়ার বাষ্পতেজ বহু মাইলব্যাপী বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে, সজল বর্ষার মধ্য দিয়ে, বসন্ত দিনের জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়ে, বনবিহঙ্গকাকলীর মধ্য দিয়ে বন-কুসুমের সুবাসের মধ্য দিয়ে পরিস্রুত হয়ে প্রভাতের রৌদ্ররূপে যে লতাবিতানকে আলো করেছে,—আর তারই মধ্যে এই সুন্দর চিক্কণ সুপুষ্ট রাঙা মাকাল ফল লতাগ্রভাগে দোদুল্যমান।…

'ওমিক্রন সেটির' অগ্নিলীলার মধ্যে এই গোল গোল রাঙা মাকাল ফলের স্বপ্ন লুকোনো আছে।"

মনের এই বিস্ময় উচ্চ কাব্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। রচনাটি আগাগোড়াই তাই। তবে 'ওমিক্রন সেটি' নামক একটি মাত্র অতিকায় (pulsating red giant) নক্ষত্রের উপর, মাকাল ফল সৃষ্টিতে, এতখানি নির্ভর কেন করা হল তা অস্পষ্ট রয়ে গেছে। কারণ এই শ্রেণীর লাল দানবাকার তারকা (একে variable star-ও বলে) তো ঐ একটি নয়। সর্ববৃহৎ নয়। মীরা (বা মীরা সেটি) নামেও এটি পরিচিত। বিভূতিবাবুর মনে এই মুহূর্তে কি ছিল তা বোঝবার উপায় নেই। কিন্তু তবু এই কাব্যের সুর মনকে দোলা দেয়, 'ওমিক্রন সেটি' কোথায় হারিয়ে যায় এর সুরের মধ্যে। প্রকৃতির প্রতি বিভূতিবাবুর আকর্ষণ কৃত্রিম উপায়ে নয়, বই পড়ে, যত্ন করে সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করে তিনি আকর্ষণ বোধ করেন নি। এবং ভঙ্গি হিসাবে তিনি প্রকৃতিকে সাহিত্যে স্থান দেননি। এটি তাঁর প্রাণের জিনিস।

আধ্যাত্মিকতা বা প্রকৃতির ভিতর দিয়ে ঈশ্বরের লীলা অনুভব করা, এটি বিভূতিবাবুর পক্ষে মানুষ থেকে পালিয়ে গিয়ে নিজস্ব একটি ইনসুলেটেড পরিবেশ গড়ার ব্যাপার নয়। মানুষকে তিনি কখনো এড়াননি। সরল দরিদ্র মানুষের মধ্যে তিনি নিজেকে আবিষ্কার করেছেন নিবিড়ভাবে। জৈব ক্ষুধার মতোই প্রকৃতির প্রতি তাঁর মানসক্ষুধা, কিন্তু তা মানুষকে বাদ দিয়ে কখনো নয়। রোমান্টিক কবিদের মতো প্রকৃতি-বিস্ময়ের মধ্যে বা আড়ালে আত্ম-গোপন করার প্রশ্ন বিভূতিবাবুর ক্ষেত্রে আদৌ ওঠে না। ওয়ার্ডসওয়ার্থের সগোত্র তিনি হতে পারেন, কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থের সাধ্য কি পথের পাঁচালী বা আরণ্যকের মতো একখানা বই

লেখেন। তাঁছাড়া ওয়ার্ডসওয়ার্থ ছোট্ট সেলানডাইন ফুলের পরিণাম দেখে মানুষের পরিণাম চিন্তা করতে পারেন, কিন্তু বিভূতিবাবু ছোট্ট মাকাল ফলের ভিতর দিয়ে বিশ্বস্রষ্টার অসীম লীলা দেখতে পান। ওয়ার্ডওয়ার্থের হাহুতাশ, বিভূতিবাবুর ecstasy—একেবারে আনন্দরভসের আবেশবিহ্বলতা।)

"…রোজ দুবেলা যেতাম মাকাল ঝোপের তলায়—এক মাস দেড়মাস ধরে কত রূপে একে দেখেছি—এই লতাবিতানকে। প্রভাতের আলোতে, ঘন বর্ষার মেঘমেদুর সন্ধ্যায়, নির্জন ভাদ্র দ্বিপ্রহরে নিস্তব্ধ প্রশান্তির মধ্যে উদার নীলাকাশের তলে, ঘুঘু-ডাকা উদাস বনানীর পটভূমিতে, সুন্দর জ্যোৎস্না রাতের প্রথম প্রহরের জ্যোৎস্নায়।…খানিকটা সেখানে দাঁড়ালেই সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে পড়ি, কেমন-যেন সারা দেহ শিউরে ওঠে, মন অপূর্ব ভাবে ও স্বপ্নে বিমুগ্ধ হয়ে পড়ে।…সে স্বপ্ন কিসের কি করে বলবো…ফুলে ভরা শাখার পিছনকার নীল আকাশের স্বপ্ন, কোনো মহাশিল্পী মহাদেবতার প্রত্যক্ষ আবির্ভাবের স্বপ্ন, সবুজ ঝোপের মাথায় ফলন্ত রাঙা মাকাল ফলগুলির স্বপ্ন—গভীর সৌন্দর্যের স্বপ্ন। পাগল করে দেয় ঐ স্বপ্ন।

"এ মাকাল-লতার ঝোপ যেন পবিত্র দেবায়তন, অতি পবিত্র, অতিসুন্দর। সৌন্দর্যের পূজারী যে, এই দেবায়তনে দেবতার আবির্ভাব সে দর্শন করে। এখানে জাগ্রত ও প্রত্যক্ষ দেবতাকে প্রণাম কর।"…

এই অবহেলিত ফলের লতাকুঞ্জেও বিভূতিবাবু তাঁর সৌন্দর্যের দেবতাকে দেখতে পান। প্রকৃতির সৌন্দর্য সমষ্টিগত ভাবে যেন খৃ্াইস্ট, এই খ্রাইস্টের ভিতর দিয়ে তিনি তার পরম দেবতাকে, পরমা শক্তিকে, ঈশ্বরকে, লাভ করেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঈশ্বরের মহিমা বহন করছে বিভূতিবাবুর দৃষ্টিতে। এই সঙ্গে আর একবার দ্রবময়ী আর পাগলা ঠাকুরের কথা ভাবুন। তাদের ঈশ্বরের পথ সরল পথ, বিভূতিবাবুরও তাই।

বিভূতিবাবু 'হে অরণ্য কথা কও' বইতে এক জায়গায় স্পিনোজা থেকে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করেছেন, এবং তার সঙ্গে বারট্রাণ্ড রাসেল, জেমস জীনস্ ও ম্যাক্স প্ল্যাংকের কথাও আছে। কিন্তু বিভূতিবাবুর পরবর্তী কথার সঙ্গে এঁদের কথার বিশেষ মিল খুঁজে পাওয়া গেল না। বিভূতিবাবু উদ্ধৃতিগুলির পরেই বলেছেন—

"ওপরের কথাগুলি সমর্থন করে আমারই অনুভূতির, সে অনুভূতির কথা আমি এই ডায়েরীর নানা স্থানে নানা আকারে লিখেছি। সেই স্তব্ধ চিন্ময় ভাব-লোক যার সন্ধান মেলে নদীতীরে নেমে-আসা অপরাহ্নের নির্জনতায়, বন-ঝোপে ফোটা বন-কলমী ফুলের উদাস শোভায়, আঁধার নিশীথে মাথার ওপরকার জ্বলজ্বলে নক্ষত্র ছিটানো ছায়াপথের বিরাট ইঙ্গিতে। যে জীবন রহস্যের মূল ঊর্ধ্বাকাশে—শাখা-প্রশাখা ধরণীর ধূলিতে।"

কিন্তু ইংরেজী উদ্ধৃতির সঙ্গে এ সব কথার মিল না থাকলেও অন্তত স্পিনোজার নামটি তাৎপর্যপূর্ণ। মনে হয় স্পিনোজার প্যানথীইজ্ম্ তত্ত্ব তাঁর মনের সঙ্গে অনেকখানি মেলে। প্যানথীইজ্ম্—অর্থাৎ সৃষ্টির সীমার মধ্যেই ঈশ্বর নিবদ্ধ। বিভূতিবাবুর প্রকৃতি-পূজার সঙ্গেও

এর কিছু মিল আছে। কিন্তু যে ঈশ্বর সৃষ্টির ভিতরে থেকেও সৃষ্টিকে অতিক্রম করে আছেন, তা প্যানথীইজ্‌মে নেই। কিন্তু আগেই বলেছি শিল্পী তাঁর শিল্পসৃষ্টির ভিতর দিয়ে একটা সত্যে গিয়ে পৌঁছন এবং নিজের অনিবার্য গরজে নিজের জন্য একজন চেতনা-সম্পন্ন ঈশ্বরকে সৃষ্টি করে নেন। এ ঘটনা কোনো প্রচলিত তত্ত্বের মধ্যে পড়ে না। অতএব স্পিনোজার মত আলোচনা আর বেশিদূর চালিয়ে লাভ নেই। বিভূতিবাবু বিভূতিবাবুই—কোন তত্ত্বের সঙ্গে তাঁর কথা মিলুক আর নাই মিলুক। তাঁর ঈশ্বর তাঁর নিজেরেই ঈশ্বর।

বিভূতিবাবুর ডায়ারি পড়লে দেখা যায়, তিনি আনন্দে উন্মাদ হতে পারেন কিন্তু কোনো কিছু স্থায়ীভাবে আঁকড়ে ধরা তাঁর ধাতে নেই। প্রকৃতির সৌন্দর্য প্রভাবে বিভূতিবাবু আবেগমগ্ন, তাঁর সমস্ত সত্তায় একটা ecstasy, সমস্ত অন্তর উগ্র আনন্দে বেপমান, প্রবল শিহরণে দিশাহারা। এই রকম একটা অবস্থা বিভূতিবাবুর মধ্যে আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি।

১৯৩৩, ৪ঠা মার্চের ঘটনা। ছোটনাগপুরের পাহাড়ী পথে চলতে চলতে আগুনের মতো জ্বলে ওঠা পলাশফুলের অরণ্য দেখে ট্রেনের মধ্যে বিভূতিবাবু যে ভাবে বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন, প্রকৃতির সৌন্দর্য প্রভাবে কেউ যে এমন অপ্রকৃতিস্থ হতে পারে তা কখনো ভাবতে পারিনি। আমি নিজে একবার স্কুল-জীবনে প্রথম ৬০০০ ফুট উঁচু হিমালয় শহরে যাবার পথে এবং শহরে গিয়ে এমনি অপ্রকৃতিস্থ হয়েছিলাম। এবং যা দেখেছিলাম তা সত্য না স্বপ্ন—হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছিলাম। মনে হল বিভূতিবাবুও সেদিন তেমনি বিচলিত। তিনি সেই অবিন্যস্ত উন্মাদ-করা দৃশ্যে ট্রেনের মধ্যে কখনো অর্থহীন চীৎকার করেছেন, কখনো দুলাইন কীর্তন গান গেয়েছেন, ছট্‌ফট করে ক্রমাগত 'দেখুন দেখুন' করেছেন। তারপর আচম্বিতে এক সময় আমার হাত ধরে আমার চোখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে চীৎকার করে বলে উঠেছেন, 'পরিমলবাবু, ক্ষেপে যান, এ ছাড়া উপায় নেই।' তিনি নিজে ক্ষেপেছেন, অতএব আমাকেও ক্ষেপতে হবে। আমিও সে দৃশ্যে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম, অতিভোজনের ফলে যেমন হয়। কিন্তু আদেশমাত্র বিভূতিবাবুর সমপর্যায়ে ক্ষেপা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

বিভূতিবাবুর অরণ্য-পর্যায়ের লেখাতে অনেক জায়গাতেই দেখা যাবে চলতে চলতে গাছপালার সৌন্দর্যে তিনি অভিভূত হয়ে পথচলা থামিয়ে দিয়েছেন। বসে পড়েছেন মাটিতে অনেক সময়। এই যে মূঢ় আনন্দ, এর কি কোনো ব্যাখ্যা আছে? মনটা যে কি বস্তু তাই তো জানা যায় না, এর মধ্যে কত জাতের কত তন্ত্রী। সৌন্দর্যের আঘাতে কারো সকল সৌন্দর্য-তন্ত্রী একসঙ্গে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে, কারো বা কম হয়, কারো বা কিছুই হয় না। এ নিয়ে তর্ক চলে না। নিসর্গ দৃশ্য যাঁদের মনে সাড়া জাগায়, তাঁরা বিভূতিবাবুর অরণ্য-কথাগুলি পড়বেন। বিভূতিবাবুর শোনা অরণ্যের ভাষা তাঁদের কানেও প্রবেশ করবে। তাঁর প্রত্যেকটি ভ্রমণ বা ডায়ারি বা অরণ্যকথা বাংলাসাহিত্যের এক অসামান্য সম্পদ। প্রকৃতির সৌন্দর্যকে এমন মোহাঞ্জন-পরা দৃষ্টিতে দেখে এমন সরল ভাবে এমন অন্তরের সঙ্গে আবেগের সঙ্গে আর কোনো

লেখক অদ্যাবধি প্রকাশ করেনি। সবই তাঁর হৃদয়ের কথা, প্রাণের কথা, কোথাও কৃত্রিমতা নেই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য এমন ব্যাকুলতাও কারো লেখায় দেখিনি।

বিভূতিবাবুর কাছে ডায়ারিতে উল্লেখকরা ব্যক্তিদের পরিচয় বড় নয়, স্থান ও কাল নিয়েও তিনি খুব কমই ভেবেছেন, অনেক সময়েই স্পষ্ট তারিখ পাওয়া যায় না। খেয়াল নেই যে, এই সব কেউ পড়ে মানুষের বা স্থানের বা কালের পরিচয় জানতে চাইবে। আগেই বলেছি লেখার ভিতরে একটা উদাসীনতা এদিক থেকে আছে। বন্ধন এসেছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তা কাটতে কাটতে এগিয়ে গেছেন। যে গেল সে গেল, কি আর করা যাবে, এই রকম একটা দার্শনিকতার পরিচয় পাওয়া যায় এতে। যেখানে স্নেহ ভালবাসা, সেখানেই ধরা দিয়েছেন, সেখানেই আপ্লুত হয়েছেন, কিন্তু আপন্ন হননি। স্নেহভালবাসার অমৃতহ্রদে পড়েও গলে যাননি। কোনো আকর্ষণের কথা ভাল করে বলতে না বলতে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছেন। ব্যতিক্রম একমাত্র বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দ ভোগের ক্ষেত্রে। তাঁর সকল বন্ধনের মধ্যে একটা স্নিগ্ধ পবিত্রতা। সকল বন্ধন ছেঁড়ার মধ্যে একটা উদার উদাসীনতা।

প্রকৃতির বিরাট মহিমার অসহ্য আনন্দের আঘাতে বিভূতিবাবু যখন পরাজিত, তখন তিনি স্বীকার করেন,

> "কি মহিমা বিরাটের। তুমি আমাকে ভালবেসে এখানে এনেচ, তোমার এ বিরাট রূপকে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ দিয়েচ। কিন্তু আমি তোমার এ রূপের সামনে দিশাহারা হয়ে যাই, দেবতা। আমার সেই তিতপল্লা ফুলের ঝোপই ভালো। বনসিমলতা ঘাটের সেই মাকাল ফলই ভালো। তোমার এ রূপ দেখে আমি ভয় পাই।"

জোহান পাউল রিকটের-লিখিত একটি চমৎকার স্বপ্নের সঙ্গে এর কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। একটি লোককে বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় করাবার জন্য তাকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু বিশ্বের পর বিশ্ব দেখতে দেখতে তার মাথা ঘুরতে লাগল, কিন্তু এর পরেও সীমাহীন মহাশূন্যে আরো বিশ্ব আছে জেনে লোকটি দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে থেমে গেল, তার সমস্ত দেহ কাঁপতে লাগল, চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। অসীমের গুরু ভারে পিষ্ট হৃদয়ে সে বললে, "এঞ্জেল, আমি আর এগিয়ে যেতে পারছি না, ঈশ্বরের মহিমা অসহ্য বোধ হচ্ছে; আমি কবরে প্রবেশ করে এই অসীমের নির্যাতন থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখি, কারণ আমি যে এর কোথাও শেষ দেখতে পাচ্ছি না।" তখন এঞ্জেল তাঁর মহিমময় হাতখানি মহাশূন্যের দিকে তুলে ধরে বললেন, "ঈশ্বরের এই মহা বিশ্বের শেষ তো নেই, বৎস। আরো দেখো, এর আরম্ভও নেই।"

রিকটের, ঈশ্বরের মহিমার যে ছবিটি এঁকেছেন, অসীমের গুরু ভারে পিষ্ট মানুষের আর্ত আত্মার ক্রন্দন, বিভূতিবাবুর লেখায় এরই প্রতিধ্বনি মিলবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে এ সাহিত্য এদেশে আর লেখা হয়নি, সম্ভবত আর কখনো হবেও না।

পরিমল গোস্বামী

অনুবর্তন

ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীটের আর পিটার লেনের মোড়ে ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুল-বাড়ীটা বেশ সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। বেলা দশটা। ছাত্রের দল ইতিমধ্যে আসিতে শুরু করিয়াছে, বড়লোকের ছেলেরা মোটরে, মধ্যবিত্ত ও গরিব গৃহস্থের বাড়ীর ছেলেরা পদব্রজে। স্কুলের পুরানো চাকর মথুরাপ্রসাদ ছেঁড়া ও মলিন খাকির চাপকান পরিয়া তৈরী, চাপকানের হাতের কাছটাতে রাঙা সুতায় একটা ফুটবলের শিল্ডের মত নকশার মধ্যে ইংরেজী 'এম' ও 'আই' অক্ষর দুইটি জড়াপটি খাইয়া শোভা পাইতেছে; কারণ, স্কুলের নাম মর্ডান ইন্‌ষ্টিটিউশন, যদিও হেড-মাস্টার ক্লার্কওয়েল সাহেবের ব্যক্তিগত চিঠির উপরে ছাপানো আছে "ক্লার্কওয়েল্‌স মর্ডান ইন্‌ষ্টিটিউশন", আসলে সেটা ভুল; কারণ, স্কুলটি সাহেবের নিজের নয়, অনেক দিনের পুরানো স্কুল, কমিটির হাতে আছে, ক্লার্কওয়েল সাহেব আজ পনেরো বছর এখানকার বেতনভোগী হেডমাস্টার মাত্র।

এই স্কুল-বাড়ীর দোতলার পিছন দিকের তিনটি ঘর হেডমাস্টারের থাকিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে—ঘরের সামনেই ক্লাসরুম, কাজেই পর্দা ফেলা। ক্লার্কওয়েলের বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি, মাথার চুল সাদা, মোটাসোটা, সর্ব্বদা ফিটফাট হইয়া থাকেন, টাইটা এদিক ওদিক নড়িবার জো নাই, শার্টের সামনেটা নিখুঁত ইস্ত্রি করা, চকচকে কলার, ভাল কাটছাঁটের কোট, পেন্টালুনের পা দুটিতে চমৎকার ভাঁজ, যাহাকে বলে 'নাইফ্‌-এজ্‌-ক্রিজ্‌'—ছুরির ফলার মত সরু খাঁজ। সাহেব অবিবাহিত, কেউ কেউ বলে সাহেবের স্ত্রী আছে, কিন্তু সে সাহেবের কাছে থাকে না। তবে এখানে মিস্ সিবসন্ নামে একজন তরুণী ফিরিঙ্গী মেম সাহেবের সঙ্গেই থাকে, কেউ বলে সাহেবের শালী, কেউ বলে কী রকম বোন, কেউ বলে আর কিছু—মিস্ সিবসন্‌ও স্কুলের টিচার, নীচের ক্লাসে ইংরেজী পড়ায় ও উচ্চারণ শেখায়।

মিস্ সিবসনের নামে এ স্কুলে নীচের ক্লাসের দিকে ছোট ছোট ছেলের বেশ ভিড়। আশপাশের অবস্থাপন্ন গৃহস্থেরা মেমসাহেবের কাছে পড়িতে পাইবে ও নিখুঁত ইংরেজী উচ্চারণ শিখিতে পাইবে, এই লোভে ছেলেদের এই স্কুলে ভর্ত্তি করে। বেলা দশটা বাজিতে না বাজিতে ছোট ছোট ছেলেরা স্কুলের সামনের কম্পাউণ্ডে ছুটাছুটি করিতেছে, মারামারি করিতেছে, হৈ-চৈ চীৎকার লাফালাফি দাপাদাপি জুড়িয়া দিয়াছে।

হঠাৎ দোতলার জানালাপথে ক্লার্কওয়েল সাহেবের মুখখানা বাহির হইল ও বিষম বাজখাঁই চিৎকার শোনা গেল: ও, ইউ মথুরা, স্টপ দি নয়েজ্‌—বাবালোগকো চুপ করনে বোলো—

মুহূর্ত্তে সব চুপ।

ছেলেরা মুখ উঁচু করিয়া হেডমাস্টারকে দেখিয়া লইল, এবং এ ওর মুখের দিকে চাহিয়া যে যাহার মার্ব্বেল পকেটের মধ্যে পুরিয়া ফেলিল ও উদ্যত ঘুষি নামাইল।

—মথুরা—এই মথুরা—

পুনরায় হেডমাস্টারের গম্ভীর আওয়াজ।

নীচের ছোট্ট কুঠুরির মধ্যে বসিয়া চাপকান-পরিহিত বৃদ্ধ মথুরা তামাক খাইতেছিল, সে তাড়াতাড়ি হুঁকা রাখিয়া বাহির হইয়া আসিয়া উপরের দিকে চাহিল।

—পহেলা ঘন্টি মারো, সওয়া দশ হো গিয়া—

দিক্‌বিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া দীর্ঘসময়ব্যাপী স্কুল বসিবার প্রথম ঘণ্টা বাজিয়া চলিল—থামিতে আর চায় না। অনেক ছোট ছোট ছেলের মন বিষণ্ণ হইয়া উঠিল—এই এখন সে স্কুল বসিবার ঘণ্টা পড়িতেছে, কলির সবে শুরু। এযাত্রা কি আর ছুটির ঘণ্টা বাজিবার সম্ভাবনা আছে? মোটে সওয়া দশ, আর কোথায় সেই সাড়ে তিন। সাড়ে তিনটাতে নীচের ছোট ছেলেদের ক্লাসের ছুটি।

ক্লার্কওয়েল তাড়াতাড়ি টেবিলে বসিয়া এক প্লেট সরু চালের ভাত, দুইটি কাঁচা টোমাটো, একটা বড় কাঁচকলা-সিদ্ধ, কিছু কাঁচা লেটুস্ শাক ও কপির পাতা কুচানো, একফালি নারিকেল ও দুইখানা মুর্গীর ঠ্যাং-সিদ্ধ খাওয়া শেষ করিয়া হাঁকিলেন, কেবলরাম!

বাবুর্চী কেবলরাম হিন্দু। সাহেবের কাছে অনেক দিন আছে, সেও কায়দাদুরস্তভাবে সাদা উর্দ্দি পরিয়া, মাথায় সাদা পাগড়ি বাঁধিয়া তৈরী—সাহেবের বাবুর্চীগিরি করে এবং স্কুলের সময়ে রেজিস্ট্রি-খাতাপত্র এ-ক্লাস হইতে ও-ক্লাসে বহিয়া লইয়া যায়, জল তোলে, ছেলেদের জল দেয়—এজন্য স্কুল হইতেই সে বেতন পাইয়া থাকে, সাহেবের খানা পাকাইবার জন্য সে কেবল সাহেবের কাছে খোরাকি পায় মাত্র।

কেবলরাম শশব্যস্ত হইয়া বলিল, হুজুর!

—মেমসাহেব কাঁহা?

—এখনও আসতেছেন না কেন, অনেকক্ষণ তো গেছেন। আলেন বলে হুজুর, ধর্ম্মতলায় ওষুধ আনতি গেছেন।

কেবলরামের বাড়ী যশোর ও খুলনার সীমানায়।

—মেমসাহেবকো খানা টেবিলমে রাখ দো। আউর তুমি চলা যাও ইউনিভার্সিটি, পিওন-বুককা অন্দর দো লেফাফা হ্যায়—

—হুজুর, ইউনিভার্সিটি এখনো খোলে নি, এগারো বাজলি তবে বাবুরা আসবেন—মেমসাহেবের খানা দিয়ে তবে গেলি চলবে না হুজুর?

—বহুৎ আচ্ছা, চা দো।

সকালে ভাত খাওয়ার পর চা-পান ক্লার্কওয়েলের বহুদিনের অভ্যাস।

এই সময় উঁচু গোড়ালির জুতা খট খট করিতে করিতে মিস্ সিবসন্ ঘরে ঢুকিল। কৃশাঙ্গী, লম্বা, মুখে পুরু করিয়া পাউডার, ঠোঁটে লিপষ্টিক ঘষা, হাতে হ্যাণ্ডব্যাগ ঝোলানো। বয়স কম হইলেও গালে ইতিমধ্যেই মেছেতা পড়িতেছে। মুখ ফিরাইয়া চোখ ঘুরাইয়া বলিল, ডিয়ারি, ইউ হ্যাড্ ফিনিশড্ অলরেডি?

—ইয়েস্, ডু ইউ গবল্ আপ কুইক্‌লি, ফার্স্ট বেল্ ইজ গন্, ইউ আর রাদার লেট ফর্ মীল!

সরু গলায় গানের সুরে কথা বলিয়া মেমসাহেব পাশের ঘরে ঢুকিল।

ক্লার্কওয়েল উঠিয়া দাঁড়াইলেন, স্কুলের পোশাক পরিয়াই তিনি খানার টেবিলে বসিয়াছিলেন, বাহিরে চাহিয়া পর্দ্দার ফাঁক দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন, ক্লাসরুমে ছেলে আসিয়াছে কি না! ঢং ঢং করিয়া স্কুল বসিবার ঘণ্টা পড়িল। ক্লার্কওয়েল শশব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া নীচের গাড়ীবারান্দায় স্কুলের ছেলেদের সমবেত প্রার্থনায় যোগ দিতে নামিয়া গেলেন।

ক্লার্কওয়েল দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জাঁহাবাজ হেডমাস্টার। ছাত্র ও মাস্টারেরা সমানভাবে ভয়ে কাঁপে তাঁর দাপটে—পুরো অটোক্র্যাট, কথা বলিলে তার নড়চড় হইবার জো নাই, হুকুমের বিরুদ্ধে কমিটীতে আপীল নাই—কমিটীর মেম্বাররা সবাই বাঙালী, সাহেবকে খাতির করিয়া চলা তাঁহাদের বহুদিনের অভ্যাস, স্কুলের মাস্টারদের ডিক্রি-ডিস্‌মিসের একমাত্র মালিক তিনিই।

সুতরাং আশ্চর্য্য না যে, তাঁহার সিঁড়ি দিয়া দুপ্ দুপ্ করিয়া নামিবার সময় দুই-একজন মাস্টার, যাঁহারা হেডমাস্টারের অলক্ষ্যে তাড়াতাড়ি হাজিরা-বই সই করিতে দোতলায় আপিস-ঘরে যাইতেছিলেন, তাঁহারা একটু সঙ্কুচিত সুরে 'গুড্ মর্নিং স্যার' বলিয়া এক পাশে রেলিং ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া হেডমাস্টারকে নামিবার পথ বাধামুক্ত করিয়া দিলেন—যদিও তাহা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক; কারণ, চওড়া সিঁড়ি উভয় পক্ষের নামিবার ও উঠিবার পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত। ইহা বিনয়ের একপ্রকার রূপ, প্রয়োজনের কার্য্য নহে।

ক্লাস বসিয়া গেল। ক্লার্কওয়েল হাজিরা-বই খুলিয়া দেখিয়া হাঁকিলেন, মিঃ আলম!

সফরুদ্দিন আলম এম-এ, স্কুলের য়্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার। বয়স ত্রিশের মধ্যে, আইন পাশ করিয়া আজ বছর চার-পাঁচ মাস্টারি করিতেছে, ধূর্ত্ত চোখ, চটপটে ধরনের চালচলন—লোক ভাল নয়। হেডমাস্টারের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ, মাস্টারেরা ভয় করিয়া চলে, ভালবাসে না।

আলম বলিল, ইয়েস্ স্যার্।

—আজ প্রেয়ারের সময় শ্রীশবাবু আর যদুবাবু অনুপস্থিত। ওদের ডাকাও।

—স্যার্, যদুবাবু আর শ্রীশবাবুকে বলে বলে পারলাম না, রোজ লেট্ স্যার্, আপনি একটু বলে দিন ওদের।

লাগাইতে-ভাঙাইতে আলমের জুড়ি নাই বলিয়া মাস্টারের দল তাহাকে বিশেষ সমীহ করিয়া চলে।

আলম মাস্টারদের ঘরে গিয়া সুমিষ্ট স্বরে বলিল, যদুবাবু, শ্রীশবাবু, হেডমাস্টার আপনাদের স্মরণ করেছেন। শরৎবাবু কোথায়?

যদুবাবু বয়সে প্রবীণ, চালচলন ক্ষিপ্রতাবর্জ্জিত, রোগা, মাথার চুল কাঁচাপাকায় মিশানো। তিনি ধীরে ধীরে টানিয়া বলিলেন, কেন আমায় অসময়ে স্মরণ—

—আপনি প্রেয়ারের সময় কোথায় ছিলেন?

—আসতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। কেন?

—হেডমাস্টার নোট করেচেন—

যদুবাবু উল্লাসহকারে বলিলেন, ওঃ, তবেই আমার সব হল ! নোট করেচেন তো ভারিই করেচেন ! গেরস্ত মানুষ, কাঁটা ধরে আসা সব সময় চলে না।

মিঃ আলম চুপ করিয়া রহিল।

টিফিনের পর যদুবাবুর পুনরায় ডাক পড়িল আপিসে। ক্লার্কওয়েল বলিলেন, ওয়েল, যদুবাবু, আমার স্কুলে শুনলাম আপনার অসুবিধে হচ্ছে ?

যদুবাবু আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, কেন স্যার ?

বুঝিলেন, আলমের কাছে ওবেলা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সাহেবের কানে উঠিয়াছে।

—আপনার রোজ লেট হচ্ছে স্কুলে, অথচ ঘরের কাজ ঠিকমত করতে পারছেন না শুনলাম।

—ঘরের কাজ ? না স্যার্, ঘরের কাজ ঠিক—তার জন্যে কি—

ক্লার্কওয়েল সাহেব বলিলেন, বসুন ওখানে। এখন কোন ক্লাস আছে ?

—আজ্ঞে, থার্ড ক্লাসে হিস্ট্রির ঘণ্টা।

—আচ্ছা, যাবেন এখন। আপনি আজ প্রেয়ারের সময় ছিলেন না, রোজই থাকেন না।

—আমি কেন স্যার্, শ্রীশ থাকে না, হীরেনবাবু থাকে না, ক্ষেত্রবাবু থাকে না।

—আমি জানি কে কে থাকে না। আপনার বলার আবশ্যক নেই। আপনি ছিলেন না কেন ? লেট করেন কেন রোজ ?

—খেতে একটু দেরি হয়ে যায় স্যার্।

—বেশ, মাই গেট্ ইজ্ ওপ্‌ন্। আপনার অসুবিধে হলে আপনি চলে যেতে পারেন।

যদুবাবু নিরুত্তর রহিলেন। সাহেবের আড়ালে যাহাই বলুন, সামনাসামনি কিছু বলিবার সাহস তাঁহার নাই। অন্তত এতদিন কেহ দেখে নাই।

—আচ্ছা, যান ক্লাসে। কাল থেকে আমার আপিসে এসে সই করবেন আগে।

যদুবাবু পরের ক্লাসের ঘণ্টা পড়িলে আপিসে আসিয়াই ক্ষেত্রবাবুকে সামনে দেখিতে পাইলেন। তখনও অন্য কোন শিক্ষক আপিস-ঘরে আসেন নাই।

ক্ষেত্রবাবু স্বর নীচু করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তলব হয়েছিল কেন ?

যদুবাবু বলিলেন, ওঃ, অত আস্তে কথা কিসের ? বলব সোজা কথা, তার আবার অত ঢাক-ঢাক গুড়-গুড়—

হঠাৎ যদুবাবুকে বাক্‌শক্তি রহিত হইতে দেখিয়া ক্ষেত্রবাবু সবিস্ময়ে পিছন ফিরিয়া চাহিতেই একেবারে য়্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার মিঃ আলমের সহিত চোখোচোখি হইয়া গেল।

আলম বলিল, ক্ষেত্রবাবু, ফোর্থ ক্লাসে এক্‌জামিনের পড়া দেখিয়ে দিয়েছেন ?

—আজ্ঞে হাঁ।

—যদুবাবু ?

—কাল দেব।

—কেন, আজই দিন না।

—কাল দিলে ক্ষতি কিছু নেই।

অল্পক্ষণ পরে হেডমাস্টারের আপিসে যদুবাবুর আবার ডাক পড়িল।

হেডমাস্টার বলিলেন, যদুবাবু আপনি ফোর্থ ক্লাসে কী পড়ান ?

—হিষ্ট্রি স্যার্।

—ওদের উইকলি পরীক্ষা হবে এই শনিবার, পড়া দেখিয়ে দিয়েছেন ?

—না স্যার্, কাল দেব।

—ওরা কদিন সময় পাবে তৈরী হতে, তা ভেবে দেখলেন না ! ছেলেদের কাজ যদি না হয়, তেমন মাস্টার এ স্কুলে রাখাও যা না রাখাও তাই। মাই ডোর ইজ্ ওপ্‌ন্—আপনার না পোষায়, আপনি চলে গেলে কেউ বাধা দেবে না।

যদুবাবু বিনীতভাবে জানাইলেন, তিনি এখনই ক্লাসে গিয়া পড়া বলিয়া দিতেছেন।

—তাই যান। পড়া দিয়ে এসে আমাকে রিপোর্ট করবেন।

—যে আজ্ঞে স্যার্।

আপিসে আসিয়া যদুবাবু লম্ফঝম্প আরম্ভ করিলেন। অন্য কেহ সেখানে ছিল না, শুধু হেডপণ্ডিত ও ক্ষেত্রবাবু।

—ওই আলম, ওটা একেবারে অন্ত্যজ—লাগিয়েছে গিয়ে অমনি হেডমাস্টারের কাছে। কথা পড়তে না পড়তে লাগাবে—এমন করলে তো এ স্কুলে থাকা চলে না দেখছি ! বললাম যে ফোর্থ ক্লাসের একজামিনের পড়া দিচ্ছি দেখিয়ে—তা না, অমনি লাগানো হয়েছে। এ রকম করলে কি মানুষ টেঁকে মশাই ?

বলা বাহুল্য, যদুবাবু জানিতেন, য়্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার এ ঘণ্টায় নীচের হলে য়্যাডিশনাল হিষ্ট্রির ক্লাস লইতেছেন।

ক্ষেত্রবাবু নীরব সহানুভূতি জানাইয়া চুপ করিয়া থাকাই নিরাপদ মনে করিলেন। তিনি ছাপোষা মানুষ, আজ সতেরো বছর ত্রিশ টাকা বেতনে এই স্কুলে চাকরি করিতেছেন। বেলেঘাটা অঞ্চলে একটি মাত্র ঘর ভাড়া লইয়া আছেন, সকালে ও সন্ধ্যায় সামান্য একটু হোমিওপ্যাথি করিয়া আর কিছু উপার্জ্জন করেন। চাকুরিটুকু গেলে এ বাজারে পথে বসিতে হইবে।

হেডপণ্ডিত মশায় বৃদ্ধ লোক, তিনি ক্লার্কওয়েল সাহেবের পূর্ব্ব হইতে এ স্কুলে আছেন—তিনি আর নারাণবাবু। অনেক মাস্টার আসিল, চলিয়া গেল, তিনি ঠিক আছেন। মেজাজ দেখাইতে গেলে চাকরি করা চলে না। তবে তিনি ইহাও জানেন, লম্ফঝম্প করা যদুবাবুর স্বভাব, শেষ পর্য্যন্ত কোন দিক হইতেই কিছু দাঁড়াইবে না।

এই সময় নারাণবাবু ঘরে ঢুকিলেন। তিনিও বৃদ্ধ, এই স্কুলেরই একটি ঘরে থাকেন—নিজে রান্না করিয়া খান। আজ পঁয়ত্রিশ বছর এ স্কুলে আছেন এবং এইভাবেই আছেন। বৃদ্ধের নিকট কেহ কখনও তাঁহার কোন আত্মীয়স্বজনকে আসিতে দেখে নাই। রোগা, বেঁটে-

চেহারার মানুষটি, পাকশিটে গড়ন, গায়ে আধময়লা পাঞ্জাবি, ততোধিক ময়লা ধুতি, পায়ে চটি জুতা।

নারাণবাবু পকেট হইতে একটি টিনের কৌটা বাহির করিয়া একটি বিড়ি ধরাইলেন।

ক্ষেত্রবাবু হাত বাড়াইয়া বলিলেন, দিন একটা, কাঠিটা ফেলবেন না।

নারণবাবু বলিলন, কী হয়েছে, আজ যদুবাবুকে হেডমাস্টার ডাকিয়েচে কেন?

যদুবাবু চড়াগলায় মেজাজ দেখানোর সুরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, সেই কথাই তো বলচি। শুধু শুধু ওই অন্ত্যজটা আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে—

নারাণবাবু বলিলেন, আস্তে, আস্তে—

যদুবাবু গলা আরও এক পর্দা চড়াইয়া বলিলেন, কেন, কিসের ভয়? যদু মুখুজ্জে ওসব গ্রাহ্যি করে না। অনেক আলম দেখে এসেছি, থার্ড ক্লাস এম-এ—তার আবার প্রতাপটা কিসের হ্যা? কেবল লাগানো-ভাঙানো সব সময়! আর লাগানোর ধার ধারে কে? উনি ভাবেন, সবাই ওঁকে ভয় করে চলবে। যে চলে সে চলুক, যদু মুখুজ্জে সে রকম বংশের—

বাহিরে বুট জুতার শব্দ শোনা গেল—মিঃ আলমের পায়ে বুট আছে সবাই জানে—যদুবাবু হঠাৎ থামিয়া গেলেন। ক্ষেত্রবাবু বলিয়া উঠলেন, যাই, খড়িটা দিন নারাণবাবু দয়া করে, ক্লাস আছে।

নারাণবাবু বলিলেন, চল, আমিও যাই। ওরে কেবলরাম, ইণ্ডিয়ার বড় ম্যাপখানা দে তো—

কিন্তু দেখা গেল, যে ঘরে ঢুকিল সে মিঃ আলম নয়, বইয়ের দোকানের একজন ক্যানভাসার—এক হাতে ব্যাগ ঝোলানো, অন্য হাতে কিছু নতুন স্কুল-পাঠ্য বই। ক্যানভাসারের সুপরিচিত মূর্ত্তি। ক্যানভাসারের প্রশ্নের উত্তরে তাহাকে হেডমাস্টারের আপিস দেখাইয়া দিয়া যদুবাবু পুনরায় শুরু করিলেন, হ্যাঁ, আমি যা বলব এক কথা। কাউকে ভয় করে না এই যদু মুখুজ্জে। বলি বাবা, এ স্কুল গড়ে তুলেছে কে? ওই নারাণ বাঁড়ুজ্জে আর হেডপণ্ডিত। সাহেব এল তো কাল, উড়ে এসে জুড়ে বসেচে—আর ওই অন্ত্যজ—

মিঃ আলমের প্রবেশটা একটু অপ্রত্যাশিত ধরনে ঘটিল।

যদুবাবু হঠাৎ ঢোক গিলিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

মিঃ আলমের ব্যবহার অত্যন্ত ভদ্র ও সংযত। মুখের উপর কেহ গালাগালি দিলেও মিঃ আলমের কথাবার্ত্তা বা ব্যবহারে কখনও রাগ প্রকাশ পায় না। আলম বলিল, ক্ষেত্রবাবুর একটা দরখাস্ত দেখলাম হেডমাস্টারের টেবিলে, কাল আসবেন না। কী কাজ?

ক্ষেত্রবাবু বললেন, আজ্ঞে, কাল আমার ভাগ্নীর বিয়ে—

—তা একদিন কেন, দুদিন ছুটি নিন না। আমি সাহেবকে বলে দেব এখন।

ক্ষেত্রবাবু বিনয়ে গলিয়া গিয়া বলিলেন, যে আজ্ঞে। তাই দেবেন বলে। আমার সুবিধে হয় তা হলে—থ্যাঙ্কস।

—নো মেন্‌শন্‌।

ছুটির ঘণ্টা এইবার পড়িবে। শেষের ঘণ্টাটা কি কাটিতে চায়? ক্ষেত্রবাবু ও যদুবাবু তিনবার ঘড়ি দেখিতে পাঠাইলেন। চারিটা বাজিতে পনেরো মিনিট, আট মিনিট এখনও চার মিনিট।

স্কুল-ঘরের নীচের তলায় একটা অন্ধকূপ ঘরে থার্ড পণ্ডিত জগদীশ ভট্‌চাজ জ্যোতির্ব্বিনোদ মশায় আছেন। বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গে, দশ বৎসর এই স্কুলে আছেন, কুড়ি টাকায় ঢুকিয়াছিলেন, এখনও তাই—গত দশ বৎসরে এক পয়সাও মাহিনা বাড়ে নাই। অবশ্য অনেক মাস্টারেরই বাড়ে নাই—হেডমাস্টার ও য়্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার ছাড়া। হেডমাস্টারের মাহিনা গত চারি বৎসরের মধ্যে দুই শত টাকা হইতে দুই শত পঁচাত্তর এবং মিঃ আলমের মাহিনা ষাট হইতে পঁচাশি হইয়াছে।

ভুলিয়া যাইতেছিলাম, মিস স্মিসনের মাহিনা গত দুই বৎসরে এক শত হইতে দেড় শত দাঁড়াইয়াছে।

উপরের তিন জনের মাহিনা বছর বছর বাড়িয়া চলিয়াছে, অথচ নীচের দিকের শিক্ষকগণের বেতনের অঙ্ক গত দশ পনেরো বিশ বৎসরেও দারুব্রহ্মবৎ অনড় ও অচল আছে কেন—এ প্রশ্ন উত্থাপন করিবার সাহস পর্য্যন্ত কোন হতভাগ্য শিক্ষকের নাই। সে কথা থাক্।

জগদীশ জ্যোতির্ব্বিনোদ সিক্স্‌থ্ ক্লাসে বাংলা পড়াইতেছিলেন। তিনি শেষ ঘণ্টার দীর্ঘতায় অতিষ্ঠ হইয়া একটি ছেলেকে ঘড়ি দেখিতে পাঠাইলেন। আপিস-ঘরে ঘড়ি। সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া ঘাড় বাড়াইয়া চালাক ছেলেরা ঘড়ি দেখিয়া ফিরিয়া আসে, যাহাতে হেডমাস্টারের চোখে না পড়িতে হয়। কিন্তু ভাঙা পা খানায় পড়ে। জগদীশ জ্যোতির্ব্বিনোদের প্রেরিত হতভাগ্য ছাত্রটি একেবারে হেডমাস্টারের সামনে পড়িয়া গেল—ঘড়ি দেখিতে চেষ্টা করিবার অবস্থায়।

ক্লার্কওয়েল ভীমগর্জ্জনে হাঁকিলেন, হোয়াট ইউ আর ট্রাইং টু লুক য়্যাট? ইউ! কাম্ আপ্!

ছোট ছেলেটি কাঁপিতে কাঁপিতে আপিস-ঘরে ঢুকিল। সেখানে মিঃ আলম বসিয়া ছিল। আলম জিজ্ঞাসা করিল, কী করছিলে নন্দ?

—ঘড়ি দেখছিলাম স্যার্।

—কেন? ক্লাসে কেউ নেই?

—আজ্ঞে, থার্ড পণ্ডিত মশাই আছেন। তিনি ঘড়ি দেখতে পাঠিয়ে দিলেন।

আলম ও হেডমাস্টার পরস্পরের দিকে চাহিলেন।

—আচ্ছা, যাও তুমি।

মিঃ আলম বলিলেন, চলবে না স্যার। কতকগুলো টীচার আছে, একেবারে অকর্ম্মণ্য, শুধু ঘড়ি দেখতে পাঠাবে ছেলেদের। কাজে মন নেই। এই থার্ড পণ্ডিত একজন, যদুবাবু,

হীরেনবাবু, আর ওই হেডপণ্ডিত—

একটা নোটিস লিখে দিন মিঃ আলম, স্কুল-ছুটির পরে মাস্টারেরা সব আমার সঙ্গে দেখা না করে না যায়। ঘণ্টা দিতে বারণ করে দিন, নোটিস ঘুরে আসুক।

মিঃ আলম হাঁকিল, কেবলরাম, ঘণ্টা দিয়ো না।

একে ঘণ্টা কাটে না, তাহার উপর ক্লাসে হেডমাস্টারের নোটিস গেল— ছুটির পর কোন মাস্টার চলিয়া যাইতে পারিবে না, হেডমাস্টার তাঁহাদের স্মরণ করিয়াছেন।

হেডমাস্টারের আপিস-ঘরে একে একে যদুবাবু, শরৎবাবু, নারাণবাবু, প্রভৃতি আসিয়া জুটিলেন। জ্যোতির্বিনোদ মশায় সকলের শেষে কম্পিত দুরু-দুরু বক্ষে প্রবেশ করিলেন; কারণ, তিনি সেই ছেলেটির মুখে শুনিয়াছেন সব কথা। তাঁহার জন্যই যে এই বিচার-সভার আয়োজন, তাহা তাঁহার বুঝিতে বাকি নাই।

হেডমাস্টার বলিলেন, ইজ্‌ এভ্‌রিবডি হিয়ার?

মিঃ আলম উত্তর দিলেন, ক্ষেত্রবাবু আর হেডপণ্ডিতকে দেখছি নে।

নারাণবাবু বলিলেন, ক্লাসে রয়েছেন, আসছেন।

কথা শেষ হইতেই তাঁহারাও ঢুকিলেন।

—এই যে আসুন, আপনাদের জন্যে সাহেব অপেক্ষা করছেন।

ক্লার্কওয়েল শিক্ষকদের সভায় অতি তুচ্ছ কথা বলিবার সময়ও জজ সাহেবের মত গাম্ভীর্য্য ও আড়ম্বর প্রদর্শন করিয়া থাকেন, বাজেট সভায় বাজেট পেশ করিবার সময় অর্থসচিব যত না বাগ্মিতা দেখান তদপেক্ষা বাগ্মিতা দেখাইয়া থাকেন। তিনি বর্ত্তমানে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া টাই ধরিয়া কখনও দক্ষিণে কখনও বামে হেলিয়া গম্ভীর স্বরে আরম্ভ করিলেন, টীচার্স, আজ আপনাদের ডেকেচি কেন, এখনি বুঝবেন। আমরা এখানে কতকগুলি তরুণ আত্মার উন্নতির জন্যে দায়ী (বড় বড় কথা বলিতে ক্লার্কওয়েল সাহেব খুব ভালবাসেন), আমরা শুধু মাইনে নিয়ে ছেলেদের ইংরেজী শেখাতে আসি নি, আমরা এসেছি দেশের ভবিষ্যৎ আশার স্থল বালকদের সত্যিকার মানুষ করে তুলতে। আমরা তাদের সময়নিষ্ঠা শেখাব, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা শেখাব—তবে তারা ভবিষ্যতে সুনাগরিক হয়ে দেশের বড় বড় কার্য্যভার হাতে নিয়ে নিজেদের জীবন সার্থক করে তুলতে পারবে, সেই সঙ্গে দেশেরও শ্রীবৃদ্ধি হবে।

দুই-একজন শিক্ষক বলিলেন, ঠিক কথা, ঠিক কথা।

—এখন দেখুন, যদি আমরাই তাদের সময়নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যানুরাগ না শিখিয়ে ফাঁকি দিতে শেখাই, যদি আমরা নিজেরা নিজেদের কর্ত্তব্য কাজে অবহেলা করি, তবে সে যে কত বড় অপরাধ, তা ধারণা করবার ক্ষমতা আমাদের মধ্যে অনেকের নেই দেখা যাচ্ছে। শিক্ষকতা শুধু পেটের ভাতের জন্যে চাকরি করা নয়, শিক্ষকতা একটা গুরুতর দায়িত্ব—এই জ্ঞান যাদের না থাকে, তারা শিক্ষক এই মহৎ নামের উপযুক্ত নয়।

দুই-চারিজন শিক্ষক মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিলেন।

—আমি জানি, এখানে এমন শিক্ষক আছেন, যাঁদের মন নেই তাঁদের কাজে। তাঁদের প্রতি আমার বলবার একটিমাত্র কথা আছে। মাই গেট ইজ্ ওপন্—তাঁরা দিব্যি তার মধ্যে দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে চলে যেতে পারেন, কেউ তাঁদের বাধা দেবে না।

হেডমাস্টার কটমট করিয়া যদুবাবু, থার্ড পণ্ডিত ও হেডপণ্ডিতের দিকে চাহিলেন।

—আজকের ঘটনাই বলি। আপনাদের মধ্যে কোন একজন শিক্ষক আজ আপিসে ঘড়ি দেখতে পাঠিয়েছিলেন একটি ছেলেকে। তিনি যে কতবড় গুরুতর অন্যায় করেছেন, তা তিনি বুঝতে পারছেন না। এতে প্রমাণ হল যে, কর্তব্য কাজে তাঁর মন নেই, কখন ঘণ্টা শেষ হবে সে জন্য তাঁর মন উসখুস করছে—তাঁর দ্বারা সুচারুরূপে শিক্ষকের কর্তব্য কখনই সম্পন্ন হতে পারে না। সুকুমারমতি বালকদের সামনে তিনি কী আদর্শ দাঁড় করালেন? কাজে ফাঁকি দেবার আদর্শ, কর্তব্যে অবহেলার আদর্শ—কী বলেন আপনারা?

সকলেই মাথা এক পাশে হেলাইয়া বলিলেন, ঠিক কথা।

—এখন আমি আপনাদের একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। সে শিক্ষকের প্রতি আর ভাল ব্যবহার করা চলে কি? তাঁর দ্বারা এ স্কুলের কাজ চলে কি? বলুন আপনারা? আমি মিঃ আলমকে এই প্রশ্ন করচি। মিঃ আলম একজন কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষক বলে আমি জানি। আর একজন ভাল শিক্ষক আছেন—নারাণবাবু, তাঁর প্রতিও আমি এই প্রশ্ন করচি।

ক্ষেত্রবাবু, যদুবাবু ও থার্ড পণ্ডিত তিনজনেরই মুখ শুকাইল। তিনজনেই ঘড়ি দেখিতে পাঠাইয়াছিলেন, তিনজনের প্রত্যেকেই ভাবিলেন তাঁহার উদ্দেশেই হেডমাস্টারের এই বক্তৃতা।

নারাণবাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, একটা কথা আছে আমার স্যার্।

—কী, বলুন?

—এবার তাঁকে ক্ষমা করুন, তিনি যেই হোন, আমার নাম জানবার দরকার নেই, এবার তাঁকে ক্ষমা করুন। ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দিন স্যার্।

হেডমাস্টারের কণ্ঠস্বর ফাঁসির হুকুম দিবার প্রাক্কালে দায়রা-জজের মত গম্ভীর হইয়া উঠিল।

—না নারাণবাবু, তা হয় না। আমি নিজের কর্তব্য কর্মে অবহেলা করতে পারব না—আমি এই ইনস্টিটিউশনের হেডমাস্টার, আমার ডিউটি একটা আছে তো? আমি চোখ বুজে থাকতে পারি নে। আমার কর্তব্য এখানে সুস্পষ্ট, হয়তো তা কঠোর, কিন্তু তা করতে হবে আমায়। আমি সেই টিচারকে সাস্পেণ্ড করলাম।

হঠাৎ যদুবাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, স্যার, আমি ঘড়ি দেখতে কোনদিন পাঠাই নি—আজ পাঠিয়েছিলাম, তার একটা কারণ ছিল স্যার্, আমার স্ত্রী অসুস্থ, ডাক্তার আসবে চারটের পরেই—তাই—এবারটা আমায়—

তিনি এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া এই কৈফিয়তটি তৈরি করিতেছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহারই উদ্দেশে হেডমাস্টার এতক্ষণ ধরিয়া বাক্যবাণ বর্ষণ করিলেন। বলা বাহুল্য,

কৈফিয়তটির মধ্যে সত্যের বালাই ছিল না।

হেডমাস্টারের চোখ কৌতুকে নাচিয়া উঠিল। তাহার একটা কারণ, যদুবাবু কোনদিনই বাগ্মী নহেন, বর্ত্তমানে ভয় পাইয়া যে কথাগুলি বলিলেন, সেগুলির ইংরেজী বারো আনা ভুল। অথচ যদুবাবু ব্যাকরণ পড়ান ক্লাসে—ইংরেজীর কী কী ভুল হইল, তিনি নিজেও তাহা বলিবার পরক্ষণেই বুঝিয়া লজ্জিত হইয়াছেন, কিন্তু বলিবার সময় কেমন হইয়া যায় সাহেবের সামনে।

হেডমাস্টার বলিলেন, আপনি প্রায়ই ও-রকম করে থাকেন কি না সে সব এখানে বিচার্য্য বিষয় নয়। আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা একবারও আমি ক্ষমা করতে পারি নে।

নারাণবাবু উঠিয়া বলিলেন, এবার আমাদের অনুরোধটা রাখুন স্যার্।

—আচ্ছা, আমি একজনের সম্বন্ধে সে অনুরোধ মানলাম। কারণ, তাঁর বাড়ীতে গুরুতর পারিবারিক কারণ আছে তিনি বলচেন। একজন শিক্ষক মিথ্যে কথা বলচেন, এ রকম ধরে নেওয়ার কোন কারণ নেই। কিন্তু আমি থার্ড পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করি, তাঁর কী কারণ ছিল ঘন ঘন ঘড়ি দেখবার? তিনি স্কুলেই থাকেন। তাঁর কোন তাড়াতাড়ি দেখি না। তাঁকে ক্ষমা করতে পারি না, তাঁকে আমি সাস্পেণ্ড করলাম।

থার্ড পণ্ডিত এবার দাঁড়াইয়া কাঁদো-কাঁদো স্বরে বাংলায় বলিলেন, (তিনি ইংরেজী জানেন না), সাহেব, এবার আমায় ক্ষমা করুন, আমি এমন আর কখনও করব না।

ক্ষেত্রবাবু ভাবিলেন, খুব বাঁচিয়া গিয়াছি এ যাত্রা! আমিও যে ঘড়ি দেখিতে পাঠাই, সেটা কেহ জানে না।

হেডমাস্টার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, আমার হুকুম নড়ে না। ছেলেদের প্রতি কর্ত্তব্যপালন আগে করতে হবে, তার পর ব্যক্তিগত দয়া দাক্ষিণ্য। সামনের বুধবারে স্কুল কমিটির মীটিং আছে, সেখানে আমি আপনার কথা ওঠাব। কমিটির অনুমতি নিয়ে আপনার শাস্তির ব্যবস্থা হবে। আপনি কাল থেকে আর ক্লাসে যাবেন না। কত দিন আপনাকে সাস্পেণ্ড করা হবে, সেটা কমিটী ঠিক করবেন।

সভা ভঙ্গ হইল। হেডমাস্টার গট গট করিয়া আপিস ছাড়িয়া নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। মাস্টারেরাও একে একে সরিয়া পড়িলেন—তাঁহারা যদি কিছু বলেন, ফুটপাথে গিয়া বলিবেন।

সন্ধ্যার সময় ক্লার্কওয়েল সাহেব মোটরে খয়রাগড়ের রাজকুমারকে পড়াইতে চলিয়া গেলেন ল্যান্সডাউন রোডে। মোটা টাকার টুইশানি, তাহারাই মোটর পাঠাইয়া লইয়া যায়। সাহেব বাহির হইয়া যাইবার পরে মিস্ সিবসন্ ঘরে বসিয়া সেলাই করিতেছে, এমন সময় দরজার বাহিরে খুস-খুস শব্দ শুনিয়া বলিল, হু? কোন্ হ্যায়?

বিনম্র সঙ্কোচে পর্দ্দা সরাইয়া থার্ড পণ্ডিত একটুখানি মুখ বাহির করিয়া উঁকি মারিয়া বলিলেন, আমি মেমসাহেব।

—ও,পাণ্ডিট্! কাম্ ইন্। হোয়াট্'স হোয়াট্?

থার্ড পণ্ডিত হাত জোড় করিয়া কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলিলেন, সাহেব আমাকে সাস্‌পেণ্ড করেছেন।

—বেগ ইওর পার্ডন্?

থার্ড পণ্ডিত 'সাস্‌পেণ্ড' কথাটার উপর জোর দিয়া কথা বলিয়া নিজের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিলেন—মি, হাম—

মিস্ সিবসন্ আসলী বিলাতী, নানা দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়িয়া ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলে চাকরি লইতে বাধ্য হইয়াছে। বুদ্ধিমতী মেয়ে, ব্যাপারটা বুঝিয়া হাসিয়া বলিল, ওয়েল—

—ইউ মাদার—আই সন্—সাহেবকে বলুন মা—

—ইয়েস্, আই প্রমিস টু—

—হ্যাঁ, মা, বুড়ো হয়েছি—ওল্ড ম্যান (থার্ড পণ্ডিত নিজের মাথার সাদা চুলে হাত দিয়া দিয়া দেখাইলেন) না খেয়ে মরে যাব—(মুখের কাছে হাত লইয়া গিয়া খাওয়ার অভিনয় করিয়া হাত নাড়িয়া না-খাওয়ার অভিনয় করিলেন) ইট্ নট—

মেমসাহেব হাসিয়া বলিলেন, আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড পাণ্ডিট্।

—নমস্কার মাদার।

থার্ড পণ্ডিত চলিয়া আসিলেন।

যদুবাবু ছুটি হইলে মলঙ্গা লেনের ছোট বাসাটায় ফিরিয়া গেলেন। দশ টাকা মাসিক ভাড়ায় একখানি মাত্র ঘর দোতলায়—এক বাড়ীতে আরও তিনটি পরিবারের সঙ্গে বাস। যদুবাবুর স্ত্রী দুইখানি রুটি ও একটু পেঁপের তরকারি আনিয়া সামনে ধরিলেন। যদুবাবু গোগ্রাসে সেগুলি গিলিয়া বলিলেন, আর একটু জল—

যদুবাবু নিঃসন্তান। ত্রিশ টাকা মাহিনায় ও দুই-একটি টুইশানির আয়ে স্বামী-স্ত্রীর কায়ক্লেশে চলিয়া যায়।

জলপান করিয়া যদুবাবু একটু সুস্থ হইয়া তামাক ধরাইলেন।

যদুবাবুর স্ত্রী একসময়ে রূপসী বলিয়া খ্যাত ছিল, এখন নানা দুঃখকষ্টে সে রূপের কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নাই আর, প্রায় সকল বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের মতই স্বামীর উপর তাহার টানটা বেশী। স্বামীর কাছে বসিয়া বলিল, তোমার বড় শালীর বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে, ছেলের অন্নপ্রাশন, যাবে নাকি?

এ যে একটু বক্রোক্তি, যদুবাবু সেটা বুঝিলেন। এটি যদুবাবুর স্ত্রীর বৈমাত্রেয় দিদি, সকলে বলে এই মেয়েটির রূপ দেখিয়া যদুবাবু নাকি একদিন মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাকে বিবাহ করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ঘটে নাই। যদুবাবুর স্ত্রী খোঁচা দিতে ছাড়ে না এখনও।

—তুমি যাও। এখন মুর্শিদাবাদ যাই সে সময় কই? ওরা নিতে আসবে?

—তা জানি নে। তারা এখন বড়লোক, যদিই ধরো গরিব কুটুম্বুর অত তোয়াক্ক না

করে! চিঠি একখানা দিয়েছে, এই যথেষ্ট।

—তা হলে যাওয়া হবে না। ভাড়ার টাকা, তারপর ধর নকুতো কিছু একটা দিতে হবে—সে হয় না।

—আমার কাছে কিছু আছে—তবে তুমি যদি না যাও, আমি যাব না।

—আমি ছুটি পাব না। আলম ব্যাটা বড্ড লাগাচ্ছে আমার নামে সাহেবের কাছে। আজ তো এক কাণ্ডতে বেধে গিয়েছিলাম আর কি, অতি কষ্টে সামলেছি। আমার হয় না। তুমি বরং যাও।

এমন সময় বাহির হইতে নারাণবাবুর গলা শোনা গেল—ও যদু, আছ নাকি?

—আসুন, আসুন নারাণদা—

নারাণবাবু ঘরে ঢুকিয়া যদুবাবুর স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, বউঠাকরুন, একটু চা খাওয়াতে পার?

যদুবাবুর স্ত্রী ঘোমটার ফাঁকে যদুবাবুর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন—অর্থাৎ চা নাই, চিনি নাই, দুধ নাই। অর্থাৎ যদুবাবু বাড়ীতে চা খান না।

যদুবাবু বলিলেন, বসুন নারাণদা, আমি একটু আসচি।

নারাণবাবু হাসিয়া বলিলেন, আসতে হবে না ভায়া, আমি সব এনেছি পকেটে, এই যে—আমি খাই কিনা, সব আমার মজুত আছে। তোমার এখানে আসব বলে পকেটে করে নিয়েই এলাম। এই নাও বউঠাকরুন।

—তারপর, দেখলেন তো কাণ্ডখানা?

—ও তো দেখেই আসছি। নতুন আর কী বল?

—আমায় কী রকম অপমানটা—

—আরে, তুমি যে ভায়া, গায়ে পেতে নিলে, ওটা আসলে থার্ড পণ্ডিতকে লক্ষ্য করে বলছিল সাহেব।

—না না, আপনি জানেন না, আমাকেও বলছিল ওই সঙ্গে।

—কিছু না, তোমার হয়েচে—ঠাকুরঘরে কে? না, আমি তো কলা খাই নি। তুমি কেন বলতে গেলে ও-কথা?

—যাক, তা নিয়ে তর্ক করে কোন লাভ নেই। ও যেতে দিন।

চা-পান শেষ করিয়া দুইজনে উঠিলেন। টুইশানির সময় সমাগত।

যদুবাবু শাঁখারিটোলায় এক বাড়ীতে টুইশানিতে গেলেন। নীচের তলায় অন্ধকার ঘর, তিনটি ছেলে একসঙ্গে পড়ে। ভীষণ গরম ঘরের মধ্যে, কেমন একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ আসে পাশের সিউয়ার্ড ডিচ্‌ হইতে। দুইটি ঘণ্টা তাহাদের পড়া বলিয়া ক্লাসের টাস্ক লিখাইয়া দিতে রাত আটটা বাজিল। আর একটা টুইশানি নিকটেই, যদু শ্রীমানীর লেনে। সেখানে একটি ছেলে—ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে, বেশ একটু নির্বোধ অথচ পড়াশুনায় মন খুব।

এমন ধরনের ছেলেরাই প্রাইভেট টিউটরকে ভোগায় বেশী। এ ছেলেরা এই অঙ্ক কষাইয়া লয়, ওটার ভাবাংশ লিখাইয়া লয়—খাটাইয়া ফরমাশ দিয়া যদুবাবুকে রীতিমত বিরক্ত করিয়া তোলে প্রতিদিন। ক্লার্কওয়েল সাহেবকে ফাঁকি দেওয়া চলে, কিন্তু প্রাইভেট টুইশানির ছাত্র বা ছাত্রের অভিভাবকদের ফাঁকি দেওয়া বড়ই কঠিন।

রাত পৌনে দশটার সময় যদুবাবু উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় ছেলেটি বলিল, একটু বাকী আছে স্যার্। কাল ইংরেজী থেকে বাংলা রিট্রানস্লেশন (বারো আনা শিক্ষক ও ছাত্র এই ভুল কথাটি ব্যবহার করে) রয়েচে, বলে দিয়ে যান।

যদুবাবুর মাথা তখন ঘুরিতেছে। তিনি বলিলেন, আজ না হয় থাক্।

—না স্যার্। বকুনি খেতে হবে, বলে দিয়ে যান।

—কই, দেখি। এতটা? এ যে ঝাড়া আধ ঘণ্টা লাগবে! আচ্ছা, এস তাড়াতাড়ি। আমি বলে যাই, তুমি লিখে নাও।

নির্ব্বোধ ছাত্রকে লিখাইয়া দিতেও প্রায় আধ ঘণ্টা লাগিয়া গেল। রাত সাড়ে দশটার সময় ক্লান্ত বিরক্ত যদুবাবু আসিয়া বাড়ী পৌঁছলেন ও যা-হয় দুটি মুখে দিয়াই শয্যা আশ্রয় করিলেন।

পরদিন স্কুলে ক্লার্কওয়েল সাহেব জ্যোতির্ব্বিনোদ মহাশয়কে ডাকাইয়া বলিলেন, পণ্ডিত, তুমি মেমসাহেবের কাছে কেন গিয়েছিলে? চাকরি তোমার বন্ধ আছে আমার হুকুমে, তা রদ হবে না।

জ্যোতির্ব্বিনোদ ইংরেজী বোঝেন না, কিন্তু আন্দাজ করিয়া লইলেন, সাহেবকে মেমসাহেব কোন কথা বলিয়া থাকিবে, তাহার ফলেই এই ডাক। তিনি হাত জোড় করিয়া বলিলেন, সাহেব মা-বাপ, আপনি না রাখলে কে রাখবে? আমি এমন কাজ আর কখনও করব না।

হেডমাস্টারের মুখে ঈষৎ হাসির আভাস দেখিয়া জ্যোতির্ব্বিনোদের মনে আশ্বাস জাগিল। সাহস পাইয়া তিনি হেডমাস্টারের টেবিলের সামনে আগাইয়া গিয়া বলিলেন, এবার আমায় মাপ করুন,—ব্রাহ্মণ—আমার অন্ন—

হেডমাস্টার টেবিলের উপর কিল মারিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মণ আমি মানি না। আমার কাছে হিন্দু-মুসলমান সমান।

জ্যোতির্ব্বিনোদ চুপ করিয়া রহিলেন—ইংরেজী বুঝিয়াছিলেন বলিয়া নয়, টেবিলে কিল মারার দরুন ভাবিলেন, সাহেব যে কারণেই হোক চটিয়াছেন।

হেডমাস্টার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, ওয়েল?

জ্যোতির্ব্বিনোদ পুনরায় হাত জোড় করিয়া বলিলেন, আমায় মাপ করুন এবার।

—আচ্ছা, যাও এবার, ও-রকম আর না হয়, তা হলে মাপ হবে না।

জ্যোতির্ব্বিনোদ সাহেবকে নমস্কার করিয়া আপিস হইতে নিক্রান্ত হইলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজে মিটিল না। স্কুল বসিবার পর মিঃ আলম শুনিয়া হেডমাস্টারকে বুঝাইলেন, এরকম করিলে এ স্কুলে ডিসিপ্লিন রাখা যাইবে না—মাস্টাররা স্বভাবতই ফাঁকিবাজ

আরও ফাকি দিবে। অতএব সারকুলার বাহির করিয়া থার্ড পণ্ডিতকে মাপ করা হোক। কী জন্য সাস্‌পেণ্ড করা হইয়াছিল, তাহার কারণ এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিবার উপদেশ লিপিবদ্ধ করা থাক্‌ সারকুলার-বহিতে। ইহাতে পণ্ডিত জব্দ হইয়া যাইবে।

হেডমাস্টারের কর্ণদ্বয় মিঃ আলমের জিম্মায় থাকিত, সুতরাং সেই মর্মেই সারকুলার বাহির হইয়া গেল। অন্যান্য শিক্ষকেরা জ্যোতির্বিনোদকে ভয় দেখাইল, চাকুরি এবার থাকিল বটে, তবে বেশী দিনের জন্য নয়, এই সারকুলার স্কুলের সেক্রেটারি বা কমিটীর কোন মেম্বারের চোখে পড়িলেই চাকুরি যাইবে।

ক্ষেত্রবাবু পড়াইতেছেন, হেডমাস্টার সেখানে গিয়া পিছনের বেঞ্চির একটা ছেলেকে হঠাৎ ডাক দিয়া বলিলেন, তুমি কী বুঝেছ বল ?

সে কিছু শোনে নাই, পাশের ছেলের সঙ্গে গল্পে মত্ত ছিল, তীক্ষ্ণদৃষ্টি ক্লার্কওয়েলের নজর এড়ানো সহজ কথা নয়।

হেডমাস্টার ক্ষেত্রবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, ডোন্ট্‌ সিট্‌ অন ইওর চেয়ার লাইক এ বাহাদুর—ছেলেরা কিছু শুনছে না। উঠে উঠে দেখুন, কে কী করচে না-করচে !

ক্ষেত্রবাবু ছেলেদের সামনে তিরস্কৃত হওয়ায় নিজেকে অপমানিত বিবেচনা করিলেন বটে ; কিন্তু সাহেবের কাছে বিনীতকণ্ঠে অঙ্গীকার করিতে হইল যে, তিনি ভবিষ্যতে দাঁড়াইয়া ও ক্লাসে পায়চারি করিতে করিতে পড়াইবেন।

সাহেবের জের এখানেই মিটিবার কথা নয়। সে দিন স্কুল ছুটির পর টীচারদের মীটিং আহূত হইল। সাহেবের উপদেশবাণী বর্ষিত হইল। ছেলেদের স্বার্থ বজায় রাখিয়া যিনি টিকিতে পারিবেন, এ স্কুলে তাঁহারই শিক্ষকতা করা চলিবে ; যাঁহার না পোষাইবে, তিনি চলিয়া যাইতে পারেন—স্কুলের গেট খোলা আছে।

বেলা সাড়ে পাঁচটায় হেডমাস্টারের সভা ভাঙিল। মাস্টারেরা বাহিরে আসিয়া নানা-প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। যদুবাবু লম্ফঝম্প শুরু করিলেন।

—রোজ রোজ এই বাজে হাঙ্গামা আর সহ্য হয় না—সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল—টিউ-শানিতে যাবার আগে আর বাসায় যাওয়া হবে না দেখছি, কবে যে আপদ কাটবে, নারায়ণের কাছে তুলসী দিই। আপনারা সব চুপ করে থাকেন, বলেনও না তো কোন কথা ! সবাই মিলে বললে কি সাহেবের বাবার সাধ্যি হয় এমন করবার ?

অন্য দুই-একজন বলিলেন, তা আপনিও তো কিছু বলুলেন না যদুদা !

—আমি বলব কি এমনি বলব ? আমি যে দিন বলব, সে দিন সাহেবকে ঠ্যালা বুঝিয়ে দেব, আর ঠ্যালা বুঝিয়ে দেব ওই অন্ত্যজটাকে—ও-ই কুপরামর্শ দেয়। আর সাহেবের মতে অমন আইডিয়াল টীচার আর হবে না ! মারো খ্যাংরা।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, সে তো বোঝাই যাচ্ছে, কিন্তু ওকে নড়ানো সোজা কথা নয়। সাহেব ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আর সবাই খারাপ, কেবল আলম ভাল—

হেডপণ্ডিত বৃদ্ধ লোক, স্মৃতিভ্রংশ ঘটায় অনেক সময় অনেকের নাম মনে করিতে পারেন না, বলিলেন : আর ভাল ওই মেমসাহেব—কী ওর যেন নামটা ?

—মিস সিবসন্।

—হ্যাঁ, ও খুব ভাল—

মাস্টাররা বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়িলেন। ক্ষেত্রবাবু, যদুবাবু, নারাণবাবু ও ফণীবাবু প্রতিদিন ছুটির পরে নিকটবর্ত্তী ছোট চায়ের দোকানে চা খাইতেন। বহুদিনের যাতায়াতের ফলে পিটার লেনের মোড়ের এই চায়ের দোকানটির সঙ্গে তাঁহাদের অনেকের স্মৃতি জড়াইয়া গিয়াছে। নিকট দিয়া যাইবার সময় কেমন যেন মায়া হয়।

ক্ষেত্রবাবুর মনে পড়ে তাঁহার চার বছরের ছেলেটির কথা। সেবার একুশ দিন ভুগিয়া টাইফয়েড রোগে মারা গেল। কত কষ্টভোগ, কত চোখের জল ফেলা, কত বিনিদ্র রজনী যাপন! এই চায়ের দোকানে বসিয়া সহকর্মীদের সঙ্গে কত পরামর্শ করিয়াছেন, আজ পেট ফাঁপিল, কী করিতে হইবে ; আজ কথা আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছে, কী করিলে ভাল হয়! এই চায়ের দোকানের সামনে আসিলেই খোকার শেষের দিনগুলি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে।

নারাণবাবুর স্মৃতি স্কুলের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। আগের হেডমাস্টার ছিলেন অনুকূলবাবু। তিনি ছিলেন ঋষিকল্প পুরুষ। দুজনে মিলিয়া এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন—খুব বন্ধুত্ব ছিল দুজনের মধ্যে। অনুকূলবাবুর অনুরোধে নারাণ চাটুজ্জে রেলের চাকরি ছাড়িয়া আসিয়া এই স্কুলে শিক্ষাব্রত গ্রহণ করেন। এই স্কুলকে কলিকাতার মধ্যে একটি নামজাদা স্কুল করিয়া তুলিতে হইবে, এই ছিল সঙ্কল্প। একদিন-দুইদিন নয়, দীর্ঘ পনেরো ষোলো বৎসর ধরিয়া সে কত পরামর্শ, কত আশা-নিরাশার দোলা, কত অর্থনাশের উদ্বেগ! একবার এমন সুদিনের উদয় হইল যে, নারাণবাবুদের স্কুল কলিকাতার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর স্কুল হইয়া গেল বুঝি। হেয়ার-হিন্দুকে ডিঙাইয়া সেবার এই স্কুলের এক ছাত্র ইউনিভার্সিটিতে প্রথম স্থান অধিকার করিল। নারাণবাবু দেড় শত টাকা বেতনে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইবেন, সব ঠিকঠাক—এমন সময় অনুকূলবাবু মারা গেলেন। সব আশা-ভরসা ফুরাইল। একরাশ দেনা ছিল স্কুলের, পাওনাদারেরা নালিশ করিল। গবর্নমেণ্ট-নিযুক্ত অডিটার আসিয়া রিপোর্ট করিল, স্কুলের রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা ভূতপূর্ব্ব হেডমাস্টার তছরুপ করিয়াছেন। বাড়ীওয়ালা ভাড়ার দায়ে আসবাবপত্র বেচিয়া লইল। নতুন ছাত্র ভর্তি হইবার আশা থাকিলে হয়তো এতটা ঘটিত না ; কিন্তু ছাত্র আসিত অনুকূলবাবুর নামে, তিনিই চলিয়া গেলেন, স্কুলে আর রহিল কে? জানুয়ারি মাসে আশানুরূপ ছাত্রের আমদানি হইল না, কাজেই পাওনাদারদের উপায়ান্তর ছিল না।

হেডপণ্ডিত চা খান না, তবু মাস্টারদের সঙ্গে দোকানে বসিয়া গল্পগুজব করিয়া চা-পানের তৃপ্তি উপভোগ করেন আজ বহু বৎসর হইতে। বলিলেন, চলুন নারাণবাবু, চা খাবেন না? আসুন যদুবাবু, ক্ষেত্রবাবু—

মাস্টার মহাশয়দের এ দোকানে যথেষ্ট খাতির। নিকটবর্ত্তী স্কুলের মাস্টার বলিয়াও বটে, অনেক দিনের খরিদ্দার বলিয়াও বটে। দোকানী বেঞ্চ হইতে অন্য খরিদ্দারদের সরাইয়া দেয়, মাস্টার মহাশয়দের চায়ের প্রকৃতি কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করে, দুই-একটি ব্যক্তিগত প্রশ্নও করে আত্মীয়তা করিবার জন্য। অনেক সময় কাছে পয়সা না থাকিলে ধারও দেয়।

যদুবাবু বলিলেন, আমাকে একটু কড়া করে চা দিয়ো আদা দিয়ে।

নারাণবাবু বলিলেন, আমার চায়েও একটু আদা দিয়ো তো।

সকলের সামনে চা আসিল। সঙ্গে সঙ্গে পাশে একখানি করিয়া টোস্ট দিয়া গেল চায়ের পিরিচে প্রত্যেককে। দোকানীকে বলিতে হয় না, সে জানে, ইঁহারা কী খাইবেন, আজিকার খরিদ্দার তো নন।

স্কুলের হাড়ভাঙা খাটুনির পরে এবং যে যাহার টুইশানিতে যাইবার পূর্ব্বে এখানটিতে বসিয়া আধ ঘণ্টা ধরিয়া চা খাওয়া ও গল্পগুজব প্রত্যেকের পক্ষে বড় আরামদায়ক হয়। বস্তুত মনে হয় যে, সারাদিনের মধ্যে এই সময়টুকুই অত্যন্ত আনন্দের। যাহারা চারিটা বাজিবার পূর্ব্বে ঘড়ি দেখিতে পাঠান, তাঁহারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে এই সময়টুকুরই প্রতীক্ষা করেন। তবে স্কুলমাস্টার হিসাবে ইঁহাদের দৃষ্টি সংকীর্ণ, জীবনের পরিধি সুপ্রশস্ত নয়, সুতরাং কথাবার্ত্তা প্রতিদিন একই খাত বাহিয়া চলে। সাহেব আজ অমুক ঘণ্টায় অমুকের ক্লাসে গিয়া কী মন্তব্য করিল, অমুক ছেলেটা দিন দিন খারাপ হইয়া যাইতেছে, অমুক অঙ্কটা এ ভাবে না করিয়া অন্য ভাবে কী করিয়া ব্ল্যাকবোর্ডে করা গেল ইত্যাদি।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, মাসটাতে ছুটিছাটা একেবারেই নেই, না নারাণবাবু?

—কই আর। সেই ছাব্বিশে কী একটা মুসলমানদের পর্ব্ব আছে, তাও যে ছুটি দেবে কি না—

—ঠিক দেবে। মিঃ আলম আদায় করে নেবে।

—নাঃ, এক-আধ দিন ছুটি না হলে আর চলে না।

যদুবাবু বলিলেন, ওহে, হাফ-কাপ একটা দাও তো। আজ চাটা বেশ লাগচে—

চার পয়সার বেশী খরচ করিবার সামর্থ্য কোন মাস্টারেরই নাই চায়ের দোকানে। যদুবাবুর এই কথায় দুই-একজন বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। নারাণবাবু বলিলেন, কি হে যদু, দমকা খরচ করে ফেললে যে!

—খাই একটু নারাণদা। আর কদিনই বা!

যদুবাবু একটু পেটুক ধরনের আছেন, এ কথা স্কুলে সবাই জানে। বাজার হাট ভাল করিয়া করিতে পারেন না পয়সার অভাবে, সামান্য বেতনে বাড়ীভাড়া দিয়া থাকিতে হয়—কোথা হইতে ভাল বাজার করিবেন! তবে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ পাইলে সেখানে দুইজনের খাদ্য একা উদরস্থ করেন, স্কুলে ইহা লইয়া নিজেদের মধ্যে বেশ হাসিঠাট্টা চলে।

নারাণবাবু বয়সে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবীণ, প্রবীণত্বের দরুণ অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষ্ঠদের প্রতি

স্বাভাবিক স্নেহ জন্মিয়াছে তাঁহার মনে। তিনি ভাবিলেন, আহা, থাক, খেতে পায় না, এই তো স্কুলের সামান্য মাইনের চাকরি; ভালবাসে খেতে, অথচ কী ছাই বা খায়! মুখে বলিলেন, খাও আর একখানা টোস্ট। আমি দাম দেব। ওহে, বাবুকে একখানা টোস্ট দাও—এখানে।

যদুবাবু হাসিয়া বলিলেন, নারাণদা আমাদের শিবতুল্য লোক। তা দাও আর একখানা, খেয়ে নিই।

খাওয়া শেষ করিয়া সকলে বিড়ি বাহির করিলেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন দেশলাই পয়সায় দুইটা; তৎসত্ত্বেও কেহ দেশলাই রাখেন না পকেটে, দোকানীর নিকট হইতে চাহিয়া কাজ সারিলেন।

নারাণবাবু বলিলেন, চল যাই, ছটা বাজে।

যদুবাবু বলিলেন, বাসায় আর যাওয়া হল না, এখন যাই গিয়ে শাঁকারিটোলা, চুকি ছাত্রের বাড়ী।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমি যাব সেই ক্যানাল রোড, ইটিলি—আমার ছাত্রেরা আবার সেখানে উঠে গিয়েচে।

নারাণবাবুও ছেলে পড়ান, তবে বেশী দূরে নয়, নিকটেই প্রমথ সরকারের লেনে, সরকারদের বাড়ীতেই। বাহিরের ঘরে বুড়া যোগীন সরকার বসিয়া আছেন, নারাণবাবুকে দেখিয়া বলিলেন, আসুন, মাস্টারমশায় আসুন। তামাক খান। বসুন।

—চুনি পান্না খেলে বাড়ী ফিরেচে?

—চুনি ফিরেচে, পান্নার দেখা নেই এখনও। হতচ্ছাড়া ছেলে মাঠে একবার গেলে তো কাণ্ডজ্ঞান থাকে না—বলই পিটছে, বলই পিটছে! দুটো নাতিই সমান। বসুন, তামাক খান, আসচে।

কিন্তু ছাত্রেরা না-আসিলে চলে না। নারাণবাবুকে দুইটা টুইশানি সারিয়া আবার স্কুলে ফিরিতে হইবে, নিজের হাতে রান্নাবান্না করিতে হইবে, কিন্তু কপ সাহেবের সঙ্গে বসিয়া মোসাহেবী গল্পও করিতে হইবে।

এমন সময়ে চুনি আসিয়া ডাকিল, মাস্টারমশায়, আসুন।

চুনি তেরো বছরের বালক, সিক্সথ ক্লাসে পড়ে। নারাণবাবু নিঃসন্তান, বিপত্নীক—ছেলেটিকে বড় স্নেহ করেন। চুনি দেখিতেও খুব সুন্দর ছেলে, টকটকে ফরসা রঙ, লাবণ্য-মাখা মুখখানি, তবে স্বভাব বিশেষ মধুর নয়। কথায় কথায় রাগ, স্নেহ-ভালবাসার ধার ধারে না—কেহ স্নেহ করিলে বোঝেও না, সুতরাং প্রতিদানেরও ক্ষমতা নাই। বড়লোকের ছেলে, একটু গর্ব্বিতও বটে।

চুনি নিজের পড়ার ঘরে আসিয়া বলিল, আজ একগাদা অঙ্ক দিয়েছেন ক্ষেত্রবাবু, আমায় সব বলে দিতে হবে।

—হবে, বার কর্ খাতা বই।

—আপনি কখন চলে যাবেন ?

—কেন রে ?

—আজ আধ ঘণ্টা বেশী থাকতে হবে স্যার্।

—থাকব, থাকব। তোর যদি দরকার হয়, থাকব না কেন ? তোর কথা ফেলতে পারি না—

—মাস্টার বাড়ীতে রাখা ওই জন্যেই তো। এতগুলো করে টাকা মাইনে দিতে হয় আমাদের কি মাসে শুধু প্রাইভেট মাস্টারদের—কাকা বলছিলেন আজ সকালে।

কথাটা নারাণবাবুর লাগিল। তিনি আত্মীয়তা করিতে গেলে কি হইবে ? চুনি সে সব বোঝে না, উড়াইয়া দেয়—পয়সা দেখায়।

ধমক দিয়া বলিলেন, তোর সে কথায় থাকার দরকার কী চুনি ? অমন কথা বলতে নেই টীচারকে। ছিঃ !

চুনি অপ্রতিভ মুখে নিচু হইয়া খাতার পাতা উল্টাইতে লাগিল। সুন্দর মুখে বিজলির আলো পড়িয়া উহাকে দেববালকের মত লাবণ্য-ভরা অথচ মহিমময় দেখাইতেছে। ইহারা আসে কোথা হইতে, কোন্ স্বর্গ হইতে ? কে ইহাদের মুখ গড়ায় চাঁদের সব সুষমা ছানিয়া ছাঁকিয়া নিঙড়াইয়া ?

নারাণবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। কোথায় যেন পড়িয়াছিলেন, কোন্ কবির লেখা একটি ছত্র—'যৌবনেরে দাও রাজটিকা'—

সত্য কথা। যৌবন পার হইয়া গিয়াছে বহুদিন, আজ আটান্ন বছর বয়স—ষাটের দুই কম। ডাক তো আসিয়াছে, গেলেই হয়। কী করিলেন সারা জীবন ? স্কুল-স্কুল করিয়া সব গেল। নিজের বলিতে কিছু নাই। আজ যদি চুনির মত একটা ছেলে—

'যৌবনেরে দাও রাজটিকা'—সারা দুনিয়ার সমস্ত আশা-ভরসা আমোদ-আহ্লাদ আজ অপেক্ষমাণ বশ্যতার সঙ্গে এই বালকের সম্মুখে বিনম্রভাবে দাঁড়াইয়া, কত কর্ম্মভার-বিপুল দিবসের সঙ্গীত বাজিবে উহার জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, কত অজানা অনুভূতির বিকাশ ও কর্ম্ম-প্রেরণা ! চুনির সঙ্গে জীবন বিনিময় করা যায় না—এই তেরো বছরের বালকের সঙ্গে ?

—স্যার্, ছুটির ইংরিজি কী হবে ? আজ আমাদের ছুটি—এর কী ট্রান্স্লেশন করব স্যার্ ?

—আজ আমাদের ছুটি, আজ আমাদের ছুটি—কিসের মধ্যে আছে দেখি ? বেশ। কর। আজ—টু-ডে, আমাদের—আওয়ার, ছুটি—হলি-ডে—

—টু-ডে আওয়ার হলি-ডে ?

—দূর, ক্রিয়া কই ! ইংরিজীতে ভার্ব না দিলে সেণ্টেন্স হয় কখনও ? কতবার বলে দিয়েচি না ?

এমন সময় ঘরে ঢুকিল পান্না—চুনির ছোট ভাই। তাহার বয়স এগারো, কিন্তু চুনির চেয়েও সেচ্ছন্ট ও অবাধ্য, বাড়ীর কাহারও কথা শোনে না, কেবল নারাণবাবুকে একটু

ভয় করিয়া চলে ; কারণ স্কুলে নারাণবাবুর হাতে বড় মার খায়। ইহাকে তিনি তত ভালবাসেন না।

পান্না ঘরে ঢুকিয়া অপরাধীর দৃষ্টিতে মাস্টারের দিকে চাহিল, তারপর শেল্‌ফের কাছে গেল বই বাহির করিতে।

নারাণবাবু কড়া স্বরে বলিলেন, কোথায় ছিলে ?

—খেলছিলাম স্যার্।

—কটা বেজেছে হুঁশ আছে ?

পড়ার ঘরেই ঘড়ি আছে দেওয়ালে। পান্না সে দিকে চাহিয়া দেখিল, সাড়ে ছয়টা বাজিয়াছে। সুতরাং সে বলিল, সাড়ে ছটা স্যার্।

—হুঁঃ, গাধা কোথাকার! সাড়ে ছটা, না, সাড়ে সাতটা ? বল্ কটা বেজেছে ? ভাল করে দেখে বল্।

—সাড়ে সাতটা।

—ঠিক হয়েচে। এই বল খেলে এলে! কাল পড়া না হলে তোমার কী করি দেখো।

চুনি বলিল, স্যার্, আজ দুপুরে বেরিয়ে গিয়েচে, এই এল।

পান্না দাদার দিকে চাহিয়া বলিল, লাগানো হচ্ছে স্যারের কাছে ? তোর ওস্তাদি আমি বার করে দেব বলচি।

—দে না দেখি ? তোর বড় সাহস!

—এই মারলাম। কী করবি তুই ?

নারাণবাবু বৃদ্ধ, দুই বলিষ্ঠ বালকের মধ্যে পড়িয়া যুদ্ধ তো থামাইতে পারিলেনই না, অধিকন্তু চশমাটি চূর্ণবিচূর্ণ হইবার সম্ভাবনা প্রবল হইয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে পান্না ড্রয়ারের ভিতর হইতে টর্চলাইট বাহির করিয়া চুনির মাথায় এক ঘা বসাইয়া দিল। ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিল।

চুনি হাউমাউ করিয়া কাঁদিবার ছেলে নয়, সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; নারাণবাবু হাঁ-হাঁ করিয়া আসিয়া পড়িতে না পড়িতে এই কাণ্ডটি ঘটিয়া গেল।

গোলমাল শুনিয়া চুনি-পান্নার মা, বিধবা পিসী ও দুই ভাই-বউ অন্তঃপুরের দিকের ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। চুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহারা কোন উত্তর না পাইয়া মাস্টারের উদ্দেশে নানাপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল—ও মা, মাস্টার তো বসে আছে, তার চোখের সামনে ছেলেটাকে একেবারে খুন করে ফেললে গো!

অন্য একটি বধূ মন্তব্য করিল, মাস্টারকে মানে না দিদি, ছেলেগুলো ভারি দুষ্টু।

চুনির মা বলিলেন, মাস্টার বসে বসে আফিম খেয়ে ঝিমোয়, তা ওকে মানবে কী করে ?

নারাণবাবু মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেও মুখে বাড়ীর স্ত্রীলোকদের উদ্দেশে কী বলিবেন ? কে তাঁহাকে আফিম খাওয়াইয়াছে-শুনিবার তাঁহার বড় কৌতূহল হইল।

চুনিকে লইয়া তাহার মা ও পিসীমা চলিয়া গেলে নারাণবাবু রাগের মাথায় পান্নাকে গোটা দুই চড় কষাইলেন, সে চুপ করিয়া রহিল। বাড়ীর মধ্যে খুব একটা গোলমাল হইল কিছুক্ষণ ধরিয়া, তাহার পর ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথায় চুনি এক পেয়ালা চা হাতে বাহিরের ঘরে আসিয়া হাজির হইল। সব মিটিয়া গেল, দুই ভাইয়ের সম্মিলিত উচ্চ কণ্ঠস্বরে নৈশ-গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

চুনির মুখের দিকে চাহিয়া নারাণবাবুর বড় মায়া হইল। অবোধ বালক! কেন মারামারি করে তাও জানে না, নিজের ভালমন্দ নিজেরা বোঝে না। মিছামিছি, সন্ধ্যার সময় মার খাইয়া মরিল!

স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, লেগেছে চুনি খুব?

চুনি বলিল, আধ ইঞ্চি ডিপ্ হয়ে কেটে গিয়েচে।

—ব্যাণ্ডেজ বাঁধলে কে?

—পিসীমা।

—উনি জানেন?

—চমৎকার জানেন। কেন, ভাল হয় নি?

নারাণবাবুর ইচ্ছা হইল, চুনিকে কোলে টানিয়া লইয়া আদর করেন, তাহাকে সান্ত্বনা দেন। কিন্তু লজ্জায় পারিলেন না। চুনি ঘ্যানঘেনে ধরনের ছেলে নয়; মার খাইয়া নালিশ করিতে জানে না। এই রকম 'স্টোইক' ধরনের ছেলে নারাণবাবু তাঁর দীর্ঘ শিক্ষক-জীবনে যতগুলি দেখিয়াছেন, এক অঙ্গুলির পর্ব্বগুলির মধ্যেই তাহাদের গণনার পরিসমাপ্তি ঘটে। চুনি সেই অতি অল্পসংখ্যক ছেলেদের একজন। চুনিকে এই জন্যই এত ভাল লাগে তাঁর!

এই সময় চুনির বাবা বাহির হইতে আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, মাস্টার যে। ও কী, ওর মাথায় কী?

নারাণবাবু সব কথা বলিলেন।

চুনির বাবার ভদ্রতা কর্পূরের মত উবিয়া গেল। তিনি বিরক্তির সুরে বলিলেন, আপনি বসে থাকেন, আর প্রায়ই আপনার চোখের সামনে এ রকম কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটে, আপনি দেখেন না?

—আজ্ঞে, দেখব না কেন? সামান্য কথাবার্ত্তা থেকে মারামারি। আমি এসে পড়ে ছাড়িয়ে দিই, তবে—

—আপনি একটু ভাল করে দেখাশুনো করবেন বলেই তো রাখা। নইলে গ্র্যাজুয়েট মাস্টার দশ টাকাতেও পাওয়া যায়। দুবেলা পড়াবে।

—আজ্ঞে, আমি দেখি। দেখি না, তা ভাববেন না।

—আমি সব সময় দেখতে পারি নে, নানা কাজে ঘুরি। কিন্তু আপনার দ্বারা দেখচি—আপনার বয়স হয়েছে।

এই সময় চুনি যদি তাহার বাবাকে বলিত—বাবা, স্যারের কোন দোষ নেই, আমারই সব দোষ, তাহা হইলে নারাণবাবুর মনের মত কাজ হইত; নারাণবাবু এই ভাবিয়া সপ্তস্বর্গ প্রাপ্ত হইতেন যে, চুনি তাঁহার অগাধ স্নেহের প্রতিদান দিল।

কিন্তু যাহা আশা করা যায়, তাহা হয় না।

চুনি চুপ করিয়া রহিল। বাবাকে তাহারা দুই ভাই যমের মত ভয় করে।

চুনির বাবা বলিলেন, মাস্টার, বোস। আমি আসচি, চা খেয়েচ?

এইবার চুনি মুখ তুলিয়া বলিল, হাঁ বাবা, আমি এনে দিয়েছি।

চুনির এ কথাটা নারাণবাবুর ভাল লাগিল না। চুনি এ কথা কেন বলিতেছে, নারাণবাবু তাহা বুঝিতে পারিলেন। পাছে তাহার বাবা গিয়া আর এক কাপ চা মাস্টারের জন্য পাঠাইয়া দেন, সে জন্য। কেন এক পেয়ালা চা বেশী দেওয়া হইবে মাস্টারকে।

নারাণবাবু বাসায় ফিরিলেন, তখন রাত নয়টা। নিজের ছোট ঘরটার চাবি খুলিয়া রান্না চাপাইয়া দিলেন, তারপর যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণখানা লইয়া পড়িতে বসিলেন। এই সময়টাই বেশ লাগে সারাদিনের খাটুনির পরে। আজ স্কুলে এই ঘরে নারাণবাবু আছেন উনিশ বছর। বহুকাল হইল তাঁহার পত্নী স্বর্গগমন করিয়াছেন, নারাণবাবু আর বিবাহ করেন নাই—পত্নীর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য যত না হোক, গরিব-স্কুল-মাস্টার-জীবনে খরচ চালাইতে পারিবেন না বলিয়াই বেশী।

উনিশ বৎসরের কত স্মৃতি এই ঘরের সঙ্গে জড়ানো।

যখন প্রথম এই স্কুলে অনুকূলবাবু তাঁহাকে লইয়া আসেন, তখন এই ঘরে আর একজন বৃদ্ধ মাস্টার ভুবনবাবু থাকিতেন। ভুবনবাবুর বাড়ী ছিল মুর্শিদাবাদ—ভদ্রলোক বিবাহ করেন নাই, সংসারে এক বিধবা ভগ্নী ছাড়া তাঁহার আর কেহ ছিল না। একদিন বিছানায় লোকটি মরিয়া পড়িয়া ছিল এই ঘরেই। স্কুলের খরচে ভুবনবাবুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

নারাণবাবু ভাবেন, তাঁহার অদৃষ্টেও তাহাই নাচিতেছে। তাঁহারও কেহ নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ভাই নাই, ভগ্নী নাই—এই ঘরটি আশ্রয় করিয়া আজ বহুদিন কাটাইয়া দিলেন। এখন এমন হইয়া গিয়াছে, এই ঘর ও এই স্কুলের বাহিরে তাঁহার যেন আর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। জীবনের একমাত্র কর্ম্মক্ষেত্র এই স্কুল। স্কুলের বিভিন্ন ক্লাসে রুটিন অনুযায়ী কোন্‌দিন কী পড়াইবেন, নারাণবাবু সকালে বসিয়া ঠিক করেন।

কাল থার্ড ক্লাসে ললিত ছেলেটা ইংরেজী গ্রামারের 'দি'র ব্যবহার সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে, নারাণবাবুর প্রাণে তাহাতে এমন একটা ধাক্কা লাগিয়াছে, সে বেদনা নিতান্ত বাস্তব। নারাণবাবু জানেন যে 'দি' ব্যবহার করিতে না পারিলে থার্ড ক্লাসের ছেলে হইয়া সে ইংরেজী ব্যাকরণ শিখিল কী? কাল নারাণবাবু তখনই নোট-বইতে লিখিয়া লইয়াছেন, "থার্ড ক্লাস, ললিতমোহন কর, ডেফিনিট্ আর্টিকল 'দি'।"—এইটুকু মাত্র দেখিলেই তাঁহার মনে পড়িবে।

তাহার পর আজ সেই ললিতকে ঝাড়া আধ ঘণ্টা ধরিয়া জিনিসটা শিখাইয়া দিলেন,

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুই হইল না। ললিত কর 'যে আঁধারে সে আঁধারে'ই রহিয়াছে। কী করা যায়? তাঁহার শিখাইবার প্রণালীর কোন দোষ ঘটিতেছে নিশ্চয়। কী করিলে ললিত চৌড়াটা 'দি'র ব্যবহার শিখিতে পারে?

নারাণবাবু হুঁকায় তামাক খাইতে খাইতে চিন্তা করিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল সেভেন্থ্ ক্লাসের পূর্ণ চক্রবর্ত্তী, মাত্র নয় বছরের ছেলে, এত মিথ্যা কথাও বলে! কত দিন মারিয়াছেন, নিষেধ করিয়াছেন, হেডমাস্টারের আপিসে লইয়া যাইবার ভয় দেখাইয়াছেন; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোনও ফল হয় নাই। ছেলেটার সম্বন্ধে কি অভিভাবকের নিকট একখানা চিঠি দিবেন? তাহাতেই বা কী সুফল ফলিবে? না হয় চিঠি পাইয়া ছেলের বাপ ছেলেকে ধরিয়া ঠ্যাঙাইলেন, তাহাতেই ছেলে ভাল হইয়া যাইবে বলিয়া তো মনে হয় না। কী করা যায়?

নারায়ণবাবুর সম্মুখে এই সব সমস্যা প্রতিদিন দুই-একটা থাকেই। মাঝে মাঝে এগুলি লইয়া তিনি ক্লার্কওয়েল সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিতে যান।

সাহেব সন্ধ্যার সময় মোটরে ছেলে পড়াইতে বাহির হন, ফিরিবার অল্পক্ষণ পরেই রাত নয়টা কি সাড়ে নয়টার সময়ে নারাণবাবু সাহেবের দরজায় গিয়া কড়া নাড়িলেন।

—কে? কী, নারাণবাবু? ভেতরে এস।

—স্যার্, আপনার খাওয়া হয়েছে?

—এই এখুনি খেতে বসব। এক পেয়ালা কফি খাবে?

—তা—তা—

—বাবুকে এক পেয়ালা কফি দাও। বোস। কী খবর?

—স্যার্, আপনার কাছে এসেছিলাম একটা খুব জরুরী দরকার নিয়ে। একবার আপনার সঙ্গে পরামর্শ করব। ওই থার্ড ক্লাসের ললিত কর বলে ছেলেটা—'দি'র ব্যবহার কিছুই জানে না, এত দিন পরে আবিষ্কার করলাম। কাল কত চেষ্টাই করেছি, কিন্তু শেখানো গেল না। কী করা যায় বলুন তো?

ক্লার্কওয়েল সাহেব অত্যন্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ হেডমাস্টার। এসব বিষয়ে নারাণবাবু তাঁহার শিষ্য হইবার উপযুক্ত। ক্লার্কওয়েল খাওয়া-দাওয়া ভুলিয়া গেলেন। নিজের টেবিলে গিয়া ড্রয়ার টানিয়া একখানা খাতা বাহির করিয়া নারাণবাবুকে দেখাইয়া বলিলেন, আমারও একটা লিস্ট আছে এই দেখ, ফার্স্ট ক্লাসের কত ছেলে ও-জিনিসটার ব্যবহার ঠিকমত জানে না আজও। আরও কত নোট করেছি দেখ। তবে একটা প্রণালীতে আমি বড় উপকার পেয়েছি, তোমাকে সেটা—এই পড়।—বলিয়া ক্লার্কওয়েল নিজের নোট-বইখানা নারাণবাবুর হাতে দিলেন।

মিস্ গিবসন্ ওদিকের দরজা দিয়া ঘরে ঢুকিয়া নারাণবাবুকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, ও নারাণবাবু! আমাদের সঙ্গে ডিনার খাবে? হাউ সুইট্ অফ্ ইউ!

নারাণবাবু বিনীতভাবে জানাইলেন, তিনি ডিনার খাইতে আসেন নাই।

ক্লার্কওয়েল মেমসাহেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন, এই স্কুলে দুজন টীচার আছে, যারা টীচার নামের উপযুক্ত—নারাণবাবু আর মিঃ আলম। ইনি এসেছেন ললিতকে কী করে 'দি'র ব্যবহার শেখানো যায়, তাই নিয়ে। আর কজন আছে আমাদের স্কুলের মধ্যে, যাঁরা এ সব নিয়ে মাথা ঘামান?

মেমসাহেব হাসিয়া বলিল, ইউ ডিজার্ভ এ স্লাইস্ অফ্ মাই হোম-মেড্ কেক্ নারাণবাবু, ইউ ডু। একটা কেকের খানিকটা কাটিয়া প্লেটে নারাণবাবুর সামনে রাখিয়া মেমসাহেব বলিল, ইট্ ইট্ য়্যাণ্ড প্লেজ ইট্।

নারাণবাবু বিনয়ে বাঁকিয়া দুমড়াইয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিলেন, ধন্যবাদ ম্যাডাম, ধন্যবাদ! চমৎকার কেক্! বাঃ, বেশ—

ক্লার্কওয়েল বলিলেন, আর কে কি রকম কাজ করে নারাণবাবু? টীচারদের মধ্যে—

নারাণবাবুর একটা গুণ, কাহারও নামে লাগানো-ভাঙানো অভ্যাস নাই তাঁহার। মিঃ আলম যে স্থলে অন্তত তিন জন টীচারকে ফাঁকিবাজ বলিয়া দেখাইত, সেখানে নারাণবাবু বলিলেন, কাজ সবাই করে প্রাণপণে, আর সবাই বেশ খাটে।

হেডমাস্টার হাসিয়া বলিলেন, ইউ আর য়্যান্ ওল্ড ম্যান্ নারাণবাবু। তুমি কারও দোষ দেখ না—ওই তোমার মস্ত দোষ। আমি জানি, কে কে আমার স্কুলে ফাঁকি দেয়। আমি জানি নে ভাব? নাম আমি করছি নে—নাম করা অনাবশ্যক—কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাদের নাম তোমার কাছেও অজ্ঞাত নয়। আচ্ছা, যাও—

মেমসাহেব বলিল, ভাল কেক্?

নারাণবাবু বলিলেন, চমৎকার কেক্ ম্যাডাম, অদ্ভুত কেক্।

মেমসাহেব বলিল, আমার বাপের বাড়ী শ্রপশায়ারে, শুধু সেইখানে এই কেক্ তৈরী হয় তোমায় বলছি। তাও দুখানা গাঁয়ে—নরউড্ আর বার্কলে-সেন্ট-জন্—পাশাপাশি গাঁ। কলকাতার দোকানে যে কেক্ বিক্রি হয়, ও আমি খাই নে।

নারাণবাবু আর এক প্রস্থ বিনীত হাস্য বিস্তার করিয়া বিদায় লইলেন···আজ অনুকূল-বাবু নাই, কিন্তু সাহেব ও মেম আসাতে নারাণবাবু খুশীই আছেন। স্কুলের কি করিয়া উন্নতি করা যায় সে দিকে সাহেবের সর্ব্বদা চেষ্টা, তবে দোষও আছে। টাকাকড়ি সম্বন্ধে সাহেব তেমন সুবিধার লোক নয়। মাস্টারদের মাহিনা দিতে বড় দেরি করে, নানা রকমে কষ্ট দেয়—তার একটা কারণ, স্কুলের ক্যাশ সাহেবের কাছে থাকে, সাহেবের বেজায় খরচের হাত—খরচ করিয়া ফেলে, অবশ্য স্কুলের বাবদই খরচ করে, শেষে মাস্টারদের মাহিনা দিতে পারে না সময়মত।

মোটের উপর কিন্তু সাহেব স্কুলের পক্ষে ভালই। বড় কড়াপ্রকৃতির বটে, শিক্ষকদের বিষয়ে অনেক সময় অন্যায় অবিচার যথেষ্ট করিয়া থাকে, যমের মত ভয় করে সব মাস্টার; কিন্তু স্কুলের স্বার্থ ও ছেলেদের স্বার্থের দিকে নজর রাখিয়াই সে-সব করে সাহেব। নারাণবাবু তাই চান; স্কুলের উন্নতি লইয়াই কথা।

যদুবাবুর আজ মোটে বিশ্রামের অবকাশ নাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া খাটুনি চলিতেছে, দুইজন শিক্ষক আসেন নাই, তাঁহাদের ঘণ্টাতেও খাটিতে হইতেছে। একটা ঘণ্টার শেষে মিনিট পনেরো সময় চুরি করিয়া যদুবাবু তেতলায় শিক্ষকদের বিশ্রাম-কক্ষে ঢুকিলেন, উদ্দেশ্য ধূমপান করা।

গিয়া দেখিলেন, হেডপণ্ডিত ও ক্ষেত্রবাবু বসিয়া আছেন। তেতলার এই ঘরটি বেশ ভাল, বড় বড় জানালা চারিদিকে, চওড়া ছাদ, ছাদে দাঁড়াইলে সেণ্ট পলের চূড়া, জেনারেল পোস্ট আপিসের গম্বুজ, হাইকোর্টের চূড়া, ভিক্টোরিয়া হাউস প্রভৃতি তো দেখা যায়ই, বিশাল মহাসমুদ্রের মত কলিকাতা নগরী অসংখ্য ঘরবাড়ীর ঢেউ তুলিয়া এই ক্ষুদ্র স্কুল-বাড়ীকে যেন চারিধার হইতে ঘিরিয়াছে মনে হয়; নীচে ওয়েলেসলি স্ট্রীট দিয়া অগণিত জনস্রোত ও গাড়ীঘোড়ার ভিড়, ট্রামের ঘণ্টাধ্বনি, ফিরিওয়ালার হাঁক,—বিচিত্র ও বৃহৎ জীবনযাত্রার রহস্যে সমগ্র শহর আপনাতে আপনি-হারা—থমথমে দুপুরে যদুবাবু মাঝে মাঝে বিড়ি খাইতে খাইতে শিক্ষকদের ঘরের জানালা দিয়া চাহিয়া দেখেন।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, কী যদুদা, বিশ্রাম নাকি?

—না ভাই, পরিশ্রম। একটা বিড়ি খেয়ে যাই।

—আমাকেও একটা দেবেন।

হেডপণ্ডিতের দিকে চাহিয়া যদুবাবু বলিলেন, কাল একটা ছুটি করিয়ে নাও না দাদা, সাহেবের কাছ থেকে। কাল ঘণ্টাকর্ণপূজো—

হেডপণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঃ, ঘণ্টাকর্ণপূজোর আবার ছুটি—তাই কখনও দেয়!

—কেন দেবে না? তুমি বুঝিয়ে বোল, তুমিই তো ছুটির মালিক।

—না না, সে দেবে না।

—বলেই দেখ না দাদা। বল গিয়ে, হিন্দুর একটা মস্ত বড় পরব।

—ভাল, তোমাদের কথায় অনেক কিছুই বললুম। তোমরা শিখিয়ে দিলে যে, রামনবমী আর পূজো প্রায় সমান দরের পরব। রাস, দোল, ষষ্ঠীপূজো, মাকালপূজো—তোমরা কিছুই বাদ দিলে না। আবার ঘণ্টাকর্ণপূজোর জন্যে ছুটি চাই,—কী বলে—

—যাও যাও, বলে এস, তুমি বললেই হয়।

ক্ষেত্রবাবু ছাদের এক ধারে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, ওহে, খুকীর বর কাল এসে গেচে?

যদুবাবু ও হেডপণ্ডিত একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, সত্যি? এসে গেচে?

—ওই দেখুন না, বসে আছে।

—যাক, বাঁচা গেল। আহা, মেয়েটা বড্ড কষ্ট পাচ্ছিল!

এই উঁচু তেতলার ছাদের ঘরে বসিয়া চারিপাশের অনেক বাড়ীর জীবনযাত্রার সঙ্গে ইহাদের প্রত্যক্ষ পরিচয়। বাড়ির মালিকের নাম-ধাম পর্যন্ত জানা নাই—অথচ ক্ষেত্রবাবু জানেন, ওই হলদে রঙের তেতলা বাড়ীটার বড় ছেলে গত কার্ত্তিক মাসে মারা গেল, বেশ

কোট-প্যান্ট পরিয়া কোথায় যেন চাকুরি করিত, বাড়ীর গিন্নীর আছাড়িবিছাড়ি মর্মভেদী, কান্না। টিফিনের অবকাশে এখানে বসিয়া দেখিয়া ক্ষেত্রবাবুর ও জ্যোতির্বিনোদ মহাশয়ের চোখে জল আসিয়াছিল।

এই যে খুকীর বর আসিল, ইহারা জানেন, ষোল-সতেরো বছরের সুন্দরী কিশোরী, বাড়ীর ওই জানালাটিতে আনমনে বসিয়া পথের দিকে চাহিয়া থাকিত, আপন মনে চোখের জল ফেলিত। জ্যোতির্বিনোদ মহাশয় এই ঘরেই থাকেন। তিনি বলেন, রাত্রে ছাদে মেয়েটি পায়চারি করিয়া বেড়াইত, এক-একবার কেহ কোন দিকে নাই দেখিয়া ছাদে উপুড় হইয়া প্রণাম করিয়া কী যেন মনে মনে মানত করিত। মেয়েটি যে অসুখী, সকলেই বুঝিতেন।—মেয়েটি বিবাহিতা, অথচ আজ এক বৎসরের মধ্যে তাহার স্বামীকে দেখা যায় নাই—কাজেই আন্দাজ করিয়াছিলেন, স্বামীর অদর্শনই মেয়েটির মনোদুঃখের কারণ। কী জাত, কী নাম, তাহা কেহই জানেন না; অথচ এই অনাত্মীয়া, অজ্ঞাতকুলশীলা কিশোরীর দুঃখে প্রৌঢ় শিক্ষকদের মন সহানুভূতিতে ভরিয়া ছিল, যদিও অল্পবয়স্ক দুই-একজন শিক্ষক ইহাদের অসাক্ষাতে কিশোরীকে লক্ষ্য করিয়া এমন সব কথা বলিত, যাহা শোভনতার সীমা অতিক্রম করে।

মাঝে মাঝে জ্যোতির্বিনোদ মহাশয় বলিতেন, আহা, কাল রাত্রে খুকী বড্ড কেঁদেছে একা একা ছাদে। হেডপণ্ডিত বলিতেন, ভাই, বড় তো মুশকিল দেখছি! কী হয়েছে ওর বরের? কোথায় গেল?

কেহই কিছু জানেন না, অথচ মেয়েটির সুখদুঃখ তাঁহারা নিজের করিয়া লইয়াছেন। আজ ইহারা সত্যই খুশী—খুকীর বর আসিয়াছে। বিশেষ করিয়া হেডপণ্ডিত ও ক্ষেত্রবাবু।

হেডপণ্ডিতের মেয়ে রাধারাণী, প্রায় এই কিশোরীর সমবয়সী, আজ এক বৎসর হইল মারা গিয়াছে টাইফয়েড রোগে। মেয়েটির দিকে চাহিলেই নিজের মেয়ের কথা মনে পড়ে; বাপের অমন সেবা রাধারাণীর মত কেহ করিতে পারিত না। স্কুলের খাটুনির পরে বৈকালে বাড়ী ফিরিলে দেখিতেন, রাধা তাঁহার জন্য হাত-পা ধোয়ার জল ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, হাত-পা ধোয়া হইলেই একটু জলখাবার আনিয়া দিবে, পাখা লইয়া বাতাস করিবে, কাছে বসিয়া কত গল্প করিবে—ঠিক যেন পাকা গিন্নী। তাহার একমাত্র দোষ ছিল, বায়োস্কোপ দেখিবার অত্যধিক নেশা। প্রায়ই বলিত, বাবা, আজ কিন্তু—

—না মা, এই সেদিন দেখলি, আজ আবার কী!

—তুমি বাবা জান না। কী সুন্দর ছবি হচ্ছে আমাদের এই চিত্রবাণীতে, সবাই দেখে এসে ভাল বলেছে বাবা।

—রোজ রোজ ছবি দেখতে গেলে চলে মা? ক টাকা মাইনে পাই?

—তা হোক বাবা, মোটে তো ন আনা পয়সা!

—ন আনা ন আনা—দেড় টাকা। তোর গর্ভধারিণী যাবে না?

—মা কোথাও যেতে চায় না। তুমি আর আমি—

হেডপণ্ডিত ভাবিতেন, মেয়েটি তাঁহাকে ফতুর করিবে, বায়োস্কোপের খরচ কত যোগাইবেন তিনি এই সামান্ত ত্রিশ টাকা বেতনের মাস্টারি করিয়া? উঃ, কী ভালই বাসিত সে ছবি দেখিতে। ছবি দেখিলে পাগল হইয়া যাইত, বাড়ী ফিরিয়া তিন দিন ধরিয়া তাহার মুখে অন্য কথা থাকিত না, ছবির কথা ছাড়া।

কোথায় আজ চলিয়া গেল! আজকাল দুই-একখানা ভাল বাংলা ছবি হইতেছে, ছবিতে কথাও কহিতেছে—এসব দেখিতে পাইল না মেয়ে। বায়োস্কোপের খরচ হইতে তাঁহাকে একেবারে মুক্তি দিয়া গিয়াছে।

যদুবাবু বলিলেন, তা যাও এ বেলা দাদা,—ছুটিটার জন্যে। তুমি গিয়ে বললেই হয়ে যাবে।

ইহাদের অনুরোধে হেডপণ্ডিত ভয়ে ভয়ে গিয়া হেডমাস্টারের আপিসে ঢুকিয়া টেবিলের সামনে দাঁড়াইলেন।

ক্লার্কওয়েল সাহেব কী লিখিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া বলিলেন, হোয়াট? পাণ্ডিট্! সিওরলি ইট্ ইজ নট্ এ হলিডে ইউ হ্যাভ্ কাম টু আস্ক ফর্?

হেডপণ্ডিত বলিলেন, কাল ঘণ্টাকর্ণপূজো স্যার্

সাহেব বলিলেন, হোয়াট ইজ দ্যাট? ঘণ্টা—

—ঘণ্টাকর্ণ। হিন্দুর এত বড় পর্ব্ব আর নেই।

—ও ইউ নটি ফেলো, তুমি প্রত্যেক বারই বল এক কথা।

—না স্যার্, পাঁজিতে লেখে—

—ওয়েল, আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ইট্,—হবে না, কী পূজো বললে? ওতে ছুটি হবে না।

হেডপণ্ডিত বুঝিলেন তাঁহার কাজ হইয়া গিয়াছে। সাহেব প্রত্যেক বারই ও-রকম বলেন, শেষ ঘণ্টায় দেখা যাইবে, স্কুলের চাকর সারকুলার-বই লইয়া ক্লাসে ক্লাসে ঘুরিতেছে।

হেডপণ্ডিত ফিরিয়া আসিলে মাস্টারেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

ক্ষেত্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কী হল দাদা?

যদুবাবু বলিলেন, কার্যসিদ্ধি?

—দাঁড়াও দাঁড়াও, হাঁপ জিরিয়ে নিই। সাহেব বললে, হবে না।

—হবে না বলেছে তো? তা হলে ও হয়ে গিয়েচে। বাঁচা গেল দাদা, মলমাস যাচ্ছিল, তবুও ঘণ্টাকর্ণের দোহাই দিয়ে—

—এখনও অত হাসিখুশির কারণ নেই। যদি পাশের স্কুলে জিজ্ঞেস করতে পাঠায় তবেই সব ফাঁক। আমি বলেছি, হিন্দুর অত বড় পর্ব্ব আর নেই। এখন যদি অন্য স্কুলে জানতে পাঠায়?

ছোকরা উমাপদবাবু বলিলেন, যদি তারাও ঘণ্টাকর্ণপূজোয় ছুটি দেয়?

হেডপণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন, ঘণ্টাকর্ণপূজোর ছুটি কে দেবে, রামোঃ!

কিন্তু সাহেবের ধাত সবাই জানে। শেষ ঘণ্টা পর্য্যন্ত মাস্টারের দল দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করিবার পরে সকলেই দেখিল, স্কুলের চাকর ছুটির সারকুলার লইয়া ক্লাসে ক্লাসে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে।

যদুবাবুর ক্লাস সিঁড়ির পাশেই। তিনি বলিলেন, কী রে, কী ওখানে?

চাকর একগাল হাসিয়া বলিল, কাল ছুটি আছে, সারকুলার বেরিয়েছে।

—সত্যি নাকি? দেখি, নিয়ে আয় এদিকে।

চোখকে বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু সত্যিই বাহির হইয়াছে:

The School will remain closed tomorrow the 9th inst. for the great Hindu festival, Ghanta Karan Puja."

কিছুক্ষণ পরে ছুটির ঘণ্টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দল মহাকলরব করিয়া বাহির হইয়া গেল।

যদুবাবুকে ডাকিয়া হেডমাস্টার বলিলেন, আপনি আর ক্ষেত্রবাবু ফোর্থ ক্লাসের ছেলেদের মিউজিয়াম আর জু'তে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারবেন?

—খুব স্যার।

—দেখবেন, যেন ট্রাম থেকে পড়ে না যায়—একটু সাবধানে নিয়ে যাবেন। আর এই টাকা, আনুষঙ্গিক খরচ আর ছেলেদের টিফিন। ছেলেদের বেশ করে বুঝিয়ে দেবেন। সব দেখাবেন।

যদুবাবু স্কুলের সামনের বারান্দাতে গিয়া দাঁড়াইলেন। ছেলেরা দুই সারিতে দাঁড়াইল হেডমাস্টারের বেতের ভয়ে। ড্রিল মাস্টারের আদেশ অনুযায়ী তাহারা মার্চ করিয়া চলিল। কিন্তু খুব বেশীক্ষণের জন্য নয়, রাস্তার মোড়ে আসিয়া তাহারা আবার দাঁড়াইয়া গেল।

যদুবাবু অনেক পিছনে ছিলেন, ছেলেদের সঙ্গে সমান তালে আসিবার বয়স তাঁহার নাই। ক্ষেত্রবাবু আর একটু আগাইয়া ছিলেন, তিনি দৌড়িয়া গিয়া বলিলেন, দাঁড়ালি কেন রে?

—আমরা ট্রামে যাব স্যার্।

—ট্রামের পয়সা কাছে আছে সব?

দুই-একজন বড় ছেলে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, স্কুল থেকে পয়সা দেয় নি স্যার্?

—কই, না। আমার কাছে তো দেয় নি। যদুবাবুর কাছে আছে কিনা জানি না, দাঁড়াও, দেখি।

ইতিমধ্যে যদুবাবু আসিয়া ইহাদের কাছে পৌছিলেন: কী ব্যাপার? দাঁড়িয়েচে কেন?

—আপনার কাছে ট্রামের ভাড়া দিয়েছেন হেডমাস্টার।

—হ্যা। কিন্তু সে চৌরঙ্গীর মোড় থেকে—এখানে চড়লে পয়সায় কুলুবে না। আপনি ওদের নিয়ে যান, আমি আর হাঁটতে পারছি নে। ট্রামে যাই।

—তবে আমিও ট্রামে যাই। ওরা হেঁটে যাক।

সেই ব্যবস্থাই হইল। যদুবাবু ও ক্ষেত্রবাবু ট্রামে চৌরঙ্গীর মোড়ে আসিয়া ছেলেদের জন্য অপেক্ষা করিলেন। ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমি কিন্তু কালীঘাট যাচ্ছি আমার বন্ধুর বাড়ী, আমি জু'তে যাব না।

ক্ষেত্রবাবু কালীঘাটের ট্রামে উঠিয়া পড়িলেন। যদুবাবু দলবল সমেত এদিকের গাড়িতে উঠিলেন। খিদিরপুরের ট্রাম হইতে নামিয়া ছেলেরা হৈ-হৈ করিয়া জু'র দিকে ছুটিল। যদুবাবু জু' অনেকবার দেখিয়াছেন, তিনি কি ছেলেদের দলে মিশিয়া হৈ-হৈ করিবেন এখন? একটা গাছের তলায় বসিলেন, পড়িয়া দেখিলেন, গাছের নাম 'পুত্রনজীব রক্সবার্জি'—জীব-পুত্রীকা বৃক্ষ। এই বৃক্ষের ফলের বীজ মৃতবৎসা নারীর গলায় পরাইয়া দিলে ছেলে হইয়া মরে না। তাঁহার স্ত্রীও মৃতবৎসা। এখন ফল লইয়া গেলে কেমন হয়? বয়স অনেক হইয়া গিয়াছে। বোধ হয় সুবিধা হইবে না।···কী চমৎকার ওই ছেলেটা! প্রজ্ঞাব্রত, যেমন নাম, তেমনই দেখিতে। ছেলে যদি হইতে হয়, প্রজ্ঞাব্রতের মত।

একটি ছেলের দল সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল, তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, স্যার্, আমাদের একটু দেখাবেন?

—কী দেখাব?

—স্যার্, অনেক পাখি-জানোয়ারের নাম লেখা আছে, বুঝতে পারছি নে। একটু আসুন না স্যার্।

—হ্যাঁ, আমার এখন ওঠবার শক্তি নেই। তোরা নিজেরা গিয়ে দেখ্‌গে যা। প্রজ্ঞাব্রত কোথায় রে?

—অন্য দিকে গিয়েছে স্যার্, দেখছি নে। যাই তবে স্যার্।

যদুবাবু আপন মনে বসিয়া বসিয়া হিসাব করিলেন। সাহেব ছেলেদের টিফিনের জন্য পাঁচ টাকা দিয়াছে—ছেলে মোট ত্রিশ জন, ছেলে-পিছু দুই টুকরো রুটি আর একটু মাখন দিলে টাকা দেড়-দুই খরচ। বাকী টাকা পকেটস্থ করা যাইবে। নগদে আড়াই টাকা লাভ।

ফিরিবার পথে ছেলের দল অনেকে সরিয়া পড়িল এদিক ওদিক। কেহ গেল ময়দানে হকিখেলা দেখিতে, কেহ কাছাকাছি অঞ্চলে কোন মাসী-পিসীর বাড়ী গিয়া উঠিল। যদুবাবু মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিলেন, দেড় টাকার মধ্যে বাকী ছেলেদের রুটি মাখন ভাল করিয়াই চলিবে। নিউ মার্কেট হইতে নিজেই তিনখানা বড় রুটি ও কিছু মাখন কিনিলেন, মিউজিয়ম হইতে বাহির হইয়া মাঠে খসাইয়া ছেলেদের খাওয়াইয়া দিলেন।

ছেলেরা পাছে আবার ট্রামের পয়সা চাহিয়া বসে, এই ছিল যদুবাবুর ভয়। কিন্তু ছেলেরা বৈকালবেলা মুক্তির আনন্দে কে কোথায় চলিয়া গেল। ছেলেরা অত হিসাব বোঝে না, হেডমাস্টার ট্রামের পয়সা দিয়াছিলেন কি না—সে কৈফিয়ৎ কেহ লইল না। যদুবাবু একা বাসার দিকে চলিতে চলিতে সতৃষ্ণ নয়নে ধর্মতলার মোড়ে গ্লোব রেস্টুরেণ্টের দিকে চাহিলেন। চপ-কাটলেট-ভাজার সুরুচি-ঘ্রাণ ফুটপাথের দক্ষিণ হাওয়াকে মাতাইয়াছে। পকেটে নগদ আড়াই টাকা উপরি-পাওনা—বাড়ীর একঘেয়ে সেই ডাঁটাচচ্চড়ি আর কুমড়োভাজা খাইতে খাইতে যৌবন চলিয়া গেল। যদি পেটে ভাল করিয়া না খাইলাম তবে চাকুরি করা কী জন্য? চক্ষু বুজিলে সব অন্ধকার। ছেলে নাই, পিলে নাই, কাহার জন্য খাটিয়া মরা!

রেস্টুরেণ্টে ঢুকিয়া দুইখানা ফাউল কাটলেট, দুইখানা চপ্, এক প্লেট কোর্মা, দুইখানা

ঢাকাই পরোটা অর্ডার দিয়া যদুবাবু মহাখুশির সহিত আপন মনে উদরসাৎ করিতেছেন, এমন সময় ফুটপাথ দিয়া প্রজ্ঞাব্রতকে যাইতে দেখিয়া ডাকিলেন, ও প্রজ্ঞা, ওরে শোন্ শোন্—

প্রজ্ঞাব্রত হকিখেলা দেখিয়া বাড়ী যাইতেছিল, উঁকি মারিয়া বলিল, স্যার্, আপনি এখানে?

—শোন্ শোন্, বোস। খাবি?

—না স্যার্, আপনি খান।

—কেন, বোস্ না। আয়। এই বয়, দুখানা চপ আর দুখানা কাটলেট দাও তো।

প্রজ্ঞাব্রত দুই-একবার মৃদু প্রতিবাদ করিয়া খাইতে বসিল। যদুবাবু তাহাকে জোর করিয়া এটা-ওটা আরও খাওয়াইলেন। যাইবার সময়ে তাহাকে বলিলেন, একটা সিগারেট কিনে আন্ তো, এই নে পয়সা।

সিগারেট ধরানো হইলে দুইজনে কিছুক্ষণ ধর্ম্মতলা ধরিয়া চলিলেন।

একটা গ্যাস-পোস্টের নীচে আসিয়া যদুবাবু বলিলেন, হ্যাঁ রে, তুই চাঁদা দিয়েছিলি?

—কিসের স্যার্?

—এই আজ জু'তে আসবার জন্যে।

—হ্যাঁ স্যার্, চার আনা।

যদুবাবু একটা সিকি বাহির করিয়া প্রজ্ঞাব্রতের হাতে দিয়া বলিলেন, এই নে, নিয়ে যা—কাউকে বলিস নে—

প্রজ্ঞাব্রত বিস্মিত হইয়া বলিল, ও কী স্যার্? জু দেখলাম, ট্রামে গেলাম, রুটি মাখন খাওয়ালেন তখন—

—তুই নিয়ে যা না। তোর অত কথার দরকার কী? কাউকে বলনি নে।

—না স্যার্, আমি নেব না—

—নে বলচি, ফাজলামো করিস নে,—নিয়ে নে—

প্রজ্ঞাব্রত আর দ্বিরুক্তি না করিয়া হাত পাতিয়া সিকিটি লইল।

—আমার এই গলি স্যার্, যাই আমি।

—চল্ না, আমায় একটু এগিয়ে দিবি। বেশ লাগে তোর সঙ্গে যেতে।

প্রজ্ঞাব্রত অনিচ্ছার সহিত আরও কিছু দূরে গিয়া ওয়েলিংটন স্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া বলিল, যান স্যার্, আমি আর যাব না—

পরদিন যদুবাবু হেডমাস্টারের কাছে আট টাকা দশ আনার এক বিল দাখিল করিয়া বিনীতভাবে জানাইলেন, দশ আনা বেশী খরচ হইয়া গিয়াছে—ট্রামভাড়া, ছেলেদের খাওয়ানো, আনুষঙ্গিক খরচ।

হেডমাস্টার বলিলেন, ওয়েল, এই নাও দশ আনা।

ছেলেরা কিন্তু ক্লাসে বলাবলি করিতে লাগিল, যদুবাবু তাহাদের কিছুই খাওয়ান নাই। হেডমাস্টার কত টাকা যদুবাবুর হাতে দিয়াছেন, কেহ কেহ তাহাও অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িল না।

প্রজ্ঞাব্রত সকলকে বলিল, যদুবাবু গ্লোব রেস্টুরেন্টে বসিয়া মনের সাধে চপ-কাটলেট খাইতেছিলেন, সে পথ দিয়া যাইবার সময় দেখিয়াছে। তাহাকে যে খাওয়াইয়াছেন, সে কথা প্রকাশ করিল না।

যদুবাবু ফোর্থ ক্লাসে তৃতীয় ঘণ্টায় পড়াইতে গিয়া দেখিলেন, ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা আছে—গ্লোব রেস্টুরেন্ট, চপ এক আনা, মুর্গির কাটলেট দশ পয়সা! জু হইতে ফিরিবার পথে সকলে খাইয়া যান!

যদুবাবু দেখিয়াও দেখিলেন না। টিফিনের ঘণ্টায় প্রজ্ঞাব্রতকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, ওসব কে লিখেছে বোর্ডে? তুই কিছু বলেছিস?

সে বলিল, না স্যার, আমি কাউকে বলি নি।

—আর কেউ দেখেছিল আমাকে, বললে কেউ?

—তাও স্যার আমি জানি না—

মিঃ আলমের চোখে লেখাটি পড়িল টিফিনের পরের ঘণ্টায়। মিঃ আলম কূটবুদ্ধিসম্পন্ন লোক, জিজ্ঞাসা করিল, এসব কী?

ছেলেরা পরস্পর গা-টেপাটিপি করিল। দুইজন বইয়ের আড়ালে মুখ লুকাইয়া হাসিল।

—কী, বল না। মনিটার!

একজন লম্বা ছেলে উঠিয়া বলিল, কী স্যার্?

—এ কে লিখেচে?

—দেখি নি স্যার্।

—হুঁ। কাল তোরা জু'তে গিয়েছিলি কার সঙ্গে?

—যদুবাবু ও ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে গিয়েছিলাম। তবে ক্ষেত্রবাবু কালীঘাট চলে গেলেন, যদুবাবু ছিলেন।

মিঃ আলম জেরা করিয়া সংগ্রহ করিলেন, তাহারা কী খাইয়াছিল, কত দূর ট্রামে গিয়াছিল ইত্যাদি। হেডমাস্টারকে আসিয়া বলিলেন, কাল ক টাকা দিয়েছিলেন স্যার্ যদুবাবুকে? ছেলেরা তো দু টুকরো রুটি আর মাখন খেয়েচে, যাবার সময় একবারই ট্রামে গিয়েছিল, আর এসেছিল মিউজিয়াম পর্য্যন্ত। আর কোনও খরচ হয় নি।

—তিন টাকা ট্রামভাড়া আর পাঁচ টাকা টিফিন—যদুবাবু আট টাকা দশ আনার বিল দিয়েচে।

—স্যার্, আপনি অনুসন্ধানের ভার যদি আমার ওপর দেন, আমি প্রমাণ করব—যদুবাবু স্কুলের টাকা চুরি করেছেন। উনি নিজে ফেরবার পথে চপ-কাটলেট খেয়েচেন দোকানে বসে, ফোর্থ ক্লাসের প্রজ্ঞাব্রত দেখেচে। সে আপনার কাছে সব বলতে রাজী হয়েচে। ডেকে নিয়ে আসি তাকে যদি বলেন। যদুবাবু শিক্ষকের উপযুক্ত কাজ করেন নি, ছেলেদের খাওয়ান নি অথচ স্কুলে বাড়তি বিল দিয়েচেন—এ একটা গুরুতর অপরাধ। আমার ধারণা

উনি এ রকম আরও কয়েক বার করেছেন—জু'তে ছেলেদের নিয়ে যাবার সময় তাই উনি সকলের আগে পা বাড়ান। ব্ল্যাকবোর্ডে ছেলেরা যা-তা লিখচে ওঁর নামে।

হেডমাস্টার হাসিয়া বলিলেন, লেট্ গো মিঃ আলম। এ বিষয়ে আর কিছু উত্থাপন করবেন না। হাজার হলেও আমাদেরই একজন টীচার, সহকর্মী—ছেড়ে দিন ও-কথা। আই ডোণ্ট গ্রাজ দি পুওর ফেলো এ কাটলেট অর টু—

গ্রীষ্মের ছুটির আর দেরি নাই। অন্য সব স্কুলে মর্নিং-স্কুল আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এ স্কুলে হেডমাস্টারের কাছে বহু দরবার করা সত্ত্বেও আজো মর্নিং-স্কুল হয় নাই। হেডমাস্টারের ধারণা, মর্নিং-স্কুল হইলে লেখাপড়া ভাল হয় না ছেলেদের। ক্লাসে ক্লাসে পাখা আছে, মর্নিং-স্কুলের কী দরকার।

ডেপুটেশনের পর ডেপুটেশন হেডমাস্টারের আপিসে গিয়া ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিল। অবশেষে সকলে মিঃ আলমকে গিয়া ধরিল। হেডপণ্ডিত বলিলেন, যান মিঃ আলম, বুঝিয়ে বলুন একবারটি।

আলমের দ্বারা স্কুলের ক্ষতিজনক কোনও কার্য্য হওয়া সম্ভব নয়, তিনি জানাইলেন।

অবশেষে অন্য সব মাস্টার জোট পাকাইয়া হেডমাস্টারের আপিসে গেলেন। ক্লার্কওয়েল একগুঁয়ে প্রকৃতির মানুষ, যাহা ধরিয়াছেন তাহা নড়চড় হইবার জো নাই। কাহারও কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। বরং ফল হইল, যে সব মাস্টার দরবার করিতে গিয়াছিলেন তাঁহাদের উপর নানারকম বেশী খাটুনির চাপ পড়িল।

ছুটির পর প্রায়ই স্কুল হইতে মাস্টারদের চলিয়া যাইবার উপায় থাকিত না। প্রশ্নপত্র লিথো করিতে হইবে, ক্লাসের ট্রানস্লেশন দেখিয়া ভুল-ভ্রান্তি শুদ্ধ করিয়া তাহা হেডমাস্টারের টেবিলে পেশ করিতে হইবে। হেডমাস্টার দেখিবেন, ঠিকমত খাতা দেখা হইয়াছে কি না!

আজ হুকুম হইল, প্রত্যেক শিক্ষক প্রতি দিন প্রত্যেক ক্লাসে কী পড়াইবেন তাহা নোট করিবেন, সে নোট আবার সাহেবের কাছে দাখিল করিতে হইবে।

হেডমাস্টার বলিলেন, স্কুলে পাখা আছে, মর্নিং-স্কুল কী জন্যে? যে সব মাস্টারের না পোষাবে, তিনি চলে যেতে পারেন। মাই গেট ইজ ওপ্‌ন্—

গলদঘর্ম্ম হইয়া মাস্টারেরা আর দিন-চারেক স্কুল করিলেন। তারপর একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ সারকুলার বাহির হইল, কাল হইতেই মর্নিং-স্কুল। ক্লার্কওয়েলের সব কাজই ওই রকম—পরের কথায় বা বুদ্ধিতে তিনি কিছুই কাজ করিবেন না, নিজের খেয়ালমত চলিবেন।

মর্নিং-স্কুল বসিবে ছ'টায়। দূরে যে সব মাস্টার থাকেন, তাঁহারা শেষরাত্রে উঠিয়া রওনা না হইলে আর ছয়টায় আসিয়া হাজিরা দিতে পারেন না। তাহার উপর সাড়ে দশটার ছুটির পর রোজ বেলা সাড়ে এগারোটা পর্য্যন্ত শিক্ষকদের লইয়া পরামর্শ-সভা বসিবে।

সভার কার্য্য-প্রণালী নিম্নোক্ত রূপ:—

১। সেভেন্‌থ্ ক্লাসে কী করিয়া হাতের লেখার উন্নতি করা যায়?

২। থার্ড ক্লাসে ছেলেরা শ্রুতিলিখনে কাঁচা—কী ভাবে তাহারা শ্রুতিলিখনে উন্নতি করিতে পারে ?

৩। একজন টীচার কাল ক্লাসে বাজে গল্প করিয়াছিলেন—তাঁহার সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা করা যায় ?

হেডমাস্টার প্রথমে বলিলেন, আচ্ছা, সেভেন্‌থ্‌ ক্লাসের হাতের লেখা সম্বন্ধে কার কী মত ?

ক্ষুৎ-পিপাসায় পীড়িত টীচারের দল মনের বিরক্তি চাপিয়া চাকুরির খাতিরে মুখে কৃত্রিম উৎসাহ ও গভীর চিন্তার ভাব আনিয়া একে একে আলোচনায় যোগ দিলেন।

কাহারও ফাঁকি দিবার উপায় নাই, কেহ চুপ করিয়া উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকিবেন, তাহার জো কী ? হেডমাস্টার অমনি বলিবেন, যদুবাবু, হোয়াই ইউ আর সাইলেন্ট ?

সর্ব্বশেষে মিঃ আলমের দিকে চাহিয়া হাসিমুখে সাহেব বলিলেন, নাউ ল্যাস্ট্‌ নট্‌ লীস্ট, লেট্‌ আস হিয়ার মিঃ আলম।

মিঃ আলম গম্ভীর মুখে উঠিলেন। যেন 'প্রাইম মিনিস্টার' কোনো গুরুতর বিল আলোচনা করিবার জন্ম ট্রেজারি বেঞ্চ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মিঃ আলমের হাতে তিন পাতা লেখা কাগজ, সেভেন্‌থ্‌ ক্লাসের হাতের লেখা ভাল করা সম্বন্ধে এক গুরুগম্ভীর নিবন্ধ। তাহার মধ্যে কত উদাহরণ, কত প্রস্তাব, কত মহাজন-বাণী উদ্ধৃত।

মিঃ আলম মাথা দুলাইয়া সতেজ উচ্চারণের সহিত গোটা নিবন্ধটা পড়িয়া গেলেন, "অন্‌ দি বেটারমেণ্ট্‌ অফ্‌ হ্যাণ্ডরাইটিং অফ্‌ সেভেন্‌থ্‌ ক্লাস বয়েজ"—ঝাড়া দশ মিনিট লাগিল।

টীচারদের সভা চুপ। হেডমাস্টার বলিলেন, মিঃ আলম একজন আদর্শ শিক্ষক। এ কথা আমি কতদিন বলেছি। মানুষের মত মানুষ একজন। কারও কিছু বলবার আছে মিঃ আলমের প্রবন্ধ সম্বন্ধে ? নারায়ণবাবু ?

বৃদ্ধ নারায়ণবাবু একটা কী সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন।

—ওয়েল, যদুবাবু ?

যদুবাবু বিনীতভাবে জানাইলেন, তাঁহার কিছু বলিবার নাই। মিঃ আলমের প্রবন্ধের পর আর বলিবার কী থাকিতে পারে।

—ওয়েল, ক্ষেত্রবাবু ?

—না স্যার, আমার কিছু বলবার নেই।

এক পর্ব শেষ হইল। বেলা সাড়ে এগারোটা বাজে, জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রে রাস্তার পিচ গলিয়া গিয়াছে। অনেকে চিন্তা করিতেছেন, বাড়ী ফিরিয়া আঁর স্নানের জল পাওয়া যাইবে না। চৌবাচ্চায় দুই ইঞ্চি জলও থাকে না এত বেলায়। অথচ কিছু বলিবার জো নাই, সাহেব বলিবেন, মাই গেট ইজ ওপ্‌ন্‌—

ঠিক বারোটার সময় 'টীচার্স মিটিং' সাঙ্গ হইল।

বাহিরে পা দিয়াই যদুবাবু বলিলেন, ব্যাটা কী খোশামুদে ! দেখলে তো একবার ! আবার এক প্রবন্ধ লিখে এনেছে ! কাজের খাঁট কত।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, একেবারে লর্ড বেকন্—"অন দি বেটারমেন্ট অফ্ হ্যাণ্ডরাইটিং অফ সেভেন্থ্ ক্লাস বয়েজ"। হামবাগ্ কোথাকার!

যদুবাবু বলিলেন, আর এক খোশামুদে ওই নারাণবাবু! তোর কোনো কূলে কেউ নেই, মিমিসি হয়ে যা। দরকার কী তোর খোশামুদির?

নীচের ক্লাসের একজন টীচার মেসে থাকিতেন। তিনি সামান্ত মাহিনা পান, মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে সাহস পান না। তিনি কতকটা আপন মনেই বলিলেন, কোনদিন নাইতে পারি নে—আজ মর্নিং-স্কুল হয়ে পাঁচ দিন নাই নি।

যদুবাবু বলিলেন, এই বলে কে! কই, তুমি তো মুখ ফুটে কথাটা বলতে পারলে না ভায়া সাহেবকে।

—আপনারা সিনিয়র টীচার রয়েছেন, কিছু বলতে পারেন না। আমি চুনো-পুঁটি—আমার সাহস কী?

—ওই তো দোষ ভায়া! ওতেই তো পেয়ে বসে। প্রোটেস্ট করতে হয়—মেনে নিলেই বিপন্ন।

—আপনারা প্রোটেস্ট করুন গিয়ে দাদা, আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

গ্রীষ্মের ছুটি পর্য্যন্ত প্রায়ই এই রকম চলিল। গ্রীষ্মের ছুটি আসিয়া পড়িবার দেরি নাই। ছেলেরা সে দিন গান গাহিবে, আবৃত্তি করিবে। দুই-একজন শিক্ষক তাহাদের তালিম দিবার ভার লইয়া স্কুলের কাজ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন।

হঠাৎ শোনা গেল, গ্রীষ্মের বন্ধের পূর্ব্বে মাস্টারদের মাহিনা দেওয়া হইবে না।

দুই মাসের বেতন এই সময়ে একসঙ্গে পাওয়ার কথা। মোটেই পয়সা দেওয়া হইবে না। শুনিয়া মাস্টারদের মুখ শুকাইয়া গেল। হেডমাস্টারের কাছে দরবার শুরু হইল। হেড-মাস্টার বলিলেন, আমি বা মিস্ সিবসন্ এক পয়সা নেব না—কেউ কিছু নিচ্ছি না। মাইনে আদায় যা হয়েছিল, কর্পোরেশনের ট্যাক্স আর বাড়ী-ভাড়াতে গেল।

দুই-একজন শিক্ষক একটু ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, আমরা তবে খাব কি?

—আমি জানি না। আপনাদের না পোষায়, মাই গেট ইজ ওপ্ন্—

গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রত্যেক মাস্টারের উপর দুই-তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়া আনিবার ভার পড়িল—ছাত্রদের প্রতি কর্ত্তব্য, বিভিন্ন বিষয় পড়াইবার প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে। মাস্টারদের দল মুখে কিছু বলিতে পারিলেন না। মনে মনে কেহ চটিলেন, কেহ ক্ষুব্ধ হইলেন।

যদুবাবু বলিলেন, ওঃ, ভাত দেবার কেউ নয়, কিল মারবার গোসাঁই! মাইনের সঙ্গে খোঁজ নেই, প্রবন্ধ লিখে নিয়ে এস—দায় পড়েচে—

ক্ষেত্রবাবু অনেক দিন পরে গ্রামের বাড়ীতে আসিলেন, সঙ্গে স্ত্রী নিভাননী ও দুই-তিনটি ছেলে-মেয়ে।

আজ প্রায় ছয় বছর পৈতৃক ভিটাতে আসেন নাই। চারিধারে জঙ্গল, বাড়ীঘরে গাছ গজাইয়াছে। জমিজমা, আম-কাঁঠালের বাগান যাহা আছে, বারোভূতে লুটিয়া খাইতেছে।

গ্রামের নাম আস্‌সিংড়ি—কয়েক ঘর গোয়ালার ব্রাহ্মণ এ গ্রামে বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থ, ধান পুকুর জমিজমা যথেষ্ট তাহাদের। অন্য কোন ভাল ব্রাহ্মণ গ্রামে নাই, কায়স্থ আছে কিছু, গোয়ালা জেলে ছুতার কর্ম্মকার এবং বাট-সত্তর ঘর মুসলমান—এই লইয়া গ্রাম।

গ্রামে জঙ্গল খুব, বড় বড় আম-কাঁঠালের বাগান। ক্ষেত্রবাবুর পৈতৃক বাড়ী কোঠা, বড় বড় চার-পাঁচখানা ঘর; কিন্তু মেরামতের অভাবে ছাদ দিয়া জল পড়ে। বাড়ীর উঠানে বড় বড় কাঁঠালগাছে অনেক কাঁঠাল ফলিয়াছে, নারিকেলগাছে ডাবের কাঁদি ঝুলিতেছে। বাড়ীর সামনে পুকুর, সেখানে কর্ত্তাদের আমলে বড় বড় মাছ জাল দিয়া ধরা হইত, আজ কিছু নাই। শরিক এক জ্যাঠতুতো ভাই এতদিন সব খাইতেছিল, আজ বছর দুই হইল সে উঠিয়া গিয়া শ্বশুর-বাড়ী বাস করিতেছে।

সকালে উঠিয়া ক্ষেত্রবাবু গ্রামের প্রজাদের ডাকাইলেন। সকলে আসিয়া প্রণাম করিল এবং এতদিন পরে তিনি গ্রামে আসিয়াছেন ইহাতে যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিল। —বাপ-পিতামহের ভিটা ছাড়িয়া বাহিরে না গেলে কি অন্ন হয় না? বাবু এখানে থাকুন, তাহারা ধানের জমি করিয়া দিবে, চলিবার সব ব্যবস্থা করিয়া দিবে। ক্ষেত্রবাবুও ভাবিলেন, সাহেবের তাঁবে থাকিয়া দিনরাত্রি দাসত্ব করার চেয়ে এ কত ভাল। 'টাচার্স মীটিং' নাই, দুই ঘণ্টা করিয়া প্রতি দিন খাতা কারেক্ট করিবার হাঙ্গামা নাই, মিঃ আলমের ধূর্ত্ত চক্ষুর চাহনিতে আর ভয় খাইতে হইবে না—এই তো কত চমৎকার! নাকে মুখে গুঁজিয়া স্কুলে দৌড়িবার তাড়া থাকিবে না।

নিভাননী হাসিয়া বলিল, দুধ এখানকার কী চমৎকার গো! ইটিলিতে এমন দুধ কিন্তু দেয় না গোয়ালা।

ক্ষেত্রবাবু বলেন, কোত্থেকে সেখানকার গোয়ালারা ভাল দুধ দেবে? তা দিতে পারে কখনও?

দিনকতক ভাল দুধের পায়েস পিঠে খাওয়া হইল। বাড়ীতে সত্যনারায়ণের সিন্নি দেওয়া হইল একদিন। ইতিমধ্যে আম-কাঁঠাল পাকিয়া উঠিল, ছেলে-মেয়েরা প্রাণ পুরিয়া আম খাইল।

গ্রামের দক্ষিণে জোলের মাঠ, অনেক খেজুর পাকিয়াছে গাছে গাছে, ক্ষেত্রবাবু ছেলে-মেয়েদের হাত ধরিয়া মাঠে গিয়া খেজুর কুড়াইয়া বাল্যের আনন্দ আবার উপভোগ করেন—যখন এ গ্রাম ছাড়া আর কোথাও বৃহত্তর দুনিয়ার স্থান ছিল না, এই গ্রামের আম আমড়া কুল বেল খাইয়া একদিন মানুষ হইয়া উঠিয়াছিলেন, যখন এ গ্রামের মাটি ছিল পৃথিবীর জীবনের একমাত্র নোঙর, ক্ষুদ্রের মধ্যেও সে পরিধি ছিল অসীম—সে সব দিনের কথা মনে হয়।

তারপর তিনি বি-এ পাস করিলেন, এখানে আর থাকা চলিল না, বিদেশে চাকুরি লইতে হইল। কর্ত্তারাও সব পরলোকে চলিয়া গেলেন—গ্রামের সঙ্গে সংযোগ-সূত্র ছিন্ন হইল। সন্ধ্যার শিয়ালের ডাকে পিতৃপুরুষের ভিটা মুখরিত হইতে লাগিল। মধ্যে বার-দুই এখানে আসিয়াছেন—তাও বছর পাঁচ-ছয় আগেকার কথা, আর আসা ঘটে নাই। পনেরো টাকা

ভাড়ায় কলিকাতার গলিতে একখানা ঘর ভাড়া করিয়া থাকা, বারান্দার ছোট্ট এতটুকু রান্নাঘর, ধোঁয়া দিলে বাড়ীতে টেঁকা দায়। এমন দুধ টাটকা তরকারি চোখে দেখা যায় না। ক্ষেত্রবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবেন, কী হইলে আবার আসিয়া গ্রামে বাস করিতে পারেন। পুরানো দিনের সুখ আবার ফিরিয়া আসে যদি, ক্ষেত্রবাবু তাঁহার জীবনের অনেকখানিই যে-কোন দেবতাকে দানপত্র করিয়া দিতে রাজী আছেন। ক্ষেত্রবাবু গ্রামের প্রজাদের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। গ্রামে থাকিলে তাঁহার সংসার চলিবার বন্দোবস্ত হয় কি না। সকলেই উৎসাহ দিল, ধানের জমি আছে তাহাতে বছরের ভাতের টানাটানি হইবে না—ক্ষেত্রবাবু গ্রামেই থাকুন।

একদিন নিভাননী বলিল, আর কদিন ছুটি আছে তোমার গো?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, কেন

—না, তাই বলছি।

দিন উনিশ কাটিয়াছে সবে, এখনো প্রায় একমাস। সত্য কথা যদি স্বীকার করিতে হয়, ছুটিটা একটু বেশীই হইয়া গিয়াছে। এতদিন ছুটি না দিলেও চলিত।

নিভাননীর দিন আর কাটে না। এখানে সে কথা বলিবার মানুষ খুঁজিয়া পায় না, ঘুরিয়া-ফিরিয়া সেই বড়-গিন্নী আর তাহার মেয়ে সরলা। আর আছে কয়েকটি গোয়ালার মেয়ে। কোন আমোদ নাই, আহ্লাদ নাই—বন-জঙ্গলের মধ্যে আর দিন কাটিতে চায় না। তাহার উপর উনি নাকি এখানে থাকিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, এখানে মানুষ বারমাস থাকিলে পাগল, নয় তো ভূত হইয়া যায়। বাড়ীর পিছনে বাঁশবনের নীচেই, মিনিট কয়েকের পথ দূরে শীর্ণকায় চূর্ণি নদী, টলটলে কাচের মত জল—রোজ এই বাগানের ভিতর দিয়া স্নানে যাইবার সময় নিভাননীর ভয় হয়। উঁচু উঁচু আমগাছে পরগাছা ঝুলিতেছে, কালপ্যাচার গম্ভীর স্বরে দিন দুপুরেও বুকের মধ্যে কেমন করে। স্নান করিতে নামিয়া কিন্তু মনে বেশ আনন্দ হয়, এত জল এবং এমন কাকের চোখের মত জল কলিকাতায় কল্পনাও করা যায় না।

বাঁশের চ্যালা পুড়াইয়া উনানে রান্না—কয়লা নাই, বাড়ীতে জল নাই, নিভাননীর এসব অভ্যাস নাই। কলিকাতায় রান্নাঘরের মধ্যেই কলের জলের পাইপ। এখানে মানুষ থাকে না। সময় যেখানে কাটিতে চাহে না, সে জায়গা আর যাহাই হউক, ভদ্রলোকের বাসের উপযুক্ত নয়।

ছেলেমেয়েদেরও এ জায়গা ভাল লাগে না। বড় ছেলে পাঁচু কেবল বলে, মা, কলকাতায় কবে যাওয়া হবে?

তাহাদের বাড়ীর সামনে ছোট্ট পার্কটাতে প্রতি বৈকালে টুনু হাবু রণজিৎ হীরু, মদন সিং বলিয়া একটা শিখের ছেলে, সুরেশ ভানু কত ছেলে আসিয়া জোটে। পাঁচুর সঙ্গে উহাদের সকলের খুব ভাব। পার্কে দোলনা টাঙানো আছে। সড়াইয়া পড়িবার লোহার ডোঙা খাটানো আছে, রোজ রোজ সেখানে কত কী খেলা, কত আমোদ-আহ্লাদ!

রণজিতের বাড়ীর কাছেই—প্রসাদ বড়াল লেনে। পাঁচুর সঙ্গে রণজিতের খুব বন্ধুত্ব—

প্রায়ই তাহার বন্ধুর বাড়ী পাঁচু যাইত, রণজিতের মা খাইতে দিতেন, তারপরে রণজিতের বোন সুসি আর হিমির সঙ্গে তাহারা দুইজনে বসিয়া ক্যারম খেলিত। সুসির অদ্ভুত টিপ, সরু সরু কয়লা আঙুল দিয়া স্ট্রাইকার ছটকাইয়া সামনের কাঠে রিবাউণ্ড করাইয়া কেমন অদ্ভুত কৌশলে সে গুটি ফেলিত। পাঁচু সুসির গুণে মুগ্ধ। অমন অদ্ভুত মেয়ে সে যদি আর কোথাও দেখিয়া থাকে!

হারিয়া গেলে সুসি হাসিয়া বলে, পারলে না পাঁচু, এইবার লালখানা ফেলেও হেরে গেলে!

লাল ফেলিলে কী হইবে, পয়েন্ট হইল কই? বোর্ডে যখন সাতখানা গুটি মজুত, তখন ওদিকে সুসির হাতের গুণে স্ট্রাইকার অসম্ভব সম্ভব করিয়া তুলিতেছে পাঁচুর বিস্মিত ও মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে। দেখিতে দেখিতে বোর্ড ফাঁকা, প্রতিপক্ষ সব গুটি পকেটে ফেলিয়াছে।

কী মজার খেলা! কী মজার দিন!

এখানে ভাল লাগে না। কী আছে এখানে? কুমোরপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া গেঁয়ো খেলা যত সব! কথা সব বাঙালে ধরনের, এখানে আর কিছুদিন থাকিলে পাঁচু বাঙাল হইয়া উঠিবে।

নিভাননী বলে, আজ পঁচিশ দিন হল, না?

ক্ষেত্রবাবু হাসিয়া বলেন, দিন গুনছ নাকি?

—ভাল লাগছে না আর, সত্যি!

—তা বটে। আমারও তেমন ভাল লাগছে না—বসে বসে আর দিমে ঘুমিয়ে শরীর. মাটি হল। একটা কথা বলবার লোক নেই, আছে ওই নন্দী মশায় আর জগহরি ঘোষ—ওরা ধানচালের দর নিয়ে কথাবার্তা বলে কেবল। কাঁহাতক ওদের সঙ্গে বসে গল্প করি?

—আর কদিন আছে তোমার?

—তা এখনও আঠারো-উনিশ দিন—কি তারও বেশী।

নিভাননী বলিল, ছেলেমেয়েদেরও আর ভাল লাগচে না। কাদু আমায় বলচে, মা, আমরা কলকাতা যাব কবে?

ক্ষেত্রবাবুও নিজের মনের ভাব দেখিয়া নিজেই অবাক হইলেন। যে ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলের নাম শুনিলে গায়ের মধ্যে জ্বালা ধরে, চাকুরির সময় যাহাকে কারাগার বলিয়া বোধ হইত, সেই স্কুলের কথা এখন যখন মনে হয় তখন যেন সে প্রশান্ত মহাসাগরের নারিকেল-দ্বীপপুঞ্জ-ঘেরা পাগো-পাগো দ্বীপ, চিরবসন্ত যেখানে বিরাজমান, পক্ষি-কাকলীতে যাহার শ্যাম তীরভূমি মুখর—ইংরেজী টকি-ছবিতে যা দেখিয়াছেন কতবার। সেই সিঁড়ির ঘর, তেতলার ছাদে মাস্টারদের সেই বিশ্রামকক্ষ, হেডমাস্টারের আপিসের ঘণ্টাধ্বনি, মথুরা চাকরের সারকুলার-বই লইয়া ছুটাছুটি করিবার সেই সুপরিচিত দৃশ্য—এসব কল্পনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। না, আর ভাল লাগে না, স্কুল খুলিলেই বাঁচা যায়।

নারাণবাবুর অবস্থা ইহা অপেক্ষাও খারাপ।

নারাণবাবু স্কুলের ঘরটিতে বারো মাস আছেন, কোথাও যাইবার স্থান নাই। সেই ঘর আশ্রয় করিয়া বহুদিন থাকিবার ফলে যখন টুইশানি সারিয়া নিজের ঘরটিতে ফেরেন, তখন সমস্ত মন প্রাণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠে, বাড়ী এসে বাঁচা গেল! কত কালের পিতৃ-পিতামহের বাসভূমি যেন সাহেবের বাথরুমের পূর্ব্বদিকের সেই এক-জানালা এক-দরজা-ওয়ালা কুঠুরিটা।

এ ছুটিতে নারাণবাবু গিয়াছিলেন তাঁহার এক দূর-সম্পর্কের ভাগ্নীর বাড়ী বরিশালে। চিরকাল কলিকাতায় কাটাইয়াছেন, বরিশালের পল্লীগ্রামে কিছুদিন থাকিয়াই তিনি হাঁপাইয়া উঠিলেন। গরীব স্কুল-মাস্টার হইলেও নাগরিক মনোবৃত্তি তাঁহার মজ্জাগত—সত্যিকার শহুরে মানুষ। এখানে সকালে উঠিয়া কেহ চা খায় না, লেখাপড়া-জানা মানুষ নাই। এক বাঙাল মোক্তার আছে, পঞ্চানন লাহিড়ী—বয়সে নারাণবাবুর সমান, গ্রামে সে-ই একমাত্র লেখাপড়া জানা লোক। হইলে হইবে কি, লোকটার কথাবার্ত্তায় বরিশালের টান তিনি ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলেন—কিন্তু সে গোঁড়া বৈষ্ণব, ধর্ম্মবাতিকগ্রস্ত বৈষ্ণব।

তাহার কাছে গিয়া বসিতে হয়, উপায় নাই। সন্ধ্যাবেলাটা কোথায় কাটানো যায় আর!

অমনি সে আরম্ভ করিবে—গোপিনীদের ভাব সম্বন্ধে উদ্ধব দাস কী বলিতেছেন—এটা বলিয়া লই—

নারাণবাবুকে বাধ্য হইয়া বসিয়া শুনিতে হয়। তিনি ধার্ম্মিক লোক নন, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের দার্শনিক অংশ ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না তাঁর। সেসৃজি স্টিফেন এবং মিলের ছাত্র তিনি। পঞ্চানন মোক্তার কথা বলিতে বলিতে যখন দুই হাত তুলিয়া 'আহা' 'আহা' বলে, তখন নারাণবাবু ভাবেন, এই একটা নিতান্ত অজ্ঞ-মূর্খের পাল্লায় পড়ে প্রাণটা গেল দেখচি!

মনে হয় শরৎ সান্যালের কথা। শরৎ সান্যাল অবসরপ্রাপ্ত এঞ্জিনীয়ার, নারাণবাবুর বহুদিনের বন্ধু—পাশের গলিতে এক সময় বড় বাড়ী ছিল, ছেলেরা রেস খেলিয়া বাড়ী উড়াইয়া দিয়াছে, এখন দুর্গাচরণ ডাক্তার রোডে ছোট ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করেন, ছুটিছাটার দিনে সন্ধ্যার দিকে ধোপ-দোরস্ত পাঞ্জাবি গায়ে, ছড়ি হাতে প্রায়ই নারাণবাবুর ঘরে আসিয়া বসেন ও নানাবিধ উঁচু ধরনের কথাবার্ত্তা বলেন।

উঁচু ধরনের কথা নারাণবাবু পছন্দ করেন, গোপীভাবের কথা নয়।

কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা, ওয়াশিংটন-চুক্তির ভিতরের রহস্য, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের বক্তৃতা, শিক্ষামন্ত্রী সংক্রান্ত কথা প্রভৃতি আলোচনাকেই নারাণবাবু উচ্চ বিষয় বলিয়া থাকেন। বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত লোকে রাসলীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা লইয়া মাথা ঘামায় না।

পঞ্চাননবাবু নিজে ইংরেজী-শিক্ষিত নহেন, সেকালের ছাত্রবৃত্তি-পাস মোক্তার, সুতরাং

ইংরেজী শিক্ষার উপর হাড়ে চটা। পশ্চিম হইতে যাহা কিছু আসিয়াছে সব খারাপ, এ দেশে যাহা ছিল সব ভাল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের (পঞ্চানন মোক্তার বলেন, কবিরাজ গোস্বামী) চৈতন্যচরিতামৃত তাঁহার মতে বাংলা সাহিত্যের শেষ ভাল গ্রন্থ।

পঞ্চানন মোক্তার গদ্‌গদ কণ্ঠে বলেন, কী সব ইংরেজী বলেন আপনারা বুঝি না। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীর পর আর বই হয় না। বাংলায় আর বই নাই, লেখা হয় নাই তার পরে—

এ রকম লোকের সঙ্গে লেস্‌লি ষ্টিফেন ও মিলের ছাত্র নারাণবাবু কী তর্ক করিবেন!

জীবনে তিনি একজন খাঁটি দার্শনিক দেখিয়াছিলেন—অনুকূলবাবু। নিজের জন্য কখনও কিছু করেন নাই, স্কুল গড়িয়া তুলিবেন মনের মত করিয়া, ভাল শিক্ষা দিবেন তাঁহার স্কুলে, কলিকাতার মধ্যে একটি আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত করিবেন স্কুলকে। ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার যত কল্পনা, যত আলোচনা—কত বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছেন স্কুলের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া! অমন সাধুপুরুষ জন্মায় না।

এই সব তিলক-কণ্ঠিধারী গোপীভাবে বিভোর লোকের মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তিত্বের তুলনায় অনুকূলবাবু একটা পুরা মানুষ। আর এই সাহেবটাও মন্দ নয়, অনুকূলবাবুর মত এও স্কুল বলিতে পাগল। স্কুলের স্বার্থ, ছাত্রদের স্বার্থ সবচেয়ে বড় ওর কাছে। তবে অনুকূলবাবু ছিলেন খাঁটি স্টোইক্ আর সাহেব এপিকিউরিয়ান্—এই যা তফাত।

যা হোক, নারাণবাবুর ভাল লাগে না—পঞ্চানন মোক্তারকে না, বরিশালের এ পাড়াগাঁ না। পঞ্চানন ছাড়া গ্রামে আরও অনেক মানুষ আছে বটে, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে নারাণবাবুর খাপ খায় না। নারাণবাবু ভাবেন, তাহারা ছেলে-ছোকরা, তাহাদের সঙ্গে কী মিশিবেন! তা ছাড়া যাচিয়া তিনি কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে যাইবেন না। কলিকাতার লোক, একটু নাক্‌উঁচু ধরনেরও আছেন।

একদিন গ্রামের বাঁশবনে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে খুব বর্ষা নামিয়া বাঁশঝাড়ের রঙ্‌ কালো দেখাইতেছে। চারিদিক মেঘে ঘিরিয়াছে গ্রামখানিকে, টারাসাদের ঘন জঙ্গলে বৃষ্টির ধারার শব্দ। গ্রামে এক জায়গায় গান-বাজনার মজলিশ হইবে, খুব আগ্রহ লইয়া নারাণবাবু সেখানে গিয়া দেখিলেন—পঞ্চানন মোক্তার, দীনবন্ধু স্যাকরা গলায় ত্রিকণ্ঠি তুলসীর মালা ঝুলাইয়া মজলিশ জুড়িয়া বসিয়া। আরও অনেক উহাদের শিষ্য-প্রশিষ্য বসিয়া আছে। কিছুক্ষণ পরে কীর্তন শুরু হইল, নারাণবাবু চলিয়া আসিলেন—তাঁহার ভাল লাগে না।

কীর্তন কেন তাঁহার ভাল লাগে না, ইহা লইয়া পঞ্চানন মোক্তারের সঙ্গে তর্ক করিয়া একদিন তিনি হার মানিয়াছেন। পঞ্চানন মোক্তার বলে, কীর্তন বাংলার নিজস্ব জিনিস, সঙ্গীতে বাংলার প্রধান দান—এমন মধুর রসের জিনিস যে উপভোগ করিতে না শিখিল, তার শ্রবণেন্দ্রিয়ই মিথ্যা।

নারাণবাবু বলেন, তিনি বোঝেন না, তাঁহার ভাল লাগে না—মিটিয়া গেল। যে ভাল

অত তর্ক করিয়া বুঝাইতে হয়, তাহার মধ্যে তিনি নাই। 'বাংলাদেশের দান, বাংলাদেশের দান' বলিয়া চেঁচাইলে কী হইবে! বাংলাদেশ, বাংলাদেশ—তিনি নিজে নিজে। ইহার চেয়ে কথা আছে? মিটিয়া গেল।'

সেদিন সেখান হইতে বাহির হইয়া পল্লীগ্রামের উপর বিতৃষ্ণা ধরিয়া গেল নারাণবাবুর। কী বিশ্রী জায়গা এ সব, বৃষ্টির পরে বাঁশবনের চেহারা দেখিলে মনে হয়, কোথায় যেন পড়িয়া আছেন। এমন জায়গায় কি মানুষ থাকে! কলিকাতার ফুটপাথে কোথাও এতটুকু ধূলাকাদা নাই—কি বিশাল জনস্রোত ছুটিয়াছে নিজের নিজের কাজে, সুইচ টিপিলেই আলো, কল টিপিলেই জল। সন্ধ্যার সময় যখন চারিদিকে বাড়ীতে আলো জ্বলিয়া ওঠে, 'বঙ্গবাসী' প্রেসে ফ্ল্যাট মেশিনের শব্দ হয়, ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট দিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া ট্রাম চলে, তখন এক অদ্ভুত রহস্যের ভাবে মন পূর্ণ হইয়া যায়; মনে হয়, চিরজীবন এ কর্মব্যস্ত জনস্রোতের মধ্যে কাটাইলেও ক্লান্তি আসে না, প্রাণ নবীন হয়, এতটুকু সময়ের জন্য অবসাদ আসে না মনে।

এখান হইতে চলিয়া যাইতেন, কিন্তু ভাগ্নী যাইতে দেয় না, জোর করিয়াও যাইতে মন সরে না।

জ্যোতির্বিনোদ মহাশয়ও বাড়ী গিয়া খুব শান্তিতে নাই। তাঁহার বাড়ী নোয়াখালি জেলায়। তিন বৎসরে এই একবার বাড়ী আসেন, বাড়ীতে স্ত্রীপুত্র সবাই আছে। দুই-তিন ভাই, খুব বড় পরিবার—এমন কিছু বেশী মাহিনা পান না, যাহাতে স্ত্রীপুত্র লইয়া কলিকাতায় থাকিতে পারেন। বাড়ীতে আসিয়াই জ্যোতির্বিনোদ এবার এক মোকদ্দমায় পড়িয়া গেলেন, জমিজমা সংক্রান্ত শরিকী মোকদ্দমা। তাহার পর হইল বড় ছেলেটির টাইফয়েড, সে সতেরো দিন ভুগিয়া এবং পয়সা খরচ করাইয়া ঠেলিয়া উঠিল তো স্ত্রী পা পিছলাইয়া হাঁটু ভাঙিয়া শয্যাগত হইয়া পড়িল।

এই রকম নানা মুশকিলে জ্যোতির্বিনোদ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। এদিকে কলিকাতায় থাকিলে লোকের হাত দেখিয়া, ঠিকুজি কুষ্ঠি তৈরী করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জনও হয়। এখানে সে উপার্জ্জন নাই, শুধু খরচ আর খরচ।

কলিকাতায় একরকম থাকেন ভাল, একা ঘরে একা থাকেন, কোন গোলমাল নাই। সাহেবের দাপট সহ্য করিয়া থাকিতে পারিলে আর কোন হাঙ্গামা নাই। নিজে যা-খুশি দুইটি রান্না করিলেন, অভাব-অভিযোগ হইলে নারাণবাবুর কাছে টাকাটা সিকিটা ধার করিয়া দিন চলিয়া যায়। বাড়ীর এত ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয় না। যে চিরকাল একা কাটাইয়া আসিয়াছে, তাহার পক্ষে এসব বড় বোঝা বলিয়া মনে হয়।

ছুটি ফুরাইলে যেন বাঁচা যায়।

. . . .

যদুবাবু ছিলেন কলিকাতায়, একটা মাত্র টুইশানি সন্ধ্যার সময়—অন্য অন্য টুইশানির ছাত্র কলিকাতার বাহিরে গিয়াছে। দিবানিদ্রা হইতে উঠিয়া বেলা পাঁচটার সময় চা খাইয়া তিনি

টুইশানিতে যান। সময় কাটাইবার ওই একমাত্র উপায়। পথে এক কবিরাজ-বন্ধুর ওখানে বসিয়া কিছুক্ষণ গল্প-গুজব করেন। স্কুল-মাস্টারদের জগৎ সংকীর্ণ, বৃহত্তর কলিকাতা শহরে চেনেন কেবল টুইশানির ছাত্র ও তাহাদের অভিভাবকদের, কিংবা স্কুল-কমিটির দু-একজন উকিল কিংবা ডাক্তারকে। তাঁহাদের বাড়ীতেও মাঝে মাঝে যদুবাবু গিয়া থাকেন, কমিটির মেম্বারদের তোয়াজ করা ভাল—কী জানি, কখন কী ঘটে!

একঘেয়ে ভাবে সময় আর কাটিতে চায় না, দিবানিদ্রার অভ্যাস ক্রমশ পাকা হইয়া আসিতেছে। স্কুল-বাড়ীর সামনে দিয়া আসিবার সময় চাহিয়া দেখেন সাহেবের ঘরে আলো জ্বলিতেছে কি না। সাহেব দার্জিলিং বেড়াইতে গিয়াছে মেম সিবসন্‌কে লইয়া—ছুটি ফুরাইবার আগের দিন বোধ হয় ফিরিবে।

অবশেষে দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশ ফুরাইল। সব মাস্টার একত্র হইলেন।

যদুবাবু বলিলেন, এই যে জ্যোতির্বিনোদ মশায়, নমস্কার! বেশ ভাল ছিলেন? কবে এলেন?

হেডপণ্ডিত যদুবাবুর সঙ্গে কোলাকুলি করিয়া বলিলেন, ভাল যদু? এখানেই ছিলে?

সকলে মিলিয়া বৃদ্ধ নারাণবাবুর পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিলেন। নারাণবাবুর স্বাস্থ্য ভাল হইয়া গিয়াছে। যেখানে গিয়াছিলেন, সেখানে দুধ ঘি মাছ সস্তা, খাওয়া-দাওয়া এখানকার চেয়ে ভাল অনেক, এখানে হাত পুড়াইয়া ভাতে-ভাত রাঁধিয়া খাইয়া থাকিতে হয়। এ বয়সে সেবাযত্ন পাওয়া আবশ্যক—সকলে এসব কথা বলিয়া নারাণবাবুকে আপ্যায়িত করিল।

মাস্টারদের মধ্যে পরস্পর প্রীতি ও আত্মীয়তার বন্ধন স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে দীর্ঘদিন পরস্পর অদর্শনের পর—হিংসা বা মনোমালিন্যের চিহ্নও নাই। এমন কি মিঃ আলমকে দেখিয়াও যেন সকলে খুশী হইল।

হেডমাস্টার বলিলেন, ওয়েল-কাম জেন্টলমেন। আশা করি,আপনারা সব ভাল ছিলেন। এবার হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষা সামনে, সকলে তৈরী হোন, প্রশ্নপত্র তৈরী করুন। আজই সারকুলার বার হবে।

আলম নিজের দেশ হইতে হেডমাস্টারের জন্য প্রায় দুই ডজন মুর্গির ডিম একটা টিনের কৌটা ভরিয়া আনিয়াছে। সিবসন্ ডিম পাইয়া খুব খুশী।

—ও, মিঃ আলম, ইট ইজ সো গুড অফ ইউ! দ্যাট্‌ নাইস্ এগস্ অ্যাণ্ড সো ফ্রেশ!

কিন্তু পরক্ষণেই সাহেব ও মেম দুইজনকেই আশ্চর্য করিয়া মিঃ আলম কাগজ-জড়ানো কী একটা বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল।

মেম বলিল, কী ওটা?

সাহেব বলিয়া উঠিলেন, গুড হেভন্‌স! শিওরলি দ্যাট ইজ নট এ বোতল অফ মাটন?

মিঃ আলম মৃদু হাসিয়া বলিল, ইয়েস স্যার্, ইট ইজ স্যার্। এ টিইন্ বোতল অফ মাটন—হোম মেইড হোম স্যার্।

বিস্মিত ও আনন্দিত মিস্ সিবসন্ বলিল, থ্যাঙ্কস্ অ-ফুলি মিঃ আলম !

যদুবাবু টীচারদের ঘরে আড়ালে বলিলেন, ঢের ঢের খোশামুদে দেখেচি বাবা, কিন্তু এ দেখছি সকলের উপর টেক্কা দিলে—আবার বাড়ী থেকে বয়ে ভেড়ার দাপনা এনেচে !

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, বাড়ী থেকে না ছাই। আপনিও যেমন! ওর বাড়ীতে একেবারে দলে দলে ভেড়া চরচে! ক্ষেপেছেন আপনি! ওসব চাল দেখানো আমরা বুঝি নে? মিউনিসিপ্যাল মার্কেট থেকে কিনে এনেছে মশাই।

ছেলেরা ক্লাসে ক্লাসে প্রণাম করিল মাস্টারদের। আজ বেশী পড়াশুনা নাই, সকাল সকাল ছুটি হইয়া গেলে সকলে মিলিয়া পুরানো চায়ের দোকানে চা পান করিতে গেলেন। দোকানী তাঁহাদের দেখিয়া লাফাইয়া উঠিল: আসুন বাবুরা, আসুন—ভাল ছিলেন সব? আজ স্কুল খুলল বুঝি? ওরে, বাবুদের চা দে। আবার সেই পুরানো ঘরে বসিয়া বহুদিন পরে পুরোনো সঙ্গীদের সঙ্গে চা পান। সকলেরই খুব ভাল লাগে।

যদুবাবু বলেন, নারাণদা, গল্প করুন সে দেশের !

—আরে রামো, সে আবার দেশ! মোটে মন টেঁকে না। দুধ ঘি খেতে পেলেই কি হল! মানুষের মন নিয়ে হল ব্যাপার—মন যেখানে টেঁকে না, সে দেশ আবার দেশ !

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, যা বলেচেন দাদা। গেলাম পৈতৃক বাড়ীতে। ভাবলাম, অনেক দিন পরে এলাম, বেশ থাকব। কিন্তু মশাই, দু দিন যেতে না-যেতে দেখি আর সেখানে মন টিকচে না।

—কলকাতার মতন জায়গা আর কোথাও নেই রে ভাই।

—খুব সত্যি কথা।

—মানুষের মুখ যেখানে দেখা যায়, দুটো বন্ধুর সঙ্গে গল্প করে সুখ যেখানে, খাই না-খাই সেখানে পড়ে থাকি।

নারাণবাবু অনেকদিন পরে চুনিদের বাড়ী পড়াইতে গেলেন।

চুনিরা দেওঘর না কোথায় গিয়াছিল, বেশ মোটাসোটা হইয়া ফিরিয়াছে। অনেকদিন পরে চুনির সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে নারাণবাবু বড় আনন্দ পাইলেন।

চুনি আসিয়া প্রণাম করিল। নারাণবাবু প্রথম দিনটা তাহাকে পড়াইলেন না, বরিশালে যে গ্রামে গিয়াছিলেন সে গ্রামের গল্প করিলেন, পঞ্চানন মোক্তারের কথা বলিলেন। চুনি তাঁহার কাছে দেওঘরের গল্প করিল।

নারাণবাবু বলিলেন, পান্না কোথায় রে?

—সে স্যার্, মাসীমার বাড়ী গিয়েছে কালীঘাটে কাল আসবে। মাসীমার বড় ছেলের পৈতে কিনা।

—তুই যাস নি যে?

—স্যার্, আজ প্রথম দিনটা—আপনি আসবেন। রাত্রে যাব।

উত্তর শুনিয়া নারাণবাবু আহ্লাদে আটখানা হইয়া গেলেন। নিজের ছেলেপিলে নাই,

পরের ছেলেকে মানুষ করা, তাহাদের নিজের সন্তানের মত দেখিয়া অপত্যস্নেহের ক্ষুধা নিবারণ করা যাহাদের অদৃষ্টলিপি—তাহাদের এ-রকম উত্তরে খুশী হইবার কথা। চুনি বলিল, চা খাবেন স্যার.? আমি—

নারাণবাবু ভাবেন—নিজের নাই, তাতে কী! আমার ছেলেমেয়ে এই ওয়েলেস্‌লি অঞ্চলে সর্ব্বত্র ছড়ানো—আমার ভাবনা কী! একটা করে টাকা যদি দেয় প্রত্যেকে, বুড়ো বয়সে আমার ভাবনা কী?

—স্যার., আজ পড়ব না।

—বেশ, গল্প শোন্—এই বরিশালের গাঁয়ে—

—না স্যার., একটা ভূতের গল্প করুন।

—ভূত-টুত সব মিথ্যে। ও-সব নিয়ে মাথা ঘামাস নে ছেলেবেলা থেকে।

—কিন্তু স্যার্, কুণ্ডাতে একটা বাড়ী আছে—

—কোথায়?

—কুণ্ডা—দেওঘরের কাছে স্যার.। সেখানে একটা বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব ব'লে কেউ ভাড়া নেয় না। সত্যি, আমরা জানি স্যার.।

নারাণবাবু আর এক সমস্যায় পড়িলেন। মিথ্যা ভয় এক বালকের মন হইতে কী করিয়া তাড়ানো যায়? নানা কুসংস্কার বালকদের মনে শিকড় গাড়িবার সুযোগ পায় শুধু অভিভাবকদের দোষে। তিনি শিক্ষক, তাঁহার কর্ত্তব্য, বালকদের মন হইতে সে সমস্ত কুসংস্কার উচ্ছেদ করা।

নারাণবাবু নিজের নোট-বইয়ে লিখিয়া লইলেন। সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করা আবশ্যক, এ বিষয়ে কী করা যায়!

চুনির মা আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন, বলি ও দিদি, মাস্টারকে বল না—ছেলে যে মোটে বই হাতে করতে চায় না।

(দেওঘরে গিয়ে বেড়িয়ে আর খেলে বেড়াবে—তার কী করবেন উনি?)

নারাণবাবু বলিলেন, বউমা, চুনি ছেলেমানুষ, একদিনে দুদিনে ও স্বভাব ওর যাবে না। আমি ওকে বিশেষ স্নেহ করি, সেদিকে আমার যথেষ্ট নজর আছে, আপনি ভাববেন না।

চুনির মা বলিলেন, ও দিদি, বল যে, পরীক্ষা সামনে আসছে, চুনিকে দু বেলা পড়াতে হবে। এক মাস দেড় মাস তো বসিয়ে মাইনে দিয়েছি। এখন মাস্টার যেন দু-বেলা আসে।

নারাণবাবু মেয়েমানুষের কাছে কী প্রতিবাদ করিবেন? ছাত্র পড়াইয়া এখানে মাহিনা আদায় করিতে পায়ের রক্ত জল হইয়া যায়, ছুটির মাসে বসাইয়া কে তাঁহাকে মাহিনা দিল? ছুটির আগের মাসের মাহিনা এখনও বাকী।

মুখে বলিলেন, বউমা, সকালে আজকাল সময় বেশী পাওয়া যায় না। আমারও নিজের একটু কাজ আছে। আচ্ছা, তা বরং দেখব—

—দেখাদেখি চলবে না, বলে দাও দিদি। আসতেই হবে—না পারেন, আমরা অন্য

মাস্টার রাখব। ওই তো সে দিন পাশের মেসের ছেলে—তিনটে পাসের পড়া পড়ছে—বলছিল, আমায় দশ টাকা দেবেন, দু বেলা পড়াব।

এই সময় চুনি মাকে ধমক দিয়া বলিল, যাও না এখান থেকে, তোমার আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিকনেস কাটতে হবে না।

নারাণবাবু বলিলেন, ছি, মাকে অমন কথা বলতে আছে?

মনে মনে কিন্তু খুশী হইলেন।

চুনি বলিল, তাহ, আপনি মার কথা শুনবেন না। দু বেলা আপনি পড়ালেও আমি পড়ব না। আমার দু বেলা পড়তে ইচ্ছে করে না।

নারাণবাবুর আনন্দ অনেকখানি উবিয়া গেল। তাঁহার অসুবিধা দেখিয়া তাহা হইলে চুনি কথা বলে নাই, সে দেখিয়াছে নিজের সুবিধা! পাছে নারাণবাবু স্বীকার করিলে দুই বেলা পড়িতে হয়, তাই মাকে ধমক দিয়াছে হয়তো।

বাড়ীতে ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার এঞ্জিনীয়ার-বন্ধুটি তাঁহার জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন।

—কী নারাণবাবু, কবে ফিরলেন?

—আজ দিন-তিনেক। ভাল সব? বসুন, বসুন শরৎবাবু।

মনের মতন সঙ্গী পাইয়াছেন তিনি। উঃ, কোথায় বরিশালের অজ-পাড়াগাঁয়ের পঞ্চানন মোক্তার, আর কোথায় তাঁহার এই বন্ধু শরৎ সান্ন্যাল!

দুইজনে যেমন একত্র হইয়াছেন, অমনি উঁচু বিষয়ের আলোচনা শুরু। এই জন্তই কলিকাতা এত ভাল লাগে। এ সব লইয়া কথা বলিবার লোক কি বাংলাদেশের অজ-পাড়াগাঁয়ে মিলিবে?

নারাণবাবুর বন্ধু বলিলেন, ভাল কথা দাদা, আপনাকে দেখাব বলে রেখে দিয়েছি।

—কী?

—'রিডার্স ডাইজেস্ট'-এ একটা আর্টিকল্ বেরিয়েছে বর্তমান চায়নার ব্যাপার নিয়ে। কাল এনে দেখাব।

—আচ্ছা, কাল আনবেন। কিন্তু আমার ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ আছে তো ওয়াশিংটন-চুক্তি সম্বন্ধে?

—আপনার ও-কথা টেঁকে না। রামানন্দবাবুর মন্তব্য পড়ে দেখবেন এ মাসের 'মডার্ন রিভিউ'-এ।

—আলবত টেঁকে। আমি কারও কথা মানি নে।

এ কথা নারাণবাবু বলিলেন একটা খাঁটি ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল আলোচনা জমাইয়া তুলিবার জন্ত। তর্ক না হইলে আলোচনা জমে না।

কলিকাতা না হইলে এমন মনের খোরাক কোথায় জোটে?

দুই বন্ধুতে মিলিয়া মনের খেদ মিটাইয়া রাত এগারোটা পর্যন্ত ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল আলোচনা চলিল। দুই জনেই সমান তার্কিক। কোন কথারই মীমাংসা হইল না। তা না

হউক। মীমাংসার জন্য কেহ তর্ক করে না। তর্কের খাতিরেই তর্ক করিতে হয়। আফিমের নেশার মত তর্কের নেশাও একবার পাইয়া বসিলে আর ছাড়িতে চায় না।

নারাণবাবু বলিলেন, আজ একটু যোগবাশিষ্ঠ পড়া হল না।

—তা বেশ তো, পড়ুন না। আরও রাত হোক।

অনেক রাত্রে নারাণবাবুর বন্ধু রায় বাহাদুর শরৎ সান্যাল বিদায় গ্রহণ করিলে নারাণবাবু রান্না চড়াইলেন। মনে এত আনন্দ, ও-বেলার বাসি পুঁটিমাছ-ভাজা ছিল, তাই দিয়া ঝোল চড়াইলেন আর ভাত—আর কিছু না। মনের আনন্দই মানুষকে তাজা রাখে, খাইয়া মানুষ বাঁচে না শুধু।

খাওয়া শেষ হইলে সাহেবের ঘরের দিকে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, সাহেবের টেবিলে আলো জ্বলিতেছে, অত রাত্রে সাহেব লেখাপড়া করিতেছেন নাকি? নারাণবাবুর ইচ্ছা হইল, ঘরে ঢুকিয়া দেখেন সাহেব কী পড়িতেছেন!

সাহেব বলিলেন, কাম ইন্।

নারাণবাবু বিনীত হাস্যের সহিত ঢুকিলেন।

—ইয়েস?

—না, এমনি দেখতে এলাম, আপনি কী পড়ছেন!

—আমি আপিসের কাজ করছিলাম। বোস।

—স্যার, কলকাতার মত জায়গা নেই।

—আমাদের মত লোক অন্য জায়গায় গিয়ে থাকতে পারে না। আমার এক ভাই চায়নাতে আছে—মিশনারি। ক্যান্টন থেকে নদীপথে যেতে হয়—অনেক দূর। আগে সে ব্রিটিশ গানবোটে মেডিক্যাল অফিসার ছিল, এখন মিশনারি হয়েছে। সে কিন্তু চীনদেশের একটা অজ-পাড়াগাঁয়ে মিশনে থাকে। আমি একবার গিয়েছিলাম সেখানে, গিয়ে আমার মন হাঁপিয়ে উঠল।

—আমিও স্যার্ বরিশালে গিয়েছিলাম ছুটিতে, আমার মন টেঁকে নি।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, স্কুলটাকে আরও ভাল করতে হবে স্যার্।

—আমিও তাই ভাবছি। একটা বিজ্ঞাপন দেব কাগজে, আরও ছেলে হোক!

দুজনে বসিয়া স্কুলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হইল।

নারাণবাবু বিদায় লইয়া শয়নের জন্য গেলেন।

শ্রাবণ মাসের দিকে স্কুলের কাজ ভয়ানক বাড়িল।

এই সময় একজন নতুন মাস্টার স্কুলে নেওয়া হইল—বেশী বয়স নয়, ত্রিশের মধ্যে। লোকটি কবিতা লেখে, বড় বড় কথা বলে, অবস্থাও বোধ হয় ভাল। কারণ, সাধারণ স্কুলমাস্টারদের অপেক্ষা ভাল সাজগোজ করিয়া স্কুলে আসে, বেশির ভাগ আপন মনে বসিয়া থাকে, কাহারও সঙ্গে কথাবার্তা বলে না। ফট ফট করিয়া ইংরেজী বলে যখন-তখন। নাম

—রামেন্দুভূষণ দত্তগুপ্ত, বাড়ী—নৈহাটির কাছে কী একটা জায়গায়।

যদুবাবু চায়ের দোকানে বলিলেন, ওহে, এ নবাবটি কে এল হে? নরলোকের সঙ্গে বাক্যালাপ করে না যে!

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, করার উপযুক্ত মনে করলেই করবে।

নারাণবাবু চুপ করিয়া ছিলেন। যদুবাবু বলিলেন, কী দাদা! চুপ করে আছেন যে?

—কী বলি বল? কী রকম লোক, কিছু জানি নে তো?

—কী রকম বলে মনে হয়? বেজায় গুমুরে?

—তা হতে পারে। তবে ছেলেমানুষ, শাইও হতে পারে।

—শাই, না ছাই। কারও সঙ্গে কথা বলে না, টীচারস-রুমে একলাটি বসে কী যেন ভাবে!

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, লোকটা কবি, তাই বোধ হয় আপন মনে ভাবে—

যদুবাবু কাহারও প্রশংসা সহ্য করিতে পারেন না, তিনি বলিলেন, হ্যাঃ, কবি—একেবারে রবি ঠাকুর। ডেঁপো কোথাকার!

সে দিন টিফিনের পর কিছুক্ষণ ক্লাসে নূতন শিক্ষক নাই। দশ মিনিট কাটিয়া গেল, তখনও তাঁহার দেখা নাই।

হেডমাস্টার কটমট দৃষ্টিতে ক্লাসের শূন্য চেয়ারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কার ক্লাস?

মনিটার দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, নিউ টীচার স্যার্।

হেডমাস্টার চলিয়া গেলেন।

অনেকক্ষণ পরে নতুন মাস্টার আসিয়া বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মথুরা চাকর আসিয়া একটা স্লিপ দিল তাঁহার হাতে, হেডমাস্টার আপিসে ডাকিয়াছেন।

নতুন মাস্টার উঠিয়া আপিসে গেলেন।

—আমাকে ডেকেছেন স্যার্?

—হ্যাঁ। আপনি ক্লাসে ছিলেন না?

—আমি ক্লাস থেকেই আসছি।

—দশ মিনিট পর্য্যন্ত আপনি ক্লাসে ছিলেন না।

—আমি দুঃখিত। চা খেতে গিয়ে একটু দেরি হয়ে গেল।

—কোথায় চা খেতে গিয়েছিলেন? আমায় না বলে বাইরে যাবেন না।

—কেন স্যার্?

হেডমাস্টার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া নতুন মাস্টারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, আমার স্কুলের নিয়ম।

নতুন মাস্টার কিছু না বলিয়া ক্লাসে গিয়া পড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার হেডমাস্টারের আপিসে আসিয়া বলিলেন, স্যার্, একটা কথা—

—কী?

—আমি স্কুলের একজন টীচার, ছাত্র নই—হেডমাস্টারের কাছে অনুমতি নিয়ে স্কুলের কটকের বাইরে যেতে হয় ছাত্রদের, টীচারদের নয়। আমার দেরি হয়েছিল ফিরতে, সে জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আপনাকে না বলে যাওয়ার জন্যে আপনি অনুযোগ করলেন, এটা ঠিক করেছেন বলে মনে করি না।

হেডমাস্টারের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে নতুন টীচার স্টগট করিয়া ক্লাসে চলিয়া গেলেন। দোর্দণ্ডপ্রতাপ ক্লার্কওয়েল তো অবাক, তাঁহার অধীনস্থ কোন মাস্টার যে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এ কথা বলিতে পারে, তাহা তাঁহার কল্পনার অতীত। তিনি তখনই মিঃ আলমকে ডাকিলেন।

—ইয়েস স্যার্।

—নতুন টীচার বেশ ভাল পড়ায় ?

—জানি না স্যার্। বলেন তো দৃষ্টি রাখি।

—রাখো।

—কী রকম একটু অসামাজিক ধরনের—

—শুনলাম নাকি, কবি। বাংলা কবিতা পড় তোমরা—পড়েছ কী রকম কবিতা লেখে ?

মিঃ আলম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাত কড়িকাঠের দিকে উঠাইয়া থিয়েটারী ভঙ্গি করিলেন। তারপর সুর নীচু করিয়া বলিলেন, কিসের কবি ! বাংলাদেশে সবাই কবিতা লেখে আজকাল। কবি !

—তুমি বাংলা কবিতা পড় মিঃ আলম ?

—পড়ি বইকি স্যার্।

আলমের এ কথা সত্য নয়, বাংলা সাহিত্যের কোন খবর কোনদিনও তিনি রাখেন না।

মিঃ আলমের সঙ্গে একদিন নতুন মাস্টারের ঠোকাঠুকি বাধিল।

ব্যাপারটা খুব সামান্য বিষয় অবলম্বন করিয়া। ক্লাসে কী একটা পরীক্ষার কাগজে নতুন মাস্টার নম্বর দিয়া ছেলেদের নিকট ফেরত দিয়াছেন। মিঃ আলম সে ক্লাসে পড়াইতে গিয়া সামনের বেঞ্চির উপর একটি ছেলের পরীক্ষার খাতা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের খাতা রে ?

ছেলেটি বলিল, এবারকার উইকলি এক্সারসাইজের খাতা স্যার্, নতুন স্যার্ দেখে ফেরত দিয়েছেন।

—কী সাব্জেক্ট ?

—হিস্ট্রি।

—দেখি খাতাখানা।

মিঃ আলম খাতাখানা লইয়া উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া বলিলেন, নম্বর দেওয়া সুবিধে হয় নি।

—কেন স্যার্ ?

—এর নাম কি মার্ক দেওয়া! এ আনাড়ীর মার্ক দেওয়া। এই খাতায় তুমি ষাট নম্বর কখনও পাও না—আমার হাতে চল্লিশের বেশী নম্বর উঠত না।

নতুন টীচারের কাছে ছেলেরা অন্যভাবে ঘুরাইয়া বলিল, স্যার্, আপনার হাতে বড় নম্বর ওঠে।

—কেন রে?

—স্যার্, ওই সতীশকে ষাট দিয়েছেন, ও চল্লিশের বেশী পায় না।

—কে বলেছে তোকে?

—মিঃ আলম বলে গেলেন স্যার।

—কী বললেন?

—বললেন, এ আনাড়ীর মার্ক দেওয়া হয়েছে।

নতুন টীচার তখনই গিয়া হেডমাস্টারের আপিসে মিঃ আলমকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। হেডমাস্টার নাই, ক্লাসে পড়াইতে গিয়াছেন। বলিলেন, আপনার সঙ্গে একটা কথা—এক মিনিট—

—কী বলুন?

—আপনি কি ফোর্থ ক্লাসে আমার খাতা দেখা সম্বন্ধে কিছু বলেছেন?

—কেন বলুন তো?

—না, তাই বলছি। ছেলেরা বলছিল, আপনি খাতা দেখে বলেছেন যে খাতা ভাল দেখা হয় নি।

—হ্যাঁ—তা—না—সে কথা ঠিক না—তবে হ্যাঁ, একটু বেশী নম্বর বলেই আমার মনে হল কিনা—

খুব ভাল কথা। আপনি অভিজ্ঞ টীচার, আমার ভুল ধরবার সম্পূর্ণ অধিকারী। আমায় দয়া করে যদি খাতা দেখাটা সম্বন্ধে একটু বলে-টলে দেন—আমার অনেক ভুল সংশোধন হতে পারে। আমরা আনাড়ী কিনা আবার এ বিষয়ে?

আলমের মুখ লাল হইয়া উঠিল। বলিলেন, তা আমার যা মনে হয়েছে, তাই বলেছি। আপনার নম্বর দেওয়াটা একটু বেশী বলেই মনে হয়েছিল।

আমি মোটেই তার প্রতিবাদ করছি না। আমি কেবল বলতে চাই ক্লাসে ছেলেদের সামনে মন্তব্য না করে আমাকে আড়ালে ডেকে বললেই ভাল হত।

ন্যায্য কথা। এ কথার উপর কোন কথা চলে না। মিঃ আলমের চুপ করিয়া থাকা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে হেডমাস্টারকে একা পাইয়া মিঃ আলম সাত-খানা করিয়া তাঁহার কাছে লাগাইলেন, নতুন টীচারকে খাতা দেখতে দেবেন না স্যার্।

—নতুন টীচারকে? কেন, মিঃ আলম?

—উনি খাতা মনোযোগ দিয়ে দেখেন না।

—দেখেছিলে নাকি কোন খাতা?

হ্যাঁ স্যার্। ফোর্থ ক্লাসের সতীশকে উনি ষাট নম্বর দিয়েছেন যে খাতায়, তাতে চল্লিশের বেশী নম্বর ওঠে না। ভুল কাটেনও নি সব জায়গায়।

এই কথার মধ্যে মুশকিল আছে। সব ভুল নিখুঁতভাবে কাটিয়া কোন মাস্টারই খাতা দেখেন না—স্বয়ং মিঃ আলমও না। এখানে মিঃ আলম নতুন টীচারের উপর বেশ এক চাল চালিলেন। হেডমাস্টার খাতা চাহিয়া পাঠাইয়া সত্যই দেখিলেন, প্রত্যেক পাতায় এক-আধটা ভুল রহিয়া গিয়াছে, যাহা কাটা হয় নাই। নতুন মাস্টারের ডাক পড়িল ছুটির পর।

হেডমাস্টার বলিলেন, ফোর্থ ক্লাসের হিস্ট্রির খাতা দেখেছিলেন আপনি ?

—হ্যাঁ স্যার্।

—খাতা ভাল করে দেখেন নি তো। সব ভুলে লাল দাগ দেন নি।

—বেশীর ভাগ দিয়েছি স্যার্। দু-একটা ছুটে গিয়েছে হয়তো।

—না, আমার স্কুলে ওভাবে কাজ করলে চলবে না। খাতা সব আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান। আবার দেখতে হবে।

—যে আজ্ঞে স্যার্।

পরদিন নতুন মাস্টার সারকুলার-বই দেখিয়া বাহির করিলেন—মিঃ আলম ফার্স্ট ক্লাসের ইংরাজী গ্রামার ও রচনার খাতা দেখিয়াছেন। তিনখানি খাতা চাহিয়া লইয়া দেখিতে দেখিতে বাহির করিলেন, মিঃ আলম গড়ে প্রত্যেক পাতায় অন্তত তিনটি করিয়া ভুলের নীচে লাল দাগ দেন নাই।

নতুন টীচার খাতা কয়খানি হাতে করিয়া হেডমাস্টারের কাছে না গিয়া মিঃ আলমের কাছে গেলেন। খাতা দেখাইয়া বলিলেন, আপনার খাতা দেখা যদি আদর্শ হিসেবে নিতে হয়, তা হলে প্রত্যেক পাতায় আমার তিনটি ভুলে লাল দাগ না দিয়ে রাখা উচিত ছিল। দেখুন খাতা কখানা।

মিঃ আলম উল্টাইয়া খাতাগুলি দেখিল। যুক্তি অকাট্য। গড়ে তিনটি করিয়া ভুলে লাল দাগ দেওয়া হয় নাই—খাঁটি কথা।

মিঃ আলমের মুখ লাল হইয়া উঠিল অপমানে, কিন্তু কোন কথা বলিলেন না।

নতুন টীচার বলিলেন, আপনি বললেন কিনা হেডমাস্টারের কাছে আমার বড্ড ভুল থাকে খাতায়, তাই দেখালুম—ভুল সকলেরই থাকে। ওগুলো*ওভারলুক করতে হয়। সব কথায় হেডমাস্টারের কাছে—

মিঃ আলম রাগিয়া বলিলেন, আপনি কী করে জানলেন, আমি হেডমাস্টারের কাছে বলেছি।

—মনের অগোচর পাপ নেই। আপনি জানেন, আপনি বলেছেন কিনা—বলিয়াই নতুন টীচার বেশ কায়দার সহিত ঘর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এ ব্যাপার কী করিয়া যেন অন্য টীচারেরা জানিতে পারিলেন, টীচারদের বসিবার ঘরে

টিফিনের সময় এ কথা লইয়া বেশ গুলজার হইল। মিঃ আলমের অপমানে সকলেই খুশী।

যদুবাবু বলিলেন, বেশ হয়েছে অস্ত্যজটার। থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছে নতুন টীচার। কী ওর নাম, রামেন্দুবাবু বুঝি ?

নারাণবাবু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার একটা গুণ, পরের কথায় বড় একটা থাকেন না। বলিলেন, বাদ দাও ভায়া ও-কথা।

যদুবাবু বলিলেন, বাদ দেব কেন ? আপনি তো দাদা, দেবতুল্য লোক। তা বলে দুষ্ট লোকও তো আছে পৃথিবীতে। তাদের শাস্তি হওয়াই ভাল।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, জানেন দাদা, একটা কথা বলি। ওই আলমটা সবার নামে হেডমাস্টারের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়—এ কথা আপনি অস্বীকার করতে পারেন ? অমন হিংসুক লোক আর দুটি দেখি নি, এই আপনাকে বলে দিচ্চি।

জ্যোতির্বিনোদ নীচু ক্লাসের পণ্ডিত—বড় বড় ক্লাসে যাঁহারা পড়ান, তাঁহাদের সমীহ করিয়া চলেন, তিনি কাহারও বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা হইলে বিশেষ যোগ দেন না। তিনি বলেন, আমি চুনোপুঁটি, আপনারা সকলেই রুই-কাতলা—আমার কোন কথায় থাকা সাজে না। তিনিও আজ বলিলেন, একটা ভাল বলতে হয় রামেন্দুবাবুকে—তিনি ওই খাতা নিয়ে হেডমাস্টারের কাছে না গিয়ে মিঃ আলমের কাছে গিয়েছেন।

যদুবাবু কাহারও ভাল দেখিতে পারেন না। তিনি বলিলেন, আরে, সেটা কিছু নয় হে ভায়া, হেডমাস্টারের কাছে যেতে সাহস কি হয় সবারই ?

নারাণবাবু বলিলেন, তা হয়। অতখানি যে করতে পারে, সাহেবের কাছে যাওয়ার সাহস তার খুবই আছে। লোকটি ভদ্রলোক।

যদুবাবু বলিলেন, তবে একটু গুমুরে। যাক, সব গুণ মানুষের থাকে না। এ কাজটা করে যা শিক্ষা দিয়েছে আলমকে, ভারি খুশী হয়েছি—হা-হা, কী বল ক্ষেত্র-ভায়া ?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, স্পিরিট আছে ভদ্রলোকের।

—ডেকে নিয়ে এস না। ওই তো ওদিকের ছাদে বসে থাকে একলাটি। টিফিনে টীচারদের ঘরে কোনদিন তো আসে না।

নারাণবাবু বলিলেন, বসে বসে বই পড়ে লাইব্রেরি থেকে নিয়ে। সেদিন বঙ্কিমের বই পড়ছিল। পকেটে একদিন শেলির কবিতা ছিল। তোমরা ওকে গুমুরে ভাব, ও তা নয়। কবি কিনা, একটু আনমনে ভাবতে ভালবাসে।

—যাও না ক্ষেত্র-ভায়া, ডেকে নিয়ে এস না।

—আমি পারব না দাদা। কিছু যদি বলে বসে ! তার চেয়ে চলুন, আজ চায়ের দোকানের আড্ডায় নিয়ে যাওয়া যাক ওকে। আলাপ-সালাপ করা যাক।

ছুটির পর গেটের বাহিরে মাস্টারের দল নতুন মাস্টারের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন ; কারণ, এ ঘনিষ্ঠতা হেডমাস্টার বা মিঃ আলমের চোখের আড়ালে হওয়াই ভাল। মিঃ আলম

বা হেডমাস্টারের নেকনজরে যে ব্যক্তি নাই, তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে যাওয়ার বিপদ আছে।

নতুন টীচার চোখে চশমা লাগাইয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে নব্য কবির স্টাইলে আকাশ-পানে মুখ করিয়া যেই গেটের বাহিরে পা দিয়াছেন, অমনি যদুবাবু এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিলেন, এই যে শুনছেন, রামেন্দুবাবু—এই যে—

রামেন্দুবাবু হঠাৎ যেন চমকিয়া উঠিয়া পিছনে ফিরিয়া বিস্ময়ের সঙ্গে বলিলেন, আমাকে বলছেন?

যেন তিনি ইহা প্রত্যাশা করেন নাই, তাঁহাকে কেহ ডাকিবে।

যদুবাবু বলিলেন, আমরাই ডাকছি, আসুন, একটু চা খেয়ে আসি।

—ও! আচ্ছা—তা চলুন।

সকলেই খুব আগ্রহান্বিত। নতুন টীচারের সঙ্গে এত দিন আলাপ ভাল করিয়া হয়ই নাই, অনেকের সঙ্গে একটা কথাও হয় নাই। আজ ভাল করিয়া আলাপ করা যাইবে। লোকটার অদ্ভুত কার্যে তাহার সম্বন্ধে মাস্টারদের কৌতূহলের অন্ত নাই। আলমকে যে অপমান করিয়া ছাড়িয়াছে, সে সকলের বন্ধু।

চায়ের দোকানে গিয়া প্রতিদিনের মত মজলিস জমিল। স্কুল-মাস্টারদের অবস্থা যতটা হওয়া সম্ভব, তাহার বেশী ইহাদের ক্ষমতা নাই। নতুন টীচারকে খাতির করিয়া দুইখানা টোস্ট দেওয়া হইল, বাকী সবাই একখানা করিয়া টোস্ট লইলেন। পরস্পর একটা মানসিক বোঝাপড়া হইল যে, নতুন টীচারের খাবারের বিলটা সকলে মিলিয়া চাঁদা করিয়া দিবেন।

নারাণবাবু আলাপের ভূমিকাস্বরূপ প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, মশায়ের বাড়ী কোথায়?

—আমার বাড়ী ছিল গিয়ে নদে জেলায় সুবর্ণপুর। এখন কলকাতায় আছি অনেক দিন।

—কলকাতায় কোথায় থাকেন?

—মেসে।

—ও!

যদুবাবু একটু ঘনিষ্ঠতা করার জন্য বলিলেন, অনেক দিন কলকাতায় আর কী আছ, ভায়া, তোমার বয়েসটা কা আর এখন? আমাদের চেয়ে কত ছোট—

নতুন টীচার এ ঘনিষ্ঠতায় বিশেষ ধরা দিলেন না। খুব ভদ্রতার সঙ্গে বিনীতভাবে জানাইলেন, তাঁহার বয়স খুব কম নয়, প্রায় চৌত্রিশ পার হইতে চলিল। 'দাদা' কথাটার ব্যবহার একবারও করিলেন না। বেশ একটু ভদ্র ও বিনীত ব্যবধান বজায় রাখিয়া চলিলেন কথাবার্তায় ও চালচলনে।

একথা-ওকথার পর যদুবাবু হঠাৎ বলিলেন, আজ আমরা খুব খুশী হয়েছি, বেশ শিক্ষা দিয়েছেন (মাখামাখি করিবার সাহস তাঁহার উবিয়া গিয়াছিল) ওই ব্যাটাকে—

নতুন টীচার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, কার কথা বলছেন?

—আরে, ওই যে ওই আলমটাকে—ও ব্যাটা হেডমাস্টারের কাছে প্রত্যেকের বিষয়ে লাগাবে। আমাদের উত্তন-কুত্তন করে মেরেচে মশাই। উঃ, ও একেবারে অন্ত্যজ—ওর যা অপমান করেচেন আজ! দেখুন তো, আপনার নামে কিনা লাগাতে—

নতুন টীচারের মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি বিরস কণ্ঠে বলিলেন, ও আলোচনা নাই বা করলেন এখন। মিঃ আলমের ভুল হতে পারে। ভুল সবারই হয়। আমি তাঁর ভুল পয়েন্ট আউট করেছি মাত্র। আদারওয়াইজ হি ইজ এ ভেরি গুড টীচার—ভেরি অনেস্ট অ্যাণ্ড সিন্‌সিয়ার টীচার! যাক্ ওসব কথা।

কঠিন ভদ্র সুরের গাম্ভীর্য্যে চায়ের দোকানের হাল্‌কা আবহাওয়া যেন থমথম করিয়া উঠিল।

যদুবাবু আর মাখামাখি করিবার সাহস পাইলেন না। অন্য কথা উঠিল। নতুন টীচার বিশেষ কোন কথা বলিলেন না। মজলিস জমিল না, যতটা আশা করা গিয়াছিল।

চায়ের মজলিস শেষ হইলে নতুন টীচার বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। সকলের পয়সা তিনি নিজেই দিয়া দিলেন।

যদুবাবু বলিলেন, গভীর জলের মাছ, দেখলে তো?

ক্ষেত্রবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, হুঁ।

—বেশ চালবাজ।

—তা একটু আছে বইকি।

নারাণবাবু বলিলেন, তোমরা কারুর ভালো দেখ না—ওই তোমাদের দোষ। এ চালবাজ, ও গভীর জলের মাছ—এই সব তোমাদের কথা।

জ্যোতির্ব্বিনোদ বলিলেন, না না, ভদ্রলোক ভালই! আমি তো দেখচি বেশ উদার লোক।

যদুবাবু বলিলেন, ওই তো ভায়া, ওই জন্যেই তো বলচি গভীর জলের মাছ। আমাদের পয়সাটি পর্য্যন্ত নিজে দিয়ে গেল, যেন কত ভদ্রতা! অথচ—

নারাণবাবু বলিলেন, অথচ কী? তুমি সব জিনিসের মধ্যে একটা 'অথচ' না বের করে ছাড়বে না ভায়া!

—অথচ মনের কথাটা প্রকাশ করলে না।

—অথচ নয়, অর্থাৎ তোমার মত পেটপাতলা নয়।

—আপনি তো দাদা আমার সবই দোষ দেখেন।

—রাগ কোর না ভায়া। আমি তো ও-ছোকরার কোন দোষই দেখলাম না। বসে বসে মিঃ আলমের নামে কুৎসা গাইলেই কি ভাল লোক হত?

নারাণবাবুকে সকলেই তাঁহার বয়সের জন্য একটু সমীহ করিয়া চলে। যদুবাবু ইহা লইয়া নারাণবাবুর সঙ্গে আর তর্ক করিলেন না।

মোটের উপর সে দিন চায়ের মজলিস হইতে বাহির হইয়া সকলেই অসন্তোষ লইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

মাসের শেষে ছেলেদের প্রোগ্রেস-রিপোর্ট ইত্যাদি লেখার ভিড় পড়িয়া গেল। হেড-মাস্টারের কড়া হুকুম আছে, মাসের শেষদিন কোন টীচার ছুটির পর বাড়ী যাইতে পারিবে না—বসিয়া বসিয়া সব প্রোগ্রেস-রিপোর্ট লিখিয়া হেডমাস্টারের সই করাইয়া বিভিন্ন ক্লাসের মার্কের খাতায় ছেলেদের মার্ক জমা করিয়া, ক্লাসের হাজিরা-বহিতে ছেলেদের গর-হাজিরা বাহির করিয়া তবে যাইতে পারিবে।

এই সব কেরানীর কাজ সাঙ্গ করিয়া বাড়ী ফিরিতে রাত সাড়ে সাতটা বাজিয়া যায়।

স্কুলের প্রথানুযায়ী মাস্টারদের এদিন জলখাবার দেওয়া হয় স্কুলের খরচে। যদুবাবু ছুটির পর সাহেবের কাছে জলখাবারের টাকা আনিতে গেলেন—বরাবর তিনিই যান ও কোন দোকান হইতে খাবার কিনিয়া আনেন।

বরাদ্দ আছে সাড়ে পাঁচ টাকা। সাহেব যদুবাবুর হাতে সাতটি টাকা দিয়া বলিলেন, আজ ভাল করে খাও সকলে—লাড্ডু, রসগোল্লা বেশী করে নিয়ে এস।

যদুবাবু প্রথমে একটি রেস্টুরেন্টে গিয়া দুই পেয়ালা চা খাইলেন, তারপর ছয় টাকার খাবার কিনিলেন এক দোকান হইতে। বাকী একটি টাকা তাঁহার উপরি-পাওনা। অন্য অন্য বার আট আনা পয়সা উপরি-পাওনা হয় অর্থাৎ পাঁচ টাকার খাবার কিনিয়া আট আনা পকেটস্থ করেন।

স্কুলে আসিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল।

মাস্টারেরা অধীর আগ্রহে জলখাবারের প্রত্যাশায় বসিয়া আছেন। একজন বলিলেন, এত দেরি কেন যদুবাবু?

—আরে, গরম গরম ভাজিয়ে আনচি। আমার কাছে বাবা ফাঁকি দিতে পারবে না কোন দোকানদার। বসে থেকে তৈরী করিয়ে ষোল আনা দাঁড়ি ধরে ওজন করিয়ে তবে—

অন্যান্য মাস্টারদের অগাধ বিশ্বাস যদুবাবুর উপরে। সকলেই বলেন, যদুবাবুর মত কিনতে-কাটতে কেউ পারে না—পাকা লোক একেবারে যাকে বলে।

টীচারদের ঘরে বেঞ্চির উপর ছোট ছোট পাতা পাতিয়া খাবার পরিবেশন করা হইল। যদুবাবু এখানে খাইবেন না, তিনি বাড়ী লইয়া যাইবেন। জ্যোতির্বিনোদ মশায় ঘিয়ে-ভাজা জিনিস খাইবেন না, তিনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, তাঁহার জন্য শুধু সন্দেশ-রসগোল্লা আনা হইয়াছে। নতুন টীচার বেঞ্চির এক পাশে খাইতে বসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে বড় সাধারণত কাহারও মেশামেশি নাই। তিনি নিঃশব্দে ঘাড় গুঁজিয়া খাইতেছিলেন। যদুবাবু সামনে গিয়া বলিলেন, আর দু-একখানা লুচি দেব?

—না না, আর দেবেন না।

—একটা রসগোল্লা?

অন্যান্য টীচার সকলেই বিভিন্ন বেঞ্চি হইতে নতুন টীচারকে খাওয়ার জন্য, দুই-একটা অতিরিক্ত মিষ্টি লওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

মিঃ আলম ভোজসভায় প্রতিবার উপস্থিত থাকেন ; কিন্তু স্বীয় পদের আভিজাত্য বজায় রাখিবার জন্য সাধারণ মাস্টারদের সঙ্গে খাইতে বসেন না। মাস্টারেরা বরং খোশামোদ করিয়া প্রতিবার ভোজসভাতেই তাঁহাকে খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিত। মিঃ আলম হাসিমুখে প্রত্যাখ্যান করিতেন।

আজ তাঁহার প্রাপ্য সেই আপ্যায়ন নতুন টীচারের উপর গিয়া পড়িতে দেখিয়া মিঃ আলম মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন, বিস্মিত হইলেন, নতুন টীচারের উপর হিংসায় মন পরিপূর্ণ হইল।

নতুন টীচার বলিলেন, মিঃ আলম, আপনি খেলেন না ? আসুন।

মিঃ আলম গম্ভীরমুখে উত্তর দিলেন, না, আপনারা খান। আমি এখন খাই নে।

নতুন টীচার আর কোন কথা বলিলেন না।

মাসে এই একদিন করিয়া স্কুলের খরচে খাওয়া—এমন বেশী কিছু খাওয়া নয়, হয়তো খান পাঁচ-ছয় লুচি, দুইটি রসগোল্লা, একটু তরকারি, এক মুঠা বোঁদে। এই খাওয়াটুকুর জন্য মাস্টারেরা মাসের শেষ দিনটির প্রতীক্ষায় থাকেন, সে দিন সারা দিনটা খাটিবার পর সন্ধ্যায় সকলে বসিয়া একটু খাওয়াদাওয়া—

পরদিন মিঃ আলম হেডমাস্টারকে গিয়া বলিলেন, স্যার্, একটা কথা—মাসের শেষে মাস্টারদের পিছনে পাঁচ টাকা ছ টাকা মিথ্যে খরচ, ও বন্ধ করে দেওয়াই ভাল। ধরুন, কমিটী থেকে আপত্তি তুলতে পারে। মাস্টারদের ডিউটি তারা করবে, তার জন্যে খাওয়ানো কেন স্কুলের খরচে ? আমি তো ভাল বুঝছি নে স্যার্।

কমিটীর নামে হেডমাস্টার একটু ভয় পাইয়া গেলেন। তবুও বলিলেন, তা থাক্ থাকগে। খাটতেও হয় তো।

মিঃ আলম জানিত, কমিটীর নামে সাহেব একটু ভয় পায়। সে গিয়া কমিটীর একজন মেম্বারকে কথাটা লাগাইল। কমিটীর মীটিংয়ে অমূল্যবাবু সাহেবকে প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, শুনলাম আপনি টীচারদের জলখাবার খেতে দেন মাসের শেষে, সে কার পয়সায় ?

—স্কুলের খরচে।

—কেন ?

—মাস্টারদের খাটুনি বেশী হয়—প্রোগ্রেস-রিপোর্ট লেখা, রেজিস্টার ঠিক করা—

—এ তো তাঁদের ডিউটি। এর জন্যে জলখাবার দেওয়া কেন ?

ক্লার্কওয়েল তর্ক করিয়া তখনকার মতো নিজের কাজের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু পরের মাস হইতে মাস্টারদের জলযোগ বন্ধ হইয়া গেল।

•

ক্ষেত্রবাবু সেদিন স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন, স্ত্রী বিছানায় শুইয়া আছে, ভয়ানক জ্বর। এঁটো বাসন রান্নাঘরের এক পাশে জড়ো হইয়া আছে—ওবেলাকার এঁটো পরিষ্কার করা হয় নাই, ছেলেমেয়েগুলো ঘরময় দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছে, চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। ক্ষেত্রবাবুর মাথা ঘুরিয়া গেল। সারাদিন পরে আসিয়া এ সব কি সহ্য হয় ? স্ত্রীর ব্যবস্থামত

ঠিকা-ঝিকে আজ মাস-তিনেক হইল ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। স্ত্রীই বলিয়াছিল, কেন মিছিমিছি ঝির পেছনে আড়াই টাকা তিন টাকা খরচ—আজ একটু নুন দাও মা, আজ খিদে পেয়েছে জলখাবার দাও মা, আজ মাথবার একটু তেল দাও মা—এই সব ঝক্কি রোজ লেগেই আছে। দাও ছাড়িয়ে, কাজকর্ম সব করব আমি। হাসিয়া বলিয়াছিল, কিন্তু মাসে মাসে আড়াইটে করে টাকা আমায় দিয়ো গো, ফাঁকি দিয়ো না যেন।

কিন্তু শরীর খারাপ, মন খাটিতে চাহিলে কী হইবে, তিন মাসের মধ্যে এই তিনবার অসুখে পড়িল। ডাক্তার ও ওষুধ-খরচে ঠিকা-ঝিয়ের ডবল খরচ হইয়া গেল।

ক্ষেত্রবাবু নিজে বড় মেয়েটির সাহায্যে রান্নাঘর পরিষ্কার করিলেন। মেয়েকে বলিলেন বাসন মাজতে পারবি হাবি ?

হাবি মাত্র সাত বছরের মেয়ে। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হুঁ, খু-উ-ব।

—যা দিকি, আমি কলতলায় দিয়ে আসচি।

ঘরের ভিতর হইতে নিভাননী চিঁ-চিঁ করিয়া বলিল, ও পারবে না—একটা ঠিকে-ঝি দেখে নিয়ে এস। ওই সদ্‌গোপ-বাবুদের পাশের গলিতে মুংলির মা বুড়ী থাকে, খোঁজ করে দেখগে।

ক্ষেত্রবাবু ধমক দিয়া বলিলেন, তুমি চুপ করে শুয়ে থাক। আমি বুঝছি। কেন ও পারবে না ? শিখতে হবে না কাজ ? কানু কোথায় রে ?

হাবি বলিল, না বাবা, আমি পারব। দাদা খেলা করতে গিয়েচে।

—সুজি কোথায় আছে ? ঘি ?

নিভাননীর ধমক খাইয়া রাগ হইয়াছিল। সে কথা বলিল না।

—আঃ, বলি—সুজিটা কোথায় ? সারাদিন খেটে খিদেতে মরছি, যা হয় কিছু খাব তো ?

নিভাননী পূর্ব্ববৎ চিঁ-চিঁ করিতে করিতে বলিল, আমার কী দরকার কথায় ? যা বোঝ করো তুমি।

হাবি বলিল, আমি জানি বাবা, আমি দিচ্চি।

তখন নিভাননী মেয়েকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, সুজি করিবার দরকার নাই, ও-বেলার রুটি করা আছে শিকেয় হাঁড়িতে। নিয়ে খেতে বল্‌। চা করে দিতে পারবি ?

হাবি 'না' বলিতে জানে না। ঘাড় লম্বা করিয়া বলিল, হুঁ—উ—উ—

সে চায়ের কাপ ইত্যাদি লইয়া রান্নাঘরের দিকে যাইতে যাইতে বলিল, মা, উনুনে আঁচ দিয়ে দেবে কে ?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, তোমাকে ওসব করতে হবে না। হয়েছে, থাক্‌, আর আমার চায়ে দরকার নেই। তারপর চা করতে গিয়ে জামায় আগুন লেগে মরুক—

নিভাননী বলিল, আহা, মুখের কী মিষ্টি বাক্যি !

ক্ষেত্রবাবু এক গ্লাস জল ঢকঢক করিয়া খাইয়া ফেলিলেন। তারপর হাবির সাহায্যে রুটি

বাহির করিয়া গুড় দিয়া এক-আধখানা নিজে খাইলেন, বাকি ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া টুইশানিতে বাহির হইলেন।

হাবি বলিল, বাবা, মা বলছে রাত্রে কী খাবে ? একখানা পাউরুটি কিনে এনো—

ক্ষেত্রবাবু কথা কানে তুলিলেন না। ছাত্রের বাড়ী গিয়া মনে পড়িল, স্ত্রীর অসুখের জন্য একবার বেলেঘাটায় রামসদয় ডাক্তারের ওখানে যাইতে হইবে। খানিকটা আলাপ-পরিচয় আছে ; স্কুল-মাস্টার বলিয়া ভিজিটটা কম লইয়া থাকে তাঁহার কাছে।

ছেলের বাপ আসিয়া কাছে বসিয়া ছেলের পড়ার তদারক করিতে লাগিল। ফলে ক্ষেত্রবাবু যে একটু সকাল সকাল বিদায় লইবেন, তাহার উপায় রহিল না। অভিভাবকের মনস্তুষ্টির দরুন বরং একটু বেশী সময় বসিয়া থাকিতে হইল। রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় ছাত্রের বাড়ী হইতে পদব্রজে বেলেঘাটা চলিলেন। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করিয়া কাজ শেষ করিতে সাড়ে দশটা বাজিয়া গেল, কাজেই আসিবার পথে ছয়টি পয়সা বাসভাড়া দিয়া ফিরিতে হইল।

বাসায় ফিরিয়া দেখেন, ছেলেমেয়েরা অঘোরে ঘুমাইতেছে। স্ত্রীর আবার জ্বর আসিয়াছিল সন্ধ্যার পরেই, সে বিছানায় পড়িয়া এপাশ-ওপাশ করিতেছে।

ভীষণ ক্ষুধা পাইয়াছে। কিন্তু এত রাত্রে কী খাইবেন ? ভাত চড়াইবার ধৈর্য্য থাকে না আর এখন।

নিভাননী জ্বরে বেহুঁশ, তবুও সে জিজ্ঞাসা করিল, পাউরুটি এনেচ ?

ঐ যাঃ ! পাঁউরুটি কিনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, অত কি ছাই মনে থাকে ? বলিলেন, না, আনতে মনে নেই।

নিভাননী উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলিল, তবে কী খাবে এখন ? দুটো চিঁড়ে কিনে আন না হয়—

ক্ষেত্রবাবু বিরক্তির সহিত বলিলেন, হ্যাঃ, এখন এগারোটা বাজে, আমার জন্যে চিঁড়ের দোকান খুলে রেখেছে তারা !

—দেখই না গো, মোড়ের দোকানটা অনেক রাত পর্য্যন্ত খোলা থাকে।

ক্ষেত্রবাবু সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া কলসী হইতে এক গ্লাস জল গড়াইয়া ঢকঢক করিয়া খাইয়া আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িলেন, অর্থাৎ সমস্ত অসুবিধা ও অনাহারের দায়িত্বটা রুগ্ন স্ত্রীর ঘাড়ে চাপাইয়া দিলেন বিনাবাক্যব্যয়ে।

নিভাননী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

পরদিন সকালে ডাক্তার আসিয়া বলিল, রোগ বাঁকা পথ ধরিয়াছে। বাড়ীতে ভাল চিকিৎসা হইবে না, হাসপাতালে পাঠাইতে পারিলে ভাল হয়। ক্ষেত্রবাবুর প্রাণ উড়িয়া গেল। হাসপাতালে স্ত্রীকে পাঠাইলে ছেলেমেয়েদের বাড়ীতে দেখাশোনা করে কে ? হাসপাতালে যাওয়ার ব্যবস্থাই বা তিনি কখন করেন ?

ডাক্তারের হাতে-পায়ে ধরিয়া একটা চিঠি লিখাইয়া লইলেন ক্যাম্বেল হাসপাতালের এক ডাক্তারের নামে। খাইতে গেলে ক্যাম্বেল হাসপাতালে গিয়া কাজ মিটাইয়া আবার

ঠিক সময়ে স্কুলে যাইতে পারেন না। সুতরাং হাবিকে তাহার ভাইবোনের জন্ম রান্না করিতে বলিয়া, না খাইয়াই বাহির হইলেন। ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলে পাঁচ মিনিট লেট হইবার জো নাই।

হাসপাতালে গিয়া শুনিলেন, ডাক্তারবাবু দশটার আগে আসেন না। বসিয়া বসিয়া সাড়ে দশটার সময় ডাক্তারের মোটর আসিয়া গেটে ঢুকিল। ক্ষেত্রবাবুর হাত হইতে চিঠি পড়িয়া বলিলেন, আচ্ছা, আপনি ও-বেলা আমার সঙ্গে একবার দেখা করবেন, এই—ছটার সময়। এ-বেলা বলতে পারচি নে।

ক্ষেত্রবাবু প্রমাদ গনিলেন। ছয়টা পর্য্যন্ত এখানে অপেক্ষা করিবেন তো বাসায় যাইবেন কখন, ছেলে পড়াইতেই বা যাইবেন কখন?

স্কুলের কাজ শেষ হইয়া আসিয়াছে, বেলা চারিটা বাজে, এমন সময় সাহেবের ঘরে ডাক পড়িল।

ক্ষেত্রবাবু সাহেবের টেবিলের সামনে দাঁড়াইতেই সাহেব বলিলেন, ক্ষেত্রবাবু, ছুটো ক্লাসের প্রশ্নপত্র লিখো করতে হবে—আপনি ছুটি হলে কাজটা করে বাড়ী যাবেন।

হেডমাস্টারের কথার উপর কথা চলে না, অগত্যা তাহাই করিতে হইল। ছুটির পর মাস্টারদের মধ্যে দুই-একজন বলিলেন, চলুন ক্ষেত্রবাবু, চা খেয়ে আসি।

—মনে সুখ নেই, চা খাব কী, চলুন—

সেখানে গিয়া মাস্টারের দল প্রস্তাব করিলেন, স্কুলে একদিন ফিস্ট্ করা হোক। হেড-পণ্ডিত চা না খাইলেও এখানে উপস্থিত থাকেন রোজ। তিনি ফর্দ্দ করিলেন, প্রত্যেক মাস্টারকে এক টাকা করিয়া চাঁদা দিতে হইবে। তাহা হইলে একদিন পোলাও রাঁধিয়া সবাই আমোদ করিয়া খাওয়া যায়। যদুবাবু বলিলেন, এক টাকা বড় বেশী হইয়া পড়ে—বারো আনার মধ্যে যাহা হয় হউক।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, মনে সুখ নেই দাদা, এখন ওসব থাক্।

যদুবাবু বলিলেন, কেন, কী হয়েছে?

—বাড়ীতে বড় অসুখ। হাসপাতালে পাঠাতে হচ্চে কাল।

সকলেই নানারূপ ব্যগ্র প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। দুই-একজন ক্ষেত্রবাবুর বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়া দেখিতে চাহিলেন। ফিস্ট্ খাইবার প্রস্তাব আপাতত মুলতুবী রহিল। সকলেই কম মাহিনায় সংসার চালান, এক পরিবারের মত মনে করেন পরস্পরকে, একজনের দুঃখ সবাই বোঝেন বলিয়াই চায়ের এ মজলিসের বন্ধুদের মধ্যে প্রীতির বন্ধন ঘনিষ্ঠ ও নির্ভেজাল।

ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে নারাণবাবু হাসপাতাল পর্য্যন্ত গেলেন। ক্ষেত্রবাবু বলিয়াছিলেন, আপনি বুড়োমানুষ, এতটা আর যাবেন না হেঁটে।

—বুড়োমানুষ বলে কি মানুষ নই? ও কী ভায়া, চল, গিয়ে দেখে আসি।

দুজনে গিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করিয়া হাসপাতালের সব ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন এবং পরদিনই নিভাননীকে হাসপাতালে আনা হইল।

নারাণবাবু রোজ বিকালে টুইশানিতে যাইবার আগে তুইটি কমলালেবু, কোনদিন বা এক গুচ্ছ আঙুর লইয়া নিভাননীকে দেখিয়া যান। স্কুলে পরদিন বলেন, ও ক্ষেত্র-ভায়া, বউমা কাল বলছিলেন, তুমি হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাচ্ছ, তোমার কে এক শালী আছেন, তাঁকে এনে তুদিন রাখ না—

—আপনাকে বললে বুঝি?

—হাঁা, কাল উনি বলছিলেন। তোমার কষ্ট হচ্ছে। কবে যে সেরে উঠব, কবে যে বাড়ী যাব—বলছিলেন বউমা।

—ওই রকম বলে। শালীকে আনা কী সহজ দাদা? নিয়ে এস খরচ করে, দিয়ে এস খরচ করে—খাওয়াও লুচি-পরোটা। সে কি আমাদের সাধ্যি?

নারাণবাবুকে নিভাননী 'দাদা' বলিয়া ডাকে। আড়ালে 'বট্‌ঠাকুর' বলিয়া ডাকে স্বামীর কাছে। নারাণবাবু কত রকম মজার গল্প করেন তাহার কাছে, রোগীর মনে আনন্দ দিতে চান। একদিন নিভাননী বলিল, দাদা, আমি ভাল হলে আপনাকে ছোট বোনের বাড়ী একদিন খেতে হবে।

নারাণবাবু শশব্যস্ত হইয়া বলেন, নিশ্চয় বউমা, নিশ্চয়, এর আর কথা কী?

—আপনি কী খেতে ভালবাসেন দাদা?

—আমি? আমার—বউমা—বুড়ো হয়েছি—যা হয় সব ভাল লাগে। একলা থাকি, রেঁধে খাই—

—কতদিন আছেন একা?

—তা আজ সাতাশ বছর বউমা।

—একা আছেন?

—তা থাকতে হয় বইকি বউমা। নিজেই রাঁধি—এই বয়সে কি রান্না করতে ইচ্ছে করে? বেশী কিছু রাঁধি না, যা হয় একটা তরকারি করি।

—আপনি মাছ খান?

—তা খাই বউমা। ও বোষ্টমদের ঢঙ নেই আমার। পুরুষ মানুষ, মাছ-মাংস কেন খাব না? ও বোষ্টমদের মেয়েলিপনার ঢঙ দেখলে আমি হাড়ে চটি।

—আমি আপনাকে ইলিশমাছের দই-মাছ রেঁধে খাওয়াব। আমি দিদিমার কাছে রাঁধতে শিখেছি, জানেন?

পিতৃসম স্নেহময় বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলিবার সময় নিভাননীর কণ্ঠে আপনিই যেন আবদারের সুর আসিয়া পড়ে। তাহার বালিকা-বয়সে যে বাবা স্বর্গে গিয়াছেন, যাঁহার কথা ভাল মনে পড়ে না—এই প্রাণখোলা সরল বৃদ্ধের মধ্যে নিভাননী তাঁহাকেই যেন আবার দেখিতে পায়, নিজের কণ্ঠে কখন যে কন্যার মত আবদার-অভিমানের সুর আসিয়া পড়ে সে বুঝিতেও পারে না।

নারাণবাবু বসিয়া সুখ-দুঃখের কথা বলেন। নারীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আজ ত্রিশ বছর

আসেন নাই—স্নেহ-ভালবাসার পাট উঠিয়া গিয়াছে। এমন দরদী শ্রোতা পাইয়া তাঁহারও মনের উৎস-মুখ খুলিয়া যায়। প্রথম জীবনের চাকুরির কথা বলেন। বহুকাল-পরলোকগতা পত্নীর সম্বন্ধে বলেন, অনুকূলবাবুর কথাও পাড়েন। নিভাননী সহানুভূতি জানায়, একমনে শুনিতে শুনিতে কখন তাহার চোখ ছলছল করিয়া উঠে।

ক্ষেত্রবাবু সবদিন আসিতে পারেন না। টুইশানি, বাড়ীতে ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনা—এসব সারিয়া রোজ হাসপাতালে আসা চলে না। নারাণবাবু আসেন বলিয়া হয়তো তেমন দরকারও হয় না।

সেদিন নারাণবাবু টুইশানি সারিয়া বউবাজারের মোড় হইতে একটা বেদানা ও ছুইটি কমলালেবু কিনিলেন। অনেকদিন কিছু হাতে করিয়া যাইতে পারেন নাই, আজ টুইশানির মাহিনা পাইয়াছেন। হাসপাতালের হলে দেখিলেন, হলের কোণে নিভাননীর সে বিছানাটা খালি, লোহার খাটটা হাড়পাঁজরা বাহির করা পড়িয়া আছে।

নারাণবাবু ভাবিলেন, তাঁহার ভুল হইয়াছে। কোন্ ঘরে আসিতে কোন্ ঘরে আসিয়াছেন, বৃদ্ধবয়সে মনে থাকে না। বাহির হইতে গিয়া বারান্দায় জলের না কিসের ড্রামটি চোখে পড়িল। না, এই ড্রাম রহিয়াছে—এই তো ঘর। আবার তিনি ঘরে ঢুকিলেন।

পাশের বিছানার এক রোগী বলিল, আপনি কাকে খুঁজছেন বলুন তো? ও, সেই বউটির আপনি কেউ—আহা, আপনি জানেন না! ও তো আজ দুপুরে হয়ে গিয়েছে। বউটির স্বামী এল, আরও কে কে এল—নিয়ে গেল, প্রায় তখন তিনটে। আহা, আমরা সবাই—কথা কইতে কইতে পাশ ফিরল আর অমনি হয়ে গেল। হার্টে কিছু ছিল না। আহা, আপনি কে হতেন ওঁর—ইত্যাদি।

নারাণবাবু কিছু না বলিয়া ফলগুলি হাতে করিয়া বাহিরে আসিলেন।

আজ ক্ষেত্রবাবুকে কি স্কুলে দেখেন নাই? না বোধ হয়। এখন মনে পড়িল, সারাদিন স্কুলে ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে দেখা হয় নাই বটে। আজ হাসপাতালে আসিবেন বলিয়া টুইশানিতে গিয়াছিলেন ছুটির পরেই, সুতরাং চায়ের দোকানেও যান নাই। নতুবা ক্ষেত্রবাবুর অনুপস্থিতি চোখে পড়িত।

নিজের ছোট ঘরের নিঃসঙ্গ শয্যায় শুইয়া বৃদ্ধ কত রাত পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারিলেন না।

স্কুলের দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল এপ্রিল মাস হইতে। এপ্রিল মাসে মাস্টারদের বেতন ঠিক সময় দেওয়ার উপায় রহিল না; কারণ, এবার জানুয়ারি মাসে আশানুরূপ ছেলে ভর্ত্তি হয় নাই, বরং অনেক ছেলে ট্রান্সফার লইয়া চলিয়া গিয়াছে। এ স্কুলে ছেলেদের মাহিনা অন্য স্কুল হইতে বেশী, এই সব দুঃসময়ে লোক বেশী মাহিনা দিতে আর চায় না। পূর্ব্বে ভাবা গিয়াছিল, সাহেব-মেম স্কুলে পড়াইবে বলিয়া পাড়ার বড়লোকেরা ছেলে এখানেই ভর্ত্তি করিবে; কিন্তু গত ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল তেমন ভাল না হওয়ায় এ স্কুলে পড়াইতে অনেকেই দ্বিধা বোধ করিল। ফলে ছেলে অনেক কমিয়া গিয়াছে এবার।

মাস্টাররা সাতাশে এপ্রিল মার্চ মাসের মাহিনার কিছু অংশ মাত্র পাইল। গরমের ছুটির পূর্ব্বে যে মাসে মার্চ মাসের প্রাপ্য বেতনের বাকী অংশ শোধ করিয়া দেওয়া হইল। দেড় মাস গরমের ছুটি, গরীব শিক্ষকেরা বাড়ী গিয়া খায় কী? হেডমাস্টারের কাছে দরবার করিয়া ফল হইল না। সকলে বলিল, সাহেব মেম ঠিক ওদের পুরো ছুটির মাইনে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদেরই বিপদ।

শোনা গেল, সাহেব দিল্লী না কোথায় যেন বেড়াইতে যাইতেছে।

স্কুলের কেরানী হরিচরণ নাগ কিন্তু বলিল, কথা ঠিক নয়—সাহেব এখনও মার্চ মাসের মাহিনা শোধ করিয়া লয় নাই। মেম এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত মাহিনা লইয়াছে বটে।

সাহেবের নিকট যাইয়া মাহিনা পাইবার জন্ম বেশী পীড়াপীড়ি করিলে সাহেব বলিলেন, মাই ডোর ইজ ওপ্‌ন্—যাঁদের না পোষায় চলে যেতে পারেন। আমার স্কুলে কষ্ট করে যারা থাকতে না পারবে, তাদের দিয়ে এখানে কাজ হবে না। আমাদের অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে এখনও যেতে হবে—স্বার্থত্যাগ চাই তার জন্যে। সামনের বছর থেকে স্কুল ভাল হয়ে যাবে। এই বছরটা তোমরা আমার সঙ্গে সহযোগিতা করো।

ক্লার্কওয়েল সাহেবের ব্যক্তিত্ব বলিয়া জিনিস ছিল, অন্তত গরীব টীচারদের কাছে। কারণ ব্যক্তিত্ব জিনিসটা ভীষণ রিলেটিভ, আমার গুরুদেবের ব্যক্তিত্ব তোমার কাছে হয়তো কিছুই নয়, কিন্তু আমার কাছে তা গুরুত্বপূর্ণ; তোমার জমিদার-মনিবের ব্যক্তিত্ব যতই গুরু হউক, আমার নিকটে তাহা নিতান্তই লঘু। সুতরাং মাস্টারের দল শুধু-হাতে গরমের ছুটিতে দেশে চলিয়া গেল।

যদুবাবু পড়িয়া গেলেন মুশকিলে। কলিকাতা ছাড়িয়া কোথাও একটা যাইবার স্থান নাই, অথচ ইচ্ছা করে কোথাও যাইতে। কতদিন কলিকাতার বাহিরে যাওয়া ঘটে নাই, হাতও এদিকে খালি। তাঁহার ছাত্রেরা দেশে যাইতেছে, নবদ্বীপের কাছে পূর্ব্বস্থলি নামে গ্রাম, বেশ নাকি ভাল জায়গা। কিন্তু যদুবাবু তো একা নহেন, স্ত্রীকে বাসায় রাখিয়া যাওয়া সম্ভব নয়।

পৈতৃক গ্রামে যাইতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু সেখানে ঘরবাড়ী নাই। জমিজমা শরিক কিনিয়া লইয়াছে আজ বহুদিন। তবুও যদুবাবু বলিলেন, বেড়াবাড়ী যাবে?

যদুবাবুর স্ত্রী বিবাহ হইয়া কিছুদিন যশোর জেলার এই ক্ষুদ্র গ্রামে শ্বশুরঘর করিয়াছিল, ম্যালেরিয়া ধরিয়া মাস দুই ভোগে। তাহার পর হইতেই স্বামীর সঙ্গে বর্দ্ধমান ও পরে কলিকাতায়। সে বেড়াবাড়ী যাইবার প্রস্তাবে বিস্মিত হইয়া কহিল, বেড়াবাড়ী! সেখানে কেমন করে যাবে গো? বাড়ীঘর কোথায় সেখানে?

—চলো না, অবনীদের বাড়ীতে গিয়ে উঠি। সেও তো কলকাতায় এসে আমার বাসাতে থেকে গিয়েছে দু-একবার।

—না বাপু, পরের ঘরকন্নার মধ্যে যাওয়া, সে বড় ঝঞ্ঝাট। হাতে তোমার টাকাই বা কই?

যদুবাবুর মতলব একটু অন্য রকম। হাতে প্রায় কিছুই নাই, স্ত্রীকে পাড়াগাঁয়ে জ্ঞাতিদের বাড়ী গছাইয়া রাখিয়া আসিয়া দিনকতক তিনি একটু হাল্‌কা হইবেন। এগারো টাকা করিয়া বাসাভাড়া আর টানিতে পারেন না। ওই থার্ড মাস্টার শ্রীশ রায় মেসে থাকে, আড়াই টাকা সীট্ রেণ্ট্, খোরাকী খরচ দশ টাকা, সাড়ে বারো টাকার মধ্যে সব শেষ।

যদুবাবু স্ত্রীকে বলিয়া-কহিয়া রাজী করাইলেন। কিন্তু যাইবার দিন বাড়ীওয়ালা গোলমাল বাধাইল।

—আজ পাঁচ মাসের বাড়ীভাড়া পাওনা মশাই, পাঁচ এগারোং পঞ্চান্ন টাকা—দশ টাকা মাত্র ঠেকিয়েছেন এ মাসে আর মাত্র পাঁচ টাকা ঠেকিয়ে চলে যাচ্ছেন? বাক্স-পেঁটরা-বিছানা সবই নিয়ে চললেন, রইল এখানে কী তবে? ওই একটা জারুল কাঠের সিন্দুক আর একখানা ভাঙা তক্তপোশ, আর তো দেখছি কয়লাভাঙা হাতুড়িটা আর মরচে-ধরা গোটা দুই কাচ-ভাঙা হ্যারিকেন। আপনি যদি আর না আসেন মশাই তো এতে আমার চল্লিশ টাকা আদায় হবে কিসে বুঝিয়ে দিয়ে তবে যান। আমি পাড়ার লোক ডাকি, তারা বলুক, আমার যদি অন্যায় হয়ে থাকে মশাই, আমায় দশ ঘা জুতো মারুক। আপনি ভদ্রলোকের ছেলে, বাড়ীতে জায়গা দিয়েছিলাম, ইস্কুলে মাস্টারি করেন, ছেলেদের লেখাপড়া শেখান, তা এই যদি আপনার ধরন হয়—না মশাই, আমি তা পারব না। মাপ করবেন। আপনি যেতে হয়, জিনিসপত্র রেখে যান, নইলে আমার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে যান।

—কী হয়েছে, কী হয়েছে?—বলিয়া কলিকাতার হুজুকপ্রিয় কৌতূহলী লোক ভিড় পাকাইয়া তুলিল। কেহ হইল বাড়ীওয়ালার দিকে, কেহ হইল যদুবাবুর দিকে—উভয় দলে মারামারি হইবার উপক্রম হইল। যদুবাবুর স্ত্রী চট্ করিয়া উপরে গিয়া বাড়ীওয়ালার মায়ের কাছে কাঁদিয়া পড়িলেন—মা, আপনি বলে দিন। টাকা আমরা ফেলে রাখব না—পালাবও না। স্কুল খুললেই টাকা শোধ দেব।

দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া বাড়ীওয়ালার মা ডাকিল, ও বদে, বলি শোন্, ওপরে আয়।

ব্যাপারটা মিটিল। স্ত্রী ও বাক্স বিছানা সমেত যদুবাবু মুক্তি পাইলেন; কিন্তু আর তিনি কোনদিন এ বাসা তো দূরের কথা, এ পাড়ার ত্রিসীমানাও মাড়ান নাই।

বেড়াবাড়ী বগুলা স্টেশনে নামিয়া সাত ক্রোশ গরুর গাড়ীতে যাইতে হয়। দুপুর ঘুরিয়া গেল সেখানে পৌঁছিতে। শরিক অবনী মুখুজ্জে আহারাদি সারিয়া দিবানিদ্রা দিতেছিলেন, বাহিরে শোরগোল শুনিয়া আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি খুব সন্তুষ্ট হইলেন না। মুখে বলিলেন, কে, যদুদা? সঙ্গে কে? বউদি? বেশ, বেশ—তা এতকাল পরে মনে পড়েছে যে? না, ভাল না, বাড়ীর সব অসুখ ব্যায়রাম। আপনার বউমা তো কাল জ্বর থেকে উঠেছে—ছেলে দুটোর এমন পাঁচড়া যে, পঙ্গু হয়ে বসে থাকে—ও পুঁটি—ওগো—এই বউদিদি এসেছেন, নামিয়ে নাও—

রাত্রে যদুবাবু দেখিলেন, থাকিবার ভীষণ কষ্ট। ইহাদের দুইটি মাত্র ঘর আর এক ভাঙা

পূজার দালান, তার একখানায় কাঠকুঠা রহিয়াছে। একটি ঘরে ভদ্রতা করিয়া আজিকার জন্ত থাকিবার জায়গা দিয়াছে বটে, কিন্তু বেশীদিনের জন্ত এ ব্যবস্থা সম্ভব নয়, কারণ অবনীর তিনটি বড় মেয়ে, দুইটি ছেলে, স্ত্রী ও এক বিধবা দিদিকে লইয়া পাশের ওই একখানি মাত্র ঘরে কতদিন থাকিতে পারিবে?

দুই দিন গেল, এক সপ্তাহ গেল। গরমে বড় কষ্ট হয়—সেকেলে কোঠার ছোট ছোট জানালা, হাওয়া চ'লে না।

অবনীদের সংসারে প্রথম দুই দিন এক হাঁড়িতেই খাওয়া চলিয়াছিল, তারপর যদুবাবুর আলাদা রান্না হয়। জিনিসপত্র সস্তা, এক সের করিয়া দুধ যোগান করা হইয়াছে—বেশ খাঁটি দুধ। যদুবাবুর স্ত্রী বলে, এমন দুধ, যাই বল, শহরে বেশী পয়সা দিলেও মিলবে না।

কিন্তু দিন-পনেরো পরে থাকিবার বড় অসুবিধা হইতে লাগিল। অবনী একদিন ঘুরাইয়া কথাটা বলিয়াই ফেলিল। অর্থাৎ দেশ তো দেখা হইয়াছে, এবার যাইবার কী ব্যবস্থা? ভাবখানা এই রকম।

রাত্রে যদুবাবু স্ত্রীকে নিম্নকণ্ঠে বলিলেন, অবনী তো বলছিল, আর কদিন আছ দাদা? তা কী করি বল তো? এই গরমে কলকাতায়—

স্ত্রী বলিল, চল এখান থেকে বাপু। নানান অসুবিধে। মন টেকে না। বাবাঃ, যে জঙ্গল! ঘরদোরগুলো ভাল না, ছাদ যেমন—একটা বিষ্টি হলেই জল পড়বে। আর ওরাও আর তেমন ভাল ব্যবহার করছে না। আজ ঘাটে বড়দিদি কাকে বলছিল—আমাদের বাড়ী তো আর শরিকের ভাগ নেই, যে যেখানে আছে হুট্ করে এলেই তো হল না! এই রকম কী কথা! আমাদের যাওয়াই ভাল। যে মশা, রাত্তিরে ঘুম হয় না মশার ডাকে।

যদুবাবুর তাহা ইচ্ছা নয়। স্ত্রীকে এবার শরিকের ঘাড়ে কিছুদিন চাপাইয়া যাইবেন, এই মতলব লইয়াই এখানে আসিয়াছেন। তিনি কিছু বলিলেন না।

আর দুই-তিন দিন পরে যদুবাবু ফিরিবেন মনস্থ করিলেন।

অবনীকে বলিলেন, তোমার বউদিদি রইল এ মাসটা, দিদির সঙ্গে শোবে। আমার কলকাতায় না গেলে নয়, আমি পরশু নাগাদ যাই।

গ্রামের কাপালীপাড়া হইতে সিধু কাপালী আসিয়া বলিল, দাদাঠাকুর, এ গাঁয়ে একটা পাঠশালা খুলে বসুন। পঁচিশ-ত্রিশটা ছেলে দেব—চার আনা আট আনা করে রেট। আপনার বাড়ী বসে যা হয়! কলকাতা ছেড়ে দিয়ে এখানেই থেকে যান না কেন?

যদুবাবু হাসিয়া বলিলেন, কলকাতার স্কুলে পঁচাত্তর টাকা মাইনে পাই—সত্তর ছিল, ছেড়ে দেব বলে ভয় দেখিয়েছিলাম, অমনি সেক্রেটারি পাঁচ টাকা বাড়িয়ে বললে—যদুবাবু, আপনার মত টিচার আর কোথায় পাব, আপনি থাকুন। প্রাইভেট টুইশানিতে তাও ধরো পাই—পনেরো আর পঁচিশ সকালে—বিকেলে পনেরো আর কুড়ি। এই ছেড়ে আসব পাঠশালা খুলে চার আনা আট আনা নিয়ে ছেলে পড়াতে? তুমি হাসালে সিদ্ধেশ্বর।

অবনী সেখানে উপস্থিত ছিল। যদুদাদা যে স্কুলে এত মাহিনা পান, এই সে প্রথম শুনিল।

কিন্তু কই, তেমন তো আসবাব বাসনপত্র কিছুই নাই! বউদিদি মোটে চারখানা শাড়ী আনিয়াছেন। দাদার দুইটি মলিন পিরান, গায়ে ভাল গেঞ্জি একটাও দেখা যায় না। বিছানা তো যা আনিয়াছেন, তাহা দেখিয়া একদিন অবনীর স্ত্রী বলিয়াছিল—বট্‌ঠাকুরের যা বিছানা-পত্র, ওই বিছানায় কী করে ওরা শোয় কলকাতা শহরে, তা ভেবে পাই নে। আমরা যে অজ-পাড়াগেঁয়ে—আমাদের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত ও-বিছানায় শোবে না।

গ্রামের সকলে ধরিয়াছিল, এতকাল পরে দেশে এসেছ, গাঁয়ের ব্রাহ্মণ কটিকে ভাল করে একদিন মা-বাপের তিথিতে খাইয়ে দাও। কিছুই তো করলে না গাঁয়ে—

যদুবাবু তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই।

অথচ তিনি এত রোজগার করেন নিজের মুখেই তো বললেন। কী জানি কী ব্যাপার শহরের লোকের! বেশ মোটা পয়সা হাতে নিয়ে এসেছে দাদা, অথচ খরচপত্র বিষয়ে কঞ্জুস—

কথাটা অবনী স্ত্রীকে বলিল।

স্ত্রী বলিল, কী জানি বাপু, দিদির গায়ে তো একরত্তি সোনা নেই—শাঁখা আর কাঁচের চুড়ি এই তো দেখছি, তা কেমন করে বলব বল? হতে পারে।

—তুমি জান না, ওসব কলকাতার লোক, পাড়াগাঁয়ে আসবার সময় সব খুলে রেখে এসেছে। চুরি যাবার ভয় বড্ড ওদের।

ভাবিয়া-চিন্তিয়া পরদিন অবনী যদুবাবুর কছে দুপুরের পর কথাটা পাড়িল: দাদা, একটা কথা ছিল—

—কী হে?

—নানা রকমে বড় জড়িয়ে পড়েছি, মেয়েটা বড় হয়ে উঠেছে, বিয়ে না দিলে আর নয়। বড়দা সেই সোনাদতির মোকদ্দমা করে আড়ালে বিল বিক্রি করে ফেললেন, জানেন তো সব। সেই নিজে মারাও গেলেন, আমাকে একেবারে পথে বসিয়ে গেলেন। পয়সা অভাবে ছেলেটাকে পড়াতে পারছি না। তা আমি বলচি কী, ছেলেটাকে আপনার বাসায় রেখে যদি দুটো দুটো খেতে দেন আর আপনার স্কুলে ফ্রী করে নেন দয়া করে, তবে গরীবের ছেলের লেখাপড়াটা হয়। আপনিও তো ওর জ্যাঠামশায়—

যদুবাবু বুঝিলেন, মাহিনা সম্বন্ধে ও-রকম বলা উচিত হয় নাই তখন। পাড়াগাঁয়ের গতিক ভুলিয়া গিয়াছেন বহুদিন না-আসার দরুন। এসব জায়গার লোকে সর্ব্বদা সুবিধা খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, চাহিতে-চিন্তিতে ইহাদের দ্বিধা নাই, লজ্জা নাই। কী বিপদেই ফেলিল এখন!

মুখে বলিলেন, তা আর বেশী কথা কী! দুটো থাকবে, এ ভাল কথাই তো! তবে এখন স্কুলে ভর্তি করার সময় নয়, সামনের জানুয়ারি মাসে নিয়ে যাব ওকে।

অবনী পল্লীগ্রামের লোক, পাইয়া বসিল। বলিল, তা কেন দাদা, ও বউদিদির সঙ্গেই যাক না। বাসায় থাকুক, সকালে বিকেলে আপনার কাছে একটু আধটু পড়লেও ওর যথেষ্ট বিদ্যে হবে পেটে। বংশের মধ্যে আপনি এল-এ পাস করেছেন—আমাদের বংশের চূড়ো

আপনি। আমরা সব মুখ্য-সুখ্য। দেখুন, যদি আপনার দয়ায় একটু আধটু ইংরিজী পেটে যায় ওর, পরে করে খেতে পারবে।

যদুবাবু কাঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, তা—তা, হবে। বেশ—বেশ।

স্ত্রীকে রাত্রে কথাটা বলিলেন। স্ত্রী বলিল, কে, ওই হুঁটো? ওই দেখতে পিলেরোগা পেটমোটা, ও আধসের চালের ভাত খায়। সেদিন একটা কাঁটাল একলা খেলে। ওর পেছনে, যা মাইনে পাও, সব যাবে। তা তুমি কিছু বলেচ নাকি?

—বলেচি বলেচি। কী আর করি! তোমাকে নিয়ে যাবার সময় এখন ছিনে-জোঁকের মত ধরে না বলে! ওসব লোককে বিশ্বাস নেই রে বাবা।

—কেন, বাহাদুরি করতে গিয়েছিলে যে বড়? এখন সামলাও ঠ্যালা!

যদুবাবুকে আরও বেশী মুশকিলে পড়িতে হইল। যেদিন তিনি যাইবেন, সেদিন অবনী আসিয়া কুড়ি টাকা ধার চাহিয়া বসিল। না দিলে চলিবে না, সামনের মাসে সে বউদিদির হাতে কড়ায় গণ্ডায় শোধ করিয়া দিবে। এখন না দিলে জমিদারের নালিশের দায়ে আমন ধানের জমা বিক্রয় হইয়া যাইবে। সে (অবনী) তাঁহাকে বড় দাদার মত দেখে, তিনি না দিলে এ বিপদের সময় সে কোথায় দাঁড়ায়, কাহার কাছে বা হাত পাতে?

অবনী একেবারে যদুবাবুর পা জড়াইয়া ধরিল। দিতেই হইবে, যদুবাবুর বউমা পর্য্যন্ত নাকি বট্‌ঠাকুরের কাছে আসিবার জন্য তৈয়ারী হইয়া আছে টাকার জন্য।

যদুবাবু প্রমাদ গণিলেন। এমন বিপদে পড়িবেন জানিলে তিনি সাধু কাপালীককে কি ও কথা বলেন?

বলিলেন, তা একটা কথা। টাকাকড়ি ভায়া এখানে কিছু রাখি নি তো! সব ব্যাঙ্কে। তোমার বউদিদি বললে, পাড়াগাঁয়ে যাচ্ছ—সোনাদানা টাকাকড়ি সব এখানে রেখে যাও। হাতে কেবল যাবার ভাড়াটা রেখেছি ভায়া।

—আজই যাবেন?

—হ্যাঁ, এখুনি খাওয়া হলেই বেরুব! আজই দশটার গাড়িতে—

যদুবাবু মনে মনে বলিলেন, যাও বা থাকতাম আজকের এবেলাটা হয়তো, আর এক দণ্ডও এখানে থাকি! এখন বেরুতে পারলে হয় এখান থেকে!

কিন্তু অবনী মুখুজ্জে অভাবগ্রস্ত পাড়াগাঁয়ের লোক, তাহাকে তিনি চেনেন নাই কিংবা চিনিয়াও ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

অবনী বলিল, বেশ দাদা, চলুন আমিও আপনার সঙ্গে কলকাতা যাই তবে। না হয় যাতায়াতে সাত সিকে পয়সা খরচ হয়ে গেল, টাকাটা এনে জমিদারের দায় থেকে তো বেঁচে যাব এখন! সাত সিকে খরচ বলে এখন কী করব, না হয় গুনগার গেল।

যদুবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, তুমি কেন গাড়ীভাড়া করে যেতে যাবে? আমি গিয়েই মনিঅর্ডার করে পাঠাব। তা ছাড়া আজ—আজ আমি, কি বলে—একটু হালিশহরে নামব কিনা! আমার বড় শালীর বাড়ী। তারা কি গেলেই আজ ছাড়বে? একটু আধ দিন

রাখবেই। তুমি মিছিমিছি পয়সা খরচ করবে, অথচ সেই দেরি হয়েই যাবে।

অবনী বলিল, ভালোই তো, চলুন না হয় বউদিদির বোনের বাড়ী দেখেই আসি। গাঁয়ে থাকি পড়ে, কুটুম্ববাড়ীর ভালটা মন্দটা না হয় খেয়েই আসি দুদিন।

কোথায় যাইবে অবনী তাঁহার সঙ্গে। তিনি এখন শ্রীশের মেসে গিয়া উঠিবেন। যদুবাবু কী যে বলেন, উপস্থিত বুদ্ধিতে আর কুলায় না। আকাশ-পাতাল ভাবাও যায় না সামনে দাঁড়াইয়া। বলিলেন, বেশ, বেশ, এ তো খুব ভাল কথা, তোমার মত কুটুম্ব যাবে আমার শালীর বাড়ী। তবে একটা কথাও ভাবছি আবার, যদি কলকাতায় গিয়ে আমাদের স্কুলের হেডমাস্টারের দেখা না পাই!

—হেডমাস্টার! কেন দাদা?

যদুবাবু এতক্ষণে ভাবিয়া বলিবার একটা রাস্তা খুঁজিয়া পাইয়াছেন। বলিলেন, হেড-মাস্টারের কাছে ব্যাঙ্কের বইখানা রয়েছে কিনা! হেডমাস্টার না থাকলে টাকা তুলব কী করে?

—কারও কাছে চাইলে আপনি দুদিনের জন্যে ধার পেয়ে যাবেন দাদা। আপনার কত বন্ধুবান্ধব সেখানে। এ দায় উদ্ধার করতেই হবে আপনাকে। দিন একটা উপায় করে।

—অবিশ্যি তা পেতাম। কিন্তু আমার যে বন্ধুবান্ধব এখন গরমের সময় কেউ নেই কলকাতায়, দার্জ্জিলিং কি সিমলে পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছে গরমের সময়। কলকাতার বড়-লোক উকিল ব্যারিস্টার সব—গরমের সময় সব পাহাড়ে চলে যাবে। এ কি তুমি-আমি?

—তাই তো দাদা, তবে আমার কী উপায় হবে?—অবনী মুখুজ্জে প্রায় কাঁদো-কাঁদো হইয়া পড়িল।

যদু বলিলেন, কিছু ভেবো না ভায়া। আমি যাচ্ছি কলকাতায়—গিয়ে একটা যা হয় হিল্লে লাগিয়ে দেব। কেন তুমি পয়সা খরচ করে অনর্থক যাবে আমার সঙ্গে? আমি চেষ্টা করে দেখে মনিঅর্ডার করে দেব হাতে পেলেই। আচ্ছা, চলি, দুটো খেয়ে নিই—আর দেরি করা চলে না।

যদুবাবু ঝড়ের বেগে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। মনে মনে বলিলেন, উঃ, কী ছিনেজোঁক রে বাবা! কিছুতেই বাগ মানে না, এত করে ভেবে ভেবে বলি। ভাগ্যিস মনে এল হেড-মাস্টারের কাছে ব্যাঙ্কের খাতার ওই ফন্দিটা!

টিনের সুটকেস হাতে ঝুলাইয়া যদুবাবু তাড়াতাড়ি দুইটি খাইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। পাছে অবনী তাহার মত বদলাইয়া ফেলে! কী ঝঞ্ঝাট, এখন মেসে বসাইয়া উহাকে ক্রেওচার্জ দিয়া খাওয়াও, থিয়েটার বায়স্কোপ দেখাও—কোথায় ব্যাঙ্ক, আর কোথায় বা টাকা!

যদুবাবু শ্রীশ রায়ের মেসে আসিয়া উঠিবার পরে অবনী মুখুজ্জের পর পর তিন-চারিখানা তাগাদার চিঠি পাইলেন। তিনি উত্তর লিখিয়া দিলেন, হেডমাস্টার অনুপস্থিত—টাকা

ধারের কোন উপায় হইল না, সে জন্য তিনি খুব দুঃখিত। তবুও চেষ্টায় আছেন। যদুবাবুর স্ত্রী বেচারীর খোঁটা খাইতে খাইতে প্রাণ যাইতেছে। সে বেচারী লিখিল, পরের বাড়ী এমন করিয়া ফেলিয়া রাখা কি তাঁহার উচিত হইতেছে? কবে তিনি আসিয়া লইয়া যাইবেন? আর সে এক দণ্ডও এখানে থাকিতে চায় না।

যদুবাবু স্ত্রীর পত্রের কোন উত্তর দিলেন না।

যদুবাবুরও খুব দোষ দেওয়া যায় না। স্কুল খুলিবার পর প্রত্যেক মাস্টার মাত্র পনেরো টাকা করিয়া পাইলেন ছুটির মাসের দরুন। তাহার মধ্যে মেসখরচ করিয়া আর হাতে কিছু থাকে না। এদিকে পুরাতন বাড়ীওয়ালা স্কুলে আসিয়া তাগাদা দিয়া গায়ের ছাল ছিঁড়িয়া খাইবার উপক্রম করিতেছে। হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা করিবার ভয় দেখাইয়া গিয়াছে, কেমন ভদ্রলোক সে দেখিয়া লইবে।

চায়ের দোকানের মজলিসে বসিয়া মাস্টারের দল পয়সাকড়ির টানাটানির কথা রোজই আলোচনা করে। কারণ, অবস্থা সকলেরই একরূপ। জ্যোতির্বিনোদ বলিলেন, সামান্য ত্রিশটে টাকা, তাও দু মাস বাকি। সাহেবের কাছে বলতে গেলাম, সাহেব আজ দু টাকা দিলে মোটে।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমাদেরও তো তাই, সংসার অচল।

যদুবাবু বলিলেন, আমার দুর্দ্দশা তো দেখতেই পাচ্ছ। দু বেলা শাসিয়ে যাচ্ছে। ক্ষেত্রভায়া, তোমার ছেলেমেয়ে কোথায় এখন?

—রেখেছিলাম আমার শাশুড়ীর কাছে দু মাস। এখন আবার এনেছি।

নারাণবাবু বলিলেন, আহা, বউমার কথা ভাবলে কী কষ্ট যে পাই মনে। লক্ষ্মীস্বরূপিণী ছিলেন। আমি যেন তাঁর বাবা, তিনি মেয়ে—এমন ব্যবহার করতেন আমার সঙ্গে।

উপস্থিত সকলেই ক্ষেত্রবাবুর স্ত্রী-বিয়োগের কথা স্মরণ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

ক্ষেত্রবাবু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। তাহার নিগূঢ় কারণও ছিল। এই গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি বর্দ্ধমানে তাঁহার জাঠতুতো ভাইয়ের কাছে গিয়াছিলেন। জাঠতুতো ভাই বর্দ্ধমানে রেলে কাজ করেন। বউদিদি সেখানে তাঁহার জন্য একটি পাত্রী ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। পাত্রী-পক্ষ এজন্য তাঁহাকে অনুরোধও করিয়া গিয়াছে। তিনি এখনও মত দেন নাই বটে, কিন্তু এ শনিবার হঠাৎ তাঁহার মন বর্দ্ধমানে যাইতে চাহিতেছে কেন!

চায়ের দোকান হইতে বাহির হইয়া টুইশানিতে যাইবার পূর্ব্বে ক্ষেত্রবাবু ওয়েলেসলি স্কোয়ারে একটু বসিলেন। বেঞ্চিখানাতে আর একজন কে বসিয়া ছিল, তিনি বসিতেই সে উঠিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবু একটু অন্যমনস্ক। পুনরায় বিবাহ করিবার অবশ্য তাঁহার ইচ্ছা নাই। করিবেনও না। তবে আর একটা কথাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বিশেষ কষ্ট। সেই কোন সকালে তিনি স্কুলে চলিয়া আসিয়াছেন। বড় মেয়েটার উপরে সব ভার—তার বয়স এই মাত্র সাড়ে সাত। সে-ই রান্নাবান্না, ছোট ভাই-বোনদের খাওয়ানো-মাখানোর ঝুঁকি ঘাড়ে লইয়া গৃহিণী সাজিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু আজ

যদি একটা শক্ত অসুখবিসুখ হয় কাহারও—কে দেখাশোনা করিবে তাহাদের ? এ সব ভাবিয়া দেখিবার জিনিস।

স্কুলের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হইয়া আসিতেছে। গ্রীষ্মের ছুটির পর দুই মাস চলিয়া গিয়াছে, অথচ ছুটির মাহিনা এখনও সম্পূর্ণ শোধ হয় নাই। সাহেবকে বার বার বলিয়াও কোন ফল হয় না। সাহেবের এক কথা, এ বছর কষ্ট সহ্য করিতে হইবেই। যাহার না পোষায়, সে চলিয়া যাইতে পারে।

একদিন সাহেবের সারকুলার-অনুযায়ী ছুটির পর সাহেবের আপিসে শিক্ষকদের হাজির হইতে হইল। সাহেব বলিলেন, আজ একটা বিশেষ জরুরী মীটিং করা দরকার। থার্ড ক্লাসে গণিতের ফল আদৌ ভাল হইতেছে না, এ বিষয়ে শিক্ষকদের লইয়া পরামর্শ করা নিতান্ত আবশ্যক।

মীটিং চলিল। হতভাগ্য টীচারের দল খালিপেটে শ্রান্তদেহে পাঁচটা পর্য্যন্ত নানারূপ কৌশল উদ্ভাবন করিতে ব্যস্ত রহিল—থার্ড ক্লাসে কী করিয়া অ্যালজেব্রা ভালরূপে শিখানো যায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কোন বৈদেশিক শক্তি যুদ্ধ ঘোষণা করিলে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী এতদপেক্ষা অধিক আগ্রহ ও উদ্যোগ দেখাইতে পারিতেন না তাঁহার ক্যাবিনেট মীটিংয়ে !

পাঁচটা বাজিয়া গেল। তখনও প্রস্তাবের অন্ত নাই। থার্ড ক্লাসের গণিত শিক্ষার ভার-প্রাপ্ত টীচার হতভাগ্য শেখরবাবু ম্লানমুখে বসিয়া শুনিয়া যাইতেছেন, কারণ এ অবস্থার জন্য তিনিই ধর্ম্মত দায়ী। তাঁহার দপ্তরেই এ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। উক্ত ক্লাসের গত দুইটি সাপ্তাহিক পরীক্ষায় গণিতের ফল আদৌ আশাপ্রদ হয় নাই।

সাড়ে পাঁচটার সময় হেডমাস্টার উঠিয়া ধীরে ধীরে গণিতশিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ পাঠ শুরু করিলেন—খাতার বহর দেখিয়া মনে হইল, সাড়ে ছয়টার কমে সে প্রবন্ধ শেষ হইবে না।

হঠাৎ নতুন টীচার দাঁড়াইয়া বলিলেন, স্যার্, আমার একটা কথা বলবার আছে।

হেডমাস্টার প্রবন্ধ পাঠ করিতেছিলেন, থামিয়া মুখ তুলিয়া বিস্মিতভাবে নতুন টীচারের দিকে চাহিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, ইয়েস ?

—স্যার্, ছটা বাজে, মাস্টারেরা সকলেই ক্ষুধার্ত্ত। আজ এই পর্য্যন্ত থাকলে ভাল হয়।

নতুন টীচারের সাহস দেখিয়া সবাই বিস্মিত ও স্তম্ভিত।

হেডমাস্টার বলিলেন, জান মাস্টার, আমি আমার বক্তব্যের মধ্যে কোন বাধাসৃষ্টি পছন্দ করি না ?

—স্যার্, আমায় ক্ষমা করবেন। স্পষ্ট কথা বলবার সময় এসেছে। আপনার এ রকম মীটিং মাস্টারদের পক্ষে বড় কষ্টদায়ক হয়। এতে স্কুলের কাজ হয় না।

—স্কুলের কাজ কি তোমার কাছে আমায় শিখতে হবে ?

—আপনিই ভেবে দেখুন, এতে স্কুলের কী ভাল হচ্ছে? ছাত্র ছেড়ে গিয়েছে, রিজার্ভ ফণ্ড নেই, মাইনে পাই না আমরা নিয়মমত। অথচ আপনি এই সব শিক্ষককে নিয়ে আলোচনা-সভায় প্রহসন করচেন! আপনিই ভেবে দেখুন, এতে কী উপকার হয়? এই সব টীচার মুখ ফুটে বলতে পারেন না; কিন্তু চারটের পর আপনি এঁদের কাছে থেকে ভাল কিছু আশা করতে পারেন কি?

এবার হেডমাস্টারের পালা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইবার। একজন সামান্য বেতনের টীচারের কাছে তিনি এ ধরনের সোজা ও স্পষ্ট কথা প্রত্যাশা করেন নাই। বলিলেন, আমি কতদিন হেডমাস্টারি করছি, তা তোমার জানা আছে?

—তা আমার জানবার দরকার নেই স্যার্। কিন্তু আপনার এই শাসনপ্রণালী যে আদৌ ফলপ্রদ নয়, তা আপনাকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়াতে আপনি আমায় শত্রু ভাববেন না। আমি বন্ধুভাবেই এ কথা বলছি। আপনাকে সদুপদেশ দেওয়ার লোক নেই।

মাস্টারেরা সকলে কাঠের মত বসিয়া আছেন। এমন একটা ব্যাপার তাঁহারা কখনও এ স্কুলে ঘটিতে পারে বলিয়া কল্পনাও করেন নাই। দুই-চারিজন সপ্রশংস দৃষ্টিতে নতুন টীচারের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নতুন টীচার যে এমন চোস্ত ইংরেজী বলিতে পারদর্শী—এ তথ্য আজই তাঁহারা অবগত হইলেন।

হেডমাস্টারের মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন, তুমি কি বলতে চাও আমি স্কুল চালাতে জানি নে?

নতুন টীচার কী একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে নারাণবাবু নতুন টীচারকে বলিলেন, ভায়া, ছেড়ে দাও। আর তর্ক-বিতর্ক ক'রো না। সাহেব যা বলছেন, ওনার ওপর আর কথা বলো না।

আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই সভাতেই সাহেবের সামনে দুই-তিনজন টীচার, তাঁহাদের মধ্যে ক্ষেত্রবাবু ও শ্রীশবাবু আছেন—নারাণবাবুর মধ্যস্থতা করিতে যাওয়ায় স্পষ্টতই বিরক্তি প্রকাশ করিলেন।

পিছন হইতে হেডমৌলবী বলিল, আহা, বলতে দেন ওনাকে নারাণবাবু, বাধা দেবেন না।

আলম বেঞ্চির কোণে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, মুখে কথাটি নাই।

নতুন টীচার বলিলেন, স্যার্, আপনি ভেটারান্ হেডমাস্টার, স্কুল চালাতে জানেন না, তাই কি বলছি? কিন্তু আপনি স্কুলের বাজেট দেখে ব্যয়সঙ্কোচের ব্যবস্থা করুন, দু মাসের মাইনে পাননি যে সব মাস্টার, তাঁদের নিয়ে ছটা পর্যন্ত মীটিং করা কি চলে স্যার্?

নারাণবাবু বলিলেন, থাম ভায়া, থাম।

দুই-তিনজন টীচার একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, নারাণদা, ওঁকে বলতে দিন।

হেডমাস্টার দেখিলেন, সভায় সমবেত মত তাঁহারই বিরুদ্ধে—নতুন টীচারের স্বপক্ষে। তাঁহার নিজের স্কুলে বসিয়া এই তাঁহার প্রথম পরাজয়।

একটা দুর্ব্বল কথা তিনি হঠাৎ বলিয়া বসিলেন। বলিলেন, কেন, চারটের পর আমি

মাস্টারদের জন্যে জলখাবারের ব্যবস্থা তো করে দিই। আজ যদি তোমাদের খিদে পেয়ে থাকে, আমাকে আগে জানালেই আমি ব্যবস্থা করতাম।

সকলেই বুঝিল, হেডমাস্টারের এ উক্তি দুর্বলতাজ্ঞাপক।

নতুন টীচার বলিলেন, সামান্য দু-চারখানা লুচি জলখাবারের কথা ধরি নি স্যার্! সে যাঁরা খেতে চান, তাঁরা খেতে পারেন। আমার বলবার উদ্দেশ্য, মাস্টারদের উপর নানা দিক থেকে অন্যায় হচ্ছে—আপনি এর প্রতিকার করুন।

হেডমাস্টার যে আদৌ দমেন নাই, ইহা দেখাইবার জন্য মুখখানাতে গর্ব্বসূচক হাসি আনিয়া সকলের দিকে একবার চাহিয়া লইয়া বলিলেন, শীগগির তোমরা আমার মতলব জানতে পারবে স্কুলের উন্নতি সম্বন্ধে।—বলিয়াই চশমাটি খুলিয়া ধীরভাবে মুছিয়া ফেলিতে ফেলিতে কৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে বলিলেন, আচ্ছা, এখন আমরা আমাদের প্রবন্ধ পাঠ আরম্ভ করি—কোন্ পর্য্যন্ত পড়েছিলাম তখন? দেখি—

এমন ভাব দেখাইবার চেষ্টা করিলেন, যেন নতুন টীচারের মন্তব্য তিনি গায়েই মাখেন নাই। ও-রকম বহু অর্ব্বাচীনের উক্তি তিনি বহুবার শুনিয়াছেন, কিন্তু ওসব শুনিতে গেলে তাঁহার চলে না।

সাড়ে ছয়টার সময় প্রবন্ধ শেষ হইল। ইতিমধ্যে যদুবাবু কখন খাবারের টাকা লইয়া গিয়াছিলেন, কেহ লক্ষ্য করে নাই—তিন টুকরি লুচি কচুরি আলুর দম কখন আসিয়া পৌঁছিয়া গিয়াছে।

হেডমাস্টার নিজে দাঁড়াইয়া শিক্ষকদের খাওয়ার তদারক করিলেন।

নতুন টীচারের মর্য্যাদা যথেষ্ট বাড়িয়া গেল স্কুলে এই দিনটির পর হইতে। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ক্লার্কওয়েল যার সামনে হঠাৎ নরম হইয়া সরু-সুতা কাটিতে লাগিলেন, তার ক্ষমতা আছে বৈকি।

মিঃ আলম হেডমাস্টারকে বলিলেন, স্যার্, আপনার মুখের উপর তর্ক করে, আপনি তাই সহ্য করলেন কাল? বলুন, আজই পড়ানোর ভুল ধরে রিপোর্ট করে দিচ্ছি, দিন ওর চাকরি খেয়ে।

—নতুন টীচার অত ভাল ইংরেজী বলে, আমি জানতাম না মিঃ আলম। আমি ওর ক্লাস-ওয়ার্ক আগেও দেখেছি। তাকে খারাপ বলা যায় না ঠিক।

—স্যার্, আমার কাল রাগ হচ্ছিল ওর বেয়াদবি দেখে। আর দেখলেন, মাস্টারেরা প্রায় অনেকেই ওকে সাপোর্ট করলে?

—সেটা নিয়ে আমিও ভেবেছি। মাস্টারেরা ঠিকমত মাইনে পায় না বলে অসন্তুষ্ট। অসন্তুষ্ট লোক দিয়ে কাজ হয় না। স্কুলের বাজেটটা সামনের বছর থেকে ব্যালান্স না করাতে পারলে আর এরা সন্তুষ্ট হচ্ছে না।

—স্যার্, কাল কোন্ কোন্ টীচার ওকে সাপোর্ট করেছিল, তাদের নাম আমি লিখে রেখেছি।

—নামগুলো দিয়ো আমার কাছে।

—বলেন তো ওদের ক্লাস-ওয়ার্ক দেখি আজ থেকে। রিপোর্ট করি।

একদিন মিঃ আলম চুপি চুপি সাহেবের কাছে আসিয়া বলিল, স্যার্ মাস্টারেরা, নতুন টীচারকে নিয়ে দল পাকাচ্ছে।

—কে কে ?

—স্যার্, ক্ষেত্রবাবু, যদুবাবু, শ্রীশবাবু, জ্যোতির্বিনোদ, দত্ত, বোস—কেবল নারাণবাবু নয়।

—নারাণবাবু ইজ অ্যান ওল্ড্ লয়্যালিস্ট।

—স্যার্, নতুন টীচারকে নিয়ে দল পাকায়—মোড়েই ওই চায়ের দোকানে রোজ ছুটির পর ওদের মীটিং হয়। নতুন টীচার ওদের দলপতি।

—তোমাকে কে বললে ?

—ক্লার্ক সুবল দে আমায় সব কথা বলে। ও ওদের দলে যোগ দিয়ে শুনে এসে আমায় বলেছে। আমাদের স্কুলের সম্বন্ধে ইউনিভার্সিটিতে নাকি ওরা জানাবে। নতুন টীচারের কে আত্মীয় আছে ইউনিভার্সিটিতে।

—দেখ মিঃ আলম, যে যা পারে করুক। আর ও-সব স্পাইগিরি আমি পছন্দ করি নে। এটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, এর মধ্যে ও-সব দলাদলি, ডার্টি পলিটিক্স,—আই হেট্। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছেলেদের শিক্ষা, স্কুলকে ভাল করব। গড্ ইজ্ অন্ মাই সাইড—

—আমার মনে হয়, ওই নতুন টীচারকে না তাড়ালে স্কুলে দলাদলি আরও বাড়বে। ও-ই ভাঙবে স্কুলটাকে। ও লোক সুবিধের নয়।

কিন্তু এ রিপোর্টে ফল উল্‌টা হইল। সাহেবের কাছে মাস দুইয়ের মধ্যে নতুন টীচারের প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল। মাস্টারেরা সব নতুন টীচারকে লিডার বানাইয়াছে, তাহাদের অভাব-অভিযোগের কথা নতুন টীচারের মুখে ব্যক্ত হয় হেডমাস্টারের কাছে। আজ ইহাকে দুই টাকা আগাম দিতে হইবে, কাল 'টীচার্স এড্ ফণ্ড' হইতে উহাকে পাঁচ টাকা ধার দিতে হইবে—নতুন টীচারকে মুখপাত্র করিয়া সবাই পাঠাইয়া দেয়।

সাহেব বলেন, কী, রামেন্দুবাবু ?

—স্যার্, আজ যদুবাবুকে কিছু আগাম দিতে হবে।

—কেন ? ও-মাসে দেওয়া হয়েছে সাত টাকা।

—ওঁর বড় ঠেকা! দেনা হয়েছে—

—বড় অবিবেচক লোক ওই যদুবাবু। আমি শুনেছি, ও রেস খেলে।

—না স্যার্। রেস খেলার পয়সা কোথায় পাবেন ? মেসে থাকেন এখানে—

মিঃ আলমের কানে কথাটা উঠিল। আজকাল নতুন টীচার সাহেবের কাছে মাস্টারদের জন্ম সুপারিশ করে এবং তাহাতে ফলও হয়। আলম একদিন সুবল দে কেরানীকে বাহিরে একটা চায়ের দোকানে লইয়া গেলেন। বলিলেন, সুবল, এ সব হচ্ছে কী ?

—কী বলুন, স্যার্ ?

—সাহেব নাকি ওই নতুন টীচারের কথা খুব শুনছেন !

—তাই মনে হয় স্যার্। সেদিন জ্যোতির্ব্বিনোদকে দু দিন ছুটি দিলেন ওঁর সুপারিশে।

—কেন, কেন ?

—জ্যোতির্ব্বিনোদের ভাগ্নীর বিয়ে।

—জ্যোতির্ব্বিনোদের ক্যাজুয়াল লিভের হিসেবটা চেক করে কাল আমায় জানিও তো ! বুঝলে ?

—বেশ, স্যার্।

—স্কুলে যা-তা হচ্চে, না ?

কেরানী চুপ করিয়া রহিল। কেরানী মানুষ, বড় টীচারের সামনে যা-তা বলিয়া কি শেষে বিপদে পড়িবে ? মিঃ আলম বলিলেন, তোমার কি মনে হয় ?

—স্যার্, আমরা চুনোপুঁটির দল, আমাদের কিছু না বলাই ভাল।

—নতুন টীচার বড় বাড়িয়েচে, না ?

—হুঁ। তবে একটা কথা—

—কী ?

—স্যার্, নতুন টীচার রামেন্দুবাবু কিন্তু লোকের অসুবিধে বা উপকার এই ধরনের ছাড়া অন্য কথা নিয়ে সাহেবের কাছে যায় না।

—তুমি কি করে জানলে ?

—আমি জানি স্যার্। সেই জন্যেই মাস্টারবাবুরা ওর খুব বাধ্য হয়ে পড়েছেন।

—থাক। তোমায় আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। তুমি কাল জ্যোতির্ব্বিনোদের ক্যাজুয়াল লিভটা চেক করে আমায় জানাবে, কেমন তো ?

—হ্যাঁ স্যার্, তা করে দেব। বলেন তো আজই দিই।

—কালই দেবে।

পরদিন হিসাব করিয়া ধরা পড়িল, জ্যোতির্ব্বিনোদের তিন দিন ছুটি বেশী লওয়া হইয়া গিয়াছে এ বছর। মিঃ আলম সাহেবের কাছে রিপোর্ট করিলেন। জ্যোতির্ব্বিনোদের তিন দিনের বেতন কাটা গেল। মিঃ আলম হাসিয়া নিজের দলের মাস্টারদের বলিলেন, লিডার হলেই হল না। সব দিকে দৃষ্টি রেখে তবে লিডার হতে হয়। স্কুলটাকে এবার উচ্ছন্ন দেবে আর কি ! সাহেবেরও আজকাল হয়েচে যেমন !

•

হেডপণ্ডিত ছুটিপ্রার্থী হইয়া সাহেবের টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়াছেন।

সাহেব মুখ তুলিয়া বলিলেন, হোয়াট পাণ্ডিট্ ?

—স্যার্, কাল তালনবমী, টীচারেরা ও ছেলেরা ছুটি চাচ্ছে।

—টালনব—হোয়াট ইজ্ ভাট পাণ্ডিট্ ? নেভার হার্ড দি নেম্।

—স্যার্, মস্ত বড় পরব হিন্দুর। দুর্গাপুজোর নিচেই—মস্ত পরব।

সাহেব চিন্তা করিয়া বলিলেন, না পণ্ডিত, এ বছর এক শো দিন ছাড়িয়েছে। ইন্‌স্পেক্টর-আপিসে গোলমাল করবে। কী তুমি বলছ টাল—কী?

—তালনবমী।

—ফানি নেম। যাই হোক, এতে ছুটি দেওয়া চলে না।

হেডপণ্ডিত মাস্টারদের শেখানো ইংরেজী আওড়াইয়া বলিলেন, নেক্সট্‌ টু দুর্গাপূজা সার্—গ্রেট্—গ্রেট্—ইয়ে—

'ফেস্টিভ্যাল' কথাটা ভুলিয়া গিয়াছেন, অত বড় কথা মনে আনিতে পারিলেন না।

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, ইয়েস্‌, আণ্ডারস্ট্যাণ্ড্‌—ইউ মিন ফেস্টিভ্যাল—আমি বুঝেছি। হবে না। ক্লাসে পড়াওগে যাও।

সকলেই জানিল, ছুটি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ঠিক শেষ ঘণ্টায় মথুরা চাপরাসীকে সারকুলার-বই লইয়া ক্লাসে ক্লাসে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে দেখা গেল। তাল-নবমীর ছুটি হইয়া গিয়াছে।

মনে সকলেরই খুব স্ফূর্তি। জ্যোতির্বিনোদের ঘরে ছাদের উপর অনেকে আড্ডা দিতে গেলেন। জ্যোতির্বিনোদ বলিলেন, বাব্বা, কাল সেই পাগল বউটার কী কাণ্ড রাত্রে—

হেডপণ্ডিত বলিলেন, কী হয়েছিল?

—আরে, কখনও কাঁদে কখনও হাসে। রাত্রে ছাদে কতক্ষণ বসে রইল। ওর দুই দেওর এসে শেষে ধরে নিয়ে গেল। মারলেও যা।

নারাণবাবু বলিলেন, বড় কষ্ট হয় মেয়েটার জন্যে। ওর অদৃষ্টটাই খারাপ।

যে বাড়ীর বধূর কথা বলা হইতেছে, বাড়ীটা বেশ বড়লোকের, স্কুলের পশ্চিম দিকে, গত ছয় মাসের মধ্যে বাড়ীটাতে অনেকগুলি বিবাহ হইয়াছিল খুব জাঁকজমকের সঙ্গে। সেই হিড়িকে এই মেয়েটিও বধূরূপে ও-বাড়ীতে ঢোকে, কারণ তাহার পূর্ব্বে মাস্টারেরা আর কোন দিন উহাকে দেখেন নাই ও-বাড়ীতে। কিন্তু বিবাহের মাসখানেক পর হইতেই বধূটি কেন যে পাগল হইয়া গিয়াছে, তাহা ইহারা কী করিয়াই বা জানিবেন! তবে বধূটি যে আগে ভাল ছিল, এ ব্যাপার ইহারা স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, হ্যাঁ হে, সেই পার্শী মেয়েটাকে আর তো দেখা যায় না ও-বাড়ীতে!

শ্রীশবাবু বলিলেন, ও-বাড়ীতে অন্য ভাড়াটে এসে গিয়েছে। তারা চলে গিয়েছে।

—কি করে জানলে?

—এই দিন-পনরো থেকে দেখছি, ছাদে বাঙালী মেয়ে গিন্নী পুরুষমানুষ ঘোরে।

পার্শী মেয়েটিকে ইহারা সকলেই প্রায় দুই-বছর ধরিয়া দেখিয়া আসিতে ছিল। তাহার আগে বছর পাঁচেক ও-বাড়ীতে অন্য ভাড়াটে দেখিয়াছিলেন। মেয়েটি ছাদের লোহার চৌবাচ্চার ছায়ায় বসিয়া একমনে পিঠের উপর বেণী ফেলিয়া বসিয়া পড়িত—যেন সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রতিমা। কোন স্কুল বা কলেজের ছাত্রী হইবে। দুপুরে বা বিকালে শতরঞ্জির উপর

একরাশ বই ছড়াইয়া পড়িত—কী একাগ্র মনে পড়িত!

তাহাকে লইয়া মাস্টারদের কত জল্পনা-কল্পনা!

—আচ্ছা, ও কি স্কুলের ছাত্রী?

—কিন্তু ওর বয়স হিসেবে কলেজের বলেই মনে হয়।

—খুব বড়লোক,—না?

—এমন আর কী! ফ্ল্যাট নিয়ে তো থাকে। ওদের চাল খুব বেশী—পার্শী জাতটার—

—বিয়ে হয়েছে বলে মনে হয়?

এই রকম কত কথা! সে তরুণী পার্শী ছাত্রীটি বিবাহিতা হইলেই বা কাহার কী, না হইলেই বা তাহাতে মাস্টারদের কী লাভ! তবু আলোচনা করিয়া সুখ।

অধিকাংশ মাস্টার এ স্কুলে বহুদিন ধরিয়া আছেন—দশ, তেরো, আঠারো, বিশ বছর। এই উঁচু তেতলার ছাদ হইতে চারি পাশের বাড়ীগুলিতে কত উত্থান পতন পরিবর্ত্তন দেখিলেন। অনেকে বাড়ী যাইতে পান না পয়সার অভাবে, যেমন জ্যোতির্বিনোদ, কি নারাণবাবু, কিংবা মেস্-পালিত শ্রীশবাবু—গৃহস্থবাড়ীর মা, বোন, মেয়ে, ইহাদের চলচ্চিত্র মাত্র এত উঁচু হইতে দেখিতে পান এবং দেখিয়া কখনও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন নিজেদের নিঃসঙ্গ জীবনের কথা ভাবিয়া, কখনও আনন্দ পান, কখনও পরের দুঃখে দুঃখিত হন, উদ্বিগ্ন হন। এই চলিতেছে বহুদিন ধরিয়া।

এ এক অদ্ভুত জীবনানুভূতি—দূর হইয়াও নিকট, পর হইয়াও আপন, অথচ যে দূর সে দূরই, যে পর সে পরই। অনেক কুশ্রী ঘটনাও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ওই লাল বাড়ীটাতে নয় বৎসর আগে এক মেয়ে একটি ছেলের সঙ্গে পলাইয়া গিয়াছিল, এদিকের ওই বাড়ীটাতে প্রৌঢ়া গৃহিণীকে প্রত্যেকদিন—থাক, সে সব কথায় দরকার নাই।

কত দুঃখের কাহিনীও এই সঙ্গে মনে পড়ে। ওই পুবদিকের হলদে দোতলা বাড়ীটাতে আজ প্রায় সাত-আট বছর আগে স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে আত্মহত্যা করে। এতদিন পরেও সে কথা টিফিনের ছুটির সময় মাঝে মাঝে উঠে। বেকার স্বামী, পরিবার প্রতিপালন করিতে না পারিয়া স্ত্রীর সঙ্গে মিলিয়া বেকার-জীবনের অবসান করে।

সে সব দিনে ক্লার্কওয়েল সাহেব ছিল না। ছিলেন সুধীর মজুমদার হেডমাস্টার। অনুকূলবাবুর পরের কথা।

হেডপণ্ডিত বলেন, অনেকদিন হয়ে গেল এ স্কুলে যদু ভায়া, কী বল? সেই বউবাজার স্কুল ভেঙে এখানে আসি—মনে পড়ে সে-কথা? হেডমাস্টারের নাম কী ছিল যেন—শশিপদ কী যেন? আমার আজকাল ভুল হয়ে যায়, নাম মনে আনতে পারি নে।

যদুবাবু বলেন, শশিপদ রায় চৌধুরী। বউবাজার থেকে তারপর রাণী ভবানীতে গিয়েছিলেন, মনে নেই?

'—আমরা তো স্কুল ভেঙে গেলে চলে এলুম। শশীবাবুর আর কোন খোঁজ রাখি নে। এ স্কুলে তখন অনুকূলবাবু হেডমাস্টার। ওঃ অমন লোক আর হয় না। আমাদের নারাণদাদা

সেই আমলের লোক, না দাদা ?

নারাণবাবু বলেন, আমি তারও কত আগের। তুমি আর যদু এসেচ এই আঠারো বছর, আমি তারও বারো বছর আগে থেকে এখানে। অনুকূলবাবুতে আমাতে মিলে স্কুল গড়ি।

ক্ষেত্রবাবু বলেন, আপনারা গড়লেন স্কুল, এখন কোথা থেকে মিঃ আলম আর সাহেব এসে নবাবী করচে দেখ।

নারাণবাবু বলেন, আমি কিছু নই, অনুকূলবাবু গড়েন স্কুল। তাঁর মত ক্ষমতা যার-তার থাকে না। অনুকূলবাবুর মত লোক হচ্ছে এই সাহেব। সত্যিকার ডিউটিফুল হেডমাস্টার হিসেবে সাহেব অনুকূলবাবুর জুড়িদার। লেখাপড়া শেখে সবাই, কিন্তু অন্যকে শেখানো সবাই পারে না। যে পারে, তাকে বলে টীচার। তুমি আমি টীচার নই—টীচার ছিলেন অনুকূলবাবু, টীচার হল এই সাহেব।

হেডপণ্ডিত বলেন, না, দাদা, আপনি টীচার নিশ্চয়ই। আমরা না হতে পারি—

নারাণবাবু বলেন, অত সহজে টীচার হয় না। এই শুনবে তবে অনুকূলবাবুর দু-একটা ঘটনা ? একবার একটা ছেলে এল, তার বাবা বর্ম্মায় ডাক্তারি করে, দু'পয়সা পায়। ছেলেটাকে আমাদের স্কুলে দিয়ে গেল বাংলা শিখবে বলে। বর্ম্মী ভাষা জানে, বাংলা ভাল শেখে নি। পয়সাওলা লোকের ছেলে, বদমাইশও খুব। স্কুল পালায়, বাবা মোটা টাকা পাঠায়—সেই টাকায় থিয়েটার দেখে, হোটেলে খায়, পড়াশুনোয় মন দেয় না।

—এখানে থাকে কোথায় ?

—থাকে তার আত্মীয়-বাড়ী। সেই ছেলের জন্যে অনুকূলবাবুকে রাতের পর রাত বসে ভাবতে দেখেচি। আমায় বললেন—নারাণ, মারধোর বা বকুনিতে ওকে ভাল করা যাবে না। উপায় ভাবচি। তারপর ভেবে করলেন কী, রোজ সেই ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বার হতেন আর মুখে মুখে গল্প করতেন পাপের দুর্দ্দশা, অধঃপতনের ফল—এই সব সম্বন্ধে। গল্প নিজেই বসে বসে বানাতেন রাত্রে। আমায় আবার শোনাতেন পয়েন্টগুলো। সেই ছেলে ক্রমে শুধরে উঠল, ম্যাট্রিক পাস করে বেরুল। তার বাবা এসে অনুকূলবাবুকে একটা সোনার ঘড়ি দেয় ছেলে পাস করলে। অনুকূলবাবু ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, আমায় এ কেন দিচ্ছেন ? আমার একার চেষ্টায় ও পাস করে নি, আমার স্কুলের অন্যান্য মাস্টারের কৃতিত্ব না থাকলে আমি একা কী করতে পারতাম ? তা ছাড়া, আমি কর্ত্তব্য পালন করেচি, ভগবানের কাছে আপনার ছেলের জন্যে আমি দায়ী ছিলাম, কারণ আমার স্কুলে তাকে ভর্ত্তি করেছিলেন। সে দায়িত্ব পালন করেচি, তার জন্যে কোন পুরস্কারের কথা ওঠে না।—আজকাল ক'জন শিক্ষক তাঁদের ছাত্রের সম্বন্ধে একথা ভাবেন বলুন দিকি ? আদর্শ শিক্ষক বলতে যা বোঝায়, তা ছিলেন তিনি। আমাদের সাহেবকে দেখি, অনেকটা সেইরকম ভাব ওঁর মধ্যে।

ক্ষেত্রবাবু ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, দাদা, এতক্ষণ অনুকূলবাবুর কথা বলছিলেন, বেশ লাগছিল। আবার তাঁর সঙ্গে সাহেবের নাম করতে যান কেন ?

নারাণবাবু গম্ভীর মুখে বলিলেন, কেন করি, তোমরা জান না—আই নো এ রিয়াল টীচার হোয়েন দেয়ার ইজ ওয়ান—আমার কথা শোন ভায়া, সাহেবকে তোমরা অনেকেই চেন নি।

শিক্ষকের দল পরস্পরের কাছে বিদায় গ্রহণ করিলেন; কারণ সকলেরই টুইশানির সময় হইয়াছে।

পূজার ছুটির মাসখানেক দেরি। স্কুলের অবস্থা খুবই খারাপ। হেডমাস্টার সারকুলার দিলেন যে, যে মাস্টারের নিতান্ত দরকার, তাহারা আসিয়া জানাইলে কিছু কিছু টাকা দেওয়া হইবে, বাকী শিক্ষকদের ছুটির পর স্কুল খোলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে মাহিনা লওয়ার জন্য।

স্কুলে শিক্ষকদের মধ্যে হট্টগোল পড়িয়া গেল।

যদুবাবু বলিলেন, এ সারকুলারের মানে কী হে ক্ষেত্র-ভায়া? আমাদের মধ্যে কে তালেবর আছে, যার টাকার দরকার নেই?

ক্ষেত্রবাবু সে সব কিছু জানেন না, তবে তাঁহার নিজের টাকার দরকার এটুকু জানেন।

শ্রীশবাবু বলিলেন, তোমার যেমন দরকার, গরীব মাস্টার—পূজোর সময় শুধু হাতে বাড়ী যেতে হবে সারা বছর খেটে—সকলেরই দরকার। রামেন্দুবাবুকে সকলে বলা যাক।

কিন্তু শোনা গেল, টাকা আদৌ নাই! আশামত আদায় হয় নাই। যা আদায় হইয়াছে, বাড়ীভাড়া আর কর্পোরেশন-ট্যাক্স দিতেই হইবে, যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকিবে নিতান্ত অভাবগ্রস্ত শিক্ষকদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

সেদিন টীচারদের ঘরে হঠাৎ মিঃ আলমের আগমনে সকলে বিস্মিত হইল। মাস্টারদের বসিবার ঘরে মিঃ আলম বড় একটা আসেন না।

মিঃ আলমকে দেখিয়া মাস্টারেরা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। যে বসিয়াছিল সে উঠিয়া দাঁড়াইল, যে শুইয়াছিল সে সোজা হইয়া বসিল।

মিঃ আলম হাসিমুখে চারদিকে চাহিয়া বলিলেন, বসুন, বসুন।

তারপর ধীরে ধীরে নিজের আগমনের উদ্দেশ্য পাড়িলেন। হেডমাস্টারের এই যে সারকুলার, এ নিতান্ত জুলুমবাজি। কাহার টাকার জন্য কে এখানে খাটিতে আসিয়াছে?

সকলে এ উহার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। মিঃ আলম সাহেবের বিশ্বাসী লেফটেন্যান্ট, তাহার মুখে এ কী কথা? সাহেবের স্পাই হিসাবেও মিঃ আলম প্রসিদ্ধ। কে কী কথা বলিবে তাহার সামনে?

মিঃ আলম বলিলেন, না, সাহেবকে দিয়ে এ স্কুলের আর উন্নতি নেই। আমি আপনাদের কো-অপারেশন চাই। আমার সঙ্গে মিলে সবাই সাহেবের বিরুদ্ধে সেক্রেটারির কাছে আর প্রেসিডেন্টের কাছে চলুন। স্কুলের যা আয়, তাতে মাস্টারদের বেশ চলে যায়। সাহেব আর মেম পুষতে সাড়ে চার শো টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। এ স্কুলের হাতী পোষার ক্ষমতা

নেই। আসুন, আমরা ম্যানেজিং কমিটীকে জানাই।

যদুবাবু প্রথমে কথা বলিলেন। তাঁহার ভাব বা আদর্শ বলিয়া জিনিস নাই কোন কালে, সুবিধা বা স্বার্থ লইয়া কারবার। তিনি বলিলেন, ঠিক বলেছেন মিঃ আলম। আমিও তা ভেবেছি।

মিঃ আলম বলিলেন, আর কে কে আমাকে সাহায্য করতে রাজী?

জ্যোতির্বিনোদের রাগ ছিল হেডমাস্টারের উপর, বলিলেন, আমি করব।

যদুবাবু বলিলেন, আমিও।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমিও।

শ্রীশবাবুও সাহায্য করিতে রাজী।

কেবল নতুন টীচার ও নারাণবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

মিঃ আলম বলিলেন, কী রামেন্দুবাবু, আপনি কী বলেন?

নতুন টীচার বলিলেন, আমি দু বছর প্রায় হল এ স্কুলে এসেছি, যা বুঝেছি এ স্কুলের উন্নতি নেই। স্কুলের বাজেট যিনি দেখেছেন, তিনিই এ কথা বলবেন। মিঃ আলম যা বলেছেন, তা খুবই ঠিক।

—তা হলে আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

—কী জন্তে সাহায্য চান?

—টু রিমুভ দি প্রেজেন্ট হেডমাস্টার। আশী টাকার হেডমাস্টার রাখলে স্কুল চলে যায়, মেমের কী দরকার? ওতে ছেলে বাড়চে না যখন, তখন হাতী পোষা কেন? আমরা অনাহারে আছি, আর সাহেব মেম সাড়ে চারশো টাকা নিয়ে যাচ্ছে!

—ঠিক কথা।

—তবে আপনি কি করবেন?

—আমি এতে নেই।

—কেন?

—প্রকাশ্য ভাবে প্রতিবাদ করি বলে গোপনে শত্রুতা করতে পারব না, মাপ করবেন মিঃ আলম। তবে আমি নিউট্রাল থাকব, কারও দিকে হব না—এ কথা আপনাকে দিতে পারি।

—বেশ, তাই থাকুন। নারাণবাবু?

—আমি বুড়ো মানুষ, আমায় নিয়ে কেন টানাটানি করেন মিঃ আলম? আপনি জানেন, আমি নির্বিরোধী লোক। আমায় আর এর মধ্যে জড়াবেন না।

—অন্য সব টীচারের মুখের দিকে চেয়ে রাজী হোন নারাণবাবু। আপনি হেডমাস্টার হোন, খুব খুশী হব সবাই। এঁদের মধ্যে কেউ নেই, যিনি তাতে অমত করবেন। কিংবা রামেন্দুবাবু হেডমাস্টার হোন—কারও আপত্তি হবে না।

সকলে সমস্বরে এ প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

এই দিনটির পরে মিঃ আলমের চক্রান্ত রোজই চলিতে লাগিল। মাস্টারদের মধ্যে

স্বার্থান্বেষী, প্রিন্সিপল-বিহীন যাঁহারা (যেমন যদুবাবু), মিঃ আলমের দলে যোগ দিয়াছেন ; ক্ষেত্রবাবু ও শ্রীশবাবু মনে মনে মিঃ আলমের দলে আছেন, মুখে কিছু বলেন না। কেবল নারাণবাবু ও নতুন টীচার রামেন্দু দত্ত নিরপেক্ষ, কোন দলেই নাই।

ইহাদের মিটিং প্রতি দিন ছুটির পর তেতলার ঘরে হয়—নতুন টীচার ও নারাণবাবু সেখানে থাকেন না।

এই অবস্থার মধ্যে আসিল পূজার ছুটির সপ্তাহ। শনিবারে ছুটি হইবে। ছেলেরা ক্লাসে ক্লাসে ছুটির দিন শিক্ষকদের জলযোগের ব্যবস্থা করিতেছে। শিক্ষকদের মধ্যে কেহ কেহ গোপনে তাহাদের উসকাইয়া না দিতেছেন এমন নয়।

—কী রে, পড়াশুনা কিছুই হয় নি কেন ? গ্রামার মুখস্থ ছিল, টাস্ক ছিল, কিছু করিস নি ? খাওয়াতে ব্যস্ত আছিস বুঝি ? কি ফর্দ্দ করলি এবার ?

ফর্দ্দ শুনিয়া যদুবাবু উদাসীন ভাবে বলিলেন, এ আর তেমন কী হল—এবার থার্ড ক্লাসে যা করবে, শুনে এলুম—

ক্লাসের চাঁই বালকেরা সাগ্রহ কলরবে বলিয়া উঠিল, কী স্যার্—কী স্যার্—?

—আইসক্রীম, লুচি, আলুর দম, হরি ময়রার কড়াপাকের সন্দেশ—

—স্যার্, আমরাও করব আইসক্রিম।

—হরি ময়রার সন্দেশ স্যার্, কোথায় পাওয়া যায় ?

—সে আমি তোদের এনে দেব, ভাবনা কী ! পয়সা দিস আমার হাতে।

—কালই দেব চাঁদা তুলে।

—স্যার্, আপনার হাতে আমরা দশ টাকা দেব, আপনি যাতে থার্ড ক্লাসের চেয়ে ভাল হয়, তা কিন্তু করবেন।

থার্ড ক্লাসে গিয়া যদুবাবু বলিলেন, ওঃ, ছুটির টাস্কটা সবাই লিখে নে, ভুলে গিয়েছি একেবারে। তোদের এবার কী বন্দোবস্ত হচ্ছে রে ? কিন্তু এবার ফোর্থ ক্লাসে যা হচ্ছে, তার কাছে তোরা পারবি নে।

শ্রীশবাবু ও জ্যোতির্বিনোদ অন্য অন্য ক্লাসে উস্কাইলেন। প্রতি বৎসর ক্লাসে ক্লাসে টেক্কা দিবার চেষ্টা করে।

ছুটির পর হেডমাষ্টারের ঘরে নতুন টীচার গিয়া টেবিলের সামনে দাঁড়াইলেন।

—স্যার্, আপনার সঙ্গে গোপনীয় কথা আছে—কখন আসব ?

—ও, মিঃ দত্ত ! তুমি সন্ধ্যার পর এসো—আজ আর টুইশানিতে যাব না।

—বেশ।

ছুটির পর প্রায় দেড় ঘণ্টা মাস্টারেরা থাকিয়া ছেলেদের সেকেণ্ড টার্মিনাল পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করিলেন, প্রোগ্রেস্-রিপোর্ট লিখিলেন, বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সিজিল-মিছিল করিলেন—বড় একটা ছুটির আগে অনেক কাজ। অথচ সকলেই জানে, ছুটির মাহিনা কেহ পাইবে না। এই শারদীয় পূজার সময়ে সকলকে শুধু হাতে বাড়ী যাইতে হইবে—উপায় নাই।

ইহা যে স্বার্থত্যাগ-প্রণোদিত ব্যাপার তাহা নহে, নিরুপায়ে পড়িয়া মার খাওয়া মাত্র। এ চাকরি ছাড়িলে কোন্ স্কুলে হঠাৎ চাকরি মিলিতেছে ?

সন্ধ্যার পর নতুন টীচার হেডমাস্টারের নিজের বসিবার ঘরের দরজায় কড়া নাড়িলেন।

—হ্যাঁ, এস। কাম্ ইন্—

নতুন টীচার ঢুকিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

—বোস মিঃ দত্ত, বোস। এক পেয়ালা চা ?

—না, ধন্যবাদ। এই খেয়ে আসছি। মিস্ সিবসন্ কোথায় ?

—উনি আজকাল পড়াতে বেরোন। ভাল টুইশানি পেয়েছেন—পঞ্চকোটের রাজকুমারীকে এক ঘণ্টা ইংরিজী পড়াতে—

—ও !

—কী কথা বলবে বলছিলে ?

নতুন টীচার পকেট হইতে একটা কাগজ বাহির করিলেন। গলা ঝাড়িয়া বলিলেন, স্যার্, আপনি এবার কি কিছু দেবেন না আমাদের মাইনে ?

—তোমায় তো সব দেখিয়েছি মিঃ দত্ত। স্কুলের আর্থিক অবস্থা তুমি আর মিঃ আলম জান, আর জানে নারাণবাবু। বেশী লোককে বলে কোনও লাভ নেই। স্কুলকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছি প্রাণপণে। বাড়ীওলা নালিস করবে শাসিয়েছিল—তার পাঁচ শো টাকা দিতে হয়েছে। মিস্ সিবসন্‌কে দেড় শো টাকা দিতে হবে, উনি দার্জ্জিলিং যাচ্ছেন। কিন্তু তার মধ্যে মোটে পঁচাত্তর দিতে পারছি। আমি এক পয়সা নিচ্ছি নে। এ আমাদের স্ট্রাগলের বছর, এ বছর যদি সামলে উঠি—সামনের বছরে হয়তো সুদিন আসবে। সকলকেই স্বার্থত্যাগ করতে হবে, কষ্ট স্বীকার করতে হবে এ বছরটাতে। বুঝলে না ?

—হ্যাঁ স্যার্।

—তুমি কিছু চাও ? কত দরকার বল ?

—না স্যার্। আমি একরকম ম্যানেজ করে নেব। ধন্যবাদ স্যার্। এই ক'জনকে কিছু কিছু দিতেই হবে, যে করে হোক ম্যানেজ করুন।

নতুন টীচার হাতের কাগজ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, ক্ষেত্রবাবু কুড়ি টাকা, জ্যোতির্বিনোদ পনেরো টাকা, শ্রীশবাবু আঠারো টাকা, হেডপণ্ডিত দশ টাকা, যদুবাবু কুড়ি—

সাহেব কুইনাইন সেবনের পরের অবস্থার মত মুখখানা করিয়া বলিলেন, ও, দীজ আর দি ট্রাবল্-মেকারস্—

—না স্যার্, এদের না হলে চলবে না। এদের অবস্থা সত্যিই খারাপ—প্রত্যেকেরই বিশেষ দরকার আছে। জ্যোতির্বিনোদের বাড়ী পৈতৃক পুজো, তাঁকে বাড়ী যেতে হবে ভাড়া চাই। ক্ষেত্রবাবুর আবশ্যক আমি ঠিক জানি নে, তবে তাঁরও দরকার জরুরী। হেডপণ্ডিত পুজো করতে যাবেন দক্ষিণে শিষ্যবাড়ী। কাপড়চোপড় নেই, কিনবেন। যদুবাবু—

—দি কানিং ওল্ড্ ফক্স্—

—যদুবাবুর স্ত্রী আজ তিন-চার মাস পড়ে আছেন জ্ঞাতির বাড়ী, তাঁদের সেখান থেকে না আনলে নয়—তাঁরা চিঠি লিখছেন কড়া কড়া। ট্রেনভাড়া খরচ চাই—

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, তোমার কাছে সবাই বলে, তোমাকে ধরেছে আমাকে বলতে। বুঝলাম।

—হাঁ, স্যার্।

—টাকা আমি যে করে হয় ম্যানেজ করব, তুমি যখন বলছ। তুমি নিজের জন্যে কিছু নেবে না?

—না স্যার্। আমার দুটো টুইশানির টাকা পাব—একরকম করে চালিয়ে নেব এখন। এখনও তো কত মাস্টারকে কিছু দেওয়া হচ্ছে না। শুধু এই ক'জনের নিতান্ত জরুরী দরকার, তাই—

—বেশ, কাল ওদের ব'লো, টাকা দিয়ে দেব যে করেই হোক।

—আর একটা কথা স্যার্, যদি জানুয়ারি মাসে সুবিধে হয়, জ্যোতির্বিনোদের কিছু মাইনে বাড়িয়ে দিতে হবে। বড় গরীব।

—কেন, ওকে আমরা যা দিই, ওর বিদ্যাবুদ্ধির পক্ষে তা যথেষ্ট নয় কি?

—না স্যার্। ওর প্রতি অবিচার করবেন না। গরীব বড়—

—কিন্তু বড় ফাঁকিবাজ, ক্লাসে কিছু করে না। আরও দু-চার জন আছে ফাঁকিবাজ। তুমি ভাব, আমি তাদের চিনি নে? স্কুলের অবস্থা ভাল না বলে কিছু বলি নে। আচ্ছা, তোমার কথা মনে রইল, জানুয়ারি মাসে বেশী ছেলে ভর্ত্তি হলে থার্ড পণ্ডিতের কেস আমি বিবেচনা করব।

নতুন টীচার বিদায় লইলেন।

যদুবাবু সত্যই বিপদে পড়িয়াছেন।

গত গ্রীষ্মের ছুটিতে স্ত্রীকে সেই যে গ্রামে শরিকের বাড়ী রাখিয়া আসিয়াছিলেন, অর্থাভাবে তাহাকে আনিতে পারেন নাই। অবনী মুখুজ্জেকে টাকা ধার দিবেন বলিয়াছিলেন, সে অন্ত তিন মাস ধরিয়া তাগাদার উপর তাগাদা দিয়া আসিয়াছে—নানা ছল-ছুতা, সত্য-মিথ্যা নানারূপ স্তোকবাক্যে তাহাকে কতদিন ঠেকাইয়া রাখিয়াছেন। যদুবাবুর স্ত্রী লিখিল, তুমি অবনী ঠাকুরপোকে টাকা দিবার কথা নাকি বলিয়া গিয়াছিলে, সে একদফা নিজে, একদফা তাহার দিদি ও স্ত্রীর দ্বারা আমার গায়ের ছাল খুলিয়া ফেলিতেছে, তোমার কাছে টাকা ধারের সুপারিশ করিতে। তুমি কোথা হইতে টাকা দিবে জানি না। তবে এমন বলিলেই বা কেন, তাহাও ভাবিয়া পাই না। যদি টাকা দিতে না পার, তবে আমাকে এখান হইতে সত্বর লইয়া যাইবে। ইহাদের খোঁটা ও গঞ্জনা আর আমার সহ্য হয় না।

যদুবাবু স্ত্রীকে স্তোকবাক্য দিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, সে আজ দেড় মাসের কথা। তারপর স্ত্রীর যত চিঠি আসিয়াছে, তাহার কোন উত্তর দেন নাই।

দিবেনই বা কী করিয়া, স্কুলে দুই মাস খাটিয়া এক মাসের মাহিনা পাওয়া যায়—মাসের উনত্রিশ তারিখে গত মাসের মাহিনা যদি হইল, তবে মাস্টারেরা ভাগ্য প্রসন্ন বিবেচনা করেন! মেসের দেনা ঠিকমত দেওয়া যায় না—টুইশানি ছিল, তাই চলে! স্ত্রীকে ইহার মধ্যে আনেন কোথায়, বাসা করিবার খরচ জুটাইবেন কোথা হইতে, বলিলেই তো হইল না!

শনিবার পূজার ছুটি হইবে, আজ বৃহস্পতিবার। যদুবাবু টুইশানি করিয়া ফিরিবার পথে ভাবিতেছিলেন, ছুটিতে কি বেড়াবেড়ী যাইবেন? রামেন্দুবাবুকে ধরিয়াছেন, হেডমাস্টারকে বলিয়া-কহিয়া অন্তত কুড়ি টাকা যাহাতে পাওয়া যায়। রামেন্দুবাবুর কথা আজকাল সাহেব বড় শোনে।

কিন্তু তা যেন হইল। এই সামান্ত টাকা হাতে সেখানে গিয়া কী করিবেন? স্ত্রীকে আনিয়া কোথায়ই বা রাখেন? অর্থকষ্টের বাজারে বাসা করিবেনই বা কোন্ সাহসে, হাওয়ায় ভর করিয়া দাঁড়াইয়া এত ঝুঁকি লওয়া চলে না।

আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে যদুবাবু মেসের দরজায় ঢুকিতেই মেসের একটি লোক বলিয়া উঠিল—একটি ভদ্রলোক আপনার জন্তে অপেক্ষা করছেন অনেকক্ষণ থেকে। শ্রীপদ এখনও ছেলে পড়িয়ে ফেরেন নি, আপনাদের ঘরে আমি বসিয়ে রেখেছি আপনার সীটে।

যদুবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আমার জন্যে? কোথা থেকে—

—তা তো জিগ্যেস করি নি। দেখুন না গিয়ে, আপনার সীটেই বসে আছেন। বললেন—এখানে খাব। আমি আবার ঠাকুরকে বলে দিলাম যদুবাবুর ফ্রেণ্ড খাবে। নইলে রান্নাবান্না হয়ে যাবে, আপনি যখন ফিরবেন।

যদুবাবু দুরু দুরু বক্ষে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া নিজের ঘরে ঢুকিতেই সম্মুখের সীট হইতে অবনী মুখুজ্জে দাঁত বাহির করিয়া একগাল কৃতজ্ঞতার হাঁসি হাসিয়া বলিল, আসুন দাদা—এই যে! প্রণাম। ওঃ, কতক্ষণ থেকে বসে আছি!

যদুবাবুর হৃদ্‌স্পন্দন যেন এক সেকেণ্ডের জন্য থামিয়া গেল। চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। তখনই কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, আরে, অবনী যে! এস এস ভায়া। তার পর, সব ভাল? তোমার বউদিদি ভাল তো?

—হেঁ হেঁ দাদা, সব একরকম আপনার আশীর্ব্বাদে—

—বেশ বেশ।

—তারপর দাদা এলাম, বলি, যাই দাদার কাছে। জঙ্গলে পড়ে থাকি, দুদিন মুখ বদলানো হবে, আর শহরে দেখে-শুনে আসিগে যাই থিয়েটার বায়োস্কোপ। দিন পনেরো কাটিয়ে আসি পুজোর মহড়াটা। ম্যালেরিয়ায় শরীর জরজর, একটু গায়ে লাগুক—দাদা যখন আছেন।

যদুবাবু পুনরায় কাষ্ঠহাসি হাসিলেন, তা বেশ তা বেশ! তবে—

—তারপর, আপনার কাছে বলতে লজ্জা নেই দাদা—ধার করে গাড়ীর ভাড়াটি কোনক্রমে যোগাড় করে তবে আসা। হাতে কানা-কড়িটি নেই। বাড়ীতে আপনার বউমার, ছেলেপুলের পরনে কাপড় নেই কারও—বছরকার দিন, পুজো আসচে। নিজেরও—দাদা, এই দেখুন না, সাত পুরনো ধুতি, তাই পরে তবে—। বলি, যাই—দাদার কাছে, একটা হিল্লে হয়েই যাবে। আপাতত গোটা কুড়ি টাকা নিয়ে কাপড়গুলো তো কিনে রাখি। এর পর বাজার আক্রা হয়ে যাবে কিনা!

যদুবাবুর কপাল ঘামিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার রুদ্ধ কণ্ঠ হইতে কী একটা কথা অস্ফুটভাবে উচ্চারিত হইল, ভাল বোঝা গেল না। অবনী তাহাকেই সম্মতিসূচক বাণী ধরিয়া লইয়া বলিল, না, কালই সকালে টাকাটা নিয়ে বাজার করে নিয়ে আসি। আর আপনি না দিলেই বা যাচ্ছি কোথায় বলুন। আপনার ওপর জোর খাটে বলেই তো আসা। না হয় বকবেন, না হয় মারবেন—কিন্তু ছোট ভাইয়ের আবদার না রেখে তো পারবেন না—হেঁ হেঁ—

যদুবাবু বেচারী সারাদিন খাটিয়াছেন, সেই কোন্ সকালে দুইটি খাইয়া বাহির হইয়াছিলেন। রাত দশটা, এখন কোথায় খাইয়া ঘুমাইবেন, এ উপসর্গ কোথা হইতে আসিয়া জুটিল বল তো।

পাড়াগাঁয়ের দূরসম্পর্কের জ্ঞাতি, দেখাশুনা ঘটিত কালেভদ্রে, এখন মাখামাখি করিতে গিয়া মুশকিলেই পড়িয়া গেলেন। পাড়াগাঁয়ের লোকের সঙ্গে বেশী মাখামাখি করিতে নাই—ইহারা হাত পাতিয়াই আছে। পাড়াগাঁয়ের লোকের এ স্বভাব তিনি জানিতেন না যে তাহা নয়, কিন্তু বহুদিন কলিকাতায় থাকার দরুন ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাই আজ এ দুর্দশা। বলিলেন, চল, এস খাবে।

যদুবাবুর ঘরে সাতটি সীট—অর্থাৎ মেঝেতে ঢালা বিছানা পাতিয়া পাশাপাশি সাতটি ক্লান্ত প্রাণী শয়ন করে। তাহার মধ্যে অবনীকে গুঁজিয়া কোন রকমে শোওয়া চলিল। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের লোক, সকলের সম্মুখে অভাব অভিযোগের কথা উচ্চৈঃস্বরে ব্যক্ত করিতে লাগিল। আর এত বকিতেও পারে! 'হাঁ হাঁ' দিতে দিতে যদুবাবুর মুখ ব্যথা হইয়া গেল।

সকালে উঠিয়া অবনীর জন্ত চা ও খাবার আনাইয়া দিয়া যদুবাবু মেসের বাজার করিতে বাহির হইলেন, কারণ বাজার জিনিসটা তিনি করেন ভালই, এবং ইহা হইতে দুই-চারি আনা লাভও রাখিতে জানেন নিজের জন্ত।

স্কুলে বাহির হইতে যাইবেন অবনী জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, কখন আসচেন?

—কাল যে সময় এসেছিলাম, রাত হবে।

অবনী সকলের সামনেই বলিয়া বসিল, তা হলে দাদা, কাপড়ের টাকাটা আমার দিয়ে যান, আজই কাপড়গুলো কিনে রাখি। আর ওবেলা ভাবছি বায়োস্কোপ দেখব, তার দরুনও কিছু দিন, আমার ট্যাঁক যাকে বলে গড়ের মাঠ কিনা! হ্যা—হ্যা—

যদুবাবু তিন-চারজন মেস্-বন্ধুর সামনে কী বলিবেন ! বলিলেন, আমি এসে দেব এখন, এখন তো—। ইহাতে অবনী চেঁচাইয়া আবদারের সুরে বলিয়া উঠিল, না দাদা, তা হবে না। আপনি দিয়েই যান—

যদুবাবু ফাঁপরে পড়িলেন। টাকা দিবেন কোথা হইতে ? কুড়ি টাকা স্কুল হইতে লইবার সুপারিশ ধরিয়াছেন—হয়ত শনিবারের আগে সেই একমাত্র সম্বল কুড়িটি টাকাও হাতে পাওয়া যাইবে না। টুইশানির টাকা হয়তো ও-বেলা মিলিবে। অবশ্য টাকা হাতে আসিলে অবনীকে তিনি দিবেন না নিশ্চয়ই, তাঁহার নিজের খরচ নাই ? বলিলেন, এস, বাইরে আমার সঙ্গে।

পথে গিয়া বলিলেন, অমন করে সকলের সামনে বলতে আছে, ছিঃ ! টাকা হাতে থাকলে তোমায় দিতাম না ?

অবনী অনুযোগের সুরে বলিল, খা রে ! আপনাকে তো কাল রাত থেকে বলছি। সত্যি দাদা, হাতে কিছুই নেই, চা-জলখাবারের পয়সাটি পর্য্যন্ত নেই। শুধু আপনার ভরসায় এখানে আসা—

—এই রাখ দু আনা পয়সা—চা খাবার খেয়ো। আমি স্কুল থেকে ফিরি, তারপর বলব। চললাম, বেলা হয়ে যাচ্ছে—

স্কুলে বসিয়া যদুবাবু আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। যখন আসিয়া পড়িয়াছে অবনী, তখন হঠাৎ এক-আধ দিনে চলিয়া যাইবে না। উহার স্বভাবই ওই, টাকা না লইয়া যাইবে না। দুই বেলা আট আনা ফ্রেণ্ড-চার্জ দিয়া উহাকে বসাইয়া খাওয়াইতে গেলে যদুবাবু স্কুল হইতে যে কয়টি টাকা পাইবেন, তাহা উহার পিছনেই ব্যয় হইয়া যাইবে। আর কেনই বা উহাকে তিনি এখানে জামাই-আদরে বসাইয়া খাওয়াইতে যাইবেন, কে অবনী ? কিসের খাতির তাহার সঙ্গে ?

আচ্ছা, যদি মেসে না ফিরিয়া তিনি পলাইয়া দুই দিন অন্যত্র গিয়া থাকেন, তবে কেমন হয় ? মেসে শ্রীশকে দিয়া বলিয়া পাঠাইয়া দেন যদি—বিশেষ কাজে তিনি অন্যত্র যাইতেছেন, এখন দিন-বারো মেসে ফিরিবেন না ! কেমন হয় ! হইবে আর কী, অবনী সেই দশ দিন বসিয়া বসিয়া দিব্য খাইবে এখন তাঁহার খরচে।

সামনের শনিবার ছুটি। একদিন আগে কি ছুটি লইবেন ?

সাত-পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে টুইশান-শেষে যদুবাবু মেসে গিয়া দেখিলেন, অবনী নাই। চলিয়া গেল নাকি ?

পাশের ঘরের সতীশবাবু বলিলেন, যদুবাবু, আসুন। আপনার ছোট ভাই সিনেমা দেখতে গিয়েছে, এখুনি আসবে। ছ'টার শোতে গিয়েছে।

—সিনেমা ! আমার ছোট ভাই ?

সতীশবাবু যদুবাবুর কথার সুরে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, হ্যাঁ, যিনি কাল এসেছিলেন। আমায় বললেন, দাদার স্কুল থেকে আসতে দেরি হচ্ছে। বায়োস্কোপ দেখতে যাবার ইচ্ছে

ছিল। তা বোধ হয় হল না। আমি বললাম—কেন হল না? উনি বললেন, টাকা নেই সঙ্গে, দাদার কাছে চাবি। মনে করে নিয়ে রাখতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমি বললাম—তা আর কী! যদুবাবুর ফিরতে রাত হবে দশটা। আপনার কত দরকার, নিয়ে যান। পরস্পর বন্ধুবান্ধবের মধ্যে এসব—মেস-মেটের ভাই, আপনার কাছে নেই বলে কি আর অভাব ঘটবে?

—কত নিয়ে গেল?

—দু টাকা বললেন দরকার। আর দু টাকা নিয়েচেন বুঝি আপনার পিসিমার জন্যে কী ওষুধ কিনতে হবে—দোকান বন্ধ হলে আজ আর পাওয়া যাবে না—কাল সকালেই বুঝি উনি চলে যাবেন। তা থাক, তার জন্যে কী, এখন দেবার তাড়া নেই। মাইনে পেলে শনিবার দেবেন, এখন কাজটা তো হয়ে গেল।

যদুবাবু অতিকষ্টে রাগ সামলাইয়া ঘরে ঢুকিলেন এবং একটু পরেই অবনী সিনেমা হইতে ফিরিয়া ঘরে ঢুকিল। দাঁত বাহির করিয়া বলিল, এই যে দাদা, দেখে এলাম সিনেমা। থাকি গাঁয়ে পড়ে, ওসব দেখা অদৃষ্টে ঘটেই না তো। সতীশবাবুর কাছ থেকে গোটাচারেক টাকা নিয়ে গেলাম। কুড়ি টাকার মধ্যে চার টাকা সতীশবাবুকে আর ষোলটা দেবেন আমায়।

যদুবাবু দেখিলেন, অবনী ধরিয়াই লইয়াছে—কুড়ি টাকা তাহার হাতের মুঠার মধ্যে আসিয়া গিয়াছে। কুড়ি টাকা তো দূরের কথা, এই বহু-কষ্টার্জিত টাকার মধ্যে চার টাকা এভাবে বাজে ব্যয় হওয়াই কি কম কষ্টকর? এ চার টাকা দিতেই হইবে ভদ্রতার খাতিরে। যদুবাবুর বহু ভাগ্য যে, সে কুড়ি টাকা ধার করে নাই!

এমন মুশকিলে তিনি জীবনে কখনও পড়েন নাই। কেন মিছামিছি শরিক-জ্ঞাতিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে গিয়াছিলেন! এখন তাহার ধাক্কা সামলাইতে প্রাণ যে যায়! যদুবাবুর ইচ্ছা হইল, তিনি হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠিয়া হাত-পা ছোঁড়েন, অবনীকে ধরিয়া দুমদাম করিয়া কিল মারেন, কিংবা একদিকে ছুটিয়া বাহির হইয়া যান। কিন্তু মেসের ভদ্রলোকদের মধ্যে কিছুই করিবার জো নাই। তিনি শান্তমুখে তামাক সাজিতে বসিয়া গেলেন।

অবনী উৎসাহের সঙ্গে সিনেমায় কী দেখিয়া আসিয়াছে, তাহার গল্প সবিস্তারে আরম্ভ করিল। গল্প তার আর শেষ হয় না। যদুবাবু বলিলেন, চল, খেয়ে আসি।

অবনী হাসিয়া বলিল, আজ এখনও হয় নি। আজ যে আপনাদের মেসে ফিস্ট! আমি খোঁজ নিয়ে এলাম রান্নাঘরে, এখনও দেরি আছে।

সর্ব্বনাশ! আট আনা স্পেশাল চার্জ আজ ফিস্টের দিনে! এ ভূতভোজন করাইয়া লাভ কী তাঁহার রক্ত-জলকরা পয়সায়!

অবনী পরের দিনও নড়িতে চাহিল তো না-ই, টাকার তাগাদা করিয়া যদুবাবুকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিল। রাত দশটায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, অবনী কাহার কাছে খবর পাইয়াছে,

আগামী কাল শনিবার স্কুল বন্ধ হইবে, সুতরাং ওৎ পাতিয়া বসিয়া ছিল, বলিল, দাদা, কাল মাইনে পাবেন তু'মাসের, না? কাল চলুন, আপনার সঙ্গেই স্কুলে যাই—টাকা বোলটা দিয়ে দিন, তিনটের গাড়িতে বাড়ী যাই। যদুবাবুর ভয়ানক রাগ হইল, কিন্তু এখানে স্পষ্ট কথা বলিতে গেলেই অবনী ঝগড়া বাধাইবে, তাহাও বুঝিলেন। পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত লোক, কাণ্ডজ্ঞানহীন। কেলেঙ্কারি একটা না বাধাইয়া ছাড়িবে না।

পরদিন ক্লাসের ছেলেরা খাওয়াইল। অবনী গিয়া জুটিল যদুবাবুর সঙ্গে।

যদুবাবু কুড়িটি টাকা বেতন পাইলেন—তাও রামেন্দুবাবুর সুপারিশে। ছুটির সারকুলার বাহির হইয়া গেল। সকলে কে কোথায় যাইবেন, পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন। মাষ্টারেরা চায়ের দোকানে গিয়া মজলিশ করিবে ঠিক ছিল, কিন্তু সাহেব তাহাদের লইয়া পাঁচটা পর্য্যন্ত মীটিং করিলেন।

মীটিংয়ের কার্য্যতালিকা নিম্নলিখিতরূপ :—

(১) ছুটির পরেই বার্ষিক পরীক্ষা—কী ভাবে পড়াইলে ছেলেরা বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে।

(২) দেখা গিয়াছে, তৃতীয় শ্রেণীর ছেলেরা ইংরেজী ব্যাকরণে বড় কাঁচা। এই সময়ের মধ্যে কী প্রণালীতে শিক্ষা দিলে তাহারা উক্ত বিষয়ে পারদর্শী হইয়া উঠিতে পারে।

(৩) টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নপত্রগুলি পড়া ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

(৪) সপ্তম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় শ্রুতিলিখন থাকিবে কি না। থাকিলে তাহাতে কত নম্বর থাকিতে পারে।

মিঃ আলম ক্ষেত্রবাবুর প্রশ্নপত্রের দুই স্থানে দুইটি ভুল বাহির করিলেন। পাঠ্যতালিকার বাহিরে সেই দুইটি প্রশ্ন করা হইয়াছে—এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় ওই দুইটি বিষয় নাই। সাহেবের আদেশে পাঠ্য-তালিকা দেখা হইল, ভুলই বটে। ক্ষেত্রবাবু অপ্রতিভ হইলেন।

ধরা পড়িল, যদুবাবু ষষ্ঠ শ্রেণীর ইতিহাসের প্রশ্ন এখনও তৈয়ারী করেন নাই। মিঃ আলম ধরিয়া দিলেন।

সাহেব বলিলেন, কী যদুবাবু?

যদুবাবু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, অত্যন্ত দুঃখিত স্যার্। এখুনি করে দিচ্ছি—

—মিঃ আলম ধরে না দিলে কী মুশকিলেই পড়তে হত।

—স্যার্, বড় ব্যস্ত ছিলাম। মন ভাল ছিল না।

—সে সব কথা আমি জানি না। কর্ত্তব্য কাজে অবহেলা করে যে তার স্থান নেই আমার স্কুলে। মাই গেট্ ইজ—

—এবার মাপ করুন স্যার, আর কখনও এমন হবে না।

দোতলা হইতে নামিতেই অবনীর সহিত দেখা। সে সিঁড়ির নীচে তাঁহারই অপেক্ষার

দাঁড়াইয়া আছে। দাঁত বাহির করিয়া বলিল, মাইনে পেলেন দাদা ?

যদুবাবুর বড় রাগ হইল—একে সাহেবের কাছে অপমান, অপরের সুপারিশে মাত্র কুড়ি টাকা প্রাপ্তি, তার ওপর এইসব হাঙ্গামা সহ্য হয় ?

যদুবাবু বলিলেন, না।

—মাইনে পান নি ? পেয়েছেন দাদা।

—না, পাই নি। কেউই পায় নি।

অবনী একগাল হাসিয়া বলিল, দাদার যেমন কথা! দু মাসের মাইনে একসঙ্গে পেলেন বুঝি ?

যদুবাবু বলিলেন, সত্যিই পাই নি। তুমি মাস্টারমশায়দের জিগ্যেস করে দেখ না ?

—এক মাসের মাইনে দেবে না পুজোর সময়—তা কি কখনও হয় ?

—এ স্কুলে এমনি নিয়ম। সাহেবের স্কুল, পুজোটুজো মানে না।

অবনী কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'তবে আমার টাকা দেবেন বললেন যে ও-বেলা ?

—কোথা থেকে দেব বল ? স্কুলের মাইনে যখন হল না, টাকা পাব কোথায় ?

অবনী কথাটা উড়াইয়া দিবার মত তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল, আপনার আবার টাকার ভাবনা ! না হয় ডাকঘর থেকে তুলে কিছু দিন দাদা, এখনও সময় যায় নি—

যদুবাবু অবনীর মুখের দিকে চাহিয়া নীরস কণ্ঠে কহিলেন, ডাকঘরে এক পয়সাও নেই আমার। দিতে পারব না।

অবনী আরও কিছুক্ষণ কাকুতি-মিনতি করিল, রাগ করিল, ঝগড়া করিল, যদুবাবুকে কৃপণ বলিল, তাঁহার স্ত্রীকে এতদিন বাড়ীতে জায়গা দিয়া রাখিয়াছে সে খোঁটাও দিতে ছাড়িল না। যদুবাবুর এক কথা—তিনি টাকা দিতে পারিবেন না।

তিনি মাত্র কুড়ি টাকা মাহিনা পাইয়াছেন, তাহা হইতে কিছু দেওয়ার উপায় নাই।

অবনীর ভদ্রতা আগেই উবিয়া গিয়াছিল, সে বলিল, তা হলে টাকা দেবেন না আপনি ?

কথা যেন ছুঁড়িয়া মারিতেছে।

যদুবাবু বলিলেন, না।

—বেশ। কিন্তু আপনাকে চিনে রাখলাম, বিপদে-আপদে লাগব না কি আর কখনও ? আচ্ছা, চলি।

কিছু দূর গিয়া তখনই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, হাঁ, বউদিদিকে ওখানে রাখার আর সুবিধে হচ্ছে না। কালই গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসবেন, বলে দিচ্ছি। এত অসুবিধে করে পরের বউকে জায়গা দেবার ভারি তো লাভ! সব চিনি, এক কড়ার উপকারে কেউ লাগে না। কেবল মুখে লম্বা লম্বা কথা—

অবনী চলিয়া গেল। যদুবাবু স্কুলের বাহিরে আসিলেন ভাবিতে ভাবিতে। ক্ষেত্রবাবু পিছন হইতে আসিয়া বলিলেন, চল হে যদুদা, একটু চা খাই সবাই মিলে।

—আর চা খাব কী, মন বড় খারাপ।

—কী হল ? তুমি তবুও কুড়ি টাকা পেলে। আমাদের তো এক পয়সাও না।

—না হে, তোমার বউদিদি রয়েছে বেড়াবাড়ী—সেই পাড়াগাঁ। তাকে এবার না আনলেই নয়। কিন্তু এনে কোথায় বা রাখি ?

—এখন না-ই বা আনলে দাদা। নিজের বাড়ীতেই তো রয়েছেন। থাকুন না। এখন পূজোর সময়, দেশে পূজো দেখুন না। গাঁয়ে পূজো হয় তো ?

যদুবাবু গর্ব্বের সহিত বলিলেন, আমার বাড়ীতেই পূজো। শরিকী পূজো। আর, বেড়াবাড়ীর জমিদার তো আমরা। মস্ত বাড়ী, আমার অংশেই এখনও (যদুবাবু মনে মনে গণনা করিলেন) পাঁচখানা ঘর, ওপর নীচে। বাড়ীতেই পুকুর, বাঁধা ঘাট। আমার স্ত্রী সেখানেই রয়েছে, আসতে চায় না, বলে—বেশ আছি। হয়েছে কী ভায়া, নামে তালপুকুর, ঘটি ডোবে না। আছে সবই, এখনও দেশে গেলে লোকজন ছুটে দেখা করতে আসে, বলে—বড়বাবু বিদেশে পড়ে থাকেন কেন ? দেশে আসুন, আপনার ভাবনা কী ? কিন্তু ম্যালেরিয়া বড্ড। তেমন আয়ও নেই পুরনো আমলের মত। নামটাই আছে। নইলে কি আর বত্রিশ টাকা সাত আনায় পড়ে থাকি এই স্কুলে, রামোঃ !

যদুবাবু ওয়েলেসলি স্কোয়ারের বেঞ্চিতে বসিয়া মনে মনে বহু আলোচনা করিলেন। স্ত্রীকে এখন কলিকাতায় আনা অসম্ভব।

কুড়ি টাকা মাত্র সম্বলে বাসা করিয়া এক মাসও চালাইতে পারিবেন না। বেড়াবাড়ী এখন গেলে অবনী দস্তুরমত অপমান করিবে তাঁহাকে। সুতরাং তিনি কলিকাতায় মেসেই থাকিবেন, স্ত্রী কাঁদাকাটা করিলে কী হইবে ?

যদুবাবুর স্ত্রী পূজার মধ্যে স্বামীকে পাঁচ-ছয়খানা লম্বা লম্বা পত্র লিখিল। সে সেখানে টিকিতে পারিতেছে না, অবনীর দিদির ও স্ত্রীর খোঁটা এবং দুর্ব্ব্যবহারে তাহার জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে আর থাকিতে হইলে সে গলায় দড়ি দিবে, ইত্যাদি।

যদুবাবু লিখিলেন, তিনি এখন রামপুরহাটের জমিদারের বাড়ীতে টুইশানি পাইয়াছেন, ছুটি লইয়া এখন দেশে যাইবার কোনও উপায় নাই। তাহারা তাঁহাকে বড় ভালবাসে, ছাড়িতে চায় না।

সর্ব্বৈব মিথ্যা।

স্কুলে ঢুকিবার পূর্ব্বে গেটের কাছে একদল ছাত্র ভিড় জমাইয়া তুলিয়াছে। যদুবাবুকে দেখিয়া ক্লাস নাইনের একটি বড় ছেলে আগাইয়া আসিয়া বলিল, আজ স্কুলে ঢুকবেন না স্যার, আজ আমাদের স্ট্রাইক, কেউ যাবে না স্কুলে।

যদুবাবুর মুখ অপ্রত্যাশিত আনন্দে উজ্জ্বল দেখাইল। এও কি সম্ভব হইবে ? আজ কাহার

মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলেন! স্ট্রাইক হওয়ার অর্থ সারাদিন ছুটি। এখনই বাসায় ফিরিয়া দুপুরে দিবানিদ্রা দিবেন, তারপর বিকালের দিকে উঠিয়া তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ী আছে মলঙ্গা লেনে, সেখানে সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দাবা খেলিবেন। মুক্তি।

এই সময় শ্রীশবাবু ও মিঃ আলম একসঙ্গে গেটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে ছেলেরা তাঁহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল। আজ রামতারক মিত্র গ্রেপ্তার হওয়ার দরুন—দেশবিখ্যাত নেতা রামতারক মিত্র—কলিকাতার সমগ্র ছাত্রসমাজে দারুণ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে, স্কুল-কলেজের ছাত্রদল মিলিয়া বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করিবে ও-বেলা।

মিঃ আলম বলিলেন, আমাদের যেতে হবেই! আর তোমাদেরও বলি, আমি চাই না যে, এ স্কুলের ছাত্রেরা কোন পলিটিক্যাল আন্দোলনে যোগ দেয়। চলুন যদুবাবু, শ্রীশবাবু—

যদুবাবু মনে মনে ভাবিলেন, গিয়ে সইটা করেই ছুটি, কেউ আসছে না স্কুলে।

হেডমাস্টার স্ট্রাইকের কথা জানিতেন না। তিনি সকালে উঠিয়া খয়রাগড়ের রাজবাড়ীতে টুইশানিতে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া সব শুনিলেন। নিজে গেটে দাঁড়াইয়া ছেলেদের বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন অনেক—তাঁহার কথা কেহ শুনিল না। টীচার্স-রুমে বসিয়া বসিয়া মাস্টারেরা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। যদুবাবু বলিলেন, হ্যাঃ, শুনছে আজ ক্লার্কওয়েল সাহেবের কথা! তুমিও যেমন! কোথায় রামতারক মিত্তির—অত বড় লীডার আর কোথায় ক্লার্কওয়েল—ফোতো স্কুলের ফোতো হেডমাস্টার!

কিন্তু মাস্টারদের আশা পূর্ণ হইল না। একটু পরেই হেডমাস্টারের স্লিপ লইয়া মথুরা চাপরাসী আসিল, নীচু দিকের ক্লাসে ছোট ছোট ছেলেরা অনেক সকালেই আসে—বিশেষত তাহারা দেশনেতা রামতারক মিত্রের বিরাট ব্যক্তিত্বের বিষয়ে কিছুই জানে না; সুতরাং মাস্টার ও অভিভাবকের ভয়ে যথারীতি ক্লাসে আসিয়াছে। তাহাদের লইয়া ক্লাস করিতে হইবে।

উপরের দিকের ক্লাসের মাস্টার যাঁহারা, এ আদেশে তাঁহাদের কোন অসুবিধা হইল না, কেন না, উপরের কোন ক্লাসে একটি ছাত্রও আসে নাই। ধরা পড়িয়া গেলেন শ্রীশবাবু প্রভৃতি, যাঁহাদের প্রথম ঘণ্টায় নীচের দিকে ক্লাস আছে।

যদুবাবু চতুর্থ শ্রেণীতে ঢুকিয়া দেখিলেন, জন পাঁচ-ছয় ছোট ছেলে বসিয়া আছে। ওপাশে ক্লাস সেভেন্-এ জনপ্রাণীও আসে নাই, সুতরাং প্রথম ঘণ্টার শিক্ষক হেডপণ্ডিত দিব্য উপরের ঘরে বসিয়া আড্ডা দিতেছেন, অথচ তাঁহার—

রাগে দুঃখে যদুবাবু ধপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়া কটমট করিয়া চারিদিকে চাহিলেন। এই হতভাগাগুলোর জন্যই এই শাস্তি—যদি এই বদমাইসগুলা না আসিত, তবে আজ তাঁহার দিবানিদ্রা রোধ করে কে?

কড়া বাজখাঁই সুরে হাঁকিলেন, আজ পুরনো পড়া ধরব—নিয়ে আয় বই—ছাল তুলব আজ পিঠের, যদি পড়া ঠিকমত না পাই—

ছোট ছোট ছেলেরা তাঁহার রাগের কারণ ঠাহর করিতে না পারিয়া গা টেপাটিপি করিতে

লাগিল পরস্পর। একটি ছেলে ভয়ে ভয়ে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, আজ তো পুরনো পড়ার কথা ছিল না স্যার্!

যদুবাবু দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, পুরনো পড়া আবার বলা থাকবে কী? ও যে দিন ধরব, সেই দিনই বলতে হবে—দেখাচ্ছি সব মজা, কোন ক্লাসের ছেলে স্কুলে আসেনি, ওঁরা এসেছেন—ওঁদের পড়বার চাড় কত! ছাল তুলছি আজ পড়া না পারলে—

দুই-একটি বুদ্ধিমান ছেলে ততক্ষণ তাঁহার রাগের কারণ খানিকটা বুঝিয়াছে। একজন বলিল, স্যার্, না এলে বাড়ীতে বকে, বলে—ওপরের ক্লাসের ছেলেরা স্ট্রাইক করেছে তা তোদের কী? সেই আষাঢ় মাসে স্ট্রাইকের সময় এরকম হয়েছিল—

আর একটি অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ছেলে বলিল, স্যার্, বলেন তো পালাই।

যদুবাবু স্বর নরম করিয়া বলিলেন, পালাবি কোথা দিয়ে? ইস্কুলের গেটে হেডমাস্টার তালা দিয়ে রেখেছেন।

ক্লাসসুদ্ধ ছেলে বলিয়া উঠিল প্রায় সমস্বরে, গেটের দরকার কী স্যার্? আপনি বলুন, টিনের বেড়া রয়েছে পেছনে, ওর তলা দিয়ে গলে বেরিয়ে যাব।

—তবে তাই যা। কাউকে বলিস নে। রেজেষ্ট্রি হয় নি তো এখনও—পালা। একে একে যা।

নীচের তলায় আশপাশের ক্লাসে ছেলে নাই, কারণ সেগুলি বড় ছেলেদের ক্লাস। কেবল পূর্ব্বদিকের কোণে হল-ঘরের পাশের ক্লাসে গুটি-কয়েক ছোট ছেলে লইয়া জ্যোতির্ব্বিনোদ বিরক্তমুখে বসিয়া আছে। যদুবাবু বলিলেন, ওহে জ্যোতির্ব্বিনোদ, ওগুলোকে যেতে দাও না।

জ্যোতির্ব্বিনোদ যেন দৈববাণী শুনিল, এরূপভাবে লাফাইয়া উঠিয়া আগ্রহের সুরে বলিল, দেব ছেড়ে? সাহেব কিছু বলবে না তো?

যদুবাবু মুখে কোনদিন খাটো নহেন, ব্যঙ্গের সুরে বলিলেন, ও সব ভাবলে তবে বসে ক্লাস করো সেই বেলা তিনটে পর্য্যন্ত (ছোট ছেলেদের তিনটার সময় ছুটি হইয়া যায়)। এই তো আমি ছেড়ে দিলাম—

—আপনারা সব বড় বড়, আমরা হলাম চুনোপুঁটি, সব তাতেই দোষ হবে আমাদের।

—কিছু না, ছেড়ে দাও সব। এই, যা সব পালা—টিনের পার্টিশনের তলা দিয়ে পালা। স্ট্রাইকের দিন স্কুল করতে এসেছে! ভারি পড়ার চাড়!

জ্যোতির্ব্বিনোদও সুরে সুর মিলাইয়া বলিল, দেখুন দিকি কাণ্ড যত—পড়ে তো সব উল্টে যাচ্ছেন একেবারে। যা সব একে একে! রোত্তো, গোল করবি তো হাড় ভাঙব মেরে, কেউ টের না পায়—

কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাস প্রায় খালি হইয়া গেল।

যদুবাবু উপরে গিয়া বলিলেন, কোথায় ছেলে? দু-একটা এসেছিল, কে কোথা দিয়ে পালিয়ে গেল ধরতেই পারা গেল না—

ক্ষেত্রবাবু ছুটির দিনই রাত্রির ট্রেনে বর্দ্ধমান রওনা হইলেন।

পরদিন সকালের দিকে বর্দ্ধমান স্টেশনে নামিয়া প্লাটফর্মের উত্তর দিকে মালগুদামের ও পার্সেল-আপিসের পিছনে দাদার কোয়ার্টারে গিয়া ডাক দিলেন, ও বউদি !

—এস এস ঠাকুরপো। মনে পড়ল এত দিন পরে ? তা ভাল আছ বেশ ? আমায় শশীবাবুর বউ রোজই বলেন—হ্যা দিদি, তোমার সে ঠাকুরপো কবে আসবেন ? আমি বলি —তা কী জানব ? কলেজে কাজ করেন, বড় চাকরি, ছুটি না হলে তো আসতে পারেন না। তা ছেলেমেয়েদের কোথায় রেখে এলে ?

—ওরা তাদের পিসীমার কাছে রইল কালীঘাটে—মেজদিদির কাছে।

—বেশ, এসেছ ভালই হয়েছে। এবার একটা যা হয় ঠিক করে ফেল। ওঁদের মেয়ে বড় হয়েছে, তোমার ভরসাতেই আছে। আর তোমাকে সংসার যখন করতেই হবে, তখন আর দেরি করা কেন, আমি বলি। ব'সো হাত-পা ধোও, চা করি।

ক্ষেত্রবাবু এইরূপ একটা অস্পষ্ট আশার গুঞ্জনধ্বনি সারারাত ট্রেনের মধ্যে কানের কাছে শুনিয়াছেন—চলমান বাতাসে সে আভাস আসিয়াছিল ! বাসায় পা দিতেই এমন কথা শুনিবেন, তাহা কিন্তু ভাবেন নাই। ক্ষেত্রবাবু পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার জ্যাঠতুতো দাদা গোবর্দ্ধনবাবু সন্ধ্যার সময় ডিউটি হইতে ফিরিয়া বলিলেন, এই যে, ক্ষেত্র কখন এলে ? চা খেয়েছ ? স্কুল কবে—কাল বন্ধ হ'ল ? বেশ।

গোবর্দ্ধনবাবু পাকা লোক। যে খুড়তুতো ভাই আজ সাত-আট বছরের মধ্যে কখনও ঘনিষ্ঠতা করা দূরের কথা, বছরে দুইখানি পোস্টকার্ডের পত্র দিয়া খোঁজ-খবর লইত কি না সন্দেহ, সেই ভাই কাল স্কুল বন্ধ হইতে না হইতে কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমানে আসিয়া হাজির, এ নিশ্চয়ই নিছক ভ্রাতৃ-প্রেম নয়। গোবর্দ্ধনবাবু মনে মনে হাসিলেন।

চা-জলখাবার-পর্ব্বান্তে ক্ষেত্রবাবু তাঁহারই সমবয়সী শ্রীগোপাল মজুমদার অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন-মাস্টারের বাড়ী বেড়াইতে গেলেন। রেলওয়ে সমাজে পরস্পরকে উপাধি দ্বারা সম্বোধন করাই প্রচলিত।

ক্ষেত্রবাবুকে সেখানেও একদফা চা খাবার খাইতে হইল। মজুমদার বলিল, তারপর ক্ষেত্রবাবু, শুনছিলাম একটা কথা—

ক্ষেত্রবাবুর বুকের মধ্যে টিপ টিপ করিয়া উঠিল। বুঝিয়াও না-বুঝিবার ভান করিয়া বলিলেন, কী কথা ?

—আমাদের মুখুজ্জের ভাইঝির সঙ্গে নাকি আপনার—

ক্ষেত্রবাবু সলজ্জ হাসিয়া বলিলেন, না না, কই না—আমার তো—

—না, আমি বলি, দ্বিতীয় সংসার করার ইচ্ছে যদি থাকে, তবে এখানেই করে ফেলুন—মেয়েটি বড় ভাল।

ক্ষেত্রবাবু দুই-একবার বলি-বলি করিয়া অবশেষে বলিলেন, মেয়ে ? ও দেখেছেন নাকি ?

—কে, অনিলা? অনিলাকে ফ্রক পড়ে বেড়াতে দেখেছি। আমাদের বাসায় আমার ভাগ্নী বিমলার সঙ্গে খুব আলাপ।

—ও!

—বেশ মেয়ে। দেখতে তো ভালই, ঘরের কাজকর্ম সব জানে। চলুন না, পায়ে পায়ে মুখুজ্জের বাসায় যাই। আপনি এসেছেন, বোধ হয় জানে না।

ক্ষেত্রবাবু জিভ কাটিয়া বলিলেন, আরে, তা কখনও হয়? না না। আমি যাব কেন?

—আমরা যে ক'জন আছি স্টেশনের কোয়ার্টারে—সব এক ফ্যামিলির মত। এখানে কুটুম্বিতে করি না কেউ কারও সঙ্গে। সেবারে ঐ মল্লিকবাবুর মা মারা গেল, আটাত্তর বছর বয়সে। রাত দেড়টা, আমি এইট্টিন ডাউন সবে পাস্ করে টিকিটের হিসেব চালানে এনট্রি করেছি, এমন সময় বাসা থেকে লোক গিয়ে বললে—শীগগির চল, এই রকম ব্যাপার। সেই রাত্তিরে মশাই রেলওয়ে কোয়ার্টারের ক'টি প্রাণী, বলি ব্রাহ্মণ আর কায়স্থ কী, হিন্দু তো বটে—ঘাড়ে করে নিয়ে গেলুম শ্মশানে; তা এখানে ওসব নেই। চলুন, যাওয়া যাক।

ক্ষেত্রবাবুর যাওয়ার ইচ্ছা যে না হইয়াছিল তাহা নয়, কিন্তু দাদা কী মনে করিবেন, এই ভয়ে মজুমদারের কথায় রাজী হইতে পারিলেন না।

পরদিন বেলা দশটার সময় ক্ষেত্রবাবু বাসায় বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন, এমন সময় একটি মেয়ে এক বাটি তেল আনিয়া সামনে রাখিয়া সলজ্জ স্বরে বলিল, দিদি বললেন আপনাকে নেয়ে আসতে।

ক্ষেত্রবাবু চাহিয়া দেখিলেন, সতেরো-আঠারো বছরের মেয়েটি। বেশী ফরসাও নয়, বেশী কালোও না। মুখশ্রী ভাল।

—ও! বউদিদি বললেন?

ক্ষেত্রবাবু যেন একটু থতমত খাইয়া গিয়াছেন, কথার স্বরে ধরা পড়িল।

মেয়েটি হাসি চাপিতে চাপিতে বলিল, হাঁা।—এই কথা বলিয়াই সে চলিয়া গেল।

ক্ষেত্রবাবু ভাবিলেন, কে মেয়েটি, কখনও তো দেখেন নাই একে! এ সেই মেয়েটি নয় তো?

স্নান করিয়া খাইতে বসিয়াছেন, সেই মেয়েটিই আনিয়া ভাতের থালা সামনে রাখিল। আবার ফিরিয়া গিয়া ডালের বাটি আনিয়া দিল। খাওয়ার মধ্যে মেয়েটি অনেক বার যাতায়াত করিল। ক্ষেত্রবাবু দুই-একবার মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, মুখখানি ভাল ছাড়া মন্দ বলিয়া মনে হইল না তাঁহার কাছে। ভাল করিয়া চাহিতে পারিলেন না, দাদা পাশে বসিয়া খাইতেছেন। আহারাদির পর ক্ষেত্রবাবু বিশ্রাম করিতেছেন, সেই মেয়েটিই আসিয়া পান দিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবুর কৌতূহল হইল জানিবার জন্য মেয়েটি কে, কিন্তু কখনও অপরিচিতা মেয়ের সঙ্গে কথা কওয়ার বা মেলামেশার অভিজ্ঞতা না থাকায় চুপ করিয়া রহিলেন। গরীব স্কুলমাস্টার, তেমন সমাজে কখনও যাতায়াত নাই।

এ দিন এই পর্য্যন্ত। মেয়েটি আর আসিল না সারাদিনের মধ্যে। কিন্তু ক্ষেত্রবাবুর মন যেন তাহার জন্ত উৎসুক হইয়া রহিল সারাদিন। মুখখানি বেশ।' সেই মেয়েটি নাকি? কী জানি! লজ্জায় কথাটা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। পরে আরও দুই দিন গেল, মেয়েটির কোন চিহ্ন নাই কোন দিকে। হঠাৎ তৃতীয় দিনে মেয়েটি সকালে চায়ের পেয়ালা রাখিয়া গেল সামনে। ক্ষেত্রবাবুর বুকের মধ্যে কিসের একটা ঢেউ চলকিয়া উঠিল। মেয়েটি দোরের কাছে একটুখানি দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল এবং আর কিছুক্ষণ পরে আবার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনাকে কি আর এক পেয়ালা চা দোব?

—চা! তা বেশ।

—আনব?

—হ্যাঁ।

মেয়েটি এবার চলিয়া যাইতেই ক্ষেত্রবাবু ভাবিলেন, লজ্জা কিসের—এবার তিনি জিজ্ঞাসা করিবেনই। সেই মেয়েটি নয়, ও অন্ত কেউ, পাশের কোন বাসার মেয়ে। কী জাতি, তাহারই বা ঠিক কী। তা হোক, একটু আলাপ করিতে দোষ নাই।

এবার চা আনিতেই ক্ষেত্রবাবু লাজুকতা প্রাণপণে চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি বুঝি পাশের বাসাতেই থাকেন?

মেয়েটি যেন এতদিন ক্ষেত্রবাবুর কথা কহিবার আশায় ছিল, বহুবিলম্বিত ব্যাপারের অপ্রত্যাশিত সংঘটনে প্রথমটা নিজে যেন কিছু থতমত খাইয়া গেল। পরে বেশ সপ্রতিভ ভাবেই আঙুল তুলিয়া অনির্দ্দিষ্ট একটা বাসার দিকে দেখাইয়া বলিল, পাশে না, ও-ই দিকে আমাদের বাসা।

—ও!

ক্ষেত্রবাবু আর কথা খুঁজিয়া পান না। মেয়েটি যেন আশা করিয়াই দাঁড়াইয়া আছে, তিনি আবার কথা বলিবেন। ক্ষেত্রবাবু পুনরায় মরীয়া হইয়া বলিলেন, আপনার বাবা বুঝি রেলে কাজ করেন?

—পার্সেল-আপিসে কাজ করেন।

—বেশ।

মেয়েটি তখনও দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া ক্ষেত্রবাবু আকাশ-পাতাল ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি পড়েন বুঝি?

—এখন বাড়ীতেই পড়ি, গার্লস্ স্কুলে থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েছিলাম, এখন বড় হয়েছি তাই আর স্কুলে যাই নে।

মেয়েটি যে কয়টি ইংরেজী কথা বলিল, সবগুলির উচ্চারণ স্পষ্ট ও জড়তাশূন্ত, অশিক্ষিত উচ্চারণ নয়। ইংরেজী-জানা মেয়ে ক্ষেত্রবাবু এ পর্য্যন্ত দেখেন নাই, মেয়েটির প্রতি সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, এখানে বুঝি গার্লস্ স্কুল আছে?

—বেশ বড় স্কুল তো, আড়াইশো মেয়ে পড়ে।

—হেডমিস্ট্রেস্ কে ?

—আমাদের সময়ে ছিলেন মিস্ সুকুমারী দত্ত বি-এ, বি-টি। এখন কে এসেছেন জানি নে।

বা রে, মেয়েটি 'বি-টি'র খবর পর্য্যন্ত রাখে। স্কুলমাস্টার ক্ষেত্রবাবু প্রশংসায় বিগলিত হইয়া উঠিলেন মনে মনে। যেন কোনও অদৃষ্টপূর্ব্ব কিছু দেখিতেছেন। বেশ মেয়েটি তো ?

—আপনাদের স্কুলে পুরুষমানুষ টীচার নেই বুঝি ?

—নীচের দিকে একজন আছেন ভুবনবাবু বলে, বুড়োমানুষ। আমরা দাদু বলে ডাকতাম।

—পড়ানো বেশ ভাল হত স্কুলে ? অঙ্ক কষাতেন কে ?—ক্ষেত্রবাবু এবার কথা কহিবার বিষয় খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

—নীহার-দি—মিস্ নীহার তালুকদার, ওঁরা ব্রাহ্ম।

বাঃ, মেয়েটি ব্রাহ্মদের খবরও রাখে! এত বাহিরের খবর-জানা মেয়ে সাধারণ গৃহস্থঘরে বড় একটা দেখা যায় না, অন্তত ক্ষেত্রবাবু তো দেখেন নাই। ইচ্ছা হইল, খানিকক্ষণ মেয়েটির সঙ্গে গল্প করেন; কিন্তু সাহসে কুলাইল না। কে কী মনে করিতে পারে!

পরদিন বৈকালে ক্ষেত্রবাবুর বউদিদি বলিলেন, শশীবাবুদের বাসায় তোমার আর ওঁর নেমন্তন্ন।

ক্ষেত্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, শশীবাবু কে ? সেই তাঁরা ?

বউদিদি হাসিমুখে বলিলেন, হ্যাঁ গো, সেই তারাই তো।

—সেখানে কি খাওয়া উচিত হবে ?

—কেন ?

—একটা আশা দেওয়া হবে, কিন্তু—

—কিন্তু কী ? তুমি বিয়ে করবে কি না, এই তো ?

—হ্যাঁ—তা—সেই রকমই ভাবছিলাম—

—কেন, মেয়ে পছন্দ হয় নি ?

ক্ষেত্রবাবু আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি তখনই ব্যাপারটা আগাগোড়া বুঝিয়া ফেলিলেন। বউদিদির ষড়যন্ত্র। তাহা হইলে শশীবাবুদের বাসার সেই মেয়েটি! হাসিয়া বলিলেন, সব আপনার কারসাজি। তখন তো ভাবি নি যে, ওই মেয়ে! ও!

—মেয়ে খারাপ ?

ক্ষেত্রবাবু দেখিলেন, হঠাৎ নিজেকে অত্যন্ত খেলো করিয়া লাভ নাই, ওজনে ভারী থাকা মন্দ নয়। বলিলেন, মেয়ে ? হ্যাঁ—না, তা খারাপ নয়। তবে 'আহা মরি'ও কিছু নয়।

—মনের কথা বলছ ঠাকুরপো ? সত্যি বল, তোমার পছন্দ হয় নি ? অনিলার কিন্তু তোমাকে পছন্দ হয়েছে।

ক্ষেত্রবাবুর সতর্কতার বাঁধ হঠাৎ ভাঙিয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি আগ্রহপূর্ণ কণ্ঠে

জিজ্ঞাসা করিলেন, কী, কী, কী রকম ?

ক্ষেত্রবাবুর বউদিদি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, তবে নাকি ঠাকুরপোর মন নেই ? আমাদের কাছে চালাকি ? সত্যি তা হলে ভাল লেগেছে ? তবে আমিও বলছি শোন, অনিলা তোমাকে দেখতেই এসেছিল আসলে। অবিশ্যি ছুতো করে এসেছিল। আমি যেন কিছু বুঝি নি, এই ভাবে বললাম, কলকাতা থেকে আমাদের একজন আত্মীয় এসেছে, বাইরে বসে আছে, চা-টা দিয়ে এস—ভাতটা দিয়ে এস। একা পারছিনে। তাই ও গিয়েছিল। বার বার পাঠালে ভাল হয়, এমনি মনে হল। আজকালকার সব বড়সড় মেয়ে। ওদের ধরনই আলাদা। মেয়ো কিন্তু।

রাত্রে সেই মেয়েটিই ক্ষেত্রবাবুদের পরিবেষণ করিল। কিন্তু করিলে কী হইবে, দাদা পাশেই বসিয়া। ক্ষেত্রবাবু লজ্জায় মুখ তুলিয়া চাহিতেও পারিলেন না। খাওয়াদাওয়া মিটিয়া গেল। ছোট রেলওয়ে-কোয়ার্টারের বাহিরের ঘরে ক্ষুদ্র তক্তোপোশে শতরঞ্জির উপর ক্ষেত্রবাবু আসিয়া বসিলেন। বাড়ির কর্তা হঠাৎ ক্ষেত্রবাবুর দাদাকে কোথায় ডাকিয়া লইয়া গেলেন। অল্প পরেই সেই মেয়েটি একটা চায়ের পিরিচে চারটি পান আনিয়া তক্তা-পোশের এক কোণে রাখিল। ক্ষেত্রবাবু একটা বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিলেন, ও, এটা আপনাদের বাসা ? আমি প্রথমটা বুঝতে পারি নি—

মেয়েটি চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু চলিয়া গেল না।

ক্ষেত্রবাবু আর কথা খুঁজিয়া পান না। মেয়েটি যখন সামনেই দাঁড়াইয়া, তখন বেশীক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলে বড় খারাপ দেখায়। চট করিয়া মাথায় কিছু আসেও না ছাই। তখন যে কথাটা আজ দুই দিন হইতে মনে হইতেছে প্রায় সব সময়েই, সেটাই বলিলেন, রেলের বাসাগুলো বড় ছোট, না ?

—হ্যাঁ।

—এতে আপনাদের অসুবিধে হয় না ?

—আমাদের অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। এই তো রেলে রেলেই বেড়াচ্ছি কতদিন থেকে —ও সয়ে গিয়েছে ! জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত এই রকমই দেখছি।

—এর আগে কোথায় ছিলেন আপনারা ?

—আসানসোলে। তার আগে পাকুড়। তার আগে ছিলাম সক্রিগলি জংশন। তখন আমার বয়স সাত বছর, কিন্তু সব মনে আছে আমার।—

মেয়েটি বেশ সহজ সুরেই কথা বলিতে লাগিল, যেন ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে তার অনেক দিনের পরিচয়।

—আচ্ছা আপনাদের দেশ কোথায় ?

—হুগলী জেলায় আরামবাগ সাব-ডিভিশনে। কিন্তু সে বাড়ীতে আমরা যাই নি কোনদিন। রেলের চাকরিতে ছুটি পান না বাবা। আমার ভাইয়ের পৈতের সময় বাবা বলেছেন যাবেন

মেয়েটি তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করে না, নিজে হইতেও কোনও কথা বলে না ; কিন্তু তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য যেন উন্মুখী হইয়া থাকে। এ এমন এক অবস্থা, ক্ষেত্রবাবুর পক্ষে যাহা সম্পূর্ণ নূতন। নিভাননীর সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল, তখন তাঁহার বয়স উনিশ, নিভাননীর দশ। তখন নারীর মনের আগ্রহ বুঝিবার বয়স হয় নাই তাঁহার।

এতকাল পরে—এসব নূতন ব্যাপার জীবনের।

—আচ্ছা, আপনারা অনেক দেশ ঘুরেছেন, পাহাড় দেখেছেন ?

—তিনপাহাড়ী বলে একটা স্টেশন আছে লুপ লাইনে। সেখানে বাবা কিছুদিন রিলিভিং-এ ছিলেন, সেখানে পাহাড় দেখেছি।

—আপনি তো দেখেছেন, আমি এখনও দেখি নি।

মেয়েটি বিস্ময়ের সুরে বলিল, আপনি পাহাড় দেখেন নি ?

ক্ষেত্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, নাঃ, কোথায় দেখব ? বরাবর কলকাতাতেই আছি। স্কুলের ছুটি থাকলেও টুইশানির ছুটি নেই। যাতায়াত বড় একটা হয় না। আপনাদের বড় মজা, পাসে যাতায়াত করতে পারেন।

মেয়েটি বিস্ময়ের সুরে বলিল, ওঃ ওঃ! খু-উ-ব।

—গিয়েছেন কোথাও ?

—ডুমকায় আমার এক পিসেমশায় চাকরি করেন, ডুমকা রাজস্টেটে। সেখানে মার সঙ্গে গিয়ে মাসখানেক ছিলাম একবার। আর একবার পুরী যাওয়ার সব ঠিকঠাক, আমার ছোট ভাইয়ের অসুখ হল বলে বাবা পাস ফেরত দিলেন। সামনের বছর যাবেন বলেছেন। ও, আপনাকে আর দুটো পান দি—

—না না, আমি বেশী পান খাই নে। বরং খাবার জল এক গ্লাস যদি—

—আনি—বলিয়াই মেয়েটি বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় (অথও সুখ জীবনে পাওয়া যায় না), তখনই বাহির হইতে শশীবাবুর সহিত ক্ষেত্রবাবুর দাদা গোবর্দ্ধনবাবু ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, ক্ষেত্র, তা হলে চল যাই।

একটু পরে জলের গ্লাস হাতে মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া নিঃশব্দে গ্লাসটি তক্তাপোশের কোণে রাখিয়া কিঞ্চিৎ দ্রুতপদেই চলিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবু ও তাঁহার দাদাও বিদায় লইয়া আসিলেন।

সেই দিনই রাত্রে ক্ষেত্রবাবু বউদিদির কাছে প্রকারান্তরে বিবাহের মত প্রকাশ করিলেন। পরবর্ত্তী তিন-চারি দিনের মধ্যে সব ঠিকঠাক হইয়া গেল, সামনের অগ্রহায়ণ মাসের দোসরা ভাল দিন আছে। বরপণ একশো এক টাকা নগদ ও দশ ভরি সোনার গহনা। ঠিকুজী কোষ্ঠী মিলিলে কথাবার্ত্তা পাকা হইবে।

ক্ষেত্রবাবু দাদাকে বলিলেন, দাদা, তা হলে কাল যাব।

—এখনই কেন ? আর দু-চার দিন থাক না ?

—না দাদা, খোকাখুকী রয়েছে পড়ে সেখানে ! যাই একবার।

যাইবার পূর্ব্বদিন পুনরায় শশীবাবুর বাড়ী তাহার নিমন্ত্রণ হইল। এ দিন কিন্তু ক্ষেত্রবাবুর উৎসুক দৃষ্টি চারিদিক খুঁজিয়াও মেয়েটির টিকি দেখিতে পাইল না।

বার্ষিক পরীক্ষা চলিতেছে। হেডমাস্টারের তাড়নায় মাস্টারেরা অতিষ্ঠ। বড় হলে যদুবাবু ও শরৎবাবু পাহারা দিতেছেন, হঠাৎ মিঃ আলম তদারক করিতে আসিয়া ধরিয়া ফেলিলেন, দুইজন ছাত্র টোকাটুকি করিতেছে।

মিঃ আলম বলিলেন, আপনারা কী দেখছেন যদুবাবু! কত ছেলে টুকছে—

যদুবাবু দেখিতেছিলেন না সত্যই—এ স্কুলে উনিশ বৎসর হইয়া গেল তাঁহার। সাহেব আসিবার অনেক আগে হইতে এখানে ঢুকিয়াছেন। নতুন মাস্টার যাহারা, খুব উৎসাহের সঙ্গে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে, তাঁহার সে বয়স পার হইয়া গিয়াছে। তিনি চেয়ারে বসিয়া ঢুলিতেছিলেন।

সাহেবের টেবিলের সামনে দাঁড়াইতে হইল দুইজনকেই। সাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দুইজনের দিকে চাহিলেন।

—কী যদুবাবু, আপনার হলে এই দুজন ছাত্র টুকছিল—আপনি দেখেন না, আপনাদের কৈফিয়ত কী?

—দেখছিলাম স্যার্।

—দেখলে এ রকম হল কেন?

—ছেলেরা বড় দুষ্টু স্যার্,—কী ভাবে যে টোকে—

—চেয়ারে বসে পাহারা দেওয়ায় কাজ হয় না। বিশেষ করে যদুবাবু, আপনার আর মনোযোগ নেই স্কুলের কাজে, অনেকদিন থেকে লক্ষ্য করছি। এ স্কুলে আপনার আর পোষাবে না।

যদুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

—আর শরৎবাবু, আপনি নতুন এসেছেন, আজ দু বছর। কিন্তু এখনি এমনি গাফিলতি কাজের, এর পরে কী করবেন? আপনাদের দ্বারা স্কুলের কাজ আর চলবে না। এখন যান আপনারা, ছুটির পরে একবার আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

যদুবাবু রাগ করিয়া হলে ঢুকিয়া প্রত্যেক ছাত্রের পকেট খানাতল্লাশ করিলেন, ফলে প্রকাশ পাইল (১) থার্ড ক্লাসের এক ছেলের পকেট হইতে একখানা ইতিহাসের বইয়ের পাতা, (২) ক্লাসের আর একটি ছেলের কোঁচায় লুকানো একখানি আস্ত ইতিহাসের বই, (৩) নারাণবাবুর ছাত্র চুনির খাতার মধ্যে চার-পাঁচখানা কাগজে নানারূপ নোট লেখা, (৪) সেভেনথ্ ক্লাসের একটি ছেলের ডেস্ক্ হইতে দুইখানি বই—একখানি ইংরেজী ইতিহাসের বই (এবেলা আছে ইতিহাসের পরীক্ষা), আর একখানি হইল ভূগোল, যাহার পরীক্ষা ওবেলা আছে। বোঝা গেল, ইতিহাসের বই হইতে কিছু আগেও সে টুকিতেছিল।

সব কয়জনকে হেডমাস্টারের কাছে হাজির করা হইল। সাহেবের হুকুমে তাহাদের

এবেলা পরীক্ষা দেওয়া রহিত হইয়া গেল। বাড়ীতে তাহাদের অভিভাবকদের কাছে পত্র গেল। নারাণবাবুর ছাত্র চুনি বাড়ী যাইতেছিল, নারাণবাবু ডাকিয়া পাঠাইলেন।—হ্যাঁ চুনি, তুমি নোট লিখে এনেছিলে ?

চুনি চুপ করিয়া রহিল।

—কেন এনেছিলে ? কার কাছ থেকে লিখে এনেছিলে ? ও লিখে আনা কি তোমার উচিত হয়েছে ?

—না স্যার।

—তবে আনলে কেন ?

—আর কখনও আনব না।

—তা তো আনবে না বুঝলাম। এদিকে একটা পেপার পরীক্ষা দিতে পারলে না। পাস-নম্বর থাকবে কী করে, তাই ভাবছি।···চুনি, খিদে পেয়েছে ? কিছু খাবি ? আয় আমার ঘরে।

নিজের ছোট ঘরটাতে লইয়া গিয়া নারাণবাবু তাহার পিঠে হাত দিয়া কত ভাল ভাল কথা বুঝাইলেন—মিথ্যা দ্বারা কখনও মহৎ কাজ হয় না, ইত্যাদি। গীতার শ্লোক পড়িয়া শোনাইলেন। ছোলা-ভিজা ও চিনি এবং আধখানা পাঁউরুটি খাওয়াইলেন। চুনি খাইবার সময় বলিল, স্যার, একটা কথা বলব ? বাড়ী গিয়ে কোন কথা বলবেন না যেন—

—না, আমার যেচে বলবার দরকার কী ! কিন্তু হেডমাস্টারের চিঠি যাবে তোমার বাবার নামে।

চুনির মুখ শুকাইল। বলিল, কেন স্যার ?

—তাই সাহেবের নিয়ম।

—আপনি হেডস্যারকে বুঝিয়ে বলুন না। আপনি বললেই—

—যা, বাড়ী যা এখন। দেখি আমি।

চুনি চলিয়া গেলে নারাণবাবু ভাবিতে লাগিলেন, চুনির এ অসাধু প্রকৃতিকে কী করিয়া ভিন্ন পথে ঘুরাইবেন ! আজ যেভাবে বলিলেন, ও ঠিক পথ নয়। গীতার শ্লোক বলা উচিত হয় নাই—অতটুকু ছেলে গীতার কথা কী বুঝিবে ? তাঁহার নোটবুকে টুকিয়া রাখিলেন —চুনি—মিথ্যা ব্যবহার, হাউ টু কারেক্ট, অনুকূলবাবু হইলে কী করিতেন ? নারাণবাবু গভীর দুশ্চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

চায়ের দোকানে বসিয়া সে দিন যদুবাবু আস্ফালন করিতেছিলেন : এক পয়সার মুরোদ নেই স্কুলের—আবার লম্বা লম্বা কথা ! ডিউটি, ট্রুথ ! আরে মশাই, পূজোর ছুটির মাইনে দু টাকা এক টাকা করে সে দিন শোধ হল। গরীব মাস্টারেরা কী খায় বল তো ?

ক্ষেত্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, না পোষায়, চলে যেতে পারেন দাদা। সাহেবের গেট ইজ ওপন্—

রামেন্দুবাবু আর নতুন টীচার নন—দু-তিন বছর হইয়া গেল এ স্কুলে, তিনি সব দিন এ মজলিসে থাকেন না, আজ ছিলেন। বলিলেন, জানুয়ারি মাস থেকে মাইনে কাটা হবে,

জানেন না বোধ হয় ?

সকলেই চমকিয়া উঠিলেন। যদুবাবু ও জগদীশ জ্যোতির্ব্বিনোদ একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, কে বললে ? ক্যাঁ, আবার মাইনে কাটা !

—জানুয়ারি মাসে ছাত্র ভর্ত্তি না হলে মাইনে কাটা হবেই।

—এই সামান্য মাইনে, এও কাটা হবে ! আপনি একটু বলুন হেডমাস্টারকে—

—বলেছিলাম। কিন্তু বাজেট যা, তাতে মাইনে না কাটলে মাস্টারদের মধ্যে দু-একজনকে জবাব দিতে হবে কাজ থেকে। তার চেয়ে সকলকে রেখে মাইনে কাটা ভাল।

জ্যোতির্ব্বিনোদ বলিলেন, সে যাকগে, যা হয় হবে। এখন সাহেবের কাছে একটা দরখাস্ত দেওয়া যাক আসুন, যাতে মাসের মাইনেটা ঠিক সময় পাই। আড়াই মাস খেটে এক মাসের মাইনে নিয়ে এভাবে তো আর পারা যাচ্ছে না।

রামেন্দুবাবু বলিলেন, ও করতে যাবেন না। তাতে ফল হবে না। আমি কি ও নিয়ে বলি নি ভাবচেন ?

যদুবাবু বলিলেন, না, আপনি যা বলেন, তার ওপর আমাদের কথা কওয়ার দরকার কী ! যা ভাল হয় করবেন।

চায়ের দোকান হইতে বাহির হইয়া কে একজন বলিলেন, আজ যে নারাণদাকে দেখছি নে ?

জ্যোতির্ব্বিনোদ বলিলেন, যখন আসি, ঘরে উঁকি মেরে দেখি, তিনি লিখছেন বসে বসে একমনে। আমি আর ডাকলাম না।

রামেন্দুবাবু বলিলেন, ওই একজন বড় খাঁটি সিনসিয়ার লোক, সেকালের গুরুর মত। ও টাইপ আজকাল বড় একটা দেখা যায় না এ ব্যবসাদারির যুগে। আচ্ছা, আমি এখন চলি —বসুন।

বসিবার সময় নাই কাহারও। সকলকেই এখনই টুইশানিতে যাইতে হইবে।

ক্ষেত্রবাবু চায়ের দোকান হইতে পাশেই শ্রীনাথ পালিতের লেনে বাসায় গেলেন। পনেরো টাকা ভাড়ায় দুইখানি ঘর• একতলায়, ছোট্ট রান্নাঘর। এক দিকে সিঁড়ির নিচে কয়লা রাখিবার জায়গা। অন্ধকার কলঘরে একজন লোক দিনমানে ঢুকিলেও বাহির হইতে হঠাৎ দেখিবার জো নাই। তারের আলনায় কাপড় শুকাইতেছে। বাড়ীওয়ালী শুচিবেয়ে বুড়ী গামছা পরিয়া ঝাঁটা হাতে উঠানে জল দিয়া ঝাঁট দিতেছে ও ধুইতেছে।

অনিলা বাহিরে আসিয়া হাসিমুখে বলিল, দেরি হল যে ?

—কোথায় দেরি ? কানু কই ?

—সে বল খেলা দেখতে গিয়েচে, ইণ্টার-স্কুল ম্যাচ আছে কোথায়। চা খাবে ?

—না, এই খেয়ে এলাম দোকান থেকে।

অনিলা হাত-পা ধুইবার জল আনিয়া একটা ছোট টুল পাতিয়া দিল, একখানা গামছা টুলের উপর রাখিল। তারপর একটা বাটিতে মুড়ি মাখিয়া এক পাশে একটু গুড় দিয়া

স্বামীকে খাইতে দিল। ক্ষেত্রবাবু হাত মুখ ধুইয়া জলযোগ সমাপনান্তে টুইশানিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

অনিলা বলিল, একটু জিরোবে না ?

—না, দেরি হয়ে যাবে।

—অমনি বাজার থেকে ছোট খুকীর জন্যে একটা বালি কিনে এনো, আর জিরে মরিচ।

—আর কী কী নেই দেখ।

—আর সব আছে, আনতে হবে না।

বড় খুকী এই সময়ে বলিল, বাবা, আমার জন্যে একটা পেন্সিল কিনে এনো—আমার পেন্সিল নেই।

অনিলা বলিল, পেন্সিল আমার কাছে আছে, দেব এখন। মনে করে দিস কাল সকালে।

ক্ষেত্রবাবু মাসখানেক হইল, নতুন বাসায় উঠিয়া আসিয়া নতুন সংসার পাতিয়াছেন; মন্দ লাগিতেছে না। নিভাননীর মৃত্যুর পরে দিনকতক বড় কষ্ট গিয়াছিল, এখন আবার একটু সেবাযত্নের মুখ দেখিতেছেন। চিরকাল স্ত্রী লইয়া সংসার-ধর্ম করায় অভ্যস্ত, স্ত্রী-বিয়োগের পর সব যেন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকিত। অসুবিধাও ছিল বিস্তর, আট বছরের খুকীকে গৃহিণী সাজিতে হইয়াছিল, কিন্তু খুকী যতই প্রাণপণে চেষ্টা করুক, অনভিজ্ঞা শিশু মেয়ে কি তাহার মায়ের স্থান পূর্ণ করিতে পারে ?

আবার সংসারে আয়না-চিরুনির দরকার হইতেছে, সিঁদুরের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে, স্নো পাউডার কিনিবার প্রয়োজন তো আসিয়া পড়িল। চিরকাল যে গরুর কাঁধে জোয়াল, ছাড়া পাইলে অনভ্যস্ত মুক্তির অভিজ্ঞতা তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। মনে হয়, সংসার হইল না, কাহার জন্য খাটিয়া মরিব, কে আমার অসুখ হইলে মুখে একটু জল দিবে—ইত্যাদি। যে বলিষ্ঠ ও শক্তিমান মন মুক্তির পরিপূর্ণতাকে ভোগ করিতে পারে, নির্জ্জনতার ও উদাস মনোভাবের মধ্য দিয়া জীবনে নব নব দর্শন ও অনুভূতিরাজির সম্মুখীন হয়—নিরীহ স্কুলমাস্টার ক্ষেত্রবাবুর মন সে ধরনের নয়। কিন্তু না হইলে কী হয় ? যে ভাবে যে জীবনকে ভোগ করিতে পারে, সেই ভাবেই জীবন তাহার নিকট ধরা দেয়—ইহাতেই তাহার সার্থকতা। বাঁধা-ধরা নিয়ম কী-ই বা আছে জীবনকে ভোগ করিবার ?

ক্ষেত্রবাবু ছাত্রদের একতলা কুঠুরির অন্ধকূপে গিয়া ভীষণ গরমের মধ্যে পাখার তলায় অবসন্ন দেহ একখানা ইংরেজী ডিক্‌শনারির উপর এলাইয়া দিয়া পড়ানো শুরু করিলেন। আগে বেশ সময় কাটিত এখানে। এখন মনে হয়, অনিলার সঙ্গে গিয়া কতক্ষণে দুইদণ্ড কথা বলিবেন! ছাত্রও ছাড়ে না, এটা বুঝাইয়া দিন, ওটা বুঝাইয়া দিন, করিতে করিতে রাত সাড়ে নয়টা বাজাইয়া দিল। তারপর আসিল ছাত্রের কাকা। সে এফ-এ ফেল, কিন্তু তাহার বিশ্বাস ইংরেজীতে তাহার মত পণ্ডিত আর নাই, ভুল ইংরেজীতে সে ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে আলোচনা করিতে লাগিল, কী ভাবে ছেলেদের ইংরেজী শিখাইতে হয়। আজকালকার

প্রাইভেট মাস্টারেরা ফাঁকিবাজ, পড়াইতে জানে না, কেবল মাহিনা বাড়াও —এই শব্দ মুখে। তারপর সে আবার দেখিতে চাহিল, আজ ক্ষেত্রবাবু ছেলেদের কী পড়াইয়াছেন, কালকার পড়া বলিয়া দিয়াছেন কি না, টাস্ক্‌ দিয়াছেন কি না!

লোকটার হাত এড়াইয়া রাত দশটার সময় ক্ষেত্রবাবু বাসার দিকে আসিতেছেন, এমন সময়ে পথে রাখাল মিত্তিরের সঙ্গে দেখা। ক্ষেত্রবাবু পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিয়াও পারিলেন না, রাখাল মিত্তির ডাকিয়া বলিল, এই যে! ক্ষেত্রবাবু যে! শুনুন, শুনুন—

—রাখালবাবু যে। ভাল আছেন?

—কই আর ভাল, খেতেই পাই নে, তার ভাল! আপনারা তো কিছু করবেন না।—বলিতে বলিতে রাখালবাবু ক্ষেত্রবাবুর দিকের ফুটপাথে আসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, আসুন না, কাছেই আমার বাসা। একটু চা খেয়ে যান। সে দিন আপনাদের স্কুলে গিয়েছিলাম আমার বই দুখানা নিয়ে। সাহেব তো কিছু বোঝে না বাংলা বইয়ের, আপনারা একটু না বললে আমার বই ধরানো হবে না।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, এত রাত্তিরে আর যাব না রাখালবাবু, এখন চা খায় কেউ? আমি যাই—

—তবে আসুন, এই মোড়েই চায়ের দোকান, খাওয়া যাক একটু!

অগত্যা ক্ষেত্রবাবুকে যাইতে হইল। রাখালবাবু নাছোড়-বান্দা লোক, অনেক দিনের অভিজ্ঞতায় ক্ষেত্রবাবু জানেন, ইহার হাতে পড়িলে নিস্তার নাই। চা খাইতে খাইতে রাখালবাবু বলিলেন, এবার মশাই, ধরিয়ে দিতে হবে আমার বই দুখানা। আপনাদের মিঃ আলম ভারী বদ লোক, আমায় বলে কি না—ও সব চলবে না, আজকাল অনেক ভাল বই বেরিয়েচে। আমি বলি, তোমার বাবা আমার বই পড়ে মানুষ হয়েচে, তুমি আজ এসেচ রাখাল মিত্তিরের বইয়ের খুঁত ধরতে?

রাখাল মিত্তিরকে ক্ষেত্রবাবু বহুদিন জানেন। বয়স পঁয়ষট্টি, জীর্ণ অতিমলিন লংক্লথের পিরান গায়ে, তাতে ঘাড়ের কাছে ছেঁড়া, পায়ে সতের-তালি জুতা। রাখালবাবু কলিকাতার স্কুলসমূহে অতি পরিচিত, পনেরো বছর হইল স্কুল-মাস্টারি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য বই স্কুলে স্কুলে শিক্ষকদের ধরিয়া চালাইয়া দেন। তাতেই কায়ক্লেশে সংসার চলে।

ক্ষেত্রবাবুর দুঃখ হয় রাখালবাবুকে দেখিয়া। এই বয়সে লোকটা রৌদ্র নাই, বৃষ্টি নাই, টো-টো করিয়া স্কুলে স্কুলে সিঁড়ি ভাঙিয়া উঠানামা করিয়া বই চালানোর তদ্বির করিয়া বেড়ায়। কিন্তু বিশেষ কিছু হয় না। লোকটার পরন-পরিচ্ছদেই তাহা প্রকাশ।

বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, না না আপনার বই খারাপ কে বলে! চমৎকার বই!

রাখাল মিত্তির খুশী হইয়া বলিল, তাই বলুন দিকি! সকলে কি বোঝে? আপনি একজন সমজদার লোক, আপনি বোঝেন! আরে, এ কালে ব্যাকরণ জানে কে? আমি

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাতে ব্যাকরণে ফার্স্ট হই, আবার মেডেল আছে, দেখাব।

—বলেন কী!

—সত্যি। আপনি আমার বাসায় কবে আসচেন বলুন, দেখাব।

—না, দেখাতে হবে কেন! আপনি কি আর মিথ্যে বলছেন!

—সে দিন অমনি এক স্কুলের হেডমাস্টার বললে—মশাই, আপনার বই পুরনো মেথডে লেখা। ও এখন আর চলে না। এখন নতুন অথর বেরিয়েচে, তাদের বইয়ের ছাপা, ছবি, কাগজ অনেক ভাল। আপনার বই আজকাল ছেলেরাই পছন্দ করে না। শুনলেন? আরে, রাখাল মিত্তিরের বই পড়ে কত অথর সৃষ্টি হয়েচে। অথর! আমাকে এসেছেন মেথড শেখাতে। পয়সা হাতে পাই তো ভাল ছাপা ছবি আমিও করতে পারি। কিন্তু কী করব, খেতেই পাই নে, চলেই না। বুড়ো বয়সে লোকের দোরে দোরে ঘুরে বই কখানা ধরাই, তাতেই কোন রকমে—ছেলেটা আজ যদি মরে না যেত, তবে এত ইয়ে হত না। ধরুন, পঁচিশ বছরের জোয়ান ছেলে, আজ বাঁচলে চৌত্রিশ বছর বয়স হত। আমার ভাবনা কী?

—আচ্ছা, আমি দেখব চেষ্টা করে। এখন উঠি রাখালবাবু, রাত অনেক হল।

· এই শুনুন, নব ব্যাকরণ-সুধা প্রথম ভাগ—ফোর্থ ক্লাসের জন্যে। নব ব্যাকরণ-সুধা দ্বিতীয় ভাগ থার্ড ক্লাসের উপযুক্ত, আর এবার নতুন একখানা বাংলা রচনা লিখেছি, রচনাদর্শ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। খুব ভাল বই, পড়ে দেখবেন। সব রকমের রচনা আছে তাতে। কী ভাষা! ব্যাটারা সব বই লিখেছে, রচনা হয় কারও? কোনও ব্যাটা বাংলা সেণ্টেন্স্ শুদ্ধ করে লিখতে জানে? নিয়ে আসুন বই, আমি পাতায় পাতায় ভুল বের করে দেব—একবার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় 'কৃৎ' প্রত্যয়ের—চললেন যে, ও ক্ষেত্রবাবু, আচ্ছা। তাহলে শনিবারে বই নিয়ে যাব, শুনুন—মনে থাকবে তো? দেবেন একটু বলে হেডমাস্টারকে। আর শুনুন, বাংলা রচনাও একখানা নিয়ে যাব—যাতে হয়, একটু দেবেন বলে—নমস্কার—

ক্ষেত্রবাবু শেষের কথাগুলি ভাল শুনিতে পাইলেন না, তখন তিনি একটু দূরে গিয়া পড়িয়াছেন।

বাসায় অনিলা তাঁহার ভাত ঢাকা দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ক্ষেত্রবাবু ভাবেন, ছেলেমানুষ এত রাত পর্যন্ত জাগিয়া থাকার অভ্যাস নাই, সারাদিন খাটিয়া বেড়ায়। স্ত্রীকে ডাক দেন। অনিলা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসে, স্বামীকে দেখিয়া অপ্রতিভ হয়! বলে, এত রাত আজ?

—ঘুমুচ্ছিলে বুঝি?

অনিলা হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, খোকাখুকীদের খাইয়ে দিলাম, তারপর একখানা বই পড়তে পড়তে কখন ঘুম এসে গিয়েছে—

ক্ষেত্রবাবু আহারাদি করিলেন। অনিলা বলিল, হ্যাঁ গা, রাগ কর নি তো, ঘুমুচ্ছিলাম বলে?

—বাঃ, বেশ! রাগ করব কেন?

—আমার বালি আর জিরে-মরিচ এনেছ ?

—ওই যাঃ ! একদম ভুলে গিয়েচি। ভুলব না ? যদি বা ছাত্রের কাকার হাত এড়িয়ে বেরুলাম, তো পড়ে গেলাম রাখাল মিত্তিরের হাতে। সব স্কুলের সব মাস্টার ওকে এড়িয়ে চলে। একবার পাকড়ালে আর নিস্তার নেই।

—সে কে ?

—অথর।

—কী কী বই আছে ? কই, নাম শুনি নি তো ?

—শুনবে কি—বঙ্কিমবাবু, না রবি ঠাকুর, না শরৎ চাটুজ্জে ? স্কুলের—স্কুলের বই লেখে, নব কবিতাপাঠ, বাল্যবোধ—এই সব। বড্ড গরীব, হাতে পায়ে ধরে বই চালায়। ছিনে জোঁক।

—একদিন এনো না বাসায়, দেখব। আমি অথর কখনও দেখি নি—একদিন চা খাওয়াব।

—রক্ষে কর। তুমি চেন না রাখাল মিত্তিরকে। বাসায় আনলে আর দেখতে হবে না। সে কথাই তুলো না।

—বড়লোক ?

—খেতে পায় না। বই চলে না। সেকেলে ধরনের বই, একালে অচল। ওই যে বললাম, নাছোড়বান্দা হয়ে ধরে-পেড়ে চলায়।

অনিলার লেখাপড়ার উপর খুব অনুরাগ দেখিয়া ক্ষেত্রবাবুর আনন্দ হয়। নিভাননী লেখাপড়া জানিত সামান্যই ; অনিলা মন্দ লেখাপড়া জানে না, ইংরেজীও জানে। বই পড়িতে ভালবাসে বলিয়া শাঁখারিটোলার লাইব্রেরী হইতে ক্ষেত্রবাবু গত মাস হইতে বই আনিয়া দেন, দুইখানা বই একদিনেই কাবার। সম্প্রতি স্কুলের লাইব্রেরী হইতে ছোট ছোট ইংরেজী বই আনেন—অনিলার সেগুলি পড়িতে একটু সময় লাগে।

অনিলা সব সময় সব কথার মানে বুঝিতে পারে না। বলে, হ্যাঁ গা, হপ মানে কী ? বইয়েতে আছে এক জায়গায়—

—লাফিয়ে লাফিয়ে চলা।

—উঁহু, লাফানো নয়, কোন গাছপালা হবে। লাফানো হলে সে জায়গায় মানে হয় না।

—ওহো, ও একরকমের লতা, চাষ হয় ইংলণ্ডে, বিশেষ করে স্কটল্যাণ্ডে। মদ চোলাই হয় ঐ লতা থেকে, হুইস্কি বিশেষ করে—

ছোট খুকী ঘুমের ঘোরে ভয় পাইয়া কাঁদিয়া উঠিতে অনিলা ছুটিয়া গেল।

বেলা চারিটা বাজে। হেডমাস্টারের সারকুলার বাহির হইল, ছুটির পরে জরুরী মীটিং, কোন মাস্টার যেন চলিয়া না যায়। মাস্টারদের মুখ শুকাইল। দুইদিন আগে সাহেব ক্লাসে ঘুরিয়া পড়ানোর তদারক করিয়া গিয়াছেন, আজ সেই সব ব্যাপারের আলোচনা

হইবে, কাহার না জানি কী খুঁত বাহির হইয়া পড়িল।

যদুবাবু ফাঁকিবাজ মাস্টার, তাঁহার খুঁত বাহির হইবেই তিনি জানেন। অনেক দিন অনেক তিরস্কার খাইয়াছেন, বড় একটা গ্রাহ্য করেন না।

মীটিংয়ে হেডমাস্টার বলিলেন, সে দিন আপনাদের ক্লাসে পড়ানো দেখে খুব আনন্দিত হওয়ার আশা করেছিলাম; দুঃখের বিষয়, সে আনন্দলাভ ঘটে নি। টীচারদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আপনাদের অনেকবার বলেছি, কিন্তু তবুও এমন কতকগুলি টীচার আছেন, যাঁদের বার বার সে কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়ে দিতে হয়, এটা বড় দুঃখের কথা। রামবাবু?

একটি ছিপছিপে ছোকরা গোছের মাস্টার দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, স্যার্?

—আপনি ফিফ্‌থ ক্লাসে জিওগ্রাফি পড়াচ্ছিলেন, কিন্তু ম্যাপ নিয়ে যান নি কেন?

রামবাবু নিরুত্তর।

—কতবার না বলেছি, ম্যাপ না দেখালে জিওগ্রাফি পড়ানো—

এইবার রামবাবু সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলেন, স্যার্, দেশের কথা পড়ানো হচ্ছিল না, বাংলা দেশের উৎপন্ন দ্রব্য পড়াচ্ছিলাম, তাই—

—ও! উৎপন্ন দ্রব্য পড়ালে ম্যাপ নিয়ে যেতে হবে না? কেন, বাংলা দেশের ম্যাপ নেই?—আর ক্ষেত্রবাবু?

ক্ষেত্রবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

—আপনি রচনা শেখাচ্ছিলেন থার্ড ক্লাসে। কিন্তু শুধু সামনের বেঞ্চিতে যারা বসে আছে, তাদের দিকে চেয়ে কথা বলছিলেন, পেছনের বেঞ্চিতে ছাত্ররা তখন গল্প করছিল। ক্লাসসুদ্ধ ছেলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে না পারলে আপনার পড়ানো বৃথা হয়ে গেল, বুঝতে পারলেন না? তা ছাড়া ব্ল্যাকবোর্ড আদৌ ব্যবহার করেন নি সে ঘণ্টায়। পাণ্ডিট্?

পণ্ডিত বলিতে কোন্ পণ্ডিত, বুঝিতে না পারিয়া দুই পণ্ডিতই উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সাহেব জ্যোতির্ব্বিনোদের দিকে আঙুল দিয়া বলিলেন, আপনি বাংলা পড়াচ্ছিলেন ফোর্থ ক্লাসে। আপনি কি ভাবেন, খুব চেঁচিয়ে পড়ালেই ভাল পড়ানো হল! আপনি নিজের প্রশ্নের নিজেই উত্তর দিচ্ছিলেন, নামতা পড়ানোর সুরে চিৎকার করে পড়াচ্ছিলেন, ফলে, ইউ ফেল্‌ড্‌ টু ক্যারি দি ক্লাস উইথ ইউ।

পরে হেডপণ্ডিতের দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া রহস্যের সুরে বলিলেন, তা বলে ভাববেন না, আপনার পড়ানো নিখুঁত। আপনি এক জায়গায় বসে পড়ান, সামনের বেঞ্চিতে দৃষ্টি রাখেন এবং মাঝে মাঝে অবান্তর গল্প করেন। যদুবাবু?

যদুবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

—আপনার কোন দোষই গেল না। আমার মনে হয়, আপনার কাজে মন নেই। আপনার দোষের লিস্ট এত লম্বা হয়ে পড়ে যে, তা বলা কঠিন। আপনি কোনদিন ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করেন না, ক্লাসে ছেলেদের প্রশ্ন করেন না, টাস্ক্ দেন না—সে দিন বায়ুপ্রবাহের গতি বোঝাচ্ছিলেন, গ্লোব নিয়ে যান নি ক্লাসে। গ্লোব না নিয়ে গেলে—

এমন সময়ে একটি ছাত্রকে মীটিংয়ের ঘরের মধ্যে উঁকি মারিতে দেখিয়া হেডমাস্টার ধমক দিয়া বলিলেন, কি চাই ? এখানে কেন ?

ছাত্রটি মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, স্যার্, ফোর্থ ক্লাসের ধীরেনের চোখে বল লেগে চোখ বেরিয়ে এসেছে—

সকলেই লাফাইয়া উঠিলেন।

হেডমাস্টার বলিলেন, চোখ বেরিয়ে এসেছে, কোথায় সে ?

সকলে নীচের তলায় ছুটিলেন। স্কুলের বারান্দায় একটা তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলেকে শোয়াইয়া আরও অনেক ছেলে ঘিরিয়া মাথায় জল দিতেছে, বাতাস করিতেছে। হেডমাস্টারকে দেখিয়া ভিড় ফাঁকা হইয়া গেল। সত্যই চোখ বাহির হইয়া আধ ইঞ্চি পরিমাণ ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বীভৎস দৃশ্য !

তখনই মেমসাহেব খবর পাইয়া আসিয়া ছেলেটিকে কোলে লইয়া বসিল। সাহেব দারোয়ানকে ছেলের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। বড়লোকের ছেলে, বাড়ীতে মোটর আছে। মোটর আসিতে দেরি দেখিয়া সে স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে বল খেলিতেছিল, তাহার ফলেই এ দুর্ঘটনা।

দেখিতে দেখিতে ছেলের বাড়ীর লোক মোটর লইয়া ছুটিয়া আসিল। তাহার পূর্বেই স্কুলের পাশের ডাঃ বসু হেডমাস্টারের আহ্বানে আসিয়া ছেলেটিকে প্রাথমিক চিকিৎসা করিতেছিলেন। ছেলের বাবা, হেডমাস্টার ও ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ছেলেকে মোটরে মেডিক্যাল কলেজে লইয়া গেল। হেডমাস্টার সঙ্গে দুইজন মাস্টার দিলেন, শরৎবাবু ও গেমমাস্টার বিনোদবাবুকে যাইতে হইল।

পরের কয়দিন হেডমাস্টার নিজে এবং আরও তিন-চারজন মাস্টার হাসপাতালে গিয়া ছেলেটিকে দেখিতে লাগিলেন। যে চোখে চোট লাগিয়াছিল, সে চোখটা অস্ত্র করিয়া বাহির করিয়া ফেলিতে হইল, তবুও কিছু হইল না। ছেলেটির অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যায়। মেমসাহেব প্রায়ই গিয়া বসিয়া থাকে, সাহেবও এক-আধ দিন অন্তর যান, নারাণবাবু টুইশানিফেরতা প্রায় রোজই যান।

একদিন বিকালে হেডমাস্টারকে দেখিয়া ছেলেটি কাঁদিয়া ফেলিল। তখনও তাহার বাড়ী হইতে লোকজন আসে নাই। সাহেব্ গিয়া বসিয়া বলিলেন, ডোণ্ট্ ইউ ক্রাই মাই চাইল্ড্—দেয়ার ইজ এ লিট্‌ল্ ডিয়ার—বি এ হিরো—এ লিট্‌ল্ হিরো।

মুশকিল এই যে, সাহেব বাংলা বলিতে পারেন না ভাল, ছোট ছেলে তাঁহার ইংরেজী বুঝিতে পারে না। মুখে কথা বলিতে বলিতে হেডমাস্টার বিপন্ন মুখে ছেলেটির মাথায় ও পিঠে সান্ত্বনাসূচক ভাবে হাত বুলাইতে লাগিলেন : কান্না করে না, কান্না লজ্জার কঠা আছে —ইট্ ইজ এ শেম্ ফর এ বয় টু ক্রাই, বুঝেছ ? ভাল বালক আছে, সারিয়া যাইবে। কিছু হইবে না—

এমন সময় ছেলের মা ও বাড়ীর মেয়েদের আসিতে দেখিয়া সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইতে

দাঁড়াইতে বলিলেন, টোমার মার সামনে কান্না করে না। দেয়ার ইজ এ গুড বয়—আমার স্কুলের বালক কাঁদিবে না—আই নো ইউ উইল কিপ আপ দি প্রেষ্টিজ অফ ইওর স্কুল—আই ব্লেস ইউ মাই চাইল্ড—

ছেলেটি খানিকটা বুঝিল, খানিকটা বুঝিল না; কিন্তু সে কান্না বন্ধ করিল, আর কখনও কাহারও সামনে কাঁদে নাই। এমন কি, মৃত্যুর দুই দিন পূর্বে তাহার সংজ্ঞা লোপ হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত ভয় কি দুর্ব্বলতাসূচক একটি কথাও তাহার মুখে কেহ শোনে নাই।

মাস্টারদের বেতন আরও কমিয়া গিয়াছে; কারণ, জানুয়ারী মাসে নতুন ছেলে ভর্তি হয় নাই আশানুরূপ। এই মাসের মাহিনা লইতে গিয়া মাস্টারেরা ব্যাপারটা জানিতে পারিলেন।

চায়ের আসরে যদুবাবু বলিলেন, আর তো চলে না হে, একে এই মাইনে ঠিকমত পাওয়া যায় না, তাতে আরও পাঁচ টাকা কমে গেল। কলকাতা শহরে চালাই কী করে?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, তবুও তো দাদা, আপনি বউদিকে পাড়াগাঁয়ে রেখেছেন আজ ছ বছর। আমি আর-বছর বিয়ে ক'রে কী মুশকিলেই পড়ে গিয়েছি, বাসার খরচ কখনও চলত না, যদি টুইশানি না থাকত।

জ্যোতির্ব্বিনোদ বলিলেন, খোকার অন্নপ্রাশন দেবে কবে ক্ষেত্রবাবু?

—আর অন্নপ্রাশন! খেতে পাই নে তার অন্নপ্রাশন! বাসা-খরচ চলে না, বাসাভাড়া আজ তিন মাস বাকি।

—আমার কথা যদি শোনেন, তবে অবাক হয়ে যাবেন। স্কুলের ঘরে থাকি,—ঘরভাড়া লাগে না, তাই রক্ষে। আজ ছ মাস বাড়ীতে পাঁচটা করে টাকা মাসে, তাও পাঠাতে পারি নে। পঁচিশ ছিল, হল বাইশ। এখানেই বা কী খাই, বাড়ীতেই বা কী দিই?

যদুবাবু বলিলেন, আমার ভাবনা কিসের শুনবে? বউটাকে এক জ্ঞাতি শরিকের বাড়ী ফেলে রেখেছি দেশে। সেখানে তার কষ্টের সীমা নেই। কতবার লিখেছে, কিন্তু আনি কোথায় বলো? বত্রিশ থেকে আটাশ হল। মেসে খাই, তাই কুলোয় না।

শরৎবাবু বলিলেন, কোথাও চলে যাই ভাবি, কিন্তু এ বাজারে যাই-ই বা কোথায়?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আচ্ছা শরৎ, তোমায় একটা কথা বলি। আমাদের না হয় বয়েস হয়েছে, স্কুল-মাস্টারি ধরেচি অনেক দিন থেকে, কোথায় আর এ বয়েসে যাব! কিন্তু তুমি ইয়ং ম্যান, কেন মরতে এ লাইনে পচে মরবে? স্কুল-মাস্টারি কি কেউ শখ ক'রে করে? সমস্ত জীবনটা মাটি। এখনও সময় থাকতে অন্য পথ দেখে নাও—তুমি, কি ওই গেম-টীচার বিনোদবাবু, কেন যে তোমরা এখানে আছ! পিওর লেজিনেস্—

শরৎবাবু বলিলেন, লেজিনেস্ নয় দাদা। এখানে পঁচিশ পেতাম, হল বাইশ। অনেক চেষ্টা করেছি, হেন আপিস নেই যেখানে দরখাস্ত-হাতে যাই নি, হেন লোক নেই যাকে ধরি নি। আমরা গরীব, নিজের লোক না থাকলে হয় না! আমাদের কে ব্যাক্ করচে, বলুন না দাদা?

—কিন্তু তা তো হল, এ স্কুলের অবস্থা দিন দিন হয়ে দাঁড়াল কী ?

—কে জানে কেমন ! সাহেবের অত কড়াকড়ি, অমন পড়ানোর মেথড্—কিছুতেই কিছু হচ্ছে না !

যদুবাবু বলিলেন, তা নয়, কী হয়েছে জান ? পাশের স্কুলগুলো ছেলে ভাঙিয়ে নেয়, ওরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে ছেলে যোগাড় করে। হেডমাস্টার মাস্টারদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ী বাড়ী যায়।

—আমাদেরও যেতে হবে।

—হেডমাস্টার যে রাজী নন। ওতে মাস্টারদের প্রেস্টিজ থাকে না, ওসব ব্যবসাদারি ক'রে স্কুল রাখার চেয়ে না রাখা ভাল—এ সব বিলিতী মত এখানে খাটবে না। আমি জানি, লালবাজারে একটা স্কুল থেকে ছেলে ট্রান্সফার নেবে বলে দরখাস্ত দিল—হেডমাস্টার দুজন টীচার নিয়ে তাদের বাড়ী গিয়ে পড়ল, গার্জেনকে বোঝালে—কেন ট্রান্সফার নেবেন, কী অসুবিধে হচ্ছে বলুন—কত খোশামোদ ! কিছুতেই ছেলেকে নিতে দিলে না।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমাদের স্কুলে যেমন ট্রান্সফারের দরখাস্ত পড়েছে, আর সাহেব অমনি তখনই ক্লার্ককে ডেকে বলবে—কত বাকি আছে দেখ, দেখে ট্রান্সফার দিয়ে দাও।

—এ রকম ক'রে কি কলকাতার স্কুল চলে ? সাহেবকে বোঝালেও বুঝবে না।

—প্রেস্টিজ যাবে ! প্রেস্টিজ ধুয়ে জল খাই এখন।

পরদিন স্কুলে মিঃ আলম টীচারদের লইয়া এক গুপ্ত-সভা করিলেন, স্কুলের ছুটির পর তেতলার ঘরে। উদ্দেশ্য, এ হেডমাস্টারকে না তাড়াইলে স্কুলের উন্নতি নাই। একা দুই শত টাকা মাহিনা লইবে, তাহার উপর ছেলে আসে না স্কুলে। মাস্টারদের এই দুর্দ্দশা। হেড-মাস্টার ও মেম বিতাড়ন না করিলে স্কুল টিকিবে না।

যদুবাবু বলিলেন, কী উপায়ে সরানো যায় বলুন ? হিমালয় পর্ব্বত কে সরায় ?

—কমিটীর কাছে দরখাস্ত পেশ করি সবাই মিলে। আমাদের ভিউজ আমরা লিখি।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, কিছু হবে না মিঃ আলম। কমিটী ওতে কানও দেবে না, উল্টো বিপত্তি হবে।

মিঃ আলম বলিলেন, দেখুন, কী হয় ! আমি বলছি, ওতে ফল হ'তেই হবে।

এ মীটিংয়ে নারাণবাবু ছিলেন না, কিন্তু রামেন্দুবাবু ছিলেন। তিনি বলিলেন, আমি এ অপোজ করছি। হেডমাস্টার বিতাড়ন ক'রে ফল ভাল হবে কে বলেছে ? সেটা উচিতও নয়।

মিঃ আলম বলিলেন, তবে কিসে ফল ভাল হবে ?

—তা আমি জানি নে, তবে হেডমাস্টার কড়া বটে, কিন্তু এ ভেরি গুড টীচার। অমন লোককে বুড়ো বয়সে তাড়ালে ধর্ম্মে সইবে না, আর তাড়াতে পারবেনও না।

—কেন ?

—কমিটীর কাছে হেডমাস্টারের পোজিশন খুব সিকিওর। তারা ওঁকে মেনে চলে, শ্রদ্ধা করে।

—শত্রুও আছে, যেমন ডাক্তার গাঙ্গুলী, সাতকড়ি দত্ত, মিঃ সেন—এঁরা স্বদেশী কিনা, সাহেবকে দেখতে পারেন না। আপনারা বলুন, আমি তদ্বিরতদারক আরম্ভ করি, মেম্বরদের —বিশেষ ক'রে স্বদেশী মেম্বরদের বাড়ী যাই।

রামেন্দুবাবু বলিলেন, আমি এর মধ্যে নেই। তবে আমি সাহেবকেও কিছু বলব না। আপনাদের এর মধ্যেও থাকব না, আপনারা যা হয় করুন।

মিঃ আলম বলিলেন, একটা কথা আছে এর মধ্যে।

—কী?

—আপনারা সবাই কিন্তু বলুন, এর পরে আমাকে হেডমাস্টার করবেন আপনারা।

মাস্টারেরা দণ্ডমুণ্ডের মালিক নহেন, বেশ ভাল রকমই তাহা জানেন, তবুও ঘাড় নাড়িয়া কেহ সায় দিলেন, কেহ উৎসাহের সহিত বলিলেন, বেশ, বেশ।

অর্থাৎ যে ক্ষমতা তাঁহাদের নাই, অপর একজনের মুখে তাহা তাঁহাদের আছে শুনিয়া মাস্টারের দল খুশী ও উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।

রামেন্দুবাবুর দলের দুই-একজন মাস্টার নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিলেন, তাঁহারা রামেন্দুবাবুকে হেডমাস্টার করিবেন।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, মিঃ আলম, তবে আপনাকে মাইনে কম নিতে হবে।

—কত বলুন?

—একশোর বেশী নয়—

—সে আপনাদের বিবেচনা, যা ভাল হয় করবেন।

যদুবাবু বলিলেন, আচ্ছা, আপনাকে যদি আর পঁচিশ বেশী দেওয়া যায়, তবে আপনি আমাদের মাইনের বিষয়টাও দেখবেন। এই স্কেল করুন না, গ্র্যাজুয়েট পঞ্চাশ টাকা। আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট চল্লিশ।

মাহিনার কত স্কেল হইবে, তাহা লইয়া কিছুক্ষণ মাস্টারদের তুমুল তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল, যদুবাবুর প্রস্তাব গ্র্যাজুয়েটদের পক্ষে ঠিকই রহিল, তবে আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েটদের ত্রিশের বেশী আপাতত দেওয়া চলিবে না।

জ্যোতির্বিনোদ বলিলেন, পণ্ডিতদের সম্বন্ধে একটা বিবেচনা করুন।

মিঃ আলম বলিলেন, আপনারা কত হলে খুশী হন?

যদুবাবু বিষম আপত্তি উঠাইলেন। আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট আর পণ্ডিত এক স্কেলে মাহিনা পাইবে, তাহা হয় না। হেডপণ্ডিত পঁয়ত্রিশ, অন্য পণ্ডিত ত্রিশ ও পঁচিশ।

হেডমাস্টার হওয়ার আসন্ন সম্ভাবনায় উৎফুল্ল মিঃ আলম যদুবাবুর প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া গেলেন। মাস্টারেরা বলাবলি করিতে লাগিলেন, ব্যবস্থা ভালই হইয়াছে।

যদুবাবু বলিলেন, আজ দু বছর ধরে আড়াই মাস খেটে এক মাসের টাকা পাচ্ছি—আজ এক টাকা, কাল দু টাকা, এ আর সহ্য হয় না। তার ওপর মাইনে গেল কমে। ইনক্রিমেণ্ট তো হলই না আধ পয়সা আজ চোদ্দ বছরের মধ্যে।

হেডপণ্ডিত বলিলেন, আমার উনিশ বছরের মধ্যে—

জ্যোতির্ব্বিনোদ বলিলেন, আমার সতেরো বছরের মধ্যে—

বোঝা গেল, সকলেই বর্ত্তমান ব্যবস্থার উপর অসন্তুষ্ট। নতুন কিছু হইলেই খুশী। সকলেরই উন্নতি হইবে, বাজার-খরচ সচ্ছলভাবে করিতে পারিবেন, বাসায় ফিরিয়া পরোটা জলখাবার খাইতে পারিবেন, দুই-একটা জামা বেশী করাইতে পারিবেন, বাড়ীতে অনেকেরই বাসনপত্র কম—কিছু থালা বাটি কিনিবেন, কন্যার বিবাহের দেনা কেহ বা কিছু শোধ করিতে পারিবেন।

কাল হইতে স্কুলে ছেলেদের জন্য টিফিনের বন্দোবস্ত হইবে। 'ডি. পি. আই'-এর সারকুলার অনুযায়ী ছেলেদের নিকট হইতে কিছু কিছু খরচা লইয়া স্কুল ছেলেদের টিফিনের সময় জলখাবারের আয়োজন করিবে। সাহেব ঠিক করিয়াছেন—লাল আটার রুটি আর ডাল, ঠাকুর রাখিয়া তৈরি করানো হইবে, প্রত্যেক ছেলেকে দুটি পয়সা দিতে হইবে খাবার বাবদ —দুইখানা রুটি ও ডাল মাথা-পিছু।

মিঃ আলম বলিলেন, শুনুন, মীটিং ভাঙবার আগে আর একটা কথা আছে। কাল থেকে টিফিন দেওয়া হবে ছেলেদের, ওর হিসেবপত্র আর ছেলেদের দেওয়া-খোওয়ার তদারক করতে হবে একজন টীচারকে, আপনাদের মধ্যে কে রাজী আছেন? সাহেব আমাকে লোক ঠিক করতে বলেচেন।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, কে আবার ওই হাঙ্গামা ঘাড়ে নেবে, থাকি টিফিনের সময় একটু শুয়ে—

হেডপণ্ডিত বলিলেন, আমাদের শরৎ-ভায়া বরং করো—ইয়ং ম্যান। তুমি কি বিনোদ—

হিসাবপত্র করিতে হইবে এবং তিনশো ছেলেকে ডাল রুটি দেওয়ার ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইবে বলিয়া কেহই রাজী হয় না। মিঃ আলম বলিলেন, তাই তো, একটা যা হয় ঠিক করে ফেলতে হবে।

যদুবাবু চুপ করিয়া ছিলেন। বলিলেন, তা, তবে—যখন কেউ রাজী হয় না, তখন আর কী হবে, আমাকেই করতে হবে। সাহেবের অর্ডার, না মেনে তো উপায় নেই!

—আপনি নেবেন তা হলে?

—তাই ঠিক রইল মিঃ আলম। কী আর করি, একটু কষ্ট হবে বটে কিন্তু চাকরি যখন করছি—

কর্ত্তব্যকার্য্যে এতখানি অনুরাগ যদুবাবুর বড় একটা দেখা যায় না, সুতরাং অনেকে বিস্মিত হইলেন।

মিঃ আলম বলিলেন, আপনারা নির্ভয়ে নেমে যান। সাহেব টুইশানিতে বার হয়েছে, মেমসাহেবও নেই। কেউ টের পাবে না।

সকলে ভয়ে ভয়ে নীচে নামিয়া গেল।

চায়ের মজলিসে রামেন্দুবাবু বলিলেন, আমাকে আপনারা এর মধ্যে কিন্তু টানবেন না।

সকলে বলিলেন, কেন, কেন, কী বলুন ?

—মিঃ আলম হেডমাস্টার হোন, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু সাহেবের বিরুদ্ধে এ ধরনের ষড়যন্ত্র আমি পছন্দ করি নে। এ ঠিক নয়।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, তা ছাড়া আপনি কি ভেবেছেন, এ কখনও হবে ? এ হল 'কালনেমির লঙ্কাভাগ'।

বাহিরে আসিয়া সকলেরই মন হাওয়া-বার-হওয়া বেলুনের মত চুপ্‌সিয়া গিয়াছিল। এতক্ষণ বড় বড় কথা, প্রস্তাব গ্রহণ-প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি ব্যাপারের মধ্যে থাকিয়া নিজেদের পার্লামেন্টের মেম্বরের মত পদস্থ বলিয়া মনে হইতেছিল। সাহেব-তাড়ানো, সাহেব-বাঁচানো প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ কর্ম্মে ডিক্রি-ডিসমিসের মালিক বুঝি তাঁহারাই—বর্তমানে ওয়েলেসলি স্ট্রীটের কঠিন পাষাণময় ফুটপাথে পা দিয়াই সে ঘোর তাঁহাদের কাটিতে শুরু করিয়াছে।

যদুবাবু, যিনি অতগুলি প্রস্তাব আনয়নকারী উৎসাহী মেম্বর, তিনিও টানিয়া টানিয়া বলিলেন, হয় বলে তো বিশ্বাস হচ্ছে না, তবে দেখ—সাহেবকে তাড়াবে কে ?

শরৎবাবু বলিলেন, আপনি কখন কোন্‌দিকে থাকেন যদুদা, আপনাকে বোঝা ভার। এই মিঃ আলমকে গালাগাল না দিয়ে জল খান না, আবার দিবি্য ওকে হেডমাস্টার করার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন! কেন, আমরা সকলে ঠিক করেছি রামেন্দুবাবুকে ছাড়া আর কাউকে হেডমাস্টার করা হবে না।

জ্যোতির্ব্বিনোদ বলিলেন, আমিও তাই বলি।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমারও তাই মত।

যদুবাবু রাগিয়া বলিলেন, বেশ তোমরা! আমিও বলি, রামেন্দুবাবুই উপযুক্ত লোক। আমি ওখানে না বলে করি কী ? আলম যখন ও-রকম ক'রে বললে, না বলি কী ক'রে ?

রামেন্দুবাবু বলিলেন, আপনাদের কারও লজ্জা বা কিছুর কারণ নেই। ক্ষেত্রবাবু ঠিক বলেছেন, এ সব কালনেমির লঙ্কাভাগ হচ্ছে। ক্লার্কওয়েল সাহেব যথেষ্ট উপযুক্ত লোক, যদি তিনি চলে যান, তা হলে যে-কেউ হতে পারেন, আমার কোনও লোভ নেই ওতে।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, তা নিয়ে এখন আর তর্কাতর্কি করে কী হবে ? তবে আমার এই মত সাহেবের জায়গায় যদি কেউ হেডমাস্টার হওয়ার উপযুক্ত থাকেন স্টাফের ভেতর, তবে রামেন্দুবাবু আছেন।

যদুবাবু বলিলেন, আমি কি বলেচি নয় ?

—বলছিলেন তো দাদা, আমি সোজা কথা বলব।

—না, এ তোমার অন্যায় ক্ষেত্র ভায়া। তুমি আমার কথা না বুঝে আগেই—

রামেন্দুবাবু হাসিয়া উভয়ের বিবাদ থামাইয়া দিলেন।

সেদিনকার চায়ের মজলিস শেষ হইল।

দিন তিনেক পরে জ্যোতির্বিনোদ ছুটির ঘণ্টা পড়িতেই বাহিরে যাইতেছেন, যদুবাবু ফোর্থ ক্লাস হইতে ডাক দিয়া বলিলেন, কোথায় যাচ্ছ, ও জ্যোতির্বিনোদ ভায়া ?

—একটু কাজ আছে। কেন দাদা ?

—না তাই বলছি, এখনই ফিরবে ?

—ফিরতে দেরি হবে। শ্যামবাজারে যাব একবার।

—ও !

কিন্তু কী কারণে ওয়েলেস্‌লির মোড় পর্য্যন্ত গিয়া জ্যোতির্বিনোদের শ্যামবাজার যাওয়ার প্রয়োজন হইল না। সুতরাং তিনি ফিরিয়া তেতলায় নিজের ঘরে ঢুকিলেন। টীচার্স-রুমের পাশেই ছোট ঘর, যাইবার সময় দেখিলেন, যদুবাবু টীচার্স-রুমে কী করিতেছেন। কৌতূহলী হইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, কী, একা এখানে বসে এখনও দাদা ?

যদুবাবু চমকিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি কী যেন একটা ঢাকিতে চেষ্টা করিলেন, এবং পরে কথা বলিবার প্রাণপণ চেষ্টায় চোখ ঠিক্‌রাইয়া অস্পষ্টভাবে গোঙরাইয়া কী যেন বলিতে গেলেন।

জ্যোতির্বিনোদ দেখিলেন, যদুবাবুর সামনে টেবিলের উপর শালপাতায় খান পাঁচ-ছয় লাল আটার রুটি ও কিছু ডাল—যদুবাবুর মুখ রুটি ও ডালে ভর্ত্তি। আশ্চর্য্য নয় যে, এ অবস্থায় তাঁহার মুখ দিয়া স্পষ্ট কথা উচ্চারিত হইতেছে না। যদুবাবু ভীষণ আয়াসে ডালরুটির দলাকে জব্দ করিয়া কোন রকমে গিলিয়া ফেলিলেন এবং স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া অপ্রতিভ মুখে বলিলেন, এই টিফিনের পরে এক-আধখানা বাড়তি রুটি ছিল, তাই বলি ফেলে দিয়ে কী হবে ! ঠাকুরকে বললাম, দাও ঠাকুর—

—বেশ বেশ, খান না।

—তা ইয়ে—তুমি যদি খাও, কাল থেকে যদি বাড়তি থাকে, তোমার জন্যেও না হয়—

জ্যোতির্বিনোদ কী ভাবিয়া বলিলেন, কেউ আবার লাগাবে মিঃ আলমের কানে !

যদুবাবু ষড়যন্ত্র করিবার সুরে ও ভঙ্গিতে নিচু গলায় চোখ টিপিয়া বলিলেন, কেউ টের পাবে ! তুমিও যেমন ! যেখানে আধ মণ ময়দা মাখা হয় ডেলি, সেখানে ছখানা কি আটখানা রুটির হিসেব কে রাখছে ? আর আমার হাতেই তো হিসেব। তুমি নাও।

জ্যোতির্বিনোদও নির্ব্বোধ নন। তিনি বুঝিলেন, যদুবাবুর এ রুটি খাইতে হইলে ছুটির পরে নির্জন টীচার্স-রুম ভিন্ন আর স্থান নাই। সে রুমের পরেই জ্যোতির্বিনোদের থাকিবার ক্ষুদ্র কুঠুরি, তাঁহাকে অংশীদার না করিলে যদুবাবু উহা একা একা আত্মসাৎ কি করিয়া করিবেন ? সেই জন্যই যদুবাবু অত আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, জ্যোতির্বিনোদ কোথায় যাইতেছে, অর্থাৎ এখনই ফিরিবে কিনা !

ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, তা যদি বাড়তি থাকে, তবে না হয়—

যদুবাবু উৎসাহের সঙ্গে বলিলেন, বাড়তি আছে—বাড়তি আছে—হয়ে যাবে। খান আষ্টেক করে রুটি তোমার জন্যে, তা সে এক রকম হবে এখন। জলখাবারটা বিকেলবেলার, বুঝলে না ? পেটে খিদে মুখে লাজ—না ভায়া, ও কোন কথা নয়।

তিন-চার দিন বেশ খাওয়া-দাওয়া চলিল দুইজনের।

জ্যোতির্ব্বিনোদ দেখিলেন, যদুবাবু ক্রমশ রুটির সংখ্যা ও ডালের পরিমাণ বাড়াইতেছেন। একদিন শালপাতা খুলিলে দেখা গেল, বাইশখানা রুটি ও প্রায় সের খানেক ডাল তাহার ভিতরে।

জ্যোতির্ব্বিনোদ ভয় পাইয়া বলিলেন, এ নিয়ে কথা হবে দাদা। এত কেন?

—আরে, নাও না খেয়ে। রাত্রের খাওয়াটাও এই সঙ্গে না-হয়—সে পয়সাটা তো বেঁচে গেল—এ পেনি সেভ্‌ড্‌ ইজ এ পেনি গট্, অর্থাৎ—

—কিন্তু দাদা, আমার শরীর খারাপ, আমি এত খেতে পারব না যে।

—বেশ, বেশ, যা পার খাও! না-হয় যা থাকবে, আমিই খাব—ফেলা যাচ্ছে না।

এদিকে মিঃ আলমের ষড়যন্ত্র বেশ পাকিয়া উঠিল। মিঃ আলম কয়েকজন মেম্বরের বাড়ী গিয়া তাঁহাদের বুঝাইলেন, সাহেবকে না তাড়াইলে স্কুলের উন্নতি সম্ভব নয়। মীটিংয়ের দিন পর্য্যন্ত ধার্য্য হইয়া গেল। স্থির হইল, ডাক্তার গাঙ্গুলী সে দিন সাহেবকে সরাইবার প্রস্তাব কমিটীতে উঠাইবেন; কমিটীর অন্যতম স্বদেশী মেম্বর সাতকড়ি দত্ত, জনৈক লোহা-পটির দালাল সে প্রস্তাব সমর্থন করিবে।

রামেন্দুবাবু গোপনে ক্ষেত্রবাবুকে বলিলেন, মিঃ আলম এদিকে বেশ হেসে কথা বলে হেডমাস্টারের সঙ্গে, আর একদিকে এ রকম ষড়যন্ত্র করে—এ অত্যন্ত খারাপ। আমার মনে হয়, হেডমাস্টারকে ওয়ার্নিং দিয়ে দিলে ভাল হয়।

—কে দেবে?

—আমি দিতে পারতাম, কিন্তু আমার উচিত হবে না। আমি মিঃ আলমের মীটিংয়ে প্রথম দিন ছিলাম।

—তাই কী? আর তো ছিলেন না। আপনিই গিয়ে বলুন।

—সেটা ভদ্রলোকের কাজ হয় না। আর কাউকে দিয়ে বলাতে পারেন তো বলান।

—আর কে যাবে? এক আপনি, নয় তো নারাণবাবু।

—বুড়ো মানুষকে আর এর মধ্যে জড়িয়ে লাভ নেই। হি ইজ্ টু গুড্ এ ম্যান ফর অল দীজ—নিরীহ বেচারী ওঁকে আর এ বয়সে কেন এর মধ্যে?

—আমি বলব?

—আপনার উচিত হবে না। দু-মুখো সাপের কাজ হবে।

—তবে লেট্ ফেট্ টেক্ ইট্‌স্ কোর্স—

—তাই হোক।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ক্ষেত্রবাবু ও জ্যোতির্ব্বিনোদ রাত দশটার পরে হেডমাস্টারের দোরে ঘা দিলেন।

সাহেব খয়রাগড়ের রাজকুমারকে পড়াইয়া সবে ফিরিয়াছেন। বলিলেন, কে নারাণবাবু?

ক্ষেত্রবাবু কাশিয়া বলিলেন, না স্যার্, আমি ক্ষেত্রবাবু।

—ও! ক্ষেত্রবাবু? এস এস। এত রাত্রে?

ক্ষেত্রবাবু ঘরে ঢুকিয়া সামনের চেয়ারে মেমসাহেবকে দেখিয়া বলিলেন, গুড্ ইভ্নিং মিস্ সিবসন্!

বুদ্ধিমতী মেমসাহেব প্রীতিসম্ভাষণ-বিনিময়ান্তে অন্য ঘরে চলিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবু সাহেবকে সব খুলিয়া বলিলেন।

সাহেব তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিলেন, এই! তা আমি রিজাইন দিতে প্রস্তুত আছি, তাতে যদি স্কুল ভাল হয়—হোক।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, না স্যার্, তা হলে স্কুল একদিনও টিকবে না।

—না, যদি মেম্বরেরা আমার কাজে সন্তুষ্ট না হন, তবে আমার থাকার দরকার নেই।

—স্যার্, আপনি যদি বলেন, তবে আমরাও অন্য অন্য মেম্বরের বাড়ী গিয়ে উল্‌টো তদ্বির করি, আপনাকে পছন্দ করে এমন মেম্বর সংখ্যায় কম নয় কমিটীতে।

সাহেব নিতান্ত উদাসীন ভাবে বলিলেন, আমি এই স্কুল গড়ে তুলেছি, যখন এ স্কুলের ভার আমি নিই, তখন স্কুলে দেড় শো ছেলে ছিল। আমি হাতে নিলে চার শো দাঁড়ায় ছাত্রসংখ্যা। তারপর আবার কমে গেল। নতুন প্রণালীতে স্কুল চালাব ভেবেছিলাম, অক্সফোর্ড থেকে শিখে এসেছিলাম, আমার সব নোন্ করা আছে। এক গাদা নোন্—দেখতে চাও দেখাব একদিন। কিন্তু যদি কমিটী আমাকে না চায়, রিজাইন দিয়ে চলে যাব। এই অঞ্চলে সবাই আমার ছাত্র—চোদ্দ বছর ধরে এই স্কুলে কত ছাত্র আমার হাত দিয়ে বেরিয়েছে! বুড়ো বয়সে খেতে না পাই, এর বাড়ী একদিন ব্রেকফাস্ট খেলাম, আর-এক ছাত্রের বাড়ী একদিন ডিনার খাওয়ালেও এই রকম করে চলে যাবে। নারাণবাবু কোথায়?

—বোধ হয় এখন টুইশানিতে।

—ওই একজন সাধুপ্রকৃতির মানুষ। এ সব কথা নারাণবাবু জানে?

—আমাদের মনে হয় শোনেন নি। ওঁর কানে এ কথা কেউ ইচ্ছে ক'রেই ওঠায় না।

—দেখে এস তো। যদি এসে থাকে, ডেকে নিয়ে এস—

নারাণবাবু কিছুক্ষণ পরে জ্যোতির্বিনোদের সঙ্গে ঘরে ঢুকিলেন।

সাহেব বলিলেন, শুনেছেন নারাণবাবু, আমাকে কমিটী থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পরামর্শ হচ্ছে।

নারাণবাবু বিস্মিত মুখে অবিশ্বাসের স্বরে বলিলেন, কে বললে স্যার্?

—জিজ্ঞেস করুন এঁদের। আমার বিশ্বস্ত লেফ্‌টেনাণ্ট্ মিঃ আলম এই চক্রান্ত করছে। এত্ তু ব্রুতি!

নারাণবাবু হাসিয়া বলিলেন, জগতে ব্রুটাসের সংখ্যা কম নেই স্যার্। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি যে, এত দিন আমি কিছুই শুনি নি এ কথা!

—কোথা থেকে শুনবেন? আপনি থাকেন আপনার কাজ নিয়ে।

—স্যার, আপনি নির্ভয়ে থাকুন। আপনার কিছু হবে না।

—ভয় কিসের? আমি রিজাইন দিতে রাজী আছি এই মুহূর্তে।

—আমার মত শুনুন। কাউন্টার প্রোপ্যাগাণ্ডা একটা করতে হয়—

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমি তা বলেছি। আসুন—আপনি, আমি, শরৎবাবু, গেম্‌-টীচার সব মেম্বরদের বাড়ী বাড়ী যাই—

—আমার আপত্তি নেই।

হেডমাস্টার বলিলেন, না, নারাণবাবুকে আমি কোথাও নিয়ে যেতে বলি নে। লিভ্‌ হিম্‌ এলোন। আমি আপনাদেরও যেতে বলি নে। আমি ও-সব জিনিসকে বড় ঘৃণা করি। এটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, রাজনীতির আসর নয়, এর মধ্যে দল-পাকানো, ষড়যন্ত্র—এ সবের স্থান নেই। না হয় চলেই যাব।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, স্যার, আমাদের অনুমতি দিন। আমরা দেখি—

নারাণবাবু বৃদ্ধ বটে কিন্তু বেশ তেজী লোক, তাহা বোঝা গেল। তিনি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন, একটা কথা বলে যাচ্ছি স্যার, আপনাকে কেউ তাড়াতে পারবে না এ স্কুল থেকে। কিন্তু একটা ভবিষ্যদ্বাণী করি, মিঃ আলম এ স্কুলে আর বেশীদিন নয়।

সাহেব বলিলেন, ভাল কথা, রামেন্দুবাবুর কি মত?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, তিনি নিরপেক্ষ। তিনি কোন দলেই যেতে রাজী নন।

—হি ইজ এ বর্ন জেন্টল্‌ম্যান—দুজন লোক দেখলাম এ স্কুলে, একজন সামনেই বসে, আর একজন ওই রামেন্দুবাবু।

পরে হাসিয়া ক্ষেত্রবাবুদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, মাই অ্যাপোলজি টু ইউ, আপনাদের ওপর কোন মন্তব্য করি নি এতদ্বারা।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, স্যার, আমাকে তিনটে টাকা দিন—আমি একবার এই রাত্রেই দু-একজন মেম্বরের বাড়ী যাই—ডাঃ সেনের বাড়ী যাওয়া বিশেষ দরকার। সেক্রেটারী বিপিন-বাবু আমাদের দিকে আছেন। মীটিংয়ের দেরি নেই, একটু চট্‌পট্‌ চেষ্টা করা দরকার।

সাহেব টাকা বাহির করিয়া দিলেন।

ক্ষেত্রবাবু বাহিরে আসিয়া নারাণবাবুকে ইঙ্গিতে তাঁহার সঙ্গে আসিতে বলিলেন।

হেডমাস্টার তখনই দোরের কাছে দাঁড়াইয়া তিরস্কারের সুরে বলিলেন, ক্ষেত্রবাবু, আশা করি আপনি আমার আদেশ শুনবেন, আমি এখনও এ স্কুলের হেডমাস্টার মনে রাখবেন। নারাণবাবুকে কোথাও নিয়ে যাবেন না, আমার ইচ্ছা নয়, এই সরল-প্রাণ বৃদ্ধকে আপনারা এ সব কাজে জড়ান। আপনি একা চলে যান—

মীটিংয়ের আগে ক্ষেত্রবাবুর দল মেম্বরদের বাড়ী বাড়ী গেলেন। যেখানেই যান, সেখানেই শোনা যায়, অপর পক্ষ কিছুক্ষণ আগে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

স্বদেশীভাবের লোক গাঙ্গুলীর কাছে ক্ষেত্রবাবুর দল অপমানিত হইলেন।

ডাঃ গাঙ্গুলী বলিলেন, মশাই, আপনারা কী রকম লোক জিজ্ঞেস করি? পান তো

পঁচিশ-ত্রিশ মাইনে। সাহেবের খোশামুদি করতে ইচ্ছে হয় এতে? একেবারে অপদার্থ সব! কী শিক্ষা দেবেন আপনারা ছেলেদের? নিজেদের এতটুকু আত্মসম্মান জ্ঞান নেই? সাহেবের হয়ে তদ্বির করতে এসেছেন, লজ্জা করে না? সাহেবকে এ মীটিংয়ে তাড়াবই—তারপর আপনাদের মত অপদার্থ দু-একজন টীচারকেও সরাতে হবে, তবে যদি এবার স্কুলটা ভাল হয়, ইত্যাদি।

মীটিংয়ের দিন ক্ষেত্রবাবু দল লইয়া আর-একবার দুই-একজন মেম্বরের বাড়ী গেলেন। মেম্বরদের বিশ্বাস নাই, হয়তো ভুলিয়া বসিয়া আছে, ঘন ঘন মনে না করাইয়া দিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। সকলেই বলিল, তাহাদের মনে করাইয়া দিতে হইবে না।

ছয়টার সময় মীটিং। বেলা চারটার সময় হইতে উভয় দল আসিয়া স্কুলে বসিয়া রহিল; অথচ কেহ কাহারও প্রতি অসম্মান দেখাইল না। মিঃ আলম হেডমাস্টারের ঘরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, খাতাপত্র কী কী দরকার আছে মীটিংয়ে নিয়ে যাবার জন্য, বলুন।

—বোস মিঃ আলম, চা খাবে এক পেয়ালা?

—থ্যাঙ্ক্‌স্ এখন আর থাক্।

মীটিং বসিল। সাহেবের অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব। মিঃ আলমের দলের অত তদ্বির, অত অনুরোধ, অত ধরাধরি সব বুঝি ভাসিয়া যায়। সাহেবকে সরাইবার সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব কেহ আনে না—কার্য্য-তালিকার মধ্যে এ প্রস্তাব নাই; সুতরাং 'বিবিধ' কতক্ষণে আসে, সেই অপেক্ষায় উভয়দল দুরুদুরু বক্ষে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ডাক্তার গাঙ্গুলী, যিনি অত লম্ফঝম্প করিয়াছিলেন সাহেব তাড়ানোর জন্য, তিনি মীটিংয়ের গতিক বুঝিয়া সরু মিহি সুরে প্রস্তাব আনিলেন যে সাহেবকে অত বেতন দিয়া এই গরীব স্কুলে রাখা পোষাইতেছে না, বিশেষতঃ নতুন ছাত্র যখন আশানুরূপ ভর্তিও হইতেছে না। অতএব সাহেবের বেতন কমানো হউক।

সে প্রস্তাব সমর্থন করিলেন অন্যতম স্বদেশী মেম্বর নৃপেন সেন। সভাপতি প্রস্তাব ভোটে ফেলিতে দেখা গেল, ডাঃ গাঙ্গুলী আর নৃপেনবাবু ছাড়া প্রস্তাবের পক্ষে আর কাহারও মত নাই; এমন কি, শিক্ষকদের প্রতিনিধি মিঃ আলম পর্য্যন্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিলেন।

ডাঃ গাঙ্গুলী মিঃ আলমকে ডাকিয়া আড়ালে বলিলেন, এটা কি রকম হল মশাই? আপনি আমাদের নাচালেন, শেষে কিনা আপনি নিজে—

মিঃ আলম বিনীতভাবে যাহা বলিলেন, তাহা সত্যই অসঙ্গত নয়। তিনি এখনও ক্লার্ক-ওয়েল সাহেবের অধীনে চাকুরি করেন, প্রকাশ্যে তিনি কোনও মতেই তাঁহার বিরুদ্ধে যাইতে পারেন না; বরং শিক্ষকদের প্রতিনিধি হিসাবে শিক্ষকদের স্বার্থ বজায় রাখিয়া তিনি কর্ত্তব্য পালনই করিয়াছেন।

নৃপেন সেন বলিলেন, জানি জানি, আপনাদের এই রকমই মর‍্যাল কারেজ। ঘেন্না হয়, বাঙালী জাতটা এই রকমেই উচ্ছন্নয় গেল। আপনারা কী শেখাবেন ছেলেদের? ছ্যাঃ ছ্যাঃ—

মীটিং-অন্তে যে যাহার ঘরে চলিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবুর দলকে সাহেব ডাকাইয়া বলিলেন,

কই যত শুনলাম তোমাদের মুখে, তার কিছুই তো নয় ?

ক্ষেত্রবাবুও একটু আশ্চর্য্য হইয়াছেন। বলিলেন, তাই তো ! কিছু বুঝতেও পারলাম না স্যার্।

—যত শুনেছিলে তোমরা, আমার মনে হয় অতখানি সত্যি নয়। মিঃ আলম অত খারাপ মানুষ নয়।

—স্যার্, আমাকে মাপ করবেন, আপনি অবিশ্যি মিঃ আলমকে সন্দেহ করেন না, সে খুব ভাল কথা। তবে আমার স্বচক্ষে দেখা এবং স্বকর্ণে শোনা স্যার্।

—যাক, সব ভাল যার শেষ ভাল। নারাণবাবুর কথাই খাটল। বলেছিল, অপর পক্ষের চেষ্টা ব্যর্থ হবে।

কমিটীর মেম্বরদের মধ্যে অনেকেই এই মীটিংয়ের পরে আলমের উপর চটিয়া গেলেন। ফলে এক মাসের মধ্যে মিঃ আলমের মাহিনা আরও কাটিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। কমিটীতে এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার কোন বাধা ছিল না, কিন্তু সাহেব এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যথেষ্ট আপত্তি করিলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় মীটিংয়ের পরে ক্ষেত্রবাবু হেডমাস্টারের ঘরে ঢুকিলেন।

সাহেব বলিলেন, বসুন, ক্ষেত্রবাবু। কী খবর ?

—আর স্যার্, আপনি মিঃ আলমের পক্ষে অতটা না দাঁড়ালেও পারতেন।

—কেন বল তো ?

—আপনার খুব বন্ধু নয় ও।

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, ও ! তা বলে আমি কি তার প্রতিশোধ নেব ওভাবে ? ওসব কাজ আমাদের দ্বারা হবে না। আমরা শিক্ষক—আমি চাই না ক্ষেত্রবাবু যে, স্কুলের মধ্যে এ ধরনের দলাদলি হয়। আমি চেয়েছিলাম স্কুলটাকে ভাল করতে। অক্সফোর্ড থেকে অনেক কিছু শিখে এসেছিলাম, নতুন প্রণালীতে শিক্ষা দেব ছেলেদের। এখানে এসে সব মিথ্যে হতে চলেছে দেখছি। এখানকার হাওয়াতে দলাদলি ভাসে।

এই সব ঘটনার পর কিছুদিন দলাদলি ও ষড়যন্ত্র ক্ষান্ত রহিল। আবার মাস দুই পরে মিঃ আলম নতুন ভাবে ষড়যন্ত্র শুরু করিল। এবার মেমসাহেবের বিরুদ্ধে। স্কুলে অত টাকা খরচ করিয়া মেম রাখিবার কোন কারণ নাই। বিশেষত ছেলের স্কুলে মেয়েমানুষ শিক্ষয়িত্রী কেন? এবার মিঃ আলমের ষড়যন্ত্র সফল হইল। স্বদেশী মেম্বরের দল টেবিল চাপড়াইয়া লম্বা বক্তৃতা করিল। ফলে মিস্ সিবসনের চাকরি গেল। ছেলেরা মিলিয়া চাঁদা তুলিয়া মেমসাহেবের বিদায়-অভিনন্দনজ্ঞাপক সভা করিল। মিস্ সিবসন্ ছোট ছোট ছেলেদের সত্যই ভালবাসিত, বিদায়-সভায় বেচারী প্রীতিভাষণ দিতে উঠিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

মেমসাহেব চলিয়া যাওয়াতে সাহেবের কষ্ট হইল খুব বেশী। সকলে বলে, বিলাত হইতে আসিবার সময় সাহেব মিস্ সিবসন্‌কে সঙ্গে করিয়া আনেন, গরীবের ঘরের মেয়ে, ইণ্ডিয়ায় একটি চাকরি জুটিয়া যাইবে—ইহাই ছিল উদ্দেশ্য।

এই স্কুলের ভার সাহেব যতদিন হইতে লইয়াছেন, মেমসাহেবেরও চাকরি এখানে ততদিন।

চায়ের মজলিসে সে দিন মাস্টারের সংখ্যা কিছু বেশী ছিল।

জ্যোতির্বিনোদ বলিলেন, আজ আলমের মনস্কামনা পূর্ণ হল।

ক্ষেত্রবাবু যতখানি সাহেবের পক্ষ হইয়া তদ্বির করিয়াছিলেন, মিস. সিবসনের পক্ষ হইয়া তাহার অর্দ্ধেকও করেন নাই। মেমসাহেব যাওয়াতে তিনি ততটা দুঃখিত হন নাই, ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইবার কথা। তিনি বলিলেন, তা বটে, তবে আমার মত যদি জিগ্যেস কর—এ চালটা ওদের খুব গভীর।

শরৎবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কী রকম?

—এতে সাহেবকেও তাড়ানো হল।

সকলে একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? কেন?

—সাহেব একা এখানে থাকতে পারবে না।

—তা ছাড়া মেম বেচারীই বা যায় কোথায়? ও তো খুব গরীব ছিল শুনেছি।

—শুনচি মেম দার্জ্জিলিং গিয়ে থাকবে।

—খরচ?

—দার্জ্জিলিং ল্যাজেয়েজ স্কুলে টিচার হবে। মিশনারী সোসাইটিকে সাহেব লিখেছিলেন ওর জন্যে, তারা সব ঠিক ক'রে দিয়েছে।

মেমসাহেব যে খুব ভাল টীচার ও ভাল লোক এ বিষয়ে সকলেই দেখা গেল একমত। স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মিস্ সিবসনকে খুব ভালবাসে, তাহারা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া নিজেদের ক্লাসের এক গ্রুপ ফটো মেমসাহেবকে উপহার দিয়াছে।

একজন কে বলিল, ও ভালই হয়েছে, আমাদের মাইনে পঁচিশ-ত্রিশ—আর মেমসাহেবের মাইনে আশী। অথচ তিনি ইন্‌ফ্যাণ্ট ক্লাসে পড়াবেন। কেন, আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেচি! তোমাদের স্লেভ মেণ্টালিটি কতদূর হয়েচে, তা বুঝতে পারছ না। এ কাজটা মিঃ আলম ঠিকই করেচে।

ক্ষেত্রবাবু বোধ হয় এইটুকুর অপেক্ষা করিতেছিলেন। বলিলেন, আমারও তাই মত। এবার মিঃ আলমের এতটুকু অন্যায় হয় নি। তাই বুঝে এবার তদ্বিরও করি নি। এটা আলমের ন্যায্য কাজ।

চায়ের দোকান হইতে ক্ষেত্রবাবু বাসায় ফিরিলেন। অনিলা স্বামীকে চা করিয়া দিয়া বলিল, কী খাবার যে দেব? মুড়ি রোজ রোজ খেতে পার কি? ভেবেছিলাম একটু হালুয়া—

—হ্যা, হালুয়া! ঘিটুকু সব খরচ ক'রে না ফেললে তোমার—

—তুমি তো আধ সের ক'রে মাসে দেবে বলেচ, তার মধ্যেই আমি—

—গত মাসের মাইনের মধ্যে দশটি টাকা আজ পাওয়া গেল, এতে তুমি কত ঘি খাবে, আর কী করবে?

অনিলা দুঃখ ও রাগের সুরে বলিল, আমি কি তোমার ঘি খাই! ছেলেমেয়েরা মুড়ি চিবুতে পারে না রোজ, তাও কোনদিন ওদের জন্যে একটু হালুয়া, কি দুখানা পরোটা—

ক্ষেত্রবাবু ঝাঁঝের সঙ্গে বলিলেন, না, কেন মুড়ি খেতে পারবে না? বিদ্যাসাগর মশায় যে না খেয়ে পরের বাসায় থেকে লেখাপড়া শিখেছিলেন! তবে ওসব হয়। যখন যেমন অবস্থা, তখন তেমনি থাকবে।

—আধ সের ঘি তুমি বরাদ্দ করেছ কি না মাসে, আমি তাই শুনতে চাই।

—করেছিলাম। এ মাস থেকে হয়তো খরচ কমাতে হবে। পাচ্ছি কোথায়? ঘির আইটেমই হয়তো তুলে দিতে হবে।

অনিলা সামনে গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, হ্যাঁ গা, সেই সাড়ে নটায় খেয়ে বেরোও আর সাড়ে পাঁচটায় ফেরো। যদি কিছু না হয় ওতে, তবে ও ছাইপাঁশ চাকরি কেন ছেড়ে দাও না।

—ছেড়ে তো দেব, তার পর?

—ছেলে পড়াও যেমন পড়াচ্ছ—তাতে হয় না? আর নয়তো চল বাবার কাছে। ওদিকে অনেক কিছু জুটে যাবে। ডিহিরি-অন্-সোনে আমার সেই শৈলেনকাকা থাকেন, দেখেছ তো তাঁকে? এক মাড়োয়ারীর ফার্মে কাজ করেন। ধরে পেড়ে বললে—সেখানে চাকরি হতে পাবে। যদি বল তো বাবাকে লিখি।

—তা না হয় হল। কলকাতা ছেড়ে কোথাও যেতে মন সরে না। এতদিন এখানে আছি—আর কি জান, স্কুলের ওপরও বড় মায়া। আমার বলে নয়, সব মাস্টারেরই। সুখে দুঃখে আজ বারো ষোলো বিশ বছর এক জায়গায় আছি। ওই কেমন একটা নেশা—স্কুলবাড়ীটা, ছেলেগুলো, ওই চায়ের দোকানের মজলিসটা, হেডমাস্টার—বেশ লাগে। যত কষ্টই পাই তবুও যেতে পারি নে কোথাও যে, তাই এক এক সময় ভাবি—

—ভাবাভাবির কোনও দরকার নেই, চল বেরুই। কলকাতার খরচ বেশী অথচ খাওয়া হচ্ছে কী, একটু দুধ তোমার পেটে পড়ে না, একটু ঘি না। আমাদের গয়ায় এগারো সের করে খাঁটি দুধ—

—বুঝি সবই। কিন্তু কোথাও গিয়ে থাকতে পারি নে যে। তোমাদের গয়া কেন, আমার নিজের পৈতৃক গ্রামে চোদ্দ সের করে দুধ টাকায়। পাঁচ সিকে উৎকৃষ্ট গাওয়া ঘিয়ের সের—কিন্তু সেবার তোমার দিদি থাকতে নিয়ে গেলুম—মন টেকে না মোটে। ছেলেমেয়েদের মন মোটে টেকে না—সব কলকাতায় মানুষ। তোমার দিদি তো ছটফট করতে লাগল দেশে। তা ছাড়া ম্যালেরিয়াও আছে—

এই সময় বাহির হইতে কে ডাকিল, ক্ষেত্রবাবু আছেন?

—কে ডাকছে দেখ তো জানলা দিয়ে?

অনিলা দেখিয়া আসিয়া বলিল, একটা ছেলে। তোমার স্কুলের ছেলে নাকি, দেখ না ?

ক্ষেত্রবাবু বাহিরে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে আবার ঢুকিয়া বলিলেন, সেই তোমার অথর গো, সেই যে সেদিন বলেছিলাম—অথর রাখাল মিত্তির। তিনি তাঁর ছেলের হাত দিয়ে চিঠি দিয়েছেন, তাঁর অসুখ, বড় কষ্ট পাচ্ছেন, আমি যেন গিয়ে দেখা করি—

অনিলা ব্যগ্রভাবে বলিল, আহা, তা যাও ! কষ্ট পাচ্ছেন, সত্যি তো—অথর একজন—যাও—

ক্ষেত্রবাবু ছেলেটির পিছু পিছু ইটিলি সাউথ রোডের মধ্যে এক অন্ধ গলির ভিতরে গিয়া পড়িলেন। ছেলেটি তাঁহাকে একটা দরজার সামনে দাঁড় করাইয়া বলিল, আপনি দাঁড়ান, দরজা খুলে দি।

সে কোন্ দিক দিয়া চলিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবু ভাবিলেন, আমি নিজেও ঠিক চৌরঙ্গীতে থাকি নে, কিন্তু এ কী গলি, বাপ্ !

দরজা খুলিল। দরজার পাশে ক্ষুদ্র একটা রোয়াকের সামনে অন্ধকার এক ঘরে ছেলেটি তাঁহাকে লইয়া গেল। এত অন্ধকার যে, প্রথমে বোঝা যায় না, ঘরের মধ্যে কিছু আছে কি না ! অন্ধকারের ভিতর হইতে একটা ক্ষীণ স্বর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, কে ? ক্ষেত্রবাবু এসেচেন ?

ক্ষেত্রবাবু দেখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া চোখ ঠিক্‌রাইয়া একটা বিছানা বা কিছুর অস্পষ্ট আভাস ও একটি শায়িত মনুষ্যমূর্ত্তি-গোছ যেন দেখিতে পাইলেন। আর অগ্রসর না হইয়া দাঁড়াইলেন, কিছু বাধিয়া ঠোকর খাইয়া পড়িয়া না যান।

ক্ষীণস্বর চিঁ চিঁ করিয়া বলিল, ওই জানলার ওপরটাতে বসুন। ওরে, একটা কিছু পেতে দে না ! ও রাধু—

—থাক্ থাক্, পেতে দিতে হবে না। আপনার কী হয়েছে ?

—আর কী হবে ! জ্বর আর কাশি আজ পনেরো দিন। পড়ে আছি। উত্থানশক্তি-রহিত—

—তাই তো দেখতে পাচ্ছি। বড় কষ্ট পাচ্ছেন তো।

এইবার ক্ষেত্রবাবু ঘরের ভিতরটা বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। ওই যে রাখালবাবু তাকিয়া ঠেস দিয়া মলিন বিছানায় কাত হইয়া আছেন, পাশে একটা ততোধিক মলিন লেপ, বিছানার এক পাশে দড়ির আলনাতে দু-চারখানা ময়লা ও আধময়লা কাপড় ঝুলিতেছে, বিছানার সামনে একটা তাক, তাকের উপর অনেক বই কাগজ। এক পাশে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন। দেওয়ালে কয়েকখানি সস্তা ধরনের ক্যালেণ্ডার—বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক বিক্রেতাদের নাম ও বিজ্ঞাপন ছাপানো। ঘরের আসবাবপত্রের বীভৎস দারিদ্র্যে গরীব স্কুলমাস্টার ক্ষেত্রবাবুও যেন শিহরিয়া উঠিলেন।

—কতদিন অসুখ বললেন ?

—তা আজ দিন পনেরো।

—কেউ দেখচে ?

—না, দেখে নি। পয়সা নেই, সত্যি কথা বলতে কি ক্ষেত্রবাবু, আজ তিন দিন ঘরে এক পয়সাও নেই। ছেলেকে পাঠিয়েছিলাম রাধাকৃষ্ণ কর অ্যাণ্ড সন্সের দোকানে। আমার সেই —সেই—সেই—(রাখালবাবু একটু হাঁপ জিরাইলেন) রচনার বইখানা দশ কপি পাঠিয়ে দিয়ে একখানা লিখে দিলাম, বলি—এখন বইগুলো রেখে দাম দাও, আমি পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট কমিশন দেব, এখন আমার হাত বড্ড টানাটানি যাচ্ছে—তা ব্যাটারা বই ফেরত দিয়েছে। ও বই নাকি কম বিক্রি—ও এখন বিক্রি হবে না। আপনি তো জানেন, চেতলা স্কুলের হেডমাস্টার —নব ব্যাকরণ সুধা প্রথম ভাগ—

আচ্ছা, আপনি একটু বিশ্রাম করুন।

—বিশ্রাম আমি করছি সারাদিনই। কিন্তু আমি বলি, দেখুন ক্ষেত্রবাবু, যারা জিনিস চেনে, তাদের কাছে জিনিসের কদর! চেতলা স্কুলের হেডমাস্টার নব ব্যাকরণ সুধা দেখে বললে, মিত্তির মশাই, এমন বই একালে কে লিখছে আপনি ছাড়া ? আপনাকে বলেছি বোধ হয় ক্ষেত্রবাবু, ব্যাকরণে ছাত্রবৃত্তিতে ফার্স্ট স্ট্যাণ্ড করি, মেডেল আছে। দেখতে চান তো দেখাতে পারি।

—না, দেখাতে হবে কেন ? আপনি ঠিকই বলছেন। তা চেতলা স্কুলে বই ধরালে আপনার ?

—না। বললে—আগে যদি আসতেন! কাকে বুঝি কথা দিয়ে ফেলেছে। আসছে বারে প্রমিস্ করেছে ধরিয়ে দেবে। আর ওই শাঁকারিটোলা হাই স্কুলে রচনাদর্শখানা পাঠাতে বলেছিল—নমুনা। কিন্তু নমুনা পাঠিয়ে হয়রান। বই ধরাবেন না, নমুনা পাঠাও—

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, ওসব আমরাও জানি। বই ধরাবার ইচ্ছে নেই, বই পাঠান—

রাখালবাবু উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিয়া পাশের তাকে হাত বাড়াইতে গেলেন।

—আপনাকে দেখাই, আর একখানা নীচের ক্লাসের ব্যাকরণ লিখচি—আপনাকে দেখাই —খাতাখানাতে লিখছিলাম—

কাশির বেগে রাখালবাবুর খাতা বাহির করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, থাক্ থাক্, এখন রাখুন।

—বড় কষ্ট পাচ্ছি। কেউ নেই, কাকে বলি! তাই ছেলেটাকে প্রথমে আপনার স্কুলে পাঠাই, সেখানে দরোয়ান আপনার বাসার ঠিকানা বলে দিয়েছে, তাই বাসায় গিয়েছিল।... এখন কী করি, একটি পরামর্শ দিন দিকি ক্ষেত্রবাবু!

—তাই তো। খুবই বিপদ। বাসাতে কে কে আছেন ?

—আমার স্ত্রী, দুটি ছোট ছোট ছেলে, এক বিধবা ভগ্নী, তাঁর একটি মেয়ে—এই। রোজ দুটি করে টাকা হলে তবে সংসার বেশ চলে। এক পয়সা আয় নেই, তার দু টাকা—কী করা যায় বলুন! খেতে পায় নি বাড়ীতে আজ দু দিন। আপনার কাছে খুলে বলতে লজ্জা নেই—

ক্ষেত্রবাবুর মনে যথেষ্ট দুঃখ ও সহানুভূতির উদ্রেক হইল। নিজেকে তিনি ওই অবস্থায় ফেলিয়া দেখিলেন কল্পনায়। কিন্তু তিনি কী করিবেন! তাঁহার হাতে বাড়তি পয়সা এমন নাই, যাহা দিয়া তিনি এই দুঃস্থ বৃদ্ধ গ্রন্থকারকে সাহায্য করিতে পারেন। পরামর্শই বা তিনি কী দিবেন? একমাত্র পরামর্শ হইতেছে পয়সাকড়ির পরামর্শ। কিন্তু কে এই বৃদ্ধকে অর্থ-সাহায্য করিবে, সে কথাই বা তিনি কী করিয়া জানিবেন? বাধ্য হইয়া দুঃখের সঙ্গে ক্ষেত্রবাবু সে কথা জানাইলেন। তাঁহার এ ক্ষেত্রে করিবার কিছু নাই। কোন পথই তিনি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছেন না।

মুশকিল হইল যে,এই সময় রাখাল মিত্তিরের ছেলেটি ভাঙা পেয়ালায় চা আনিয়া ক্ষেত্রবাবুর হাতে দিল। রাখালবাবুর স্ত্রী শুনিয়াছেন, তাঁহার স্বামীর একজন বিশিষ্ট প্রতিপত্তিশালী বন্ধু আসিবেন। চিঠি লইয়া ছেলে তাঁহার কাছে গিয়াছে। তিনি আসিলে দুঃখের একটা কিনারা হইবেই। এখন সেই ভদ্রলোকটি আসিয়াছেন শুনিয়া গৃহিণী তাড়াতাড়ি যথাসাধ্য অতিথি-সংকার করিয়াছেন। গরীবের ঘরে এই ভাঙা পেয়ালায় একটু চায়ের পিছনে যে কত ভরসা নির্ভরতা আবেদন নিহিত, ক্ষেত্রবাবু তাহা বুঝিলেন বলিয়াই চায়ের চুমুক যেন গলায় বাধিতেছিল। এখানে না আসিলেই হইত। পকেটে আছে মাত্র আট আনা পয়সা। তাই কি দিয়া যাইবেন! সে-ই বা কেমন দেখাইবে!

রাখালবাবু স্বয়ং এ দ্বিধা ঘুচাইয়া দিলেন: তা হলে উঠবেন? আচ্ছা, কিছু কি আপনার পকেটে আছে? যা থাকে। বাড়ীতে খাওয়া হয় নি ও-বেলা থেকে—দুটো একটা টাকা—এমন বিপদে পড়ে গিয়েছি।

ক্ষেত্রবাবু ছেলেটির হাতে একটা আট-আনি দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

সমস্ত সন্ধ্যাটা যেন বিস্বাদ হইয়া গেল। সামনেই একটা ছোট পার্ক, ছেলেমেয়েরা দোলনায় দোল খাইতেছে, লাফালাফি করিতেছে, আনন্দকলরবমুখর পার্কের সবুজ ঘাসের উপর দুই-একটি অফিস-প্রত্যাগত কেরানী বসিয়া বিড়ি টানিতেছে, সোঁদালি ফুলের ঝাড় দুলিতেছে রেলিংয়ের ধারের গাছে, আলু-কাবলির চারি পাশে উৎসাহী অল্পবয়স্ক ক্রেতার ভিড় লাগিয়াছে। ক্ষেত্রবাবু একখানা বেঞ্চের এক কোণে গিয়া বসিলেন। বেঞ্চির উপর দুইটি লোক বসিয়া ঘরভাড়া আদায় করার অসুবিধা সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিতেছে।

ক্ষেত্রবাবু ভাবিলেন, রাখালবাবুও তাঁহার মত স্কুলমাস্টার ছিলেন একদিন। আজ অক্ষম ও পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাই এই দুর্দশা। বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, টুইশানিও জোটে না আর। স্কুলমাস্টারের এই পরিণাম।

বেশী দূর যাইতে হইবে না, তাঁহাদের স্কুলেই রহিয়াছেন নারাণবাবু—তিন কুলে কেহ নাই, আজীবন পূতচরিত্র, আদর্শ শিক্ষক, কিন্তু স্কুলের চোর-কুঠুরির ঘরে নির্জন আত্মীয়হীন জীবন যাপন করিতেছেন আজ আঠারো বছর কি বাইশ বছর, কে খবর রাখে? আজ যদি চাকুরি যায়, কাল আশ্রয়টুকুও নাই। ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক অবস্থায় ক্ষেত্রবাবু টুইশানিতে চলিয়াছেন, কে পিছন হইতে বলিল, স্যার্, ভাল আছেন?

ক্ষেত্রবাবু পিছন ফিরিয়া চাহিলেন, একটি সুবেশ তরুণ যুবক। বেশ দামী সুট পরনে, চোখে কাঁচকড়ার চশমা! মৃদু হাসিয়া বলিল, চিনতে পারছেন না স্যার্ ?

—না, কই, ঠিক—তুমি আমাদের স্কুলের ?

—হ্যাঁ, স্যার্। অনেক দিন আগে, এগার বছর আগে—পাশ করি। আমার নাম সুরেশ।

—সুরেশ বসু ?

—না স্যার্, সুরেশ মুখার্জ্জি, সেবার সেই সরস্বতীপুজোর সময়ে আমাদের বারে ডাঁড়াব লুঠ করে ছেলেরা, মনে আছে? হেডমাস্টার ফাইন করেছিলেন সব ছেলেদের। মনে হচ্ছে স্যার্ ?

—হ্যাঁ, একটু একটু মনে হচ্ছে যেন। তোমাদের ছেলেবেলার কথা হিসেবে এমন যত মনে থাকে আমাদের তত মনে রাখবার ব্যাপার নয় বাবা। বুঝতেই পারচ! কী কর এখন ?

—আজ্ঞে স্যার্, রাঁচিতে চাকরি করি, এঞ্জিনীয়ার।

—ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেছিলে বুঝি বাবা ?

—আজ্ঞে, শিবপুর থেকে পাশ করে বিলেতে যাই। আজ তিন বছর বিলেত থেকে ফিরে গভর্মেণ্ট সার্ভিস করছি রাঁচিতে—পি. ডবলিউ. ডি.-তে য়্যাসিস্ট্যাণ্ট এঞ্জিনীয়ার।

—কী নাম বললে, সুরেশ মুখার্জ্জি ? এখন চেনা-চেনা মুখ বলে মনে হচ্ছে। অনেক দিনের কথা—আর কত ছেলে আসে-যায়, কাজেই সব মনে রাখা—

—নিশ্চয় স্যার্, ঠিক কথা। পুরোনো মাস্টারদের মধ্যে কে কে আছেন স্যার্ ? যদুবাবু আছেন ?

—হ্যাঁ, শ্রীশবাবু, থার্ড পণ্ডিত আছেন, নারাণবাবু আছেন—

—নারাণবাবু আজও আছেন স্যার্ ? উঃ, অনেক বয়স হল তাঁর! তিনি কি স্কুলের সেই ঘরেই থাকেন—আচ্ছা, একবার দেখা করে আসব। বড্ড ইচ্ছে হয়। চাকরটা আছে ? কেবলরাম ?

—হ্যাঁ, আছে বইকি। যেও না একদিন স্কুলে।

যুবকটি পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবু সগর্বে একবার চারিদিকে চাহিলেন—লোকে দেখুক, এমন একজন সুট-পরা তরুণ যুবক তাঁহার পায়ের ধূলা লইতেছে। তাহাকে বেশ সুন্দর দেখিতে, সাহেবের মত চেহারা। কবে হয়তো ইহাকে পড়াইয়াছিলেন মনে নাই, তবুও তো তাঁহাদের স্কুলের ছাত্র। আজ দু পয়সা করিয়া খাইতেছে। বিলাত-ফেরত য়্যাসিস্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার—এরকম হয়তো কত ছাত্র কত দিকে আছে, সকলের সন্ধান তো জানা নাই।

এইটুকু ভাবিয়াই সুখ। এই ছাত্রের দল তাহাদের বাল্যজীবনের শত সুখস্মৃতির আধার তাহাদের স্কুল ও স্কুলের শিক্ষকদের ভুলে নাই; কেহ আছে বর্ম্মায়, কেহ আছে শিমলায়,

কেহ বা কুমায়ুন, শিলং, মসলিপত্তনে। তবুও দেশের আশা-ভরসাস্থল পুত্রপ্রতিম এই সব তরুণ দল একদিন তাঁহাদেরই হাতে চড়টা-চাপড়টা পাইয়া ইংরেজী ব্যাকরণের নিয়ম শিখিয়াছে, বীজগণিতের জটিল রহস্য বুঝিয়াছে—ভাবিয়াও আনন্দ হয়।

ক্ষেত্রবাবু পাশের গলিতে ঢুকিয়া টুইশানি-পড়া ছাত্রের বাড়ী কড়া নাড়িলেন।

চৈত্র মাস। ইস্টারের ছুটি আজই হইয়া গেল। যদুবাবু মেসে ফিরিয়া দেখিলেন, অবনী চিঠি লিখিয়াছেন। তিনি যদি এই মাসের মধ্যে বউদিদিকে এখান হইতে লইয়া না যান, তবে সে বউদিদিকে কলিকাতায় আনিয়া যদুবাবুর মেসে রাখিয়া যাইবে।

মাত্র পাঁচটি টাকা হাতে—স্কুলের টাকা এ মাসে সামান্যই পাওয়া গিয়াছিল, কোন্ কালে খরচ হইয়া গিয়াছে মেসের দুই মাসের দেনা মিটাইতে। সামান্য কিছু স্ত্রীকে পাঠাইয়াছিলেন, এ পাঁচটা টাকা টুইশানির অগ্রিম আদায়ী আংশিক মাহিনা। স্ত্রীকে রাখিবার কোন অসুবিধা হইত না বেড়াবাড়ী, যদি নিজের বাড়ীখানা সেখানে থাকিত। কিন্তু পৈতৃক বাড়ী ভূমিসাৎ হওয়ার পরে যদুবাবু সেখানে আর যান নাই, সেই হইতেই পথে পথে, বাসায়। আজ দেড় বৎসরের উপর, স্ত্রীকে বেড়াবাড়ী পরের সংসারে ফেলিয়া রাখিয়াছেন,—ইচ্ছা করিয়া কি? তাহা নয়। নিরুপায় হিসাবে।

এখন স্ত্রীকে গিয়া ওখান হইতে সরাইতে হইবে।

নতুবা ইতর অবনীটা সত্য সত্যই হয়তো স্ত্রীকে একদিন মেসে আনিয়া হাজির করিবে। লোকটা কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানহীন কিনা।

সাত-পাঁচ ভাবিয়া যদুবাবু টিকিট কাটিয়া সিরাজগঞ্জ-প্যাসেঞ্জারে রাত্রে রওনা হইলেন এবং শেষরাত্রে বগুলা নামিয়া, স্টেশনে রাত কাটাইয়া, পরদিন সকালে সাত ক্রোশ হাঁটিয়া বেলা আড়াইটার সময় গলদ্‌ঘর্ম ও অভুক্ত অবস্থায় বেড়াবাড়ী পৌঁছিলেন।

অবনী বলিল, আসুন দাদা, তা একেবারে ঘেমে—এঃ ওরে নিতে কাপালীকে ডেকে এনে গাছ থেকে দুটো ডাব পাড়ার ব্যবস্থা কর। হাত পা ধুয়ে নিন—তারপর ভাল সব?

যদুবাবু ঠাণ্ডা হইলেন। স্ত্রীকে দেখিয়া কিন্তু চমকিয়া উঠিলেন। অবনীর বিধবা দিদি ক্ষান্ত বলিল, বউ প্রায় কেবল জ্বরে ভুগেছে ওদিকে—এই মাসখানেক ফাগুনে হাওয়া পড়ে একটু ভাল আছে। তাও দুবার পড়ল। ঘোর মেলেরিয়া এ সব দিকে। দেখ না, ওই অবনীর ছেলেমেয়েগুলো ভুগে ভুগে হাড্ডি-সার! না একটু ওষুধ, না চিকিচ্ছে—কোথায় পাবে? সামান্য আয়, এদিকে সকালে উঠে দু কাঠা চালের খরচ। বোস, একটা ডাব কেটে আনি ভাই—

যদুবাবুর স্ত্রী কাঁদিতে লাগিল। বেচারীর ভাগ্যে আজ প্রায় এক বছর পরে তাঁহার দর্শনলাভ ঘটিল।

যদুবাবু বলিলেন, কেঁদো না। এঃ তোমার চেহারা দেখতে বড্ডই—

—হ্যাঁ, বড্ডই! মরে যাচ্ছিলাম কার্ত্তিক মাসে। মরে বেঁচে উঠেছি। আচ্ছা, মানুষ

কী করে এমন হতে পারে ? এত করে চিঠি দিলাম, একবার চোখের দেখা –

—তুমি তো বললে চোখের দেখা। হাতে পয়সা না থাকলে তো আর—

—হাঁ গো, যদি মরেই যেতাম, তা হলে একবার তোমার সঙ্গে দেখাটাও যে হত না !

—সে সবই বুঝলাম। আমার অবস্থাটা তোমরা দেখবে না তো ? তোমাদের কেবল—

যদুবাবুর স্ত্রী ঝাঁজের সহিত বলিল, অমন কথা বলো না। মুখে পোকা পড়বে। আমি যেমন নীরবে সয়ে গেলাম এমন কেউ সহ্যি করবে না, তা বলে দিচ্ছি। রাত্রে জ্বরে পুড়েচি, শুধু মন হাঁপিয়েচে—মরে গেলে তোমাকে একটিবার চোখের দেখাটা হল না বুঝি, তাও কাউকে আমি বিরক্ত করি নি। চারিদিক চাহিয়া স্বর নিচু করিয়া বলিল, আর এমন চামার ! এমন চামার ! এক পয়সার সাবু না, এক পয়সার মিছরি না। বরং তুমি যে টাকা পাঠাতে মাসে মাসে, তা থেকে কেবল আজ দাও এক টাকা, কাল দাও আট আনা —ওই অবনী ঠাকুরপো। না দিলেও চক্ষুলজ্জা, ওদের বাড়ী, ওদের ঘরে জায়গা দিয়েচে। জায়গা দিয়েচে কি অমনি। ওই টাকাটা সিকেটা তো আছেই—আর এদিকে বাকির জ্বালা কী ! এক-একদিন ইচ্ছে হত—এই সত্যি বলচি দুপুরবেলা—ব্রাহ্মণের সামনে মিথ্যে বলি নি—যে, গলায় দড়ি দিয়ে মরি—

এই সময়ে অবনীর বিধবা দিদি (তিনি যদুবাবুরও বড়) ডাব কাটিয়া আনিয়া বলিলেন, বউ, এক গ্লাস জল নিয়ে এস, আর এই রেকাবিতে দুখানা বাসোতা—কোথায় কী পাব বল ভাই ! বাসোতা দুখানা খেয়ে একটু জল—আমি গিয়ে ভাত চড়াই।

যদুবাবুর স্ত্রী জলহাতে আসিয়া বলিল, ঠাকুরঝি লোকটা এই বাড়ীর মধ্যে ভাল লোক। নইলে বউ—ও বাবাঃ—দূরে নমস্কার। বলিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিয়া জলের গ্লাসটা যদুবাবুর সম্মুখে নামাইয়া রাখিল।

বৈকালের দিকে অবনী বলিল, দাদার কি এখন গুড্ ফ্রাইডের ছুটি ?

—হাঁ।

—কদিন ?

—মঙ্গলবার খুলবে। ওই দিনই ওকে নিয়ে যাব ভাবচি।

—তাই নিয়ে যান। এখানে বউদিদির শরীরও টিকচে না, মনও টিকচে না। তাই কখনও টেকে ? আপনি রইলেন পড়ে কলকাতায়, উনি রইলেন এখানে। ছেলে নেই, পিলে নেই। আপনার বউমার কাছে কেবল কান্নাকাটি করেন, দুঃখু করেন। নিয়ে যান, সেই ভাল। তা ছাড়া আমাদের এখানে অসুবিধে। ঘরদোর নেই – দুখানি মাত্র ঘর। আবার আমার ছোট ভগ্নীপতি শিশির নাকি আসবে শুনছি ছেলেমেয়ে নিয়ে—কতদিন আসে নি। তারা এলেই বা কোথায় থাকে ? তাই বলি দাদাকে চিঠি লিখি, দাদা এসে ওঁকে নিয়েই যান।

—না, তুমি যা করেছ, যথেষ্ট উপকার করেছ। এতদিন কে রাখে ! যাই, একটু বেড়িয়ে আসি—

এ বেড়াবাড়ী গ্রামের বাহিরে খুব বড় বড় মাঠ—আধ মাইল, কি তারও কম দূরে চূর্ণী নদী। নদীর ধারে খেজুরগাছ, নিমগাছ ও ভাঁটসেওড়ার বন। এখন নিমফুলের সময়, চৈত্রের তপ্ত বাতাসে নিমফুলের সুবাস-মাখানো। ঘেঁটুফুলের দল কিছুদিন আগে ফুটিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে—এখন শুধু রাঙা রাঙা সুঁটির মেলা ভাঁটগাছের মাথায় মাথায়। উত্তর দিকের মাঠে প্রকাণ্ড একটা কচিপাতা-ভরা বটগাছের শীর্ষদেশ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া। কিছুদিন আগে সামান্য বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, চষা-ক্ষেতের মাঝে মাঝে জল জমিয়া ছিল, এখনও আধশুকনো কাদায় তার চিহ্ন আছে। একটা তুঁতগাছের তলায় অনেক শুকনো তুঁতফল পড়িয়া আছে। যদুবাবু একটা তুঁতফল কুড়াইয়া মুখে দিলেন—মনে পড়িল, বাল্যকালে এই সময় তুঁতফল খাওয়ার সে কত আগ্রহ। কোথায় গেল সে সব সুখের দিন। বাবা গোয়াড়ী কোর্টে কাজ করিতেন, শনিবারে শনিবারে গ্রামের বাড়ীতে আসিতেন, হাঁড়ি-ভর্তি খাবার আনিতেন ছেলেমেয়ের জন্য। তাঁদের বাড়ীতে মোংলা বলিয়া এক গোয়ালা-ছোঁড়া থাকিত। সরভাজা খাইবার লোভে সে ছুটিয়া গিয়া রাস্তায় দাঁড়াইত—কর্তা হাঁড়ি-হাতে আসিতেছেন, না শুধু হাতে আসিতেছেন দেখিবার জন্য।

নদীতে ডিঙি-নৌকায় জেলেরা মাছ ধরিতেছে! যদুবাবু বলিলেন, কী মাছ রে?

—আজ খয়রা আছে কর্তা।

—দিবি চার পয়সার, যাব? অনেক দিন দেশের খয়রা মাছ খাই নি। টাটকা খয়রা মাছটা—

যদুবাবু অবনীর দিদির হাতে মাছ দিয়া বলিলেন, ও দিদি, এই নাও। দেশের খয়রা মাছ কত কাল খাই নি!

রাত্রে পাড়ার এক জায়গায় সত্যনারায়ণের সিন্নি উপলক্ষে যদুবাবু অবনীর সঙ্গে তাহাদের বাড়ী গেলেন। বাড়ীর কর্তা যদুবাবুকে যথেষ্ট খাতির করিয়া বসাইল, তামাক সাজিয়া আনিল নিজের হাতে। তাহার বড় ছেলের একটা চাকরি হইতে পারে কি না কলিকাতায়? ছেলেটিকে ডাকিয়া আনিয়া পরিচয় করাইয়া দিল। ম্যাট্রিক দুইবার ফেল করিয়া সম্প্রতি আজ বছর খানেক বসিয়া আছে। পূর্ব্বেকার অভিজ্ঞতা হইতে যদুবাবু সাবধান হইয়াছিলেন, আবার কলিকাতার মেসে, কি বাসায় জুটিয়া উৎপাত করিতে শুরু করিলেই চক্ষুস্থির। পাড়াগাঁয়ের লোককে বিশ্বাস নাই। সুতরাং তিনি বলিলেন, তিনি চেষ্টা করিবেন, তবে এখন কিছু বলিতে পারেন না—আজকাল কত বি. এ., এম. এ. পাস ফ্যা-ফ্যা করিতেছে, তা ম্যাট্রিক।

রাত্রে স্ত্রীকে বলিলেন, তা হলে আর একটা মাস এখানে—

—না, তা হবে না। আমায় নিয়ে যাও এবার।

—কিন্তু কোথায় নিয়ে যাই বল তো?

—তা তুমি বোঝ।

যদুবাবু মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিলেন, তুমি বোঝ! বুঝি। কী, সেটা আমায় দেখিয়ে দাও। কলকাতায় কি বাসা ঠিক করে রেখে এসেছি যে, তোমায় নিয়ে ওঠাব? উঠবে কোথায়?

শেয়ালদা ইষ্টীশানে বসে থাকবে ?

যদুবাবুর স্ত্রী কাঁদিতে লাগিল।

—আঃ কী মুশকিলেই পড়েছি বিয়ে করে ! ঝাড়া হাত-পা থাকলে আজ আমার ভাবনা কি ? তোমার ভাবনা ভাবতে ভাবতেই প্রাণ গেল।

যদুবাবুর স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আমার ভাবনা কী ভাবতে হচ্ছে তোমায় ? ফেলে রেখেছ এখানে আজ দেড় বছর—জ্বরে ভুগে ভুগে আমার শরীরে কিছু নেই, তাও তোমাকে কি কিছু বলেছি ? মুখনাড়া আর খোঁটা দুটি বেলা হজম করতে হত যদি আমার মত, তবে বুঝতে ! এততেও তোমার কাছে ভাল হলাম না। তার চেয়ে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরি, তুমি ঝাড়া হাত-পা হও, আপদ চুকে যাক।

—আচ্ছা, থাম থাম, রাত-দুপুরে কান্নাকাটি ভাল লাগে না। ঘুম আসচে। ওরা শুনতে পাবে—এক ঘর, এক দোর, দেখি যা হয়—

—তুমি এবার না নিয়ে গেলে অবনী ঠাকুরপো শুনবে নাকি ? স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ হয়েছে এবার আমাকে তোমার সঙ্গে ওরা পাঠিয়ে দেবেই। ওদের বাড়ীতে জায়গা হচ্চে না—ওর ভগ্নিপতি নাকি আসবে শুনছি এ মাসের শেষে। সত্যিই তো, ঘরদোর নেই, ওদের অসুবিধে হয় বইকি। এতদিন তো রাখলে।

—হ্যাঁ, রেখেছে তো মাথা কিনেচে কি না ! ভারি করেচে ! আর আমার মেসে গিয়ে যে সাত দিন থেকে এল, আজ সিনেমা রে, কাল ইয়ে রে, তখন ?

—তুমি বুঝি অবনী-ঠাকুরপোকে টাকা দাও নি সেবার, সে কী খোঁটা আর তোমার নামে কী সব কথা আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে দিনরাত ! আমি বলি, আর তো আমার সহ্য হয় না, এক দিকে চলেই যাই, কি, কী করি ! এত কষ্ট গিয়েছে সে সময়।

—আচ্ছা, থাক্ সে-সব কথা এখন। রাত হয়েচে ঘুম আসচে—সারাদিন খাটুনি আর রাত্তির কালে ভ্যাজর-ভ্যাজর ভাল লাগে না।

যদুবাবু বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িলেন। তাঁহার স্ত্রী নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। কিছুকাল পরে বলিল, ঘুমুলে নাকি ? ওগো !

যদুবাবু বিরক্তির সুরে বলিলেন, আঃ, কী ?

—তোমার পায়ে পড়ি, আমায় এবার এখানে রেখে যেয়ো না। আমি আর সহ্যি করতে পারছি নে—তুমি বোঝ। কখনও তো তোমায় এমন করে বলি নি—কেবল ওই ঠাকুরঝির জন্যে এখানে এতদিন থাকতে পেরেচি। নইলে কোন্ কালে এতদিন—একবার রটিয়ে দিলে, তুমি নাকি বিয়ে করেছ, আমার ছেলেপিলে হল না বলে। 'বলে, দাদা সেইজন্যেই বউদিদিকে ত্যাগ করে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে রেখে গিয়েছে। সে কত কথা ! আমি ভেবে কেঁদে মরি। শুধু ঠাকুরঝি আমায় বোঝাত, বউ, তার কি এখন বিয়ের বয়স আছে যে, বিয়ে করবে ? তুমি ওসব শুনো না।

—তুমিও কি ভাব নাকি আমার বিয়ের বয়স নেই ?

—বয়েস থাকলে কী হবে, একটা বিয়ে করে তাই খেতে দিতে পার না, দুটো বিয়ে করে তোমার উপায় হবে কী ? কুঁজোর সাধ হয় চিত হয়ে শুতে—

এই কথায় যদুবাবুর পৌরুষের অভিমান ভীষণভাবে আহত হওয়ায় তিনি আর কোন কথা না বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন এবং বোধ হয় খানিকক্ষণ পরেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

চুনি এবার থার্ড ক্লাসে উঠিল। চেহারা আরও সুন্দর হইয়াছে, ওষ্ঠে গোঁফের ঈষৎ রেখা দেখা দিয়াছে।

নারাণবাবু পড়াইতে গিয়া তাহার সঙ্গে গল্প করেন নানা বিষয়ে—চুনিকে ছাড়িয়া যেন উঠিতে ইচ্ছা হয় না। চুনির মধ্যে একটি সুদুর্লভ রহস্য ও বিস্ময়ের ভাণ্ডার যেন গুপ্ত আছে, নারাণবাবু নানা কথায় ও প্রশ্নে সেই রহস্যভাণ্ডারের সন্ধান খুঁজিয়া বেড়ান। চুনি আসিবা-মাত্র নারাণবাবু কেমন আত্মহারা হইয়া যান—ভাল করিয়া পড়াইতেও যেন পারেন না, কেবল তাহার সহিত গল্প করিতে ইচ্ছা করে! অথচ চুনি তাঁহাকে কী দিতে পারে ? তাঁহাকে সে রাজা করিয়া দিবে না, নারাণবাবু তাহা ভালই জানেন; তবুও কেন এমন হয়, কে জানে ? মাস্টার পড়াইতে আসিয়া ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকায়, উঠিতে পারিলে বাঁচে; অথচ নারাণবাবুর উঠিতে ইচ্ছা করে না, রাত্রি বেশী হইয়া যায়, চুনি পান্না ঘুমে ঢলিয়া পড়ে, কলিকাতার কলকোলাহল নীরব হইয়া আসে। নারাণবাবু ধমক দিয়া বলেন, এই চুনি, এই পান্না, ঢুলছিস নাকি ? পান্না চমকিয়া উঠিয়া বইয়ের পাতায় মন দিবার চেষ্টা করে, নিচু সলজ্জ স্বরে বলে, ঘুম আসছে স্যার্, রাত অনেক হল—

চুনির মায়ের স্বর খোলা দ্বারপথে ভাসিয়া আসে: আজ তোদের কি হবে না নাকি ? সারা রাত বসে ভ্যাজর ভ্যাজর করলেই বুঝি ভাল পড়ানো হয় ?

পরে ঈষৎ নেপথ্য হইতে শ্রুত হইল সেই একই কণ্ঠের স্বর: বুড়ো মাস্টারটা বসে বসে করে কী এত রাত পর্যন্ত ? এত করে বলি ওঁকে, বুড়ো মাস্টার বদলে ফেল—বুড়ো দিয়ে কি লেকাপড়া হয় ?

চুনি লাফাইয়া উঠিয়া বাড়ীর মধ্যে মাকে হয়তো বা মারিতে ছোটে।

নারাণবাবু ধমক দিয়া চিৎকার করিয়া বলেন, এই চুনি কোথায় যাস্ ? পান্না যা তো, তোর দাদাকে ধরে নিয়ে আয়।

কিছুক্ষণ পরে চুনি ঘর্মাক্ত রাঙা মুখে আসিয়া হাঁপাইতে থাকে।

—কোথায় গিয়েছিলি ?

—কোথাও না স্যার্।

—এই সব জ্ঞান হচ্ছে তোমার, না ?

—না স্যার্। আপনি তাই সহ্য করেন, আপনার খেয়াল নেই কোনও দিকে। আমাদের বাড়ীতে আসেন, তা আমাদের কত ভাগ্যি। রোজ রোজ, মা এরকম করবে আমি—

—ছিঃ, মার সম্বন্ধে কোন কথা বলতে নেই ছেলের। মায়ের বিচার কি ছেলে করবে? আমারই দেরি হয়ে গিয়েছে আজ, উঠি বরং—

—না স্যার্, বসুন না আপনি।

চুনির মার কণ্ঠস্বর পুনরায় দ্বারপথে শ্রুত হইল: খাবি নে পোড়ারমুখো ছেলে? বামনী কি এত রাত পর্য্যন্ত তোমাদের ভাত নিয়ে বসে থাকবে নাকি?

নারাণবাবু লজ্জিত কৈফিয়তের সুরে অন্তরালবর্ত্তিনীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, হাঁ, বউমা, আমি এই যে যাই—যাচ্ছি—একটু দেরি হয়ে গেল আজ—

ঈষৎ নম্রস্বরে উদ্দেশে উত্তর আসিল, ভাত নিয়ে থাকতে হয় ঠাকুরঝি, তাই বলি। নইলে মাস্টার পড়াচ্ছে, পড়াক না—আমি কি বারণ করি?

নারাণবাবু গলির ভিতর দিয়া চলিয়া আসিলেন, মনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ। চুনি তাঁহার দিকে হইয়া মাকে মারিতে গিয়াছিল, তাঁহাকেই চুনি তবে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, ভক্তি করে! কেন এ আনন্দ রাখিবার জায়গা নাই, বৃদ্ধ নারায়ণবাবু তা বুঝিতে পারেন। তাঁহার কেহ আপনার জন নাই এ বিশাল দুনিয়ায়, তবু চুনি আছে, বড় হইলে তাঁহাকে দেখিবে।

স্কুল-বাড়ীর বড় ছাদে রাত্রে আহারাদির পর নারাণবাবু পায়চারি করেন—বহুকালের অভ্যাস। আকাশে নক্ষত্ররাজি এই তেতলার ছাদ হইতে বেশ দেখা যায় বলিয়াই নারাণবাবু এই সময়ে উন্মুক্ত আকাশতলে বেড়াইতে ভালবাসেন। ডাকিলেন, ও জগদীশ ভায়া, খাওয়া-দাওয়া হল?

টীচারদের ঘরের পাশে ক্ষুদ্র টিনের একখানি চালায় জ্যোতির্বিনোদ মাছ ভাজিতেছিলেন, উত্তর দিলেন, না দাদা, এই ছেলে পড়িয়ে এসে রান্না চড়িয়েছি। ও দাদা, আজ কী হয়েছিল জানেন?—বলিতে বলিতে জ্যোতির্বিনোদ বাহিরে আসিলেন:—আজ এই লাল বাড়ীর সেই যে ছেলেটা ছাদে উঠে ডন্ কষত, সে আজ নতুন বউ নিয়ে বাড়ী এসেছে—পাড়াগাঁয়ের বাড়ীতে বিয়ে হয়েছিল, আজ বউ নিয়ে এল।

নারাণবাবু আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন বউ হল?

—খাসা বউ হয়েছে—ওরই মত ফরসা, দুজনে ছাদে বেড়াচ্ছিল, খুব হাসিখুশি—

—আহা, তা হোক, তা হোক—

—যাই দাদা, মাছ পুড়ে গেল কড়ায়।

কী জানি কেন, নারাণবাবুর হঠাৎ মনে পড়িল একটা ছবি। চুনি বিবাহ করিয়া বউ আনিয়াছে, যেমন চমৎকার রূপবান ছেলে, তেমনি লক্ষ্মী-প্রতিমার মত বধূ। পুত্রবধূ সাধ তাঁহার মিটিয়াছে। চুনি বলিতেছে, আমার বউ স্যার্ আপনার সেবা করবে না তো কার সেবা করবে? চুনি পুরীতে বউ লইয়া বেড়াইতে গিয়াছে, সঙ্গে তাঁহাকে লইয়া গিয়াছে, কারণ তাঁহার শরীর খারাপ। পুত্রের কর্ত্তব্য করিয়াছে সে।

চুনির বউ বলিতেছে, বাবা, আপনার পায়ে কি এ বেলা তেল মালিশ করতে হবে?

স্বপ্নাচ্ছন্ন অতীত দিবসগুলির কুয়াশা ভেদ করিয়া কত অস্পষ্ট মুখ উঁকি মারে! দুপুরের

সময় টিফিনের ছুটিতে কিংবা বেলা পড়িলে কতবার তিনি এই রকম ছাদে বেড়াইতেন, এই ছাদটিতে উঠিলেই সেই পুরানো দিন, তাহাদের সঙ্গে জড়িত কত মুখ মনে পড়ে!

একখানি মুখ মনে পড়ে—সুন্দর মুখখানি, ডাগর চোখে নিষ্পাপ দৃষ্টি, আট-ন বছরের ছেলে, নাম ছিল সুদেব। মুখের মধ্যে লেবেনচুষ পুরিয়া দিত, তখন নারাণবাবুর মাথার চুলে সবে পাক ধরিয়াছে, টিফিনের সময় রোজ পাকা চুল আটগাছি দশগাছি তুলিয়া দিত। বলিত, আপনাকে ছেড়ে কোন স্কুলে যাব না স্যার্।

তারপর আর ভাল মনে হয় না—অগণিত ছাত্রসমুদ্রে দূর হইতে দূরান্তরে তাহাদের অপস্রিয়মাণ মুখ কখন যে হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল, তার হিসাব মনের মধ্যে খুঁজিয়া মেলে না আর। জীবনের পথ বহু পথিকের আসা-যাওয়ার পদচিহ্নে ভরা, কোথাও স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট।

ঘরে আসিয়া শুইবার ইচ্ছা হইল না, নারাণবাবু আবার ডাকিলেন, ও জগদীশ, কী করলে রান্নাবান্না?

জ্যোতির্বিনোদ অন্নপিণ্ডরুদ্ধ স্বরে বলিলেন, খেতে বসেচি দাদা।

—আচ্ছা, খাও খাও—

এই স্কুলবাড়ীর ছোট ঘরটিতে কত কাল বাস! কত সুপরিচিত পরিবেশ, কত দূর অতীতের স্মৃতিভরা মাস, বৎসর, যুগ! আশপাশের বাড়ীর গৃহস্থ জীবনের কত সুখ, আনন্দ, সঙ্কট তাঁহার চোখের উপর ঘটিয়া গিয়াছে। মনে মনে তিনি এই অঞ্চলের পাড়াশুদ্ধ ছেলে মেয়ে, তরুণী কন্যা বধূদের বুড়ো দাদু, যদিও তাহাদের মধ্যে কেহই তাঁহাকে জানে না, চেনে না। আদর্শ শিক্ষক অনুকূলবাবুর স্মৃতিপূত এই বিদ্যালয়গৃহ, এ জায়গা যে কত পবিত্র—কী যে এখানে একদিন হইয়া গিয়াছে, তার খোঁজ রাখেন শুধু নারাণবাবু।

আজ মনে এত আনন্দ কেন?

কী অপূর্ব আনন্দ, একটা তরুণ মনের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি আজ তিনি আকর্ষণ করিতে পারিয়া ধন্য হইয়াছেন। অনুকূলবাবু বলিতেন, দেখ নারাণ, একটা বেলগাছে বছরে কত বেল হয় দেখেচ? একটা বেলের মধ্যে কত বিচি থাকে, প্রত্যেক বিচিটি থেকে এক হাজার মহীরুহ জন্মাতে পারে। কিন্তু তা জন্মায় না। একটা বেলগাছের ষাট-সত্তর বৎসর-ব্যাপী জীবনে অত বিচি থেকে গাছ জন্মায় না—অন্তত দুটি বেলচারা মানুষ হয়, বড় হয়, আবার বহু বেল ফল দেয়। বহু অপচয়ের হিসেব কষেই এই পৃথিবীর ইঞ্জিনীয়ারীং দাঁড় করিয়ে রেখেছেন ভগবান্। তার মধ্যেই অপচয়ের সার্থকতা। স্কুলের সব ছেলে কি মানুষ হয়? একটা স্কুল থেকে ষাট বছরে দুটো-একটা মানুষ বার হলেও স্কুলের অস্তিত্ব সার্থক। এই ভেবেই আনন্দ পাই নারাণ। প্রত্যেক শিক্ষক, যিনি শিক্ষক নামের যোগ্য—এই ভেবেই তাঁর আনন্দ ও উৎসাহ। দেশের সেবার সব চেয়ে বড় অর্ঘ্য তাঁরা যোগান—মানুষ।

জ্যোতির্বিনোদ নারাণবাবুর সামনে বিড়ি খান না। আড়ালে দাঁড়াইয়া ধূমপান শেষ করিয়া ছাদের এধারে আসিয়া বলিলেন, দাদা, এখনও খান নি? রাত অনেক হয়েছে।

—না, খাব না, শরীরটা আজ তেমন ভাল নেই।

—কী হয়েছে দাদা ? দেখি, হাত দেখি ? তাই তো, আপনার যে জ্বর হয়েছে। ছাদে ঠাণ্ডা লাগিয়ে বেড়াবেন না, বেশ গা গরম। চলুন নীচে দিয়ে আসি।

—বোস বোস। এ একটু-আধটু গা-গরমে কিছু আসবে-যাবে না। আকাশের নক্ষত্র চেন ? তুমি তো জ্যোতিষ নিয়ে ব্যবসা কর। অ্যাস্ট্রনমি জান ? ওই যে এক-একটা নক্ষত্র দেখছ—এক-একটা সূর্য্য। আমি যদি বলি, এই পৃথিবীর মত বহু হাজার পৃথিবী ওই সব নক্ষত্রের মধ্যে আছে, তা হলে তুমি কি তার প্রতিবাদ করতে পার ?

—আজ্ঞে না দাদা, প্রতিবাদ তো দূরের কথা—আমি কথাটি বলব না, আপনি যত ইচ্ছে বলে যান। যখন ও নিয়ে কখনও মাথা ঘামাইনি—আপনি যেমন জ্যোতিষ আলোচনা করেন নি কখনও—বলেন, ওসব মিথ্যে।

—মিথ্যে বলি নে, আন্‌সায়েন্টিফিক্ বলি।

—ওই একই কথা দাদা। দু পয়সা করে খাই, কাজেই বিশ্বাস করি।

নারাণবাবু ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। রাত্রে ভয়ানক পিপাসা। সমস্ত গায়ে ব্যথা। ঘুমের ঘোরে আর জ্বরের ঘোরে কত কী অস্পষ্ট স্বপ্ন দেখিলেন—চুনির মুখ, তাঁহার ছেলে নাই, কেহ কোথাও নাই। কেন ! এত ছাত্র আছে, চুনি আছে, শিয়রে চুনি বসিয়া তাঁহার সেবা করিতেছে।

পরদিন নারাণবাবু সকালে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারিলেন না। দুইচার দিন গেল, তবুও জ্বর কমে না। ক্ষেত্রবাবু ও রামেন্দুবাবু প্রায়ই আসিয়া বসিয়া থাকেন। হেডমাস্টার প্রথমে নিজের ঔষধের বাক্স হইতে বাইওকেমিক দিলেন, তারপর ডাক্তার ডাকাইলেন। জ্যোতির্বিনোদ কোথা হইতে নিজের দেশের এক কবিরাজ আনিলেন। ছাত্রেরা কেহ কেহ দেখিয়া গেল। পালা করিয়া রাত জাগিতেও লাগিল।

সকালে স্কুলের মাস্টারেরা দেখিতে আসিয়া খবরের কাগজে একটা খুনের সংবাদ শুনাইয়া গিয়াছিল। নারাণবাবু শুইয়া ভাবিতেছিলেন, মানুষে কী করিয়া খুন করে ? একবার তিনি এই স্কুলের ঘরেই রাত্রে আলো জালিয়া পড়িতেছিলেন, ডেয়ো-পিঁপড়ের দল আসিয়া জুটিল লণ্ঠনের আশেপাশে—চাপড় মারিয়া গোটা তিনেক ডেয়ো-পিঁপড়ে মারিয়াছিলেন। তারপর সে কী দুঃখ তাঁহার মনে ! একটা ডেয়ো-পিঁপড়ে আধ-মরা অবস্থায় ঠ্যাং নাড়িয়া চিত হইয়া ছটফট করিতেছিল, সেটাকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুতেই সেটাকে বাঁচানো গেল না। নারাণবাবুর মনে হইল, তিনি জীবহত্যা করিয়াছেন—দুঃখ ও অনুতাপে নিজেকে অতি নীচ বলিয়া বিবেচনা হইল। কী জানি, মানুষের বিচার করার ভার মানুষের উপর নাই। তিনি যে খুনী নহেন, তাহা কে বলিবে ?

নারাণবাবু শুইয়া যেন সমস্ত জীবনের একটা ছবি চোখের সামনে খেলিয়া যাইতে দেখিতে পান। তারাজোল গ্রামের উত্তরে প্রকাণ্ড তালদীঘি, তাহার পাড়ে ঘন তালের বন, কোনকালে রাঢ় অঞ্চলের ঠ্যাঙাড়ে ডাকাতেরা সেই দীঘির পাড়ে মানুষ মারিত। কাঁটা-

জঙ্গলের ঝোপ, আঁচোড় বাসক ফুলের গাছ নিবিড় হইয়া উঠিয়া মানুষের উগ্র লোলুপতার লজ্জা শ্যামল শান্তি ও বনকুসুমের গন্ধে ঢাকিয়া দিয়াছে। চীনা পর্য্যটক আই সিং যেমন বলিয়াছেন—মন ও অন্তঃকরণের তৃষ্ণা হইতে দুঃখ আসে, পুনর্জ্জন্ম আসে। কিন্তু তৃষ্ণা দূর কর, লোভকে ঢাকিয়া মনে শান্তি স্থাপন কর—ভ্রমসমুদ্রে মানবাত্মার পরিভ্রমণ শেষ হইবে। না, কী যেন ভাবিতেছিলেন—তারাজোল গ্রামের তালদীঘির কথা। মনের মধ্যে উল্টা-পাল্টা ভাবনা আসিতেছে।

পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের সেই হুগলী জেলার অন্তঃপাতী ক্ষুদ্র গ্রামখানি আজ আবার স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, মুখুজ্জেবাড়ীর ছেলে ছুহু ছিল সঙ্গী, ছুহুর সঙ্গে বাঁশতলায় বাঁশের শুকনা খোলা কুড়াইয়া আনিয়া নৌকা করিতেন। একবার তেঁতুলগাছে উঠিয়া তেঁতুল পাড়িতে গিয়া হাত ভাঙিয়াছিলেন, সাত ক্রোশ হাঁটিয়া দামোদরের বন্যা দেখিতে গিয়া পথে এক গ্রামে কামারবাড়ী রাত্রে তিনি ও তাঁহার দুইজন বালক সঙ্গী চিঁড়া-দুধ খাইয়া তাহাদের দাওয়ায় শুইয়া ছিলেন—যেন কালিকার কথা বলিয়া মনে হইতেছে। কতকাল তারাজোল যাওয়া হয় নাই!

কেহ নাই আপনার লোক সে গ্রামে। বহুদিন আগে পৈতৃক বাড়ী ভাঙিয়া চুরিয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে তিন দিনের জন্য তারাজোল গিয়া প্রতিবেশীর বাড়ী কাটাইয়া আসিয়াছিলেন, আর যান নাই। তখনই বাল্যদিনের সে বাড়ীঘর জঙ্গলাবৃত ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইয়াছে দেখিয়াছিলেন—হ্যাঁ, প্রায় ত্রিশ বৎসর হইবে।

নারাণবাবু মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন।

জ্যোতির্ব্বিনোদ ও যদুবাবু একসঙ্গে ঘরে ঢুকিলেন।

যদুবাবু বলিলেন, কেমন আছেন দাদা? এই দুটো কমলালেবু—ওহে জ্যোতির্ব্বিনোদ, দাও না রস ক'রে।

শ্রীশবাবু উঁকি মারিয়া বলিলেন, কে ঘরে বসে?

যদুবাবু বলিলেন, এই আমরাই আছি। এস শ্রীশ ভায়া।

—দাদা কেমন?

—এই একটু কমলালেবুর রস খাওয়াচ্ছি।

নারাণবাবুর তৃষিত দৃষ্টি দোরের দিকে চাহিয়া থাকে। দুই দিন, তিন দিন, কোন দিনই চুনিকে দেখতে পান না। চুনি আসে না কেন? বোধ হয় সে শোনে নাই তাঁহার অসুখের কথা।

সকলে চলিয়া যায়। গভীর রাত্রি। টিমটিম করিয়া আলো জ্বলিতেছে।

উত্তর মাঠে গ্রামের বাঁশবনের ও-পারে দুইটি লোক আকন্দ গাছের পাকা ও ফাটা ফল সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছে—তুলা বাহির করিয়া খেলা করিবে। তিনি আর ছুহু। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের তারাজোল গ্রাম। ছুহু বাঁচিয়া নাই—প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে মারা গিয়াছে।...

—কে ?

—আমি কমলেশ স্যার্, আমাদের নাইট-ডিউটি আজ। বিমলও আসছে।

—নারাণবাবু বলিলেন, হ্যাঁ কমলেশ, চুনিকে চিনিস ?

—না স্যার্।

—থার্ডক্লাসে পড়ে—ভাল নামটা কী যেন ! দীপ্তি বোধ হয়।

—হ্যাঁ স্যার্।

—কাল একবার বলবি বাবা—

নারাণবাবু হাঁপাইতে লাগিলেন। কথা বলিবার শ্রম সহ্য হয় না।

—বলব স্যার্, আপনি বেশী কথা বলবেন না—গরম জলটা করি। মালিশটা—

পরদিন সকাল হইতে নারাণবাবু আর মানুষ চিনিতে পারেন না।

কমলেশ ও বিমল চুনিকে গিয়া বলিল। চুনি মহাব্যস্ত, আজ তাহাদের পাড়ার ম্যাচ, তাহাকে ব্যাকে খেলিতে হইবে। আচ্ছা, খেলার পর বরং—রাত্রেই সে চেষ্টা করিয়া দেখিবে।

চুনি আসিয়াছিল, কিন্তু নারাণবাবু আর তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। লোকে বলিতেছিল, তাঁহার জ্ঞান নাই। সে কথা আসলে ঠিক নয়। তিনি তখন তারাজোল গ্রামের মাঠে, বনে, দামোদরের বাঁধে বাল্যসঙ্গী ছুনু আর গদাই নাপিতের সঙ্গে আকন্দগাছের ফলের তুলা সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত ছিলেন, পঞ্চাশ বৎসর আগের দিনগুলির মত। চুনির কণ্ঠস্বরও তাঁহাকে সেখান হইতে ফিরাইতে পারিল না।

কখনও বা অনুকূলবাবু তাঁহাকে বলিতেছিলেন, নারাণ, মানুষ তৈরী করতে হবে। তুমি আর আমি দুজনে যদি লাগি—।···বউবাজারে এই স্কুলের একটা ব্রাঞ্চ খুলব সামনের বছর থেকে। তুমি হবে য়্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার। সব বেলফলের বিচি থেকে কি চারা হয় ? বহু অপচয়ের অঙ্ক হিসেবে ধরেই ভগবানের এই সৃষ্টি। ভগবানের গৃহস্থালী কৃপণের গৃহস্থালী নয় নারাণ।···

স্কুল-মাস্টারের মধ্যে সবাই তাঁহার খাটিয়া বহন করিয়া নিমতলায় লইয়া গেল। হেডমাস্টার নিজের পয়সায় ফুল কিনিয়া দিলেন। অনেক ছাত্রও সঙ্গে গেল। শুধু ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুল নয়, আশেপাশে দুই-তিনটি স্কুলও এই আদর্শ শিক্ষাব্রতীর মৃত্যুতে একদিন করিয়া বন্ধ রহিল।

যদুবাবু বাজার করিয়া বাসায় ফিরিলেন। স্কুলের সময় হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীকে বলিলেন, মাছটা ভেজে দাও, নটা বেজে গিয়েছে—আজ একজামিন আরম্ভ হবে কিনা ! ঠিক টাইমে না গেলে সাহেব বকাবকি করবে।

শীতকালের বেলা। বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হইবে বলিয়া যদুবাবু সকালে উঠিয়া বাসার অতি ক্ষুদ্র দাওয়াটাতে দাড়ি কামাইতে বসিয়াছিলেন। দাড়ি কামানো শেষ করিয়া বাজারে গিয়াছিলেন।

দৈর্ঘ্যে সাত ফুট, প্রস্থে সাড়ে তিন ফুট ঘর—দাওয়ার এক পাশে রান্নাঘর। ঘরের জানলা খুলিলে পিছনের বাড়ীর ইট-বাহির-করা দেওয়াল চোখে পড়ে। ভাগ্যে শীতকাল, তাই রক্ষা —সারা গরমকাল ও বর্ষাকালের ভীষণ গুমটে অধিকাংশ দিন রাত্রে ঘুম হইত না। তাই সাড়ে আট টাকা ভাড়া।

ভাত খাইতে খাইতে যদুবাবু বলিলেন, বাসা বদলাব, এখানে মানুষ থাকে না, তার ওপর অবনীটা এ বাসার ঠিকানা জানে। ও যদি আবার এসে জোটে—

যদুবাবুর স্ত্রী বলিল, তা অবনী ঠাকুরপো তোমার স্কুলে যাবে, স্কুল তো চেনে। বাসা বদলালে কী হবে! কা বুদ্ধি!

—ওগো, না না। স্কুলে আমাদের যার-তার ঢোকবার জো নেই। দারোয়ানকে বলে রেখে দেব, হাঁকিয়ে দেবে। এ বাড়ীর ভাড়াটাও বেশী।

—এর চেয়ে সস্তা আর খুঁজো না। টিকতে পারবে না সে বাসায়। এখানে আমি যে কষ্টে থাকি! তুমি বাইরে কাটিয়ে আস, তুমি কি জানবে?

—কলকাতার বাইরে ডায়মণ্ডহারবার লাইনে গড়িয়া কি সোনারপুরে বাসা ভাড়া পাওয়া যায়—সস্তা, কিন্তু ট্রেনভাড়াতে মেরে দেবে।

স্কুলে যাইতে কিছু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। মিঃ আলম ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, ক্লাসে পেপার দেওয়া হয় নি। এত দেরি করে এলেন প্রথম দিনটাতেই?

একটু পরেই হেডমাস্টারের টেবিলের সামনে গিয়া যদুবাবুকে দাঁড়াইতে হইল। সাহেব বলিলেন, যদুবাবু, বড়ই দুঃখের কথা—কাজে আপনার আর মন নেই দেখা যাচ্ছে।

—না স্যার, বাড়ীতে অসুখ।

—ওসব ওজর এখানে চলবে না—মাই গেট্ ইজ ওপ্‌ন্—যদি আপনার না পোষায়—

—স্যার্, এবার আমায় মাপ করুন—আর কখনও এমন হবে না।

ব্যাপার মিটিয়া গেল। যদুবাবু আসিয়া হলে পরীক্ষারত ছেলেদের খবরদারি আরম্ভ করিলেন।

—এই দেবু, পাশের ছেলের খাতার দিকে চেয়ে কী হচ্ছে?

একটি ছেলে উঠিয়া বলিল, তিনের কোশ্চেনটা স্যার্, একটু মানে করে দেবেন?

—কই, দেখি কী কোশ্চেন! এ আর বুঝতে পারলে না? বুড়ো ধাড়ি ছেলে—তবে পড়াশুনোর দরকার কী?

—স্যার্, এ ধারে ব্লটিং পেপার পাই নি—একখানা দিয়ে যাবেন।

হেডমাস্টার একবার আসিয়া চারিদিক ঘুরিয়া দেখিয়া গেলেন। গেম-টীচার পাশের ঘরে চেয়ারে বসিয়া একখানা নভেল পড়িতেছিল, হেডমাস্টারকে হলে ঢুকিতে দেখিয়া, বইখানা টেবিলে রক্ষিত ছেলেদের বইয়ের সঙ্গে মিশাইয়া দিল। পিছনের বেঞ্চিতে দুইটি ছেলে পাশাপাশি বসিয়া বই দেখিয়া টুকিতেছিল, হেডমাস্টারকে পাশের হলে ঢুকিতে শুনিয়া বই-খানা একজন ছেলে তাহার শার্টের তলায় পেটকোঁচড়ে বেমালুম গুঁজিয়া ফেলিল।

জিনিসটা এবার গেম-মাস্টারের চোখ এড়াইল না, কারণ তাহার দৃষ্টি আর মণ্ডলের পাতায় নিবদ্ধ ছিল না, ধীরে ধীরে কাছে গিয়া ছেলেটির পিঠে হাত দিয়া গেম-টীচার কড়াস্বরে হাঁকিল, কী ওখানে ? দেখি, বার কর—

ছেলেটির মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। সে বলিল, কিছু না স্যার্—

—দেখি কেমন কিছু না—

বলা বাহুল্য, বই নিছক জড়পদার্থ, যেখানে রাখ সেখানেই থাকে, টানিতেই বাহির হইয়া পড়িল, ছেলেটি বিষণ্ণমুখে দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। তাহার অপকার্য্যের সাথী পাশের ছেলেটি তখন একমনে খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিতান্ত ভালমানুষের মত লিখিয়া চলিয়াছে।

দণ্ডায়মান ছাত্রটি হঠাৎ তাহার দিকে দেখাইয়া বলিল, স্যার্, ক্ষিতীশও তো এই বই দেখে লিখছিল।

ক্ষিতীশ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আমি ! আমি টুকছিলাম ?

গেম-টীচার বইখানি ক্ষিতীশকে দেখাইয়া বলিলেন, এই বই দেখে তুমিও টুকছিলে ?

ক্ষিতীশ অবাক হইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া বইখানির দিকে চাহিয়া রহিল, যেন জীবনে সে এই প্রথম সে-বইখানা দেখিল।

—আমি স্যার্ টুকব বই দেখে ! আমি !

তাহার মুখের ক্ষুব্ধ, অপমানিত ও বিস্মিত ভাব দেখিয়া মনে হয়, যেন গেম মাস্টার তাহাকে চুরি বা ডাকাতি কিংবা ততোধিক কোন নীচ কার্য্যে অপরাধী স্থির করিয়াছেন।

সুতরাং সে বাঁচিয়া গেল ! তাহার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নাই—এক আসামী ছাত্রের উক্তি ছাড়া গেম-মাস্টার কিছু দেখেন নাই। আসামী হেডমাস্টারের টেবিলের সম্মুখে নীত হইল, সেখানেও সে তাহার সঙ্গীর নাম করিতে ছাড়িল না।

হেডমাস্টার হাঁকিলেন, বি এ স্পোর্ট, আর ইউ নট্ অ্যাশেম্ড্ অফ নেমিং ওয়ান অফ ইওর ক্লাস মেট্স্—কাম, হাড্ ইট্—

সপাসপ বেতের শব্দে আশেপাশের ঘরের ও হলের ছাত্রেরা ভীত ও চকিত দৃষ্টিতে হেড-মাস্টারের আপিস-ঘরের দিকে চাহিল।

ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা পড়িল।

পাহারাদার শিক্ষকেরা হাঁকিলেন, ফিফ্‌টিন্ মিনিট্‌স্ মোর—

একটি ছেলে ও-কোণে দাঁড়াইয়া বলিল, স্যার্, আমাদের ক্লাসে দেরিতে কোশ্চেন্ দেওয়া হয়েছে—

যদুবাবুই এজন্য দায়ী। তিনি হাঁকিয়া বলিলেন, এক মিনিটও সময় বেশী দেওয়া হবে না—

কারণ, তাহা হইলে আরও খানিকক্ষণ তাঁহাকে সে ক্লাসের ছেলেগুলিকে আগলাইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। ছেলেরা কিন্তু অনেকেই আপত্তি জানাইল। মিঃ আলমের কাছে

আপীল রুজু হইল অবশেষে। আপীলে ধার্য্য হইল, সেই ক্লাসের ছেলেরা আরও পনেরো মিনিট বেশী সময় পাইবে। যদুবাবুকে অপ্রসন্নমুখে আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইল।

কেরানী প্রত্যেক টীচারের কাছে স্লিপ পাঠাইয়া দিল,—মাহিনা আজ দেওয়া হইবে, যাইবার সময় যে যার মাহিনা লইয়া যাইবেন।

প্রায় সব টীচারই সারা মাস ধরিয়া কিছু কিছু লইয়া আসিয়াছেন—বিশেষ কিছু পাওনা কাহারও নাই। কাটাকাটি করিয়া কেহ বারো টাকা, কেহ পনেরো টাকা হাতে করিয়া বাড়ী ফিরিলেন। ইহার মধ্যে যদুবাবুর অভাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, তাঁহার পাওনা দাঁড়াইল পাঁচ টাকা কয়েক আনা।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, চা খাবেন নাকি যদুদা? চলুন।

যদুবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আর চা! যা নিয়ে যাচ্ছি এ দিয়ে স্ত্রীর এক জোড়া কাপড় নিয়ে গেলেই ফুরিয়ে গেল।

দুইজনে চায়ের দোকানে গিয়া ঢুকিলেন।

ক্ষেত্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কী খাবেন যদুদা? আর এখন তো স্কুলের মধ্যে আপনিই বয়সে বড়, নারাণবাবু মারা যাওয়ার পরে।

—দেখতে দেখতে প্রায় দু বছর হয়ে গেল। দিন যাচ্চে, না, জল যাচ্চে! মনে হচ্চে সে দিন মারা গেলেন নারাণদা।

—হেডমাস্টারকে বলে নারাণবাবুর একটা ফোটো, কি অয়েলপেন্টিং—

—পাগল হয়েছ ভায়া, পুওর স্কুল, মাস্টারদের মাইনে তাই আজ পনেরো বছরের মধ্যে বাড়া তো দূরের কথা, ক্রমে কমেই যাচ্চে—তাও দু মাস খেটে এক মাসের মাইনে নিতে হয়। এ স্কুলে আবার অয়েলপেন্টিং ঝুলনো হবে নারাণবাবুর—পয়সা দিচ্চে কে?

দোকানের চাকর সামনে দুই পেয়ালা চা ও টোস্ট রাখিয়া গেল। যদুবাবু বলিলেন, না না টোস্ট না, শুধু চা।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, খান দাদা আমি অর্ডার দিয়েচি, আমি পয়সা দেব ওর।

—তুমি খাওয়াচ্চ? বেশ বেশ, তা হলে একখানা কেক্‌ও অমনি—

দুইজনে চা খাইতে খাইতে গল্প করিতেছেন, এমন সময়ে খবরের কাগজের স্পেশাল লইয়া ফিরিওয়ালাকে ছুটিতে দেখা গেল—কী একটা মুখে চিৎকার করিয়া বলিতে বলিতে ছুটিতেছে। ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, কী বলচে দাদা? কী বলচে?

দোকানী ইতিমধ্যে কখন্ বাহিরে গিয়াছিল। সে একখানা কাগজ আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, দেখুন না পড়ে বাবু—জাপান, ইংরেজ আর মার্কিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করচে—

দুইজনেই একসঙ্গে বিস্ময়সূচক শব্দ করিয়া কাগজখানা উঠাইয়া লইলেন। যদুবাবুই চশমাখানা তাড়াতাড়ি বাহির করিয়া পড়িয়া বিস্ময়ের সঙ্গে বলিলেন, য়্যাঁ—এ কী! এই তো লেখা রয়েছে জাপান য়্যাটাক্‌স্ পার্ল হারবার—এ কী! গ্রেট ব্রিটেন আর মার্কিন—

যদুবাবু 'গ্রেট ব্রিটেন' কথাটা বেশ টানটোন দিয়া লম্বা করিয়া গালভরা ভাবে উচ্চারণ করিলেন।

—উঃ! গ্রেট ব্রিটেন আর ইউনাইটেড স্টেট্‌স্ অব আমেরিকা!

ক্ষেত্রবাবু 'ইউনাইটেড স্টেট্‌স্ অব আমেরিকা' কথাটা উচ্চারণ করিতে ঝাড়া এক মিনিট সময় লইলেন। দুইজনেই বেশ পুলকিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন হঠাৎ। কেন, তাহার কোন কারণ নাই। একঘেয়ে দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে যেন বেশ একটা নূতনত্ব আসিয়া গেল —নারাণবাবুর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই ইউরোপে যুদ্ধ বাধিয়াছে, এবং এতদিন, আজ প্রায় দুই বৎসর, চায়ের আসর নিত্যনূতন যুদ্ধের খবরে মশগুল হইয়া ছিল। কিন্তু আজ এ আবার এক নূতন ব্যাপারের অবতারণা হইল তাহার মধ্যে।

যদুবাবু বলিলেন, আরে চল চল, স্কুলে ফিরে যাই—এত বড় খবরটা দিয়ে যাই সকলকে—

—তা মন্দ নয়, চলুন যদুদা। ওহে, তোমার কাগজখানা একটু নিয়ে যাচ্চি। দিয়ে যাব এখন ফেরত।

যে স্কুলের বাড়ী ছুটির পরে কারাগারের মত মনে হয়, ইহারা মহা উৎসাহে কাগজখানা হাতে করিয়া সেই স্কুলে পুনরায় ঢুকিলেন। মিঃ আলম, শ্রীশবাবু, জ্যোতির্বিনোদ, হেড-পণ্ডিত, রামেন্দুবাবু প্রভৃতির এ বেলা ডিউটি। তাঁহাদের মধ্যে সকলেই বিভিন্ন ঘরে পাহারাদি দিতেছেন—উৎসাহের আতিশয্যে উভয়ে কাগজখানা লইয়া গিয়া একেবারে হেডমাস্টারের টেবিলে ফেলিয়া দিলেন।

হেডমাস্টার বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, কী?

—দেখুন স্যার, জাপান হাওয়াই দ্বীপ আর পার্ল হারবার হঠাৎ আক্রমণ করেছে—মিটমাটের কথা হচ্ছিল—হঠাৎ—

হেডমাস্টার সে কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। বলিলেন, কই দেখি?

খবরটা বিদ্যুদ্বেগে স্কুলের সর্বত্র ছড়াইয়া গেল। ছেলেরা অনেকে টীচারদের নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিল। স্কুলের অটুট শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইয়া বিভিন্ন ঘরে ছেলেদের উত্তেজিত কণ্ঠের প্রশ্ন ও মধ্যে মধ্যে দুই-একজন শিক্ষকের কড়া সুরে হাঁকডাক শ্রুত হইতে লাগিল —এই! স্টপ্ দেয়ার! উইল ইউ? ইউ, রমেন, ডোণ্ট বি টকিং—হু টক্‌স্ দেয়ার? ইত্যাদি ইত্যাদি।

যদুবাবু ও ক্ষেত্রবাবু স্কুল হইতে বাহির হইলেন, কিন্তু চায়ের দোকানে কাগজ ফেরত দেওয়া হইল না, কারণ স্কুলের টীচারদের ব্যূহ ভেদ করিয়া কাগজখানা বাহির করিয়া আনা গেল না।

পড়াইতে গিয়া যদুবাবু আজ আর ছেলেকে ক্লাসের পড়া বলিয়া দিতে পারিলেন না। ছেলের বাবা ও কাকাকে জাপানের ও প্রশান্ত মহাসাগরের ম্যাপ দেখাইতে দেখাইতে সময় কাটিয়া গেল।

বাসায় ফিরিবার মুখে গলিতে বৃদ্ধ প্রতিবেশী মাখন চক্রবর্ত্তী রোয়াকের উপর অত্যন্ত

উৎসাহী শ্রোতাদের মধ্যে বসিয়া আন্তর্জাতিক রাজনীতির গুহ্য তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন, যদু-বাবুকে দেখিয়া বলিলেন, কে ? মাস্টার মশায় ? কী ব্যাপার শুনলেন ? খিদিরপুরে পাঁচশো জাপানী গুপ্তচর ধরা পড়েচে জানেন তো ?

—সে কী ! কই, তা তো কিছু শুনি নি। না বোধ হয়—

চক্রবর্ত্তী মশায় বিরক্তির সুরে বলিলেন, না কী ক'রে জানলেন আপনি ? সব পিঠমোড় করে বেঁধে চালান দিয়েছে লালবাজারে। যারা দেখে এল, তারা বললে !

—কে দেখে এল ?

—এই তো এখানে বসে বলছিল—ওই ওপাড়ার—কে যেন—কে হে ? সুরেশ বলে গেল ?

শেষ পর্য্যন্ত শোনা গেল, কথাটা কে বলিয়াছে, তাহার খবর কেহই দিতে পারে না।

যদুবাবু বাসায় আসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, শুনেছ, আজ জাপানের সঙ্গে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধ বেধেচে ?

—সে কোথায় গো ?

—বুঝিয়ে বলি তবে শোন—ম্যাপ বোঝ ? দাঁড়াও, এঁকে দেখাচ্ছি।

—ওগো, আগে একটা কথা বলি শোন। অবনী ঠাকুরপো এসেচে আজ।

যদুবাবুর উৎসাহ ও উত্তেজনা এক মুহূর্তে নিবিয়া গেল। বলিলেন, য়্যাঁ ! অবনী ? কোথায় সে ?

—আমায় বললে, চা করে দাও বউদি। চা করে দিলাম, তারপর তোমার আসবার দেরি আছে শুনে সন্ধ্যের সময় কোথায় বেরুল।

—তা তো বুঝলাম ! শোবে কোথায় ও ? বড্ড জ্বালালে দেখচি। এইটুকু তো ঘর—ওই বা থাকে কোথায়, তুমি আমিই বা যাই কোথায় ? রাঁধছ কী ?

—কী রাঁধব, তুমি আজ বাজার করবে বললে এ বেলা। বাজার তো আনলে না, আমি ভাত নামিয়ে বসে আছি। দুটো আলু ছিল, ভাতে দিয়েছি, আর কিচ্ছু নেই।

—নেই তো আমি কী জানি ? আমি কি কাউকে আসতে বলেচি এখানে !

—তা বললে কি হয় ! আসতে বলে নি, তুমিও না, আমিও না—কিন্তু উপায় কী ? নিয়ে এস কিছু।

যদুবাবু নিতান্ত অপ্রসন্নমুখে বাজার করিতে চলিলেন। তাঁহার মনে আর বিন্দুমাত্র উত্তেজনা ছিল না—এ কী দুর্দৈব ! অবনী আবার কোথা হইতে আসিয়া জুটিল।

রাত্রি নয়টার পরে অবনী একগাল হাসিয়া হাজির হইল : এই যে দাদা, একটু পায়ের ধুলো—ভাল আছেন বেশ ?

—হ্যাঁ, ভাল। তোমরা সব ভাল ? বউমা, ছেলেপিলে ? সব ভাল ? আমি শুনলাম তোমার বউদিদির মুখে যে তুমি এসেচ, শুনে আমি ভারী খুশী হলাম। বলি—বেশ, বেশ। কতদিন দেখাটা হয় নি—আছ তো দু-একদিন ?

—তা দাদা, আমি তো আর পর ভাবি নে। এলাম একটা চাকরি-টাকরি দেখতে। সংসার আর চলে না। বলি—যাই, দাদার বাসা রয়েছে। নিজের বাড়ীই। সেখানে থাকি গে, একটা হিল্লে না করে এবার আর হঠাৎ বাড়ী ফিরছি নে। কিছুদিন ধরে কলকাতায় না থাকলে কিছু হয় না।

অবনীর মতলব শুনিয়া যদুবাবুর মুখের ভাব অনেকটা ফাঁসির আসামীর মত দেখাইল। তবুও ভদ্রতাসূচক কী একটা উত্তর দিতে গেলেন, কিন্তু গলা দিয়া ভাল স্বর বাহির হইল না।

আহারাদির পর যদুবাবুর স্ত্রী বলিল, আমি বাড়ীওলার পিসীর সঙ্গে গিয়ে না হয় শুই, তুমি আর অবনী ঠাকুরপো—

যদুবাবু চোখ টিপিয়া বলিলেন, তুমি পাথুরে বোকা। কষ্ট ক'রে শুতে হচ্ছে এটা অবনীকে দেখাতে হবে, নইলে ও আদৌ নড়বে না। কিছু না, এই এক ঘরেই সব শুতে হবে।

যদুবাবুর আশা টিকিল না। সেই ভাবে হাত-পা গুটাইয়া ছোট ঘরে শুইয়া অবনী তিন দিন দিব্য কাটাইয়া দিল। যাওয়ার নামগন্ধ করে না।

একদিন বলিল, দাদা, চলুন, আজ বউদিদিকে নিয়ে সব শুদ্ধু টকি দেখে আসি। পয়সা রোজগার করে তো কেবল সঞ্চয় করছেন, কার জন্যে বলতে পারেন? ছেলে নেই, পুলে নেই।

যদুবাবু হাসিয়া বলিলেন, তা তোমার বউদিদিকে তুমি নিয়ে গিয়ে দেখাও না কেন?

—হ্যাঁঃ, আমার পয়সাকড়ি যদি থাকবে—

অবনী একেবারে নাছোড়বান্দা। অতি কষ্টে যদুবাবু আপাতত তাহার হাত এড়াইলেন।

কয়েক দিন কাটিয়া গেল। যুদ্ধের খবর ক্রমশই ঘনীভূত। বৈকালে চায়ের মজলিসে ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, শুনেছেন একটা কথা? রেঙ্গুনে নাকি কাল বোমা পড়েচে!

জ্যোতির্বিনোদ বলিলেন, বল কী ক্ষেত্র ভায়া?

—কাগজে এখনও বেরোয় নি, তবে এই রকম গুজব।

শ্রীশবাবু চায়ের পেয়ালা হাতে আড়ষ্ট হইয়া থাকিয়া বলিলেন, আমার ছোট ভগ্নীপতি যে থাকে সেখানে! তা হলে আজই একটা তার করে—

যদুবাবু ও জ্যোতির্বিনোদ দুইজনেই ব্যস্তভাবে বলিলেন, হাঁ ভায়া, দাও—এখুনি একটা তার করা আবশ্যক।

—দাদা, আমার হাতে একেবারে কিছু নেই—কত লাগে রেঙ্গুনে তার করতে, তাও তো জানি নে।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, তার জন্যে কী, আমরা সবাই মিলে দিচ্ছি কিছু কিছু। তার তুমি ক'রে দাও ভায়া, দেখি, কার কাছে কী আছে!

যত্নবাবু বিপন্নমুখে বলিলেন, আমার কাছে একেবারেই কিন্তু কিছু নেই—

—আচ্ছা, না থাকে না থাক্। আমরা দেখছি—দেখি হে, বিনোদ ভায়া—

সকলের পকেট কুড়াইয়া সাড়ে তিন টাকা হইল। শ্রীশবাবু তাহাই লইয়া ডাকঘরে চলিয়া গেলেন।

যত্নবাবু বলিলেন, তাই তো হে, এ হল কী? এমন তো কখনও ভাবিও নি।

ক্ষেত্রবাবু ও জ্যোতির্বিনোদ টুইশানিতে বাহির হইয়া গেলেন। গলির মোড়ে ইংরেজী কাগজের সদ্য প্রকাশিত সংস্করণ লইয়া ফিরিওয়ালা ছুটিতেছে—ভারি খবর বাবু—ভারি কাণ্ড হয়ে গেল—

ক্ষেত্রবাবু পকেট হাতড়াইলেন, পয়সা আছে দুইটি মাত্র! তাহাই দিয়া কাগজ একখানা কিনিয়া দেখিলেন, কাগজে বিশেষ কিছুই খবর নাই। রেঙ্গুনের বোমার তো নাম-গন্ধও নাই তাহাতে, তবে জাপানী সৈন্য ব্রহ্মের দক্ষিণে টেনাসেরিম প্রদেশে অবতরণ করিয়াছে বটে।

মনটা ভাল নয়, পয়সার টানাটানি! পুনরায় চা এক পেয়ালা খাইলে অবসাদগ্রস্ত মন একটু চাঙ্গা হইত। কিন্তু তার উপায় নাই। এমন সময়ে রামেন্দুবাবুর সঙ্গে দেখা।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, কী আজ যে চায়ের মজলিসে ছিলেন না?

—না, সাহেবের সঙ্গে দরকার ছিল। এই তো স্কুল থেকে বেরুলাম।

—যুদ্ধের খবর দেখেছেন? খুব খারাপ।

—কী রকম?

—শুনলাম নাকি রেঙ্গুনে বোমা পড়েছে।

—তা আশ্চর্য নয়! কিন্তু গুজব রটে নানারকম এ সময়ে—কাগজে কিছু লিখেছে এ বেলা?

যত্নবাবুকে কাহার সহিত যাইতে দেখিয়া দুইজনেই ডাকিয়া বলিলেন, ওই যে, ও যত্নদা, শুনে যান—

যত্নবাবুর সঙ্গে অবনী। বাজার করিয়া অবনীকে দিয়া বাসায় পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া যত্নবাবু তাহাকে লইয়া বাহির হইয়াছেন।

—এটি কে যত্নদা?

—এ—ইয়ে আমার খুড়তুতো—দেশ থেকে এসেছে—

—বেশ, বেশ। কার কাছে পয়সা আছে? রামেন্দুবাবু?

—আছে। কত?

—সবাই চা খাওয়া যাক। হবে?

—খুব হবে। চলুন সব।

যত্নবাবু বলিলেন, রামেন্দু ভায়ার কাছে চার আনা পয়সা বেশী হতে পারে? বাজার করতে যাচ্ছি কিনা!

রামেন্দুবাবু সকলকে ভাল করিয়া চা ও টোস্ট খাওয়াইলেন। যদুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দাদা, আর কী খাবেন বলুন? কেক্ একখানা দেবে?

—না, ভায়া, বরং একখানা মামলেট—

—ওহে, বাবুকে একটা ডবল ডিমের মামলেট দিয়ে যাও।

চায়ের দোকান হইতে বাহির হইয়া সকলে যে যাহার টুইশানিতে বাহির হইলেন। যদুবাবু পথে যাইতে যাইতে হঠাৎ দেখিলেন, প্রজ্ঞাব্রত ওপারের ফুটপাথ দিয়া যাইতেছে। সে এবার ম্যাট্রিক দিয়া স্কুল হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। কয়েকটি সমবয়সী বন্ধুর সঙ্গে বোধ হয় মাঠের দিকে খেলা দেখিতে যাইতেছে।

যদুবাবু ডাকিলেন, প্রজ্ঞাব্রত, ও প্রজ্ঞাব্রত—

প্রজ্ঞাব্রত এদিকে চাহিয়া দেখিল, এবং কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন মুখে ও অনিচ্ছার সহিত এপারে আসিয়া বলিল, কী স্যার্?

যদুবাবু সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, ছেলেটির কী সুন্দর উন্নত চেহারা, খেলোয়াড়ের মত সাবলীল দেহভঙ্গী, গায়ে সিল্কের হাফ-শার্ট, কাবুলী ধরনের পায়জামার মত করিয়া কাপড় পরা, পায়ে লাল, শুঁড়ওয়ালা চটি। স্কুলের নিচের ক্লাসের সে প্রজ্ঞাব্রত আর নাই।

—ভাল আছ বাবা?

—হ্যাঁ স্যার্।

—যাচ্ছ কোথায়?

প্রজ্ঞাব্রত এমন ভাব দেখাইল যে, যেখানেই যাই না কেন, তোমার সে খোঁজে দরকার কী? মুখে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দিল, এই একটু ওদিকে—

—হ্যাঁ বাবা, একটা কথা বলব ভাবছিলাম। তোমাদের বাড়ী একবার যাব আজই ভাবছিলাম—তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে। তোমার ভাই দেবব্রতকে আজকাল পড়াচ্ছে কে?

—শিববাবু বলে এক ভদ্রলোক। আপিসে চাকরি করেন—আমাদের বাড়ির সামনের মেসে থাকেন—

—ক'টাকা দাও?

—দশ টাকা বোধ হয়—কী জানি, ও-সব খবর আমি ঠিক জানি নে।

—আমি বলছিলাম কি, আমায় টুইশানিটা করে দাও না কেন। স্কুলের মাস্টার ভিন্ন ছেলে পড়াতে পারে? আমি তোমাদের স্নেহ করি নিজের ছেলের মত, আমি যেমন পড়াব—এমনটি কারও দ্বারা হবে না, তা বলে দিচ্ছি—

—কিন্তু এখন তো আমরা সব চলে যাচ্ছি কলকাতা থেকে।

যদুবাবু বিস্ময়ের সুরে বলিলেন, কলকাতা থেকে? কেন?

—শোনেন নি, জাপানীরা কবে এসে বোমা ফেলবে—এর পরে রাস্তাঘাট সব বন্ধ হয়ে

যাবে হয়তো। আমরা বুধবারে বাড়ীসুদ্ধ সব যাচ্ছি শিউড়ি, আমার দাদামশায়ের ওখানে। আমাদের পাড়ার অনেকে চলে যাচ্ছে।

—তাই নাকি ?

প্রজ্ঞাব্রত ধীরভাবে বলিল, কেন, আপনি কাগজ দেখেন না ? হাওড়া স্টেশনে গেলেই বুঝবেন, লোক অনেক চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, আসি স্যার্—

—আচ্ছা বাবা, বেঁচে থাক বাবা।

প্রজ্ঞাব্রত চলিয়া গিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। দেখ দেখি বিপদ্! যাইতেছি বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াইতে, রাস্তার মাঝখানে ডাকিয়া অনর্থক সময় নষ্ট—কে এখন বুড়ামানুষের সঙ্গে বকিয়া মুখ ব্যথা করে! মানুষের একটা কাণ্ডজ্ঞান তো থাকা দরকার, এই কি ডাকিয়া গল্প করিবার সময় মশায় ?

যদুবাবু কিন্তু অন্য রকম ভাবিতেছিলেন। প্রজ্ঞাব্রতের কথায় তিনি একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। কলিকাতা হইতে লোক পলাইতেছে জাপানী বিমানের ভয়ে ? তবে কি জাপানী বিমান এত নিকটে আসিয়া পড়িল ?

ছোট একটা টুইশানি ছিল। ভাবিতে ভাবিতে যদুবাবু ছাত্রের বাড়ী গিয়া উঠিলেন। দুইটি ছেলে, রিপন স্কুলে পড়ে—ইহাদের জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে যদুবাবু এক সময়ে কলেজে পড়িয়াছিলেন, সেই সুপারিশেই টুইশানি। যদুবাবু গিয়া দেখিলেন, বাহিরের ঘরে আলো জ্বালা হয় নাই। ডাকিলেন, ও হরে, নরে! ঘর অন্ধকার কেন।

হরেন নামক ছাত্রটি ছুটিয়া দরজার কাছে আসিয়া বলিল, স্যার্ ?

—আলো জ্বালিস নি যে বড় ?

—স্যার্, আজ আর পড়ব না।

—কেন রে ?

—আমাদের বাড়ীর সবাই কাল সকালের গাড়ীতেই দেশে চলে যাচ্ছে—মা জ্যেঠীমা, দুই দিদি—সবাই যাবে। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হচ্ছে, বড় ব্যস্ত সবাই। আজ আর—আপনি চলে যান স্যার্!

অন্যদিন টুইশানির পড়া হইতে রেহাই পাইলে যদুবাবু স্বর্গ হাতে পাইতেন, কিন্তু আজ কথাটা তেমন ভাল লাগিল না। যদুবাবু বলিলেন, তোরাও যাবি নাকি ?

—একজামিনের এখনও দু দিন বাকী আছে, একজামিন হয়ে গেলে আমরাও যাব।

—কোথায় যেন তোদের দেশ ?

—গড়বেতা, মেদিনীপুর।

—আচ্ছা, চলি তা হলে।

আজ খুব সকাল। সবে সন্ধ্যা হইয়াছে। এ সময় বাড়ী ফেরা অভ্যাস নাই। বিশেষত এখনই সে কোটরে ফিরিতে ইচ্ছাও করে না। তার উপর অবনী রহিয়াছে, জ্বালাইয়া মারিবে।

ক্রীক লেনে এক বন্ধুর বাড়ী ছুটি-ছাটার দিন যদুবাবু সন্ধ্যাবেলা গিয়া চাটা-আসটা খান, গল্প-গুজব করেন। ভাবিতে ভাবিতে সেখানেই গিয়া পৌঁছিলেন।

বন্ধু বাহিরের ঘরে বসিয়া নিজের ছেলেদের পড়াইতেছেন। যদুবাবুকে দেখিয়া বলিলেন, এস ভায়া। বোস। আজ অসময়ে যে? ছেলে পড়াতে বেরোও নি?

—সেখান থেকেই আসছি।

—একটু চা করতে বলে আয় তো তোর কাকাবাবুর জন্যে। আমার আবার বাড়ীর সবাই কাল যাচ্ছে মধুপুর। সব ব্যস্ত রয়েছে। বাঁধা-ছাঁদা—

যদুবাবুর বুকের মধ্যে ছাঁত করিয়া উঠিল। বলিলেন, কেন? কেন?

—সবাই বলছে, জাপানীরা যে-কোন সময়ে নাকি এয়ার রেড করতে পারে, তাই মেয়েদের সরিয়ে দিচ্ছি।

যদুবাবুর মনে বড় ভয় হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন, কে বললে?

—বললে কেউ না। কিন্তু গতিক সেই রকমই। এর পরে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যাবে।

—বলো কী!

—তাই তো সবাই বলচে! কলকাতা থেকে অনেকে যাচ্ছে চলে। হাওড়া স্টেশনে গিয়ে দেখ গে লোকের ভিড়।

যদুবাবু আর সেখানে না দাঁড়াইয়া বাড়ী চলিয়া আসিলেন। বাসার দরজায় দেখিলেন, দুইখানি ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়াইয়া। বাড়ীওলার বড় ছেলে ধরাধরি করিয়া বিছানার মোট ও ট্রাঙ্ক গাড়ীর মাথায় উঠাইতেছে।

যদুবাবু বলিলেন, এসব কী হে যতীন, কোথায় যাচ্চ?

যতীন বাইশ-তেইশ বছরের ছোকরা, কলেজে পড়ে। বলিল, ও, আমরা—দেশে যাচ্চি মাস্টার মশায়। সকলে বলছে, কলকাতাটা এ সময় সেফ্ নয়। তাই মা আর বউদিদিদের—

—তুমি, তোমার বাবা, এরাও নাকি?

—আমি পৌঁছে দিয়ে আবার আসব। কী জানেন, পুরুষমানুষ আমরা দৌড়েও এক দিকে না এক দিকে পালাতে পারব। হাই এক্সপ্লোসিভ বম্ব্ পড়লে এ বাড়ীঘর কিছু কি থাকবে ভাবছেন? বোমার ঝাপ্টা লেগেই মানুষ দম ফেটে মারা যায়। সে সব অবস্থায়—

যদুবাবুর পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বলিলেন, বল কী?

—বলি তো তাই। গবর্মেণ্ট বলছে, একখানা করে পেতলের চাকতিতে নামধাম লিখে প্রত্যেকে যেন পকেটে করে বেড়ায়। এয়ার রেডের পরে ওইখানা দেখে ডেড্ বডি সনাক্ত করা—

যদুবাবুর তালু শুকাইয়া গিয়াছে। এখনই যেন তাঁহার মাথায় জাপানী বোমা পড়-পড় হইয়াছে। বলিলেন, আচ্ছা যতীন, তোমরা তো ইয়ং ম্যান, পাঁচ জায়গায় বেড়াও। তোমার কি মনে হয়, বোমা শীগগির পড়তে পারে?

—এনি মোমেন্ট পড়তে পারে। আজ রাতেই পড়তে পারে। এয়ার রেড্ করার কি সময়-অসময় আছে?

—তাই তো!

যদুবাবু নিজের ঘরে ঢুকিতেই তাঁহার স্ত্রী তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, হ্যাঁ গা, হিম হয়ে তো বসে আছ—এদিকে ব্যাপার কী শোন নি? আজ রাত্রে নাকি জাপান বোমা ফেলবে কলকাতায়। বাড়ীওলারা সব পালাচ্ছে—পাশের বাড়ীর মটরের বউ আর মা চলে গিয়েছে দুপুরের গাড়ীতে। আমি কাঠ হয়ে বসে আছি—তুমি কখন ফিরবে! কী হবে, হ্যাঁ গা, সত্যি সত্যি আজ কিছু হবে নাকি?

যদুবাবু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিলেন, হ্যাঃ—ভারি—কোথায় কী তার ঠিক নেই।

ভাবিলেন, মেয়েদের সামনে সাহস দেখানোই উচিত—নতুবা মেয়েমানুষ হাউমাউ করিয়া উঠিবে।

—হ্যাঁ গা, বাইরে আজ এত অন্ধকার কেন?

—আজ ব্ল্যাক-আউট একটু বেশী। রাস্তার অনেক গ্যাসই নিবিয়ে দিয়েছে।

—তবুও তুমি বলছ—কোনও ভয় নেই?

এমন সময় অবনী আসিয়া ডাকিল, দাদা ফিরেছেন?

—হ্যাঁ, এস।

—আচ্ছা, দাদা, আজ রাস্তা এত অন্ধকার কেন?

—ও, আজ রাত দশটার পরে কম্‌প্লিট ব্ল্যাক্-আউট। মানে, রাস্তার সব আলো নিবুনো থাকবে।

—কেন?

—তুমি কিছু শোন নি যুদ্ধের খবর?

—না, কী?

যদুবাবুর মাথায় একটা বুদ্ধি আসিয়া গেল। বলিলেন, শোন নি তুমি? জাপানীরা যে, যে-কোনো সময়ে এয়ার রেড্—মানে বোমা ফেলতে পারে। সব লোক পালাচ্ছে। আজ বাড়ীওলারা চলে গেল। আমার ছাত্রেরা চলে গেল—সব পালাচ্ছে। হয়তো আজ রাত্রেই ফেলতে পারে বোমা—কে জানে? এখন একটা কথা। তুমি তোমার বউদিদিকে কাল নিয়ে যাও দেশে। আমি তো এখানে আর রাখতে সাহস করি নে—

অবনী পাড়াগেঁয়ে ভীতু লোক। তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। দাদার বাসায় স্ফূর্তি করিতে আসিয়া এ কী বিপদে পড়িয়া গেল সে! বলিল, হ্যাঁ দাদা, আজ কী দেখলেন? জাপান কি কাছাকাছি এল?

—তা কাছাকাছি বইকি। মোটের ওপর আজ রাতেই বোমা পড়া বিচিত্র নয়, জেনে রাখ।

—তাই তো!

—তুমি তা হলে কাল সকালেই তোমার বউদিদিকে নিয়ে যাও—

—তা—তা দেখি।—অবনী গুম্ খাইয়া গিয়া আপন মনে কী খানিকটা ভাবিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, হ্যাঁ দাদা, সত্যি সত্যি আজ রাতে কিছু হতে পারে?

—কথার কথা বলচি। হতে পারবে না কেন, খুব হতে পারে। বাধা কী? তুমি বোস, আমি ছ ভাঁড় দই নিয়ে আসি।

যদুবাবুর স্ত্রী কী কাজে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দেখিল, অবনী নিজের ছোট্ট টিনের স্যুটকেসটি খুলিয়া কাপড়চোপড় বাহিরে নামাইয়া আবার তুলিতেছে। তাহাকে দেখিয়া বলিল, বউদিদি, আমার গামছাখানা কোথায়?

আহারাদির পরে যদুবাবু অবনীর সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। এখানে তিনি স্ত্রীকে আর রাখিতে চান না। কাল দুপুরে অবনী তাহাকে লইয়া যাক।

অবনী নিমরাজী হইল।

সকালে উঠিয়া ঘরের দোর খুলিয়া দালানে পা দিয়া যদুবাবু দেখিলেন, অবনীর বিছানাটা গুটানো আছে বটে, কিন্তু সে নাই। অবনীকে ডাকিয়া তুলিতে হয়—অত সকালে তো সে ওঠে না। কোথায় গেল?

অবনী আর দেখা দিল না। টিনের স্যুটকেসটি কখন সে রাত্রে মাথার কাছে রাখিয়াছিল, ভোরে উঠিয়া গিয়াছে কি রাতেই পলাইয়াছে, তাহারই বা ঠিক কী?

পরদিন স্কুলে শিক্ষকদের মধ্যে একটা উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য দেখা গেল। ক্ষেত্রবাবুর বাসার আশেপাশে যাহারা ছিল, সকলেই নাকি কাল বাসা ছাড়িয়া পলাইয়াছে। ক্ষেত্রবাবু স্ত্রীকে লইয়া তেমন বাসায় কী করিয়া থাকেন। যদুবাবুর বিপদ আরও বেশী, তাঁহার যাইবার জায়গা নাই। জ্যোতির্বিনোদের বাড়ী হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে—কলিকাতায় আর থাকিবার আবশ্যক নাই, এখনই চলিয়া এস, প্রাণ বাঁচিলে অনেক চাকুরি মিলিবে। হেডমাস্টার মীটিং করিলেন—অভিভাবকেরা চিঠি লিখিতেছে, স্কুলের প্রমোশন তাড়াতাড়ি দেওয়া হউক, ছেলেরা সব বাহিরে যাইবে—এ অবস্থায় মাস্টারদের কাছে যে সমস্ত পরীক্ষার খাতা আছে, সেগুলি যত শীঘ্র হয় দেখিয়া ফেরত দেওয়া উচিত।

মিঃ আলম বলিলেন, অনেক ছেলে ট্রান্সফার চাইছে, কী করা যায়?

সাহেব বলিলেন, একে স্কুলে ছেলে নেই, এর উপর ট্রান্সফার নিলে স্কুল টিকবে না। তার চেয়েও বিপদ দেখছি, মাইনে তেমন আদায় হচ্ছে না। বড়দিনের ছুটির আগে মাইনে দেওয়া যাবে না।

যদুবাবু উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, দেওয়া যাবে না স্যার্?

—না।

—নভেম্বর মাসের মাইনে হয় নি এখনও! আমরা কী করে চালাব স্যার্, একটু বিবেচনা করুন। দুমাসের মাইনে যদি বাকী থাকে—

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, আমায় বলা নিষ্ফল, আমি ঘর থেকে আপনাদের মাইনে দেব না তো। না পোষায় আপনার, চলে যাওয়াতে আমি বাধা দেব না—মাই গেট ইজ অল্-ওয়েজ ওপ্‌ন্—

রামেন্দুবাবুকে সব মাস্টার মিলিয়া ধরিল। অন্তত নভেম্বর মাসের দরুণ কিছু না দিলে চলে কিসে? যদুবাবু কাতরস্বরে জানাইলেন, তিনি সম্পূর্ণ নিরুপায়, এ বিপদকালে কোথায় গিয়া উঠিবেন ঠিক নাই, হাতে পয়সা নাই, টুইশানির মাহিনা আদায় হয় কি না-হয়, টুইশানি থাকিবে কি না তাহারও স্থিরতা নাই—কারণ, ছেলেরা অন্যত্র যাইতেছে। কতদিনে তাহারা আসিবে কে জানে? টুইশানি না থাকিলে একেবারেই অচল।

রামেন্দুবাবুকে সাহেব বলিলেন, অবস্থা কী রকম বলে মনে হয়?

—কিছুই বুঝতে পারছি না স্যার্।

—এবার জানুয়ারী মাসে নতুন ছাত্র বেশী পরিমাণে ভর্ত্তি না হলে স্কুল চলবে না। তার-পর এই গোলমাল—

—ও কিছু না স্যার্, জানুয়ারী মাসে সব ঠিক হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে। এ একটা হুজুগ, কী বল? ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজ্যে আবার বাইরের শত্রুর ভয়!

—হুজুগ বইকি স্যার্! পিওর হুজুগ। ও কিছু না। একটা কথা—

—কী?

—মাস্টারদের মাইনে কিছু কিছু দিতেই হবে স্যার্।

—কোথা থেকে দেব? মাইনে আদায় নেই। তবে নিতান্ত ধরছে—দাও কিছু কিছু। আর একটা কথা, যে সব ছেলে ট্রান্সফারের দরখাস্ত করেচে, তাদের বাড়ী গিয়ে অভি-ভাবকদের অনুরোধ করতে হবে, তাদের যেন ছাড়িয়ে না নিয়ে যায়। ক্লাস এইটের একটা ছেলে—নাম সুধীর দত্ত, তার বাড়ী সন্ধ্যার পর একবার যেয়ো।

সন্ধ্যায় সুধীর দত্তের বাড়ী রামেন্দুবাবু অভিভাবকদের ধরিতে যাইয়া বেশ দুই কথা শুনিলেন। ছেলেটি এবার প্রমোশন পায় নাই। ছেলের অভিভাবক চটিয়া খুন, ছেলে তিনি ও-স্কুলে আর রাখিতে চাহেন না। তিনি স্কুল ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন—অনুরোধ বৃথা।

রামেন্দুবাবু বলিলেন, কেন, কী অসুবিধে হল এ স্কুলে বলুন! আমি গ্যারাণ্টি দিচ্ছি, তা দূর করে দেওয়া হবে।

—পড়াশুনো কিছু হয় না মশাই আপনাদের স্কুলে। ওদের ক্লাসে যদুবাবু বলে একজন মাস্টার পড়ান, একেবারে ফাঁকিবাজ। কিছু করান না ক্লাসে।

—আপনি ও-রকম নাম করে বলবেন না। ছেলেদের মুখে শুনে বিচার করা সব সময়ে ঠিক নয়। এবার আমি বলছি, ওর পড়াশুনো আমি নিজে দেখব।

—তা, ওরা তো কাল যাচ্ছে নবদ্বীপে। ওর মাসীর বাড়ী কবে আসবে ঠিক নেই। হ্যাঁ মাস্টারবাবু, এ হাঙ্গামা কতদিন চলবে বলতে পারেন?

—বেশী দিন চলবে বলে মনে হয় না।

—সুধীরকে জানুয়ারি মাসে ক্লাসে উঠিয়ে দেন যদি, তবে ট্রান্সফার এবার না হয় থাক্।

—তাই হবে। ওকে ক্লাস নাইনে উঠিয়ে দেওয়া যাবে।

রামেন্দুবাবু হৃষ্টমনে ফিরিতেছিলেন; কারণ, কর্ত্তব্য নিখুঁতভাবে সম্পাদন করিবার একটা আনন্দ আছে। পথের ধারে একস্থানে দেখিলেন অনেকগুলি লোক জটলা করিয়া উঁচু মুখে কী দেখিতেছে। রামেন্দুবাবু গিয়া বলিলেন, কী হয়েছে মশায়?

একজন আকাশের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, দেখুন তো স্যার্, ওই একখানা এরোপ্লেন—ওখানা যেন কী রকমের না?

রামেন্দুবাবু কিছু দেখিতে পাইলেন না। বলিলেন, কই মশায়, কিছু তো—

দুই-তিন জন অধীরভাবে বলিল, আঃ, দেখতে পেলেন না? এই ইদিকে সরে আসুন—ওই—ওই—

তবুও রামেন্দুবাবু দেখিতে পাইলেন না, একটা নক্ষত্র তো ওটা!

সবাই বলিয়া উঠিল, ওই মশায়, ওই। নক্ষত্র দেখছেন তো একটা? ওই! ও নক্ষত্র নয়—জাপানী বিমান।

রামেন্দুবাবু সাহসে ভর করিয়া বলিলেন, কিন্তু নক্ষত্র তো আরও অনেক—

লোকগুলি রামেন্দুবাবুর মূঢ়তা দেখিয়া দস্তুরমত বিরক্ত হইল। একজন বলিল, আচ্ছা, এটা কি নক্ষত্র? নীল মত আলো দেখলেন না? চোখের জোর থাকা চাই। ও হল সেই, বুঝলেন? চুপি চুপি দেখতে এসেছে—

আর একজন চিন্তিত মুখে বলিল, তাই তো, এ যে ভয়ানক কাণ্ড হল দেখছি।

পূর্ব্বের লোকটি বলিল, কলকাতায় থাকা আর সেফ্ নয় জানবেন আদৌ।

সবাই তাহাতে সায় দিয়া বলিল, সে তো আমরা জানি। যে-কোন সময়—এনি মোমেণ্ট বোমা পড়তে পারে।

রামেন্দুবাবু সে স্থান হইতে সরিয়া পড়িলেন।

পরদিন স্কুলে মাস্টারদের মধ্যে যথেষ্ট ভয় ও চাঞ্চল্য দেখা গেল। যে যে পাড়ায় থাকেন, সেই সেই পাড়া প্রায় খালি হইতে চলিয়াছে, মাস্টারদের মধ্যে অনেকের যাইবার স্থান নাই।

যদুবাবু চায়ের মজলিসে বলিতেছিলেন, সবাই তো যাচ্ছে, আমি যে কোথায় যাই!

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমারও তাই দাদা। আমার গ্রামে বাড়ীঘর সারানো নেই—কতকাল যাই নি। সেখানে গিয়ে ওঠা যাবে না।

—তবুও তোমার তো আস্তানা আছে ভায়া, আমার যে তাও নেই। চিরকাল বাসায় থেকে বাড়ীঘর সব গিয়েছে। এখন যাই কোথায়?

জ্যোতির্বিনোদ বলিল, আমার বাড়ী থেকে টেলিগ্রাম এসেছে, চিঠির পর চিঠি আসছে—বাড়ী যাবার জন্যে। বাড়ী থেকে লিখছে, চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এস।

হেডপণ্ডিত বলিলেন, কাল শেয়ালদা ইস্টিশানে কী ভিড় গিয়েছে, হে! গাড়ীতে উঠতে

পারি নে—বুড়ো মানুষ, কত কষ্টে যে ঠেলে-ঠুলে উঠলাম!

—স্কুল বন্ধ হলে যে বাঁচি। সাহেবকে সবাই মিলে বলা যাক, স্কুল বন্ধ করবার জন্যে।

সারারাত্রি ধরিয়া গাড়ীঘোড়ার শব্দ শুনিয়া যদুবাবু বিশেষ 'নার্ভাস' হইয়া উঠিয়াছিলেন। পাড়াসুদ্ধ লোক বিছানা-বোঁচকা বাঁধিয়া হয় হাওড়া, নয় শেয়ালদহ স্টেশনে ছুটিতেছে। কে বলিতেছিল, ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়া অসম্ভব ধরনে বৃদ্ধি পাইতেছে।

জ্যোতির্বিনোদ বলিল, কোন ভয় নেই দাদা। বোঁচকা মাথায় নিয়ে ঠেলে উঠব ইষ্টিশানে—আমরা বাঙাল মানুষ, কিছু মানি নে।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আস্‌সিংড়িই চলে যাই ভাবছি, ভাড়া ঘরে গিয়ে আপাতত উঠি। এখানে থাকলে এর পরে আর বেরুতে পারব না।

যদুবাবু সভয়ে বলিলেন, তাই তো, কী যে করি উপায়!

—কালই সাহেবকে গিয়ে আগে ধরা যাক, স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হোক।

ক্ষেত্রবাবু চায়ের দোকান হইতে বাহির হইয়া ধর্মতলার মোড়ে আসিলেন। দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে দুই-তিনখানি ঘোড়ার গাড়ী ছাদের উপর বিছানার মোট চাপাইয়া শেয়ালদহ স্টেশনের দিকে চলিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন—আস্‌সিংড়ি গ্রামে যাইবেন বটে, কিন্তু সেখানে বাড়ীঘরের অবস্থা কী রকম আছে, তাহার ঠিক নাই। আজ পাঁচ-ছয় বছর পূর্ব্বে নিভাননী বাঁচিয়া থাকিতে সেই একবার গিয়াছিলেন, তাহার পর আর যাওয়া ঘটে নাই। কোন খবরও লওয়া হয় নাই, কারণ এতদিন প্রয়োজন ছিল না।

একটিমাত্র টুইশানি অবশিষ্ট ছিল, সেখানে গিয়া দেখা গেল, আজ বৈকালে তাহারাও দেশে চলিয়া গিয়াছে। বাড়ীর কর্ত্তা আপিসে চাকরি করেন। বলিলেন, মাস্টার মশায়, আপনার এ মাসের মাইনেটা আর এখন দিতে পারছি নে—খরচপত্র অনেক হয়ে গেল কিনা! জানুয়ারি মাসে শোধ করব।

—আমায় না দিলে হবে না বোস মশায়, ফ্যামিলি আমাকে দেশে নিয়ে যেতে হবে—

—তা তো বুঝতে পারছি। কিন্তু এখন কিছু হবে না।

ক্ষেত্রবাবুর রাগ হইল। এখানে দুই মাসের কমে এক মাসের মাহিনা কোনদিনই দেয় না—তাও আজ পাঁচ টাকা, কাল দুই টাকা। নিতান্ত নিরুপায় বলিয়াই লাগিয়া থাকা। কিন্তু এই বিপদের সময় এত অবিবেচনার কাজ করিতে দেখিলে মানুষের মনে মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, না বোস মশায়, এ সময় আমায় দিতেই হবে। ছ মাস ধরে ছাত্র পড়ালাম, ছেলে ক্লাসে উঠল। এখন বলছেন, আমার মাইনে দেবেন না। তা হয় না—

বসু মহাশয়ও চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, মশাই, এত কাল তো পড়িয়েছেন—মাইনে পান নি কখনও বলতে পারেন কি? যদি এ মাসটাতে ঠিক সময়ে না-ই দিতে পারি—

—ঠিক সময়ে কোনদিনই দেন নি বোস মশায়, ভেবে দেখুন। তাগাদা না করলে কোন মাসেই দেন নি।

—বেশ মশাই, না-দিয়েছি তো না-দিয়েছি। মাইনে পাবেন না এখন। আপনি যা পারেন, করুন গিয়ে।

ক্ষেত্রবাবু ভদ্রস্বভাবের লোক, টুইশানির মাহিনা লইয়া একজন বৃদ্ধ ব্যক্তির সহিত ঝগড়া করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার হইল না। কিছু না বলিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া আসিলেন। কলিকাতায় বাড়ি আছে, আপিসে মোটা চাকুরিও করেন শোনা যায়, অথচ এই তো সব বিচার! ছিঃ!

অন্যমনস্কভাবে গলির মোড়ে আসিতেই ব্ল্যাক আউটের কলিকাতায় কাহার সঙ্গে ঠোকা-ঠুকি হইল! ক্ষেত্রবাবু বলিয়া উঠিলেন, মাপ্ করবেন মশাই, দেখতে পাই নি—ছুটো গ্যাসই নিবিয়েছে—

লোকটি বলিল, কে ক্ষেত্রবাবু নাকি?

—ও! রাখালবাবু?

—আমিই। ভালই হল, দেখা হল এ ভাবে। আপনাদের স্কুলে কাল যাব ভাবছিলাম—

—ভাল আছেন মিত্তির মশায়?

—আমাদের আবার ভাল-মন্দ! বই দিয়ে এসেছি পাঁচ-ছটা স্কুলে—এখন ধরায় যদি, তবে বুঝতে পারি। আপনাদের স্কুলে আমার সেই নব ব্যাকরণবোধখানা ধরানোর কী করলেন? চমৎকার বই! ক্লাস ফাইভ আর ফোরের উপযুক্ত বই। সন্ধি আর সমাস যে ভাবে ওতে দেওয়া—। বইয়ের লিস্ট হয়েচে আপনাদের?

—এখনও হয় নি।

—কেন, প্রমোশন হয় নি? তবে বইয়ের লিস্ট হয় নি কেমন কথা?

—না, প্রমোশন হবে বুধবার। শুক্রবারে ছুটি হবে।

—আমার বইয়ের কী হল?

—হেডমাস্টারের কাছে দেওয়া হয়েছে—কী হয়, বলতে পারি নে!

—আমার যে এদিকে অচল ক্ষেত্রবাবু। এই অবস্থায় প্রায় দেড়শো টাকা ধার করে বই ছাপালাম। প্রেসের দেনা এখনও বাকি। দপ্তরীর দেনা তো আছেই। বাসা ভাড়া তিন মাসের বাকী। বই যদি না চলে, তবে খেতে পাব না ক্ষেত্রবাবু। আপনারাই ভরসা।

—বুঝলাম সবই রাখালবাবু, কিন্তু এ তো আর আমার হাতে নয়। আমি যতদূর বলবার বলেচি।

কথার মধ্যে সত্যের কিছু অপলাপ ছিল। ক্ষেত্রবাবু বলেন নাই! রাখাল মিত্তিরের বই আজকাল অচল। তবুও হয়তো চলিত, কিন্তু বড় বড় প্রকাশকের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া বই চালানো রাখাল মিত্তিরের কর্ম নয়। তাহারা লাইব্রেরির জন্য বিনামূল্যে কিছু বই দেয়, প্রাইজের সময় বই কিনিলে মোটা কমিশন দেয়।

রাখাল মিত্তির ক্ষেত্রবাবুর পিছু ছাড়ে না। বলিল, আসুন না আমার ওখানে, একটু চা খাবেন—

শেষ পর্য্যন্ত যাইতেই হইল—নাছোড়বান্দা রাখাল মিস্তিরের হাতে পড়িলে না গিয়া উপায় নাই। সেই ছোট একতলার কুঠুরি। এই অগ্রহায়ণ মাসেও যেন গরম কাটে না। একখানা নীচু কেওড়া কাঠের তক্তাপোশের উপর মলিন বিছানা। কেরোসিন কাঠের একটা আলমারিভর্ত্তি বই। ঘরখানা অগোছালো, অপরিষ্কার, মেঝের উপরে পড়িয়া আছে দুইটা ছেঁড়া জামা ছেলেপুলেদের, এক বোতল আঠা, একটা আলকাতরা মাখানো মালসা।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, কী বই রাখালবাবু, আলমারিতে!

—দেখবেন? এ সব বই—এই দেখুন—

রাখালবাবু সগর্ব্বে বই নামাইয়া দেখাইতে লাগিলেন।

—এই দেখুন প্রকৃতিবোধ অভিধান। পুরনো বইয়ের দোকান থেকে তিন টাকায়—আর এই দেখুন মুগ্ধবোধ—মশাই, সংস্কৃত ব্যাকরণ না পড়লে কি ভাষার ওপর দখল দাঁড়ায়? সহর্ণেঘঃ থেকে আরম্ভ করে সব সূত্র তিনটি বছর ধরে মুখস্থ করে ভোঁতা হয়ে গিয়েছে, তাই আজ দু-এক পয়সা ক'রে খাচ্চি। রাখাল মিস্তিরের ব্যাকরণের ভুল ধরে, এমন লোক তো দেখি নে। গোয়ালটুলি স্কুলের হেডপণ্ডিত সেদিন বললে—মিস্তির মশাই, আপনার ব্যাকরণ পড়লে ছেলেদের সন্ধি আর সমাস গুলে খাওয়া হয়ে গেল। পড়া চাই—পেটে বিদ্যে না থাকলে—

—আপনার বই ধরিয়েচে নাকি?

—না, হেডমাস্টার বললে, শশিপদ কাব্যতীর্থের ব্যাকরণ আর-বছর থেকে রয়েছে ক্লাসে। এ বছর যুদ্ধের বছরটা, বই বদলালে গার্জেনরা আপত্তি করবে—তাই এ বছর আর হল না। সামনের বছর থেকে নিশ্চয়ই দেবে।

একটি বারো-তেরো বছরের রোগা মেয়ে, একটা থালায় দুটি আংটাভাঙা পেয়ালা বসাইয়া চা আনিল। রাখালবাবু বলিলেন, ও পাঁচী! এটি আমার ভাগ্নী—আমার যে বোন এখানে থাকে, তার মেয়ে—প্রণাম কর মা, উনি ব্রাহ্মণ।

—আহা, থাক্ থাক্। এস মা, হয়েছে—কল্যাণ হোক। বেশ মেয়েটি।

—অসুখে ভুগছে। বর্দ্ধমানে দেশ, কেউ নেই। এবার এক জ্ঞাতি কাকা নিয়ে গিয়েছিল, ম্যালেরিয়ায় ধরেচে। যাও মা, দুটো পান নিয়ে এস তোমার মামীমার কাছ থেকে। চা মিষ্টি হয়েছে? চিনি নেই, আখের গুড় দিয়ে—

—না না, বেশ হয়েছে।

দুধচিনিবিহীন বিস্বাদ চা, তামাকি-মাখা গুড়ের গন্ধ, এক চুমুক খাইয়া বাকিটুকু গলাধঃকরণ করিতে ক্ষেত্রবাবুর বিশেষ কসরৎ করিতে হইল।

রাখালবাবু বলিলেন, তা তো হল, কী হাঙ্গামা বলুন দিকি! পাড়া যে খালি হয়ে গেল অর্দ্ধেক!

—আপনাদের এ পাড়াতেও?

—হ্যাঁ মশাই, আশেপাশে লোক নেই। সব পালাচ্ছে। পাশের বাড়ীর যোবালেরা

আজ সকালে সব পালাল—এখন ওরা বড়লোক, এই দিনকতক আগেও পুতুলের বিয়েতে হাজার টাকা খরচ করেছে। ফুলশয্যের তত্ত্ব করেছিল, দশজন ঝি চাকর মাথায় করে নিয়ে গেল, মায় রূপোর দান-সামগ্রী, খাট বিছানা এস্তোক! ওদের কথা বাদ দিন। এখন আমরা যাব কোথায়?

—সেই ভাবনা তো আমারও, ভাবছি তো। গরীব স্কুল-মাস্টার—

—গরীব তো বটেই, যাবার জায়গাও তো নেই।

—আপনার দেশে বাড়ীঘর—

রাখালবাবু হাসিয়া বলিলেন, দেশই নেই, তার বাড়ীঘর! দেশ ছিল ন'দে জেলায়, কাঁচড়াপাড়া নেমে যেতে হয়। ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম। সে সব কিছু নেই। বড় হয়ে আর যাই নি, এই কলকাতাতেই—

—আমারও তো তাই।

পাঁচী পান আনিয়া রাখিয়া গেল।

—অনেক পয়সা খরচ করে বই ছাপালাম, চার-পাঁচ শো টাকা দেনা এখনও বাজারে। এই হাঙ্গামাতে যদি বই বিক্রি কমে যায়, তবে তো পথে বসতে হবে। আপনাদের ভরসাতেই—

—কিছুই বুঝছি নে, কী যে হবে!

—আমাদের এখানে কিছু হবে না, কী বলেন? যুদ্ধ হচ্ছে ফিলিপাইনে আর হংকংয়ে, তার এখানে কী?

—সিঙ্গাপুর ডিঙিয়ে আসা অত সোজা নয়।

—তবে লোক পালাচ্চে কেন?

—প্যানিক—ভয়! প্যানিক একেই বলে। আচ্ছা উঠি, রাত হল মিত্তির মশাই।

—আর একটু বসবেন না? আচ্ছা, তা হলে—হ্যাঁ, একটা কথা। আনা আষ্টেক পয়সা হবে?

পকেটে যাহা কিছু খুচরা ছিল, তক্তাপোশের উপর রাখিয়া ক্ষেত্রবাবু বাহিরের মুক্ত বাতাসে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া যেন বাঁচিলেন।

'স্পেশাল টেলিগ্রাফ' কাগজ বাহির হইয়াছে, কাগজওয়ালা ফুটপাথ ধরিয়া ছুটিতেছে। ক্ষেত্রবাবু একজনের হাত হইতে কাগজ লইয়া দেখিলেন—হংকং অবরুদ্ধ।…চীনসমুদ্রে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস!

ক্ষেত্রবাবু কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন।

পরদিন স্কুলে হেডমাস্টার সব মাস্টারকে আপিসে ডাকিলেন। জরুরী মীটিং।

হেডমাস্টার এ বছরের পরীক্ষার লম্বা রিপোর্ট লিখিয়াছেন, সকলকে পড়িয়া শোনাইলেন। প্রত্যেক শিক্ষকের নিকট হইতে রিপোর্ট লওয়া হয়, পরীক্ষার কাগজ দেখার পরম। সেই

সব রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া হেডমাস্টার নিজে রিপোর্ট লিখিয়া অভিভাবকদের মধ্যে ছাপাইয়া বিলি করেন। তাঁহার ধারণা, ইহাতে স্কুলে ছেলে বাড়িবে।

রিপোর্ট পড়িয়া সকলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কী রকম হয়েছে?

সকলেই বলিলেন, চমৎকার রিপোর্ট হইয়াছে, এমনধারা হয় না।

—থার্ডক্লাসের ইংরিজী নিতেন কে?

যদুবাবু বলিলেন, আমি স্যার্।

—ভীষণ খারাপ ফল এবার আপনার সাবজেক্টে। আপনি লিখিত কৈফিয়ত দেবেন—

—যে আজ্ঞে স্যার্।

—ক্লাস সেভেনের ইতিহাস কে নেয়?

শ্রীশবাবু বলিলেন, আমি স্যার্।

—সকলের চেয়ে ভাল ছেলে মোটে যাট পেয়েছে।

—স্যার, প্রশ্ন বড় কঠিন হয়েছিল—সিলেবাস ছাড়া প্রশ্ন হলে কী করে ছেলেরা—

—না। এমন কিছু কঠিন নয়। প্রশ্নপত্র সব আমি আর মিঃ আলম দেখে দিয়েছি। কমিটীতে এ কথা আমায় রিপোর্ট করতে হবে। লিখিত কৈফিয়ত দেবেন। আর এবার বাড়ী বাড়ী গিয়ে একটু ক্যানভাস করা দরকার হবে ছুটির পরে। নইলে ছেলে হবে না।

ক্ষেত্রবাবু ভয়ে ভয়ে বলিলেন, কিন্তু স্যার্, এদিকে শহর যে খালি হয়ে গেল—

সাহেব তাচ্ছিল্যের সুরে বলিলেন, কে বললে?

যদুবাবু ও শ্রীশবাবু দাঁড়াইয়া বলিলেন, সেই রকমই দেখা যাচ্ছে স্যার্। ক্ষেত্রবাবু ঠিক বলেছেন।

গেম্ মাস্টার বিনোদবাবু বলিলেন, আমাদের পাড়াতে তো আর লোক নেই।

জগদীশ জ্যোতির্বিনোদ বলিল, আমি এক জায়গায় ছেলে পড়াই, তারা চলে গিয়েছে। তাদের পাড়া খালি।

সাহেব মিঃ আলমের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কী মিঃ আলম, আপনি কি দেখেছেন? এই রকম হয়েছে নাকি?

মিঃ আলম উঠিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, না স্যার্। এখানে ওখানে দু-একটা বাড়ী খালি হয়েছে বটে। কিছুই নয়।

ক্ষেত্রবাবু প্রতিবাদের সুরে বলিলেন, কিছু না কী রকম মিঃ আলম। হাওড়া স্টেশনে নাকি বেজায় ভিড় হচ্চে—কুলি আর ঘোড়ার গাড়ীর দর্‌ বেজায় বেড়েছে—

—ওসব গুজব। কই, আমি তো রোজ বেড়াই, কিছু দেখি নি।

এমন সময় রামেন্দুবাবু বাহির হইতে একখানা খবরের কাগজ লইয়া ঘরে ঢুকিয়া সাহেবের টেবিলে রাখিয়া বলিলেন, দেখুন স্যার্, হংকং যায় যায়—জাপানীরা সিঙ্গাপুরে দূর-পাল্লার কামানের গোলা ছুঁড়েচে।

হেডমাস্টারের কড়া ডিসিপ্লিনের নিগড় বুঝি টুটিল। ক্ষেত্রবাবু ও শ্রীশবাবু টেবিলের

উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া খবরের কাগজ পড়িতে গেলেন। সমবেত শিক্ষকদের মধ্যে একটা গুঞ্জনধ্বনি উথিত হইল।

—তাই তো!

—তাই তো!

—দেখ না ভায়া কাগজটা।

—সিঙ্গাপুর বিপন্ন!

—ব্যাপার কি?

সাহেব কাগজ হাতে তুলিয়া পড়িয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, বাজে গুজব। সিঙ্গাপুর পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য।

মিঃ আলম বলিলেন, বাজে গুজব—হেঁঃ—

সাহেব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কাগজখানা একদিকে সরাইয়া বলিলেন, যাক এসব! তা হলে বাড়ী বাড়ী ক্যানভাসিংয়ের জন্যে কে কে রাজী আছেন বলুন? সকলের সাহায্যই আমি চাই। যদুবাবু? ক্ষেত্রবাবু? মিঃ আলম?

ইঁহারা সকলেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলের ডিসিপ্লিন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইল। জাপানী বোমার হুজুগে পড়িয়া সে কঠোর ডিসিপ্লিনের ভিত্তি সামান্য একটু নড়িয়া উঠিয়াছিল মাত্র—তাহাও অতি অল্পক্ষণের জন্য।

হেডপণ্ডিত বলিলেন, স্যার্, ছুটি ক'দিন হচ্চে?

সাহেব গম্ভীরস্বরে বলিলেন, পাণ্ডিট, ছুটি বেশী দিন দিতে চাই না। দোসরা জানুয়ারি খুলবে। কিন্তু তার আগে ক্যানভাসিং করবার জন্যে চার-পাঁচজন টীচারকে এখানে থাকতে হবে। আমি তাদের নামে সারকুলার করব।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমাদের মাইনেটা স্যার্—

—স্কুল খুললে দেওয়া হবে।

যদুবাবু মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিলেন, কিছু না দিলে স্যার্, আমরা দাঁড়াই কোথায়? হাতে কিছু নেই—

—যার না পোষাবে, তিনি চলে যেতে পারেন—মাই গেট্—

যদুবাবু শিক্ষক কর্ত্তৃক তিরস্কৃত স্কুলের ছাত্রের মত ঘাড় নীচু করিয়া পুনরায় আসনে বসিয়া পড়িলেন।

হেডমাস্টার বলিলেন, আমি ছুটির ক'দিন মিঃ আলম, রামেন্দুবাবু আর ক্ষেত্রবাবুকে চাই। তাঁরা রোজ আসবেন আপিসে। নতুন বছরের রুটিনে অনেক অদলবদল করতে হবে। সিলেবাস তৈরি করতে হবে প্রত্যেক ক্লাসের। আপনারা তিন জন আমাকে সাহায্য করবেন। যদুবাবু?

যদুবাবু আবার দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

—আপনিও আসবেন। আপনাকে ক্লাস-টাস্কের একটা চার্ট করতে হবে গ্রীষ্মের ছুটি পর্যন্ত।

যদুবাবুর মুখ শুকাইয়া গেল। আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, আমি স্যার্, আমার শালীর, মানে—বিয়ে—দেশে যেতে হবে সেখানে। আমিই সব দেখাশুনো করব—

হঠাৎ মনে পড়িল পৌষ মাসে বিবাহ হয় না হিন্দুর, এ কথা সাহেব না জানিলেও অন্যান্য মাস্টারেরা সবাই জানে, হয়তো আলমও জানে। আলম সাহেবকে বলিয়া দিতেও পারে। তাই তাড়াতাড়ি সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, বিয়ে এই সামনের বুধবারে, কিন্তু ছুটিতে আমার না গেলে—

—ইয়েস্, ইয়েস্, আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড।

সভা ভঙ্গ হইল। সাহেবের ঘর হইতে বাহির হইয়া যদুবাবু রামেন্দুবাবুকে পাকড়াও করিলেন।

—ও রামেন্দুবাবু, আমায় গোটা দশেক টাকা দিতে বলুন সাহেবকে। করে দিতেই হবে। না হলে মারা যাব। হাতে কিচ্ছু নেই। টুইশানির ছেলে পালিয়েছে। কোথায় পয়সা পাই বলুন তো?

ক্ষেত্রবাবু বাড়ী ফিরিতেই অনিলা ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিল, এসেছ? শোন, সব পালাচ্ছে। পাড়া ফাঁক হয়ে গেল যে? সোমবার থেকে নাকি হাওড়ার পুল খুলে দেবে, রেলগাড়ী বন্ধ ক'রে দেবে?

—কে বললে?

—কে বলল আবার—সবাই বলছে। তোমার ছুটির কদিন দেরি? এর পর যাওয়া যাবে না কোথাও—ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া নাকি দশ টাকা ক'রে হয়েছে—বোমা নাকি শীগ্গির পড়বে। সিঙ্গাপুর ব্লকেড্ করেছে, দেখেচ তো?

ক্ষেত্রবাবুর ভয় হইয়া গেল। তাই তো, ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়া চড়িয়া গেলে কী করিয়া কলিকাতা ত্যাগ করিবেন? বলিলেন, কিন্তু কোথায় যাওয়া যায় বল তো? জায়গা তো দেখছি এক আম্‌সিংড়ি। কতকাল সেখানে যাই নি। নিভা বেঁচে থাকতে একবার গরমের ছুটিতে সেখানে গিয়েছিলাম। বাড়িঘর এতদিনে ইটের স্তূপ হয়েছে পড়ে। বেজায় জঙ্গল সে গাঁয়ে।

—চল, গয়া যাই।

—পয়সা? অত টাকা কোথায়? স্কুলে এক পয়সা দিলে না।

—আমার বাক্সে পাঁচ-ছটা টাকা আছে। আর কিছু ধার কর।

—কে দেবে ধার? সে বাজার নয়।

—কিন্তু যা হয় কর তাড়াতাড়ি। এর পর আর কলকাতা থেকে বেরুনো যাবে না সবাই বলচে।

—রান্না হয়ে থাকে, দাও। আমি একবার যদুদার বাসা থেকে আসি। দেখে আসি, কি করছে ওরা!

যদুবাবু বাসায় পা দিতেই তাঁহার স্ত্রী বলিল, ওগো, কী হবে গো? সবাই চলে যাচ্ছে, কী করবে কর। কোন্‌দিন ঝুপ করে বোমা পড়বে, তখন—

—দাঁড়াও, একটু স্থির হতে দাও। চা কর, আগে খাই। তারপর সব শুনছি।

চা করিয়া যদুবাবুর গৃহিণী কাঁসার গ্লাসে আঁচল জড়াইয়া লইয়া আসিল।

যদুবাবু বলিলেন, কেন, পেয়ালা?

—সে ও-বেলা ধুতে গিয়ে হাত থেকে পড়ে গুঁড়ো হয়ে গেল।

যদুবাবু রাগিয়া উঠিলেন: তা ভাঙবে বইকি, তোমাদের তো ভেবে খেতে হয় না। জিনিসপত্র নষ্ট করলেই হল—লাগে টাকা, দেবে গৌরী সেন! একটা পেয়ালার দাম কত আজকালকার বাজারে, তার খোঁজ রাখ?

এমন সময় বাহিরে ক্ষেত্রবাবুর গলা শোনা গেল: ও যদুদা, বাসায় আছেন নাকি?

যদুবাবু তাড়াতাড়ি চা-সুদ্ধ কাঁসার গ্লাসটা স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিলেন, এটা নিয়ে যাও—নিয়ে যাও। দেখে ফেলবে, বলবে কী? গলার স্বর বাড়াইয়া বলিলেন, এস ক্ষেত্র ভায়া—এস এস—

—কী হচ্ছে?

—এই সবে এলাম ভাই। সবে মিনিট দশেক। তারপর কী মনে করে? বোস এইটেতে।

—বউদিদি কোথায়? ও বউদিদি, বলি, একটু চা-টা না হয় করেই খাওয়ান—

যদুবাবু হাসিয়া বলিলেন, চা খাবে কি ভাই, পেয়ালা ভেঙে বসে আছে তোমার বউদিদি—কাঁসার গেলাসে চা খাচ্ছিলাম, তা তোমাকে কি আর তাতে—

—খুব দেওয়া যাবে। তাতেই দিন না বউদিদি।

—দাও তা হলে, ওগো, ওই চা-ই দিয়ে যাও—ক্ষেত্র ভায়া আমাদের ঘরের লোক।

চা আসিল। চা খাইতে খাইতে ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, তা তো হল। এখন কী উপায় করা যাবে বলুন দিকি? কলকাতার যা অবস্থা! লোক সব পালাচ্ছে—

—হেডমাস্টার তা বুঝবেন না। তাঁর মতে কোন বিপদের কারণ নেই। আবার বাড়ী বাড়ী ঘুরে ক্যান্‌ভাসিং করতে হবে ছেলের জন্য! ছেলে কোথায়? কলকাতা শহর তো ফাঁকা হয়ে গেল।

—তা কি আর সাহেবকে বোঝানো যাবে দাদা? কাল থেকে ক্যান্‌ভাসিংয়ে না বেরুলে সাহেব রাগ করবে। আপনারও তো ডিউটি আছে।

—তাই তো, কী করা যায় ভাবচি। মুশকিল আসলে কী হয়েছে জান ভায়া, হাতে নেই পয়সা। রামেন্দু ভায়াকে ধরেছি, সাহেবকে বলে গোটাদশেক টাকা আমায় না দেওয়ালে চলবে না।

—কোথায় যাবেন ভাবচেন ?

—কোথায় যে যাই !—হাতে পয়সা নেই, দেশঘর নেই। তোমার তবুও তো দেশে বাড়ীঘর আছে, আমার যাবার স্থান নেই। এক আছে জ্ঞাতি-ভাইয়ের বাড়ী, বেড়াবাড়ী বলে গ্রাম, তা সেখানে তারা যে রকম ব্যবহার করেচে—পরের বাড়ী, কোন জোর তো সেখানে খাটে না ! তুমি কোথায় যাবে ভাবচ ?

—আমারও সেই একই অবস্থা। আস্‌সিংড়িতে—মানে আমাদের দেশে—কতকাল যাই নি। বাড়ীঘর এতদিনে ভূমিসাৎ—নয়তো একগলা জঙ্গল, সাপ-ব্যাঙের আড্ডা হয়ে আছে। মেয়েছেলে নিয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়াই কী করে ? আমার স্ত্রী বলছিল, গয়াতে—শ্বশুরবাড়ী—

—সেই সব চেয়ে ভাল আমার মতে। তাই কেন যাও না ?

—পয়সা? পয়সা কোথায়? স্কুলে খাটব, দু মাস পরে এক মাসের মাইনে নেব—এই তো অবস্থা। জানেন তো সবই।

—আচ্ছা, তোমার কী মনে হয় ভায়া ? জাপানীরা কি এতদূর আসবে ? সিঙ্গাপুর নিতে পারবে ?

—কী করে বলব ? তবে আমার এক জানাশোনা গবর্মেণ্ট অফিসার বলছিল, সিঙ্গাপুর হঠাৎ নিতে পারবে না। ওখানে যুদ্ধ হবে দারুণ, এবং সে যুদ্ধ কিছুকাল চলবে।

—তবে কলকাতাতে বোমা ফেলতে পারে, কী বল ?

—ফেলতে পারে। সাহেব যাই বলুক, কলকাতা খুব সেফ্ হবে না।

—স্কুলটাতে দু দিন বেশী ছুটির কথা বলে দেখলে হয় না ?

—সাহেবকে তা বলা যাবে না। সাহেব ভিজবে না।

ক্ষেত্রবাবু আর কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া বিদায় লইলেন। ব্ল্যাক-আউটের কলিকাতা, ঘুটঘুটে অন্ধকার—কাল হইতে আলো আরও কমাইয়া দিয়াছে। মোড়ের কাছে এক জায়গায় ঘোড়ার গাড়ির আড্ডা। ক্ষেত্রবাবুর কৌতূহল হইল, গাড়ির ভাড়া কেমন হাঁকে একবার দেখিবেন।

রাস্তা পার হইতে ভয় করে। অন্ধকারের মধ্যে দূরে বা নিকটে বহু আলো তাঁহার দিকে আসিতেছে—ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে বোঝা যায় না, কত বেগে সেগুলি এদিকে আসিতেছে। ক্ষেত্রবাবু সন্তর্পণে সন্তর্পণে রাস্তা পার হইয়া গাড়ীর আড্ডার কাছে গিয়া বলিলেন, ওরে গাড়োয়ান, ভাড়া যাবি ?

একখানা গাড়ির ছাদে একটা লোক শুইয়া ছিল। উঠিয়া বলিল, কাঁহা যানে হোগা বাবুজি ?

—হাওড়া ইষ্টিশানে।

—আভি যাইয়েগা ?

—হ্যাঁ, এখুনি।

—ক আদমী আছে ?

—তিন চার জন আছে—মালপত্তর। কত ভাড়া নিবি ?

—এক বাত বোলেগা বাবুজি ? চার রুপেয়া।

—কত?

—চার রুপেয়া বাবুজি। কাল ইস্‌সে আউর বাঢ়েগা বাবুজি। কাল পান্‌-ছ রুপেয়া হোগা। দিন দিন বাঢ়তে যাতা হ্যায়—যাবেন আপনি ? সওয়ারী কোথা থেকে যাবে ?

ক্ষেত্রবাবু কী একটা অজুহাত দেখাইয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন। তাঁহার হাত-পা যেন অবশ হইয়া আসিতেছে—সম্মুখে যেন ঘোর বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে, প্রলয় অথবা মৃত্যু, স্ত্রীপুত্র লইয়া এই ব্ল্যাক-আউটের ঘুটঘুটে অন্ধকারাচ্ছন্ন কলিকাতা শহরে তিনি বোতলের ছিপি আঁটা অবস্থায় বুঝি মারা পড়িলেন ! ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়া দিনে দিনে যদি অসম্ভব অঙ্কের দিকে ছোটে, তবে তাঁর মত গরীব স্কুল-মাস্টার তো নিরুপায়।

মোড়ের মাথায় বিষ্ণু ভট্টচাজের সঙ্গে অন্ধকারে প্রায় মাথা ঠুকিয়া গেল। পরস্পরকে চিনিয়া পরস্পর ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বিষ্ণু হাওড়ার রেলওয়ে মালগুদামে কাজ করে, বলিল, ওঃ, জানেন ক্ষেত্রদা, কী কাণ্ড আজ হাওড়া স্টেশনে ! প্রত্যেক ট্রেন ছাড়ছে, লোকে লোকারণ্য। লোক গাড়ীতে উঠতেপাচ্ছেনা—দশ টাকা, পনেরো টাকা করে কুলিরা নিচ্ছে। আবার শুনছি, হাওড়া ব্রিজ দিয়ে গাড়ী-ঘোড়া যাওয়া বন্ধ করে দেবে। এত ভিড় যে, স্ট্র্যাণ্ড রোড একেবারে জ্যাম্—ই. আই. আর.-এর গাড়ীতে ওঠবার উপায় নেই।

—তুমি এখনও আছ যে ?

—আমি আর কোথায় যাব ? ফ্যামিলি পাঠিয়ে দিয়েছি বীরভূম—মামাশ্বশুর-বাড়ী।

ক্ষেত্রবাবু বাসায় ঢুকিলেন। অনিলা বলিল, কী হল গো ? যদুবাবু কী বললে ?

—বলবে আর কী ! সব একই অবস্থা। সেও ভাবছে কোথায় যাবে—জায়গা নাই—

—গয়া যাবে ?

—যাব কি, ই. আই. আর-এর গাড়ীতে নাকি যাওয়ার উপায় নেই।

—তবে কী করবে ? স্কুল তো এখনও বন্ধ হল না !

—বন্ধ হলে কী হবে ? আমার ছুটির মধ্যে ডিউটি পড়েছে—আমার যাবার জো নেই—

অনিলা স্বামীর হাত ধরিয়া মিনতির স্বরে বলিল, ওগো, আমার মুখের দিকে চেয়ে তুমি চাকরি ছেড়ে দাও। এই বোমার হিড়িকে তোমাকে এখানে ফেলে রেখে আমার কোথাও গিয়ে শান্তি হবে না। ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে চাইতে হবে লক্ষীটি, শুধু তোমার-আমার কথা ভাবলে হবে না।

ক্ষেত্রবাবুর মনে হইল, তাঁহার মাথার উপরে ভীষণ বিপদ সমাগত। স্ত্রীর গলার স্বরে, নিজের মুখের কথায় যেন কোন মহা ট্র্যাজেডির ইঙ্গিত দিতেছে, সে ট্র্যাজেডির বেড়াজাল এড়াইয়া কোথাও পলাইবার পথ নাই।

সারারাত্রি বড় রাস্তা দিয়া ঘড়-ঘড় করিয়া ঘোড়ার গাড়ী আর ঠুনঠুন করিয়া রিক্শা ছুটিতেছে—ক্ষেত্রবাবু বিনিদ্র চক্ষে সারারাত্রি ধরিয়া শুনিয়াই চলিলেন। অনিলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে,ছেলেমেয়েরা ঘুমাইতেছে,সম্মুখে কী বিপদ, ইহাদের সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই। কী করিয়া উদ্ধত জাপানী বোমার হাত হইতে ইহাদের বাঁচাইবেন? বাঁচাইতে পারিবেন কি শেষ পর্যন্ত? হাতে টাকা পয়সা কোথায়?

সারারাত্রি ক্ষেত্রবাবু বিছানায় এপাশ ওপাশ করিলেন।

পরদিন স্কুলের প্রমোশন। সাহেব খুব সকালে উঠিয়া—অভিভাবকদের পড়িয়া শোনাইবার জন্ম যে রিপোর্ট লিখিয়াছেন, তাহা আর-একবার পড়িয়া দেখিতে বসিলেন। আজ ছেলেদের প্রমোশনের পর অভিভাবকদের সভায় এই রিপোর্ট পড়া হইবে—প্রতি বৎসর হইয়া থাকে, অভিভাবকদের নিমন্ত্রণ করা হয়, এবারও হইয়াছে।

"বড়ই আনন্দের কথা সপ্তম শ্রেণীর ইংরেজী পরীক্ষার ফল এবার যথেষ্ট আশাপ্রদ, যদিও ক্লাসের সর্বোচ্চ নম্বর শত-করা বাহান্ন, তবুও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রত্যেক উত্তরের খাতা আমাকে যথেষ্ট সন্তোষ দান করিয়াছে। ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে হরিচরণ এবার গ্রামারে বিশেষ উন্নতি করিয়াছে, যদিও ক্রিয়াপদের যথার্থ প্রয়োগ এখনও সে শিক্ষা করে নাই। গ্রামার-শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক এজন্ম যত্ন লইতেছেন। শ্রীমান নবীনচন্দ্র গুঁই ইংরেজী আর্টিক্‌লের ব্যবহারে বালকসুলভ ভ্রম প্রদর্শন করা সত্ত্বেও তাহার গ্রামারের জ্ঞান উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। নবম শ্রেণীর অঙ্কের ফল এ বৎসর আশাতীত ভাল। শ্রীমান গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় নব্বুই নম্বর পাইয়া অঙ্কে ক্লাসের সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। আমি এই বালকের গত বৎসরের অঙ্ক পরীক্ষার ফলের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি— বিগত বৎসরের যাম্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় শ্রীমান গোপাল বীজগণিত ও জ্যামিতিতে যথাক্রমে আটচল্লিশ ও বত্রিশ নম্বর মাত্র পায়—এক বৎসরের মধ্যে সেই বালকের এই উন্নতি শুধু যে কেবল অঙ্কশিক্ষকের কৃতিত্বের পরিচায়ক তাহা নহে, বালকের নিজের অধ্যবসায় ও আগ্রহেরও নিদর্শন বটে। আমি এজন্ম তাহাকে একটি স্বাক্ষরিত প্রশংসাপত্র দিব স্থির করিলাম। শ্রীমান লালগোপাল ধর ইতিহাসে এ বৎসর…"ইত্যাদি।

অভিভাবকদের কাছে এই ধরনের রিপোর্ট পাঠ কোন স্কুলেই হয় না—কিন্তু সাহেবের বিশ্বাস, ইহাতে অভিভাবকেরা সন্তুষ্ট থাকে, স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বাড়ে। এই ধরণের রিপোর্ট পাঠ নাকি ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলের একটি বৈশিষ্ট্য। কৃতী বালকদিগকে স্বাক্ষরিত প্রশংসাপত্র দান আর একটি বৈশিষ্ট্য; যদিও ছেলেরা আড়ালে বলাবলি করে, রৌপ্যপদক দিতে অর্থব্যয় আছে, প্রশংসাপত্র দিতে খরচ শুধু কাগজের।

মাস্টারেরা বেলা নয়টার মধ্যে আসিয়া গেল। কাল সারকুলার দেওয়া হইয়াছিল— বিভিন্ন মাস্টারের বিভিন্ন কাজ। কেহ প্রমোশন-প্রাপ্ত ছেলেদের নাম, ক্লাস ও সারি তালিকা করিতেছে, কেহ ভাল ছাত্রদের পরীক্ষার খাতাগুলি আলাদা করিয়া রাখিতেছে, কেহ নতুন

ক্লাসের বইয়ের লিস্টগুলি তৈয়ারি করিতেছে। দুইজনে মিলিয়া একখানা বিজ্ঞাপন লিথো করিতেছে [এই স্কুলে আধুনিকতম শিক্ষাবিজ্ঞান অনুমোদিত পদ্ধতিতে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয়, হেডমাস্টার মিঃ জি. বি. ক্লার্কওয়েল এম. এ. (লিড্‌স্) বি. এড. (লণ্ডন) এল. টি. (কর্ক) এল. সি. এম. এস. (অমুক) স্বয়ং নবম ও দশম শ্রেণীতে ইংরাজী পড়ান এবং শিশু শ্রেণীতে কথ্য ইংরেজী শিক্ষা দেন। আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি—]।

বিজ্ঞাপন ছাপাইবার পয়সা নাই—তাই লিথো করা। অভিভাবকদের হাতে বিলি করা হইবে। হেডমাস্টারের নানা ফাইফরমাশ খাটিতে খাটিতে মাস্টারেরা হিমসিম খাইয়া গেল।

বেলা দশটা বাজিল। এ কয়দিন ছেলেরা তেমন নাই—কারণ, পরীক্ষার পর একরকম ছুটিই ছিল। আজ প্রমোশনের দিন, অন্য অন্য বছর বেলা সাড়ে নয়টার সময় হইতে ছেলেদের ভিড় হয়—এবার জনপ্রাণীর দেখা নাই। বেলা এগারোটা বাজিল, কেহই নাই। সাড়ে এগারোটার সময় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন মাত্র ছাত্র আসিল—তিন শো সাড়ে তিন শো ছেলের মধ্যে। দুইজন মাত্র অভিভাবক দেখা দিলেন প্রায় বারোটার সময়। আর কেহই আসিল না। হেডমাস্টার রীতিমত নিরাশ হইলেন—কত কষ্ট করিয়া লেখা রিপোর্ট কাহার সামনে পাঠ করিবেন? তবুও তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন, নিজের ঘর হইতে গাউন ঝুলাইয়া ও স্লেটের মত দেখিতে হ্যাট মাথায় দিয়া সাজিয়া-গুজিয়া মাস্টারদের লইয়া ক্লাসে ক্লাসে প্রমোশন দিতে গেলেন।

মিঃ আলম বলিলেন, স্যার্, নীচের তলায় কোন ক্লাসে ছেলে নেই—ছোট ছোট ছেলেদের ক্লাস একেবারে ফাঁকা! সেখানে কি যেতে হবে?

সাহেব হাইকোর্টের জজের মত গম্ভীর স্বরে বলিলেন, নিয়ম যা, তার একটুকু ব্যতিক্রম হবার জো নেই আমার স্কুলে। শূন্য ক্লাসের সামনেই প্রমোশনের লিস্ট পড়া হবে।

সুতরাং উপরের ক্লাসের প্রমোশন লিস্ট পড়া শেষ করিয়া হেডমাস্টার দলবল লইয়া নীচেকার শূন্য ক্লাসগুলিতে অবতীর্ণ হইলেন।

হেডমাস্টার ডাকিলেন, রমেন্দ্র বোস প্রোমোটেড্ টু নেক্‌সট্ হাইয়ার ক্লাস, অমুক প্রোমোটেড্ টু নেক্‌সট্ হাইয়ার ক্লাস, ইত্যাদি।

ফাঁকা হাওয়া এ-জানালায় ও-জানালায় হা-হা করিতেছে। কাড়কাঠে টিক্‌টিকি টিক্‌টিক্ করিয়া উঠিল; হাসি পাইলেও কোন মাস্টারের হাসিবার জো নাই। শ্রীশবাবু গেম মাস্টার বিনোদবাবুর পাঁজরায় আঙুলের গুঁতা মারিল। যদুবাবু ক্ষেত্রবাবুকে চিম্‌টি কাটিলেন।

উপরে আসিয়া রিপোর্ট পড়িবার সময় দেখা গেল, সেই দুইজন অভিভাবক আপিসে বসিয়া আছে। তাহারা সাহেবের বার্ষিক প্রোগ্রেস রিপোর্ট শুনিতে আসে নাই, আসিয়াছে তাহাদের ছেলেদের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট লইতে।

সাহেবের ইঙ্গিতে মিঃ আলম তাহাদের আড়ালে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা এ স্কুল থেকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন কেন? ওদের এ বছরের ফল বেশ ভালই। হেডমাস্টারের রিপোর্টটা শুনুন না—

একজন বলিল, রিপোর্ট শুনে কী করব মশাই, আমাদের ফ্যামিলি সব এখান থেকে চলে গিয়েছে কাটোয়ায়, আজ আট-দশ দিন হল। সেখানে এখন সবাই থাকবে। এখানে বাড়ী চাবিবন্ধ, ছেলে থাকবে কার কাছে? সেখানেই ভর্ত্তি ক'রে দেব।

অন্য লোকটি বলিল, আমাদের দেশ মশাই বর্দ্ধমানে। আমাদের দোকান ছিল, উঠিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি। দেশের স্কুলে ভর্ত্তি করব। আপনি সাহেবকে বলুন, ট্রান্সফার আজই দিতে হবে। আমাদের পাড়ায় লোক নেই, থাকব কী ভরসায়?

—রিপোর্টটা শুনুন না।

—না মশাই, মন ভাল না। ওসব শোনবার সময় নেই। আমার ব্যবস্থাটা করে দিন তাড়াতাড়ি।

মিঃ আলম ফিরিয়া আসিলে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, কী হল?

—স্যার্, ওরা শোনে না। ট্রান্সফার না নিয়ে ছাড়বে না মনে হচ্ছে!

—ছেলে এল না কেন আজ?

রামেন্দুবাবু বলিলেন, ছেলে কোথায় যে আসবে স্যার্? সব ভেগেছে।

নমো-নমো করিয়া মীটিং শেষ হইল। রিপোর্ট পাঠ হইল স্কুলের মাস্টারদের সামনে। মীটিং অন্তে হেডমাস্টারের নানারকম সারকুলার বাহির হইল—এ মাস্টারকে এ করিতে হইবে, ও মাস্টারকে ও করিতে হইবে। ছুটির সারকুলার বাহির হইল—দোসরা জানুয়ারী স্কুল খুলিবে। হেডমাস্টারের নিকট মাস্টারেরা বিদায় লইলেন। অতি সাধের লিথো-করা বিজ্ঞাপন কাহাদের মধ্যে বিলি করা হইবে? স্কুলের বোর্ডে খানকতক আঠা দিয়া জুড়িয়া দেওয়া হইল।

চায়ের দোকানে যদুবাবু আর শ্রীশবাবু হাসিয়া বাঁচেন না।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, সাহেবের কী কাণ্ড! কোনো ত্রুটি হবার জো নেই।

যদুবাবু বলিলেন, নাঃ, হেসে আর বাঁচি নে—হাসতে হাসতে পেট ফুলে উঠল। হাসতেও পারি নে সাহেবের সামনে—।

এই সময় জ্যোতির্ব্বিনোদ একটা পুঁটুলি হাতে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আজ শেষ দিনটা, ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করা যাক যদুদা।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, হাতে পোঁটলা কিসের হে?

—আজ বাড়ী যাচ্ছি রাত্রের গাড়ীতে।

—এ কদিনের জন্যে?

—না দাদা, বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে। যাই চলে, যা হয় হবে। এখন কলকাতা আসা বোধ হয় হবে না।

—সাহেব কি ছুটি দে'ব?

—না হয় চাকরি ছেড়ে দেব। দেশে ঘর আছে, ভিক্ষে করে খাব। বামুনের ছেলে, তাতে লজ্জা নেই।

যদুবাবুর বুকের ভিতরটা ছ্যাঁত করিয়া উঠিল। এই জ্যোতির্বিনোদের মত সামান্য দরের লোকে যদি চাকরি ছাড়িয়া দিবার মত মরীয়া হইয়া উঠিতে পারে, তবে বিপদ কত বেশী!

কে একজন বলিল, ক্ষেত্রদার হোমিওপ্যাথিটা যা হোক চলছিল—

—আর হোমিওপ্যাথি ভায়া! পাড়ায় নেই লোক, ডাক্তারি করতাম একটু-আধটু অবসরমত, তাও গেল—পাড়া খালি।

যদুবাবু হঠাৎ হেন শীতকালেও ঘামিয়া উঠিতে লাগিলেন। শ্রীশবাবু, শরৎবাবু, গেম্‌মাস্টার বিনোদবাবু, হেডপণ্ডিত, সবাই আজ উপস্থিত। বড়দিনের ছুটি হইয়া যাইতেছে—তাহার উপর এই গোলমাল। কী হইবে কে জানে? একটু ভাল করিয়া খাওয়া-দাওয়া করিয়া লওয়া যাক। ইঁহাদের ভাল খাওয়ার দৌড়—চার পয়সা হইতে ছয় পয়সা বা আট পয়সা। একখানা টোস্টের জায়গায় দুইখানা টোস্ট। তাহাই সকলে আমোদ করিয়া খাইলেন। ইঁহারা অল্পেই সন্তুষ্ট, অভাবের মধ্যে সারা জীবন এবং যৌবনের প্রথম অংশ অতিবাহিত করিয়া সংযম ও মিতব্যয়ে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

ইঁহাদের মধ্যে জগদীশ জ্যোতির্বিনোদ অমিতব্যয়িতার প্রথম উদাহরণ দেখাইয়া বলিল, ওহে দোকানদার, যদুবাবুকে আরও একখানা কেক্ দাও, শ্রীশবাবুকে একখানা টোস্ট দাও, বিনোদকে—

যদুবাবু একগাল হাসিয়া বলিলেন, আমাদের জ্যোতির্বিনোদের হার্টটা যাই বল বেশ ভাল।

—আর দাদা, হার্ট! এবার কলকাতা থেকে চলে যাচ্ছি। বোধ হয় এই শেষ দেখা—চাকরি আর করব না—

—কেন, কেন?

—বাড়ীর সকলে বলছে, প্রাণ বাঁচলে অনেক চাকরি মিলবে—চলে এস বাড়ী।

যদুবাবু কথাটা এই কিছুক্ষণ আগেই একবার শুনিয়াছেন ইঁহার মুখ হইতে, তবুও আর একবার জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিয়া বিপদের গুরুত্বটা ভাল করিয়া যেন বুঝিতে চাহিলেন।

ক্ষেত্রবাবুকে বলিলেন, তারপর ক্ষেত্র ভায়া, ব্যাপার কী দাঁড়াল বল তো? সত্যি কি কলকাতা ছেড়ে যেতে হবে?

ক্ষেত্রবাবুও ঠিক এই কথাই ভাবিতেছেন। চা খাইতে খাইতে এইমাত্র ভাবিতেছিলেন, আস্‌সিংড়ি যাওয়া ভাল, না, গয়ার দিকে—শ্বশুরবাড়ীতে? যদুবাবুর কথায় যেন একটু বিস্মিত হইলেন। ভয়ানক বিপদ নিশ্চয় সম্মুখে, নতুবা যদুদার মনেও ঠিক একই সময়ে সেই একই কথা উঠিল কেন? বলিলেন, তা যেতে হবে বইকি। সবাই যখন পালাল—

গেম্‌-মাস্টার বলিলেন, আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে রেডিও আছে। টোকিও থেকে নাকি বলেছে, সাতাশে তারিখে কলকাতায় নিশ্চয়ই বোমা ফেলবে—

যদুবাবু সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, অ্যাঁ!

ক্ষেত্রবাবুর নিজের স্নায়ুসমূহের উপর কর্তৃত্ব আরও দৃঢ়তর। তিনি বলিলেন, কোন্ সাতাশে? এই সাতাশে?

—এই সামনের সাতাশে দাদা। আজ হল সতরো।

যদুবাবুর সামনে এইবার দোকানী জ্যোতির্বিনোদের অর্ডারী সেই কেকখানা দিয়া গেল। যদুবাবুর তখন আর কেক খাইবার রুচি নাই অন্য সময়ে হইলে পরের দেওয়া চার পয়সা দামের ভাল কেকখানা কী তৃপ্তির সঙ্গেই একটু একটু করিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া চায়ের সঙ্গে খাইয়া শেষ করিতে অন্তত দশ-পনেরো মিনিট করিতেন—পাছে তাড়াতাড়ি ফুরাইয়া যায়! আজ কিন্তু যদুবাবুর মনে হইল, তিনি মিউনিসিপ্যালিটির জবাইখানার মধ্যে বসিয়া আছেন, চারি ধারে গরুর বদলে মানুষের কাটা হাত, পা, ঘিলু-বার-হওয়া শূন্যগর্ভ নরমুণ্ড, চাপ চাপ রক্ত, থেঁতলানো ধড়, ছটকিয়া পড়া দন্তপাটি—শবের উপরে শব, রক্তমাখা চুলের বোঝা, উগ্র কর্ডাইটের গন্ধ, মৃত্যু, আর্তনাদ!

যদুবাবু নিজের অজ্ঞানিতে শিহরিয়া উঠিলেন।

কোথায় যাইবেন তিনি? যাইবার কোন জায়গা নাই। বেড়াবাড়ী গিয়া উঠিবেন অবনীকে খোশামোদ করিয়া, হাতে পায়ে ধরিয়া? এ বিপদসঙ্কুল স্থানে মরণের ফাঁদের মধ্যে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকার চেয়ে তাও যে ভাল। ভাগ্যে আজ রামেন্দুবাবুকে ধরিয়া-কহিয়া গোটাকতক টাকা সাহেবের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইয়াছেন!

সম্মুখের টেবিলস্থ পাত্রের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ইতিমধ্যে কখন কেকখানা খাইয়া ফেলিয়াছেন অন্যমনস্ক অবস্থায়। টেবিল হইতে উঠিয়া বলিলেন, তোমরা তা হলে বোস, আমি আসি—

জ্যোতির্বিনোদ বলিল, আরে বসুন বসুন যদুবাবু, আর এক পেয়ালা চা দেবে? আর একখানা কেক?

—আরে, না হে না। আমার সময় নেই সত্যি। একটা জরুরী কাজ আছে, আমি চলি—

অপরের চা ও খাবার যদুবাবু বোধ হয় জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম প্রত্যাখ্যান করিলেন।

বেলা সাড়ে পাঁচটা। শীতের বেলা, সন্ধ্যার বেশী দেরি নাই। ব্ল্যাকআউটের কলিকাতায় বেশী ঘোরাঘুরি চলিবে না, তবুও যদুবাবু শ্যামবাজারে তাঁহার এক জানা-শোনা লোকের আড়তে গিয়া কিছু টাকা ধারের চেষ্টা একবার দেখিলেন। যদি কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে হয়, বেশ কিছু রেস্ত থাকা দরকার হাতে।

টালার পুলের পাশ দিয়া গলিটা নামিয়া গেল। যদুবাবু দুরু দুরু বক্ষে আড়তের নিকটবর্ত্তী হইলেন, কী জানি কী ঘটে! কত টাকা চাহিবেন? দশ, না, ত্রিশ? পাওয়া যাইবে কি এ বাজারে? বিশেষত এ স্থলে আলাপ-পরিচয় তেমন ঘনিষ্ঠ নয়। লোকটি তাঁহার শালার সহপাঠী, শালার সঙ্গে কয়েকবার ইতিপূর্ব্বে এখানে আসিয়াছেন—একসময়ে

যাতায়াত ছিল, এখন কমিয়া গিয়াছে?

আড়তের টিনের চালা নজরে পড়িতেই যদুবাবুর বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল, জিভ শুকাইয়া আসিল।

পথের ধারে খালের জলে একটা হাঁড়ি-বোঝাই ভড় হইতে লোকজন হাঁড়ি নামাইতেছিল। যদুবাবু লক্ষ্য করিলেন, অনেকগুলি মাটির তোলোহাঁড়ি ডাঙায় সাজাইয়া এক পাশে রাখিয়া দিয়াছে। এক পাশে স্তূপাকার কলিকা। লুঙ্গি-পরা এক মাঝি আরও কলিকা নামাইতেছে।

যদুবাবু ভাবিলেন, এ হাঁড়িতে আর কি কেউ ভাত রেঁধে খাবে? কলকাতা শহর তো ফাঁকা—এত কল্কেতেই বা তামাক খাবে কে?

তখন একেবারে আড়তের সামনে তিনি পৌঁছিয়া গিয়াছেন।

সামনেই একজন ভদ্রলোক বসিয়া আছেন, বছর পঞ্চাশেক বয়স, মাথায় টাক, রঙ খুব গৌরবর্ণ, গায়ে হাত-কাটা বেনিয়ান। লোকটি গুড়গুড়িতে তামাক খাইতেছিলেন।

যদুবাবু পৈঠা দিয়া উঠিতে উঠিতে হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, এই যে সীতানাথবাবু, ভাল আছেন?

—এই যে যদুবাবু আসুন—বসুন। তারপর কোথা থেকে? রমানাথ কোথায়?

রমানাথ যদুবাবুর শ্যালক, আজ বছর কয়েক যদুবাবু তাহার কোন খবর জানেন না; সেও ভগ্নীপতির খবরাখবর রাখে না। কিন্তু সে কথা এ স্থলে বলা ঠিক হইবে না। যাহার সুবাদে আড়তের মালিকের সঙ্গে পরিচয়, সে-ই যদি খোঁজখবর না রাখে, তবে ইহার নিকটও যদুবাবুকে কিঞ্চিৎ খেলো হইতে হয় বইকি। সুতরাং তিনি বলিলেন, রামু সেইখানেই আছে। মধ্যে আসবে লিখেছিল, ছুটি পাচ্ছে না—

—সেই জব্বলপুরেই আছে? আছে ভাল?

—হ্যাঁ, তা ভাল আছে।

—আপনাদের স্কুল ছুটি হয়ে যায় নি? আপনি এখনও স্কুলে আছেন তো?

—আছি বইকি। নয়তো কী আর করব বলুন? আপনাদের মতন তো ব্যবসা-বাণিজ্য শিখি নি।

আড়তের মালিক হাসিয়া বলিলেন, আপনাদের তো ভাল, বিছানা বাক্স বাঁধলেন, কলকাতা থেকে পালালেন, আমাদের কী হয় বলুন তো? গুদোমভরা মাল নিয়ে এখন যাই কোথায়? বোমা পড়ে, এখানেই যা হয় হোক। বসুন, চা খাবেন? ওরে দু পেয়ালা চা করতে বল ঠাকুরকে।

চা খাইয়া এ-কথা ও-কথার পরে যদুবাবু আসল কথাটি উত্থাপন করিবার পূর্ব্বে যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করিয়া লইলেন। তাহার পর শুষ্কমুখে বার দুই-তিন ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন, আপনার কাছে এলেছিলাম সীতানাথবাবু, হাতে বিশেষ কিছু নেই, একেবারেই খালি। কলকাতার বাইরে যেতে হলে কিছু হাতে রাখা দরকার। গোটা কুড়ি টাকা যদি আমাকে ধার দেন এসময় তবে বড়ই উপকার করা হয়, আমি অবিশ্যি যত সত্বর হয়, আপনার ধার

শোধ করব, জানুয়ারী মাসের মাইনে থেকে—

চাহিবার ভাষা অবশ্য ইহাই। আড়তদার সীতানাথবাবু স্কুল-মাস্টার নহেন, লোক চরাইয়া খান। টাকা ধার লইলে কেহ স্বেচ্ছায় শোধ দিয়া যায় বাড়ী বহিয়া, ইহা বিশ্বাস করেন না। যদুবাবুর সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠতাও তাঁহার নাই, এ অবস্থায় যদুবাবু একেবারে কুড়ি টাকা ধার চাওয়াতে কিঞ্চিৎ বিস্মিতও হইয়াছিলেন। বেশ অমায়িকভাবে হাসিয়া, কথার সঙ্গে কিছুমাত্র ডালপালা না জুড়িয়া যথেষ্ট ভদ্রতা ও বিনয়ের সহিত বলিলেন, টাকা হবে না। এ সময় নয়—

যদুবাবু আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। সীতানাথবাবুর গলার সুরে হৃদ্যতা বা আত্মীয়তার লেশমাত্র নাই। চাঁচাছোলা কেতাদুরস্ত ভাবের ভদ্রতার সুর। শুনিলে ভয় হয়, দ্বিতীয় বার আর যাচ্ঞা করা চলে না। তবুও প্রাণের দায় বড় দায়—কাল সকালে তিনি কলিকাতা হইতে নিক্রান্ত হইবেনই, যে দিকে দুই চোখ যায়, এখানে লজ্জা করিলে চলিবে না। সুতরাং আবার বলিলেন, তা দেখুন সীতানাথবাবু, একটু দেখুন। হয়ে যাবে এখন। আমার বড্ড দরকার। কলকাতা থেকে চলে যাবার উপায় নেই, আমাকে একটু সাহায্য করুন—

—হবে না। পারব না। মাপ করুন—

সীতানাথবাবু হাতজোড় করিলেন এমন ভঙ্গিতে, যেন তিনি বিশেষ কোন অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছেন যদুবাবুর কাছে।

তবুও যদুবাবু আবার বলিলেন, তবে না হয় আমায় পনেরোটা কি দশটা টাকা দিন—যা পারেন—আমি যে বড় টানাটানিতে পড়েছি কিনা—জানুয়ারী মাসের মাইনে পেলেই—

সীতানাথবাবু কী ভাবিয়া বলিলেন, পাঁচটা নিয়ে যান, এসেছেন যখন। ও গোপাল, ক্যাশ থেকে পাঁচটা টাকা দাও তো!

ওদিকে একজন বৃদ্ধলোক বসিয়া খাতাপত্র লিখিতেছিল, সে বলিল, খাতায় কী লিখব বাবু।

—আমার নিজ নামে হাওলাতে লিখে রাখ। এই নিন্—আসুন।

যদুবাবু নমস্কার করিয়া সীতানাথবাবুর আড়ত হইতে নিক্রান্ত হইলেন। শ্যামবাজারের মোড় পর্য্যন্ত আর আসিতে পারেন না, রাস্তা পার হইতে পারেন না, ঘুটঘুটে অন্ধকার। ওখানা কী আসে—রিকশা, না, মোটর?

আলো চলিয়া আসিতেছে—অন্ধকারের মধ্যে কত জোরে আসিতেছে বোঝা যায় না, ঘাড়ে পড়িবে নাকি?

বাড়ী আসিলেন তখন দশটা-রাত্রি।

যদুবাবুর স্ত্রী বলিল, এলে? আমি ভেবে মরি, এত রাত পর্যন্ত এই অন্ধকারে—

—শোন, বিছানা-বাক্স গুছিয়ে নাও—কাল সকালের ট্রেনেই বেরুতে হবে আর নয় এখানে—

যদুবাবুর স্ত্রী অবাক হইয়া যদুবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, সে কী গো! যাবে কোথায় একটা ঠিক কর আগে।

—অত ঠিক করার সময় নেই। চল, বেড়াবাড়ী যাই।

যদুবাবুর স্ত্রী শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, ওগো, তুমি মাপ কর। সেখানে আমি যাব না।

যদুবাবু মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন, তবে মর গে যাও—যাবে কোথায়। দাঁড়াবার জায়গা আছে কোথায় জিগ্যেস করি? এখানে মর বোমা খেয়ে।

—তা সেও ভাল। অবনী ঠাকুরপোর বউ আর মায়ের খিটিং খিটিং দাঁতের বাদ্যি আমার সহ্য হবে না। তার চেয়ে মরি বোমা খেয়েই মরি।

—তবে মর, যা হয় কর। আমি কিচ্ছু জানি নে—

—তুমি যাও না নিজে। রেখে যাও আমায় এখানে—

আহারাদি করিয়া যদুবাবু মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন। বেড়াবাড়ী যদি না যাওয়া যায়, তবে কোথায় গিয়া উঠিবেন? দিদির বাড়ী? হুগলী জেলার যে পল্লীগ্রামে তাঁহার দিদির বাড়ী, ভগ্নীপতির মৃত্যুর পরে বহুদিন কেন, বহুকাল সেখানে যাওয়া হয় নাই। বাড়ীঘরের কী আছে না আছে, তিনি জানেনও না। সেইখানেই অগত্যা যাইতে হয়। মোটের উপর যেখানে হয়, কাল সকালেই পলাইতে হয়। ভাবিবার সময় নাই।

একবার কী একটা শব্দ হইল, যদুবাবু চমকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। এরোপ্লেনের শব্দ, সাইরেন বাজিল নাকি?

পোঁ—ও—ও—ও—

ক্রমশ শব্দটা মাথার উপরে আসিতেছে। যদুবাবুর প্লীহা চমকাইয়া গেল। জাপানী প্লেন যে নয়, তাহা কে বলিল? যদুবাবুর স্ত্রী বলিল, এই দেখ একখানা উড়ো জাহাজ আলো জালিয়ে মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে।

যদুবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন চুপ, চুপ, হ্যারিকেনটা ঘরের মধ্যে নিয়ে যাও—ঘরের মধ্যে নিয়ে যাও—বোমা! বোমা! জাপানী বোমা!

আবার সেই রক্তাক্ত জবাইখানার দৃশ্য তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিল—রক্ত, চুল, অস্থি, মাংস। স্ত্রীকে বলিলেন, বেঁধে নাও, বিছানা-টিছানা বেঁধে ফেল—কটা বেজেছে দেখ তো, ওখানেই যাব ঠিক করলাম। মজলাদের দেশে।

আজ রাতটা কি কোন রকমে কাটিবে না?

সকাল হইতে না হইতে যদুবাবু ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডায় গাড়ী ভাড়া করিতে গেলেন। হাওড়া স্টেশনে যাইতে কেহ হাঁকিল তিন টাকা, কেহ হাঁকিল সাড়ে তিন টাকা। একজন বলিল, হাওড়া পুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে বাবু, কোন গাড়ী যেতে দিচ্ছে না—

যদুবাবু চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, কে বললে?

—হামরা সব জানি বাবু।

দুইখানা রিক্শা ঠুন্ ঠুন্ করিয়া যাইতেছিল। তাহাদের থামাইয়া, বারো আনায় রিক্শা ঠিক করিয়া তাহাদের বাসার সামনে আনিলেন। তখনও ভাল করিয়া ভোর হয় নাই। যদি হাওড়ার পুল বন্ধ থাকে, বালি ব্রিজ হইয়া রিক্শা ঘুরাইয়া লইবেন—যত টাকা লাগে।

কলিকাতা হইতে বাহির হইতেই হইবে। এ মৃত্যুর ফাঁদ হইতে বাহির হইতে পারিবেন না কি কোন রকমে? জাপানী বোমা!!

জিনিসপত্র রিক্‌শায় বোঝাই দিয়া মলঙ্গা লেন হইতে সেণ্ট্রাল য়্যাভেনিউতে পড়িয়া বউবাজার দিয়া হাওড়ার পুলের দিকে চলিলেন। একটু একটু ফরসা হইয়াছে। পুল নির্বিঘ্নে পার হইয়া গেল, অত ভোরেও দলে দলে ছ্যাকরা গাড়ী, মোটর, রিক্‌শা, ঠ্যালা-গাড়ী, মোট-মাথায় মুটে, পথচারীর দল চলিয়াছে পুল বাহিয়া। যদুবাবু নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, তবে কি পুল পার হইতে পারিয়াছেন সত্যই? বোধ হয় এ-যাত্রা তবে রক্ষা পাইয়া গেলেন।

স্টেশনে লোকে লোকারণ্য অত সকালেও। বউ-ঝি, ছেলে-মেয়ে, লটবহর, মুটে, বিছানা, ধামা, ট্রাঙ্ক, গুড়ের ভাঁড়, তেলের টিন, ছাতালাঠির বাণ্ডিল, চ্যা-ভ্যাঁ, হৈ-চৈ। টিকিট কাটিতে গিয়া দেখিলেন, টিকিটের জানালা খোলে নাই। অথচ সেখানে সার বাঁধিয়া লোক দাঁড়াইয়া। গেটে ঢুকিবার উপায় নাই, পিষিয়া তালগোল পাকাইয়া কোন রকমে প্ল্যাটফর্মে ঢুকিলেন। গাড়ির দরজায় চাবি—লোকজন জানালা দিয়া লাফাইয়া ডিঙাইয়া কামরার মধ্যে ঢুকিতেছে। যদুবাবু এক ভদ্রলোককে বলিলেন, মশায় একটু দয়া করে যদি সাহায্য করেন মেয়েদের।

যদুবাবুর স্ত্রী বসিবার জায়গা পাইলেন, কিন্তু তিনি নিজে অতি কষ্টে দাঁড়াইবার স্থানটুকু পাইলেন। এই সময় যদুবাবুর স্ত্রী বলিলেন, ওগো, সেই ছোট বালতিটা? সেটা সেই টিকিট ঘরের সামনে—সেখানেই পড়ে আছে—

সর্ব্বনাশ! যদুবাবু অমনি ছুটিলেন। আছে, ঠিক আছে। বালতিটা কেহই লয় নাই। ভিড়ের মধ্যে জিনিসপত্র চুরি যায় না। কাছে কাছে সর্ব্বদাই লোক। সকলেই ভাবে, তাহার মধ্যে কাহারও জিনিস।

গেটে পুনরায় ঢুকিবার সময় বেজায় ভিড়। সারি সারি মুটে মোটঘাট মাথায় দাঁড়াইয়া, পিছনে বউ ঝি, ছেলে মেয়ে, পুরুষ। গেট আবার বন্ধ করিয়া দিয়াছে। একটু পরে কেন যে হঠাৎ গেট খুলিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। নরনারীর দল ধীর মন্থর গতিতে গেটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। একটি অল্পবয়সী বধূ দুই হাতে দুইটি ভারী পোঁটলা ঝুলাইয়া ভিড়ে পিষিয়া যাইতেছে। যদুবাবুর মনে সেবা-প্রবৃত্তি জাগিল। আহা, কতটুকু মেয়ে, এই ভিড় সহ্য করা কি ওদের কাজ? যদুবাবু গিয়া বলিলেন, মা, আপনার পুঁটুলিটা দিন আমার হাতে—

বউটিকে সামনে দিয়া হাত দিয়া প্রায় বেড়িয়া ভিড়ের সংস্পর্শ হইতে বাঁচাইয়া, তাহাকে গেট পার করিয়া দিলেন। বউটির সঙ্গে উনিশ-কুড়ি বছরের ছোকরা, তাহার দুই হাতে দুইটি ভারী ট্রাঙ্ক। সে যদুবাবুকে বলিল, স্যার, আপনি কোন্ গাড়ীতে যাবেন? শেওড়াফুলি? তা চলুন এক গাড়ীতেই—

যদুবাবু বধূটিকে অনেক কষ্টে স্ত্রীর পাশে একটু জায়গা করিয়া বসাইয়া দিলেন।

ট্রেন ছাড়িল।

পুনর্জ্জন্ম।

যদুবাবু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। জাপানী বোমার পাল্লা হুগলী জেলা পর্য্যন্ত পৌঁছিবে না।

ক্ষেত্রবাবু শেষ পর্য্যন্ত আস্‌সিংড়ি গ্রামে যাওয়াই স্থির করিলেন। প্রায় আজ দশ বছর পরে যাওয়া। বহু কষ্টে ভিড়, অসুবিধা, অতিরিক্ত খরচ, ধাক্কাধুক্কি সহ্য করিয়া গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন সন্ধ্যার কিছু আগে। গিয়া দেখিলেন, পৈতৃক বাড়ীর পশ্চিম দিকের কুঠুরিতে গ্রামের এক গরীব গৃহস্থ আশ্রয় লইয়াছে. তাহারা জাতিতে কৈবর্ত্ত। তাহারা মনের আনন্দে গাছের ডাব ইঁচড় ইত্যাদি খাইতেছে, বাঁশঝাড়ের বাঁশ কাটাইতেছে, উঠানে প্রকাণ্ড তরিতরকারির ক্ষেত করিয়াছে। কোন কালে কেহ আসিয়া এ-সব কাজের কৈফিয়ত চাহিবে, তাহারা কোনদিনও ভাবে নাই। হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা বাড়ীর মালিকদের আকস্মিক আবির্ভাবে তাহারা সন্ত্রস্ত তটস্থ হইয়া পড়িল।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, কে হে! ও, পাঁচু না? তোমরাই আছ?

পাঁচু হাত কচলাইয়া বলিল, আজ্ঞে আমরাই। বাড়ীঘর সেবার পড়ে গেল ঝড়ে, তা বলি বাবুর বাড়ী পড়ে রয়েছে, তাই আমরা—

—আছ, ভালই। বাপের ভিটেতে সন্ধ্যে পড়ছে। তা ওদিকে অত জঙ্গল করে রেখেছ কেন? নিজেরাই থাক, একটু ভাল করে রাখলে পার। ওদিকের ঘরগুলো ভাল আছে?

—না বাবু। ওই একখানা ঘর ভাল ছিল, আমরাই থাকি। ওদিকের ঘরের ছাদ দিয়ে জল পড়ে।

—যাই হোক, এখন রাত্তিরটা থাকার ব্যবস্থা কী করা যায়?

—ওদিকের ঘর দুটো পরিষ্কার করে দিই বাবুকে। এখন আসুন।

সেই ভাঙা ঘরের স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে জিনিসপত্র স্ত্রীপুত্র লইয়া ক্ষেত্রবাবু সেই সন্ধ্যা হইতে অধিষ্ঠিত হইলেন। অনিলার আদৌ ইচ্ছা ছিল না এখানে আসিবার। শুধু টাকা পয়সার অভাবে গ্রামে আসিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে!

অনিলা বলে, সাপখোপ কামড়াবে নাকি! মেঝের ওপর শোয়া—তোমার এখানে তক্তাপোশ নেই?

—ছিল—সবই। আজ দশ বছর আসি নি, লোকে চুরিই করুক বা উইয়েই খাক—

পাঁচ-ছয় দিন কাটিয়া গেল।

গ্রামে আসিয়া নূতন জীবন শুরু হইয়াছে ক্ষেত্রবাবুর। সকালে উঠিয়া জেলেপাড়া হইতে মাছ সংগ্রহ করিয়া আনেন, বন-বাগান হইতে এঁচড় ডুমুর পাড়িয়া আনেন, কয়লা পাওয়া যায় না—সুতরাং কাঠ কুড়াইয়া আনেন। সকালে সাড়ে নয়টায় খাওয়ার পরিবর্ত্তে বেলা বারোটায় খান।

অনিলা বলে, প্রাণ গেল বাপু, একটু কথা বলি কার সঙ্গে, এমন লোক খুঁজে মেলা দুর্ঘট।

—কেন, কাকাদের বাড়ী যাও, দত্তদের বাড়ী যাও—

—কী যাব ? কেউ কথা বলতে পারে না। শুধু গেঁয়ো কথা—কী রাঁধলে ভাই ? কতক্ষণ রান্নার কথা বলা যায় বল তো ? এর চেয়ে ভিহিরি গেলে খুব ভাল হত। শুনলে না আমার কথা।

গ্রামের একটা বাড়ীতে কলিকাতা হইতে এক ঘর গৃহস্থ আসিল। ক্ষেত্রবাবুর মত তাহারাও এই গ্রামের বাসিন্দা, কলিকাতায় বাড়ী আছে, বড়বাজারে মসলার ব্যবসা করিয়া বেশ সঙ্গতিপন্ন অবস্থা। তাহারা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে আরও দুই ঘর বোমা-ভীত পরিবার। শেষোক্ত দলের একটি পরিবারের থাকিবার স্থান নাই, পূর্ব্বোক্ত গৃহস্থের প্রাচীন ঠাকুরদালানে দরমার বেড়া দিয়া আবরু সৃষ্টি করিয়া এক ঘর সেখানে রহিল। অপর পরিবারের জন্য গ্রামে ঘর খুঁজিয়া মিলিল না। সকলেই গরীব, কোটাবাড়ী বেশী নাই—যাহা দুই-একখানা আছে, তাহাতে মালিকদের নিজেদেরই কুলায় না।

ক্ষেত্রবাবুর কাছে লোক আসিয়া বলিল, আপনার একখানা ঘর ভাড়া দেবেন ?

ক্ষেত্রবাবু অবাক হইলেন। গ্রামের ভাঙা কুঠুরি কেহ ভাড়া লইবে, একথা কে কবে শুনিয়াছে ? ভরসা করিয়া বলিলেন, তা দিতে পারি।

—কী নেবেন ?

ক্ষেত্রবাবু ভাবিয়া বলিলেন, তিন টাকা।

লোকটি এই গ্রামেরই লোক। বলিল, তিন টাকা কেন ? পনেরো টাকা হাঁকুন না। তাই দেবে।

ক্ষেত্রবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, পনেরো টাকা বাড়ীভাড়া কে দেবে ? এই ভাঙা বাড়ীর একখানা ঘরের ভাড়া তিন টাকা, তা-ই বেশী। পাগল !

—আপনি জানেন না। ওরা টাকার আণ্ডিল, দায়ে না পড়লে কি করতে এসেছে এই পাড়াগাঁয়ে ? ঠিক দেবে। নইলে বাড়ী পাচ্ছে কোথায় ?

ক্ষেত্রবাবু হাজার হোক স্কুল-মাস্টার, অত ব্যবসাবুদ্ধি মাথায় খেলিলে আজ সতেরো আঠারো বছর ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলে পঁয়ত্রিশ টাকা বেতনে মাস্টারি করিবেন কেন ? তিনি স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিতে গেলেন। অনিলা বলিল, সে কী গো, ওই ঘর আবার ভাড়া ! ওর আছে কী যে, ভাড়া দেবে ? তারা বিপদে পড়ে এসেছে, ওই ভাঙা দুটো ঘরে থাকতে চাইছে, এতেই বোঝ। এমনি থাকতে দাও, কথা বলবার মানুষ পাওয়া যাচ্ছে এক ঘর, এই না কত !

ক্ষেত্রবাবু ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, তিনটে টাকা দিতে চাচ্ছে—আর বাড়াচ্ছি নে অবিশ্যি। দিক তিনটে টাকা। নিই।

—নাও গে যাও, কিন্তু আর এক পয়সা বেশী বোল না।

পরদিন ক্ষেত্রবাবুর ভাঙা ঘরে ভাড়াটেরা আসিয়া গেল—একটি বধূ, তিন ছেলে মেয়ে, প্রৌঢ়া ননদ। শোনা গেল, বধূটির স্বামী কাজ করে ইছাপুরে বন্দুকের কারখানায়। ছুটি পাইলেই একবার আসিয়া দেখিয়া যাইবে। অনিলা বধূটির সঙ্গে খুব ভাব করিয়া ফেলিল, তার নাম কুমুদকুমারী, বাপের বাড়ী বাগবাজার—বৃন্দাবন মল্লিকের গলি। কলিকাতা

ছাড়িয়া বাহিরে আসা এই প্রথম, বিশেষ করিয়া আসসিংড়ির মত অজ পল্লীগ্রামে। প্রত্যেক কাজেই অসুবিধা, না আছে দেওয়াল টিপিলেই আলো, কল টিপিলেই জল, না আছে ভাল রাস্তাঘাট, না আছে একটা টকি-বায়স্কোপ।

তবুও দিন যায় কায়ক্লেশে। মেয়েছেলে, কেহ নিজের বাপের বাড়ী শ্বশুরবাড়ীকে অপর মেয়ের কাছে ছোট হইতে দিতে চায় না। কুসুম বাগবাজারের গল্প করে তো অনিলা ডিহিরি-অন-সোনের গল্পে তাহাকে ছাড়াইয়া যাইতে চায়।

শীত কাটিয়া বসন্ত পড়িল। ক্ষেত্রবাবুর মনে পড়িল, আমের বউলের গন্ধ কতদিন এমন পান নাই, বাঁশবন, মাঠে ঘেঁটুফুল ফোটার দৃশ্য কতকাল দেখেন নাই। বহুদিন পূর্ব্বের বিস্মৃত শৈশকালের স্মৃতি অতীত মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া শৈশবের মাতাপিতার কত হাসি ও কথার টুকরা ভুলিয়া-যাওয়া স্নেহস্বর লইয়া মনের মধ্যে উঁকি মারে।

•

হাতের পয়সা ফুরাইয়া গেল। অনিলা পিতৃগৃহ হইতে আসিবার সময় লুকাইয়া সামান্য কিছু অর্থ আনিয়াছিল, তাই দিয়াই এতদিন চলিল, নতুবা ক্ষেত্রবাবু স্কুল হইতে বিশেষ কিছু আনেন নাই। ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুল আর খোলে নাই, আঠারোই ডিসেম্বরের পরে কলিকাতার কোন স্কুলই খুলে নাই—ক্ষেত্রবাবু স্কুল হইতে পত্র পাইয়া জানিয়াছেন, খবরের কাগজেও দেখিয়াছেন।

স্কুল কি উঠিয়া গেল! হেডমাস্টারের নামে দুই-তিনখানা পত্র দিয়াও উত্তর না পাওয়াতে বৈশাখ মাসের প্রথমে ক্ষেত্রবাবু নিজেই কলিকাতা গেলেন। সে কলিকাতা আর নাই, রাস্তা দিয়া কত কম লোকজন চলিতেছে, তেল বন্ধ হওয়ার দরুন মোটর গাড়ীর সংখ্যা বহু কমিয়া গিয়াছে, রাত আটটার পর ঘুটঘুটে অন্ধকার।

পিটার লেনের মোড়ে ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুল-বাড়ীটার আর সে শ্রীছাঁদ নাই। গেট ভিতর হইতে ভেজানো ছিল। ঢুকিয়া ক্ষেত্রবাবু ডাকিলেন, ও মথুরা—মথুরা!

নীচের তলার ঘর হইতে কেবলরাম বাহির হইয়া আসিল। ক্ষেত্রবাবুকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি দুই হাত জোড় করিয়া মাথা নীচু করিয়া বলিল, কেমন আছেন বাবু?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, ও কেবলরাম, সাহেব কোথায়?

কেবলরাম হতাশার স্বরে দুই হাত তুলিয়া বলিল, তিনি কলকাতায় নেই। নাগপুরে গেছেন। আমার মাইনে চুকিয়ে দিয়ে গেলেন যাবার সময়।

—স্কুল!

—উঠে গিয়েছে বাবু।

—তবে তোকে মাইনে দিচ্ছে কে এখানে?

—হেডমাস্টার বললেন, তুই এখানে থাক্। চিঠিপত্র এলে তাঁর নামে পাঠাতে বলে দিয়েছেন। যদি এর পরে স্কুল চলে—কিন্তু তা চলবে না বাবু, বাড়ীওলার পাঁচ মাসের ভাড়া বাকী, শুনছি নাকি নোটিশ দিয়েছে।

—ছেলেপিলে কেউ আসে না ?

—কে আসবে বাবু, কে আছে কলকাতায় ? ওই পাশের গলির কেষ্ট আসে, আর আসে শিবরাম—ওই কুণ্ডু লেনের বাবুদের বাড়ীর সেই ছেলেটা। ওরা এসে খোঁজ নেয়, কবে স্কুল খুলবে। আমি বলি—যাও ছেলেরা, স্কুল যদি খোলে, খবর পাবে।

—মাস্টারেরা ?

—কেবল হেডপণ্ডিত এসেছিলেন সাহেবের ঠিকানা নিতে। আর শ্রীশবাবু এসেছিলেন টাকার কী হল জানতে। আর কেউ আসে না! শ্রীশবাবু ঢাকায় চাকরি পেয়েছেন, জ্যোতির্বিনোদ মশাই দেশেরই স্কুলে চাকরি নিয়েছেন।

—নাগপুরে সাহেব কী করছেন জান ? তাঁর ঠিকানা কী ?

—তিনি কী করছেন তা জানি নে। ঠিকানা নিয়ে যান, আমার কাছে সে দিনও চিঠি দিয়েছেন।

ক্ষেত্রবাবু ঠিকানা লইয়া বিষণ্ণ মনে স্কুল হইতে বাহির হইলেন। আজ সতেরো বৎসরের কত সুখ-দুঃখের লীলাভূমি, কত ছেলে এই দীর্ঘ সতেরো বছরে আসিয়াছে গিয়াছে, কত অস্পষ্ট কাঁচা উৎসুক মুখ মনে পড়ে এখানকার মাটিতে আসিয়া দাঁড়াইলে। মুখই মনে পড়ে, মুখের অধিকারীর নাম মনে পড়ে না। ক্লার্কওয়েল সাহেব, যদুবাবু, জ্যোতির্বিনোদ, মিঃ আলম—আজ সকলের সঙ্গেই আর একবার দেখা করিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু কে কোথায় আজ ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে!

পুরানো চায়ের দোকানটিতে ঢুকিয়া ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, ওহে, চা দাও এক পেয়ালা।

দোকানী দেখিয়া ছুটিয়া আসিল : মাস্টারবাবু যে! আসুন, আসুন। ভাল সব ?

—ভাল। তোমাদের সব ভাল ?

—আর কী করে ভাল হবে বাবু! আপনারা সব চলে গেলেন, তিন-তিনটে স্কুল কাছে, সব বন্ধ। বিক্রি-সিক্রি নেই, দোকান চলে কী করে বলুন ?

ক্ষেত্রবাবু বসিয়া বসিয়া আপন মনে চা খাইতে লাগিলেন। কোথায় গেল সে পুরানো দিন। ওইখানটাতে বসিত জ্যোতির্বিনোদ, এখানটাতে রামেন্দুবাবু, ক্ষেত্রবাবুর পাশে সব সময়েই বসিত যদুদা, আর ওই হাতলহীন চেয়ারটা ছিল নারাণদার (আহা বেচারী! ভালই হইয়াছে স্বর্গে গিয়াছে, স্কুলের এ দুর্দশায় বেচারীর প্রাণে বড়ই কষ্ট হইত।) বাঁধা-ধরা আসন। এখানে বসিয়া দুঃখের মধ্যেও কত আনন্দ, কত মজলিস করা গিয়াছে। গত দশ-বারো চৌদ্দ বছর! আজ কেউ নাই কোন দিকে। সর্ব ছত্রভঙ্গ।

স্কুল আর বসিবে না। কলিকাতার সব স্কুল যদিও দুই পাঁচ মাস পরে খোলে, তাঁহাদের স্কুল আর বসিবে না। বসিতে পারে না—আর্থিক অবস্থা খারাপ। বাড়ীওয়ালা আর মাসখানেক দেখিয়া 'টু লেট' ঝুলাইয়া দিবে। মাস্টারেরা পেটের ধান্ধায় যে যেখানে পারিয়াছে, চাকুরিতে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, নয়তো তাঁর মত সুদূর পল্লীগ্রামে আত্মগোপন করিয়াছে।

ক্লার্কওয়েল সাহেবের মত একনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতীর আজ কী দুরবস্থা, তাহার খবর কে রাখে ?

—ক পয়সা ?

—মাস্টারবাবু, আপনাদের খেয়েই মানুষ। এতদিন পরে পায়ের ধুলো দিলেন—এক পেয়ালা চা খেয়েছেন, ওর আর কী দাম নেব ? না মাস্টারবাবু, মাপ করবেন।

—আচ্ছা, আমাদের স্কুলের আর কোন মাস্টার যদি এখানে চা খেতে আসে, তবে আমার কথা বোল তাকে, কেমন তো ? মনে থাকবে ? আমার নাম ক্ষেত্রবাবু। বোল—আমি তাদের কথা ভুলি নি, কেমন তো ?

চায়ের দোকান হইতে বাহির হইয়া দুই-একটি টুইশানির ছাত্রদের বাড়ী গেলেন। বাড়ী তালাবন্ধ। মেয়েছেলে নাই, ভাবে মনে হইল। পুরুষেরা যদি বা থাকে, কর্মস্থল হইতে সকাল সকাল ফিরিবার তাগিদ নাই। ক্ষেত্রবাবু অন্যমনস্কভাবে পথ চলিতে লাগিলেন। ধর্মতলার কাছাকাছি আসিলে একটি তরুণ যুবক আসিয়া খপ করিয়া তাঁহার পায়ের উপর পড়িয়া ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া হাসিমুখে বলিল, স্যার, ভাল আছেন ? চিনতে পারেন ?

—হ্যাঁ, রাজেন দেখছি যে ! তা আর চিনতে পারব না। তুই কাদের সঙ্গে সঙ্গে যেন পাস করিস, কোন বছর ?

—বছর পাঁচ হয়ে গেল স্যার্। মনে রেখেছেন, এই যথেষ্ট ! আমি শিবুদের ব্যাচে পাস করি। শিবুকে মনে আছে ? শিবনাথ ভট্চাজ্জি—ক্ষীরোদ ডাক্তারের ছেলে।

ক্ষেত্রবাবু ভাল মনে করিতে পারিলেন না ; কিন্তু বলিলেন, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কী করচিস্ ?

—এ. আর. পি.তে ঢুকেছি স্যার্। বেকার বসেছিলাম, আজ অনেক দিন। এবার—

—বেশ, বেশ। আচ্ছা, চলি।

সন্ধ্যার দেরি নাই। আবার সেই ব্ল্যাক-আউটের কলিকাতা। আর কলিকাতায় থাকিয়া লাভ নাই। রাত সাড়ে আটটায় গাড়ী আছে শিয়ালদহে। ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু সস্তার বিস্কুট ও লেবেঞ্চুস কিনিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ক্ষেত্রবাবু স্টেশনে আসিয়া জমিলেন।

যদুবাবু আজ মাস দুই শয্যাগত।

হাওড়া জেলার যে পল্লীগ্রামে তিনি গিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া দেখিলেন, ভগ্নীপতির ঘরবাড়ীর অবস্থা যা, তাহাতে সেখানে মানুষের বাস করা চলে না। তবুও থাকিতে হইল, কী করিবেন—অভাব। কিন্তু মাসখানেক পরে যদুবাবুর ম্যালেরিয়া ধরিল। অর্থের অভাব, তদুপরি থাকিবার কষ্ট—এ গ্রামে আত্মীয়বন্ধু কেহ নাই, হাতেও নাই পয়সা।

গ্রামের নাম কমলাপুর, তারকেশ্বর লাইন হইয়া যাইতে হয়—শেওড়াফুলি হইতে পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূরে। গ্রামের ভদ্রলোকেরা সকলেই ডেলি-প্যাসেঞ্জার, সকালে কেহ আটটা চল্লিশ, কেহ নয়টা দশের ট্রেন ধরিয়া কলিকাতায় ছোটে, আবার বাড়নে বাজারহাট বাঁধিয়া বাড়ী ফেরে। যেটুকু গল্পগুজব করে—হয় আপিস, নয়তো ফুটবল, আজকাল অবশ্য যুদ্ধের গল্প।

পাশেই অবিনাশ বাঁড়ুজ্জের বাড়ী। কলিকাতা হইতে রাত নয়টার সময় প্রৌঢ় ভদ্রলোক বাড়ী ফিরিলে যদুবাবু উদ্বেগের সুরে জিজ্ঞাসা করেন, আজ যুদ্ধের খবর কী অবিনাশবাবু ?

অবিনাশবাবু যুদ্ধের আলোচনা করিতে বসেন। তোজো বা ওয়াভেল বা চার্চ্চিল যাহা না ভাবিয়াছেন, অবিনাশবাবু তাহা ভাবিয়া বুঝিয়া বিজ্ঞ হইয়া বসিয়া আছেন। সিঙ্গাপুর বা ব্রহ্মদেশ কী করিলে রক্ষা পাইতে পারিত, ব্রিটিশের কী ভুল হইল, কোন্ পথ ধরিয়া কী ভাবে যুদ্ধ করিলে আপার বর্ম্মা এখনও রক্ষা হয়—এসব কথা অবিনাশবাবু খুব ভালই জানেন। কলিকাতায় দিন পনেরোর মধ্যে বোমা পড়িবে, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। বোমারু বিমানের আক্রমণের চিত্র তাঁহার মত কেহ আঁকিতে পারে না।

শুনিয়া শুনিয়া যদুবাবুর কী হইয়াছে, আজকাল তিনি যেন সর্ব্বদাই সশঙ্ক।

একদিন রাত্রে আহার করিতে বসিয়া হঠাৎ উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন, এরোপ্লেনের শব্দের মত একটা শব্দ না ?

স্ত্রীকে বলিলেন, দাঁড়াও, ও কিসের শব্দ গো ?

—কই ?

—ওই যে শোন না—আলো সরাও, আলো ঘরে নিয়ে যাও, ঘরে নিয়ে যাও। জাপানী প্লেন হতে পারে—

—তোমার হল কী ? ও তো গুবরে পোকা উড়ছে জানালার বাইরে।

—না না, গুবরে পোকা কে বললে ? দেখে এস আগে—দুধ দিতে হবে না, আগে দেখে এস—

যদুবাবুর স্ত্রী ঝাঁটার আগায় পোকাটাকে উঠানে ফেলিয়া দিয়া বলিল, জাপানী এরোপ্লেন ঝাঁট দিয়ে তফাত করে রেখে এলাম গো। এখন নিশ্চিন্দি হয়ে বসে দুধ দিয়ে ভাত দুটি খাও। এক চাকলা আম দিই।

সংসারের বড় কষ্ট, অথচ ভয়ে যদুবাবু কলিকাতায় গিয়া স্কুলে প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকার খোঁজখবর করিতে পারেন না। স্কুলে চিঠি লিখিয়াও জবাব পাইলেন না। ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থান, শরীরের মধ্যে অসুখ ঢুকিল—প্রায়ই অসুখে ভোগেন। অথচ ঔষধ নাই, পথ্য নাই। থাকিবারও খুব কষ্ট।

যদুবাবু বলেন, এর চেয়ে বেড়াবাড়ী ছিল ভাল।

যদুবাবুর স্ত্রী বলে, সেখানেও যে সুখ, তা নয় ; তবে তুমি সঙ্গে থাকলে আমি বনেও থাকতে পারি। সে বার তুমি আমায় ফেলে এলে একা—কী করে থাকি বল তো ?

যদুবাবু বলেন, তুমি অবনীর দিদিকে একখানা চিঠি লেখো। আম-কাঁঠালের সময় আসছে, চল যাই। কতকাল বেড়াবাড়ী বাস করি নি। আসল কথা কী জান, কলকাতা ছাড়া কোন জায়গায় মন টেঁকে না। কথা বলবার মানুষ নেই—আমার যে সব বন্ধু ছিল কলকাতায়, তাদের কেউ পোস্ট-মাস্টার, কেউ মার্চেণ্ট অফিসের বড় কেরানী, দু শো টাকার কম মাইনে নয়। স্কুল-মাস্টারকে সবাই খাতির করত। শিক্ষিত লোক শিক্ষিত লোকের মর্ম্ম বোঝে।

—কেন, ওই অবিনাশবাবু—উনিও তো ভাল চাকরি করেন।

—ওই অবিনাশটা ? আরে রামোঃ, রেল-আপিসে কাজ করে, সেকালের এণ্ট্রান্স পাস

—ওর দরের লোকের সঙ্গে কি আমাদের বনে ? ওই দেখ না কেন, মুটো ছেলে রয়েছে, আমি তার বাড়ীর পাশে একজন কলকাতার বড় স্কুলের মাস্টার, পড়া না কেন টুইশানি ? দে না দশটা টাকা মাসে ? এমন পাবি কোথায় তোদের এই পাড়াগাঁয়ে ? পেটে বিদ্যে থাকলে তবে তো ! রেল-আপিসের কেরানী আর কত ভাল হবে !

অবনীর দিদিকে চিঠি লেখা হইল, কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে যদু-বাবু একদিন হঠাৎ জ্বর হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। যদুবাবুর স্ত্রী গিয়া অবিনাশবাবুর স্ত্রীর কাছে কাঁদিয়া পড়িলেন। অবিনাশবাবু তখন অফিস হইতে ফেরেন নাই, তাঁহার চাকর পাঠাইয়া পাশের গ্রামের ভূষণ ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনিলেন। ভূষণ ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিয়া বলিলেন, মাথায় হঠাৎ রক্ত উঠিয়া এমন হইয়াছে। খুব সাবধানে থাকা দরকার। চিকিৎসাপত্র করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ করিতে যদুবাবুর স্ত্রীকে শেষ সম্বল হাতের রুলি বিক্রয় করিতে হইল।

এই সময় হঠাৎ একদিন অবনী আসিয়া হাজির। সে একটা পুঁটুলি হইতে গোটাকয়েক কমলালেবু ও পোয়াটাক মিছরি যদুবাবুর বিছানার একপাশে রাখিয়া একগাল হাসিয়া বলিল, নিতে এসেছি দাদা, চলুন। বউদিদি দিদিকে পত্র লিখেছিলেন আপনার অসুখের খবর দিয়ে। দিদি বললেন—যাও ওদের গিয়ে এখানে নিয়ে এস।

যদুবাবু মিনতির স্বরে বলিলেন, তাই নিয়ে চল ভায়া, এখানে আমার মন টেঁকে না।

—বউদিদি কই ?

বোধহয় ঘাটে গিয়েছে। বোস, আসছে এখুনি।

অবনীকে দেখিয়া যদুবাবু যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। নির্ব্বান্ধব স্থানে তবুও একজন দেশের লোক, জ্ঞাতির সান্নিধ্যলাভ কম কথা নয়।

অবনী ইহাদের সঙ্গে করিয়া বেড়াবাড়ী আনিয়া ফেলিল। যে ঘরে পূর্ব্বে যদুবাবুর স্ত্রীর স্থান হইয়াছিল, সেই ঘরখানাতেই এবারও যদুবাবুরা আসিয়া উঠিলেন। ঘরখানা সেই রকমই আছে, বরং আরও খারাপ, আরও স্যাঁতসেতে। দেওয়ালে নোনা লাগার ছোপ আরও পরিস্ফুট হইয়াছে।

গ্রামে ডাক্তার নাই, আশপাশের ষোলখানা গ্রামের মধ্যে কুত্রাপি ডাক্তার নাই, দুই-এক জন হাতুড়ে বদ্যি ছাড়া। তাদেরই একজন আসিয়া যদুবাবুকে দেখিল। পুরাতন জ্বরে ভাত খাওয়ার পরামর্শ দিল। বলিল, নাতি-খাতি সেরে যাবে অখন, ও গরম হয়েছে, গরমের দরুন অসুখডা সারচে না।

রুলি বিক্রয়ের টাকা ফুরাইয়া আসিতেছে দেখিয়া যদুবাবুর স্ত্রী স্বামীকে বলিল, হ্যাঁ গো, কাল তো ওরা বলছিল—এক মণ চাল কিনতে হবে, অবনীর হাতে এখন টাকা নেই, তা তোমার ইয়েকে একবার বল। আমি তোমাকে আর কী বলব, সব বিত্তে তো জানি। এক মণ চালের দাম দিতে গেলে তোমার ওষুধপথ্যির পয়সা থাকে না। অথচ ওদের হাঁড়িতে খাওয়াদাওয়া, না দিলেও তো মান থাকে না। কী করি ?

যদুবাবু বিরক্তির সুরে বলিলেন, তোমাদের কেবল পয়সা আর পয়সা, একটা লোক শুয়ে বিছানায়—জানি নে ও-সব, যাও এখান থেকে—

যদুবাবুর স্ত্রীর আর কোন গহনাপত্র নাই, স্বামী বিশেষ কিছু দেন নাই, বরং বাপের বাড়ী হইতে আনীত যাহা কিছু ধুলাগুঁড়ো ছিল, তাহাও স্বামী ফুঁকিয়া দিয়াছেন অনেকদিন পূর্ব্বে।

এখন উপায় ? ভাবিয়া-চিন্তিয়া বিবাহের সময় শ্বশুরের দেওয়া বেনারসী শাড়িখানা লুকাইয়া গ্রামের মধ্যে অবস্থাপন্ন রায়বাড়ীর গিন্নীর কাছে লইয়া গেল।

রায়-বাড়ীর গিন্নী বলিলেন, এস এস ভাই। কবে এলে ? শুনলাম নাকি ঠাকুরপোর বড্ড অসুখ ?

যদুবাবুর স্ত্রী কাঁদিয়া বলিল, সেই জন্যেই আসা। কলকাতায় স্কুল উঠে গিয়েছে, হাতে এক পয়সা নেই, অথচ ওঁর অসুখ। আমার এই ফুলশয্যের বেনারসীখানা বিক্রি করে দিন। নইলে উপায় নেই। এই দেখুন ভাল কাপড়, এখনও নষ্ট হয় নি—এক জায়গায় কেবল একটু পোকায় কেটেচে—

রায়গিন্নীর অবস্থা ভাল ! দুই ছেলে চাকুরি করে, জমিজমাও আছে। বাড়ীর কর্ত্তা আগে কোর্টের নাজির ছিলেন সে কালের নাজির, দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। একটি মেয়ে বিধবা, বাপের বাড়ী থাকে, কিন্তু তাহার শ্বশুরবাড়ীর অবস্থা ভালই—স্ত্রীধন হিসাবে কিছু কোম্পানির কাগজও আছে।

রায়গিন্নী বলিলেন, ফুলশয্যের বেনারসী কেন বিক্রী করবে ভাই ? দু-পাঁচ টাকা দরকার থাকে, নিয়ে যাও। আবার যখন তোমার হাতে আসবে দিয়ে যেয়ো।

যদুবাবুর স্ত্রী বলিল, না, আপনি একেবারে বিক্রি করিয়েই দিন। ধার করলে একদিন শোধ দিতে হবে, তখন কোথায় পাব ?

স্ত্রীর মুখে এ কথা শুনিয়া যদুবাবু চটিয়া গেলেন। বলিলেন, ধার দিতে চাচ্ছিল, নিলেই হত। কাপড়খানা থাকত, টাকাও চার-পাঁচটা আসত। কাপড়খানা ঘুচিয়ে দিয়ে এলে ? এমন পাথুরে বোকা নিয়ে কি সংসার করা চলে ?

যদুবাবুর স্ত্রী কোনও প্রতিবাদ করিল না। অবুঝ স্বামী, রোগ হইয়া আরও অবুঝ হইয়া গিয়াছে। তাহাকে মিষ্টি কথায় ভুলাইয়া রাখিতে হইবে, ছেলেমানুষকে যেমন লোকে ভোলায়। টাকাকড়ির বিষয়ে মানুষের সঙ্গে সোজাসুজি ব্যবহার ভাল। ফাঁকি দিয়া, ঠকাইয়া কতদিন চলে ? স্বামীকে সে কথা বোঝানো শক্ত।

এদিকে অবনীদের ধারণা, যদুবাবু প্রভিডেন্ট ফণ্ডের মোটা টাকা আনিয়াছেন সঙ্গে। স্বামী স্ত্রী লইয়া সংসার, এতদিন কলকাতায় চাকরি করিয়াও দুই-পাঁচ হাজার বা ব্যাঙ্কে কোন্ না জমাইয়া থাকিবেন ? বাইরের লোকের সামনে অবনী বলে, দাদার হাতে পয়সা আছে। গভীর জলের মাছ, এ কি আর তুমি আমি ?

যদুবাবুকে বলে, দাদা, টাকা ব্যাঙ্কে রাখা ভাল না, যে বাজার !

যদুবাবু বলেন, তা তো বটেই।

—তা আপনি যদি রেখে এসে থাকেন ব্যাঙ্কে, একদিন না হয় আমিই যাই—চেক লিখে দিন, টাকাটা উঠিয়ে আনি।

যদুবাবু ভাঙেন তবু মচকান না। ব্যাঙ্কের ত্রিসীমানা দিয়া যে তিনি কস্মিন্‌কালে হাঁটেন নাই, অবনীকে এই সোজা কথাটা বলিলেই হাঙ্গামা চুকিয়া যায়; কিন্তু তা তিনি বলিলেন না। এমন ভাবের কথা বলিলেন, যাহাতে অবনীর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, দাদার অনেক টাকা কলিকাতার ব্যাঙ্কে মজুত।

সেই দিন হইতে উঁহাদের দিক হইতে নানা ধরনের তাগিদ আসিতে লাগিল। আজ অবনীর মেয়ে উষার কাপড় নাই, কাল কাছারীর খাজনা না দিলে মান থাকে না, পরশু অবনীর নিজের জুতা এমন ছিঁড়িয়াছে যে একজোড়া নতুন জুতা ভিন্ন ভদ্রসমাজে সে মুখ দেখাইতে পারিতেছে না। তা ছাড়া, সংসারের বাজার-খরচের প্রায় সমুদায় ভার পড়িল যদুবাবুদের অর্থাৎ যদুবাবুর স্ত্রীর উপর। ফলে বেনারসী শাড়ী বিক্রির পঁচিশ টাকা, দিন-কুড়ির মধ্যেই কয়েক আনা পয়সায় আসিয়া দাঁড়াইল।

যদুবাবুর স্ত্রী জানে, স্বামীর কাছে কিছু চাওয়া ভুল। তোরঙ্গের তলায় একটা সিঁদুরের কৌটার মধ্যে বহুকালের দুল ভাঙা, নথের টুকরা, এক কুচি চুড়ির গুঁড়া, দুই-চারিটা সিঁদুর-মাখানো লক্ষ্মীর টাকা ইত্যাদি ছিল। সব গৃহিণীই এগুলি লুকাইয়া জুড়াইয়া রাখিয়া দেন, যদুবাবুর স্ত্রীও তাহা করিয়াছিল। কত কালের স্মৃতি-জড়ানো এই অতিপ্রিয় দ্রব্যগুলির দিকে চাহিয়া তাহার চোখে জল আসিল। শেষ সম্বল সোনার কুচি—লোকে কথায় বলে। সত্যিই সেই শেষ সম্বলটুকুও কি হাতছাড়া করিতে হইবে, অবস্থা এত মন্দ হইয়া আসিয়াছে?

অবনী একদিন যদুবাবুর কাছে ভূমিকা ফাঁদিয়া বলিল, দাদা একটা কথা বলি। এ মাসে আমায় কিছু টাকা দিন। একটা গরু বিক্রী আছে আহাড়ী জেলেনীর, বাইশ টাকা দাম চায়—এবেলা এক সের ওবেলা এক সের দুধ দিচ্ছে। আপনার অসুখের জন্যে দুধের তো দরকার। গরুটা কিনে রাখি, সব হাঙ্গামা মিটে যায়।

যদুবাবু স্বভাবসিদ্ধভাবে উত্তর দিলেন, তা—তা—বেশ। মন্দ কী? হ্যাঁ, সে ভালই।

অবনী উৎসাহ পাইয়া বলিল, কবে দিচ্ছেন টাকাটা? আজ না হয় পাঁচটা টাকা দিন, বায়না করে আসি। হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে—

আসলে সেদিন আড়ংঘাটার বাজারে অবনীর পাঁচ টাকা ধার শোধ দেওয়ার ওয়াদা ছিল, কুণ্ডুদের দোকানে অনেক দিনের দেনা, নতুবা তাহারা নালিশ রুজু করিবে বলিয়া শাসাইয়াছে।

যদুবাবু বলিলেন, তা এখন তো হয় না। তোমার বউদিদির কাছে চাবি। সে ঘাটে গিয়েছে।

যদুবাবুর উপর হইতে চাপ গিয়া পড়িল এবার তাঁহার বেচারী স্ত্রীর উপর। বউদিদি কেন দিবেন না, দাদা যখন বলিয়া দিয়াছেন? আসল কথা, দাদা তো কঞ্জুস আছেনই,

বউদিদি হাড়-কঞ্জুস। হাত দিয়া জল গলে না।

করট ও ফিঙে পাখী গ্রীষ্মের দীর্ঘ দিন ধরিয়া বাঁশঝাড়ে ডাকে, প্রস্ফুটিত ভুঁতপুষ্পের ঘন সুবাসে যদুবাবুর জানালার বাহিরের বাতাস ভরপুর, রোগগ্রস্ত যদুবাবু নিজের বিছানায় বালিশ ঠেসান দিয়া বসিয়া বসিয়া শোনেন। সামনের নারিকেল গাছের গায়ে একটা গিরগিটি, যখনই যদুবাবু চাহিয়া দেখেন, সেই গিরগিটি ওই গাছের গায়ে একই জায়গায়। দেখিয়া দেখিয়া রুগ্ন উদ্‌ভ্রান্ত যদুবাবুর মনে হয়, ওই গিরগিটি তাঁহার এই বর্তমান শয্যাশায়ী অবস্থার প্রতীক। ওটাও যেমন নারিকেল গাছের গায়ে অচল অনড়, তিনিও তেমনিই এই আলো-আনন্দহীন কক্ষে, পুরানো ভাঙা কোঠার কেমন একপ্রকার নোনা-ধরা গন্ধের মধ্যে শয্যাগত, উত্থানশক্তিরহিত।

কবে শরীর সারিবে কে জানে? যেদিন ওই গিরগিটিটা ওখান হইতে সরিয়া যাইবে?

অবনীর বড় ছেলে কালীকে ডাকিয়া বলিলেন, এই শোন, ওই গিরগিটিটাকে ওখান থেকে তাড়াতে পারবি?

বালক অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কেন জ্যাঠামশাই?

—দে না, দরকার আছে।

—একটা কঞ্চি নিয়ে আসি জ্যাঠামশায়। খোঁচা দিয়ে তাড়াই। আপনি উঠবেন না, শুয়ে শুয়ে দেখুন।

তাড়ানো হইল বটে, কিন্তু আবার পরদিন সকালে উঠিয়া যদুবাবু সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন, গিরগিটিটা আবার সেই নারিকেলগাছের গায়ে স্বস্থানে ঝাঁকিয়া বসিয়া আছে। যদুবাবু হতাশ হইয়া বালিশের গায়ে ঠেস দিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

অসুখ সারে না। দিন দিন দুর্বল হইয়া আসিতেছে দেহ, পাড়াগাঁয়ের হাতুড়ে ডাক্তারের ওষুধে ফল হয় না। জ্যৈষ্ঠ মাস গিয়া আষাঢ় মাস পড়িল। বর্ষার জলের সঙ্গে সঙ্গে হু হু করিয়া মশককুল দেখা দিল, ফুটা-ছাদ দিয়া জল পড়িতে লাগিল রোগীর বিছানায়, এক-এক দিন রাত্রে বিছানা গুটাইয়া ঘরের কোণে জড়সড় হইয়া স্বামী-স্ত্রীতে রাত কাটাইতে হয়।

যদুবাবুর স্ত্রী বলে, কপালে এতও ছিল!

যদুবাবু চটিয়া বলেন, তুমি ও-রকম নাকে কেঁদো না বলে দিচ্ছি! কথায় বলে, পুরুষের দশ দশা। রেখেছিলাম তো কলকাতায় বাসা করে এতাবৎ কাল। জাপানীদের তো আমি ডেকে আনি নি। পড়ে গিয়েছি বিপদে, তা এখন কী করি বল? সুদিন আসে, কলকাতায় গিয়ে উঠব আবার—তা বলে নাকে কেঁদে কী হবে?

যদুবাবুর স্ত্রী বলিল, আমার জন্যে কিছু বলিনি, তোমার জন্যেই বলি। তোমার কি এত কষ্টকরা অভ্যেস আছে কখনও? চিরকাল টুইশানি করে এসেছ, শীতকালে গরম জল করে দিয়েছি হাত-পা ধুতে, তোমার ঠাণ্ডা সহ্যি হয় না কোন কালে—

—আচ্ছা, থাক্ থাক্, তার জন্যে নাকে কেঁদে কী হবে? আবার হবে সব—কেবল ওই অবনীটার জ্বালায়—

কিন্তু লক্ষণ ক্রমশ খারাপ দেখা দিল। আষাঢ় মাস পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই যদুবাবু যেন আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। জ্বর রোজ আসে, কোন দিন ছাড়ে, কোনদিন ছাড়ে না।

সে দিন জগন্নাথের স্নানযাত্রা। সকালের দিকে বৃষ্টি হইয়া দুপুরের পর বৃষ্টিধৌত সুনীল আকাশে ঝলমলে সোনালী রোদ উঠিল। আতাগাছটাতে, ফুটন্ত ফুলে ভরা আকন্দগাছটাতে, বাঁশঝাড়ের মাথায় অদ্ভুত রঙের রোদ মাখানো। আতাফুলের কুঁড়ির মৃদু সুবাস শৈশবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

অবনীর মেয়ে টুনি বলিতেছে, মা আমি পঞ্চমীর পালুনি করে পান্তা ভাত খেতে পারব না কিন্তু বলে দিচ্ছি, চিঁড়ে খাব।

যদুবাবুর মনে পড়িল, তাঁহার মা যদুবাবুর বাল্যদিনে মনসার পালুনি করিয়া পাতে যে চিঁড়ার ফলার রাখিয়া উঠিতেন, তাহা খাইবার জন্ত তাঁহাদের দুই ভাইবোনের কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত। কোথায় সে বাল্যকালের মা, কোথায় বা সেই ছোট বোন মঙ্গলা। চল্লিশ বছরের ঘন কুয়াশায় তাহাদের মুখ মনের দর্পণে আজ অস্পষ্ট।

তারপর কতকাল গ্রামছাড়া। ১৯০০ সালের পর আর গ্রামে এভাবে বাস করা হয় নাই। সেই সালেই যদুবাবু এণ্ট্রান্স পাশ করেন বোয়ালমারি হাই স্কুল হইতে। দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ রামকিঙ্কর বসু ছিলেন হেডমাস্টার। যেমন পাণ্ডিত্য, তেমনই বেতের বহর ছিল তাঁহার। রামকিঙ্কর বোসের বেত খাইয়া অনেক ডেপুটি মুন্সেফ পয়দা হইয়া গিয়াছে সেকালে।

যদুবাবুকে বলিয়াছেন—যদু, তুমি বড় ফাঁকিবাজ, টেস্ট পরীক্ষায় টুকে পাস করলে, চিরকালই পরের টুকে পাস করলে, জীবনের পরীক্ষায় যেন এ রকম ফাঁকি দিয়ো না, বড্ড ফাঁকে পড়ে যাবে।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। কী সুন্দর অপরাহ্ণের নীল আকাশ! কী সুন্দর সোনার রঙের সূর্য্যালোক! ছোট গোয়ালে-লতার ঝোপে একজোড়া বনটিয়া আসিয়া বসিল। ছেলে বেলায় যদুবাবু পাখী বড় ভালবাসিতেন। পদা বুনো নামে তাঁহাদের এক পৈতৃক প্রজা ছিল, তাহার সঙ্গে মিশিয়া ফাঁদ পাতিয়া জলচর পক্ষী ধরিতেন—সরাল, পানকৌড়ি, বক, শামুকুড়—কত কাল এসব দেখেন নাই! গানের তাল কবে কাটিয়াছিল, স্মরণ নাই। বর্ত্তমানের সঙ্গে অতীতের অনতিক্রমণীয় ব্যবধান।

যেন তাঁহার নবদৃষ্টি জাগ্রত হইয়াছে এই রোগশয্যায়! টুইশানির ছুটাছুটি নাই, সারাদিন ঠেসান দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকা। কতকাল এত দীর্ঘ অবকাশ ভোগ করেন নাই। ভগবানের কথা কখনও ভাবেন নাই, আজ মনে হইল—তিনি আছেন। না থাকিলে এই সুন্দর রোদ, বনটিয়া, তাঁহার মনের এই অকারণ আনন্দ, শত অভাবের মধ্যেও মায়ের স্নেহময়ী স্মৃতির বাস্তবতা কোথা হইতে আসিল? ভগবান না থাকিলে ওই অনাথা নিঃসম্বল বিধবাকে

কে দেখিবে? তাঁহার দিন ফুরাইয়াছে তিনি জানেন।

জীবন কি ফাঁকি দিয়া কাটাইলেন!

সুদীর্ঘ জীবনের বহু কথা আজ যেন মনে পড়িতেছে, গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের কর্ম্মজীবনের ইতিহাস—না, ফাঁকি কেন দিবেন? ফাঁকি দেন নাই। নারাণদা সাধু-পুরুষ ছিলেন—স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন—নারাণদা বলিতেন, জীবনকে সার্থক করিতে হইলে তাহাকে মানুষের কোন না কোন কাজে, সমাজের কোন না কোন উপকারে লাগানো চাই।

তিনিও জীবনকে বৃথা যাইতে দেন নাই। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কত ছাত্র লেখাপড়া শিখিয়া তাঁহার হাতে মানুষ হইয়াছে। হয় নাই কি? নিশ্চয়ই হইয়াছে। সেই সব ছেলেই সাক্ষী আজ, পরকালের মৃত্যুপারের দেশের বড় দরবারে তাহারা সে সাক্ষ্য দিবে একদিন, যদুবাবু আশা করেন।

দুই-একটা অন্যায় কাজ, দুই-একটা—চুরি ঠিক বলা যায় না—চুরি নয় তবে হাঁ, একটু-আধটু খারাপ কাজ যে না করিয়াছেন, এমন নয়। তিনি তাহা স্বীকারই করিতেছেন। ভগবান গরীব মানুষের অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

বেলা গেল।···

গিরগিটিটা নারিকেলগাছের গুঁড়িতে ঠায় বসিয়া আছে।···

ভগবান দয়াময়, গরীবের অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

যদুবাবুর স্ত্রী এক বাটি বার্লি লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, নেবু দিয়ে বার্লি দেব, না, মিছরি দেব? পরে থামিয়া বলিল আজ গুণে দেখলাম, এগারোখানা আমসত্ত্ব হয়েছে, বুঝলে? কলকাতার বাসায় নিয়ে যাব হাঙ্গামা মিটে গেলে। তুমি দুধ দিয়ে খেতে ভালবাস বলে আমসত্ত্ব দিলাম মরে-কুটে—সেরে ওঠো তুমি।

স্ত্রীকে হঠাৎ বিস্মিত করিয়া দিয়া তিনি তাহাকে পুরানো আমলের আদরের সুরে অনেক দিন পরে বলিলেন, বিছানায় এসে কাছে একটুখানি বোস না! এস—

ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুল দিন পাঁচ-ছয় খুলিয়াছে। দুই-তিন জন ব্যতীত অন্য সব শিক্ষক আসিয়াছেন। আসেন নাই কেবল জ্যোতির্ব্বিনোদ আর শ্রীশবাবু। তাঁহারা দেশের স্কুলে চাকুরি পাইয়াছেন। ছেলেরাও বেশী নাই, এ-ক্লাসে পাঁচ জন ও-ক্লাসে দশ জন। অনেকে বলিতেছে—স্কুল টিকিবে না।

আর আসেন নাই যদুবাবু। সাহেবের সারকুলার-বই লইয়া কেবলরাম ক্লাসে ক্লাসে ফিরিতেছে—স্কুলের সুযোগ্য প্রবীণ শিক্ষক যদুগোপাল মুখুজ্যের পরলোকগমনে স্কুল দুই দিন বন্ধ রহিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় একাদিক্রমে উনিশ বৎসর এই স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া ছাত্র ও শিক্ষক সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে স্কুলের যে অপরিসীম ক্ষতি হইল···ইত্যাদি ইত্যাদি।

নবাগত

দ্রবময়ীর কাশীবাস

দু'দিন থেকে জিনিসপত্র গুছনো চললো। পাড়ার মধ্যে আছে মাত্র তিনঘর প্রতিবেশী—কারো সঙ্গে কারো কথাবার্তা নেই। পাড়ার চারিধারে বনজঙ্গল, পিটুলি গাছ, তেঁতুল গাছ, বাঁশঝাড়, বহু পুরনো আমকাঁঠালের বাগান। দ্রব ঠাকরুণের বাড়ীর চারিধার বনে বনে নিবিড়, সূর্যের আলো কস্মিন্‌কালে ঢোকে না, তার ওপর বাড়ীর সামনে একটা ডোবা, বর্ষার জলে টইটম্বুর, দিনরাত 'ঘাঁওকো' 'ঘাঁওকো', ব্যাঙের একঘেয়ে ডাক, দিনে রাতে মশার বিন্‌বিন্থনি।

দ্রব ঠাকরুণের নাতি বল্লে—ঠাকুমা, সাবু আছে ঘরে, না বাজার থেকে আনবো?

দ্রব ঠাকরুণের কণ্ঠস্বর অতি ক্ষীণ শোনাল, কারণ আজ দু'মাস কাল তিনি ম্যালেরিয়ায় ভুগছেন—পালাজ্বর, ঘড়ির কাঁটার নিয়মে তা আসবে একদিন অন্তর অন্তর ঠিক বিকেল বেলাটিতে। দ্রব ঠাকরুণ পুরোনো কাঁথা-লেপ চাপা দিয়ে পড়বেন, উঃ আঃ করবেন—জ্বরের ধমকে ভুল বকবেন।

ও বাড়ীর ন' ঠাকরুণ এসে জিজ্ঞেস করবেন জানালার কাছে দাঁড়িয়ে—বলি ও দিদি, অমন করচ কেন? জ্বর এল নাকি?

—আর ন'বৌ। মলেই বাঁচি। নিত্যি জ্বর, নিত্যি জ্বর—ওরে মা রে, হাত-পা কি কামড়ানটা কামড়াচ্চে! ··একটু উঠে হেঁটে বেড়াতে দেবে না—এ কি কাণ্ড, হ্যাঁ গা?

পরে মিনতির সুরে বললেন—ও ন'বৌ, লক্ষ্মী দিদি, শীত তো আজ ভাঙলো না, কাঁথা গায়ে দিইচি, লেপ গায়ে দিইচি—তুমি ওই বাঁশের আল্‌নায় পুরনো তোশকটা পেড়ে আমার গায়ে যদি দিয়ে দাও—

—চেপে ধরবো, হ্যাঁ দিদি?

—ধ-রো—ন'বৌ—চেপে ধ-রো—আমার হ-য়ে গেল!

—ভয় কি, অমন ক'রো না, ছিঃ। টেবু আসবে চিঠি পেলেই, কাঁদু আসবে, বিল্লে আনবে—তোমার নাতিরা বেঁচে থাক্, অমন সোনার চাঁদ নাতি সব, ভাবনা কি তোমার দিদি?

—কে-উ—আ-মা-কে—দে-খে-না—ন-বৌ—

—কেন দেখবে না দিদি—সবাই দেখবে। তুমি বেশি বোকো না, চুপটি করে শুয়ে থাকো—

—আমার গো-রু! গো-রু উ-ত্ত-র-মা-ঠে—

—কোথায় গোরু দিয়ে এসেছিলে?

—জ-টে গ-য়-লা-র জ-ঙ্গ-ল ক্ষে-তে-র পাশে—

—আচ্ছা আমি এনে দেবো এখন গোরু। আমারও গোরু রয়েচে জটে গোয়ালার জমির কাছেই। তুমি শুয়ে থাকো।

আরও ঘণ্টা খানেক পরে বৃদ্ধা ন'ঠাকরুণ আবার এসে জানালায় দাঁড়িয়ে বল্লেন—কম্প থেমেচে দিদি ?

ক্ষীণস্বরে লেপ কাঁথার ছেঁড়া স্তূপের মধ্যে থেকে জবাব এল—গরু ! আমার গোরু তো—

—কোনো ভয় নেই। সে আমি এনেচি। কম্প থেমেচে ?

—হুঁ।

সারা বর্ষা দ্রবময়ী এমনি ম্যালেরিয়ায় ভোগেন। তাঁর বড় নাতি শ্রীশচন্দ্র ওরফে টেবু কাজ করে ইছাপুরে বন্দুকের কারখানায়, মেজ নাতি পাকুশীতে ই. বি. আর-এ—ছোট নাতিও ওদিকে যেন কোথায় থাকে। বড় নাতি ছাড়া অন্য দুটি অবিবাহিত, বড় নাতির আবার একটি ছেলেও হয়েচে। আজ বছর পাঁচ-ছয় আগে বড় নাতি ছেলে বৌ নিয়ে বাড়ী এসে দিন সাতেক ছিল। নাতবৌ মনোরমা হুগলী জেলার মেয়ে, সে এখানে এসে নাক সিঁটকে থাকে, 'বাড়ী তো ভারি, মোটে একখানা চালাঘর, ছেঁচার বেড়া, এমনিধারা জঙ্গল যে, দিনমানেই বুনো শূওর লুকিয়ে থাকে—মশার তো ঝাঁক। মাগো, কি কাদা ঘাটের পথে ! এখেনে কি মানুষ থাকে নাকি ?' মনোরমার খাঁড়ার মত নাক আরও উঁচু ও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। সাতদিন পরে দ্রবময়ীকে নাতির ছেলে খোকন্‌মণির মায়া কাটাতে হয়। তাঁর চোখের জলে বুক ভেসে যায়।

ন'ঠাকরুণকে বলেন—সুদের সুদ, ও যে কি মিষ্টি তা তোমাকে কি বোঝাব ন'বৌ—

দ্রবময়ীর আকুল ক্রন্দনের মধ্যে যে কত কালের পিপাসিত প্রতীক্ষা সুদূর ভবিষ্যতের দিকে নিষ্পলকে চেয়ে আছে, স্বামিহীনা বন্ধ্যা বিধবা ন'ঠাকরুণ তা বুঝতে না পেরে কেমন অবাক হয়ে যান, হয়তো বা ভাবেন—দিদির সবই বাড়াবাড়ি !

ন'ঠাকরুণ আপনার জন কেউ নয়—পাড়ার পাশের বাড়ীর প্রতিবেশিনী মাত্র। বছরের মধ্যে গড়ে তিন-চার মাস দুই বৃদ্ধার মধ্যে কথাবার্ত্তা বন্ধ হয়ে যায়, মুখ দেখাদেখি থাকে না —তবুও ঝগড়া কেটে গেলে পাড়ার মধ্যে একমাত্র ন'ঠাকরুণই দ্রবময়ীকে দেখাশুনা করেন সব চেয়ে বেশি, জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে থাকলে তাঁর গোরুটাও নিজের গোরু দুটোর সঙ্গে মাঠে বেঁধে দিয়ে আসেন, একটু সাবু হয়তো করে নিয়ে আসেন, অন্তত জানালায় উঁকি মেরে দু'-একটা কথাও বলেন !

কিন্তু এবার দ্রবময়ী যেন ভুগচেন একটু বেশি।

আষাঢ় মাসের প্রথম থেকে জ্বর শুরু হয়েচে, মাঝে মাঝে প্রায়ই ভোগেন।

শরীর দুর্ব্বল হয়ে পড়েচে—ঘোর অরুচি তার ওপর। পালাজ্বরে ধরেচে আজ মাসখানেক।

সন্ধ্যার দিকে দ্রবময়ী লেপ তোশক ফেলে ঝেড়ে উঠলেন। পালাজ্বরের কম্প থেমে গিয়েচে। জ্বর যদিও এখনো যায় নি—মুখ তেতো, মাথা ভার, শরীর ঝিম্ ঝিম্ করচে।

ডাক দিলেন—ও ন'বৌ, গোরু এনেচ দিদি ?

দু'তিনবার ডাকের পর ন'ঠাকরুণ উত্তর দিলেন—কে ডাকে ? দিদি ? ঠেলে উঠেচ ?

—বলি আমার গরুডো কি এনেচ মাঠ থেকে ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। গোরু গোরু করেই ম'লে শেষকালডা ? জ্বর ছেড়েচে ?

—ছেড়েচে—ছেড়েচে। বলি গোরু কোথায় বেঁধে রাখলে ?

—গোয়ালে গো গোয়ালে—ক্ষেপলে যে গোরু গোরু করে—

কেরোসিন তেল একটা টেমিতে একটুখানি ছিল, ব্রব ঠাকরুণ টেমিটা জ্বালালেন। আমড়া গাছে একটা তেড়ো পাখী আর একটা তেড়ো পাখীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইচে। ব্রব ঠাকরুণের জ্বরতপ্ত মস্তিষ্কে মনে হ'ল পাখী দুটো বলচে :—

প্রথম। কুৎলি, কুৎলি—

দ্বিতীয়। ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ—

প্রথম। কুৎলি, কুৎলি—

দ্বিতীয়। ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ—

প্রথম। কুৎলি, কুৎলি—

ব্রব ঠাকরুণ বিরক্ত হয়ে উঠলেন। কি একঘেয়ে আওয়াজ রে বাপু। চালাচ্চে তো চালাচ্চেই, আধঘণ্টা হয়ে গেল—একে মাথা ধরে আছে, ভালো লাগে ? থাম্ না বাপু। মানুষে জানোয়ারে সবাই মিলে পেছনে লাগলে কি করে বাঁচি—

গোহালে গিয়ে ব্রব ঠাকরুণ মুংলি গোরুকে দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা করলেন। মুংলি না খেলে তাঁর খাওয়া হয় না, এই বনজঙ্গলে ঘেরা নির্জ্জন স্বামীর ভিটে আঁকড়ে পড়ে আছেন, সবাই ছেড়ে গিয়েচে তাঁকে, কতক স্বর্গে কতক বা বিদেশে। তাঁর দুই ছেলে, দুই মেয়ে, নাতি, নাৎনী—একঘর, বড় গেরস্ত, যদি সবাই থাকতো আজ বজায়।

কেউ নেই আজ। মুংলিকে নিয়ে তিনি একা পড়ে আছেন গোপীনাথপুরের ভিটেতে। তাই গোরুটাকে অত ভালবাসেন, মাঠে বেঁধে দিয়ে বার বার করে দেখে আসেন, নদীতে জল খাওয়াতে নিয়ে যান।

সকালে উঠে ব্রব ঠাকুরুণের মনে হ'ল খিদের চোটে তিনি দাঁড়াতে পারচেন না। বাড়ীর পেছনে জঙ্গলের মধ্যে একটা ডুমুর গাছ থেকে ডুমুর পেড়ে আনলেন, দুটো সজনে শাক পাড়লেন উঠোনের গাছ থেকে। ঘাটের পথে মুখুজ্যে গিন্নীর সঙ্গে দেখা। মুখুজ্যে গিন্নীর ছেলে ক'টি লেখাপড়া শেখে নি, গাঁজা খেয়ে বেড়ায়—ব্রব ঠাকরুণের ক'টি নাতি চাকুরে, এজন্যে ব্রব ঠাকরুণের প্রতি তাঁর অন্তরে অন্তরে হিংসে বেশ।

জিজ্ঞেস করলেন—জ্বর হয়েছিল না কি শুনলাম খুড়ীমার ?

—হ্যাঁ মা, আজ দুটো ভাত রাঁধবো। তাই সকাল সকাল ঘাটে যাচ্ছি—

—আর মা, তোমার থাকতেও নেই—অমন সব নাতি নাৎনী থাকতেও তোমার এই দুর্দ্দশা—সবই কপাল।

অর্থাৎ, দুই চাকুরে নাতি আছে বলে তোমার গুমর করবার কিছু নেই। তুমি যে তিমিরে সেই তিমিরে।

নদীর ঘাটে যাবার পথে দুধারে শুধু বন আর বাগান। কোন বাগানে বেড়া দেওয়া নেই, ঘন আশশেওড়া ও বনচালতে গাছের ডালপালা স্নানার্থীদের গায়ে লাগে বলে দু'একজন শুচিবাইগ্রস্তা বিধবা পথের নিতান্ত পাশের ডালগুলো হাত দিয়ে ভেঙে ভেঙে রেখেচেন। ব্রব ঠাকরুণ বনের মধ্যে ঢুকে উঁকি মেরে কি দেখচেন, এমন সময় মুখুজ্যেদের সেজ বৌ পেছন থেকে বললে—কি দেখছেন, ও খুড়ীমা ?

—এই খয়েরখাগী কাঁঠালগাছটাতে কাঁঠাল আছে কিনা এক আধটা মা—একটা গাছ কাঁঠাল, সব্বনেশেদের জন্যে যদি মা তার কিছু ঘরে উঠলো—নিজে থাকি অসুখে পড়ে—

– কে কাঁঠাল নিলে খুড়ীমা ?

—কে নিয়েচে আমি কি চৌকি দিতে গিয়েচি বসে বসে ? এই পাড়ার মধ্যেই চোরের ঝাড়—ভ্যাখ তোর, না দেখ মোর। সব্বনেশে কলিকালে কি ধম্মোজ্ঞান আছে মা ?

—চলুন খুড়ীমা ঘাটে যাই—

ব্রব ঠাকরুণ বকতে বকতে ঘাটের দিকে চলেন। স্নান সেরে এসে দুটো আলো চাল ফুটিয়ে ডুমুরের চচ্চড়ি করে ভাত বেড়ে নিয়ে খেতে বসেচেন এমন সময় দেখলেন বাড়ীর পেছনে কাগজী লেবু গাছটার তলায় কি খস্ খস্ শব্দ হচ্চে।

ব্রব ঠাকরুণ হাঁক দিলেন—কে রে লেবুতলায় ?

ক্ষীণ বালিকাকণ্ঠে উত্তর এল—এই আমি কনক, ঠাকুমা—

—কেন ওখানে কি শুনি ? কি হচ্চে ওখানে ? বের হয়ে আয় ইদিকে, সামনে আয়।

একটি ম্যালেরিয়াশীর্ণ দশ এগারো বছরের বালিকামূর্ত্তি অকুণ্ঠপদবিক্ষেপে লেবু ঝোপের আড়াল থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে উঠোনে এসে ব্রব ঠাকরুণের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়ালো।

—এই আমার মার মুখে অরুচি—কিছু খেতে পারে না, তাই গিয়ে বল্লে—যা তোর ঠাকুরমার লেবুগাছ থেকে একটা লেবু—

ব্রব ঠাকরুণ তেলেবেগুনে জলে উঠে বললেন–হ্যাঁ যা—তোর বাবা লেবু গাছ পুঁতে রেখে গিয়েচে, যা তুলে নিয়ে আয় গিয়ে! যত সব চোর হ্যাঁচড় নিয়ে হয়েচে—তোর মার অরুচি, তা হাটে লেবু কিনতে পারিস নে ? এখানে কি ? তোর বাবার গাছ আছে—এখানে ?

বালিকা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ব্রব ঠাকরুণ আপন মনে বকে যেতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরে বালিকা ভয়ে ভয়ে বল্লে —ও ঠাকুরমা—

—কি রে ? কি ?

—আমি চলে যাব ?

—কেন, তোকে কি বেঁধে রেখেচি নাকি ? যা—

—লেবু দেবেন না ?

ব্রব ঠাকরুণ চুপ করে আপনমনে বড় বড় কয়েকটি ভাতের গ্রাস মুখে পুরে দিলেন, বাঁ হাতে ঘটি নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে খানিকটা জল খেয়ে অপেক্ষাকৃত নরমসুরে জিজ্ঞেস করলেন—

তোর পরনের কাপড় কাচা? ঐ কলসীটা থেকে আমায় একটু খাবার জল গড়িয়ে দে দেখি—

মেয়েটি তাই করলে। ব্রব ঠাকরুণ বল্লেন—অরুচি কেন? তোর মার কি ছেলেপিলে হবে না কি?

—তা তো জানিনে ঠাকুমা।

—যা, নিয়ে যা—তবে একটার বেশি নিবি নে—বুঝলি?

ব্রব ঠাকরুণ খেয়ে উঠে মাদুর পেতে একটু শুয়েচেন; এমন সময় মুখুজ্জে বাড়ীর বড় ছেলে অতুল এসে বল্লে—ও ঠাকুমা, শুয়েচেন নাকি?

—হ্যাঁ, কে? অতুল? কি ভাই?

—আপনার পিটুলি গাছ আছে? কলকাতা থেকে দেশলাইয়ের কারখানার লোক এসেচে গাঁয়ের পিটুলি আর শিমুল গাছ কিনতে। আপনার যদি থাকে—বেশ দর দিচ্চে—

—না বাপু, আমার নেই।

—কেন আপনার বাড়ীর পেছনে হরি রায়ের দরুণ জঙ্গলে তো বেশ বড় বড় পিটুলি গাছ আছে—

—না, আমি বেচবো না।

আসলে ব্রব ঠাকরুণের গাছপালার ওপর বড় মায়া, স্বামীর আমলের যা কিছু যৎসামান্য জমিজমা, তা প্রায়ই জঙ্গলাবৃত এবং বড় বড় বাজে গাছে ভর্তি। জ্বালানি কাঠ হিসেবে বিক্রী করলেও এ কয়লার দুর্মূল্যতার দিনে দু'পয়সা পাওয়া যায়, কিন্তু গাছের একটা ডাল কাটতেও তাঁর মায়া! না খেয়ে কষ্ট পাবেন, তবুও গাছ বিক্রীর কথা তুলতেও দেবেন না। একজনের শুঁয়োপোকা লাগাতে সে ডুমুরপাতা পাড়তে এসেছিল, কারণ ডুমুর পাতা দিয়ে শুঁয়ো-লাগা জায়গাটা ঘষলে শুঁয়ো ঝরে যায়, কিন্তু ব্রব ঠাকরুণ তাকে ডুমুর পাতা পাড়তে দেন নি। হয়তো এটা অতিরঞ্জিত গল্প মাত্র, তবে এর দ্বারা তাঁর মনের অবস্থা অনেকটা বোঝা যাবে।

বৈকালের দিকে ব্রব ঠাকরুণ বেশ ভালোই বোধ করলেন। পাড়ার এক প্রান্তে জঙ্গলে ঘেরা বাড়ী, বড় কেউ এদিকে বেড়াতে আসে না, এক ন'ঠাকরুণ ছাড়া কেউ উঁকি মেরে বড় একটা দেখে না, ব্রব ঠাকরুণ কিন্তু লোকজন, আড্ডা, মজলিস প্রভৃতি ভালোই বাসেন। কেউ এসে গল্প করে, এটা তাঁর খুবই ইচ্ছে—কিন্তু ও বেলার সেই বালিকাটি ছাড়া বিকেলে আর কেউ এল না। সেও এসেচে নিজের স্বার্থে।

—ঠাকুর-মা, একটা নেবু দেবেন?

—কেন রে, কেন? ওবেলা তো—

—ওবেলার নেবু ওবেলা ফুরিয়েচে, এবেলা একটা দরকার—মা বল্লে—

—আচ্ছা, আয় উঠে বোস একটু—

বালিকাটি অনিচ্ছাসত্বেও এসে বসে। নয়তো নেবু পাওয়া যায় না। বুড়ীর কাছে

বলতে তার ইচ্ছে হয় না, তার সমবয়সী বালিকারা রায়পাড়ার পুকুরধারে এতক্ষণ ফুল তোলাতুলি খেলা আরম্ভ করে দিয়েচে···তার প্রাণ রয়েচে সেখানে পড়ে। কিন্তু ব্রব ঠাকরুণের নিঃসঙ্গ মন যাকে হয় আঁকড়ে ধরতে চায় এই নির্জ্জন বৈকাল বেলাটিতে—তবুও দুটো কথা বলবার লোক তো বটে।

ব্রব ঠাকরুণ আপন মনেই বকে চলেছেন, নাৎবৌয়ের মন্দ ব্যবহারের কথা, নাতির ছেলে খোকনের অলৌকিক গুণাবলী, ছোট নাতি পরেশ তাঁকে কি রকম ভালোবাসে···এই ধরণের নানা কথা শুনতে শুনতে ক্ষুদ্র শ্রোতাটির হাই ওঠে, সে করুণ স্বরে বলে—ঠাক্‌মা, মা সাবু চড়িয়ে আমায় বল্লে, নেবু নিয়ে আয়, বেলা গেল—

—হ্যাঁ হচ্চে হচ্চে—তারপর শোন না···

—মা বক্‌বে—নেবু নইলে সাবু খেতে পারবে না—

—আচ্ছা, শোন্—তারপর খোকনমণি সেই পেয়ারা তো খাবেই, কিছুতেই ছাড়ে না—ওর মাও দেবে না—বড্ড হেজলদাগড়া মেয়ে ওর মা, আমি বলি, বৌ—চাচ্চে খেতে, এক টুকরো ওকে দাও—তা আমায় বলকে—আপনি চুপ করে থাকুন, আপনি কি বোঝেন ছেলেমেয়ে মানুষ করার—একালের মাও অন্য রকম, আপনাদের সেকাল গিয়েচে।···আমি জানিনে ছেলেমেয়ে মানুষ করতে—তবে তুই তোর বর পেলি কোথা থেকে রে আবাগের বেটি ?

—আমি এবার যাই ঠাক্‌মা—নেবু একটা—

—আচ্ছা তা যা নিয়ে একটা নেবু—শুনলি তো সব কাণ্ডখানা ? দিদিশাশুড়ী বড় মন্দ—

এমন সময়ে বাড়ীর বাইরে একখানা গোরুর গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। খুকী কৌতূহলে চোখ বড় বড় করে বল্লে—ও ঠাক্‌মা, কে যেন এল গাড়ী করে—তোমার ওই ডুঁত-তলায় গাড়ী দাঁড়ালো—

বলতে বলতে ব্রব ঠাকরুণের মেজ নাতি নীরদচন্দ্র দুটি ভারী মোট দু'হাতে ঝুলিয়ে বাড়ী ঢুকে ডাক দিলে—ও ঠাক্‌মা—

ব্রব ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে একগাল হেসে বল্লেন—কানু ? আয়, আয় ভাই—ভালো আছিস ?

কানু এসে মোট নামিয়ে পিতামহীকে প্রণাম করলে, বালিকাটির দিকে চেয়ে বল্লে—এ হরিকাকার মেয়ে কনক না ? ওঃ কত বড় হয়ে গিয়েচে—ভালো আছিস কনকী ? নে দাঁড়া—একখানা গজা নিয়ে যা—

পুঁটুলি খুলে মেয়েটির হাতে একখানা বড় গজা দিতে সে নিঃশব্দে হাসিমুখে হাত পেতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, বড় মোটটার মধ্যে আরও কি কি জিনিস আছে দেখবার আগ্রহে। তাদের বাড়ীতে এমন কেউ নেই যে বিদেশে চাকুরি করে···নিতান্তই অল্পবিত্ত গৃহস্থের সংসার—চাকুরে বাবুরা বাড়ী আসবার সময় কি কি অপূর্ব্ব জিনিস না জানি নিয়ে আসে।

ধ্রুব ঠাকরুণ জিজ্ঞেস করলেন—তারপর, কি মনে করে? হঠাৎ যে। বুড়ীকে মনে পড়েচে তা হোলে? বাবাঃ, সারা আষাঢ় মাস অসুখে ভুগে ভুগে—তাই এখনও কি সেরেচি। এমন একটা লোক নেই যে, এক ঘটি জল এগিয়ে ছায়—ওই ন'বৌ ছিল তাই—এত চিঠি দিলাম, না এল টেবু, না এল বিন্দে, না এলে তুমি—

সন্ধ্যার পর ন'ঠাকুরুণ খবর পেয়ে ছুটে এলেন। গ্রামের ছেলে, জন্মাতে দেখেচেন, অনেক দিন পরে দেখে খুব খুশি। কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞেস করার পর বল্লেন—হ্যাঁ কানু, তা তোমরা সোনার চাঁদ সব নাতি থাকতে বুড়ী এখানে বেঘোরে মারা যাবে! পালাজ্বরে ধরেচে—এই আজ ভালো আছে, কাল এমন সময় লেপ কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়বে। কে ছাখে, কে শোনে—তার ওপর আবার গোরু—একটা বিহিত করে যাও যা হয়—নইলে—

কানু বল্লে—সে সব জন্যেই তো আসা। চিঠি পেয়েচি অনেক দিন, সায়েব ছুটি দিতে চায় না—পরের চাকরি—তাই দেরি হোল।

ধ্রুব ঠাকরুণ বল্লেন—ভালো কথা, ও ন'বৌ, দুখানা গজা নিয়ে যাও, জল খেয়ো—কানু এনেচে আমার জন্যে—তা ও যেমন পাগল, আমার কি দাঁত আছে যে গজা খাবো? নিয়ে যাও ন'বৌ।

—তা ছাও দুখানা, নিয়ে যাই। ভালোটা মন্দটা এ পাড়াগাঁয়ে তো চক্ষেই দেখতে পাইনে দিদি—বেঁচে থাক্ তোমার সোনার চাঁদ নাতিরা, তোমার ভাবনাটা কিসের? বিশেষ করে কানুর মত ছেলে নেই এ গাঁয়ে—আমি যা' বলবো তা মুখের ওপরেই বলবো বাপু—

ফলে ন'বৌ দু'খানার জায়গায় চারখানা গজা হাতে খুশি মনে বাড়ীর দিকে চল্লেন আর কিছুক্ষণ পরে।

নাতি-ঠাকুরমার পরামর্শ হ'ল রাত্রে। কানু এক মতলব ফেঁদে এসেচে। ঠাকুরমাকে সে কাশী নিয়ে গিয়ে রেখে আসবে। তার একজন কে বন্ধুর মা কাশীতে থাকেন, সেই একই বাড়ীতে ঠাকুরমাকে রাখবে। পরদিন সকালে ন'বৌ শুনে খুব খুশি, অমন সব নাতি থাকতে ভাবনা কি? তীর্থধর্ম্ম করার সময়ই তো এই। তাঁর যদি আজ ছেলেটাও বেঁচে থাকতো।

আজ প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে সাত মাস মাত্র বয়সে ন'ঠাকরুণের ছেলে মারা গিয়েচে—সে-ই প্রথম, সেই শেষ। তাঁর আর ছেলেপুলে হয় নি।

যাবার দিন ধ্রুব ঠাকরুণ প্রিয় মুংলি গোরুটার ভার দিয়ে গেলেন ন'বৌকে। বার বার মাথার দিব্য দিলেন, মুংলিকে যেন যত্ন করা হয়। বল্লেন—ও গোরু তোমারই হয়ে গেল ন'বৌ, আমায় আশীর্ব্বাদ করো যেন কাশীতে হাড় ক'খানা রাখতে পারি—নাতিদের ঘাড়ের বোঝা যেন নেমে যাই—আমার বড় নাতির ভাবনা কি, তার সচ্ছল অবস্থা, লুচি পরোটা জলখাবার, তেল দিয়ে কলকলে করে পাঁচ ব্যান্নুন রান্না—আমি বুড়ী হয়েচি, ওদের সংসারে সেকেলে মতের লোকের জায়গা আর হয় না এখন—

ঘরের আড়ায় শুকনো নারকোল পাতার আঁটি, পাকাটির বোঝা যোগাড় করা ছিল,

বর্ষায় উনুন ধরানোর কষ্ট বলে সুগৃহিণী ভ্রব ঠাকুরুণ যে-সময়ের-যা' সঞ্চয় করে রাখতেন। কাশীবাস করতে যাচ্ছেন, পেছনটান থাকলে তীর্থবাস হয় না—সে সব দান করে গেলেন কতক ন'ঠাকরুণকে, কতক এ'কে ওকে।

কনক একটা পাকা শসা হাতে এসে বল্লে—শসা খাবে ঠাকুমা ?

—তুই এক বোঝা পাকাটি নিয়ে যা কনকী—ঠাক্‌মাকে মনে রাখবি তো ? হ্যাঁ-রে ?

কনক অনেকখানি ঘাড় নেড়ে বল্লে—হুঁ-উঁ-উ—

ন'ঠাকরুণ চোখের জল ফেললেন যাবার সময়ে।

ভ্রব ঠাকরুণ ট্রেনে কোনো রকমে শুচিতা বজায় রেখে কাশী এসে পৌছলেন। একটা গলির মধ্যে দোতলা একটা বাড়ীর নীচের তলার ঘরে কানুর সেই বন্ধুর মা কাশীবাস করচেন। পাশেই আর একখানা ছোট ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছে ভ্রব ঠাকরুণের জন্যে। অপর বৃদ্ধাটির কাছে চাবি ছিল ঘরের, তিনি চাবি খুলে দিলেন। ভ্রব ঠাকরুণ নিজের জিনিসপত্র নিয়ে সেই ঘরে অধিষ্ঠান হোলেন।

ভ্রব ঠাকরুণ ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সভয়ে আবিষ্কার করলেন, তাঁর প্রতিবেশিনী নদে' জেলার লোক। কথাবার্ত্তার ধরণ ও সুর শহরে ও সম্পূর্ণ মার্জ্জিত। যশোর জেলার মানুষ ভ্রব ঠাকরুণের ভয় পাবারই কথা বটে। তিনি এসে ভ্রব ঠাকরুণের ঘরে ঢুকে বল্লেন—আপনার রান্নাবান্নার ব্যবস্থা কাল থেকে করলেই হবে—আজ আমার ঘরে দুধ আর মিষ্টি আছে, আপনার জন্যে রাখলুম কিনা।

ভ্রব ঠাকরুণ ভয়ে ভয়ে বল্লেন—ও !

প্রতিবেশিনী নিজের ঘর থেকে খাবার এনে বল্লেন—আপনার লোমবস্ত্র বার করুন—

ভ্রব ঠাকরুণ ভালো বুঝতে না পেরে বল্লেন—কি বল্লেন ?

ভ্রব ঠাকরুণের 'বল্লেন' এই কথায় 'ব'-এর উচ্চারণ যশোর জেলার উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী প্রসারিত উচ্চারণ, প্রতিবেশিনী বৃদ্ধার উচ্চারণে এইসব স্থানের উচ্চারণ যতদূর সম্ভব আকুঞ্চিত। 'বল্লেন'-এর উচ্চারণ 'বোল্লেন'—'ও' কার-এর উচ্চারণও যতদূর সম্ভব ঘোরালো।

—বোলচি, লোমবস্ত্র বের করে পরুন, একটু কিছু মুখে দিতে হবে তো ?

লোমবস্ত্র কি জিনিস, পাড়াগাঁয়ের মানুষ ভ্রব ঠাকরুণ কখনো শোনেন নি—তবে জিনিসটা যে বস্ত্রজাতীয় দ্রব্য তা বুঝতে পারলেন, বল্লেন—সে তো আমার নেই !

—লোমবস্ত্র নেই ? আপনি জপ করেন কি পোরে ?

—এই সাদা থান প'রেই জপ করি, আর কোথায় কি পাবো ?

বাড়ীখানা গলির মুখে হ'লেও প্রায় সদর রাস্তার ওপরে। অনেক রাত পর্য্যন্ত গাড়ী-ঘোড়া রাস্তার গোলমাল থামে না। নিরিবিলি বনজঙ্গলের মধ্যে বাড়ীতে একা থাকা ভ্রব ঠাকরুণের চিরদিনের অভ্যাস, এত গোলমালে বড়ই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন তিনি। উঃ, কি মুস্কিলেই পড়া গেল ! নাঃ কাশীর লোক ঘুমোয় কখন ?

কাহ্ন তার পরদিন বন্ধুর হাতে পল্লীবাসিনী পিতামহীকে সমর্পণ করে কর্মস্থানে চলে গেল, তার ছুটি ফুরিয়েচে। বন্ধুর মার নাম নীরজবাসিনী, ব্রব ঠাকরুণের চেয়ে তাঁর বয়স দু'পাঁচ বছর কম হবে, মাথার সব চুল এখনও পাকে নি—তবে সেটা স্বাস্থ্যের গুণেও হতে পারে।

ব্রব ঠাকরুণ এঁর সঙ্গে দশাশ্বমেধ ঘাটে বিকেলে বেড়াতে গেলেন—খুব লোকজনের ভিড়, গান, বক্তৃতা, কথকতা। এক গেরুয়া কাপড় পরা সন্নিসির চারিপাশে খুব ভিড়, নীরজা সেখানে জুটলেন গিয়ে। কর্মবাদ, সেবাধর্ম ইত্যাদি নিয়ে সন্নিসি কি সব কথা বলে যাচ্ছেন, ব্রব ঠাকরুণ অতশত বুঝতে পারলেন না। ফিরবার পথে ব্রব ঠাকরুণ জিজ্ঞেস করলেন—উনি কেডা?

—উনি রামকৃষ্ণ মঠের একজন বড় ইয়ে—স্বামী সেবানন্দ।

—কি মঠ?

—কেন রামকৃষ্ণ মঠের কথা শোনেন নি; ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের—মস্ত বড় কাণ্ড ওঁদের—

—রাম আর কৃষ্ণ দুই ঠাকুরের নাম বুঝি?

নীরজা বিস্ময়ে ব্রব ঠাকরুণের দিকে চেয়ে বল্লেন—আপনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম শোনেন নি?

—না। কে তিনি—কই না—এখানে আছেন?

নীরজা আর কোন কথা বল্লেন না। এমন বর্ব্বরের সঙ্গেও তিনি বেড়াতে বেরিয়েছেন যে রামকৃষ্ণদেবের নাম পর্য্যন্ত জানে না! ব্রব ঠাকরুণের কোনো দোষ নেই, তিনি অজ্ঞ সেকেলে লোক, অজ পল্লীগ্রাম ছেড়ে জীবনে কখনো কোথাও যাননি। গোপীনাথপুরের জঙ্গলে ও-নাম কখনো কারো মুখে শোনেনও নি। তিনি জানেন, রাম, কৃষ্ণ, রাধা, দুর্গা, লোচনপুরের জাগ্রত কালী, কালীঘাটের কালী ইত্যাদি। অতবড় নামের কোনো ঠাকুরের কথা কই—কেউ তো তাঁকে বলে নি।

ব্রব ঠাকরুণ ভয়ে ভয়ে থাকেন। তাঁর সঙ্গিনী তাঁকে নিতান্ত নাস্তিক, অজ্ঞ, মূর্খ বলে না ঠাওরান।

দিন কয়েক যেতে না যেতেই ব্রব ঠাকরুন বুঝে নিলেন সঙ্গিনীটি ধর্ম্মবাতিকগ্রস্তা। সাধু সন্নিসির ভক্ত। যদি কোথাও কোনো নতুন ধরণের সাধু মন্দিরে কি ঘাটে বসে আছে, তবে আর নিস্তার নেই। সেখানে বসে অমনি গরুড়ের মত হাত জোড় করে বক্ বক্ বকুনি জুড়ে দেবে। আর কি-সব কথা জিজ্ঞেস করবে, কর্ম্মফল কি, পুনর্জন্ম কি, হেনো তেনো। রাস্তা-ঘাটে বেরুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, বাসায় ফেরবার নামটি নেই। এত বিরক্ত ধরে ব্রব ঠাকরুণের—কিন্তু তিনি কি করবেন? কাশীর রাস্তা চেনেন না—একাও বাসায় ফিরতে পারেন না সঙ্গিনী না ফিরলে।

একদিন বিশ্বনাথের মন্দিরে সন্ধ্যার আরতি দেখতে গেলেন দুজনেই।

সেখানে এক সন্ন্যাসিনী নাটমন্দিরে বসে আছেন, গেরুয়া কাপড় পরনে, মাথায় জটা, অনেক মেয়েছেলের ভিড় হয়েচে সেখানে। নীরজা তো সাধু সন্ন্যাসী দেখলে সর্ব্বদা একপায়ে খাড়া, চারিপাশের ভক্তের দলে গেল মিশে তাঁকে নিয়ে। ভ্রব ঠাকরুণ শুনতে লাগলেন কেউ জিজ্ঞেস করচে, মাইজি, ঠাকুরের দেখা পাওয়া যায়?

কেউ বলচে—মাইজি, আমার মেয়ের মাদুলি দেবেন তো আজ?

—আজ আমার হাতখানা দয়া করে দেখবেন কি?

নীরজা জিজ্ঞেস করলেন—মাইজি, আমার ভক্তি হচ্চে না কেন?

ভ্রব ঠাকরুণ শুনে মনে মনে হেসে আর বাঁচেন না। সর্ব্বদা সাধুসন্নিসি নিয়েই আছো, এখানে প্রণাম, ওখানে ধন্না, দুঘণ্টা ধরে নাক টেপা—এতেও যদি তোমার ভক্তি না হয়ে থাকে, গঙ্গার জলে ডুবে মরো গিয়ে—ঢং দেখে আর বাঁচি নে! মরণ আর কি!

তারপর সবাই চলে গেল—নীরজা সেই যে সেখানে চোখ বুজে ধ্যান না কি যোগে বসলো আর ওঠে না। ভ্রব ঠাকরুণও কিছু বলতে সাহস পান না। এদিকে তাঁর মনে পড়লো সুজি একদম নেই, সেকথা এতক্ষণ মনে ছিল না, এত রাত হয়ে গেল কোথায় বা সুজি কেনা হবে। রাত্রে একটু মোহনভোগ খাওয়া, তাও আজ ধর্ম্মের ভিড়ে বুঝি বা হয় না।

বসে বসে ভ্রব ঠাকরুণ বিরক্ত হয়ে উঠলেন। মন্দির থেকে বাঙালী মেয়েরা প্রায় সব চলে গিয়েচে, এদেশী লোক যারা হিন্দি মিন্দি বলে, তাদের দলই যাচ্চে আসচে! কি জানি ওদের কথা তিনি কিছুই বুঝতেও পারেন না, বলতেও পারেন না।

আজ মাস তিনেক গ্রাম থেকে এসেচেন। বেশ শীত পড়ে গিয়েচে কাশীতে। মুংলি গোরুটার কথা এত করেও আজকাল মনে পড়চে! শীতের রাত্রে পাছে মুংলির কষ্ট হয় বলে তিনি গোয়ালে আগুন করে রাখতেন। তাঁর গাছটাতে খুব ডুমুর হয়েচে নিশ্চয়, কে জানে একটা গাছ ডুমুর কারা খাচ্চে? কম ডুমুর হয় গাছটাতে! আহা, ন'বৌ কি মুংলিকে অত যত্ন করচে?—তাঁর মত? তিনি যে পেটের মেয়ের মত ওকে···না, তাঁর চোখে জল এসে পড়ে।

আজই এতকাল পড়ে ন' বৌয়ের পত্র এসেচে দেশ থেকে। তাই বেশি করে মনে পড়চে দেশের কথা। ন'বৌ লিখেচে মুংলি ভালো আছে, শীগগির বাছুর হবে। তাঁর বাড়ীর দাওয়ার খুটি না বদলালে নয়। কাহু বা বিন্দেকে যেন চিঠি লেখা হয় সেজন্তে।

নীরজা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধ্যান ভঙ্গ করে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন—দিদি, চলো যাই···সত্যি কি পবিত্র স্থান, না? ইচ্ছে হয় না যে আবার সংসারে ফিরে যাই, রাঁধি খাই।

ভ্রব ঠাকরুণ মনে মনে বল্লেন—মরো-না এখানে শুকিয়ে হত্যে দিয়ে—কে মাথার দিব্যি দিয়েছে রাঁধতে খেতে!

নীরজা বল্লেন—কুম্ভকাসটা অভ্যেস করচি কি না, প্রায় হয়ে এল—

ভ্রবময়ী নীরব। মাসীটা পাগল নাকি? কি সব বলে বোঝাও যায় না। রাত দুপুর

বাজলো, বাবা, এখন বাসায় চল্ দিকি!

বাসায় এলেও কি তাই নিস্তার আছে?

নীরজা ডাকবেন তাঁর ঘর থেকে—ও দিদি, একটু গীতাপাঠ করি শোনো—

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে তাঁকে যেতে হয়। গীতা-টিতা ওসব তিনি বোঝেন না। সুবচনীর ব্রতকথা, সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শিবরাত্রির ব্রতকথা এসব শোনা তাঁর অভ্যাস আছে, বেশ দিব্যি বুঝতেও পারেন—এসব শক্ত শক্ত কথার কি কাওমাও, এক বর্ণও যদি তিনি বোঝেন। আর মাগীর চোখ উল্টে, কান্না কান্না মুখের ভাব করে পড়বার ভঙ্গিই বা কি! দ্রব ঠাকরুণ না পারেন হাসতে, না পারেন হাসি চাপতে! এমন বিপদেও মানুষ পড়ে গা!

নীরজা পড়তে পড়তে বলবেন—আহা-হা! কি চমৎকার।

দ্রব ঠাকরুণ বসে ঢুলতে ঢুলতে ভাববেন—থামলে যে বাঁচি—

সকালে উঠে নীরজা বল্লেন—আজ আমার গুরুদেব আসবেন, দিদি দু'খানা লুচি ভেজে দিও তো আমার ঘরে বসে।

বেলা দুটোর সময় এক সন্নিসি এসে হাজির। বেশ মোটা ভুঁড়িওয়ালা, এই লম্বা দাড়ি। নীরজা সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে দু'বার মাথা ঠুকলেন গুরুদেবের পাদপদ্মে। আহারাদির যোগাড় করতেই কাটলো সারাদিন—তিনসের দুধ মেরে একসের হ'ল, ঘরে রাবড়ি মালাই তৈরি হ'ল। লুচি ভাজা হ'ল। সন্ধ্যার সময় নীরজা বসলেন গুরুর কাছে কি সব ক্রিয়া শিখতে। আসন না মাথামুণ্ডু তাই শিখতে। যত বা এ বকে, তত বা ও বকে। মনে হ'ল বুঝি কানের পোকা সব বেরিয়ে যায়।

গুরুদেব বাঙালী। রাত ন'টার পরে দ্রব ঠাকরুণকে ডাক দিলেন।

বল্লেন—তোমার বাড়ী কোথায়?

—গোপীনাথপুর, যশোর জেলা—

—কে আছে বাড়ীতে?

—নাতিরা আছে, তাদের ছেলে বৌ আছে।

—তুমি কাশীবাস করতে এসেচ?

—হ্যাঁ।

—নাম কি?

দ্রবময়ী দেব্যা—

—দীক্ষা হয়েচে?

—না।

নীরজা চোখ কপালে তুলে বল্লেন—কি সর্ব্বনাশ! দীক্ষা হয়নি এতদিন? তা তো জানতাম না?

গুরুদেব বল্লেন—দীক্ষা নিতে হবে মা তোমাকে।

—আমার পয়সা নেই, দীক্ষা নিতে গেলে খরচ আছে। নাতিরা এগারো টাকা করে

মাসে পাঠায়—তার মধ্যে ঘর ভাড়া, তার মধ্যে খাওয়া। পয়সা পাই কোথায়?

—দীক্ষা না নিলে কাশীবাসে ফল কি মা?

—ফলের জন্যে তো আসিনি, শরীরটা সারাতে এসেছিলাম।

নীরজা রাগের সুরে বল্লেন—শরীর আগে না পরকাল আগে?

ধ্রুব ঠাকরুণ চুপ করে রইলেন।

গুরুদেব বল্লেন—নীরজা-মার কথার উত্তর দাও—চুপ করে থাকলে হবে না।

নীরজা বল্লেন—গীতায় ভক্তিযোগ সেদিন পড়ছিলাম, শুনলে তো দিদি? কর্মের চেয়েও ভক্তি বড়, স্বয়ং ভগবান বলচেন—

আঃ কি বিপদ! মাগীর সব সময়েই কি আবোল-তাবোল বকুনি?

মুখে বল্লেন—আমি তো কিছু বুঝি নে, আপনারা যা বলেন। তবে এবার কিছু হবে না। নাতি সাতটাকা পাঠিয়েছিল, তা ঘর ভাড়াতেই গিয়েচে। হাতে টাকা না থাকলি—

তবুও দু'জনই নাছোড়বান্দা। দীক্ষা নিতেই হবে।

গুরুদেব বল্লেন—কাশীবাস করচো মা, তোমার যথেষ্ট বয়েস হয়েচে। গুরুদীক্ষা না নিলে যে সবই মাটি। আজ আছ, কাল নেই। পৃথিবী কিছুই না—ইহকাল কিছুই না—

নীরজা বল্লেন—গুরুর মুখেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ইহকালেও তিনি, পরকালেও তিনি—

ধ্রুব ঠাকরুণ মনে মনে বল্লেন—আ মরণ মাগীর! তবে গোঁসাইয়ের কোথায় যাবে মেয়েদের! ঢং ভাখো না—! যাই হ'ক, বহু তর্ক করেও ঠাকরুণকে দ্রব করা গেল না। নাম দ্রবময়ী হ'লে কি হবে, ভেতরে বেজায় শক্ত। নীরজা অবিশ্যি তাঁর জ্ঞান বুদ্ধি মতে একজন সত্তর বছরের মৃত্যুপথযাত্রিণীর ভালো করবারই যথেষ্ট চেষ্টা করছিলেন, সে রাজী না হ'লে তিনি আর কি করবেন?

নীরজার ভক্তি—হ্যাঁ, সে দেখবার মত একটা জিনিস বটে। গুরুর পাদোদক পান না করে তিনি দাঁতে তৃণ কাটবেন না। গুরুর বাক্য বেদবাক্যের চেয়েও মূল্যবান তাঁর কাছে। পুরোনো একছড়া সোনার হার ছিল; সেটা বিক্রি করে এসে টাকা তুলে দিলেন গুরুদেবের হাতে।

কথাটা শুনে দ্রব ঠাকরুণ জিজ্ঞেস করলেন—অতগুলো টাকা দিয়ে দিলে গুরুদেবকে?

—টাকা সার্থক হ'ল, দিদি—

—তোমার নিজের হার?

—ও আমার বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ী থেকে দিয়েছিল—তিনি হাতে করে দিয়েছিলেন—

—সেই হার তুমি দিয়ে দিলে বেচে?

—দিদি, সংসার অনিত্য, সবই অনিত্য। কে কার স্বামী, কে কার স্ত্রী? সবই ভগবানের মায়া। মায়ায় সব ভুলে থাকা—গুরুই কেবল নিত্য বস্তু—

—তা তো বটে।

এ মাগীর মুখে সব সময় বড় বড় কথা। দিগে যা তোর সব কিছু গুরুর পাদপদ্মে বিলিয়ে, —তাঁর কি? বিয়ের পরে স্বামী নিজের হাতে যে হারছড়া দিয়েছিল, তা কোনো মেয়েমানুষ এভাবে ঘুচিয়ে দিতে পারে? গভীর রাত পর্যন্ত শুধু এই কথাটিই বার বার তাঁর মনে পড়ে। সে সব দিন ঝাপসা হয়ে গিয়েচে, মনের আকাশ বিস্মৃতির মেঘে ঢাকা। ওই গোপীনাথপুরের ভিটে অমন ছিল কি তখন? ফুলশয্যার রাত।

হঠাৎ মনে পড়ে যায়, গত আষাঢ় মাসের প্রথমে উত্তর দিকের ভাঙা পাঁচিলের গায়ে এতটুকু একটা শসাগাছ নতুন বর্ষার জল পেয়ে গজিয়েচে দেখে তিনি শুকনো কঞ্চি কুড়িয়ে একটা মাচা বেঁধে দিয়েছিলেন—এতদিনে গাছ বড় হয়েচে, কত শসার জালি পড়েচে গাছটাতে। কে খাচ্চে সে বনের মধ্যে? হয়তো কনকী আসে লেবু তুলতে—এক গাছ লেবু রেখে এসেছিলেন। সে-ই হয়তো শসা পেড়ে নিয়ে যায়—কে জানে?

হঠাৎ কি একটা কুস্বরে ব্রব ঠাকরুণ চমকে ওঠেন। নীরজার ঘর থেকে শব্দটা আসচে।

মাগী এত রাত্রে করে কি? হস্ হস্ করে অত জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলচে কেন? ঘুমের ঘোরে মুখ-চাপা লাগলো নাকি?

ব্রব ঠাকরুণ ডাকলেন—শুনচো—ওগো—কি হয়েচে? ওগো—

নীরজা বল্লেন—ডাকচেন কেন দিদি?

—বলি ও শব্দ কিসের?

—কুম্ভকের রেচক-পূরক অভ্যেস করচি—অনেক রাত ভিন্ন হয় না কিনা,—ঠাকুর তাই বলে গেলেন।

সে আবার কি রে বাবা! মাগী তো ঘুমুতেও চায় না রাত্তিরে?

ব্রব ঠাকরুণ বল্লেন—যাক গে—ঘুমের ঘোরে মুখ-চাপা হয় নি তো?

—না দিদি—ঘুমুইনি এখনও। ঘুমুলে যোগের ক্রিয়া হয় না। জীবনটা যদি ঘুমিয়েই কাটাবো, তবে পরকালের কাজ করবো কখন?

—তা বেশ, বেশ।

—দিদি—ঘুমুলেন?

—না, কেন?

—নির্ব্বিকল্প সমাধি না হওয়া পর্য্যন্ত আমার মনে শান্তি পাচ্চি নে, পাবোও না। দেহ কি জন্যে দিদি? ঘুমুবার জন্যে নয়। আরামের জন্যে নয়—শুধু নিজের কাজ করে যাওয়ার জন্যে। দিন কিনে নাও, শুধু দিন কিনে নাও—।

ব্রব ঠাকরুণের পিত্তি জ্বলে গেল। কিনগে যা দিন মাগী, যদি তোর পয়সা থাকে! রাত্তিরে একটু ঘুমুতে দে অন্তত।

শীতকাল এসে গেল। কাহ্নু বড়দিনের ছুটিতে একবার কাশী এসে পিতামহীর সঙ্গে দেখা করে গেল।

ব্রব ঠাকরুণ তাকে বল্লেন—কানু ভাই, অন্ত একটা বাসা পাওয়া যায় না?

কানু বিস্মিত হয়ে বল্লে—কেন এখানে কি হ'ল! সত্যর মা রয়েচেন, এই তো সব চেয়ে ভালো—

—ও মাগী পাগল।

—পাগল! সে কি!

—না বাবু, বেজায় ধর্ম্মিষ্টি। অত ধর্ম্মিষ্টি আমার পোষাবে না। আমাকে তুই সরিয়ে নিয়ে যা—

কানু কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলে। ঠাকুরমার যেমন কাণ্ড।

বল্লে—আচ্ছা ঠাকুমা, শেষবয়েসে কাশীবাস করতে এলে—না হয় তুমিও হও একটু ধর্ম্মিষ্টি! হ্যাঁ, উনি ওই রকমই বটে। সত্য বলছিল, মা কিছুতেই দেশে থাকতে চান না। এই গত বোশেখ মাসে সত্যর ছোট ভাইয়ের বিয়ে গেল, ওঁর ছোট ছেলের—ওঁকে কত চিঠিপত্তর, কত অনুরোধ—কিছুতেই গেলেন না। বল্লেন, যে মায়া একবার কাটিয়েচেন, তাতে আর জড়িয়ে পড়তে চান না। ছোট ছেলে টেলিগ্রাম পর্য্যন্ত করলে, কোনো ফল হ'ল না।

ব্রব ঠাকরুণ অবাক হয়ে বল্লেন—বলিস কি রে কানু, সত্যি?

—মিথ্যে বলচি তোমার কাছে ঠাকুমা?

—আমায় এখান থেকে তুই সরিয়ে দে ভাই।

—ছিঃ—আচ্ছা, তুমি অত নাস্তিক কেন ঠাকুমা? ওঁর সঙ্গে থেকে একটু ধর্ম্ম শেখো না, চিরকালই বিষয় আর সংসার নিয়েই তো কাটালে।

—হাঁপ লেগে মরে যাবো যে এখানে থাকলে—

—আবার ওই সব নাস্তিকের মত কথাবার্ত্তা—ঠাকুমা তুমি কি?

শীত কেটে গ্রীষ্ম এল, চলেও গেল। আবার আষাঢ় মাসের প্রথম। দেশের খবর নেই অনেকদিন। ন'ঠাকরুণের চিঠি আগে আগে আসতো—গত তিন চার মাস তাও বন্ধ কথায় কথায় একদিন নীরজাকে কথাটা বলেই ফেল্লেন।

—দেশে কে আছে আপনার? শুনেচি সেখানে থাকে না কেউ?

—বাড়ীটা, গাছটা পালাটা—

—দিদি, এখনও ঐ সবের মায়া? বিশ্বনাথের পাদপদ্মে মন সমর্পণ করুন সব বন্ধন ঘুচে যাবে। কেউ কিছু নয়, কিছু নয়—একমাত্র তিনিই সত্যি। বলে নীরজা চোখ কপালে তুলে ওপরের দিকে চেয়ে রইলেন। ব্রব ঠাকরুণ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—ওই যাঃ, দাঁড়াও, কড়ার দুধটুকু বুঝি বেড়ালে খেয়ে গেল! নাঃ বেড়ালের জ্বালায়—যত বা বেড়াল, তত বা বাঁদর। অমন গামছাখানা সেদিন—

—দিদি, আজ আমার সঙ্গে চলুন, কেদার ঘাটে কাশীখণ্ডের ব্যাখ্যা করবেন উপীন কথক।

শোনবার জিনিস। কাশীতে এসে কাশীখণ্ড শুনতে হয়—

—আমার শরীর ভালো না, আজ থাক্, তুমি যাও—

নীরজা নাছোড়বান্দা, অবশেষে নিয়ে গেলেন ত্রব ঠাকরুণকে। কেদার ঘাটে এর আগেও দু'তিন বার ত্রব গিয়েচেন সত্যর মার সঙ্গেই। ওপরের রানার চওড়া চাতালের একপাশে ফর্সা রোগামত কথক ঠাকুর কথকতা সুরু করেচেন—তাঁকে ঘিরে বাঙালী মেয়ে-পুরুষের ভিড়। পুরুষের চেয়ে মেয়ে অনেক বেশি।

সত্যর মা জিজ্ঞেস করলেন—দিদি, প্রণামী কিছু এনেচেন তো?

—তা তো বল্লে না—আনিনি—

—আট আনার কম দেওয়া যায় না। আচ্ছা, আপনারটা আমি দিয়ে দেব এখন—

—আমার আট আনা না দিয়ে চার আনা বরং দাও। নাতিরা ক'টাকা বা পাঠায়?

—এখানে যা দেবেন দিদি, পরকালে তোলা রইল—

বর্ষার গঙ্গায় ঢল নেমেচে। কেদার ঘাটের সামনের নদীতে কাদের বড় একটা বজরা ভেসে চলেছে, দু'তিনখানা পান্সিতে সুসজ্জিতা নরনারী নদীভ্রমণে বার হয়েচে। রামনগরের দিকে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে—উঁচু বাড়ীর ছাদের কার্নিসে তরল সোনার মত ঝিলমিল করচে রাঙা রোদ। কথক ঠাকুর সুকণ্ঠে গান ধরেচেন, কাশী সকল তীর্থের সার, মৃত্যুর সময় মণিকর্ণিকার ঘাটে স্বয়ং বিশ্বনাথ কানে মন্ত্র দেন—মানুষের শিবলোকপ্রাপ্তি ঘটে—এই হ'ল গানের অর্থ।

ত্রব ঠাকরুণের মন অজ্ঞাতে অনেকদূরে চলে গেল। তার খয়েরখাগী গাছে কত কাঁঠাল হয়েচে এই আষাঢ় মাসে, বড্ড কাঁঠাল ধরে গাছটাতে, শেকড়ে পর্য্যন্ত কাঁঠাল। তিনটে আম গাছে আমও নিশ্চয়ই খুব ধরেছিল—নাতিরা কি গিয়েচে আম খেতে? তাদের সেদিকে দৃষ্টি নেই। বারোভূতে লুটে খাচ্চে।

রাত্রি নামলো। নীরজা বল্লে—চলুন দিদি—

ত্রব ঠাকরুণ লক্ষ্য করেচেন সমস্ত সময় নীরজা মাগী ফোঁস ফোঁস করে কেঁদেচে। আর কেবল বলেচে—আহা-হা-হা!

যদি এ মাগীর সঙ্গ ছাড়তে পারতেন!—কিন্তু তা হবার নয়, কাহু শুনবে না।

বাসায় এসে নীরজা দেখলেন তাঁর সঙ্গিনীর মন বড় খারাপ—অন্যমনস্ক ভাব, বিশেষ কোন কথা বলে না।

কাশীখণ্ড শুনে আজ তা হলে খুব ভালো লেগেচে বোধ হয়। পাষাণ বুঝি গলেচে।

নীরজা বল্লেন—কি ভাবচেন দিদি?

—একটা-গাছ কাঁঠাল দেশে। খয়েরখাগীর কাঁঠাল, সে তুমি কখনো খাওনি—খেলে বুঝতে।

—দিদি, এখনও আপনার মায়ার বন্ধন গেল না? আপনার তো দু'টো একটা গাছ, আমার তিনটে বড় বাগান—কলমের বোম্বাই, মালদ' ফজলি—মায় ল্যাংড়া পর্য্যন্ত। আমি

তো ফিরেও চাইনি ওসব দিকে। ছেলেরা কাঁদে, বলে, এখন কি কাশীবাস করবার সময় হয়েচে তোমার? আমি বলি, না, সংসারের মায়ায় আর না। গানে বলে—কেবা কার পর, কে কার আপন; (এই মরেচে, মাগী আবার শুরু করেচে!) কালশয্যা পরে মোহতন্দ্রা ঘোরে, দেখে পরস্পরে অসার আশার স্বপন।

—তা আমি বলি—এতকাল তো সংসারের বন্ধনে ঘুরে আশার স্বপন অনেক দেখলুম। এইবার পরকালের কথা ভাবি। আর আমার এই যে গুরুদেব, উনি দেহধারী মুক্ত পুরুষ—ওঁর কৃপায়—(নীরজা উদ্দেশে প্রণাম করলেন।)

দ্রব ঠাকরুণ মুখে বল্লেন—তা তো বটেই—

—চলুন দিদি কাল বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে সেই মাইজির কাছে আপনাকে নিয়ে যাই—আপনার বয়স আমার চেয়ে বেশি, আপনার এখন উচিত গুরুমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে সব বন্ধন মুক্ত হয়ে একমনে কাশীবাস করা। আমাদের আর ক'দিন দিদি? শমন তো দোরে দাঁড়িয়ে—সব রকম তো দেখলুম শুনলুম।

দ্রব ঠাকরুণ মনে মনে বল্লেন—তোমার মুণ্ডু করলুম, মাগীর কথার আবার ধরণ শোনো-না, ভাটপাড়ার ভট্‌চাজ্জি এসেচেন! মুখে বল্লেন—মুংলি বলে একটা গাই গোরু ছিল আমার—বড্ড ন্যাওটো। যেখানে যাবো, সেখানে যাবে। আমার হাতে না খেলে তার পেট ভরতো না। এই বেশ কচি কচি বাঁশপাতা এনে মুখে দেতাম তুলি আর—

—আঃ, আবার ওই সব কথা আপনার মুখে! জড়ভরতের কথা জানেন তো? অত বড় জ্ঞানী—পূর্ব্ব জন্মের এক হরিণের মায়ায় তাঁর সব গেল। ভগবানের চিন্তা করুন—ভগবানের চিন্তা করুন—সব মিথ্যে। সব মিথ্যে।

দ্রব ঠাকরুণ কোন কথা বল্লেন না। তাঁর ওর কথা একেবারেই ভাল লাগে না। মাগী যেন কি! কি বলে, কি করে! মাগী এমন পাষাণ যে, ছোট ছেলের বিয়েতে বাড়ী গেল না। মুখ দেখতে আছে ওর? ছিঃ—

সারারাত্রি স্বপ্নের ঘোরে দেখলেন তাঁর গোপীনাথপুরের ভিটেতে চালাঘরের ছাঁচতলায় ম্লান মুখে ছলছল চোখে তাঁর মুংলি দাঁড়িয়ে রয়েচে—ন'বৌ তাকে যত্ন করচে না, বুড়ী হয়েচে মুংলি, তেমন দুধ ত আর দিতে পারে না—মুংলিকে তিনি তার মায়ের পেট থেকে টেনে বার করে এতকাল নিজের মেয়ের মত পুষেছিলেন—তিনি নেই, কে ওকে দেখে? কাঁঠাল হয়েচে বটে খয়েরখাগী গাছটাতে! এত কাঁঠাল তিন চার বছরের মধ্যে হয়নি। তিনি নাইতে যাচ্চেন নদীতে, মুখুজ্যে-গিন্নি বলচে—হ্যাঁ খুড়ী মা, এবার তোমার গাছে কী কাঁঠাল ধরেচে! তা আমায় একটা দিও, তোমার নাতিদের খেতে দেবো—

খড় উড়ে উড়ে পড়চে বাড়ীর চাল থেকে। কানু বা বিন্দে দেশে যায়নি, ঘরও সারায়নি। এবার বর্ষায় কি টিকবে চালে খুঁচি না দিলে?

কনক বলচে—অ ঠাকুমা, একটা নেবু দেবো? আমার মার অরুচি হয়েচে কিছু খেতি পারে না—

সকালে উঠে নীরজা নিজেই গঙ্গাস্নান করে এসে স্বপাক হবিষ্যান্ন চড়িয়েচেন এবং প্রতিদিনের অভ্যাসমত ইষ্টমন্ত্র জপ শেষ করে গাল-বাদ্য সহকারে শিবপূজা করচেন। ভ্রব ঠাকরুণের একটু বেলা হয়েচে আজ উঠতে। মনও খুব ভার। তাঁর আপনার জন পড়ে রইল—তাঁর মুংলি, তাঁর খয়েরখাগী গাছটা, তাঁর ডুমুর গাছ—আর তিনি কোথায়! আর এই মাগীর জ্বালায়···

নীরজার গাল-বাদ্য থামলো। ভ্রব ঠাকরুণকে বল্লেন—আজ বড় সুখবর পেলুম দিদি—গঙ্গাস্নানে গিয়ে গুপ্তিপাড়ার সইয়ের সঙ্গে দেখা—সেও আমার মত কাশীবাস করচে—বাঙালীটোলায় থাকে, বল্লে, গুরুদেব আসচেন সামনের সোমবারে। হরিদ্বার থেকে ফেরবার পথে আমার এখানে পায়ের ধুলো দিয়ে তবে যাবেন! সইও একই গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েচে কিনা। আজ বড় শুভদিন আমার। গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করেই বেঁচে আছি, এবার এলে আপনাকে দীক্ষা নিতেই হবে দিদি, আমি ছাড়বো না। গুরুদীক্ষা না হ'লে দেহ পবিত্র হয় না, ভবসাগর পার হ'তে হ'লে গুরুর চরণরূপ ভেলা চাই আগে—নইলে হাবুডুবু খেয়ে মরতে হবে যে দিদি?

ভ্রব ঠাকরুণ বল্লেন—তা তো ঠিক, তা তো ঠিক—

গুরুদেবের আগমনের পূর্ব্বেই শনিবার সকালের গাড়ীতে কানু এসে হাজির হ'ল। ভ্রব ঠাকরুণ নাতির কাছে কেঁদে পড়লেন—তুই আমায় গুপীনাথপুরে নিয়ে চল্ ভাই, আমার আর কাশীবাসে কাজ নেই—বাবা বিশ্বনাথ মাথায় থাকুন। ও মাগীর কাছে আর ছ'মাস থাকলে আমি পাগল হয়ে যাবো।

ফলে সোমবার কাশীতে গুরুদেবের শুভাগমনের দিন দুপুরের ট্রেনে ভ্রব ঠাকরুণ দেশের ইষ্টিশনে তাঁর বোঁচকা-তোরঙ্গ নিয়ে নাতির সঙ্গে এসে নামলেন।

ন'ঠাকরুণ শুনে ছুটে এলেন—ও দিদি—দিদি—

—হ্যাঁ ন'বৌ—আমার মুংলি ভালো আছে?

—ভালো নেই দিদি! ওঠে না, খায় না—তোমার যাওয়ার পর থেকেই, গোয়ালে শুয়েই থাকে।

—সে আমার মন বলেচে ভাই, তুমি কি বলবে। তাকে রাত্তিরে স্বপ্ন দেখেই তো আর টিকতে পারলাম না, চলে অ্যালাম। কানুকে বল্লাম, নিয়ে চল্ ভাই গুপীনাথপুর, মাথায় থাকুন বাবা বিশ্বনাথ—মুংলি কোথায়? ওকে কচি বাঁশপাতা খাওয়াবো নিজের হাতে, স্বপ্ন দেখিচি।

একটু পরে ন'ঠাকরুণ দড়া ধরে মুংলিকে নিয়ে এলেন। সত্যিই তার সে চেহারা নেই। সব কাজ ফেলে ভ্রব ঠাকরুণ ছুটে গিয়ে তার গায়ে-মুখে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন। মুংলির চোখে জল পড়ে, তাঁরও চোখে জল পড়ে।

ন'ঠাকরুণ বল্লেন—আর-জন্মে ও তোমার মেয়ে ছিল দিদি—আর-জন্মের মায়ার বাঁধন—

—রক্ষে করো ন'বৌ—তুমিও বড় বড় কথা বলতে শুরু করলে নাকি, সেই মাগীর মত? মুংলি এ জন্মেই আমার মেয়ে—আর জন্ম-টন্ম ছেড়ে দাও।

—কে মাগী, কার কথা বলচো—

—সে বলবো এখন সব। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি দেশে এসে—বাবাঃ—

কান্থ হেসে বল্লে—নাঃ, ঠাকুমাকে নিয়ে আর পারা গেল না—এমন নাস্তিক—কাশীপ্রাপ্তি অদৃষ্টে থাকলে তো?

—তুই ভাই বল্, ন'বৌ বলো—আমার এই ভিটেতেই যেন তোদের কোলে শুয়ে সকলের কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে যেতে পারি।. কাশী পেরাপ্তিতে দরকার নেই—এই ভিটেই আমার গয়া কাশী। তিনি এই উঠোনের মৃত্তিকেতে শুয়েছিলেন ওই তুলসীতলায়—আমাকেও তোরা ওখানে—

আঁচলের খুঁট দিয়ে ব্রব ঠাকরুণ চোখের জল মুছলেন।

বেলা যায় যায়—আষাঢ়ান্ত সুদীর্ঘ দিনমানের শেষে সূর্য্য চলে পড়েচে পশ্চিম দিকের নিবিড় বাঁশবনের আড়ালে। ঘেঁটকোল ফুল কোথাও জঙ্গলে ফুটেচে, বাতাসে তার কটু উগ্র গন্ধ। ব্রব ঠাকরুণের মন শান্তিতে, আনন্দে, উৎসাহে পূর্ণ হয়ে গেল। এগারো বছরের নববধূ এই বাড়ীর উঠানে পা দিয়েছিলেন, এখন তাঁর বয়েস তিন কুড়ি ছয়।

কনক হাসিমুখে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে—ঠাকুমা ভালো আছেন? এয়েচেন শুনে ছুটে দেখতে আলাম—আমাদের কথা মনে ছিল?

ক্যান্ভাসার কৃষ্ণলাল

চাকুরী গেল। এত করিয়াও কৃষ্ণলাল চাকুরী রাখিতে পারিল না। সকাল হইতে রাত দশটা পর্যন্ত (ডাউন খুলনা প্যাসেঞ্জার, ১০-৪৫ কলিকাতা টাইম) টিনের সুটকেস্ হাতে শিয়ালদ' হইতে বারাসত এবং বারাসত হইতে শিয়ালদ' পর্যন্ত 'তাঁতের মাকু'র মত যাতায়াত করিয়া ও ক্রমাগত "দত্তপুকুরের বাতের তেল, দত্তপুকুরের বাতের তেল—বাত, বেদনা, ফুলো, কাটা ঘা, পোড়া ঘা, দাঁত কনকনানি, এক কথায় যত রকম ব্যথা, শূলানি, কামড়ানো আছে সব এক নিমেষে চলে যাবে—আজ চব্বিশ বছর এই লাইনে ওষুধটি প্রত্যেক ভদ্রলোক ব্যবহার করচেন, সকলেই এর গুণ জানেন—" বলিয়া চিৎকার করিয়াও চাকুরী রাখা গেল না।

সেদিন বসু মহাশয় (ইণ্ডিয়ান ড্রাগ সিণ্ডিকেটের মালিক নৃত্যগোপাল বসু) কৃষ্ণলালকে ডাক দিয়া বলিলেন—পাল মশায়, কাল রাত্রের ক্যাশ জমা দেন নি কেন?

—আজ্ঞে, আজ্ঞে—অনেক রাত হয়ে গেল—খুলনার ট্রেন—প্রায় বিশ মিনিট লেট্।

—দেখুন, আগেও আমি অন্তত সতেরো বার আপনাকে সাবধান করে দিয়েচি। খুলনা ট্রেন দশটা, এক্কুশে স্টেশনে আসে। আমি সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত অফিসে বসে ছিলাম শুধু

আপনার জন্যে। নিতাই দুবার স্টেশনে দেখে এল ট্রেন রাইট-টাইমে এসেচে। লেট এক মিনিটও ছিল না—

—আজ্ঞে বড়বাবু, শরীরটা কাল বড়ই—

—ও আপনার পুরানো কথা। ও কথা আর শুনবো না আজ। যাক, ক্যাশ এনেচেন এখন ?

কৃষ্ণলাল অপরাধীর মত বড়বাবুর মুখের দিকে চাহিল। বলিল—ক্যাশটা আনিগে যাই—না—একটু মুশকিল হয়েচে, আচ্ছা আসি—

—যান আসুন—

কৃষ্ণলাল তবুও দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া নৃত্যগোপালবাবু বলিলেন—কি হ'ল !

—আজ্ঞে ওবেলা দেবো ওটা। বাসায় এনে রেখেছিলাম, চাবি দিয়ে বেরিয়ে গিয়েচে, আমি যার সঙ্গে থাকি।

—আপনি কোথায় গিয়েছিলেন ?

—একটু বেড়াতে বার হয়েছিলাম ওই গোলদীঘির দিকে—

—সব বাজে কথা। আমি বিশ্বাস করিনে। কেন করিনে তাও আপনি জানেন। রাত দশটার পরেই ক্যাশ এনে দেওয়ার কথা।—আপনি বুড়ো হয়ে গেলেন এই ক্যানভাসারের কাজ ক'রে। জানেন না যে ক্যাশ তখুনি জমা দেওয়ার নিয়ম আছে ?

—আজ্ঞে, আজ্ঞে—

—এ রকম আরও কতবার হয়েচে বলুন দিকি ? আপনার কথার ওপর বিশ্বাস করা যায় না আর। বড়ই দুঃখের কথা। আপনি আমাদের পুরানো ক্যানভাসার ব'লে আপনার অনেক দোষ সহ্য করেচি আমরা। কিন্তু এবার আর নয়। আপনি এ মাসের এই ক'দিনের মাইনে নিয়ে যাবেন আপিস খুললে—কমিশনের হিসেবটাও সেই সঙ্গে দেবেন। যান এখন।

অবশ্য এত সহজে কৃষ্ণলাল যাইতে রাজি হয় নাই—নৃত্যগোপালবাবুকে সে যথেষ্টই বলিয়াছিল, নিত্যগোপালবাবুর বুড়োকর্ত্তাকে গিয়া পর্য্যন্ত ধরিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত কিছুই হইল না। মুশকিল এই, চাকুরী যখন যাইবার হয়, তখন তাহাকে কিছুতেই ধরিয়া রাখা যায় না। মৃত্যুপথযাত্রী মানবের মতই তার গতিপথ নির্মম, ধরাবাঁধা !

সুতরাং চাকুরী গেল।

তখন বেলা আড়াইটা। সকাল হইতে ইহাকে উহাকে ধরাধরির ব্যাপারেই এতক্ষণ সময় কাটিয়াছে। স্নান-আহার হয় নাই।

২৫।২ রামনারায়ণ মিত্রের লেনে ঢুকিয়াই যে টিনের চালওয়ালা লম্বা দোতলা মাটির ঘর, অর্থাৎ যে মাঠকোঠার ঠিক সামনেই আজকাল কর্পোরেশনের সাধারণ স্নানাগার নির্মিত হইয়াছে—তারই পশ্চিম কোণে সতেরো নম্বর ঘরে আজ প্রায় এগারো বছর ধরিয়া কৃষ্ণলালের বাসা।

কৃষ্ণলাল ঘরে একা থাকে না। ছোট্টঘরে তিনটি ময়লা বিছানা মেজের উপর পাতা। সে ঢুকিয়া দেখিল ঘরে কেবল যতীন শুইয়া ঘুমাইতেছে। আর একজন কমমেট্ ট্রামের কণ্ডাক্টার, সাড়ে চারটার পরে সে ডিউটি হইতে ছুটি লইয়া একবার আধঘণ্টার জন্য বাসায় আসে এবং তারপরই সাজিয়া-গুজিয়া কোথায় বাহির হইয়া যায়।

নীচে পাইস্ হোটেলে ইহাদের খাইবার বন্দোবস্ত।

কৃষ্ণলালের সাড়া পাইয়া যতীনের ঘুম ভাঙিয়া গেল।

সে বলিল—এত বেলায় ?

—বেলায় তা কি হবে ? চাকরীটা গেল আজ।

—সে কি ! এতদিনের চাকরীটা—

—কত করে বল্লুম বড়বাবুকে। তা শোনে কি কেউ ? গরীবের কথা কে রাখে বলো !

—হয়েছিল কি ?

—ক্যাশ জমা দিতে দেরি হয়েছিল। বলে, তুমি ক্যাশ ভেঙেচ।

—তাই তো···তাহোলে এখন উপায় !

—দেখি কোথাও আবার চেষ্টা—জুটে যাবে একটা না একটা। আমাদের এক দোর বন্ধ হাজার দোর খোলা—আমাদের অন্ন মারে কে।

সামান্য কিছু পয়সা হাতে ছিল—পাইস্ হোটেল হইতে শুধু ডাল-ভাত খাইয়া আসিয়া কৃষ্ণলাল কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিল, পরে নবীন কুণ্ডু লেনে একটি খোলার বাড়ীতে ঢুকিয়া ডাক দিল—ও গোলাপী—গোলাপী—

তাহার সাড়ায় যে বাহির হইয়া আসিল, সে বর্ত্তমানে রূপযৌবনহীনা প্রৌঢ়া, পরনে আধ ময়লা খয়েরী রংয়ের শাড়ী, হাতে গাছকয়েক কাঁচের চুড়ি। দু-গাছা সোনাবাঁধানো পেটি। মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে, গায়ের রং এখনও বেশ ফর্সা।

গোলাপীকে ত্রিশ বছর আগে দেখিলে ঠিক বোঝা যাইত গোলাপী কি ছিল। এখন আর তাহার কি আছে ? কৃষ্ণলাল তখন সবে ঔষধের ক্যানভাসারের পদে বহাল হইয়াছে—তাহার চমৎকার চেহারা ও কথাবার্ত্তা বলিবার ভঙ্গিতে রেলগাড়ীর প্যাসেঞ্জার কি করিয়া সহজেই ভুলিয়া যাইত—জলের মত পয়সা আসিতে লাগিল।

এই নবীন কুণ্ডু লেনেই অন্য এক বাড়ীতে এক বন্ধুর সহিত আসিয়া সে গোলাপীকে দেখে। তখন নতুন যৌবন, হাতেও কাঁচা পয়সা। গোলাপীর বয়স তখন ষোলো সতেরো; রূপ দেখিয়া রাস্তার লোক চমকিয়া দাঁড়াইয়া যায়। গোলাপীর মার হাতে বছরে বছরে মোটা টাকা জমে। কৃষ্ণলাল সেই হইতেই নবীন কুণ্ডু লেনের নৈশ অধিবাসী। কত কালের কথা।—গোলাপীর ঘরে মেহগ্‌নি কাঠের দেরাজ হইল, ঘরের দেওয়ালে বিলম্বিত বড় বিলাতি কাচ বুসানো আয়না হইল, সেকালে প্রচলিত ম্যাকাসার অয়েলের শিশির পর শিশি ভিড় জমাইয়া তুলিল—বাতায়ন মালতী ফুলের টবে সজ্জিত হইয়া বাড়ীর অন্যান্য ঘরের অধিবাসীদের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করিল।

কাঁচা পয়সা কৃষ্ণলালের হাতে। প্রতিদিনের আয় তিন টাকা, আড়াই টাকার নীচে নয়।

একদিন গোলাপীর মা অভিমানের সুরে বলিল—যাই বলো বাপু, গোলাপী আমায় প্রায়ই বলে, একখানা বাড়ী তার নিজের না হ'লে চলে না আর তো তেমন কপাল কি—এই এক বাড়ীতে ছত্রিশ জনার সঙ্গে—

—কেন মা? তার ভাবনা কি? কালই ঘর দেখে দিচ্চি—

—কত টাকা ভাড়ার মধ্যে হবে বলো—এই আমাদের পাড়াতেই আছে—

—যা তুমি বলবে। কুড়ি কি পঁচিশ—

—ত্রিশ টাকায় একখানা ভালো বাড়ী এ পাড়াতেই আছে—তাহ'লে তাই না হয়—

—হ্যাঁ হ্যাঁ—এ আবার আমায় জিজ্ঞেস করতে হয় মা?

গোলাপীরা নতুন বাড়ীতে উঠিয়া আসিল। বড় পাঁচী বলিল—ওলো, একটু রয়ে সয়ে নিস—দেখিস যেন আবার দড়ি না ছেঁড়ে—খুব বরাত তোর যাহোক গোলাপী। আর আমাদের ওই বুড়ো রায় বাবু রোজ আসেন আর বাঁধানো দাঁত জলের গেলাসে খুলে রাখেন—ক'দিন বল্লাম একখানা ঢাকাই শাড়ী, আর একটা বাজা-ঘড়ি দাও দেওয়ালে টাঙানোর, তা বুড়ো মড়া আজ সাতমাস ঘুরুচ্চে—আজ এলে হয় একবার—ওর দাঁত খুলে জলের গেলাসে ডুবিয়ে রাখা বের করে দেবো—

শুধু বাড়া? গোলাপীর টেবিল-হারমোনিয়ম হইল, জোড়া জোড়া শাড়ী, চেয়ার, এমন কি শেষে কলের গান পর্য্যন্ত। কোন সুখ গোলাপীর বাকি ছিল? প্রতি রবিবারে কৃষ্ণলালের সঙ্গে গাড়ী করিয়া (অবশ্য ঘোড়ার গাড়ী) কালিঘাটে গঙ্গাস্নান ও দেবীদর্শন করিতে যাওয়া তাহার অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। বছরের পর বছর কাটিয়া গেল।

গোলাপী আর কৃষ্ণলাল, কৃষ্ণলাল আর গোলাপী।

ইতিমধ্যে গোলাপীকে সুখে-স্বচ্ছন্দে প্রতিষ্ঠিতা দেখিয়া তাহার মা একদিন নবীন কুণ্ডু লেনের মায়া কাটাইয়া বোধ হয় উর্ব্বশী বা তিলোত্তমা-লোকে প্রস্থান করিল। অমন জাঁকের শ্রাদ্ধ এ অঞ্চলে কেহ দেখে নাই তার আগে।

ক্রমে ক্রমে গোলাপীর যৌবনে ভাঁটা পড়িল। কৃষ্ণলালেরও আয়ের অঙ্ক কমিতে লাগিল। দত্তপুকুরের তেলের অনুকরণে শত শত বাতের তেল বাজারে বাহির হইল—রেলগাড়ীর কামরাও নিত্যনূতন ক্যানভাসারে ভরিয়া গেল। যা ছিল কৃষ্ণলালের একার—তাহার মধ্যে অনেক ভাগ বসিল। পূর্ব্বের সচ্ছলতা কমিতে লাগিল।

তারপর দশ বারো বছর কাটিয়া গিয়াছে।

এই দশ বারো বছরে সুন্দরী গোলাপী কুরূপা প্রৌঢ়াতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—তাহার সে বাড়ী চলিয়া গিয়া আবার সাত আটটি নানা বয়সের সঙ্গিনীর সঙ্গে বাড়ীটিতে থাকিতে হয়! তবুও কৃষ্ণলালের যাহা কিছু উপার্জ্জন, এইখানেই তাহার সদ্ব্যয়। গোলাপীও তাহা বোঝে—এই ত্রিশ বছরের মধ্যে সে কৃষ্ণলালকে ছাড়িয়া অন্য কোথাও যায় নাই।

কৃষ্ণলাল বলিল—গোলাপী, চাকরীটা গেল !

গোলাপী বিস্ময়ের সুরে বলিল—সে কি গা !

—বড়বাবু রাগ করেচে, কাল ক্যাশ জমা দিইনি বলে।

—কি করলে সে টাকা ?

—খরচ হয়ে গেল।

—কোথায় খরচ হয়ে গেল—কিসে খরচ হয়ে গেল ? তোমার এখনও দোষ গেল না তা ওরা কি করে রাখে তোমায় ? কাল কোথায় গিয়েছিলে ?

—সে খরচ নয় গোলাপী। দক্ষিণেশ্বর সেদিন যাওয়ার দরুন দেনা ছিল মনে নেই ? কাবুলীর কাছ থেকে টাকা নিইনি ? রাত দশটার পরে ইষ্টিশনের গেটে আমায় ধরেচে ! রুপী দেও। শেষে ভাবলাম কি ছোরা মারবে না কি ? ভয়ে পড়ে দিয়ে দিলাম টাকা। কাবুলীর দেনা, ও হজম করা কঠিন।

—তা নেও বেশ হয়েচে। এখন খাওয়া হয়েচে, না হয়নি ? আমার অদেষ্টে ঝি-গিরি নাচচে সে তো দেখতে পাচ্চি। বল্লু, পাড়াগাঁয়ের দিকে চলো—কোথাও একখানা ঘরদোর বেঁধে দু'জনে থাকা যাবে—তা না, তোমার বাপু কলকেতা আর কলকেতা ! কলকেতা ছেড়ে আমি থাকতে পারবো নি। এখন থাকো কলকেতায় ? কে এখানে খাওয়ায় দেখি।

—জুটে যাবে, এখানেই জুটে যাবে। অত ভাবনার কারণ নেই—

—তোমার এ বুড়ো বয়সে চাকরী নিয়ে তোমার জন্যে বসে আছে ! এখন আর কি তোমার হাত পা নেড়ে বক্তিমে করবার গতর আছে নাকি ?

—দেখিয়ে দেবো গোলাপী, দেখবি ? ভদ্রমহোদয়গণ, এই সেই বিখ্যাত আদি ও অকৃত্রিম দত্তপুকুরের বাতের তেল—ইহা ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার বাত বেদনা, মাথাধরা, দাঁত কনকনানি, কাউর, ছুলি, কাটা ঘা, পোড়া ঘা—

গোলাপী হাসিতে হাসিতে বলিল—থাক গো গোসাঁই, আর বিদ্যে দেখাতে হবে না··· সবাই জানে তুমি খুব ভালো বক্তিমে দিতে পারো—আহা, কি হাত পা নাড়ার ছিরি ! যেন থিয়েটারের এ্যাক্টো করচেন !

—তাহ'লে বল চাকুরীতে নেবে কিনা ?

—নেবে না আবার ? একশো বার নেবে—আমি যাই এখন ঝি-গিরি ক'রে নিজের পেট চালাবার চেষ্টা দেখি—নিজেই খেতে পাবে না তা আমায় আর খাওয়াবে কোত্থেকে ! কি অদেষ্ট যে নিয়ে এসেছিলাম !

কৃষ্ণলাল চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া গোলাপী বলিল—ব'সো, দুটো মুড়িটুড়ি মেখে দি—খেয়ে একটু চা খেয়ে যাও—

অগত্যা কৃষ্ণলাল বসিল। বলিল—তাহ'লে বক্তৃতা এখনও দিতে পারি, কি বলো ?

—নেও, আর আদিখ্যেতায় কাজ নেই। দিতে পারো তো—সত্যি কথা যদি বলি তবে

তো পায়া ভারী হয়ে যাবে।

—কি বলো না গোলাপী, বলতেই হবে।

—তোমার মত অমন কারো হয় না, আমি তো কতই দেখলাম দাঁতের মাজনের, ওষুধের ফিরিওয়ালা—আমাদের এই গলির মুখে হারমোনিয়াম গলায় বেঁধে নাচে, বক্তিমে দেয় পোড়ারমুখোরা—কিন্তু সে সব ফিরিওয়ালা তোমার মত নয়—

কৃষ্ণলাল রাগের সুরে বাধা দিয়া বলিল—কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা! তোকে নিয়ে আর পারিনে দেখচি—তারা হ'ল ফিরিওয়ালা—আমরা হলুম ক্যান্‌ভাসার—হারমোনিয়াম পিঠে বেঁধে যারা গান গেয়ে ঘুঙুর পায়ে দিয়ে নেচে বেড়ায়, আমরা কি সেই দলের? অপমান হয়, ওকথা আমাদের ব'লো না!

—যাক যাক, ভুল হয়েচে, তুমি এখন ঠাণ্ডা হয়ে বসে চা খেয়ে নেও।

গোলাপীর মন আজ বেশ খুশি। কতদিন পরে যেন যুবক কৃষ্ণলালের অঙ্গভঙ্গি ও সুন্দর সতেজ গলার স্বর সে আবার শুনিল। ত্রিশ বৎসরের অন্ধকার কালো ছেঁড়া পর্দাটা কে টানিয়া সরাইয়া দিল।

সে যত্ন করিয়া কৃষ্ণলালকে খাওয়াইল—কৃষ্ণলাল বিদায় লইয়া যখন আসে তখন বলিল—একটা কথা বলি শোনো। যদি খাওয়া-দাওয়ার কোনো কষ্ট হয়, তবে আমার কাছে এসে অবিশ্যি খেয়ে যাবে। এই বেদ্ধ বয়েসে না খেলে শরীর থাকবে কেন? আমায় কিছু দিতে হবে না এখন। ওই সোনারবেনেদের ঠাকুরবাড়ীতে একটা ঝিয়ের দরকার, সকাল-সন্ধ্যে কাজ করব—আমি কাল থেকে সেখানে কাজে লেগে যাবো—তা তোমায় বলাও যা না বলাও তাই—তুমি কি আসবে? তোমায় আমি চিনি কিনা!

কৃষ্ণলাল হাসিয়া বলিল—ভালোই তো। তোর রোজগার এইবার খাই দিনকতক—সে সাধ আমার আছে অনেকদিন থেকেই। আচ্ছা তাহ'লে এখন আসি, ওবেলা হয়তো আসবো—সন্ধ্যের পর।

তাহার পর এক মাস কাটিয়া যায়। কিন্তু গোলাপীর বাড়ী কৃষ্ণলাল আর আসিল না। সুখের দিনে গোলাপীকে সে অনেক দিয়াছে—এখন দুঃখের দিনে বসিয়া বসিয়া গোলাপীর অন্ন ধ্বংস করিবে তেমন-বংশে জন্ম নয় কৃষ্ণলালের। বিশেষত দেখিতে হইবে, গোলাপীও প্রৌঢ়া—ঝি-গিরি ভিন্ন এখন আর তার কোনো উপায় নাই।

মেসের ভাড়া বাকি পড়িয়াছিল দু'মাসের, মেসের অধ্যক্ষ কৃষ্ণলালকে ডাকিয়া বলিল—কি কৃষ্ণবাবু, আমাদের রেণ্টটা কি হবে?

—আজ্ঞে ক্ষেত্রবাবু, দেখতেই তো পাচ্চেন—চাকুরীটা গেল, হাতে কিছু নেই। এ অবস্থায়—

—ফি-মাসে আমি পকেট থেকে ঘরভাড়া যোগাবো কোথা থেকে সেটাও তো দেখতে হবে? দুদিন সময় নিন—তারপর আপনি দয়া করে সিট ছেড়ে দিন, আমি অন্য ব্যবস্থা দেখি।

কৃষ্ণলাল পড়িল মহা বিপদে। একে খাইবার পয়সা নাই—তাহার উপর মাথা গুঁজিবার যে জায়গাটুকু ছিল, তাহাও তো আর থাকে না। তিনদিন কাটিয়া গেল, দু'একটি পূর্ব্ব-পরিচিত বন্ধুর নিকট হইতে চাহিয়া-চিন্তিয়া দু'চার আনা ধার লইয়া পাইস হোটেলের ডাল-ভাতে কোনোরকমে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করিয়া এই তিনদিন কাটাইল। কিন্তু তিনদিন পরে তাহার সত্যই অনাহার শুরু হইল। দু' পয়সার ছাতু বা মুড়ি সারাদিনে—শুধু ছাতু, একটু গুড় বা চিনি জোটে না তাহার সঙ্গে। তাহার পর পেট পুরিয়া জল, কলের নির্ম্মল জল।

মেসে ম্যানেজার আবার ডাক দিলেন। বলিলেন—কিছু হ'ল ?

—আজ্ঞে এখনো—এই ভাবচি—

—আমার লোক এসে গিয়েচে—কাল মাসের পয়লা। দু'মাসের ভাড়া পকেট থেকে দিয়েচি—এ মাসেরও দিতে হবে। আমিও ছা-পোষা মানুষ মশাই—কত লোকসান হজম করি বলুন ? আপনি জিনিসপত্তর নিয়ে চলে যান—আমার ভাড়ার দরকার নেই।

পরদিন সকালেই জিনিসপত্র সমেত (একটা টিনের ট্রাঙ্ক ও একটি ময়লা বিছানা) কৃষ্ণলালকে পথে দাঁড়াইতে হইল। বর্ষাকাল। জিনিসপত্র রাখিবার মত জায়গা কোথায় পাওয়া যায় ? গোলাপী অনেকবার মেসে খবর লইয়াছে—মধ্যে একদিন দু'ঘণ্টা মেসের বাহিরের ফুটপাতে বসিয়া ছিল তাহার অপেক্ষায় (কারণ ম্যানেজার তাহাকে চেনে, মেসে কুচরিত্রা স্ত্রীলোক ঢুকিতে দিবে না)—কৃষ্ণলাল দূর হইতে দেখিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। এখন গোলাপীর বাড়ী গেলে সে কান্নাকাটি করিবে, আটকাইয়া রাখিতে চাহিবে। নতুবা সেখানে জিনিসপত্র রাখা চলিত।

মেস হইতে কিছু দূরে বড় রাস্তার উপর একটা চায়ের দোকানের মালিকের সঙ্গে কৃষ্ণলালের পরিচয় ছিল। বলিয়া কহিয়া সেখানে কৃষ্ণলাল জিনিসপত্র আপাতত রাখিয়া দিল। তাহার পর উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ দেখিল সে গঙ্গার ধারে আহিরিটোলার ষ্টীমারঘাটে আসিয়া পড়িয়াছে।

সকাল হইতে কিছু খাওয়া হয় নাই। ঘাটের ধারে একটা গাছতলায় হিন্দুস্থানী ফিরিওয়ালা ভুট্টা পোড়াইতেছে। কৃষ্ণলাল এক পয়সার ভুট্টা কিনিয়া জলের ধারে বসিয়া সেটি পরম তৃপ্তির সহিত খাইল।

একটা বিড়ি পাইলে হইত এই সময়।

এই সময় একটি ছোকরা ব্যাগহাতে আসিয়া তাহার পাশে ব্যাগটি নামাইয়া পকেট হইতে ঝাড়ন বাহির করিয়া সিমেণ্ট-বাঁধানো রানার উপর পাতিল। বসিতে যাইবে এমন সময় ছোকরা হঠাৎ পকেটে হাত দিয়া কি দেখিয়া একবার চারিদিকে চাহিল এবং কাছেই কৃষ্ণলালকে দেখিয়া বলিল—একটু দয়া করে ব্যাগটা দেখবেন ? এক পয়সার বিড়ি কিনে আনি—

বিড়ি কিনিয়া আনিয়া সে কৃষ্ণলালকে একটি বিড়ি দিল। কৃষ্ণলাল আগেই আন্দাজ

করিয়াছিল, ছোকরা একজন ক্যান্‌ভাসার। এখন জিজ্ঞাসা করিল—আপনি বুঝি ক্যান্‌ভাস করেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—কি জিনিস?

—হাতকাটা তেল—সার্জ্জিক্যাল মলম—

—বেশ পাওয়া যায়? কমিশন কেমন?

—ভালোই। খদ্দেরকে হাত কেটে দেখাতে—সঙ্গে ছুরি থাকে—এই যে—

ছোকরা জামার আস্তিন গুটাইয়া দেখাইল—কব্জি হইতে কনুই পর্যন্ত হাতের সমস্ত অংশটা ছুরি দিয়া ফালা ফালা করিয়া চেরা। কৃষ্ণলাল শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—এ কি! লাগে না?

ছোকরা হাসিয়া বলিল—লাগে—আবার মলম লাগালে সেরে যায়।

—কি রকম আয় করেন?

—চব্বিশ টাকা থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকা মাসে।

কৃষ্ণলালের মন বেজায় দমিয়া গেল। এত কাণ্ড করিয়া ত্রিশ টাকা! অথচ এমন সময় গিয়াছে—যখন দত্তপুকুরের বাতের তেল ফিরি করিয়া সে মাসে ষাট সত্তর টাকা অনায়াসে রোজগার করিয়াছে—তাহার জন্য নিজের হাত ছুরি দিয়া ফালা ফালা করিয়া কাটিবার প্রয়োজন হয় নাই।

ক্যানভাসারের কাজে আর সুখ নাই। আর সে এ কাজ করিবে না।

পরদিন কৃষ্ণলাল কলিকাতা ছাড়িয়া স্বগ্রামে রওনা হইল। বসিরহাট স্টেশনে নামিয়া সাত ক্রোশ হাঁটিয়া তাহার পৈতৃক গ্রাম ইলশেখালি পৌঁছিতে বেলা তিনটা বাজিল। গ্রামে তাহার দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি ছাড়া অন্য কেহ আপনার জন নাই—নিজের পৈতৃক ভিটা জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে। বহুদিন এদিকে আসে নাই, দেখা-শোনাও করে নাই—খড়ের ঘর কতদিনে টেকে? আজ প্রায় সতেরো আঠারো বছর পূর্ব্বে শুধু পাঁচ দিনের জন্য একবার পিসিমার শ্রাদ্ধে গ্রামে আসিয়াছিল। সেই আর এই।

জ্ঞাতিরা অবশ্য কৃষ্ণলালকে জায়গা দিল। কিন্তু কিছুদিন থাকিয়া কৃষ্ণলালের কেমন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। গ্রামে তাহার মন টেকে না। কখনও সে দীর্ঘদিন ধরিয়া গ্রামে বাস করে নাই—এখানকার লোকে কথাবার্ত্তা বলিতে জানে না, ভাল করিয়া মিশিতে জানে না, চা খায় না। কলিকাতায় রাস্তার ভিখারীও চা খায়। তাহার উপর এই পাড়াগাঁয়ে যেমন জলকাদা, তেমনি জঙ্গল রাত্রে মশার উৎপাতে নিদ্রা হয় না। এর মধ্যে ম্যালেরিয়া প্রায় সকল বাড়ীতেই দেখা দিয়াছে।

না, এখানে মন টেকে না। কৃষ্ণলাল চেষ্টা করিয়া দেখিল—এখানে সবাই যেন সারাদিন ঘুমাইয়া আছে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ইহারা চড়কতলায় ক্ষুদ্র মাঠে বেলতলায় বসিয়া হুঁকা হাতে আড্ডা দেয়, পরচর্চ্চা করে। কোনো কাজ নাই অথচ দুপুরে ভাত দু'টি মুখে

দিতে না দিতে এদের চোখ ঘুমে ঢুলিয়া পড়ে। দিবানিদ্রা চলে বেলা চারিটা পর্য্যন্ত—তারপর ঘুম হইতে রক্তবর্ণ চোখে উঠিয়া কেহ বা বাজারে দু'পয়সার সওদা করিতে যায়—সেখানেও আবার আড্ডা…এ দোকানে ও দোকানে বসিয়া তামাক খাওয়া…চার পয়সার সওদা করিতে তিন ঘন্টা লাগাইয়া সন্ধ্যার পর বাড়ী আসে। তারপরই আহার ও নিদ্রা। কেরোসিন তেলের দাম চড়িয়া গিয়াছে—তেল খরচ করিয়া আলো জ্বালাইয়া রাখিতে কেহ রাজী নয়। কয়েক বাড়ী যাও—অন্ধকারে বসিয়া দু'একটা কথা বলো, গল্প করো—এক আধ কল্কে তামাক খাও—তাহার পর বাড়ী ফিরিয়া আবার বিছানা আশ্রয় কর। দিন শেষ হইয়া গেল।

কৃষ্ণলাল এরকম জীবনে অভ্যস্ত নয়। এ কি জীবন? অথচ সকলেই বলিবে, দাদা, সংসার আর চলে না, বড় কষ্ট। কষ্ট ঘুচাইবার চেষ্টা কোথায়? আজ দীর্ঘ পঁচিশ ত্রিশ বছর ধরিয়া যার কলিকাতায় ভীষণ কর্ম্মব্যস্ত জীবন কাটিয়াছে, এ ধরনের অলস, শ্রমবিমুখ জীবনের ধারণাই করিতে পারে না সে।

সকালে উঠিয়াই নীচের তলার কলে স্নান সারিয়া লইতে হইত। খুব ভোরে স্নান না সারিলে এমন ভিড় জমিয়া যাইবে কলে যে, আর স্নান করা চলিবে না। নীচের তলায় সেকরার দোকানের লোকেরা, শালওয়ালা, দরজি, পুব দিকের ঘরে যে মুটেরা থাকে সবাই আসিয়া কলে ভিড় লাগাইয়া দিবে, ইহার পর আসিবে একদল বালতি হাতে জল ধরিতে ও চাউল ধুইতে। সারি সারি লোক দাঁড়াইয়া যাইবে কলসী হাতে জল ভরিতে। ওপরে তিনতলায় তিনটি মেসের চাকরেরা। সকলেই কর্ম্মব্যস্ত, ঘড়ি ধরিয়া কাজ কলিকাতায়, 'সময় গেল। ছ'টা বাজে, কখন কি হবে?' দিন আরম্ভ হইয়াছে…এখনি বাবুরা আসিয়া ভাত চাহিবে আটটা বাজিতে না বাজিতে, এতটুকু দেরি করিলে চলিবে না।

স্নান সারিয়া কৃষ্ণলাল ব্যাগ হাতে বাহির হইত শেয়াল-দ' স্টেশনে, প্রথমেই সাতটা দশ বারাসত, সাতটা পঁচিশ নৈহাটি, পৌনে আটটা রাণাঘাট প্যাসেঞ্জার, সাড়ে আটটা বনগাঁ লোকাল, আটটা পঞ্চাশ দত্তপুকুর, ন'টা দশ কেষ্টনগর লোকাল,…শুরু হইয়া গেল দিনের কাজ। বাতের তেল! বাতের তেল! দত্তপুকুরের বাতের তেল! যত প্রকার বাত, কুলা, শূলানি, কন্‌কনানি, মাথা ধরা, পেট বেদনা, ইহার একমাত্র ব্যবহারে…ভদ্রমহোদয়গণ, এই ওষুধটি আজ ত্রিশ বছর যাবৎ এই লাইনে সুখ্যাতির সহিত চলিতেছে,—এই চলিল বেলা বারোটা পর্য্যন্ত। বারোটা পঞ্চান্ন শান্তিপুর ছাড়িয়া গেলে তবে সকালের কাজ মিটিল। কি জীবন! কি আনন্দ! কি পয়সা রোজগার! কাঁচা পয়সা রোজ আসে, রোজ সন্ধ্যায় উড়িয়া যায়, যে পয়সা আয় করিতে জানে, সে-ই জানে খরচ করিতে, ইহাতে ক্ষোভ কি?

কৃষ্ণলাল আরও মাসখানেক কোনোরকমে কাটাইল।

আর চলে না। এ অলস জীবন তাহার অসহ্য, কখনো পা গুটাইয়া কূর্ম্মবৃত্তি অবলম্বন করিয়া এভাবে সে থাকে নাই। বেশিদিন এভাবে থাকিলে সে পাগল হইয়া যাইবে, নয়তো

মরিয়া যাইবে।

কিন্তু কলিকাতায় গিয়া সে খাইবে কি? কোন উপায় তো দেখা যাইতেছে না। ইণ্ডিয়ান ড্রাগ সিণ্ডিকেটে আর চাকরী হইবার সম্ভাবনা নাই। তবুও একবার বসু মহাশয়কে গিয়া ধরিয়া দেখিলে কেমন হয়? কিছু যদি না জোটে, তবে আহিরিটোলার ঘাটে সেই হাতকাটা তেলের ক্যান্‌ভাসার ছোকরার সঙ্গে দেখা করিয়া···তবে ছুরি দিয়া নিজের হাতটা ফালা ফালা করিয়া কাটা—এ বৃদ্ধ বয়সে, ক্যান্‌ভাসারের চাকুরীর মত সম্মানের চাকুরীর, আরামের চাকুরী আর নাই, কিন্তু হাত কাটিয়া দেখাইয়া জিনিস বিক্রয় করা? ওতে মান-সম্ভ্রম থাকে না।

এভাবে গ্রামে বসিয়া থাকা জীবন নয়। চিরকাল কাজের মধ্যে থাকিয়া আজ বাঁচিয়া মরিয়া থাকা তাহার পোষাইবে না। গ্রামেও তো হাওয়া খাইয়া জীবনধারণ করা যায় না—কেহ কেহ তাহাকে সামনের বছর দু'এক বিঘা ধান করিতে পরামর্শ দিল—কেহ বলিল, ডোবার ধারে জমিটা পড়ে আছে কেষ্ট খুড়ো, তোমারই পৈতৃক জমি, এই শীতকালে মানকচু লাগাও ওটাতে, তবু হাটে হাটে কিছু ঘরে আসবে, সামনের শীতকাল লাগাৎ—কৃষ্ণলালের হাসি পায়।

কলিকাতার রোজগার যে কি ধরণের, সেখানে ক্যান্‌ভাসারের কাজে মাসে যে টাকা এক সময় তাহার আয় ছিল, এখানে গোটা বছর ধরিয়া কচু, কুমড়া বেচিয়াও যে সে আয় হওয়া অসম্ভব—এই মূর্খ, অর্ব্বাচীনেরা তাহা কি করিয়া বুঝিবে?

অবশেষে সে একদিন বাক্স বিছানা বাঁধিয়া কলিকাতায় আসিয়া হাজির হইল।

বাঁচিতে হয় তো ভাল করিয়াই সে বাঁচিবে!

ট্রেনে পুরানো ক্যান্‌ভাসারদের সঙ্গে দেখা। নবশক্তি ঔষধালয়, কবিরাজ অনঙ্গমোহন দেব, বিশ্বাস কোম্পানী—ইণ্ডিয়ান ড্রাগ সিণ্ডিকেট প্রভৃতি ফার্ম্মের লোক সব। সবাই জানে, সবাই খাতির করে।

—আরে, এই যে কেষ্টদা, আজকাল আর দেখিনে যে?

—কেষ্টদা, কোত্থেকে? বিয়েথাওয়া করলেন নাকি এ বয়সে?

—আজকাল কোন কোম্পানীতে আছেন কেষ্টদা? দেখিনে ট্রেনে আর?

—জমিজমা দেখতে গেছলে ভায়া? তা দেখবেই, তো, থাকলেই দেখে—আমাদের কোন চুলোয় কিছু নেই, যা করে এই বিশ্বাস কোম্পানী, হিংসে হয় তোমায় দেখে, দু'শো টাকা বছরের আয়ের সম্পত্তি? বলো কি! তবে তো তুমি—

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কৃষ্ণলালকে এ বিড়ি দেয়, ও পানের কৌটা খুলিয়া সামনে ধরে। পুরাতন বন্ধুর দল। ইহাদের ফেলিয়া সে এতকাল ঘুমন্ত পুরীতে কাল কাটাইল যে কি ভাবিয়া? এখানে কাজ আছে, আমোদ আছে, পয়সা রোজগার আছে, তারপর ইয়ে আছে। আর সে কোথাও

যাইবে না কলিকাতা ছাড়িয়া। মরিতে হয় এখানেই মরিবে।

পনেরো বিশ দিন এখানে ওখানে হাঁটাহাঁটি করিয়াও কিন্তু চাকুরী মিলিল না। বসু মহাশয় ঝাড়া জবাব দিলেন। এখন সুশ্রী চেহারার ছোকরা ক্যান্‌ভাসার—বেশ লম্বা জুলপি, ঘাড় বাহির করিয়া চুল ছাঁটা, লপেটা জুতা পায়ে, থিয়েটারের রামের মত গলা, এই সবাই চায়। বয়স হইয়া গেলে, মানে, এখন উঁহাদের লোক আছে, দরকার হইলে চিঠি লিখিয়া জানাইবেন পরে।

পুরোনো মেসেই উঠিয়াছিল, বারান্দাতে আছে। গোলাপীর সঙ্গে দেখা করে নাই। এখন করিতে চাহেও না সে। অনাহারে দু'দিন কাটিল মধ্যে। অবশেষে একদিন আহিরিটোলার ঘাটেই গিয়া হাজির হইল, যদি হাতকাটা তেলওয়ালা সেই ছোকরার সঙ্গে দেখা হইয়া যায়। সে সাড়ে বারোটার স্টীমারে রোজ বালি হইতে আসে বলিয়াছিল। সাত আট দিন ক্রমাগত ঘুরিয়াও কিন্তু ছোকরার দেখা মিলিল না। কৃষ্ণলালের দুঃখ শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আর চলে না। আচ্ছা, সে ক্যান্‌ভাসারি ভুলিয়া যাইতেছে না তো? আজ কতদিন চাকুরী নাই। কতদিন বক্তৃতা দিবার অভ্যাস নাই। চর্চ্চা অভাবে শেষে কিনা ছোকরা ক্যান্‌ভাসারেরা তাহাকে—কৃষ্ণলালকে ছাড়াইয়া যাইবে!

সেদিন কৃষ্ণলাল নিজের টিনের ছোট সুটকেস্‌টি হাতে লইয়া ড্যালহাউসি স্কোয়ারের মোড়ে দাঁড়াইয়া হাত-পা নাড়িয়া ক্যান্‌ভাসারের বক্তৃতা জুড়িয়া দিল, চর্চ্চা রাখা দরকার তো বটেই, তাছাড়া সে নিজের শক্তি পরীক্ষা করিতে চায়, খরিদ্দার জোটে কিনা সে একবার দেখিবে। এখনও তাহার যাহা গলা আছে, থিয়েটারের রামের মত গলাওয়ালা কোন্ ছোকরা ক্যান্‌ভাসার তাহার সঙ্গে পাল্লা দিবে, সে দেখিতে চায়।—দত্তপুকুরের বাতের তেল! ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার বাত, বেদনা, মাথা ধরা, দাঁতশূলানি, হাত বেদনা, পিঠ বেদনা···ভদ্রমহোদয়গণ। এই ঔষধটি আজ ত্রিশ বছর ধরিয়া এই লালদীঘির মোড়ে···

কৃষ্ণলাল মিনিট পাঁচ-ছয় পরে সগর্ব্বে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া লইল। বেশ ভিড় জমিয়া গিয়াছে। একজন ভিড় ঠেলিয়া কাছে আসিয়া বলিল—আমায় একটা ছোট ফাইল।—

কৃষ্ণলাল গম্ভীর ভাবে বলিল—আমার কাছে ওষুধ নেই—আমি বসু ইণ্ডিয়ান ড্রাগ সিণ্ডিকেটের পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টের লোক, যাঁদের দরকার হবে, তাঁরা একশো ছয়ের সি হরিধন পোদ্দারের লেনে বসু ইণ্ডিয়ান ড্রাগ সিণ্ডিকেটের অফিসে··আমার নামের এই স্লিপটা নিয়ে যান দয়া করে, টাকায় চার আনা কমিশন পাবেন—দাঁড়ান লিখে দিচ্ছি—

দিন পাঁচ-ছয় কাটিল। কৃষ্ণলালের নেশা লাগিয়া গিয়াছে। সে বেলা তিনটার সময় রোজ সুটকেস্ হাতে ঝুলাইয়া ড্যালহাউসি স্কোয়ারের মোড়ে গিয়া বক্তৃতা জুড়িয়া দেয়। আফিস ফেরতা লোকেরা ভিড় করিয়া শোনে।

সেদিন কৃষ্ণলাল দাঁড়াইয়া দত্তপুকুরের বাতের তেলের গুণ ব্যাখ্যা করিতেছে, এমন সময় একজন ভদ্রলোক ভিড় ঠেলিয়া একেবারে তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

কৃষ্ণলাল চমকিয়া উঠিল, বসু ড্রাগ সিণ্ডিকেটের মালিক নৃত্যগোপাল বসু মহাশয় স্বয়ং!

বসু মহাশয় কৃষ্ণলালের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, শুনুন একবার এদিকে—

কৃষ্ণলাল ভিড়ের পাশ কাটাইয়া কিছু দূরে বসু মহাশয়ের সঙ্গে গিয়া অপ্রতিভের মত দাঁড়াইল। বসু মহাশয় বলিলেন, এ কি হচ্চে?

কৃষ্ণলাল অপরাধীর মত মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল,—আজ্ঞে, আজ্ঞে, একবার চর্চ্চাটা রাখচি, নইলে—

বসু মহাশয় বলিলেন, তাই তো বলি এ কি কাণ্ড! গত দিন পাঁচ ছ'য়ের মধ্যে অফিসে আপনার নামের স্লিপ নিয়ে বোধ হয় একশো কি দেড়শো খদ্দের গিয়েছে। এত ওষুধ বিক্রি গত ক'মাসের মধ্যে হয়নি। একে তো এই ডাল্ সিজন্ যাচ্চে, আমি তো অবাক; সবাই বলে লালদীঘির মোড়ে আপনাদের পাবলিসিটি অফিসার, তাঁরই মুখে শুনে···আমি বলি আজ নিজে গিয়ে ব্যাপারটা কি দেখি তো নিজের চোখে। তা আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েচি, আপনার এরকম কাজে—

কৃষ্ণলাল বিনীতভাবে বলিল, আজ্ঞে, ভাবলাম ছোকরা ক্যানভাসারদের মত থিয়েটারী রামের গলা কোথায় পাবো—তবুও একবার দেখি দিকি—

বসু মহাশয় বলিলেন, শুনুন। ওসব থাক। আপনি আজই আপিসে আসুন এক্ষুনি। আপনাকে আজ থেকে হেড ক্যান্‌ভাসার অ্যাপয়েন্ট করলাম। ষাট টাকা মাইনে পাবেন আর কমিশন, শুধু তদারক ক'রে বেড়াবেন কে কেমন কাজ করচে, আর ছোকরাদের একটু তালিম দিয়ে দেবেন, বুঝলেন না? আসুন চ'লে আমার গাড়ীতে—

সন্ধ্যাবেলা।···নবীন কুণ্ডুর লেনে খোলার ঘরের সংকীর্ণ রোয়াকে গোলাপী ক্যানেস্তা-কাটা তোলা উনুনে আঁচ দিয়া প্রাণপণে পাখার বাতাস করিতেছে, এমন সময় বাহিরে কে পরিচিত গলায় ডাকিল—গোলাপী ও গোলাপী, বাইরে এসে জিনিসগুলো ধরো দিকি। হাত ভেঙে গিয়েচে—

পারমিট

আজই সেই আশ্চর্য্য ব্যাপারটি আমার জীবনে ঘটেচে।

এমন সব অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ডও মানুষের জীবনে ঘটে যায়! বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এখনও ভাবলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়চি এক একবার।···

ভাদ্রের ভরা নদী। উভয় তীরের বনভূমির শাখা প্রশাখা জলের ওপর নত হয়ে আছে, এক এক জায়গায় জলমগ্ন নল-খাগ্‌ড়ার বন নদীর স্রোতোবেগে থরথর করে কাঁপচে। এমনি এক স্থানে জলের ওপর কলমি শাকের দাম দেখে নৌকোর মাঝি দয়ারাম শাক তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো নৌকা থামিয়ে! আমার সঙ্গী নকুড় চক্কত্তি তাকে বকচে—সন্দে হবে,

ফিরতে বড্ড দেরি হয়ে যাবে শাক তুলতে।

নৌকো থেমে দাঁড়িয়ে জলের আবর্ত্তে পাক খাচ্চে।

নকুড় চক্কত্তি বল্লে—একটা বিড়ি খাওয়া যাক, কি বলো হে ?

আমার ওসব দিকে তত মন ছিল না। তবুও কলের পুতুলের মত ওর হাত থেকে বিড়ি নিয়ে ধরালুম। নকুড় চক্কত্তি জলের ধারের ধানগুলো সম্বন্ধে কি যেন বলচে। একবার সে বল্লে—যাক, একটা কাজের মত কাজ হয়েচে। ধানটা খুব জোর পাওয়া গিয়েচে। তুমি না গেলে হাকিম কি ধান দিত ? হাকিমের স্ত্রী তোমায় চেনে নাকি ? ও না থাকলে আজ ধান হ'ত, না ছাই হ'ত !

আমি অন্যমনস্কভাবে বল্লাম—হ্যাঁ।

গল্পে এমন ঘটনা অনেক পড়া গিয়েচে—কিন্তু বাস্তব জীবনে ক'টা ঘটে তাই ভাবচি। একটাও না, অথচ গল্পে পড়লে হয়তো মনে হবে, এমন গল্প অনেক পড়া গিয়েচে। জীবনের অলিখিত কাব্যে কত অধ্যায় কত ঘটনা—এর পাঠক কে, না যে সে জীবন যাপন করচে। বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান বিরাট জনতা উৎসুক শ্রোতা হতে পারে, দর্শক হতে পারে কিন্তু রসিক সমঝদার মাত্র, তার বেশি নয়।

বাগজোলার খালের মধ্যে দিয়ে জলের তোড় মাঠের দিক দিয়ে দু'ধারের ঘন বনের মধ্যে দিয়ে এসে নদীতে পড়চে। জলের তোড়ে একটা প্রকাণ্ড জগডুমুর গাছ শেকড় ছিঁড়ে জলে ঝুঁকে পড়ে আছে। নকুড় চক্কত্তি বল্লে—ছাখ তো বাবা সয়ারাম, গাছটাতে যদি কচি কচি ডুমুর পাওয়া যায়। নৌকোটা একটু থামিয়ে পাড় দিকি দু'টো—তরিতরকারির দাম, তবুও দু'টো ডুমুর নিয়ে গেলে কাজ হবে—ধানটা পেয়ে বড্ড সুবিধে হয়েছে—কি বলো রামলাল ?

আমি বল্লাম—হ্যাঁ।

—তোমার আজ হয়েচে কি হে ? কোনদিকে যেন মন নেই—

—যা হয়েচে তা হয়েচে, ধান পেয়েচ তো ?

—ওঃ—দশ টাকায় এক মণ ধান ; এ না পেলে তোমার আমার মত লোকের—

নকুড় চক্কত্তির কথাটা আমার মনে লাগলো বটে কিন্তু কথাটা সত্যি, আমাদের মত অবস্থার লোকের কি অবস্থা হ'ত আজ যদি সুবিধে দরের ধান পাওয়া না যেতো। অথচ আজ নকুড় চক্কত্তি নিজের নামের সঙ্গে আমার নামটা জড়ালে শুনে মনের মধ্যে খচ্ করে উঠলো কোথায়।

অনেকদিন আগের কথা। আমার পিসিমার বাড়ী বামুনহাটি থেকে ফিরে আসছিলাম। আমি কলেজ থেকে বেরিয়েচি চার পাঁচ বছর, কিন্তু তখনও কলকাতায় থাকি, ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকেই চিরকাল মন। এক মাড়োয়ারী ফার্ম্মে কাজ শিখি। এগারো মাইল রাস্তা মেঠো পথ। হেঁটে আসতে আসতে কাপালীপাড়ার হাটতলায় বাঁধানো পুকুরের চাতালে বসে একটু বিশ্রাম করচি এমন সময় খুব ব্যস্তসমস্ত অবস্থায় দু'টি লোককে আমার

দিকে আসতে দেখে একটু আশ্চর্য্য হ'লাম।

লোক দু'টির মধ্যে একজন ভট্চাজ বামুন, মাথায় টিকি, ফর্সা রং, গায়ে সাদা উড়ুনি। অন্য লোকটি আঠারো উনিশ বছর বয়সের ছোকরা মাত্র। দু'জনেই খুব ঘর্মাক্ত, হাঁপাতে হাঁপাতে যেন অনেক দূর থেকে আসচে। ভট্চাজ মশায় আমার কাছে এসে বল্লেন—ওঃ ছুটতে ছুটতে এসে ধরেচি। পাওয়া গিয়েচে শেষকালে। তোমার পিসিমার বাড়ী গিয়ে শুনি তুমি আধ ঘণ্টা আগে বেরিয়েচ—তখুনি রমেশকে বল্লাম, পা চালা, রমেশ। ধরতেই হবে পথে।

আশ্চর্য্য হয়ে বল্লাম—ব্যাপার কি? আপনারা আমায় খুঁজচেন?

—হ্যাঁ, বাবাজী হ্যাঁ। দাঁড়াও একটু জিরিয়ে নিই আগে—

মনে মনে ভাবচি এমন তো কোথাও চুরি বা খুন করে পালাচ্চি নে, তবে এরা এমন ব্যস্তসমস্ত হয়ে আমার পেছনে ছোটে কেন? কিন্তু কিছু পরেই ভট্চাজ মশায় আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করলেন। আমায় বল্লেন—তোমায় এখুনি যেতে হবে বাবাজী। এই পাশেই গ্রাম, সীতানাথ বাবুর নাম শোনোনি? এ অঞ্চলের জমিদার। তোমার সঙ্গে তাঁর এক মেয়ের সম্বন্ধ আমিই প্রস্তাব করেচি। তুমি এসেচ খবর পেয়ে তোমার পিসিমার বাড়ী দৌড়েছিলাম। এটি আমার ভাইপো।—

এতক্ষণে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেল বটে, কিন্তু সবটা নয়। বল্লাম—কিন্তু আমি সেখানে যাবো কেন হঠাৎ?

—মেয়ে দেখতে, মেয়ে দেখতে। তাঁরাই পাঠিয়ে দিয়েছেন আমায়! সীতানাথ বাবু বল্লেন—নিয়ে এসো তাঁকে!

—তিনি কি করে জানলেন আমি পিসিমার বাড়ী গিয়েচি—

—তোমার যাবার দিন আমি তোমাকে দেখেছিলাম বাবাজী। সে দিন হাটে তোমার পিসেমশায়ের সঙ্গে দেখা, তিনি বল্লেন, তুমি ওখানেই আছ। আমি এসে সীতানাথ বাবুকে বলতেই তিনি বল্লেন, নিয়ে এসো, মেয়ে দেখে যান তিনি?

আমার মনের খট্কা গেল না। কোথাও কিছু ভুল হয়ে থাকবে হয়তো। আমি বিবাহ করার জন্যে অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠিনি। আমার পিসেমশায়ের বাড়ী দু'বছর পাঁচ বছর অন্তর একবার যাই, তিনিই বা কি করে জানলেন আমি বিয়ে করবো কি না।

হঠাৎ আমার মনে একটা তীব্র কৌতূহল হ'ল। এমন ভাবে রাস্তা থেকে ডেকে কেউ আমাকে কখনো মেয়ে দেখাতে নিয়ে যায় নি। সীতানাথ বাবু কেমন জমিদার, কেমন তাঁর মেয়ে, এ আমায় দেখতে হবে।

ওরা দু'জনে আমায় নিয়ে পাশের এক রাস্তা ধরলে। সে রাস্তার দু'ধারে ঘন বাঁশবন, কাপাসীপাড়ার দুস্তকার পাড়া ছাড়িয়ে একটা খুব বড় মাঠ, মাঠের মধ্যে অনেক দূরে কাদের একটা সাদা রংয়ের বাড়ী। ভট্চাজ মশায় বল্লেন—ওই হ'ল রায়েদের বাড়ী—এ অঞ্চলে নামডাক আছে ওদের। বংশও খুব ভালো—নাম শোনো নি?

আমিই বিনীত ভাবে বল্লাম, আমার এ অঞ্চলে তত বেশি যাতায়াত নেই। কাজেই অনেক লোকেরই নাম শুনি নি।

একটা সাবেক আমলের বড় বাড়ীর সামনে আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম। বাড়ীটা দেখেই বুঝলাম এক সময়ে এ বাড়ীর মালিকেরা দেশের জমিদার ও শাসক ছিল, যদিও এখন এদের সে অবস্থা নেই। থাকলে রাস্তা থেকে ডেকে এনে আমায় মেয়ে দেখাতো না।

একটি বেশ সুন্দর মত ছোকরা আমাদের ডাক শুনে বাইরে এলো, তারপর এলেন বাড়ীর কর্তা স্বয়ং সীতানাথ রায়। আমাদের সাদরে নিয়ে গিয়ে বসালেন বৈঠকখানার মধ্যে। খুব বড় সাবেকী বৈঠকখানা, দেওয়ালে বড় বড় হরিণের শিং, ঝাড়লণ্ঠন টাঙানো, বড় বড় পুরোনো বিবর্ণ ছবি ভেতরে বাইরে ঝুলনো। বৈঠকখানার এক পাশের তক্তপোশের ওপর অনেকগুলি বাদ্যযন্ত্র—সেতার, তানপুরা, ডুগিতবলা ইত্যাদি। মনে হ'ল সেগুলো ব্যবহার করবার লোক আছে এ বাড়ীতে। বেশ যত্নে তদ্বিরে গুছিয়ে রাখা। এক কোণে আট দশ গাছা বড় হুইলের ছিপ। ভট্‌চাজ মশায় আমায় দেখিয়ে বল্লেন—এই ইনিই, এঁরই নাম রামলাল চাটুয্যে—

এমন কিছু বিখ্যাত লোক আমি নই, অথচ কথার ভাবে মনে হ'ল আমার সম্বন্ধে এঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই আলোচনা হয়েচে। সীতানাথ বাবু আমার দিকে চেয়ে বল্লেন—আপনার পিসেমশায় ভবশঙ্কর বাবুর সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয়। তিনি আমার সঙ্গে একবার আপনার কথা বলেছিলেন, তখন আপনি কোথায় পশ্চিমে চুনের ব্যবসা করতেন—খুব ব্যবসার ঝোঁক আপনার। এই তো চাই বাঙালীর। চাকরী চাকরী করে দেশ উচ্ছন্ন।

বিনীত ভাবে বল্লাম—চুনের ব্যবসা করি নে, করবার চেষ্টায় গিয়েছিলাম বটে।

—কোথায় যেন সেই ?

—আজ্ঞে পশ্চিমে, বিন্ধ্যাচলের কাছে। ঘুটিং পাথর কিনে পুড়িয়ে চুন করে, সেখানে বড় বড় ভাঁটি আছে চুন পোড়ানোর।

—এখন কি করা হয় আপনার ?

—বিজনেস করি কলকাতায় এক বন্ধুর সঙ্গে ভাগে। আমাকে 'আপনি' বলবেন না, আপনি পিশেমশায়ের বন্ধু, আমাকে—

—তা'তে কি তা'তে কি বাবাজী। ব্রাহ্মণসন্তান, কুলীনের সন্তান, সব নমস্য। কত বড় কুলীন বংশ আপনারা—

এইবার খানিকটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। সীতানাথ রায় মশায় পুরাতন-পন্থী লোক, এখনও কৌলিন্য মানেন, আমাদের কুলীন হিসেবে এক সময়ে বেশ নামডাক ছিল বাবা বলতেন। এখন আর ওসব কে মানে বা গ্রাহ্য করে ? তবে এই সব অজ পাড়া-গাঁয়ে—

সীতানাথ রায় মশায়ের চেহারা আমার খুব ভালো লেগেচে। বেশ লম্বা, দোহারা,

ফর্সা চেহারা, মাথার চুল ধবধবে সাদা, মুখশ্রীতে একটা সদানন্দ, উদার অথচ একটু যেন নির্ব্বোধের ভাব। তা'তে মানুষকে আরও বেশি আকৃষ্ট করে তাঁর দিকে। আমি নিজে তো ধূর্ত্ত মানুষের চেয়ে নির্ব্বোধ লোক ঢের বেশি পছন্দ করি।

আমায় বল্লেন—আমার বড্ড আনন্দ হচ্চে আপনি আজ এসেচেন আমার বাড়ী—বিয়ে হোক না হোক, সে ভবিতব্য। কিন্তু আপনার আসাতেই—

গ্রামের দু'তিনটি ভদ্রলোক, কেউ কোঁচার টিক গায়ে, কেউ একটা আধময়লা পাঞ্জাবি গায়ে, এসে বৈঠকখানায় ঢুকে আমাদের দিকে চেয়ে নমস্কার করে বসলেন অন্তদিকে। রায় মশায় বল্লেন—ওদিকে কেন, সরে আসুন, সরে আসুন—এই ইনিই রামলাল বাবু—আলাপ পরিচয় করুন—

কিন্তু তাঁরা নিতান্ত গ্রাম্য লোক, আমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে তাদৃশ সাহস করলেন না বোধ হয়। একটু পরে তাঁদের একজন নিজেই তামাক সেজে টানতে লাগলেন। ভট্‌চাজ মশায়ও তামাক খাবেন বলে ওদিকে উঠে গেলেন। আমি আর রমেশ এদিকে বসে রইলাম। সীতানাথ রায় মশায় একটু পরে বাড়ীর ভেতর থেকে এসে বল্লেন—চলুন, একটু মিষ্টিমুখ করবেন।—অজ পাড়াগাঁয়ে এইটিই বলা রীতি। একটু শহর-ঘেঁষা জায়গা হ'লে বলতো চলুন, চা খাবেন।

বৈঠকখানা ছাড়িয়ে খুব বড় একটা হলঘর পার হয়ে ডাইনে বাঁয়ে দু'দিকেই বারান্দা-ওয়ালা কুঠুরির সারি। অনেকগুলি কুঠুরি, আট-দশটার কম নয়, তারপর আবার খোলা রোয়াক্, পূব পশ্চিমে লম্বা। তারপর চাতাল বাঁধানো উঠান পার হয়ে ওদিকের আর একটা বড় টানা ঢাকা বারান্দায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল। আমি চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম। প্রাচীন জমিদার-বাটী বটে। ভেতরটা আগাগোড়া চকমেলানো, খুব উঁচু কার্নিশ-যুক্ত ছাদ- তবে সেকেলে বাড়ী, ছোট ছোট দরজা জানালা।

বারান্দায় আট দশজন লোকের প্রচুর জলযোগের আয়োজন সজ্জিত ছিল। সীতানাথ রায় মহাশয়ের প্রৌঢ়া গৃহিণী সকলকে লুচি পরিবেষণ করলেন—কারণ এখানে বাইরের লোকের মধ্যে এক যা আমিই আছি, আর সবাই এই গ্রামেরই লোক। আমার মনে হ'ল তিনি লুচি পরিবেষণের ছলে আমায় দেখতে এসেচেন এবং বেশ একটু আগ্রহের সঙ্গেই আমার দিকে চেয়ে চেয়ে বার বার দেখচেন।

জলযোগান্তে রায়-মশায় আমায় পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। আমি পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করতেই তিনি বল্লেন—এসো বাবা এসো—

মনে হ'ল ঠিক যেন নিজের মা।

আমায় আর একটি বর্ষীয়সী মহিলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন গৃহিণী নিজে। বল্লেন —বড় কুলীন বংশ, যদি এখন আমার মেয়ের শিবপুজোর জোর থাকে—তোমরা পাঁচজনে আশীর্ব্বাদ করো—

এঁরা আমার সঙ্গে যে অমায়িক, হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করলেন, শুধু এই সব পল্লীগ্রামেই তার

তুলনা মেলে। নিজে আমি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম এঁদের আত্মীয়তায়। জানালা দিয়ে চোখে পড়চে ওঁদের চকমেলানো ছাদের ওপর ঝুঁকে-পড়া নারিকেল বৃক্ষের কম্পমান শাখা-প্রশাখা।

একটু পরে বাইরের ঘরে মেয়ে দেখানো হ'ল।

মেয়ে সুন্দরী না হোক, বেশ দেখতে শুনতে। বড় ঘরের মেয়ে ব'লে বোধ হয় বটে। সীতানাথ রায় মশায় নিজে যত্ন ক'রে মেয়েকে গান বাজনা শিখিয়েচেন। বল্লেন—ভট্‌চাজ মশায়, বিনু আমার গান-বাজনা জানে, সেতার বাজাতে পারে—সেটা একটু শুনতে উনি যদি চান—

আমি সলজ্জমুখে চুপ করে রইলাম। ভট্‌চাজ মশায় বল্লেন—হ্যাঁ হ্যাঁ—বিনু দিদি, ধরো একবার সেতারটা—

মেয়েটি বেশ সপ্রতিভভাবে গিয়ে বৈঠকখানার ঢালা বিছানায় বসে সেতার বাজালে, সীতানাথ রায় মশায় নিজে ডুগি-তবলা ধরলেন। আমি গান-বাজনা বিশেষ কিছু বুঝি নে, করি কয়লা আর চুনের আড়তদারি, তবুও মনে হ'ল মেয়েটি কাঁচা হাতে সেতার ধরে নি। সেতার নামিয়ে খানিক পরে যখন সে ছুটি গান গাইলে, তখন মেয়েটির কণ্ঠস্বর আমার কাছে বেশ ভালোই লাগলো। তবে, ঐ যে বল্লুম, ও জিনিসের সমঝদার নই আমি।

সেই অপরাহ্ণটি আমার জীবনের এক অদ্ভুত অপরাহ্ণ বটে। দূর সম্পর্কের পিসিমার বাড়ী থেকে ফিরচি। থাকি কলকাতায়, যখন আসি বাড়ীতে কালেভদ্রে, তখন হাঁটাপথে এগারো-বারো মাইল পথ নানা ধরণের পাড়াগাঁ, বিল, বাঁওড়ের মধ্যে দিয়ে যাবার প্রলোভনেই পিসিমার বাড়ী যাই—বিশেষ কোনো আত্মীয়তার টানে নয়।

সেই পথে ফেরবার সময়ে এ যেন এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। কথনো শুনিনি যাদের নাম, তাদের বাড়ীতে এসে এমন অমায়িক ব্যবহার পাওয়া আমার কাছে সম্পূর্ণ অভিনব। এই প্রাচীন জমিদারবাড়ী, ওই ভাঙা পুজোর দালানের কার্নিশে বটচারাটা, জানালার বাইরে ওই গোলার সারি, এই সুগায়িকা মেয়েটি—সব যেন স্বপ্ন। আমি জানি এ বিয়ে হবে না, বিয়ে করার ইচ্ছে নেইও আমার, থাকলেও উপায় নেই—ব্যবসা-জীবনের সবে আমার শুরু, এখন বিয়ে ক'রে নিজেকে সংসার-জালে জড়িত করতে চাই নে আমি। তা ছাড়া ওঁরা অনেক কিছু ভুল খবর শুনেচেন আমার সম্বন্ধে, এটা ওঁদের কথাবার্ত্তা থেকে বুঝতে পারলাম। আমি সামান্যই ব্যবসা করি, তাও একটি বন্ধুর সঙ্গে ভাগে। সামান্য পুঁজির উপর ব্যবসা—এমন কিছু আয় হয় না যা'তে কলকাতা শহরে বাসা ক'রে পরিবার নিয়ে সচ্ছলভাবে থাকা যায়।

এমন সময় ভট্‌চাজ মশায় এমন একটি কথা বল্লেন যা'তে আমি একেবারে অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

তিনি বল্লেন—বাবাজীর নিজের বাড়ী আছে কলকাতায়, নিজেই করেচেন—

রায় মশায় বল্লেন—হ্যাঁ, সে তো আপনি বল্লেন সেদিন—

আমি অবাক। ভট্‌চাজ মশায় জেনে শুনে মিথ্যে কথা বলচেন ঘটকালি অগ্রসর করবার

জন্তে, না উনি আমার সম্বন্ধে ভুল খবর পেয়েছেন ?

আমি তখনি প্রতিবাদ করতাম কিন্তু হঠাৎ কেমন দুর্ব্বলতা এসে গেল মনে। ওই যে মেয়েটি এখানে বসে আছে, ওর কাছে এখুনি এত খেলো হব কেন ? বিয়ে হবে না জানি, মেয়েটি উঠে যাক—আমিও এখান থেকে চলে যাই—তারপর আমি যা করবো তা আমার জানাই আছে।

রায় মশায়ই বল্লেন—তা'হলে মেয়েটিকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যেতে পারি ?

অপরাধের বোঝা যথেষ্টই ভারী হয়েছে তাঁর কাছে আমার। আর নয়—আমি মেয়েকে নিয়ে যেতে বল্লাম। একটু পরে এল বাড়ীর মধ্যে থেকে মেয়ের হাতের নানারকম সূচের কাজকর্ম—একটি রাশ। কত রকমের তুলোর কুকুর, পশমের আসন, রুমাল, টেবিল ঢাকা কাপড়, মাছের আঁশের হাঁস, ফ্রেম বাঁধানো—ইত্যাদি ! একটি সুদর্শন ছোট ছেলের সঙ্গে একজন ঝি সেগুলো নিয়ে এসে আমার সামনে রাখলে। গিন্নিমা নাকি সেগুলি পাঠিয়েছেন।

আরও আধ ঘণ্টা।

এইবার রওনা হতে হবে। ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। সীতানাথ রায় মশায় আমাকে প্রথমে কিছুতেই আসতে দেবেন না, রাত হয়ে আসচে—এখন তিনি আমায় ছেড়ে দিতে পারেন না। রাত্রে এখানেই থাকতে হবে।

আমি বল্লাম—কোন অসুবিধে হবে না, মঙ্গলগঞ্জের ঘাটে নৌকো ভাড়া ক'রে চলে যাবো। সে ঘাট তো মোটে ছ'মাইল। জ্যোৎস্নারাত্রে বেশ চলে যাবো।

সীতানাথ রায় মশাই আমার সঙ্গে একাই খানিক দূর হেঁটে চললেন। বল্লেন—আপনাকে আর বেশি কি বলবো মেয়ে আমার বড্ড ভালো।

—আজ্ঞে নিশ্চয়ই।

—আপনার মতামতটা যদি জানাতেন—

—সেটা আমার মামার সঙ্গে পরামর্শ করে আপনাকে জানাবো, কারণ মামাই বলতে গেলে এখন অভিভাবক—

বলা বাহুল্য, যে মাতুলকে কর্ম্মকর্ত্তা নির্দ্দেশ করলাম, তাঁর খবর পর্য্যন্ত রাখিনি আজ তিন চার বছর।

বল্লুম—তাহ'লে আপনি আর এগোবেন না—সন্ধে হয়ে এল—

স্থানটি নির্জ্জন। গ্রাম ছাড়িয়ে বড় একটা বিল ডান দিকে, সামনে ধূ ধূ মাঠের বুক চিরে সাদা বালির রাস্তা সোজা পশ্চিম দিকে চলে গিয়েচে। কেউ কোথাও নেই।

রায় মশায় এদিক ওদিক তাকিয়ে স্বর নীচু করে বল্লেন—যা'তে এ হয়, তা তোমাকে করতেই হবে বাবাজী। আমার স্ত্রীর বড্ড পছন্দ হয়েচে তোমাকে, আমায় ডেকে বলছিল। আর কি জানো, বাইরে ঠাট যতই ছাখো, তেমন অবস্থা তো আর নেই। তোমার মত সুপাত্র কোথায় পাবো। দেনা পাওনার জন্ত কিছু আটকাবে না—তোমার কলকাতার বাড়ী সাজানো আসবাবপত্তর দিতে পারব না হয়তো, তবে মেয়ের গা সাজানো গহনা

দেখো। ত্রিশ ভরি সোনা দেবো, ওর গর্ভধারিণীর যা আছে, তা দুই মেয়েকে তিনি ভাগ ক'রে দেবেন। তাহলে মনে থাকে যেন বাবাজী—

এই প্রথম তিনি আমায় ঘনিষ্ঠ সম্বোধন করলেন।

চলে এলাম সেদিন এবং কয়েকদিন পরে কলকাতাতেও এলাম। তারপর আমি কোন উচ্চবাচ্য করিনি এ বিষয়ে। সীতানাথ রায় মশায় পত্র দিয়েছিলেন, লোক পাঠিয়েছিলেন। বহু অনুরোধ করেছিলেন—শেষ পর্য্যন্ত যদি আমি বিবাহ করি, উৎকৃষ্ট ধানের জমি মেয়ের নামে লেখাপড়া করে দিতে চেয়েছিলেন,—প্রায় পনেরো বিঘে। বড়ই দুঃখের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে হ'ল আমায়। তিনি আগাগোড়া ভুলের ওপর যে বাড়ীর ভিৎ পত্তন করেছিলেন, সে ভিতের ওপর আমি বাড়ী তুলতে পারি নি।

সব কথা খুলে বলি নি কেন?

তখন বয়স ছিল কম। গর্ব্বে বাধে, মুখ ছোট হয়ে যায়। এখন হ'লে সব খুলে বলতাম, তখন তা পারি নি।

এখন দেশেই আছি। এই যুদ্ধের বাজারে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার চালানো বড়ই কষ্ট। ব্যবসা অনেকদিন নষ্ট হয়ে গিয়েচে—বন্ধুই হ'ক আর যে-ই হ'ক ভাগে ব্যবসা না করাই ভালো—এই অতি মূল্যবান অভিজ্ঞতা ক্রয় করতে হয়েচে অতি কষ্টে উপার্জ্জিত হাজার সাতেক টাকার বিনিময়ে।

সেদিন প্রভা বল্লে—সামনের মাসে ধান ফুরিয়ে যাবে। ছত্রিশ টাকা চালের মণ, কি ক'রে এই পুরীপাল্লা চালাবো। সস্তায় নাকি কনট্রোলের ধান দিচ্চে মহকুমায়—চেষ্টা দেখো না?

তাই আজ ক'দিন ধরে হাঁটাহাটি করছি মহকুমায়। ধান সস্তায় দেবার মালিক এক বড় অফিসার, তিনি কলকাতা থেকে এসে দিন পনেরো আছেন। তাঁর আরদালি ক'দিন ফিরিয়ে দিয়েচে।

আজ নকুড় চক্কত্তি বল্লে, এমনি না হয়—একজন উকিল ধরে হাকিমের কাছে দরখাস্ত দিতে হবে! রোজ হেঁটে আর পারিনে—

তাই দু'জনে মিলে একখানা নৌকো ভাড়া করে এসেছিলাম।

বেলা দশটার সময় হাকিমের বাসার ফটকে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে না, ভেতরে ঢুকতেও সাহস হয় না। এমন সময় হাকিমের ছোকরা আরদালিকে আসতে দেখে তাকে বল্লাম—ওহে শোনো, আমাদের দরখাস্তখানা নিয়ে যাও না সাহেবের কাছে?

হাকিম বাঙালী হলেও তাঁকে সাহেব বলাই নিয়ম।

লোকটা ইতস্তত করচে দেখে নকুড় চক্কত্তি তাকে দু'আনা পয়সা দিয়ে বল্লে—পান

বিড়ি খেয়ো। আমরা গরীব লোক, নিয়ে যাও দরখাস্তখানা, আজ ন'দিন হাঁটাহাঁটি করচি। ধান মঞ্জুর হ'লে তোমায় আরো কিছু দেবো—

আরদালি কি ভেবে দরখাস্ত নিয়ে চলে গেল।

দু'ঘণ্টা কারো দেখা নেই—কেউ ডাকে না। সাহেব তো দূরের কথা, আরদালিরও চুলের টিকি আর দেখা যায় না। নকুড় চক্কত্তি বল্লে—কি ব্যাপার হে, দু'আনা পয়সাই গেল এ বাজারে—থাকলে তবুও ছেলেপিলের জন্য দু'খানা গজা টজা নিয়ে গেলে—

এমন সময় সেই ছোক্‌রা আরদালি বারান্দায় বেরিয়ে বল্লে—রামলাল বাবু কার নাম ?

নকুড় চক্কত্তি বল্লে—যাও হে, তোমায় ডাক পড়েচে—দেখে এসো—আমার কথাটাও একটু ব'লো। না খেয়ে মরে যাবে ছেলেপিলে—

বারান্দা পার হয়ে সামনের সাজানো মাঝারি গোছের ঘরে ঢুকেই আমি সামনে একটি মহিলাকে দেখে একেবারে চমকে গেলাম। থতমত খেয়ে সরে যাব কিনা ভাবচি, এমন সময়ে মেয়েটি হাত তুলে আমায় নমস্কার করলে। আমি আরও থতমত খেয়ে গেলাম।

হাতের একখানা কাগজ দেখিয়ে মেয়েটি বল্লে—এ দরখাস্ত আপনি করেচেন ? আমি আপনার নাম দেখে বুঝেচি আর গ্রামের নাম দেখে—আমায় চিনতে পারলেন না ?

নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে মেয়েটির দিকে ভালো ক'রে চাইলাম। কোথায় যেন দেখেচি, কিন্তু মনে করতে পারলাম না কোথায় দেখেচি।

মেয়েটি মৃদু হেসে বল্লে—আমাদের বাড়ী আপনি গিয়েছিলেন—আমার বাবার নাম শ্রীসীতানাথ রায়, কাপাসীপাড়া—

আমার সমস্ত শরীর যেন কাঠের মত আড়ষ্ট হয়ে গিয়েচে। এই সেই স্মৃতি, সীতানাথ রায়ের মেয়ে।

মেয়েটি আবার বল্লে—আমি আপনাকে আরও দুদিন দেখেচি। দেখেই চিনেছিলাম, একটু সন্দেহ ছিল—আজ দরখাস্তে আপনার নাম দেখে আর সন্দেহ রইল না। উনি একটু বিশ্রাম করচেন। আপনার দরখাস্ত ওঁকে ব'লে মঞ্জুর করিয়েচি—নিয়ে যান। চেহারা খারাপ হয়ে গিয়েচে আগেকার চেয়ে। একটু চা খাবেন ?

আমি যেন সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে বল্লাম—না—না—এখন থাক্—

মেয়েটি হাত তুলে নমস্কার ক'রে বল্লে—এবার এখানে এলে কিন্তু আবার দেখা করবেন। ওঁকে বলেচি আমার বাপের বাড়ীর দেশে আপনার পিসিমার বাড়ী। অবিশ্যি আসবেন, চা খাবেন সেদিন—

আমি দরখাস্ত হাতে নিয়ে বার হয়ে এলাম। সস্তায় দু'মণ ধানের পারমিট পেয়েছি। স্ত্রী-পুত্র এখন দু'মাস খেয়ে বাঁচবে।

ওর ভাল নাম বোধ হয় ছিল নিস্তারিণী। ওর যৌবন বয়সে গ্রামের মধ্যে অমন সুন্দরী বৌ ব্রাহ্মণপাড়ার মধ্যেও ছিল না। ওরা জাতে যুগী, হরিনাথ ছিল স্বামীর নাম। ভদ্রলোকের পাড়ায় ডাকনাম ছিল, 'হ'রে যুগী'।

নিস্তারিণীর স্বামী হরি যুগীর গ্রামের উত্তর মাঠে কলাবাগান ছিল বড়। কাঁচকলা ও পাকাকলা হাটে বিক্রী ক'রে কিছু জমিয়ে নিয়ে ছোট একটা মনোহারি জিনিসের ব্যবসা করে। রেশমি চুড়ি ছ'গাছা এক পয়সা, দু'হাত কার এক পয়সা—ইত্যাদি। প্রসঙ্গক্রমে মনে হ'ল 'কার' মানে ফিতে বটে; কিন্তু 'কার' কি ভাষা? ইংরিজিতে এমন কোনো শব্দ নেই, হিন্দি বা উর্দ্দুতে নেই, অথচ 'কার' কথাটা ইংরিজি শব্দ বলে আমরা সকলেই ধরে নিয়ে থাকি! যাক্ সে। হরি যুগীর বাড়ীতে দুখানা বড় বড় মেটেঘর, একখানা রান্নাঘর, মাটির পাঁচিল-ঘেরা বাড়ী। অনেক পুষ্যি বাড়ীতে, দু'বেলা পনেরো-ষোলোখানা পাত পড়ে। হরি যুগীর মা, হরি যুগীর দু'টি ছোট ভাই, এক বিধবা ভাগ্নী, তার দুই ছেলেমেয়ে। সংসার ভালোই চলে, মোটা ভাত, কলাইয়ের ডাল ও ঝিঙে ও লাল ডাঁটাচচ্চড়ির অভাব কোনোদিন হয়নি, গোরুর দুধও ছিল চার পাঁচ সের। অবিশ্যি দুধের অর্দ্ধেকটা ব্রাহ্মণপাড়ায় যোগান দিয়ে তার বদলে টাকা আসতো।

গ্রামের মধ্যে সুন্দরী বৌ-ঝির কথা উঠলে সকলেই বলতো—হ'রে যুগীর বৌয়ের মত প্রায় দেখতে'। গ্রামের নারী-সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি ছিল নিস্তারিণী। গেরস্তঘরের বৌ স্নান ক'রে ভিজে কাপড়ে ঘড়া কাঁকে নিয়ে যখন সে গাঙের ঘাট থেকে ফিরতো, তখন তার উদ্দাম যৌবনের সৌন্দর্য্য অনেক প্রবীণের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিত।

এ গ্রামে একটা প্রবাদ আছে অনেকদিনের।

তুলসী দারোগা নদীর ঘাটের পথ ধরে নীলকুঠীর ওদিক থেকে ঘোড়া ক'রে ফিরবার সময়ে তুঁতবটের ছায়ায় প্রস্ফুট তুঁত ফুলের মাদকতায় সুবাসের মধ্যে এই সিক্তবসনা গৌরাঙ্গী বধূকে ঘড়া কাঁকে যেতে দেখল। বসন্তের শেষ, ঈষৎ গরম পড়েচে—নতুবা তুঁত ফুল সুবাস ছড়াবে কেন?

তুলসী দারোগা ছিল অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ জাঁহাবাজ দারোগা—'হয়'কে 'নয়' করবার এমন ওস্তাদ আর ছিল না। চরিত্র হিসেবেও নিষ্কলঙ্ক ছিল, এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই। তুলসী দারোগার নামে এ অঞ্চলে বাঘে গোরুতে একঘাটে জল খেত। তার সুনজরে একবার যিনি পড়বেন, তাঁর হঠাৎ উদ্ধারের উপায় ছিল না। এ হেন তুলসী দারোগা হঠাৎ উন্মনা হয়ে পড়লো সুন্দরী গ্রাম্যবধূকে নির্জ্জন নদীতীরের পথে দেখে। বধূটিকে সন্ধান করবার লোকও লাগলে। হরি যুগীকে দু'তিনবার থানায় যেতে হ'ল দারোগার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কিন্তু নিস্তারিণী ছিল অন্য চরিত্রের মেয়ে, শোনা যায় তুলসী দারোগার পাঠানো বৃন্দাবনী শাড়ী সে পা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে বলেছিল তাদের কলাবাগানের কল্যাণে অমন শাড়ী

সে অনেক পরতে পারবে; জাতমান খুইয়ে বৃন্দাবনী কেন, বেনারসী পরবার শখও তার নেই।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে তুলসী দারোগা এখান থেকে বদলি হয়ে চলে যায়।

আর একজন লোক কিন্তু কথঞ্চিৎ সাফল্য লাভ করেছিল অন্যভাবে। গ্রামের প্রান্তে গোসাঁইপাড়া, গ্রামের মধ্যে তারা খুব অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, প্রায় জমিদার। বড় গোসাঁইয়ের ছেলে রতিকান্ত নদীর ধারে বন্দুক নিয়ে শিকার করতে গিয়েছিল—সন্ধ্যার প্রাকালে, শীতকাল। হঠাৎ সে দেখলে কাদের একটি বৌ ঘড়াসুদ্ধ পা পিছলে পড়ে গেল—খুব সম্ভব তাকে দেখে। রতিকান্ত কলকাতায় থাকতো, দেশের ঝি-বৌ সে চেনে না। সে ছুটে গিয়ে ঘড়াটা আগে হাঁটুর ওপর থেকে সরিয়ে নিলে, কিন্তু অপরিচিতা বধূর অঙ্গ স্পর্শ করলে না। একটু পরেই সে দেখলে বধূটি মাটি থেকে উঠতে পারছে না, বোধহয় হাঁটু মচকে গিয়ে থাকবে। নির্জন বনপথ, কেউ কোনদিকে নেই, সে একটু বিব্রত হয়ে পড়লো। কাছে দাঁড়িয়ে বল্লে—মা, উঠতে পারবে, না হাত ধরে তুলবো?

তারপর সে অপরিচিতার অনুমতির অপেক্ষা না করেই তার কোমল হাতখানি ধরে বল্লে—ওঠ মা আমার ওপর ভর দিয়ে। কোন লজ্জা নেই—উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করো তো—

কুণ্ঠিতা সঙ্কুচিতা বধূ ছিল না নিস্তারিণী। সে ছিল যুগীপাড়ার বৌ—তাকে একা ঘাট থেকে জল আনতে হয়, ধান ভানতে হয়, ক্ষার কাচতে হয়—সংসারের কাজকর্মে সে অনলস, অক্লান্ত। যেমনি পরিশ্রম করতে পারে, তেমনি মুখরা, তেমনি সাহসিকাও বটে। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের গৌরবে তখন তার নবীন বয়সের নবীন চোখ দুটি জগৎকে অন্য দৃষ্টিতে দেখে।

সে উঠে দাঁড়ালো, রতিকান্তের সঙ্গে কিন্তু কোনো কথা বল্লে না। বুঝতে পারলে গোসাঁইপাড়ার বাবুদের ছেলে তার সাহায্যকারী। বাড়ী গিয়ে দু-তিন দিন পরে সে স্বামীকে দিয়ে একছড়া সুপক্ক চাঁপাকলা ও নিজের হাতের তৈরী বাঁশফুলা ধানের খইয়ের মুড়কী পাঠিয়ে দিলে গোসাঁইবাড়ী। বল্লে—আমার ছেলেকে দিয়ে এসো গে—

নিস্তারিণী সেই থেকে সেই একদিনের দেখা সুদর্শন যুবকটিকে কত কি উপহার পাঠিয়ে দিত। রতিকান্তের সঙ্গে আর কিন্তু কোনদিন তার সাক্ষাৎ হয় নি। গোসাঁই-বাড়ীর ছেলে যুগী-বাড়ীতে কোনো প্রয়োজনে কোনদিন আসে নি।

রতিকান্ত কলকাতাতেই মারা গিয়েছিল অনেকদিন পরে। নিস্তারিণীর দুতিন-দিন ধরে চোখের জল থামেনি, এ সংবাদ যখন সে প্রথম শুনলে।

গ্রামের অবস্থা তখন ছিল অন্যরকম। সকলের বাড়ীতে গোলাভরা ধান, গোয়ালে দু-তিনটি গোরু থাকতো। সব জিনিস ছিল সস্তা। নিস্তারিণীদের বাড়ীর পশ্চিম উঠানে ছোট একটা ধানের গোলা। কোন কিছুর অভাব ছিল না ঘরে। বরং ব্রাহ্মণ-পাড়ার অনেককে সে সাহায্য করেছে।

একবার বড্ড বর্ষার দিনে সে বাড়ীর পিছনের আমতলায় ওল তুলচে—এমন সময় বাঁড়ুয্যেবাড়ীর মেয়ে কান্তমণি এসে বল্লে—

—ও যুগী-বৌ?

নিস্তারিণী অবাক হয়ে মুখ তুলে চাইলে। বাঁড়ুয্যেবাড়ীর মেয়েরা কখনো তাদের বাড়ীর বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে কথা বলে না। সে বল্লে—কি দিদিমণি ?

—একটা কথা বলবো।

—কি বলো দিদিমণি—

—আমাদের আজ একদম চাল নেই ঘরে। বাদলায় শুকুচ্চে না, কাল ধান ভেজে দুটো চিঁড়ে হয়েছিল। তোমাদের ঘরে চাল আছে, কাঠাখানেক দেবে ?

নিস্তারিণী এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে, তার খাণ্ডার শাশুড়ী কোনোদিকে আছে কি না। পরে বল্লে—দাঁড়াও দিদিমণি—দেবানি চাল ঘরে আছে। শাশুড়ীকে লুকিয়ে দিতি হবে—দেখতি পেলে বড্ড বকবে আমারে। তা বকুক গে, তা ব'লে বামুনের মেয়েকে বাড়ী থেকে ফিরিয়ে দেবো ?

আর একবার বাঁড়ুয্যেবাড়ীর বৌ তার বৃদ্ধা শাশুড়ীকে ঝগড়া করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল ; সে বৌ ছিল গ্রামের মধ্যে নামডাকওয়ালা খাণ্ডার বৌ—শাশুড়ীর সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া বাধাতো, কেরোসিনের টেমি ধরিয়ে শাশুড়ীর মুখ পুড়িয়ে দিয়েছিল। পাড়ার কেউ ভয়ে বৃদ্ধাকে স্থান দিতে পারে নি, যে আশ্রয় দেবে তাকেই বড় বৌয়ের গালাগালি খেতে হবে। যুগী-বৌ দেখলে বাঁড়ুয্যেবাড়ীর বেড়ার কাছে বড় সেগুনতলার ছায়ায় ন'ঠাকরুণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে হাপুস নয়নে কাঁদচেন। গিয়ে বল্লে—ন'ঠাকরুণ, আসুন আমাদের বাড়ীর দাওয়াতে বসবেন—বড় বৌ বকেছে বুঝি ?

ন'ঠাকরুণ শুচিবেয়ে মানুষ, তা ছাড়া বাঁড়ুয্যেবাড়ীর গিন্নী হয়ে যুগী বাড়ী আশ্রয় নিলে মান থাকে না। সুতরাং প্রথমে তিনি বল্লেন—না বৌ, তুমি যাও, আমার কপালে এ যখন চিরদিনের, তখন তুমি একদিন বাড়িতে ঠাঁই দিয়ে আমার কি করবে ? নগের বৌ যেদিন চটকাতলায় চিতেয় শোবে, সেদিনটি ছাড়া আমার শান্তি হবে না মা। ওই 'কালনাগিনী' যেদিন আমার নগের ঘাড়ে চেপেচে—

নিস্তারিণী ভয়ে ভয়ে বল্লে—চুপ করুন ন'গিন্নী, বৌ শুনতি পেলি আমার এশুক রক্ষে রাখবে না। আসুন আপনি আমার বাড়ীতে। এইখানে দাঁড়িয়ে কষ্ট পাবেন কেন মিথ্যে—

ন'গিন্নীকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে সে নিজের হাতে তার পা ধুয়ে দিয়ে পিঁড়ি পেতে দাওয়ায় বসালে। কিছু খেতে দেওয়ার খুব ইচ্ছে থাকলেও সে বুঝলে বড় ঘরের গিন্নী ন'ঠাকরুণ এ বাড়ীতে কোনো কিছু খাবে না, খেতে বলাও ঠিক হবে না। সে ভাগ্য সে করে নি।

অনেক রাত্রে গিন্নির বড় ছেলে নগেন খুঁজতে খুঁজতে এসে যখন মায়ের হাত ধরে নিয়ে গেল, তখন নিস্তারিণী অনেক অনুনয় বিনয় ক'রে বড় একছড়া মর্ত্তমান কলা তাঁকে দিয়ে বল্লে—নিয়ে যান দয়া ক'রে। আর তো কিছু নেই, কলাবাগান আছে, কলা ছাড়া মানুষকে হাতে ক'রে আর কিছু দিতে পারিনে—

তার স্বামী সেবার রামসাগরের চড়কের মেলায় মনোহারী জিনিস বিক্রী করতে গেল। যাবার সময় নিস্তারিণী বল্লে—ওগো আমার জন্যি কি আনবা।

—কি নেবা বলো? ফুলন শাড়ী আনবো?

—না শোনো, ওসব না। একরকম আলতা উঠেচে আজ মজুমদার বাড়ী দেখে এলাম। কলকেতা থেকে এনেচে মজুমদার মশায়ের ছেলে—শিশিনিতে থাকে। কি একটা নাম বল্লে ভুলে গিইচি।

—শিশিনিতে থাকে?

—হ্যাঁ গো। সে বড় মজা, কাটির আগায় তুলো দেওয়া, তাতে করে মাখাতে হয়। ভালো কথা, তরল আলতা—তরল আলতা—

—কত দাম?

—দশ পয়সা। হ্যাঁগা, আনবে এক শিশিনি আমার জন্যি?

—দ্যাখবো এখন। গোটা পাঁচেক টাকা যদি খেয়ে দেয়ে মুনফা রাখতি পারি, তবে এক শিশিনি ঐ যে কি আলতা তোর জন্যি ঠিক এনে দেবো।

এইভাবে গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ার সাথে টেক্কা দিয়ে নিস্তারিণী প্রসাধন দ্রব্য ক্রয় করেচে। তাদের পাড়ার মধ্যে সে-ই সর্ব্বপ্রথম তরল আলতা পায়ে দেয়। শূদ্রপাড়ার মধ্যে ও জিনিস একেবারে নতুন—কখনো কেউ দেখেনি। আলতা পরবার সময়ে যে দেখতো সে-ই অবাক হয়ে থাকতো। হাজরী বুড়ী মাছ বেচতে এসেচে একদিন—সে অবাক হয়ে বল্লে—হ্যাঁ বড় বৌ, ও শিশিনিতে কি? কি মাখাচ্চ পায়ে?

নিস্তারিণী সুন্দর রাঙা পা দুখানি ছড়িয়ে আলতা পরতে বসেছিল, একগাল হেসে বল্লে—এ আলতা দিদিমা। এরে বলে তরল আলতা।

—ওমা, পাতা আলতাই তো দেখে এসেচি চিরকাল। শিশিনিতে আলতা থাকে, কখনো শুনিনি। কালে কালে কতই দ্যাখলাম। কিন্তু বড় চমৎকার মানিয়েছে তোমার পায়ে বৌ—এমনি টুকটুকে রং, যেন জগদ্ধাত্রী পিরতিমের মত দেখাচ্চে—

এ সব ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা।

শীতের সকালবেলা। ওদের বড় ঘরের দাওয়ায় ছেঁড়া মাদুরে ছেঁড়া কাঁথা গায়ে নিস্তারিণী শুয়ে আছে। সংসারের সাবেক অবস্থা আর নেই, হরি যুগী বহুদিন মারা গিয়েচে—হরি যুগীর একমাত্র ছেলে সাধনও আজ তিন চার বছর একদিনের জ্বরে হঠাৎ মারা গিয়েচে। সুতরাং নিস্তারিণী এখন স্বামীপুত্রহীনা বিধবা। তার শাশুড়ী এখনও বেঁচে আছে, আর আছে এক বিধবা জা, জায়ের এক মেয়ে, এক ছেলে।

পঁয়ত্রিশ বছর আগের সে উজ্জ্বলযৌবনা সুন্দরী গ্রাম্য বধূটিকে আজ আর রোগগ্রস্তা, শীর্ণকায়া, মলিনবসনা প্রৌঢ়ার মধ্যে খুঁজেও পাওয়া যাবে না! হরি যুগীর মৃত্যুর সঙ্গে তাদের সে গোয়ালভরা গোরু ও গোলাভরা ধান অন্তর্হিত হয়েচে—ঘরের চালে খড় নেই, তিন চার

জায়গায় খুঁচি দেওয়া খসে-পড়া চালে বর্ষার জল আটকায় না। গত বর্ষায় চালের ওপর উচ্ছেলতা গজিয়ে একদিকে ঢেকে রেখেচে, মাটির দাওয়ার খানিকটা ভেঙে পড়েচে, পয়সার অভাবে সারানো হয়নি। কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলে। সংসারের কর্ত্তা, যার আয়ে সংসারের শ্রী, সে চলে যাওয়ায় নিস্তারিণীর আদর এ বাড়ীতে আর নেই। আগে ছিল সে-ই সংসারের কর্ত্রী, এখন তাকে পরের হাত-তোলা খেয়ে থাকতে হয়—তার ছেলে সাধন বাপের মনোহারী দোকান আর কলাবাগান কোনো রকমে বজায় রেখেছিল।

তিন বছর আগের এক ভাদ্র মাসে খুব বৃষ্টির পরে সাধন নদীর ধারে কলাবাগানে কাজ করতে গিয়ে সেখানে মারা যায়। কেন মারা যায় তার কারণ কিছু জানা যায়নি। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সাধন ফিরলো না দেখে তার ঠাকুরমা নাতিকে খুঁজতে বার হচ্চে এমন সময় বেলেডাঙার তুজন মুসলমান পথিক এসে খবর দিলে—সাধন মুখ গুঁজড়ে কলাবাগানের ধারের পথে কাদার ওপরে পড়ে আছে—দেহে বোধ হয় প্রাণ নেই।

সকলে ছুটতে ছুটতে গেল। গ্রামের লোক ভেঙে পড়লো। সকলে গিয়ে দেখলে সাধন সত্যিই উপুড় হয়ে কাদার ওপর পড়ে, সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাথা, তার ওপর দিয়ে এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গিয়েচে। যেখানে শুয়ে আছে সেখানটা রক্ত প'ড়ে অনেকখানি জায়গা রাঙা, খানিকটা বৃষ্টির জলে ধুয়েও গিয়েচে। রক্তটা পড়েচে সাধনের মুখ থেকে।

গরীবের ঘরের ব্যাপার, দু দিনই মিটে গেল। সংসারের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়লো, ক্রমে—বাড়ীতে উপার্জ্জনক্ষম পুরুষ মানুষের মধ্যে বাকী কেবল হরি যুগীর ভাই যুগলের ছেলে বলাই। যুগলও বহুদিন পরলোকগত, দাদার মৃত্যুর পর-বৎসরেই সে বিধবা স্ত্রী ও দু'বছরের শিশুপুত্রকে রেখে মারা যায়। বলাই এখন যোলো বছরের, বেশ কর্ম্মঠ, স্বাস্থ্যবান বালক।

নিস্তারিণীকে এখন আদর করে 'নিস্তার' বা 'বড়বৌ' বলে কেউ ডাকে না—যে ডাকতো সে নেই। এখন তার নাম 'সাধনের মা'। কেউ ডাকে পিন্টুর ঠাম্মা। পিন্টু সাধনের শিশুপুত্র—এখন তার তিন বছর বয়েস। সাধনের বিধবা বৌয়ের বয়স এই সবে সতেরো।

নিস্তারিণী ডাক দিল—ও পিনটু, পিনটু—

পিনটু উঠানের আমতলায় খেলা করছিল, কাছে এসে বল্লে—কি ঠাক্‌মা?

—তোর মাকে একবার ডেকে দে—

পিনটুর ডাকে তার মা এসে দাওয়ার ধারে দাঁড়িয়ে বল্লে—কি হয়েচে, ডাকচো কেন?

—আমি আজ দুটো ভাত খাবো, বল্ তোর ঠাকুরমাকে—

পুত্রবধূ ঝঙ্কার দিয়ে বল্লে—ভাত বল্লিই অমনি ভাত, খাবা কোথা থেকে? সে আমি বলতে পারবো না ঠাকুরমাকে।

—তবে একগাল খই কি চিঁড়েভাজা যা হয় দে এখন—খিদেয় মলাম—

—হ্যাঁ, আমি তোমার জন্তি বামুনপাড়ায় বেরুই লোকের দোর দোর। অসুখ হয়েচে চুপ ক'রে শুয়ে থাকো বাপু।

ওরা ওই রকম। সাধনের বৌ মুখঝামটার দেয়, তাকে একেবারেই মানে না। সেকালের আর একালের মেয়েতে কি তফাৎ, তাই সে ভাবে এক এক সময়ে। তারও একদিন সতেরো বছর বয়স ছিল, কখনো শাশুড়ীর একটা কথায় অবাধ্য হতে সাহস হ'ত তার? আশ্চর্য্যি।

একটু পরে নিস্তারিণীর শাশুড়ী এসে দূরে দাঁড়িয়ে বল্লে—বলি, হ্যাঁ বৌ, তোমার আক্কেলখানা কি? আজ নাকি ভাত খেতে চেয়েচ? জ্বর রয়েচে চব্বিশ পহরের জন্তি। ভাত খেলেই হল অমনি?…বলি, সোয়ামী খেয়েচ পুত্তুর খেয়েচ, দেওর খেয়েচ—এখনো খাওয়ার সাধ মেটেনি তোমার?

নিস্তারিণী বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েচে অসুখে—তবু সে বল্লে, সোয়ামি পুত্তুর তো তুমিও খেয়েছিলে, তবুও তিন পাথর ক'রে ভাত মারো তো তিনটি বেলা। লজ্জা করে না বলতি?

নিস্তারিণীর শাশুড়ী এ'কথার উত্তরে চীৎকার ক'রে গালাগালি দিয়ে এক কাণ্ডই বাধালে। সাধনের বউকে ডেকে ব'লে দিলে—ওকে কিছু খেতে দিবিনে আজ ব'লে দিচ্চি। এ সংসারে যে খাটবে, সে খাবে। আমরা সবাই মায়ে ঝিয়ে খাটি, ও শুধু শুয়ে থাকে। রোগ নিয়ে শুয়ে থাকলি এ সংসারে চলে না। তার ওপর আবার যে সে রোগ নয়, ওকে বলে পাণ্ডুর রোগ। মুখ হলদে, চোখ হলদে, হাত পা ফুলেচে, ও কি সহজ রোগ? ও আর উঠবেও না, খাটবেও না, কেবল শুয়ে শুয়ে পাথর পাথর খাবে।

নিস্তারিণী বল্লে—খাবো—খাবো, বেশ করবো। আমার খোকা কলাবাগান সামলে রাখতো, তারই আয়ে বাড়ীসুদ্ধ খাওনি? সেই কলাবাগান তদ্বির করতে গিয়েই বাছা আমার চলে গেল। তোমরা ওদের বাপছেলের রক্ত জল করা কলাবাগান, মনিহারি ব্যবসা ঘোচালে। এখন আমায় বসিয়ে খেতে দেবে না তো কি করবে? নিশ্চয়ই দিতে হবে।

—বাসি আখার ছাই খেয়ো দেবো। ডাইনি রাক্কুসি—আমার সংসার তোর দিষ্টিতে জলে পুড়ে গেল—নইলে কি না ছেল, গোলাভরা ধান ছেল না? হাঁড়ি ভর্ত্তি ডালভুল, গোয়াল ভর্ত্তি গোরু ছাগল—ছেল না কি?

উভয় পক্ষের চেঁচামেচি শুনে ওর জা নির্ম্মলা সেখানে এসে পড়লো। এটি হরি যুগীর ছোট ভাই যুগলের বিধবা স্ত্রী। এর একমাত্র পুত্র বলাই এই সংসারের একমাত্র উপার্জ্জনক্ষম পুরুষ মানুষ। বলাইয়ের বয়েস এই উনিশ বছর।

বলাই বাঁশ কিনে গাড়ী বোঝাই দিয়ে রেলস্টেশনে নিয়ে যায়, সেখান থেকে মালগাড়ীতে উঠিয়ে কলিকাতায় পাঠায়। গত বছরখানেক এ ব্যবসা ক'রে সে গোটা পঞ্চাশ টাকা হাতে জমিয়েচে—মার হাতেই এনে দিয়েচে সে টাকা। নির্ম্মলা আবার সে টাকাটা থেকে কুড়িটি টাকা শাশুড়ীকে দিয়েচে। বুড়ী সেই টাকায় পাশের গ্রাম থেকে দুধ কিনে এ গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ায় যোগান দেয়, তাতেও সামান্য কিছু লাভ থাকে। বুড়ীর বয়স সত্তর ছাড়িয়ে গেলেও সে এখনও দুপুর রোদে সারা পাড়া, সারা গ্রাম ঘুরে বেড়ায়—

দূর দূরান্তরের চাষাগাঁয়ে হাঁসের ডিম, মুরগীর ডিম সংগ্রহ করতে যায় ব্রাহ্মণপাড়ায় বিক্রির জন্তে।

নির্মলা নিজেও বসে থাকে না, তিনু গাঙ্গুলীর বাড়ী ঝিয়ের কাজ ক'রে মাসে দু'টাকা মাইনে পায়।

সুতরাং এ সংসারে এখন নির্মলার প্রতিপত্তিই বেশি। নিস্তারিণীর দিন সকল রকমেই চলে গিয়েচে। এখন নির্মলার ছেলে বলাই পয়সা আনে, নির্মলা নিজে পয়সা আনে, বলাইয়ের পয়সায় ওর ঠাকুরমা দুধের যোগান দিয়ে কিছু আয় করে। নিস্তারিণী শীর্ণ পাণ্ডুর দেহে উত্থানশক্তিরহিত শয্যাগত অবস্থায় শুধু 'খাই খাই' করে রোগের দুষ্টক্ষুধায় অবোধ বালিকার মত। হরি যুগী বেঁচে থাকলে তার সে অন্যায় আবদার খাটতো, সাধন বেঁচে থাকলেও খাটতো। আজ তার আবদার কান পেতে শোনবার লোক কে আছে এ সংসারে।

নির্মলার বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ—বেশ ধপধপে ফর্সা, কৃশাঙ্গী, মুখচোখ ভালোই, মাথায় এখনো একঢাল চুল, চুলে একটিও পাক ধরে নি। যুগীদের মেয়েরা সাধারণত সুন্দরী হয়ে থাকে—নির্মলার মেয়ে তারা বেশ সুন্দরী। তারা বলাইয়ের ছোটো, এই মাত্র চোদ্দ বছর বয়েস। আজ বছর দুই হ'ল এই গ্রামেই তার বিয়ে হয়েচে।

নির্মলা এসে বল্লে—দিদি, চেঁচিও না। ঝগড়া করে মরচো কেন?

নিস্তারিণী কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—ছাক দিকি ছোট বৌ, আমায় কিনা রাক্ষুসি, ডাইনি বলে। আমি নাকি এসে ওনার সংসারে আগুন লাগিয়ে দিইচি। আমার সোয়ামী পুত্তুরের অন্ন উনি কোনো দিন বুঝি দাঁতে কাটেন নি—

নির্মলা বল্লে—সে তো তুমিও ওনাকে বলেচো। যাক্, এখন চুপটি ক'রে শুয়ে থাকো।

—ও ছোট বৌ, আমি দুটো ভাত—

—না, আজ না। তোমার গা ফুলেচে, মুখ ফুলেচে—তুমি ভাত খাবে কি ব'লে আজ?

—তা হোক, তোর পায়ে পড়ি—

—আচ্ছা এখন চুপ করো, বেলা হোক! ভাত রান্না হোক, আমি বলবো তখন।

নিস্তারিণীর হাত, পা, মুখ ফুলেচে একথা ঠিকই। বিশ্রী চেহারা হয়ে গিয়েচে একথা ঠিকই। কি বিশ্রী চেহারা হয়ে গিয়েচে তার, ওর দিকে যেন আর তাকানো যায় না—এমন খারাপ দেখতে হয়েচে ও। যত্ন করবার কেউ না থাকাতে আরও দিন দিন ওর অবস্থা খারাপতর হয়ে উঠেচে। খেতে ইচ্ছে করে কিন্তু আগ্রহ ক'রে খেতে দেবার কেউ নেই। রোগীর পথ্য তো দূরের কথা, দুটি ভাত তাই কেউ দেয় না।

ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে বেলা দশটা আন্দাজ সময়ে সে নাতিকে ডেকে চুপি চুপি বল্লে—পিনটু, দুটো পেয়ারা আনতে পারিস?

পিনটুর মা ছেলেকে বলে—খবরদার, যাবি নি বুড়ীর কাছে। ওর পাণ্ডুর রোগ হয়েচে, ছোঁয়াচে রোগ। ছেলে খেয়ে বসে আছে ডাইনি, আবার নাতিকে খাবার যোগাড় করচে।

ঠ্যাঙ ভেঙে দেবো যদি ওর কাছে যাবি—

বেলা দুপুরের পরে সে ভীষণ জ্বরে বিকেল পর্য্যন্ত অঘোরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইল—কখন যে এ বাড়ীর লোকে খাওয়া দাওয়া করেচে তা সে কিছুই জানে না। যখন তার খানিকটা জ্ঞান হ'ল, তখন ভাদ্র মাসের রোদ প্রায় রাঙা হয়ে উঠোনের আম গাছটা, বাঁশ-ঝাড়গুলোর আগায় উঠে গিয়েচে। মুখের কাঁথাটা খুলে দিয়েই ও চিঁ চিঁ ক'রে প্রথমেই ডাকলে—ও পিনটু, পিনটু—

পিনটু কোথা থেকে ছুটে এসে বল্লে—কি ঠামা ?

—আমার জন্যি সেই পেয়ারা এনেলি ?

—না ঠামা।

—আনিস্ নি ? ছেলেমানুষ ভুলে গিয়েচিস। বোস এখানে।

কিন্তু পিনটু বসতে ভরসা পায় না, মা দেখতে পেলে মার খেতে হবে। সে আনমনে খেলা করতে করতে অন্যদিকে চলে গেল। একটু পরে নিস্তারিণী আবার ডাকলে—ও ছোট বৌ—ছোট বৌ—

কেউ উত্তর দিল না, কারণ এ সময়ে বাড়ীতে কেউ থাকে না।

আরও দু'বার ডাক দিয়ে নিস্তারিণী অবসন্ন হয়ে পড়লো, তার বেশি চেঁচামেচি করবার ক্ষমতা নেই।

বেশ খানিকক্ষণ পরে নির্ম্মলার মেয়ে তারা এসে বল্লে—হ্যাঁ জ্যাঠাইমা ডাকছিলে ?

নিস্তারিণী চিঁ চিঁ করতে করতে বল্লে—কাত্‌রে কাত্‌রে মরে গেলাম। তা যদি তোমাদের একজনও উত্তর দেবে। একজন এমন রুগী বাড়ীতে রয়েচে—বোস এখানে একটু—

তারা ওর মায়ের মত ছিপছিপে গড়নের সুন্দরী বালিকা। নতুন বিয়ের কনে, পাশেই শ্বশুরবাড়ী। নবীন যুগীর ছেলে অভিলাষ তার স্বামী। এই মাত্র শ্বশুরবাড়ী থেকেই আসছে। আসবার কারণ অন্য কিছু নয়। অভিলাষ এখুনি গরম মুড়কি মেখেচে, বালিকা স্ত্রীকে আদর করে বলেচে, তোদের বাড়ী থেকে ধামি নিয়ে আয় মুড়কি খেতে দেবো। এই জন্যেই তার আগমন। রোগগ্রস্ত জ্যাঠাইমা বুড়ীর বকুনি শুনবার জন্যে সে এখন এখানে বসতে আসেনি। সুতরাং সে বিব্রত মুখে বল্লে—ও জ্যাঠাইমা, আমি এখন বসতে পারবো না, তোমার জামাই মুড়কি মেখেচে, নিয়ে বেলেডাঙায় ফিরি করতে বেরুবে—

—তোর মা কোথায় ?

—বাড়ীতে কেউ নেই। মা গাঙ্গুলী বাড়ী কাজ করতে গিয়েছে, ঠাকুমা নরহরিপুরে হাঁসের ডিম আনতে গিয়েচে—

—পিনটুর মা কোথায় ?

—ঐ যে শিউলীতলায় বসে বাসন মাজচে—

—একটু ডেকে দিয়ে যা দিকি মা—

পরে সুর খুবই নীচু ক'রে বল্লে—মা দুটো মুড়কি অভিলাষের কাছ থেকে নিয়ে আয় না ?

আমার নাম যেন করিস নে—

তারা বল্লে—সে আমি পারবো না। অসুখ গায়ে মুড়কি খাবে কি? তারপর শেষকালে ঠাকুমা টের পেলে আমায় বকে ভূত ঝাড়াবে। চল্লাম আমি—ও বৌদিদি, শুনে যাও জেঠিমা ডাকচে—

পুত্রবধূ বিরক্ত মুখে এসে দূরে উঠোনে দাঁড়িয়ে বল্লে—বলি ডাকের ওপর ডাক কেন অত? আমার সংসারে কাজকর্ম নেই, না তোমার কাছে বসে থাকলে চলবে? কি বলচো বলো—

নিস্তারিণী কাতরস্বরে বল্লে—তা রাগ করিস নে আমার ওপর বৌমা। আমায় দুটো ভাত দে—

—দিই। জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছ, ভাত না খেলে কি চলে!

—তবে আমি কি খাবো, খিদে পায় না?

—আমি জানিনে। আদিখ্যেতার কথা শোনো'। খিদে পায় তা আমি কি করবো? ঠাকুমা এলে বলো। ঠাকুমা না বল্লি আমি ভাত দিতি পারবো না।

—পিনটু কোথায়? একটু ডেকে দে আমার কাছে—বড্ড ইচ্ছে করে দেখতি—

পুত্রবধূ ঝঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠলো—অত সোহাগে আর কাজ নেই। ছেলের মাথা খেয়ে বসে আছে, এখন নাতিটি বাকি?

নিস্তারিণী মিনতির সুরে বল্লে—অমন ক'রে বলতি নেই, বৌমা। তা দে ডেকে, কিছু হবে না, দে একবার ডেকে—

পুত্রবধূ হাত পা নেড়ে বল্লে—না—না—হবে না। তোমার পাণ্ডুর রোগ হয়েচে, বিশ্রী ছোঁয়াচে রোগ। আমি ছেলে পাঠাতি পারবো না তোমার কাছে। গেলি আমারি যাবে—তোমার কি?

কথা শেষ ক'রেই মুখ ঘুরিয়ে পুত্রবধূ চলে গেল। নিস্তারিণীর দুই চোখ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল গড়িয়ে পড়ে' ছেঁড়া, ময়লা, তেলচিটে বালিশটা ভিজিয়ে দিলে। এমন কথাও লোককে লোকে বলে—তাও নিজের পুত্রবধূ। সাধনের নাম রেখেচে ওই ধুলোগুঁড়োটুকু—ওই অবোধ শিশু। মা সাতভেয়ে কালী, তার মঙ্গল করুন, মঙ্গল করুন।—সে না তার ঠাকুর-মা? বৌমা বলে কিনা, গেলে তারই যাবে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে নির্ম্মলা বামুনবাড়ীর কাজকর্ম্ম সেরে ফিরে এল। বড় জায়ের কাছে গিয়ে বল্লে—কেমন আছ দিদি? দেখি, গা দেখি—

নিস্তারিণী না ঘুম না জ্বরে আচ্ছন্নমত হয়ে পড়ে ছিল, কপালে ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ পেয়ে জেগে উঠে বল্লে—কে? ছোট বৌ? তুই আবার আমায় ছুঁলি কেন, তোর পাছে পাণ্ডুর রোগ হয়—আজ আমায় বৌমা বলেছে—হ্যাঁ, ছোট বৌ সাধনের ছেলে আমার কেউ নয়? বুলো তুমি—

নিস্তারিণী নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো। নির্ম্মলা বল্লে—চুপ করো চুপ করো দিদি, সবই

তোমার কপাল। পিরতিমের মত বৌ ছিলে, সব তো দেখেচি। স্বভাব-চরিত্তির সম্বন্ধে কেউ একটা কথা বলতি পারে নি কোনো দিন।

—কেন, দেওরদের কোলেপিঠে করে মানুষ করি নি? আমি যখন ঘর করতি এলাম, তোর সোয়ামী তখন ন' বছরের ছেলে। আমার পাত থেকে বেগুন পোড়া ভাত মেখে খেতো—আর আজ আমি হইচি নাকি ডাইনি—

—চুপ করো দিদি। এসব কথা আমি সব জানি। এখন কি খাবে তাই বলো—

নিস্তারিণী মিনতির সুরে বল্লে—দুটো ভাত—

—না, আমায় বকিও না। সারাদিন কাজ ক'রে দুঃখধান্দা ক'রে এলাম। দুটো মুড়ি নিয়ে এসেচি—

—শোন ছোটবৌ, অভিলাষ আজ গরম মুড়কি মেখেচে, তারা বল্লে গেল—

—না, সে সব হবে না। গুড়ের মুড়কি জ্বর হ'লে খায় না। দুটো তেল নুন দিয়ে মুড়ি মেখে দিগ, খেয়ে এক ঘটি জল খেয়ে আজ রাত্তির মত পড়ে থাকো। শুনেচ কাণ্ড, বাজারে নাকি চালের পালি দেড় টাকা! ভাত আর খাতি হবে না। বলাই আর কত রোজগার করবে? কি ক'রে এই বিধবার পুরী চালাবে? ধান ফুরিয়ে এসেচে, এবার আমাদের মত গরীবদের না-খেয়ে মরণ।

নিস্তারিণী স্তব্ধ হয়ে শুনলে। অসুস্থতার দরুণ সে বহুদিন অবধি বৈষয়িক ব্যাপারে নিস্পৃহ, তবুও দেড় টাকা এক পালি চাল শুনে সে যেন অত জ্বরের ঘোরের মধ্যেও চমকে গেল। সেকালে যে তাদের গোলার ধান বিক্রি হয়েচে,—আঠারো আনা ক'রে সরু বাঁশফুলা কি চামরমণি ধানের মন। মনে আছে একবার তার প্রথম পুত্রের অন্নপ্রাশনের জন্য গোলা থেকে পঁচিশ টাকার ধান বিক্রি হয়—পাঁচ সিকা ছিল এক মন ধানের দাম।

নিজের হাতে সে কত ধান বিলিয়ে দিয়েচে···একবার গাঁয়ে আকাল হয়েছিল, টাকায় সাড়ে তিন সের হয়ে উঠলো চালের দাম। বামুনপাড়ার মেজ গিন্নি একদিন তাকে বাড়ীতে ডেকে বল্লেন,—"বৌ, তোমায় একটা কথা বলি। খাওয়াদাওয়ার বড্ড কষ্ট, দু'মন ধান আমাকে ধার দিতে হবে। ঈশ্বরের ইচ্ছেয় তোমার কোনো অভাব নেই। গোলা আরও উথলে উঠুক তোমার।" সে শাশুড়ীকে লুকিয়ে দু'মন ধান বার করে দিয়েছিল গোলা থাকে। শাশুড়ী চিরকালের খাণ্ডার, কাউকে কিছু জিনিস দেওয়া পছন্দ করতো না কখনো। কিন্তু তখনকার দিনে এ সংসারে তার প্রতিপত্তি ছিল অন্য রকম। সে যা করবে তাই হবে। তার ওপর কথা বলবার কেউ ছিল না। কোথায় গেল সে সব দিন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে। নির্মলা এক বাটি দুধ নিয়ে এসে বল্লে—ও দিদি, খেয়ে নাও একটু দুধ।

নিস্তারিণী বল্লে—আমার এখানে একটু বোস ছোটবৌ—কেউ বসে না।

নির্মলার বেশীক্ষণ এক জায়গায় বসবার জো নেই। এক্ষুনি সব খেতে চাইবে, শেষ রাত্রে উঠে চার কাঠা ধানের চিঁড়ে কুটতে হবে বাঁড়ুজ্যেদের।

তারপর আবার যে একা, সেই একা। সারা দিনরাত আজ একটি মাস ধরে একাই শুয়ে থাকতে হচ্ছে। নির্মলা তাকে ধরাধরি ক'রে ঘরের মধ্যে শুইয়ে দিয়ে গেল।

একদিন দু'দিন করে কতদিন যে কাটলো, নিস্তারিণীর কোনো খেয়াল নাই। কেবল আব্‌ছা আব্‌ছা দিনগুলো আসে, সে সব দিনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত যেন নিঃসঙ্গ, কেবল ছোট্ট খোকা পিনটুকে দেখতে ইচ্ছে করে···কিন্তু তার মা তাকে পাঠায় না, একটুও বসতে দেয় না কাছে। পুত্রবধূ হয়ে শাশুড়ীকে দেখতে পারে না···তার নাকি ছোঁয়াচে রোগ হয়েছে বলে। আর কেবল সবাই বকে, সবাই বকে।

একদিন সে শুয়ে শুয়ে লক্ষ্য করলে আর আকাশে বৃষ্টি হয় না। হল্‌দে রঙের রোদ বাঁশঝাড়ে, আমগাছের মাথায়। তেলাকুচো লতায় সাদা সাদা ফুল ধরেছে, বলাইয়ের হাতে পোঁতা উঠোনের রাঙা ডাঁটা শাক ক্রমে ফুরিয়ে আসছে। বর্ষাকাল তা হ'লে চলে গিয়েছে।

পুত্রবধূ আমতলায় কাঠ কাটছে। জিগ্যেস করলে—ও বৌমা, এটা কি মাস ?

—সে খোঁজে কি দরকার তোমার ?

—বল না বৌমা ?

—শেষ ভাদ্দর। তোমার কি হুঁশ পোড়েন আছে ? সেদিন চাপড়া ষষ্ঠী গেল, খোকাকে তোমার আশীর্বাদ করা দরকার। তোমার কাছে গিয়ে ডাকলে, তা যদি একটা কথা বল্লে—

বিকেলে ও-পাড়ার বুধো গোয়ালার মা দেখা করতে এসে বলে—ও মা, এ কি চেহারা হয়ে গিয়েছে ! আহা, কতদিন হয়েছে আসিনি—বলি, শুনচি বড্ড অসুখ, একবার দেখে আসি। উদুরী হয়েছে বুঝি, পেট যে ফুলেচে বড্ড। সোনার পিরতিমে চেহারা ছিল বৌমার। আমি তো আজকের লোক নই, যখন হরি প্রথম বিয়ে ক'রে এল—ওই আমতলায় দুধে আলতার পিঁড়িতে দাঁড়াল, বেশ মনে আছে। রূপে একেবারে ঝলক দিয়ে গেল যেন। সে চেহারার আর কিছু নেই। এমন লক্ষ্মি বৌ—আহা, তার এত কষ্টও ছেল অদেষ্টে।

নিস্তারিণী যেন সব বিষয়ে নিস্পৃহ, উদাসী হয়ে পড়েছে। এ সব কথা শুনে যায় বটে, কিন্তু কার বিষয়ে কে যেন কথা বলছে। সে কালের সে বড়বৌ তো কোন্ কালে মরে হেজে গিয়েছে। সে রূপসী, লক্ষ্মীর মত সংসারজোড়া বড়বৌ কোথায় আজ ?···কেবল খেতে ইচ্ছে হয়। পান্তাভাত কতকাল খায় নি। কেউ দেয় না—দেখাই করে না এসে। সন্ধ্যার পরে নির্মলা এসে একটু কাছে বসে। বলে—ও দিদি, তোমার জন্যি একটা জিনিস এনেছি মনিববাড়ী থেকে।

নিস্তারিণী ব্যগ্রভাবে বলে—কি—কি ?

—চুপ করো। দু'টো তালের বড়া। গিন্নি ভাজছে তা আমাকে খেতে দেলে—

—কতকাল খাইনি। দে—

নির্মলা বেশীক্ষণ বসতে পারে না, রান্নাঘরে খই ভেজে দিতে হবে জামাই অভিলাষকে। তারা ব'লে দিয়েছে—কাল মুড়কি মাখবে সকালবেলা। সে মুড়কির ব্যবসা করে, কিন্তু খই

ভাজা কাজটা মেয়েমানুষের, পুরুষের নয়—ওটা শাশুড়ীর বিনা সাহায্যে সম্পূর্ণ হয় না।

রান্নাঘরে যেতে সাধনের বৌ বল্লে—কাকীমার বুড়ীর কাছে রোজ বসা চাই-ই। অমন ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে—পাপের দেহ তাই কষ্ট পাচ্ছে—নইলে মরে' যেত কোন্‌কালে।

নির্ম্মলা ধমক দিয়ে বল্লে—অমন বলিস নে বৌমা, মুখে পোকা পড়বে। সতী লক্ষি মেয়ের নামে কিছু বোলো না। তোর আপন শাশুড়ী না? তুই ও-সব কথা মুখে বের করিস্ কি ক'রে? আজই না হয় ও অমন হয়ে গিয়েচে—ও যে কি ছিল, আমি সব দেখিচি। এই সংসারের যা কিছু ঝক্কি চিরডাকাল ও পুইয়েছে। দেওরদের মানুষ করা, বিয়ে থাওয়া দেওয়া—ও না থাকলে সংসার টিকতো না। আজ না হয় ওর—

সাধনের বৌ ঠোঁট উল্টে বল্লে—হোক গে যাক বাপু। ও নিজের ছেলে খেয়েছে—ওর ওপর আমার একটুকু ছেদ্দা নেই। যতই বলো।

—ও খেয়েছে, কি বলিস্ বৌমা? ও ছেলে খেয়েছে! যাবার অদেষ্টে যায় চলে। কার দোষ দেবো। তা হলে তো তোকেও বলতে পারি—তুই সোয়ামী খেয়েছিস।

এই কথার উত্তরে খুড়শাশুড়ী ও বৌয়ে তুমুল ঝগড়া বেধে উঠলো।

আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি। পুজো প্রায় এসে পড়েছে। নিস্তারিণী একেবারে উত্থানশক্তিহীন হয়ে পড়েছে। দিনের অর্দ্ধেক সময় তার জ্ঞান থাকে না। এক একবার চেতনা সজাগ হয়ে ওঠে, তখন কেবল এদিক-ওদিক চেয়ে নাতিকে খোঁজে, নির্ম্মলাকে খোঁজে। ওর মলিন বিছানা ও সারা দেহে কেমন একটা দুর্গন্ধ ব'লে আজকাল কেউই কাছে আসতে চায় না। কেবল খাওয়ার সময় কোনদিন নির্ম্মলা, কোনদিন বা সাধনের বৌ দুটি ভাত দিয়ে যায়। সেদিনও চোখ মেলে ভাত খাবার চেষ্টা করলে—কিন্তু পারলে না। অনেকক্ষণ পরে পুত্রবধূ বল্লে—ভাত খাওনি যে, খাইয়ে দেবো?

নিস্তারিণী অবাক হয়ে গেল অসুখের ঘোরের মধ্যেও। বল্লে—তাই দে বৌমা।

সাধনের বৌ ভাত দুটি খাইয়ে এঁটো থালা নিয়ে চলে গেল। একটু পরে নির্ম্মলা বাড়ী এল। রোগীকে দেখতে গিয়ে ওর মনে হ'ল অবস্থা ভালো নয়। আপন মনে বল্লে—ঠাকুর, ওকে মুক্তি দাও, বড্ড কষ্ট পাচ্ছে—

প্রতিদিন সন্ধ্যায় যেমন নিস্তারিণীর জ্ঞান হয় আজও তেমনি হ'ল। তা'কে অবোধ বালিকার মত আবদারের সুরে বল্লে—দুটো পান্তাভাত আর ইলিশ মাছ ভাজা খাবো—

নির্ম্মলা দু'তিন দিন চেষ্টার পরে অতি কষ্টে এই যুদ্ধের বাজারে ইলিশ মাছ জুটিয়ে এনেছিল, কিন্তু তা'কে খেতে দিতে পারে নি।

নিস্তারিণীর অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে ঝুঁকলো পরদিন দুপুর থেকে।

সে অসুখের ঘোরে কোন্ বিস্মৃত পথ বেয়ে ফিরে গেল তার যৌবনদিনের দেশে। বাঁড়ুজ্যেদের ন'গিন্নী যেন এসে হেসে হেসে বলচেন, 'আমায় আজ দু'কাঠা চাল ধার দিতে হবে বৌ। বৌমা তাড়িয়ে দিয়েচে বাড়ী থেকে—তুমি না দিলে দাঁড়াবো কোথায়?'…যে সব লোক

কত কাল আগে চলে গিয়েচে, তারা যেন এসে দিনরাত ওর বিছানার চারিপাশে ওকে ঘিরে ভিড় করচে। বহুদিন পূর্ব্বের শরৎ-অপরাহ্ণের মত হাট থেকে ফিরে ওর স্বামী যেন হাসি-মুখে বলচে—ও বড়বৌ, কলা বিক্রির দরুণ টাকাগুলো এই নাও, তুলে রেখে দাও—আর এই ইলিশ মাছটা—ভারি সস্তা আজ হাটে—

ওর সব দুঃখ, সব অপমান, অনাদরের দিনের হঠাৎ আজ এমন অপ্রত্যাশিত অবসান হ'ল কিভাবে? নিস্তারিণী অবাক হয়ে যায়, বুঝতে পারে না কোন্‌টা স্বপ্ন—কোনটা সত্য। সে একগাল হেসে স্বামীর হাত থেকে ইলিশ মাছটা নেবার জন্যে হাত বাড়ায়।

নির্ম্মলা চোখ মুছতে মুছতে বল্লে—সতী লক্ষ্মী সগ্‌গে চলে গেল—বৌমা পায়ের ধূলো নে—তারপর সে নিজেও ঝুঁকে পড়ে মাতৃসমা বড় জায়ের পায়ে হাত ঠেকায়।

গায়ে হলুদ

শ্রাবণ মাসের দিন, বর্ষার বিরাম নেই, এই বৃষ্টি আসছে এই আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্চে। ক্ষেতে আউস ধানের গোছা কালো হয়ে উঠেচে, ধানের শিষ দেখা দিয়েচে অধি-কাংশ ক্ষেতে।

পুঁটি সকালে উঠে একবারে চারিদিকে চেয়ে দেখলে—চারিদিক মেঘে মেঘাচ্ছন্ন। হয়তো বা একটু পরে টিপ-টিপ বিষ্টি পড়তে শুরু ক'রে দেবে। আজ তার মনে একটা অদ্ভুত ধরণের অনুভূতি, সেটাকে আনন্দও বলা যেতে পারে, ছদ্মবেশী বিষাদও বলা যায়। কি যে সেটা ঠিক ক'রে না যায় বোঝা, না যায় বোঝানো। আজ তার বিয়ের গায়ে-হলুদের দিন। এমন একটা দিন তার বারো বৎসরের ক্ষুদ্র জীবনে এইবার এই প্রথম এল। সকালে উঠতেই জ্যেঠিমা বলেচে—ও পুঁটি, জলে ভিজে ভিজে কোথাও যেন যাস্‌ নি; আর তিনটে দিন কোনও রকমে ভালোয় ভালোয় কেটে গেলে যে বাঁচি।

আজ কি বার?—মঙ্গলবার! শনিবার বুঝি বিয়ের দিন। পুঁটির মনে সত্যিই কেমন হয়, আনন্দের একটা ঢেউ যেন গলা পর্য্যন্ত উঠে আটকে গেল। বিয়ে বেশি দূরে কোথাও নয়, এই গ্রামেই, এমন কি এই পাড়াতেই। এক ঘর ব্রাহ্মণ আজ বছরখানেক হ'ল অন্য জায়গা থেকে উঠে এসেচেন এখানে, দুখানা বড় বড় মেটে ঘর বেঁধেচেন—একখানা রান্নাঘর। এতদিন ধ'রে সে সঙ্গিনীদের সঙ্গে সেই বাড়ীতে কুল পাড়তে গিয়েচে, সত্যনারাণের সিন্নি আনতে গিয়েচে, যখন পাড়ার প্রান্তের ঘন জঙ্গল কেটে সে ভদ্রলোক বাড়ী তৈরি করেন ঘাটে যাবার পথের একেবারে ডান ধারে, তখন সে কতবার ভেবেচে এই ঘন বনের মধ্যে বাড়ী ক'রে বাস করবার কার না জানি মাথাব্যথা পড়ল।

কে জানত, সেই বাড়ীটাই—আজ একবছর এখনও পোরেনি—তার শ্বশুরবাড়ী হবে!

কতদূর আশ্চর্য্যের কথা, কতদূর বিস্ময়ের কথা, ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। অথচ তারই ক্ষুদ্র জীবনে এমন একটা মহাশ্চর্য্য ব্যাপার সম্ভব হল! যখনই সে এ কথাটা ভাবে তখনই সে সুদ্ধ, তার মন সুদ্ধ, যেন কতদূরে কোথায় চলে যায়।

ঐ ভদ্রলোকের একটি মাত্র ছেলে, নাম সুবোধ, তারই সঙ্গে ওর বিয়ের সম্বন্ধ হয়েচে। সুবোধকে এই সম্বন্ধের আগে তাদের বাড়ীতে কয়েকবার যাতায়াত করতে দেখেচে—বেশ ফর্সা, লম্বামত মুখ, এবার ম্যাট্রিক দিয়েচে, এখনও পরীক্ষার ফল বার হয় নি। আগে আগে, সত্যি কথা বলতে গেলে, সুবোধের মুখ পুঁটি তত পছন্দ করতো না। তার দাদার সঙ্গে যতবার এসেচে তাদের বাড়ীতে—পুঁটি ভাবতো—দেখো না ঘোড়ার মত মুখখানা। কিন্তু আজকাল আর সুবোধের মুখ ঘোড়ার মত ত মনে হয়ই না, মনে হয় বেশ চমৎকার মুখ। গ্রামের ছেলেদের মধ্যে অমন চোখ, অমন রং, অমন মুখের গড়ন কার আছে?

রায়েদের পাঁচি সেদিন বলেছিল তাকে—হ্যাঁরে, তুই যে বড় ঘোড়ামুখো বলতিস, তোর অদেষ্টে শেষকালে কিনা সেই ঘোড়ামুখোই জুটল!

পুঁটি মারতে ছুটে গিয়েছিল তার পিছু পিছু।

পুঁটির বাবা গোলার দোরে দাঁড়িয়ে ধান পাড়বার ব্যবস্থা করচে। তার বাবা বেশ চাষীবাসী গেরস্ত। পুঁটিদের বাড়ীতে চারটা বড় বড় ধানের আউড়ি আছে, গোলা আছে একটা। আউড়ি জিনিসটা গোলার চেয়ে অনেক ছোট, তিন চার বিশ ধান ধরে—আর একটা গোলায় ধরে এক পৌটি অর্থাৎ ষোলো বিশ ধান।

তাদেরও ধান আছে গোলা ভর্ত্তি, সব ক'টা আউড়ি ভর্ত্তি। কলকাতায় চাকুরী করেন এ পাড়ার হরিকাকা, তিনি মাঝে মাঝে গাঁয়ে এসে পুঁটির বাবাকে বলেন—আর কি রায় মশায়, এ বাজারে ত আপনিই রাজা। গোলা ভর্ত্তি ধান রেখেচেন ঘরে, আপনার মহড়া নেয় কে? কলকাতায় 'কিউ'তে দাঁড়িয়ে এক সের চাল নিতে হচ্চে—আর আপনি—।

পুঁটি জিগ্যেস্ করেছিল—কিসে দাঁড়িয়ে চাল নিতে হয় বাবা, বলছিল হরিকাকা?

—কে জানে কিসে দাঁড়িয়ে, তুই নিজের কাজ কর, আমি নিজের করি—মিটে গেল।

—তুমি জান না বুঝি ও কথাটার মানে? না বাবা?

—না জেনেও ত পায়ের ওপর পা দিয়ে এ বাজারে চালিয়ে দিলাম মা। কলকাতার মুখ না দেখেও ত বেশ যাচ্চে।

কলকাতায় নাকি মানুষের এক সের চালের জন্মে চার ঘন্টা কোথায় নাকি দাঁড়িয়ে থাকতে হয়—কি যে বাড়ীতে তার বিয়ে হচ্ছে, তাদের অবস্থা এত ভালো নয়। সুবোধ যদি পাশ করে, তবে হরিকাকা ভরসা দিয়েচেন কলকাতায় নিয়ে গিয়ে তাকে ওঁর আপিসে চাকুরী ক'রে দেবেন। তা হ'লে তাকেও কি কলকাতায় গিয়ে বাসায় থাকতে হবে আর সেই কিসে দাঁড়িয়ে রোজ এক সের চাল নিয়ে এসে রাঁধতে হবে? সে বড় কষ্ট—তবে, মানে সুবোধ যদি সঙ্গে থাকে, সে বোধ হয় সব রকম কষ্টই করতে প্রস্তুত আছে।

তাদের ধানের গোলা থেকে ধান পাড়া হচ্চে, খাবরাপোতা থেকে সীতানাথ কলু

আড়ৎদার এসেচে—ধান কিনে নিয়ে যাবে। বিয়ের খরচপত্র ধান বেচে করতে হবে কিনা।

ওর জ্যেঠিমা বললেন—ও পুঁটি, আজ কোথাও বেরিও না। নাপিত ও-বাড়ী থেকে হলুদ নিয়ে আসবে, সেই হলুদ গায়ে দিয়ে তোমায় নাইতে হবে।

এমন সময় সাধন জেলে এসে ভিজতে ভিজতে উঠোনে দাঁড়াল। হাত জোড় ক'রে মাথা নীচু করে প্রণাম করে বললে—প্রাতপেন্নাম।

তার বাবা বললে—ও সাধন, বাবা তোমায় ডেকেছি যে একবার। আমার যে কিছু মাছের দরকার এই শনিবারে।

কি জানি কেন, পুঁটির বুকটা দুলে উঠল। এই শনিবার—এই শনিবারে তা হলে সত্যিই তার—

সাধন বললে—আজ্ঞে, মাছের যে বড্ড গোলমাল যাচ্চে। গাঙে কি মাছ আছে? ভুমোর বাঁওড়ের মাছ সব যাচ্চে কলকাতায়। বিরাশি টাকা দর। এমন দর বাপের জন্মে কোনও কালে শুনি নি রায় মশায়। এক সের দেড় সের পোনা ইস্তক পড়তে পাচ্চে না। মরগাঙে বাঁধাল দিয়েলাম—একদিন কেবল এক সাড়ে এগার সের গজাড় মাছ—

পুঁটির বাবা বিস্ময়ের সুরে বললে—সাড়ে এগার সের গজাড়! এমন কথা ত কখনও শুনি নি—

—অরিবৎ গজাড় রায় মশায়। মাছের এমন দর, গজাড় মাছই বিক্রি হয়েল দশ আনা সের।

পুঁটি আর সেখানে দাঁড়াল না। মাকে এমন আজগুবি খবরটা দিতে ছুটল বাড়ীর মধ্যে। বিষ্টি একটু থেমেচে, একটু কোথাও বেরুতে পারলে ভালো হ'ত। তার জীবনে যে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার হতে চলেচে এ কথাটা কারও সঙ্গে আনন্দ করে বলাও চলে না। বেহায়া বলবে, নিন্দে করবে। কেবল বলা চলে তার সমবয়সী পাঁচি, আর ক্ষেন্তি জেলেনীর মেয়ে টুনির কাছে। আর একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার—তার চেয়ে অন্তত সাত বছরের বড় লতিদিদির এখনও বিয়ে হয় নি—অথচ লতিদিকে সবাই বলে সুন্দরী, লতিদির বাপের অবস্থা ভালো। লতিদি লেখাপড়া জানা ভালো। গান করে, ওর বাবা যখন কলকাতায় চাকরী করত, তখন লতিদি স্কুলে পড়ত সেখানে। কত বই পড়ে বসে বসে দুপুর বেলা। পুঁটি ওদের বাড়ী যায় যখনই তখনই দেখে লতিদি বই মুখে বসে। পুঁটি ভাল লেখাপড়া জানে না, বইয়ের নাম পড়তে পারে না, লতিদি একটু ঠ্যাকারে, সে লেখাপড়া জানে না বলে বুঝি আর মানুষ না?

তাকে বলে—তুই বই-টই নাড়িস নে পুঁটি। কি বুঝিস্ তুই এর আস্বাদ?

পুঁটি হয়ত বলে—এ কি বই বল না লতিদি?

—যাঃ যাঃ, আর বইয়ের খবরে দরকার নেই। শরৎ চাটুজ্যের নাম শুনেচিস্? কোথা থেকে শুনবি? তোরা শুধু জানিস্ ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে কি করে চিঁড়ে কুটতে হয়। তাই করগে যা—এদিকে কেন আবার?

আচ্ছা, আজ তার লতিদিকে বলতে ইচ্ছে হচ্চে—কই লতিদি, তুমি এত বই পড়ে টরে বসে আছ, এত সব নাম জান—কই তোমার ত আজও বিয়ে হ'ল না। আমার জীবনে এত বড় একটা আশ্চর্য্যি কাণ্ড ত টুক্ করে ঘটে গেল। ধানের নিন্দে কর, বাবার গোলায় ধান ছিল বলে ত আজ—কই তোমাদের ত—তারপর ম্যাট্রিক পাশ বর। এ গাঁয়ে পাশ করা ছেলে একমাত্র আছে মুখুজ্জেদের জীবন দা'। সে নাকি দুটো পাশ—কোথায় চাকরী করচে যেন—ঐ দিকে কোথায়। যার সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্চে, সে মুখ্যু নয়। পাশের খবর বেরুবার দেরি নেই—বাবা বলেন, সুবোধ নিশ্চয়ই পাশ করবে। হে ভগবান, তাই করো, পাশ যেন সে করে, সত্যনারাণের সিন্নি দেবে সে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে।

নাপিত এসে বললে—মা ঠাকরুণ, ও-বাড়ী থেকে দেখে এলাম। গায়ে হলুদের লগ্ন বেলা দশটার পর। আপনাদের যা দিতে হবে তার আগে দিয়ে দেবেন।

গায়ে হলুদের তত্ত্ব আসবে ওবাড়ী থেকে। কি রকম জিনিসপত্র না জানি আসে। পুঁটির মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। একখানা লাল কাপড় নিশ্চয়ই তারা দেবে। পুঁটির মোটে তিনখানা শাড়ী আর একখানা ডুরে শাড়ী আছে মায়ের বাক্সে তোলা। এবার তার অনেক কাপড় হবে, গহনাও হবে। পাঁচ ভরি সোনা দেবার কথাবার্ত্তা হয়েচে। এতদিন দুটি দুল ছাড়া অন্য কোনও গহনা তার অঙ্গে ওঠে নি—অথচ ঐ কুমারী মেয়ে লতিদিরই হাতে ছ'গাছা করে চুড়ি, গলায় লকেট্ ঝোলানো হার, কানে পাশা, হাতে আংটিও আছে। ও থাকতো শহরে, সেখানে মেয়েদের চালচলন আলাদা। এ সব পাড়াগাঁয়ে কুমারী মেয়েরা কাঁচের চুড়ি ছাড়া আবার কি গহনা পরে? অত পয়সাও নেই তার বাপের। গোলায় দুটো ধান আছে মাত্র, নগদ পয়সা কোথায়। যা কিছু করতে হয়, সে ঐ ধান বেচে।

ভীষণ বৃষ্টি এসেচে। সঙ্গে সঙ্গে সামান্য ঝড়। রান্নাঘরের ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে বকনা বাছুরটা ভিজচে। কচুপাতার জল জমে আবার গড়িয়ে গড়িয়ে পড়চে। তাদের কৃষাণ বীরু মুচি বলচে—ও দিদি ঠাকুরোণ, তা একটু তামাক খাও মোরে, বিয়েবাড়ী যে মনেই হচ্চে না। দু'দশ ছিলিম তামাক পোড়বে তবে ত বোঝবো যে লগনশা লেগেচে।

পুঁটি বীরুকে ধমক দিয়ে বললে—যাঃ, তোর আর বক্তৃতা দিতে হবে না। তামাক আমি কোথায় পাবো? কাকীমার কাছে গিয়ে চাইগে যা—

একটু বেলা হয়েচে। বাড়ীতে অনেক লোক এসেচে বিয়ের জন্যে। বিয়েবাড়ীর মত দেখাচ্চে বটে—কুমোরপুরের কাকীমা, পাঁচঘরার মাসীমা তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসেচেন—আজ বেলা এগারোটার সময়ে আরও একদল আসবে, ইষ্টিশানে গাড়ী গিয়েচে। মেয়েরা সবাই দল বেঁধে নদীতে নাইতে গেল। কুমোরপুরের কাকীমা যাবার সময়ে তাকে বলে গেল—বাঁড়ুয্যে বাড়ী পিঁড়ি চিত্তির করতে দিয়ে আসা হয়েচে, দেখে আসিস্ পুঁটি সে-দুখানা পিঁড়ি হয়েচে কি-না।

কাকীমার এটা অন্যায় কথা। তার লজ্জা করে না? নিজের বিয়ের পিঁড়ি নিজে বুঝি

সে চাইতে যাবে ? এত বেহায়া সে এখনও হয় নি।

তার বাবা চণ্ডীমণ্ডপ থেকে হেঁকে বললেন—ও পুঁটি, হাতায় করে একটু আগুন নিয়ে এস মা—

চণ্ডীমণ্ডপের দোর পর্যন্ত গিয়ে ও শুনলে ওর বাবা আর একজন অজ্ঞাত লোকের মধ্যে নিম্নোক্ত কথাবার্তা :

—তা হলে পাল্‌কির বন্দোবস্ত দেখতে হয়—

—আজ্ঞে পাল্‌কি কোথায় মিলবে ? ষোলডুবুরির কাহারপাড়া নির্বংশ। পাল্‌কি বইবার মানুষ নেই এ দিগরে।

—তবে ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে এস বনগাঁ থেকে।

—এ কাদা-জলে দশ টাকা দিলেও আসবে না। আসবার রাস্তা কই ?

—ওরা বিদেশী লোক। বর আসবার ব্যবস্থা আমাদেরই করে দিতে হবে, বুঝলে না ? আমরাই পারচি নে, ওরা কোথায় কি পাবে ? হিম হয়ে বসে থেকো না। যা হয় হিল্লে লাগিয়ে দাও একটা।

—আচ্ছা বাবু, বলদের গাড়ীতে বর আনলি কেমন হয় ?

—আরে না না—সে বড় দেখতে খারাপ হবে। সে কি—না না। শুন্‌চি ওরা ইংরিজি বাজনা আনচে। বলদের গাড়ীর পেছনে ইংরিজি বাজনা বাজিয়ে বর আসবে, তাতে লোক হাসবে।

—কেন বাবু তাতে কি ? বলদের গাড়ীতে কি আর বর যায় না ? একেবারে আপনাদের বাড়ীর পেছনে এসে থামবে—সেই তো ভালো।

—বলদের গাড়ীতে বর যাবে না কেন ? সে কি আর ভদ্দরলোকের বর যায় ? তা ছাড়া পেছনের ওপথ আইবুড়ো পথ। ওখান দিয়ে বর আসবে না, সামনের তেঁতুলতলার রাস্তা দিয়ে বরকে আনতে হবে। তুমি আজই যাও দিকি ষষ্ঠীতলা। সেখানে ক'ঘর কাহার আছে শুনিচি। সেখান থেকেই পাল্‌কি আনাতে—

—সে যে এখান থেকে তিনকোশ সাড়ে তিনকোশ রাস্তা বাবু।

পুঁটি সেখানে আর দাঁড়ালো না। সুবোধ আসবে বর সেজে বলদের গাড়ীতে ? হি—হি—সে বড় মজা হবে এখন। ধুতরো ফুলের মালা গলায় দিয়ে ?

দৃশ্যটা মনে কল্পনা করে নিয়েই হাসতে হাসতে পুঁটির দম বন্ধ।

—ও তিনু—তিনু রে—শোন্ শোন্ একটা মজার কথা—

তিনু চার বছরের খুড়তুতো ভাই। উঠোনের নীচে দিয়েই যাচ্চে। সে মুখ উঁচু করে ওর দিকে চেয়ে বললে—কি লে ডিডি ?

—জানিস্ ? এই আমাদের বাড়ী বর আসবে—

—বল ?

—হ্যাঁ-রে। ধুতরো ফুলের মালা পরে বলদের গাড়ী চেপে ইংরিজি বাজনা বাজিয়ে—হি—হি—

তিনু না বুঝে হাসলে—হি—হি—

এই সময়ে ওদের জ্যাঠাইমা বাড়ীর ছেলেমেয়েকে ডাক দিলেন—ওরে, সবাই এসে কাঁটাল খেয়ে যা—ও হিমু, পান্ত ভাত কে কে খাবে ডাক দিয়ে নিয়ে আয়। এক হাঁড়ি পান্ত রয়েচে সেগুলো কাঁটাল দিয়ে ওঠাতে তো হবে। ভাত ফেলতে পারবো না এই যুধ্যের বাজারে—

পান্ত ভাত ও কাঁঠাল পুঁটির অতি প্রিয় খাদ্য। কিন্তু আজ এখন তার খাবার নাম করবার জো নেই—খিদেও পেয়েছিল, ইচ্ছে করলে সে কলসী থেকে কাঁঠালবীচি ভাজা আর মুড়ি লুকিয়ে পেড়ে নিয়ে খেতে পারতো—কিন্তু সে ইচ্ছে তার নেই। তাতে ভগবান রাগ করবেন। আজকের দিনে সে ভগবানকে রাগাবে না।

বেলা বাড়লো। ও বাড়ীতে শাঁক ও হলুর শব্দ শোনা গেল। অবিশ্যি খুব কাছে নয় পুঁটির ভাবী শশুরবাড়ী। তা হলেও শাঁকের শব্দ আসবার মত দূরও নয়।

ওর খুড়তুতো বোন শ্যামা বল্লে—ওই শোন দিদি, দাদাবাবুর গায়ে হলুদ হচ্চে—

পুঁটি ধমক দিয়ে বল্লে—চুপ্। মেরে ফেলে দেবো। দাদাবাবু কে?

—বা-রে, হয়েচেই তো—আর ত দুদিন দেরি—

—না। তা হোক্। আগে থেকে বলতে নেই।

—জ্যাঠাইমা তো বলচে?

—কি বলচে?

—বলচে, আমাদের জামাইয়ের গায়ে হলুদ হচ্চে—সেখান থেকে তত্ত্ব নিয়ে নাপিত এবার এসে পৌঁছে যাবে—

—তা বলুক গে। আমাদের বলতে নেই।

—আচ্ছা দিদি—দাদাবাবু—ইয়ে সুবোধবাবু পাশ করেছে?

—খবর এখনও বের হয় নি।

—আমি ও পাড়ায় রাধীদের বাড়ী গিইছিলাম এই এট্টু আগে। রাধীর দাদা পাশ করেচে, কাল বিকেলে কলকাতা থেকে ওর কাকা খবর দিয়েচে।

—তোর দাদাবাবুর—ইয়ে মানে ওর—দূর, ওই কেশববাবুর ছেলের খবর কে পাঠাবে কলকাতা থেকে? ওদের তো কেউ নেই কলকাতায়।

একটু পরে ওদের বাড়ীতে শাঁক বেজে উঠলো, হুলু পড়লো। নাপিত তত্ত্ব নিয়ে আসচে তেঁতুলতলার পথে, বাড়ী থেকে দেখা গিয়েচে।

পুঁটির বুক আনন্দে দুলে উঠলো—জ্যাঠাইমা বলছিলেন, আশীর্ব্বাদ হয়ে গেলেও বিয়ে না হতে পারে, কিন্তু গায়ে হলুদ হয়ে গেলে বিয়ে নাকি আর ফেরে না।

এবার তা হোলে সেই আশ্চর্য্য ব্যাপারটা তার জীবনে ঘটে গেল।

কেউ আর বাধা দিতে পারবে না। পাড়াগাঁয়ে কত রকমে ভাঙ্‌চি দেয় লোকে। তবুর বিয়েতেও ভাঙ্‌চি দিয়েছিল। বলেছিল, মেয়ের রং কালো, মুখ-চোখ ভালো না—লেখাপড়া

জানে না—আরও কত কি। কিন্তু সুবোধ—না। ছিঃ, ও নাম করতে নেই, নাম হিসেবে মনে ভাবতে নেই।

তারপর বাকি অনেকগুলো কি ব্যাপার স্বপ্নের মত তার চোখের সামনে দিয়ে ঘটে গেল। শাঁকের ডাক, হুলুধ্বনি, মা, কাকিমা, জ্যাঠাইমা তাকে তেলহলুদ মাখিয়ে দিলেন। গায়ে-হলুদের তত্ত্ব এল লালপাড় শাড়ী, তেলহলুদ, একটা বড় মাছ, এক হাঁড়ি দই। তার সমবয়সী বন্ধু তিনজন খেতে এল তাদের বাড়ী। তাকে কাছে বসিয়ে কত যত্ন করে মাছ দিয়ে, দই দিয়ে, মা জ্যাঠাইমা কত আদর করে খাওয়ালেন, কত মিষ্টি কথা বল্‌লেন। সোনার পিঁড়িতে সিঁদুর দেওয়া হ'ল, প্রদীপ দেখান হ'ল,—যাতে শূন্য ধানের গোলা সামনের ভাদ্র মাসে আউশ ধানে অন্তত অর্দ্ধেকটা পুরে যায়। বাবা বলেন, গোলার ধান খালি হয়ে যেতো না। মধ্যে কি একটা গভর্ণমেণ্টের হাঙ্গামা এল—কেউ গোলায় ধান জমিয়ে রাখতে পারবে না। তাতেই অনেক ধান কর্জ্জ দিতে হ'ল গ্রামের লোকজনকে।

গায়ে হলুদের তত্ত্বে আরও অনেক জিনিস এসেছিল, খাওয়া-দাওয়ার পরে গাঁয়ের মেয়েরা কেউ কেউ দেখতে এল—তখন সে নিজেও দেখলে। আগে লজ্জায় ওদিকেও সে যায় নি। একটা শাড়ী, একটা ব্লাউজ, সায়া একটা—আলতা, সাবান, আয়না আর গন্ধতেল। এ সব জিনিস তার নিজস্ব। কারও ভাগ নেই এতে। সে ইচ্ছে করে যদি কাউকে দেয় তবেই সে পাবে, নইলে নিজের বাক্সে রেখে দিতে পারে, কারও কিছু বলবার নেই।

সব কাজ মিটতে বেলা দুটো বেজে গেল।

পুঁটির মন ছট্‌ফট্ করছিল, ও পাড়ার লতিদি, হিমি, অন্ন, রাধী - এরা কেউ আসেনি—এদের গিয়ে একবার দেখা দেওয়া দরকার—যাতে তারা বুঝতে পারে যে, তার গায়ে হলুদের মত আশ্চর্য্য ব্যাপারটা আজ সত্যিই ঘটে গিয়েচে। আচ্ছা, যখন ইংরিজি বাজনা বাজিয়ে বর আসবে তাদের বাড়ীর দোরে তেঁতুলতলার ওই পথটা দিয়ে, বোধনতলার কাছে পাল্‌কি নামিয়ে প্রণাম করে—বাজি পুড়বে, লোকজনের হৈ হৈ হবে—ওঃ, সে সময়ের কথা ভাবাও যায় না। দেখে যেন পাড়ার সব মেয়েরা এসে।

সে বেড়াতে বেড়াতে গেল মুখুয্যেবাড়ী। মুখুয্যেগিন্নী ওকে দেখে বল্‌লেন—কি রে পুঁটি, আয় মা আয়। গায়ে হলুদ হয়ে গেল? আহা, এখন ভালোয় ভালোয় দু-হাত এক হয়ে গেলে—বোসো মা, বোসো।

একটু পরে লতিকাও সেখানে এসে হাজির হোল। পুঁটিকে দেখে বললে—ও পুঁটি, তোর আজ গায়ে হলুদ ছিল না? হয়ে গেল? কি তত্ত্ব এল শ্বশুরবাড়ী থেকে?

মুখুয্যেগিন্নী বল্‌লেন—বোস্ মা তোরা। লতি, পুঁটির সঙ্গে গল্প কর। একটু চা করে আনি। যাক্, ভালোই হ'ল, আজকাল মেয়ের বিয়ে দেওয়া যে কি কষ্ট, যে দেয় সেই জানে!

পাশের বাড়ীর জানালা দিয়ে গাঙ্গুলীদের ছোটবৌ ডেকে বললে—ও কে, পুঁটি নাকি?

গায়ে হলুদ হয়ে গেল ? তা কই আমাদের একবার বলতেও তো হয়। এই ত বাড়ীর পেছনে বাড়ী—

পুঁটি বল্লে—গেলেন না কেন বৌদি ? আমরা ত বারণ করি নি যেতে। শাঁক যখন বাজলো, তখনও যদি যেতেন—

লতিকা ভাবলে, পুঁটি ছেলেমানুষ এ উত্তরটা দেওয়া ওর উচিত হ'ল না। এখানে ও কথা বলা ঠিক হয় নি। কিন্তু এর পরবর্ত্তী ব্যাপারের জন্যে সে বা পুঁটি কেউ প্রস্তুত ছিল না। গাঙ্গুলীদের ছোটবৌ মুখ লাল করে উত্তর দিলে—কি বল্লি ? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা ? আমরা কখনও গায়ে হলুদ দেখি নি, শাঁকে ফুঁ পড়লে অমনি কুকুরের মত ছুটে যাব তোমাদের বাড়ী পাতা পাততে। অত অংখার ভালো না রে পুঁটি। তোমার বাপের বড্ড ধানের গোলা হয়েচে, না ? অমন বিয়ে আমরা কখনও কি দেখিচি জীবনে ? ছেলের না আছে চাল, না চুলো—সংসারে মানুষ নেই বলে হাঁড়ি ঠেলতে নিয়ে যাচ্চে। ছেলের বিদ্যে কত, তা জানতে বাকি নেই—এবার তো ম্যাট্রিক ফেল করেচে -

এখানে লতিকা আর না থাকতে পেরে বল্‌লে—কে বল্‌লে ছোট বৌদি ? সুবোধবাবুর পাশের খবর তো পাওয়া যায় নি ?

—কেন পাওয়া যাবে না ? চিঠি এসেচে ফেল করেচে বলে—ওরা সে চিঠি লুকিয়ে ফেলেচে। বিয়ের আগে ও খবর জানাজানি হতে দেবে না। উনিই হাট থেকে চিঠি আনেন। পোষ্টকার্ডে চিঠি। উনি সন্দের পর সুবোধদের বাড়ী দিয়ে এলেন। আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া—

পুঁটির চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে বিশ্বসংসার লেপে মুছে গিয়েচে। মুখরা দর্পিতা ছোট বৌয়ের মুখের কাছে সে কি করে দাঁড়াবে। চেঁচামেচি শুনে মুখুয্যেগিন্নী হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন, লতিকা ওর হাত ধরে নিয়ে ঘরের মধ্যে গেল।

মুখুয্যেগিন্নী ঘরের মধ্যে এসে চাপা গলায় বললেন—আহা, ছেলেমানুষ—ওর সাধ-আহ্লাদের দিনটা অমন করে বিষ ছড়াতে আছে—ছিঃ ছিঃ—দ্যাখ তো মা লতি কাণ্ডটা—

কাঠের পুতুলের মত আড়ষ্ট পুঁটির হাত ধরে ততক্ষণ লতিকা বলচে—চল্ চল্ পুঁটি তোকে বাড়ী দিয়ে আসি—ছিঃ, বৌদির কি কাণ্ড ! ও সব কথা মনে করিস নে, মিথ্যে কথা। চল পুঁটি—ভাই—

লতিকার গলার সুরে ও কথার ভাবে কিন্তু পুঁটির মনে হ'ল লতিদিও এ খবরটা জানে—কি জানি হয়তো গাঁয়ের সবাই জানে—সে-ই কেবল জানতো না এতক্ষণ। পথে পা দিয়েই লজ্জায় অপমানে সে ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেলে বললে—লতিদি, আমি কী বলেছিলাম ছোটবৌদিকে ?—খারাপ কথা কিছু ?

ঠাকুরদা'র গল্প

অনেক দিন আগের কথা।

একালে সে জিনিস শুনলে ভাববে গল্পকথা বুঝি, কিন্তু সেকালে দেশের সামাজিক অবস্থা ছিল অন্যরকম, তখন ওরকম সম্ভব ছিল।

যাক আসল গল্পটা বলি :

আমার তখন বয়স কুড়ি-একুশ—একহারা চেহারা, মাথায় বাবরি চুল, গায়ে যথেষ্ট শক্তি রাখি। খেতেও পারি খুব। ভোজসভার নাম-করা খাইয়ে ছিলেন সেকালের আমার পিতামহ তোমাদের বৃদ্ধপ্রপিতামহ ৺বিষ্ণুরাম রায়, মারসার জমিদারবাড়ীতে দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণে পুরো খাওয়ার পর এক হাঁড়ি রসগোল্লা খেয়ে ধুতি চাদর আদায় করে এনেছিলেন। সকলে বলতো নিমাই বংশের নাম রাখবে। তাঁর ডাকনাম ছিল নিমাই।

আষাঢ় মাসের শেষ, ঘোর বর্ষা সেবার। বাবা তার আগের বছর মারা গিয়েছেন সুতরাং বাইশ বিঘে ব্রহ্মোত্তর আমন ধানের জমিতে ধান রোয়ার ভার পড়লো আমার ঘাড়ে। বড়দাদা কুসঙ্গে মিশে অল্পবয়সে গাঁজা ধরেছিলেন, পাড়াগাঁয়ে যা হয়ে থাকে, গাঁজা খাওয়ার দলে তাঁরই সমবয়সী লোক ছিল অনেক, তারা কুপরামর্শ দিয়ে আমাদের পৈতৃক জমি ফাঁকি দিয়ে মৌরসী নেবার চেষ্টা করলে।

একদিন দাদা এসে বল্লেন—খালপারের জমিটা মৌরসী চাইচে একজন, বেশ মোটা সেলামী! দিবি? আমি দাদার নির্ব্বুদ্ধিতা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আমার চেয়ে বয়সে বড়—অথচ তাঁর বুদ্ধি এরকম। কে এমন সুপরামর্শ দিয়েছে কি জানি। বল্লাম—কত সেলামী দিচ্ছে?

—পনেরো টাকা বিঘে।

—জমিগুলো কিন্তু চিরদিনের মত হাত-ছাড়া হয়ে যাবে!

—তাতে কি? এখন সত্তর আশি টাকা হাতে আসবে—

—আমার ওতে মত নেই দাদা।

এই থেকেই দাদার সঙ্গে আমার মতভেদ হয়ে গেল। তিনি আর আমার সঙ্গে কথা বলেন না, মার সঙ্গে বলেন, তাঁর অংশের জমি তিনি আলাদা করে নেবেন, নিজের জমি যা খুশী করবেন, এতে কার কি বলবার আছে—ইত্যাদি।

আমরা চাষীবাসী গৃহস্থ। ধান ছাড়া অন্য আয় নেই, জমি ছাড়া অন্য সম্পত্তি নেই। আষাঢ় মাস এল, ধান রোয়ার সময়। দাদা কিন্তু জমির দিকে একবারও গেলেন না, এক পয়সার সাহায্যও করলেন না। আমি ভেবে চিন্তে মুণ্ডুকাপুরের কাজী সাহেবদের বাড়ী গিয়ে হাজির হোলাম। মুণ্ডুকাপুরের কাজীরা বেশ অবস্থাপন্ন, তবে বুড়ো কাজী সাহেব শুনেছিলাম খুব রুক্ষ মেজাজের মানুষ—কিন্তু আমার তখন আর কোনো উপায় ছিল না।

কাজী সাহেবের বাড়ী বেশ দোমহলা কোঠা, বাইরে লম্বা বৈঠকখানা। কাজী আবদুর রহমান বসে হুঁকোয় তামাক খাচ্ছিলেন। আমায় দেখে বল্লেন—কোথা থেকে আসা হচ্চে?

তারপর আমার পরিচয় পেয়ে বল্লেন—ও, আপনি বিষ্ণুরাম রায়ের নাতি। তা কি মনে করে ?

—আমার কিছু টাকা ধার দিতে হবে দয়া করে, বিশেষ দরকার। রোয়ার খরচ নেই কিছু হাতে।

—টাকা হবে না।

—কাজী সাহেব, না দিলে আমার কোন উপায় নেই। এই তিন ক্রোশ রাস্তা রোদ্দুরে হেঁটে এসেচি, আমার দাদা মানুষ নন, তিনি কিছু দেখাশুনা করলে আজ এই কষ্ট হয় আমার ! ধান রোয়া না হ'লে সারা বছর চালাবো কি করে বলুন।

কাজী সাহেব বল্লেন—আপনাকে এখানে আহারাদি করতে হবে। ছেলেমানুষ, এতখানি হেঁটে এসেচেন—এমন সময়, বাড়ী ফিরে যাবেন সে হবে না। আমাদের প্রজা আছে একঘর নাপিত, এই পাশেই বাড়ী তাদের, গোয়ালে রান্নাবান্না করুন, আমি জিনিসপত্তর পাঠিয়ে দিচ্চি। তারাই জলটল তুলে দেবে। নতুন হাঁড়ি কুমোর বাড়ী থেকে আনিয়ে দিচ্চি। আহারাদি করে সুস্থ হোন, ওবেলা কথাবার্ত্তা হবে। স্নান সেরে আসুন দীঘি থেকে।

দিব্য সরু চালের ভাত, কই মাছের ঝোল, গাওয়া ঘি, টাটকা দুধ, মর্ত্তমান কলা, আখের গুড়ের পাটালি ইত্যাদি দিয়ে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজনপর্ব্ব সমাধা হ'ল। কাজী সাহেবের আতিথ্যের ও সৌজন্যের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিতে গেলাম দুপুরের পর। তিনি সে কথায় কান না দিয়ে বল্লেন, কত টাকা হ'লে জমি রোয়া হয় ? কত বিঘে জমি ? বল্লাম, এগারো।

হিসেব করে টাকা গুনে আমার হাতে দিয়ে বল্লেন—না। যখন জমি ছাড়া ভরসা নেই তখন আমার পরামর্শ শুনুন। লাঙল গরু কিনুন, পরের লাঙলের ভরসায় চাষ চলে না। হাতিয়ার না থাকলে কি লড়াই হয় ?

আমি বল্লাম—টাকা কোথায় পাই বলুন। লাঙল গোরু কর্‌তে এখন অন্তত শ'খানেক টাকা দরকার।

—আচ্ছা যেদিন আপনি আজকের টাকা শোধ দিতে আসবেন, সেদিন এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলা যাবে, আজ নয়।

বাড়ী ফিরে আসতেই মা সব শুনে বল্লে—খুব ভদ্দর লোক তো ওরা। আমার দুগাছা বালা আছে, বাঁধা দিয়ে কাজী সাহেবের টাকা দিয়ে আয়।

আমি বল্লাম—বেশ কথা মা।

সেই টাকা ফেরৎ দিতে গিয়ে কাজী সাহেব গোরু কিনবার জন্যে আমায় একশো টাকা ধার দিলেন আবার। আমায় বল্লেন—আজ তেত্রিশ বছর লোককে টাকা আর ধান কর্জ্জ দাদন দিয়ে আসচি, এই আমাদের সাত পুরুষের ব্যবসা ! যে মহাজন খাতক চেনে না, সে মহাজন নয়। আপনি টাকা নিয়ে যান, দলিল দিতে হবে না।

এই ভাবে সেই আষাঢ় মাসে ধান রোয়া আমিই নিজের চেষ্টায় শেষ করলাম। বাংলা ১২৮২ সাল। তখন সাড়ে তিন টাকায় উৎকৃষ্ট আমন চাল এক মন পাওয়া যায়, পাকি ওজনের পাওয়া ঘি এই গ্রামে বসেই বারো আনা সের কিনেচি। দুধ ষোল সের টাকায়। সে সব এখন বল্লে রূপকথা বলে মনে হবে।

গ্রামে পীতাম্বর ঘোষ বলে একজন প্রজা ছিল আমাদের। গোরু কেনা সম্বন্ধে তার সঙ্গে পরামর্শ করলাম। সে বল্লে—বাবাঠাকুর, গঙ্গাপারে একটা হাট আছে, সেখানে সস্তায় বলদ পাওয়া যায়। একবার আমি সেখান থেকে গোরু কিনে এনেছিলাম। চলুন সেখানে। আমিও যাবো।

মার সম্মতি নিয়ে পীতাম্বরের সঙ্গে হাঁটাপথে রওনা হলাম। সঙ্গে কাজী সাহেবের দেওয়া সেই একশো টাকা। গেঁজের মধ্যে কাঁচা টাকা নিয়ে কোমরে বেঁধে নিয়েচি পীতাম্বরের পরামর্শে। তখনকার আমলে রাস্তাঘাটে চোরডাকাতের বিশেষ ভয় ছিল, মা পীতাম্বরকে তুলসী গাছ ছুঁইয়ে দিব্যি করিয়ে নিলেন সে যেন আমাকে একা রেখে পথের মধ্যে কোনো দরকারেও কোথাও না যায়।

মা জানতেন না এই যাত্রার কি পরিণাম, কে-ই বা জানতো! আজও ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে যাই এমন একটা ঘটনা একদিন কি করে ঘটেছিল আমার বাইশ বৎসরের জীবনে।

চাঁদুড়ের গঙ্গাতীর আমাদের গ্রাম থেকে সাত ক্রোশ। বেলা দুটোর সময় খেয়ায় গঙ্গা-পার গেলাম। পীতাম্বর বল্লে, বাবাঠাকুর, এখান থেকে ক্রোশচারেক দূরে একখানা গ্রাম আছে, সেখানে আমাদের স্বজাতির বাস আছে অনেক। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হাঁটতে পারবেন?

তখন আমার জোয়ান বয়েস—বল্লাম, খুব।

পীতাম্বর বল্লে—তবে চলুন বাবাঠাকুর।

সন্ধ্যার অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক পরে আমরা সে গ্রামে পৌঁছে গেলাম। ষাট বছর আগের সে সব কথা আজও বেশ মনে আছে আমার। আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে পীতাম্বর বাসার সন্ধানে কোথায় চলে গেল, আমি একটা নিমগাছের তলায় দাঁড়িয়েই আছি অন্ধকারে। পীতাম্বর আর ফেরে না। আধঘণ্টা পরে দেখি পীতাম্বর এসে ডাকচে, আছেন নাকি বাবা-ঠাকুর? চলুন—

তারপর একটা খড়ের ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে তুল্লে। মনে হল সেটা কোন গৃহস্থের বাইরের চণ্ডীমণ্ডপ হবে। একপাশে কতকগুলো বিচালি, অন্যদিকে ধানের বস্তা। একটা মাদুর পর্য্যন্ত পাতা নেই মাটির মেজেতে। তার ওপর অস্পষ্ট অন্ধকার। আলো নেই। বাড়ীর লোকেরা এমন অভদ্র যে একবার খোঁজ পর্য্যন্ত নিলে না আমাদের।

পীতাম্বরকে বল্লাম—দেশলাই জ্বালি, একবার দেখে নিই সাপ-খোপ কোথাও আছে কিনা। এমন বাড়ীতেও নিয়ে এসেছ তুমি।

—বাবু, এ রাঢ় দেশ। বড় খারাপ জায়গা। বিদেশী মানুষকে জায়গা দেয় না। এরা বোধ হয় জানেও না যে আমরা বাইরের ঘরে আছি।

কোনো রকমে রাত কাটিয়ে ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়া গেল দু'জনে। শাঁকমুড়ি বলে একটা ছোট বাজারে চিঁড়ে দই কিনে আমরা ফলার করলাম—আগের রাত্রে অনাহারে আছি, তার ওপর আমার জোয়ান বয়সের খিদে! আধসের করে চিঁড়ে আর আধসের দই, পোয়াটাক গুড় ও এক ছড়া কলা এক একজনে চক্ষের নিমেষে উড়িয়ে দিলাম।

পীতাম্বরের মহৎ দোষ ছিল তামাক খেতে বসলে সে হঠাৎ উঠতো না। মুদীর দোকানে আহারান্তে তামাক খেতে বসলো তো বসলোই। এদিকে বেলা পড়ে আসতে আমি একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

মুদীর দোকানে পয়সা মিটিয়ে আমরা আবার পথ হাঁটি। বেলা যখন বেশ গড়িয়ে এসেচে, তখন উপর দিক থেকে খুব মেঘ করে এল। পীতাম্বর বল্লে—বাবাঠাকুর, আগে সিজে-ডুমুর দ' বলে গ্রাম। অনেক বামুনের বাস। কিন্তু জায়গাটাতে যাবো কিনা তাই ভাবচি—

—কেন?

—বিখ্যাত ডাকাতের জায়গা। বামুনরাই ডাকাত। গঙ্গা দিয়ে একসময় বিদেশী মাল বোঝাই নৌকো যাওয়ার উপায় ছিল না। আজকাল তেমনটা নেই—তবুও বাবাঠাকুর বিশ্বেস নেই। সঙ্গে অতগুলো টাকা।

—গ্রামের মধ্যে ঢোকা ভালো বাইরের মাঠে থাকার চেয়ে। মাঠের মধ্যেও ডাকাতি করে নিতে পারে তো? চলো কোনো ব্রাহ্মণের বাড়ী আশ্রয় নিই।

—কিন্তু বাবাঠাকুর, কোনো রকমে যেন জানতে দেবেন না যে আমাদের কাছে টাকা আছে; সিজে-ডুমুর দ' জায়গা ভালো না।

সন্ধ্যার আগে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে দু'তিনটি ব্রাহ্মণ-বাড়ী গেলাম—কিন্তু কেউ জায়গা দিল না। আমরা বাইরের রোয়াকে শুয়ে থাকতে চাইলাম—রাত্রে কিছু খাবো না বল্লাম, কিন্তু কেউ আমাদের কথায় কর্ণপাত করলে না।

অবশেষে একটা দেউড়িওয়ালা উঁচু পাঁচিল-তোলা পুরোনো আমলের কোঠাবাড়ীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে ভাবচি, এখন কি করা যায়—একজন বৃদ্ধ হঠাৎ দরজা খুলে বাইরে এলেন। আমায় বল্লেন, কে?

—আজ্ঞে, আমাদের বাড়ী এখানে নয়।

—এখানে কি মনে করে?

—বিদেশী লোক, রাত্রে একটু থাকবার জায়গা খুঁজচি।

—তোমরা?

—আজ্ঞে ব্রাহ্মণ।

—কি ব্রাহ্মণ। উপাধি কি?

—রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, উপাধি রায়।

বৃদ্ধ একবার আমার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে বল্লে—এসো বাপু। সঙ্গে কেউ আছে? তাকেও ডাকো।

এভাবে আশ্রয় পেয়ে প্রথমটা খুব খুশী হয়ে উঠেছিলাম বটে কিন্তু পরে সদর দেউড়ি পার হয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে সেই পুরোনো আমলের বাড়ীর চেহারা দেখে কেমন ভয় ভয় হ'ল। নির্জ্জন বাড়ীটায় কেউ যেন কোথাও নেই—এখানে যদি এরা টাকার জন্যে আমাদের খুন ক'রে পুঁতে রাখে, তবে লাস সনাক্ত করবার মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ভেতরে গিয়ে দু'মহল পার হয়ে তৃতীয় মহলে ঢুকে নারীকণ্ঠের স্বর শুনে একটু ভরসা হ'ল। মেয়েদের সামনে খুনটা অন্তত করতে পারবে না। চটাওঠা একটা খুব বড় রোয়াকের একপাশে বর্ষার জলে আগাছা গজিয়ে রীতিমত বন হয়েচে। আমার ভয় হ'ল ওখানে নিশ্চয়ই সাপ লুকিয়ে থাকে। সেই রোয়াকে আমাদের বসবার জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকলো।

পীতাম্বর চাপা গলায় বল্লে—বাবাঠাকুর, এ কি-রকম জায়গা? চলো সরে পড়ি।

আমি ভরসা পেয়েচি মেয়েদের দেখে। বল্লাম—বনেদী গেরস্ত, অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েচে এখন। কোনো ভয় নেই।

একটু পরে বৃদ্ধ ফিরে এসে বল্লে—তোমার সঙ্গের লোকটি কি-জাত? গোয়ালা? বেশ। ওকে এই পেছনের পুকুর থেকে এক ঘড়া জল আনতে হবে, তোমাদের হাত পা ধোবার জন্যে। আমার বাড়ীতে লোকের অভাব।

আমি বল্লাম—যাও পীতাম্বর—

পীতাম্বর দেখি আমায় চোখ টিপচে। আমি ধমক দিয়ে বল্লাম—যাও না—বসে কেন?

অগত্যা সে চলে গেল। আমি একা পড়ে গেলাম অতবড় বাড়ীর মধ্যে। পীতাম্বরের সন্দেহের অর্থ বুঝিনি এমন নির্ব্বোধ নই আমি। খুব সতর্ক হয়ে রইলাম—নিজের দশ হাতের মধ্যে কোনো অপরিচিত লোককে আসতে দিচ্চিনে—কাউকে বিশ্বাস নেই এখানে। প্রসিদ্ধ ডাকাতের জায়গা সিজে-ডুমুর দ'।

বৃদ্ধ দেখি আবার আসচে। আমি উঠে দাঁড়ালাম। ওর হাতে লুকোনো সড়কি নেই তো? উঠে দাঁড়ালে তবুও ছুট দিতে পারবো।

বৃদ্ধ বল্লে—দাঁড়িয়ে কেন, বোসো বোসো। তোমাদের বাড়ী কোথায় বল্লে?

—আজ্ঞে সনাতনপুর, নদে' জেলা।

—বাপের নাম কি?

—৺ভূষণচন্দ্র রায়।

—কি কর? বয়স কত? ছেলেমানুষ বলে মনে হচ্চে।

বৃদ্ধ একটা আশ্চর্য্য প্রশ্নও করলে হঠাৎ। বল্লে—গায়ত্রী মন্ত্র বলো তো?

ব্যাপার কি? বৃদ্ধ পাগল টাগল নয় তো? রাত্তিরটা কাটলে বাঁচি।

কি করি, আবৃত্তি করে গেলাম গায়ত্রী।

একটু পরে জল নিয়ে পীতাম্বর ফিরে এল, আমরা হাত পা ধুয়ে বিশ্রাম করলাম। রাত্রের আহারাদিও শেষ হ'ল। আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে টানা বারান্দার একপাশে একটা ঘরে বৃদ্ধ আমার শোয়ার জায়গা দেখিয়ে দিলে।

বিছানায় সবে শুয়েচি। এমন সময় একটি স্ত্রীলোক আমার ঘরে ঢুকলেন। স্ত্রীলোকটির রং বেশ ফর্সা, বয়স চল্লিশের কম নয়, হাতে মোটা সোনার বালা, পরনে রাঙাপাড় শাড়ী। আমার মায়ের বয়সী। দেখে আমি একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম। উঠে বসবার চেষ্টা করলাম বিছানা থেকে।

তিনি বল্লেন—না না থাক, তুমি শোও। বড্ড কষ্ট করে এসেচ, কিছু খাওয়া তো হ'ল না—কিই বা ঘরে আছে?

এমন সময় আবার বৃদ্ধটি ঘরে ঢুকে এমন একটি কথা বল্লেন, যাতে আমি আবার ভাবলাম বৃদ্ধটির মাথা নিশ্চয়ই খারাপ। তিনি স্ত্রীলোকটির দিকে চেয়ে বল্লেন—কেমন, পছন্দ হয়?

স্ত্রীলোকটি বল্লেন—সে কথা এখন কেন! বাছা ঘুমুক। চলো আমরা যাই এখন।

ওঁরা চলে গেলে আমি ভাবলাম, পীতাম্বরকে ডাক দেবো নাকি? কি ব্যাপার এঁদের? নরবলি-টলি দেবে না তো আমায়? পছন্দ কিসের হবে? রাত্রি বোধ হয় কাটলো না।

সকালে পীতাম্বরকে ডাক দিয়ে বল্লাম—চলো সকালেই বেরুনো যাক।

—তা যেমন আপনি বলেন বাবাঠাকুর। একটা কথা বলবো?

—কি?

—কাল আমি শোবার পরে সেই বুড়ো আমার কাছে গিয়ে অনেক খোঁজখবর নিলেন। আপনার বাড়ী কোথায়, কে আছে, অবস্থা কেমন, কিসে চলে—সে অনেক কথা। এ জায়গা ভাল নয়, এখুনি এখান থেকে যাওয়া ভালো।

বৃদ্ধ কিন্তু পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, কাল রাত্রে আমাদের খাওয়া-দাওয়া ভালো হয় নি, আজ এখানে থাকতেই হবে। আমার সঙ্গে তাঁর নাকি একটা কথাও আছে।

—কি কথা?

—আহারাদি ক'রে নাও, ওবেলা হবে এখন সে সব—

বৃদ্ধকে যেন বড় ব্যস্ত বলে মনে হ'ল! বৃদ্ধ পিছন ফিরতেই পীতাম্বর আমায় এসে চুপি চুপি বল্লে—বাবাঠাকুর, বড় বিপদ।

—কি রে?

—এরা ডাকাত। সদর দেউড়ি বন্ধ করে দিয়েচে। টাকার সন্ধান পেয়ে গিয়েচে। বাইরে যেতে দেবে না।

—সত্যি?

—দেখে আসুন নিজের চোখে সদর দেউড়িতে তালা লাগানো।

কথাটি কিন্তু আমার মনে লাগলো না। রাত্রিতে অন্ধকারে এরা যে কাজ অনায়াসে

শেষ করতে পারতো, তার জন্যে দিনমানে দেউড়ি বন্ধ করে গোলমাল বাধাবার চেষ্টা পাবে কেন? পীতাম্বর হাজার হোক গোয়ালার ছেলে, আশি বৎসরে সাবালক হয় না।

রাত্রের সেই স্ত্রীলোকটি একটু পরে এসে বল্লেন—বাবা, কুয়োর জল তুলে দিচ্চি। বেশ করে নেয়ে নাও। কিন্তু এবেলা কিছু খেয়ো না যেন!

আশ্চর্য্য হয়ে বল্লাম—খাব না কেন মা?

এ নিশ্চয়ই নরবলি না হয়ে যায় না!

স্ত্রীলোকটি বল্লেন—মা বলে ডেকেচ তো? তা হ'লেই হয়ে গেল। কর্ত্তার কাছে সব শুনো।

বলতে বলতে বৃদ্ধ এসে হাজির। বল্লেন—সোজা কথা বলি শোনো। আমার একটি নাতনী আছে, সেটিকে তোমায় বিয়ে করতে হবে। সুন্দরী মেয়ে—তোমাকে এখুনি দেখানো হচ্চে। কোনো অনিষ্ট হবে না তোমার। মেয়ে কানা খোঁড়া নয়, দেখলেই বুঝতে পারবে। তোমার সঙ্গে চমৎকার মানাবে বলেই এ সম্বন্ধ স্থির করেছি।

আমার সামনে বজ্রপাত হলেও বোধ হয় তত আশ্চর্য্য হ'তাম না। বিয়ে করতে হবে, সে কেমন কথা!

বল্লাম—সে কি! তা কেমন করে হয়?

—কেন হবে না? তোমরা আমাদেরই পালটি ঘর। মেয়ে ভালো। তোমার অমতের কারণ কি? গহনাপত্র সবই দেওয়া হবে।

—আজ্ঞে তা হয় না।

বৃদ্ধের মুখচোখের ভাব বদলে গেল। হঠাৎ অত্যন্ত কর্কশ ও রুক্ষস্বরে বলে উঠলো—তা হয় না? তা হ'তে হবে। আমি কে জানো? আমার নাম ঈশ্বর রায়। আমার নামে সিঙ্গে-ডুমুর দ' থেকে মগরার খাল পর্য্যন্ত লোকে থরহরি কাঁপতো একদিন। বিয়ে না করে এখান থেকে যাবার জো নেই তোমার। দেউড়িতে চাবি দেওয়া, ঘাড়ে ধরে বিয়ে দেওয়াবো, যদি সোজা আঙুলে ঘি না ওঠে। গোঁপদাড়ি ওঠেনি, ছোকরা কার সঙ্গে কি বলচো তোমার খেয়াল নেই?

আমি কাঠের পুতুলের মত রইলাম। বৃদ্ধ সেই স্ত্রীলোকটির দিকে চেয়ে বল্লে—যাও, জগদ্ধাত্রীকে নিয়ে এসো।

স্ত্রীলোকটি ঘরের মধ্যে ঢুকলেন এবং একটু পরে যখন মেয়েকে নিয়ে এলেন হাত ধরে, তখন সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মতই তার রূপ ফুটে উঠলো আমার মূঢ় চোখের সামনে। যেমনি গড়ন, তেমনি লম্বা, তেমনি রং। নামেও জগদ্ধাত্রী, রূপেও জগদ্ধাত্রী, ব্যবহারেও তাই।

এর পরে গল্প খুবই সংক্ষিপ্ত। এই মেয়েই তোমাদের ঠাকুরমা ৺জগদ্ধাত্রী দেবী। পুণ্যবতী, সিঁথের সিঁদুর নিয়ে চলে গিয়েচে আজ কত কাল, তোমাদের বাপ তখন ছ'বছরের।

আর সেই ডাকাতের সর্দ্দার ঈশ্বর রায় ছিলেন আমার দাদাশ্বশুর।

গল্পটি শেষ করে ঠাকুরদা একবার শ্রোতাদের মুখের দিকে চাইলেন, কিন্তু কারুর মুখ দেখে বোঝা গেল না যে তারা কেউ এটা বিশ্বাস করেছে।

তখন তামাকের নলটায় একটা জোরে টান দিয়ে বল্লেন, আগেই তো বলেচি এটা সত্যি বলে তোমরা কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না। কিন্তু জেনো, এটা সত্যি—বুড়ো বয়েসে মিথ্যা কথা বলে নাতিদের ঠকিয়ে আমার লাভ কি বলো!

ভিড়

ষ্টেশনে আসতে দেরি হয়ে গিয়েছে, টিকিট-ঘরের দিকে চেয়ে হৃৎস্পন্দন বন্ধ হবার উপক্রম হ'ল। তিনবার কুণ্ডলী খেয়ে এক বিরাট কিউ, টিকিটের জানালা থেকে এন্‌কোয়ারি অফিস পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে। ঘড়ির দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে সর্ব্বাগ্রে চট ক'রে সেই কুণ্ডলী-পাকানো অজগর সাপের লেজের আগায় গিয়ে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলাম। নইলে আরও পিছিয়ে পড়তে হবে এক্ষুনি।

তিন মিনিটের মধ্যে লেজটা আরও ছ'হাত বেড়ে গেল।

বহু লোক ব্যাপার দেখে টিকিটের জানালার কাছাকাছি যে সব লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, তাদের কাছে টাকা নিয়ে গিয়ে খোসামোদ করছে,—মশাই, আপনি তো টিকিট করছেনই, এই উলুবেড়ের দু'খানা অমনই ওই সঙ্গে—

—আমার, মশাই, একখানা অমনই কোলাঘাটের—

যাকে অনুনয় করা হচ্ছে সে বলছে,—ওসব হবে না। নিজের নিয়েই ব্যস্ত—না, না, কেন আপনি বকছেন মশাই? যান, তার চেয়ে কিউতে দাঁড়ানো ভাল। লোককে খোশামোদ করা ধাতে সয় না।

কিন্তু এদিকে ঘড়িতে এগারোটা বাজে। এগারোটা কুড়িতে নাগপুর প্যাসেঞ্জার ছাড়বে—কুড়ি মিনিটের মধ্যে। সম্মুখে এই বিরাট কিউ। বিশ্বাস তো হয় না।

আরও দশ মিনিট কেটে গেল। কিউ যেমন তেমনই, বিশেষ কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন অন্তত চর্ম্মচক্ষে তো দৃষ্টিগোচর হয় না, এক-একখানা টিকিট দিতে ছ'মাস লাগছে। এই রেটে আমার পালা আসতে বেলা আড়াইটে বাজবে, এগারোটা কুড়িতে এর সিকির সিকিও ফুরোবে না।

সঙ্গে লটবহর, মেয়েছেলে। নইলে না হয় ফিরেই যেতাম। সারাদিনে আর ট্রেনও নেই।

এই সব ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ হুড়মুড় ক'রে গেল কিউ ভেঙে। দেখি, জনতা ঊর্দ্ধশ্বাসে পাশের জানালার দিকে ছুটছে। কি ব্যাপার, কেউ বলে না। চেয়ে দেখি, এ জানালা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ছুটলাম পাশের জানালার দিকে। সেখানে তখন ঠেসাঠেসি, ধাকাধাকি

ও হাতাহাতি চলেছে। পূর্ব্বতন কিউয়ের লেজের দিকে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারাই এখন নতুন কিউয়ের পুরোভাগে আসবার প্রয়াসী।

একজন বলছে,—তুমার জায়গা এখানে ছিল? খবরদার—

—খবরদার—

—মু' সামালকে বাত বোলো—

—এই ব্যাটা, দেখবি?

মুহূর্ত্তমধ্যে বিশৃঙ্খলা, কিলোকিলি। অকথ্য ভাষণের বন্যা ব'য়ে গেল উভয় পক্ষে।

আমি অতি কষ্টে প্রাণপণে জন আষ্টেক লোকের পেছনে জায়গা দখল করেছিলাম। মিনিট দশেক পরে যখন টিকিটের জানালার কাছে আসবার পালা এল, তখন আমার গন্তব্য স্থানের কথা শুনেই মেমসাহেব বললে, নট হিয়ার, নম্বর টোয়েন্টি।

সে আবার কোথায়? নাঃ, ট্রেন পাওয়া যাবে না দেখছি। আর সময় নেই। যদি বা অতি কষ্টে একটু জায়গা করলাম, তাও কোন কাজে এল না। খুঁজে খুঁজে কুড়ি নম্বরের জানালা বার করলাম, সেখানেও কিউ, তবে অত লম্বা নয়। একজন বললে,—মশাই, কোথায় যাবেন? আমায় দয়া ক'রে একখানা খড়্গপুরের—

মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছে। রূঢ়স্বরে বললাম,—কেন বিরক্ত কর বাপু?

মেমসাহেবকে নোট বার ক'রে দিতেই ছুঁড়ে ফেলে দিলে,—নো চেঞ্জ, ভাগো।

তটস্থ ও কাঁচুমাচু হয়ে বলি, ইয়েস ম্যাডাম, সরি ম্যাডাম, হিয়ার মাই চেঞ্জ ম্যাডাম।

পকেট হাতড়ে দশ আনা পয়সা বার করবার পথ খুঁজে পাই না।

কনুইয়ের কাছে একটি সানুনয় অনুরোধ আমায় বাবু, একখানা মেচেদার টিকিট যদি ক'রে দেন, ছোট ছেলে সঙ্গে রয়েছে, ভিড়ে ঢুকতে পারছি না, দু'বার গেনু—

মাথা তখন সম্পূর্ণ বেঠিক। বলি,—ভাগো।

—বাবু, দেন একখানা। দু'বার গেনু—

—নেই হোগা, ভাগো। রাগের মাথায় হিন্দি বেরিয়ে পড়ে।

টিকিট-কাটা পর্ব্ব সাঙ্গ ক'রে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটি গাড়ী ধরতে। মেয়েদের গাড়ীতে জিনিসপত্র তুলে দিলাম, কারণ চেয়ে দেখে মনে হ'ল অতি কষ্টে নিজে উঠতে পারব কি না সন্দেহ।

অসম্ভব ভিড় প্রত্যেক গাড়ীতে। তার ওপর মানুষ কেমন যেন হৃদয়হীন, রূঢ়, পশুবৎ হয়ে উঠেছে, এরা নিজের নিজের জিনিস, নিজের নিজের বসবার জায়গা সামলাতে ভীষণ ব্যস্ত ও অত্যধিক সতর্ক। এই রেলেই কতবার ভ্রমণ করেছি, মানুষের মধ্যে কত সহানুভূতি কত মমত্ব দেখেছি। এখন এই বিপদের চাপে মানুষ রূঢ় কঠোর হয়ে উঠেছে। একবার মনে আছে, —সম্পূর্ণ অপরিচিতা এক ভদ্রমহিলা আমাকে তাঁদের খাবার ঝুড়ি থেকে খাবার বের ক'রে ডিশে সাজিয়ে তাঁর স্বামীর হাত দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। ভদ্রলোক আমার সামনে ডিশ রেখে বিনীতভাবে বললেন, একটু জলযোগ করুন।

আমি চমকে উঠলাম। হাওড়া থেকে একসঙ্গে ইণ্টার ক্লাসে যাচ্ছি পাশাপাশি বেঞ্চিতে,

অথচ একটা কথা বিনিময় হয় নি তাঁদের সঙ্গে আমার। জলখাবার দেওয়ার ব্যাপার ঘটল পরদিন সকালে কিউল স্টেশনে।

সঙ্কোচের সঙ্গে বললাম,—না না, এ কেন, আমি—আপনারা খান।

—না, সে শুনব না, খেতেই হবে। এ সব স্টেশনে খাবার পাওয়া যায় না, অনেক খাবার আছে আমাদের সঙ্গে, দয়া ক'রে একটু মুখে দিন।

কোথায় গেল সে সব দিন! এখন একখানা কচুরির মত তিন ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট পুরির দাম এক আনা। মানুষের ভ্রাতৃভাব কোথায় উবে গিয়েছে।

ট্রেনের জানালার বাইরে ভিখারীর ভিড়। একজন শীর্ণকায় স্ত্রীলোক, কোলে তার একটি ছেলে, ইনিয়ে বিনিয়ে বলছে,—বাবু, তোমরা থাকতে আমরা ডুবে যাব! সমস্ত দিন খাই নি, দুটো পয়সা দেন।

একজন উত্তর দিলে,—কোথা থেকে দোব বাপু। চল্লিশ টাকা চালের মণ, এবার সবাই ডুববে, যাও, হবে না।

একটি রোগা হ্যাংলা গোছের লোক ময়লা পৈতে বার ক'রে ভিক্ষে করছে। কামরার ও-প্রান্ত থেকে সে সুর ক'রে প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করতে করতে আসছে শুনছি। তার নাকি অনেক কষ্ট, বাড়ীতে বৃদ্ধা মাতা শয্যাগত, স্ত্রীপুত্র অনাহারে মরছে। যত কাছে আসে, ততই দেখলাম নিজের মনে রাগ ও বিরক্তি জমে' উঠছে। কাছে এলে মুখ খিঁচিয়ে বলি, ইদিকে আর কোথায় আসছ? দেখছো ভিড়ের ঠ্যালা! না পাব কোথাও খুচরো যে তোমায় দোব! খুচরোর অভাবে বলে চা খেতে পাই নি—

গাড়ীর ভিড় ক্রমশই বাড়ছে ব'লে সবাই গাড়ীর দোর ঠেলে বন্ধ ক'রে রেখেছে, কাউকে উঠতে দেবে না। জানালা গলিয়ে জোরজবরদস্তি ক'রে লোক উঠে প'ড়ে দফায় দফায় মারামারির সৃষ্টি করছে।

—মশাই, একটু সরে' বসুন না!

—কোথায় সরে' বসব, দেখুন। বাঃ, ঘাড়ে এসে বসলেন যে!

—আপনি যে এতটা জায়গা জুড়ে ব'সে থাকবেন! দেখছেন না ভিড়!

—তাই ব'লে আপনি ঘাড়ের ওপর এসে বসবেন? খুব ভদ্দরলোক তো?

—ভদ্দরলোক তুলে কথা বলবেন না, সাবধান ক'রে দিচ্ছি।

—ওঃ, কেন? নবাব খান্জা খাঁ নাকি? কিসের ভয়? তোমার এক চালায় বাস করি?

—খবরদার! মুখ সামলে। 'তুমি' 'তুমি' করবে না বলছি। একটা চড়ে—

অতঃপর বিরাট কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি। এক পক্ষে ভাঙা ছাতা, অপর পক্ষে মুষ্টিবদ্ধ হস্ত। গাড়ীর লোকে 'হাঁ' 'হাঁ' ক'রে উভয়ের মধ্যে এসে প'ড়ে তাদের ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। চলল নানাবিধ সদুপদেশ।—এই সামান্যক্ষণ গাড়ীতে থাকা, তার জন্যে কেন ঝগড়া করা? বলি, এই আঁদুল থেকেই তো লোক নামতে শুরু হবে।

গাড়ী চলেছে। কলকারখানা, লোকের ঘরবাড়ী, ধানের ক্ষেত। প্রত্যেক স্টেশনে লোকে কামরার বাইরের হাণ্ডেল ধ'রে ঝুলছে, প্রায়ই নাকি দু-একটা প'ড়ে গিয়ে মারাও যাচ্ছে। নতুন নতুন স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে কি ভীষণ ভিড়, এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত লোকজন, মেয়েছেলে, ট্রাঙ্ক, বোঁচকা, পুঁটলি, গুড়ের ভাঁড়, চোরাই চালের বস্তা, ছাতি, লাঠি নিয়ে অধীর ব্যস্ততার সঙ্গে ছুটোছুটি করছে, যে ক'রে হোক গাড়ীতে উঠতেই হবে তাদের।

আমাদের কামরায় যত লোক ব'সে আছে, তার দু'গুণ দাঁড়িয়ে রয়েছে। যারা ঢুকতে আসছে, তাদের সকলকেই বলা হচ্ছে,—আগে যাও, আগের গাড়ী খালি।

সে স্তোকবাক্যে কেউ ভুলে আগে দেখতে যাচ্ছে, কেউ না ভুলে বলছে, কোথায় খালি বাবু, দেখে আসুন পিঁপড়ে ঢোকানোর জায়গা নেই কোনও গাড়ীতে, দেন একটু খুলে, দিনেরাতে এই একখানা গাড়ী।

এক দাড়িওয়ালা শিখ আমাদের দ্বারপাল। সে হুঙ্কার দিয়ে বলছে,—আগাড়িওয়ালা ডাব্বামে চলা যাও।

ইতিমধ্যে ওপরের তাক থেকে এক লুঙি-পরা গোঁপছাঁটা মুসলমান পা ঝুলিয়ে নীচের বেঞ্চিতে নামবার চেষ্টা করলে দু-একবার, ভিড়ের জন্যে কৃতকার্য্য হ'ল না, শেষ পর্য্যন্ত একজনের প্রায় ঘাড়ে পা দিয়েই নামল। লম্বা, রোগামত লোকটা, মুখখানাতে যেন বদমাইশি মাখানো। ওকে দেখে আজকের এই সমস্ত কলহ-কোলাহল-নির্ম্মমতার প্রতীক ব'লে যেন মনে হ'ল। বিড়ির ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার ক'রে দিয়ে দিব্যি সে চেপে বসল সামনের বেঞ্চিতে।

কামরার মধ্যে অন্য কোন কথাই নেই, কেবল—

—মশাই আপনাদের ইদিকে চাল কি দর?

—চল্লিশ টাকা। আপনাদের?

—আমাদের সাড়ে বত্রিশ দেখে এসেছি।

—সে কোন্ জায়গা?

—ওই দক্ষিণে—ডায়মণ্ডহারবার।

—মানুষ এবার না খেয়ে ম'রে যাবে মশাই।

ডায়মণ্ডহারবারবাসী লোকটি বললে,—ম'রে যাবে কি মশাই, মরে যাচ্ছে। আমাদের ওদিকে একদিন কতকগুলো গরীব লোকের মেয়েছেলে এসে বললে, তোমাদের বনের কচু সব তুলে নিয়ে যাব, আর কচি জামরুলপাতা।

কে একজন জিজ্ঞেস করলে,—জামরুলপাতা আবার খায় নাকি?

—খায় না? গিয়ে দেখুন, আমাদের দেশে জামরুলগাছের আর পাতা নেই, সব সাবাড় করেছে।

আর একজন বললে,—এই তো আজও দুটো ভিখিরি শেয়ালদার কাছে ফুটপাথে ম'রে

প'ড়ে ছিল সকালবেলা।

—আজ নতুন দেখলেন আপনি ? ও দুটো-পাঁচটা রোজ মরছে। কাল বৈঠকখানার বাজারে কণ্ট্রোলের চালের কিউতে এক বুড়ী ধুঁকতে ধুঁকতে মারা গেল, আমাদের দোকানের সামনে।

—কিসের দোকান আপনাদের ?

—কাপড়কাচা সাবান। আমি এই ইষ্টিশানে নামব, পুঁটুলিটা ছেড়ে দেন।—চিঁড়ে, তাই দু'টাকা সের।

মনে পড়ল, আমাদের দেশের হাটে সদ্‌গোপ মেয়েরা চিঁড়ে বিক্রি করত, দু'আনা সের, চিরকাল দেখে এসেছি। চার আনা সেরের মুড়কি, খুব ভাল মুড়কি ছিল। আর সে সব দিন ফিরবে কখনও ?

কি একটা স্টেশনে এসে গাড়ী দাঁড়াল। শিখ দাঁড়িয়ে উঠল, দরজা ঠেলে বন্ধ ক'রে যাত্রীদের রুখতে হবে। আবার একদফা হৈ-হৈ চীৎকার, গালাগালি, অনুনয়-বিনয় ও হুঙ্কারের পালা শুরু হ'ল। একটা কচি ছেলের চীৎকার প্ল্যাটফর্ম্মের বাইরে। একজন লোক জানালা দিয়ে গ'লে আসবার প্রাণপণ চেষ্টা করাতে গাড়ীর লোকে তাকে ধাক্কা মেরে নামিয়ে দিয়ে জানালা বন্ধ ক'রে দিলে। মনে হ'ল, বেশ হয়েছে, ওঠ জানালা দিয়ে !

মন নিষ্ঠুর নির্ম্মম হয়ে উঠেছে বিপদের মুখে প'ড়ে। অন্য কারও সুবিধা-অসুবিধা সে এখন বুঝতে রাজি নয় !

একটা স্টেশনে দেখা গেল, চারিদিকে থৈ-থৈ করছে জল। বললাম,—এটা কি বন্যে নাকি ?

একজন বললে,—কাঁসাই নদীর বন্যে। কত ধান যে ডুবে গিয়েছে, দু'খানা গাঁ একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে মশাই।

শিখ দ্বারপাল বললে,—নেই হোগা, আগাড়িওয়ালা ডাব্বা একদম খালি, যাও আগাড়ি।

আর একজন বললে,—ভাসিয়ে নিয়ে যাবে না মশাই ? চেতাবুনিতে যে লিখেছিল—

কোণ থেকে কে ব'লে উঠল,—বাদ দিন চেতাবুনি ! জোচ্চোর কোথাকার—

অর্থাৎ লোকটা চেতাবুনিতে কথিত প্রলয় দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়েছে।

এইবার সেই লুঙি-পরা লোকটি ন'ড়েচ'ড়ে ব'সে বললে—বাবু, আমাদের নন্দিগ্রাম থানায় এমন এক জ্বর দেখা দিয়েছে, যার হচ্ছে, তিন দিন চার দিন পরে মারা পড়ছে। আর বছর হ'ল আশ্বিনে ঝড়, এ বছর বন্যে আর তার সঙ্গে এই জ্বর। আমার মশাই বাইশ বছরের ছেলে—

ব'লেই, কোথাও কিছু নেই, -লোকটা হাউমাউ ক'রে কেঁদে উঠল।

—কি হয়েছে ছেলের ?

—আর কি হবে বাবু, নেই। সেই খবর পেয়েই তো দেশে যাচ্ছি। কলকাতায়

কলে চাকরি করি, আর-বছর ঘরদোর ঝড়ে সব প'ড়ে গেল, আবার এ বছর বাইশ বছরের ছেলেটা—

আবার সে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল। গাড়ীসুদ্ধ লোকের গোলমাল যেন মন্ত্রবলে স্তব্ধ হয়ে গেল। শিখ দ্বারপাল তার হুঙ্কার থামিয়েছে। কাছাকাছি দু-একজন লোক সান্ত্বনা দেবার কথা বলতে লাগল। কি অসহায় ওর কান্না!

—কেঁদো না ভাই, কি করবে কেঁদে, আহা, বাইশ বছরের ছেলে। বাঁচা-মরা কারও হাতে নয় দাদা। নাও, বিড়িটা ধরাও।

ওই একটি পুত্রবিয়োগাতুর পিতার ক্রন্দনে গাড়ীর আবহাওয়া যেন বদলে গেল এক মুহূর্তে। সূচ্যগ্রপরিমাণ স্থানের জন্যে যে নির্লজ্জ চেষ্টা ও আঁকড়ে থাকবার আগ্রহ, তা বন্ধ হয়ে গেল।

—স'রে আসুন না, এদিকে জায়গা আছে।

একটা ছোট ছেলে অনেকক্ষণ থেকে একটা নারকেল তেলের বোতল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, এতক্ষণ পরে একজন কে তাকে হাত ধ'রে বললে,—বাবা, এখানে ব'স কোনও রকমে, হয়ে যাবে এখন।

যে লুঙি-পরা লোকটিকে এতক্ষণ আমি গুণ্ডার সর্দ্দার ব'লে ভাবছিলাম, তার মুখের দিকে চেয়ে কেমন একটা করুণা ও সহানুভূতির উদ্রেক হ'ল। হতভাগ্য পিতা, হয়তো ওর বৃদ্ধ বয়সের সম্বল হয়ে দাঁড়াত এই পুত্রটি, হয়তো ওর একমাত্র পুত্র। গাড়ীর আবহাওয়া ওর কান্নার সুরে কি আশ্চর্য্যভাবেই বদলে গিয়েছে। এই নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা, উগ্র স্বার্থবোধ, যা হাওড়া থেকে উঠে পর্য্যন্ত সমানে দেখে আসছি, যাতে শুধু মানুষের পশুত্বের ছবিটাই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল চোখের সামনে, ওই লুঙি-পরা লোকটির চোখের জলে সব যেন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল। মানুষের লজ্জা হ'ল মানবতার অপমানে যেন। যেন সবাই সতর্ক হয়ে উঠল।

এইবার যে স্টেশনে গাড়ী এসে দাঁড়াল, সেখানে লোকটি নেমে যাবে। গাড়ীর এক কোণে একটি দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ ব'সে ছিল, সে আবেগভরে বললে,—এখানে নামবে? আচ্ছা বাবা, ভগবান তোমার মনে শান্তি দিন, আমি বুড়ো বামুন, আশীর্ব্বাদ করছি, ভালো হবে তোমার, ভালো হবে!

আরক

লাহোর মিউজিয়মে যখন চাকরী করতাম সে সময় লাহোরের বিখ্যাত 'দেশ-বন্ধু' কাগজের সম্পাদক বিনায়ক দত্ত সিং মহাশয়ের সঙ্গে আমার যথেষ্ট আলাপ হয়। মিঃ সিংহ প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, তাঁদের আদি বাসভূমি পাঞ্জাবে নয়, রাজপুতানার কোটা রাজ্যে।

তিনপুরুষ পূর্ব্বে তাঁর পিতামহ রাজকার্য্য উপলক্ষ্যে এসে পাঞ্জাবে বাস করেন, সেই থেকেই তাঁরা দেশছাড়া। সন্ধ্যার পরে তাঁর বৈঠকখানায় গিয়ে বসতাম এবং দেওয়ালে টাঙানো পুরানো আমলের বর্ম্ম, কুঠার, পতাকা, বল্লম প্রভৃতি রাজপুতের যুদ্ধাস্ত্র সম্বন্ধে নানা ইতিহাস ও আলোচনা শুনতে বড় ভালো লাগতো। রাজপুতানার, বিশেষ করে কোটা রাজ্যের ইতিহাস সম্বন্ধে মিঃ সিংয়ের জ্ঞান খুবই গভীর।

কিন্তু এ-সকল কথা নয়। আমি একটা আশ্চর্য্য ঘটনা বলবো। মিঃ বিনায়ক দত্ত সিংয়ের মত সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোকের মুখে না শুনলে আমিও এ কাহিনী হেসে উড়িয়ে দিতাম।

একদিন শীতকালে সন্ধ্যার পরে আমি মিঃ সিংয়ের বৈঠকখানায় গিয়ে বসেচি। ভীষণ শীত সেদিন। দু'পেয়ালা গরম চা পানের পর তাওয়ার তামাক টানচি (মিঃ সিং ধূমপানে অভ্যস্ত নন)। হঠাৎ কি মনে করে জানিনে, আমি তাঁকে বল্লাম—মিঃ সিং, আপনি অপ-দেবতায় বিশ্বাস করেন ?

মিঃ সিং একটু চিন্তা করে বল্লেন—হ্যাঁ, করি।

—দেখেচেন ভূতটুত ?

মিঃ সিং গম্ভীর স্বরে বল্লেন—না, এ আমার কথা নয়। আমার ছোট ঠাকুরদাদার জীবনের ঘটনা। যদি এ ঘটনা না ঘটতো আমাদের বংশে, তবে আজও আমরা কোটা রাজ্যে মস্ত বড় খানদানি তালুকদার হয়ে থাকতে পারতাম। লাহোরে এসে চাকরি করতে হ'ত না। সে বড় আশ্চর্য্য ঘটনা।

আমি বল্লাম—কি রকম ?

—শুনুন তবে। আমার ছোট ঠাকুরদা আমার পিতামহের আপন ভাই নন, বৈমাত্র ভাই। তিনি মস্ত বড় সৌখীন মানুষ ছিলেন— আর ছিলেন খুব সুপুরুষ।

আমি বিনায়ক দত্ত সিংয়ের দীর্ঘ, গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠ দেহের দিকে চেয়ে সে কথা অবিশ্বাস করতে পারলাম না।

তারপর তিনি বলে যেতে লাগলেন—আমি যখন তাঁকে দেখেচি, তখন আমার বয়স খুব কম। কিন্তু তিনি তখন বদ্ধ উন্মাদ !—এক দম। কেন তিনি উন্মাদ হ'লেন, সেই ইতিহাসের মূলেই এই গল্প। তিনি উন্মাদ হওয়াতে কোটা রাজদরবারের আইন অনুসারে তাঁর ভাগের সমস্ত সম্পত্তি আমাদের হাতছাড়া—সে কথা যাক্ গে। আসল গল্পটা বলি—

বিনায়ক দত্ত সিং তাঁর অনবদ্য উর্দ্দুতে সমস্ত গল্পটা বলে গেলেন। মধ্যে মধ্যে আমি তাঁকে নানা প্রশ্ন করেছিলুম, সে সব বাদ দিয়ে শুধু গল্পটাই আমার নিজের ভাষায় প্রকাশ করলাম।

আমাদের গ্রাম থেকে কিছুদূরে কোটা দরবারের একটা সৈন্যদের আড্ডা ছিল। আমার ঠাকুরদাদা সেই সৈন্যদের আড্ডায় মাঝে মাঝে যেতেন—মদ খেয়ে স্ফূর্ত্তি করতে। তাঁর দু'একজন বন্ধু সেখানে ছিল, তাদের সঙ্গের নেশাতেই সেখানে যাওয়া। একবার জ্যোৎস্নারাত্রে তিনি আর তাঁর দুই বন্ধু খেয়ালের মাথায় বরী নদীতে স্নান করতে যাবেন বলে ঘোড়ায় করে বেরুলেন।

বরী নদী মরুভূমির মধ্য দিয়ে তিন শাখায় ভাগ হয়ে সাবলীল গতিতে বয়ে গিয়েচে। যে সময়ের কথা বলা হচ্চে তখন এই ত্রিস্রোতা নদীর প্রথম ধারাটিতে আদৌ জল ছিল না, মাঝের শাখাটিতে হাঁটুখানেক জল—তারপর মাইলটাক বিস্তৃত চড়া—তার ওপারে আসল ধারা, অনেকখানি জল তা'তে।

যাবার পথে একজন বন্ধুর কি খেয়াল হ'ল তিনি প্রথম ধারার বালির ওপর ঘোড়া থেকে নেমে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লেন—আর কিছুতেই উঠতে চাইলেন না। বাকি বন্ধুটি আর আমার ঠাকুরদাদা অগত্যা তাকে সেখানেই বালুশয্যার শায়িত অবস্থায় ফেলে চল্লেন এগিয়ে। বলা বাহুল্য, তিনজনের মধ্যে কেউই ঠিক প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিলেন না।

আমার ঠাকুরদাদা বড় ধারা অর্থাৎ আসল বরী নদীর কাছে এসে পেছন ফিরে চেয়ে দেখলেন তাঁর বন্ধুটি ঘোড়া থামিয়ে বালির চড়ার পশ্চিম দিকে ভীত ও বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। ঠাকুরদাদা বল্লেন—ওদিকে কি দেখচ চেয়ে?

বন্ধু মুখে কিছু না বলে সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখালে আর ইঙ্গিতে ঠাকুরদাদাকে চুপ করে থাকতে বল্লে। ঠাকুরদাদা চেয়ে দেখলেন, বালুর চরার ঠিক মাঝখানে অস্পষ্ট ধরণের কতকগুলি মনুষ্যমূর্ত্তি—চক্রাকারে ঘুরচে! কিছুক্ষণ চেয়ে দেখে মনে হ'ল ওরা যেই হোক্, হাত ধরাধরি করে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করচে। সেই নির্জ্জন স্থানে রাত্রিকালে কাদের এমন আমোদ লেগেচে যে লোকচলাচলের অন্তরালে নৃত্য করতে যাবে বুঝতে না পেরে তাঁরা দু'-জনেই অবাক হয়ে রইলেন। কাছে কেউ কেন গেলেন না, সে কথা আমি বলতে পারব না, কারণ, শুনি নি। হয়তো এদের মত্ত অবস্থাই সব দৃশ্যটার জন্য দায়ী, এই ভেবে তাঁরাও কাউকে কথাটা বলেনওনি সেই সময়।

এর পরে আরও বছর তিনেক কেটে গেল।

ত্রিস্রোতা বরী নদীর প্রধান স্রোতোধারার তিন মাইল উত্তরে মরুভূমির মধ্যে একটা বড় লবণাক্ত জলের হ্রদ আছে, এর নাম 'নাহারা নিপট' অর্থাৎ ব্যাঘ্র হ্রদ। এই হ্রদের দূরে দূরে এ'কে প্রায় চারিদিক থেকে বেষ্টন করে পাহাড়শ্রেণী—এই পাহাড়শ্রেণী কোথাও হাজার ফুট উঁচু, কোথাও তার চেয়ে বেশী উঁচু। হ্রদ ও পাহাড় থেকে খনিজ লবণ পাওয়া যায় বলে কোটা দরবার থেকে মাঝে মাঝে এর ইজারা দেওয়া হ'ত ব্যবসাদারদের।

আমার ঠাকুরদাদা পূর্ব্বোক্ত ঘটনার প্রায় তিন বছর পরে একদিন এই হ্রদের জলে বালি-হাঁস শিকার করতে যাবেন ঠিক করলেন। গভীর রাত্রে বালি-হাঁসের দল হ্রদের জলে দলে দলে চরে' বেড়ায়, একথা তিনি শুনেছিলেন। একটা ঘাসের লতাপাতার ছোট ঝুপড়ি বেঁধে তিনি তার মধ্যে লুকিয়ে থাকবেন দিনমান থেকে—কারণ মানুষ দেখলে হাঁসের দল আর নামবে না।

সব ঠিকঠাক হ'ল, কিন্তু দু'একজন বৃদ্ধলোক নিষেধ করলে, রাত্রিকালে নাহারা হ্রদের ত্রিসীমানাতেও যাওয়া উচিত নয়। কেন, তারা স্পষ্ট করে কিছু বল্লে না—শুধু বল্লে জায়গাটা ভালো নয়। ভৈজি নামে একজন বৃদ্ধ ভীল আমাদের প্রজা ছিল, সে বল্লে,—কোটা দরবারের নিমক মহালের ইজারাদার এক বেনিয়ার সে চাকর ছিল তার যৌবন বয়সে। উক্ত বেনিয়ার

লবণের গুদাম আর আড্ডা ছিল নাহারা হ্রদের পাড় থেকে মাইল খানেক দূরে পাহাড়ের কোলে। সে সময় সে দেখেচে হ্রদের ওপর আকাশ হঠাৎ গভীর রাত্রে যেন দিনের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠলো—কেমন যেন অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে হ্রদের জলে। মোটের উপর রাত্রে হ্রদের ধারে কেউ যায় না—অনেক দিন থেকেই স্থানীয় লোকেদের মধ্যে এ ভয় রয়েচে। একবার এক মেষপালক রাত্রিকালে হ্রদের ধারে কাটিয়েছিল, সকালবেলা তাকে সম্পূর্ণ উন্মাদ অবস্থায় নিমকের গুদামের কাছে পায়চারি করতে দেখা যায়।

আমার ঠাকুরদাদা এসব গালগল্প শুনবার লোক ছিলেন না। তিনি বুঝতেন স্ফূর্তি, শিকার, হল্লা, হৈ-চৈ। লোকটাও ছিলেন দুঃসাহসী ও একগুঁয়ে ধরণের। তিনি যাবেনই ঠিক করলেন।

বৃদ্ধ ভীল তাঁকে বল্লে—হুজুর, হাঁসের দল যদি জলে নামে, তবে সেরাত্রে কোনো ভয় নেই জানবেন! ঠাকুরদাদা জিজ্ঞেস করলেন—কিসের ভয়? বাঘের?

—তার চেয়েও ভয়ানক কোনো জানোয়ার হতে পারে—কি জানি হুজুর, আমার শোনা কথা মাত্র। ঠিক বলতে পারিনে—

—তুই সঙ্গে থাক না? বকশিশ দেবো—

—মাপ করবেন, হুজুর। একশো রূপেয়া দিলেও না, রাত কাটাবে কে নাহারা নিপটের ধারে? প্রাণের ভয় নেই? আমরা ভীল, বাঘের ভয় রাখি নে—এই হাতে তীর দিয়ে কত বাঘ মেরেচি, কিন্তু হুজুর, বাঘের চেয়েও ভয়ানক কোনো জীব কি দুনিয়ায় নেই?

আমার ঠাকুরদাদা নাহারা হ্রদ ভালো জানতেন না। ঠিক আমাদের অঞ্চলে হ্রদটা নয়, আমাদের গ্রাম থেকে চল্লিশ মাইল দূরে। তখনই তিনি ভীলদের গ্রাম থেকে রওনা হয়ে সাত আট মাইল হেঁটে পাহাড় ডিঙিয়ে সমতল ভূমিতে নামলেন, দূরে মস্ত বড় হ্রদটার লবণাক্ত জলরাশি প্রখর সূর্য্যতাপে চক্ চক্ করচে। জনপ্রাণী নাই কোনো দিকে।

বেলা তখনও অনেকখানি আছে, এমন সময়ে ঠাকুরদাদা হ্রদের ধারে পৌঁছে গেলেন এবং নলখাগড়া ও শুকনো ঘাস দিয়ে সামান্য একটু আবরণ মত তৈরি করে নিলেন জলের ধারেই, যার আড়ালে তিনি বন্দুক নিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারেন, হাঁসের দল তাঁকে না টের পায়।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল—রাঙা রোদ দূরের পাহাড়ের গা থেকে মিলিয়ে গিয়েচে অনেকক্ষণ। সুন্দর চাঁদ উঠলো পূবের পাহাড় ডিঙিয়ে, কৃষ্ণপক্ষের আঁধার রাত্রি। একদল সবুজ বনটিয়া জলের ধারে নেমে আবার উড়ে গেল।

নির্জ্জন নিস্তব্ধ মরুভূমি আর হ্রদ।

দুই দণ্ড পরে জ্যোৎস্না ফুটে উঠলো হ্রদের বুকে। ধবধবে জ্যোৎস্না—কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার। দুদিন মাত্র আগে হেমন্তপূর্ণিমা চলে গিয়েচে—যত রাত বাড়ে, তত শীত নামে।

শীতের মুখে বালি-হাঁস আসবার সময়—কিন্তু কই একটা হাঁসও আজ নামচে না কেন?

বৃদ্ধ ভীলের কথা মনে পড়লো ঠাকুরদাদার। হাঁসের দল যদি নামে তবে সে-রাত্রি বিপদহীন বলে জানবেন।—যদি না নামে তবে কিসের বিপদ? বাঘ জল খেতে আসে পাহাড় থেকে?

রাত্রি ক্রমে গভীর হ'ল। অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নালোকে হ্রদের জল, মরুভূমির নোনা বালি

রহস্যময় হয়ে উঠেচে—কোনো শব্দ নেই কোনো দিকে। ঠাকুরদাদা যথেষ্ট দুঃসাহসী হ'লেও তাঁর যেন গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠলো—জ্যোৎস্নার সে ছন্নছাড়া অপার্থিব রূপে। তিনি চামড়ার বোতল বের করে কিছু আরক সেবন করলেন।

হঠাৎ হ্রদের তীরের পশ্চিমাংশে চেয়ে দেখে তাঁর মন আনন্দে দুলে উঠলো। জ্যোৎস্নালোকেও আকাশের নীচে একদল বালি-হাঁস নামচে। জ্যোৎস্না পড়ে তাদের সাদা দুধের মত পাখাগুলো কি অদ্ভুত দেখাচ্ছে! দেখতে দেখতে তারা নেমে এসে হ্রদের ধারে বালির চরে বসলো।

জায়গাটা ঠাকুরদাদার ঝুপড়ি থেকে দু'শো গজের মধ্যে কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশি।

এতদূর থেকে বন্দুকের পাল্লা পাবে না, বিশেষ এই জ্যোৎস্নারাত্রে। ঠাকুরদাদা ভাবলেন, দেখি ওরা কাছে আসে কিনা, বা আরও হাঁসের দল নামে কিনা। শিকারীর পক্ষে ধৈর্য্যের মত গুণ আর কিছু নেই। একদৃষ্টে হাঁসগুলোকে লক্ষ্য করাই ভালো। কিন্তু পরক্ষণেই ঠাকুরদাদা বিস্ময়ে নিজের চোখ বার বার মুছলেন। আরক খেয়েচেন বটে, কিন্তু তাতে জ্ঞানহারা হবার বা চোখে অত ভুল দেখবার কি কারণ আছে এখনই?

অতঃপর যা ঘটল তা বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছা মিষ্টার ব্যানার্জ্জি, কিন্তু এ গল্প আমি বাবার মুখে অনেকবার শুনেচি—আমাদের বংশের ঘটনা—কাজেই আমি আপনাকে মিথ্যে বলচি বানিয়ে, অন্তত এইটুকু ভাববেন না। ঠাকুরদাদা দেখলেন, সেই হাঁসগুলো সাধারণ হাঁসের মত নয়—অনেক বড়। অনেক—অনেক বড়। হাঁসের মত তাদের চালচলন নয়। তার পরেই মনে হ'ল সেগুলো হাঁসই নয় আদপে। সেগুলো মানুষের মত চেহারা বিশিষ্ট। বেচারী ঠাকুরদাদা আবার চোখ মুছলেন। আরক ঐটুকু খেয়েই আজ আবার এ কি দশা। পরক্ষণেই সেই জীবগুলি জলে নামল এবং হাঁসের মত সাঁতার দিয়ে, তিনি যেখানে লুকিয়ে আছেন, তার কাছাকাছি জলে এসে গেল। কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নাতে বিস্মিত, ভীত চকিত, দুঃসাহসী, আরক-সেবনকারী ঠাকুরদাদা দেখলেন, তারা সত্যিই হাঁস নয়—একদল অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ে! শুভ্র তাদের বেশ—জ্যোৎস্না পড়ে চিক্‌চিক্‌ করচে; তাদের হাসি, মুখশ্রী সবই অতি অদ্ভুত ধরণের সুন্দর। কতক্ষণ ধরে তারা নিজেদের মধ্যে খেলা করলে জলে, রাজহংসের মত সুঠাম ধরণে, নিঃশব্দে, সুন্দর ভঙ্গিতে হ্রদের বুকে সাঁতার দিতে লাগলো। তারপর কতক্ষণ পরে—তা ঠাকুরদাদার আন্দাজ ছিল না—কারণ, তখন ঠাকুরদাদা সময়ের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেচেন—ওরা সবাই জল থেকে উঠলো এবং অল্পপরেই জ্যোৎস্নাভরা আকাশ দিয়ে ভেসে হাঁসের মতই শুভ্র পাখা নেড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। —হ্রদের তীরের বাতাস তখনও তাদের অপূর্ব্ব দেহগন্ধে ভুরভুর।

আমার ঠাকুরদাদা নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখলেন তিনি জেগে আছেন কিনা। তখন তাঁর আরকের নেশা ছুটে গিয়েচে। একটু পরে রাত ফর্সা হয়ে জ্যোৎস্না মিলিয়ে গেল। তিনি উদ্‌ভ্রান্ত মস্তিষ্কে হ্রদের পার থেকে হেঁটে চলে এলেন পাহাড়ের কোলে। সেখান থেকে পৌঁছলেন ভীলদের গ্রামে।

বৃদ্ধ ভীল বৈজ্জি তাঁকে বল্লে—হুজুর, হাঁস নেমেছিল কাল?

ঠাকুরদাদা মিথ্যা কথা বলেন। হাঁস নেমেছিল, কিন্তু একটাও মারতে পারেন নি।

কেন মিথ্যা বল্লেন শুনুন।

কি এক দুর্ব্বার মোহ তাঁকে টানতে লাগলো দুপুরের পর থেকেই—আবার তাঁকে যেতে হবে, নাহারা হ্রদের তীরে রাত্রিকালে। ভৈজিকে সত্য কথা বল্লে পাছে সে বাধা দেয়।

কিন্তু সে রাত্রে বুনো বালি-হাঁসের দল নামলো হ্রদের জলে। আসল হাঁসের দল।

পর পর কয়েক রাত্রি শুধু বন্য-হংসের দল নামে, খেলা করে। আমার ঠাকুরদাদা ঝুপড়ির মধ্যে শুয়ে চেয়ে থাকেন, বন্দুকের গুলি করতে তাঁর মন সরে না।

তারপর আর একদিন শেষরাত্রের জ্যোৎস্নায় বন্যহংসের বদলে নামলো সেই অদ্ভুত জীবের দল।

একদিন তারা আরও কাছে এল, বন্য রাজহংসের মত সাঁতার দিয়ে বেড়াল জলজ ঘাসের বনের পাশে পাশে—তাদের অপূর্ব্ব সুন্দর মুখশ্রী জ্যোৎস্নালোকে ঠাকুরদাদার মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে কতবার পড়লো। রাত ভোর হবার বেশি দেরি নেই, তখনও কিন্তু জ্যোৎস্না আছে; আমার ঠাকুরদাদা কি ভেবে, আরকের নেশায় কিংবা ভালো অবস্থায় জানি নে, ঝুপড়ি থেকে উঠে ছুটে জলের ধারে চল্লেন। বোধ হয় ওদের কাউকে ধরতে গেলেন। অমনি ত্রস্ত বন্যহংসের মত সেই অলৌকিক জীবের দল তাড়াতাড়ি সাঁতরে কে কোথায় দূরে চলে গেল এবং পরক্ষণেই শেষরাত্রের বিলীয়মান চন্দ্রালোকে তাদের লঘু দেহ ভাসিয়ে আকাশপথে অদৃশ্য হ'ল।

পরদিন দুপুরবেলায় আমার ঠাকুরদাদাকে উন্মাদ অবস্থায় হ্রদের ধারের বালির চড়ায় লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখে জনৈক জেলে তাঁকে ভীলদের গ্রামে পৌছে দেয়। বৃদ্ধ ভৈজি ঘাড় নেড়ে বল্লে—আমি বলেছিলাম হাঁসের দল যেদিন না নামে, সেদিন বড় ভয়।

ঠাকুরদাদা মাঝে মাঝে ভালো হোতেন, আবার উন্মাদ হয়ে যেতেন। ভালো অবস্থায় বাড়ীতে এ গল্প করেছিলেন, একবার নয়, অনেকবার। মৃত্যুর প্রায় দশ বছর আগে থেকে তাঁর মোটেই ভালো অবস্থা আসেনি। বদ্ধ উন্মাদ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটে।

বিনায়ক দত্ত সিং গল্প শেষ করলেন। আমি বল্লাম—খুব অদ্ভুত ঘটনা, তবে—

মিঃ সিং বল্লেন—তবে বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বাস করা শক্ত। সে আমিও জানি। আমাদের দেশেও সকলে বিশ্বাস করে না। এ আজ পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘটনা বলচি। কেউ বলে, ঠাকুরদাদার অতিরিক্ত আরক সেবনের ফলে ওই সব চোখের ভুল দেখা, বন্যহংসকে ভেবেচেন আকাশ-পরী; আবার কেউ বলে, না—আকাশপরী দেখলেই লোকে পাগল হয়। সেই বৃদ্ধ ভীল ভৈজি সেই কথাই বলতো। কি করে বলব কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যে, তখন আমার জন্ম-ই হয় নি।

থিয়েটারের টিকিট

সকালে উঠেই আভা স্বামীকে বল্লে—ওগো, শীগ্‌গির করে বাজারটা করে এনে দাও—সকাল সকাল রান্নাবাড়া করে আবার তৈরী হ'তে হবে তো? যা বেলা ছোট। অবিনাশ বল্লে—কি কি আনতে হবে, একটা ফর্দ্দ করে রাখো। আমি কলঘর থেকে চট্ করে আসি—আর একটু পরে কলঘর খালি পাওয়া যাবে না।

—এখনই যায় কিনা দেখ—একটা কল, আর এই সাতঘর ভাড়াটে, এখন দোতলার বুধুর মা জল নিতে এসেচে, এই তো দেখে এলুম।

—না, বাড়ীটা বদলাবো এই সামনের মাসেই, এরকম কষ্ট আর পোষায় না। দেখে এস বুধুর মা আছে না গেল—সকালে উঠে একটু চান করবার জো নেই!

আভা খুকীকে কাল রাত্তিরের বাসি রুটি ও একটু গুড় একখানা কলাইকরা রেকাবিতে বার করে দিয়ে চঞ্চল পদে নৃত্যের লঘুচটুল ভঙ্গিতে কলঘরের দিকে গেল এবং তখুনি ফিরে এসে বল্লে—শীগগির যাও—এখুনি আবার বুড়ো নিবারণবাবু নাইতে আসবে—খালি আছে—

তারপর সে বাজারের ফর্দ্দ করতে বসলো:—

আলু—একপো

বেগুন—একপো

রাঙা শাক—আধপয়সা

কাঁচকলা—একপয়সা

নুন—একপয়সা

পান—দু'পয়সা

অবিনাশ কলঘর থেকে ফিরে এসে বল্লে—পান দু'পয়সা?

আভা ঘাড় দুলিয়ে বল্লে—তা হবে না? ওবেলা এককৌটো পান সেজে সঙ্গে করে নিতে হবে না?···রাস্তায় যেখানে সেখানে পান কিনতে আমি তোমায় দেবো না বাপু।

অবিনাশ বাজারে চলে যাওয়ার পরে আভা উনুনে কয়লা দিয়ে কলঘরের দিকে গেল নাইতে। তবু আজ রবিবার তাই অনেকটা রক্ষে···সময় তাও খুব বেশী কোথায়? খেতে খেতেই তো আজ বেলা বারোটা বেজে যাবে এখন···তারপর সাজগোজ···তৈরী হওয়া···একটার তোপ পড়লে দুটো বাজতে আর কত দেরি থাকে?

—খুকী, ও খুকী, শোন্ তুই আর আমি এক জায়গায় বসবো কেমন তো? ওমা মুখে সিঁদুর মেখে ভূত হলি যে! তুই ঠিক যেন একটা—হি-হি-হি—

খুকীর হাত থেকে সিঁদুরকৌটো ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে কড়ি থেকে দোদুল্যমান দড়ির শিকেতে তুলে রেখে আভা হাত উঁচু করে ওপরদিকে হাস্যোচ্ছল মুখখানা তুলে বল্লে—উড়ে গেল—হুস্—যাঃ—

খুকীর আসন্নপ্রায় কান্না অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে পরিবর্ত্তিত হওয়াতে সে অবাক চোখে মায়ের

হস্তেঙ্গিতে প্রদর্শিত ঘরের কড়িকাঠের শূন্যতার দিকে চেয়ে রইল।

আভা বল্লে—আবার আমরা এক জায়গায় যাচ্চি যে খুকু, কত কি দেখচি, তুই খাবার খাচ্চিস। ছবি, বাজ্‌না কত কি হচ্চে—গাড়ী চড়ব তুই আর আমি—বুঝ্‌লি খুকি, বুঝলি ?

অবিনাশ বাজার করে এনে ছোট্ট পায়রার খোপের মত রান্নাঘরটার সামনে নামালো। আভা গামছা খুলে বল্লে—মাছ আননি ?

—তেমন মাছ পেলাম না, আবার ওবেলাকার ধরো রিক্‌শাভাড়া রয়েচে—কতকগুলো পয়সা—

—থাক্ গে তবে। তুমি তাহলে কবিরাজের বাড়ী থেকে চট্ করে সেরে এস—বেশী দেরি হয় না যেন। খেতেদেতে ওদিকে আবার—

—যথেষ্ট সময় থাকবে, ভাবনা কি ? এই তো য়্যালবার্ট হল্, কতটুকুই বা রাস্তা। যেতে ধরো কুড়ি মিনিট রিক্‌শাতে—গোলদীঘি দেখ নি ? সেই সেবার কালীঘাট থেকে আসতে দেখালাম, রেলিং দিয়ে ঘেরা একটা পুকুর, কত লোক বেড়াচ্চে, মনে নেই ? ওরই কাছে।

অবিনাশ চলে গেল।

আভা ছুটোছুটি করে রান্না চড়িয়ে দিল।···মনে আজ তার ভারি আনন্দ ! কতদিন সে কোথাও বেড়ায় নি, সেই পৌষ মাসে কালীঘাট গিয়েছিল, আর এটা আশ্বিন মাসের প্রথম। ···কোন কিছু দেখা, বা কোথাও যাওয়া তো ঘটেই ওঠে না। লোকে বলে কলকাতা শহরে কত দেখবার জিনিস, কি-ই বা দেখলো সে কলকাতায় এসে ? এসেচে তো আজ দু'বছরের ওপর হ'ল।

আর কি করেই বা হবে ? খুকীর বাবা একটা কাগজের দোকানে কাজ করে, মাসে ত্রিশটি টাকা মাইনে পায়। ওর মধ্যে দুধ, ওর মধ্যে ঘরভাড়া, ওর মধ্যে কাপড়চোপড়। মাসের শেষে এক একদিন বাজার হয় না, তা বেড়ানো আর থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখা ! মুদী ধারে চাল ডাল দেয়, তাই রক্ষে।

ধার চারিদিকে ! কয়লাওয়ালা, কেরোসিন তেলওয়ালা, ধোপা, মুদী, বাড়ীভাড়া। তবুও তো ঠিকে ঝিটাকে ওমাস থেকে জবাব দেওয়া হয়েচে, আভা নিজেই সব কাজ করে। খুকী এখন বড় হয়েচে, মাসে দেড়টাকা ঝিয়ের পেছনে দেওয়ার চেয়ে ওই দেড় টাকায় খুকীর আর খুকীর বাপের বিকেলের জলখাবারটা তো হয়ে যায় ?

পরশু অবিনাশ এসে একখানা রাঙা কার্ড আভার হাতে দিয়ে বলেছিল, টিকিটখানা ভালো করে রেখে দাও তো আভা।

আভা বল্লে—এ কিসের টিকিট গো ?

—ও, আমাদের এসোসিয়েশনের বার্ষিক উৎসব কিনা রবিবার। য়্যালবার্ট হল্ ভাড়া নিয়েচে। তাই একখানা টিকিট দিয়েচে।

—কি হবে সেখানে ?

—কনসার্ট হবে, গান হবে। তার পরে খাওয়াদাওয়া আছে।

—আমার জন্যে একখানা টিকিট আনলে না কেন ? আর দেয় না ? বেশ গান শুনতুম, দেখতুম কি হয়। কতকাল তো কোথাও বেরুইনি। দেখা না যদি পাওয়া যায়—

তাই অবিনাশ কাল শনিবারে আর একখানা রাঙা টিকিট এনেচে।

খাওয়াদাওয়া সারাসোরা হয়ে গেলে আভা আর একটুও বসেনি। এক বালতি জল ওবেলা অতিকষ্টে মারামারি করে কলঘর থেকে সংগ্রহ করেছিল—নইলে বেলা দুটোর সময় গা ধোয়ার জল কোথায় পাওয়া যাবে ? সাত ঘর ভাড়াটের সঙ্গে একত্রে বাস, ন্যায্য নাইবার জল তাই মেলে না—তা আবার অসময়ে শখের গা ধোওয়া ! কি কষ্ট যে জলের এ বাসাতে !

আভা আগে আগে অবাক্ হয়ে যেতো জলের কষ্ট দেখে। নদীর ধারের পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, মাপজোপ করে জল ব্যবহার করবার কল্পনা সে করতে পারতো না। এখন অবিশ্যি সব সয়ে গেছে।

সাবান মেখে, গা ধুয়ে, সাজগোজ করতে বেলা আড়াইটে বেজে গেল। রিক্‌শা ডাকতে আর একটু দেরি হ'ল। ওরা যখন বাসা থেকে বেরুলো, তখন পৌনে তিনটে।

আভা অধীর আগ্রহে চেয়ে আছে কতক্ষণে সেই রেলিং-দেওয়া পুকুরটা দেখা যাবে—যার ধারে—ঐ যে কি নাম জায়গাটার ?

য়্যালবার্ট হল্ ? খুব বড় বাড়ী ? ক'তালা ? তোমাদের ক'তালায় সভা হবে ?

কিন্তু সকলের চেয়ে আকর্ষণের বিষয়—কাগজের দোকানের লোকেরা মিলে এখানে আজ থিয়েটার করবে। থিয়েটার কি জিনিস, আভা কখনও দেখে নি।

ওদের রিক্‌শা যখন সংস্কৃত কলেজের কাছাকাছি এসে পৌছেচে, তখন দূরাগত সমুদ্র-কল্লোলের মত একটা শব্দ ওদের কর্ণগোচর হ'ল। অবিনাশ ঘাড় উঁচু করে যা চেয়ে দেখলে, তাতে তার তো চক্ষু স্থির।

প্রথমটা ওর মনে হোল য়্যালবার্ট হলে ঢোকবার দরজার সামনে রাস্তার ওপর একটা বুঝি দাঙ্গা চলচে।

প্রায় শ'দুই আড়াই লোক এক জায়গায় জড় হয়ে একযোগে চীৎকার, ঠেলাঠেলি করচে—য়্যালবার্ট হলের কলেজ স্ট্রীটের দিকের সিঁড়ির মুখ থেকে জনতা শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটের মোড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

অবিনাশ বল্লে—এঃ, বড্ড ভিড় জমে গেছে দেখচি !

ভিড় ঠেলে রিক্‌শা থেকে নেমে ওরা কোন রকমে দরজা পর্য্যন্ত গেল বটে, কিন্তু আর এগোনো অসম্ভব। সিঁড়িটা লোকে লোকারণ্য। একটা দলের সঙ্গে ওরা ওপরে খানিকদূর উঠতে গেল ব্যস্তসমস্ত হয়ে—আভা ভাবলে না জানি কি অদ্ভুত ব্যাপার চলচে ওপরে, যা দেখবার জন্যে এত ভিড়—কিন্তু দু-চার সিঁড়ির ধাপ উঠতে না উঠতে ওপর থেকে আর এক দলের ধাক্কা খেয়ে আভা ছিট্‌কে এসে পড়ল দেওয়ালের গায়ে। ওদের চারিপাশে ভিড় জমে গেল ! আভার কপালে বেশ লেগেচে দেওয়ালে ঠুকে গিয়ে, ফুলে উঠেচে এরই মধ্যে। সবাই বল্লে—আহা, কোথায় লাগলো ! জনতার কৌতুহলী দৃষ্টির সামনে আভা জড়সড় হয়ে গেল। একজন ঘর্মাক্তকলেবর ভলান্টিয়ার এসে অবিনাশকে

বল্লে—আহা-হা, কোথায় লেগেচে!···আপনি এই ভিড়ে মেয়েদের এনেচেন? ভাল করেন নি। আচ্ছা, আপনি ওঁকে নিয়ে বাইরে দাঁড়ান। দেখি আমি।

সত্যই দেখা গেল জনতার মধ্যে আর কোন মেয়ে নেই—মেয়ের মধ্যে একা আভা আর তার আড়াই বছরের খুকি···

অবিনাশ আভাকে ভিড়ের মধ্য থেকে বার করে এনে খানিকক্ষণ ফুটপাথে দাঁড় করিয়ে রাখলে। আড়া কুড়ি মিনিট কেটে গেল, কারো দেখা নেই। ওপর তালার খোলা জানালা দিয়ে নিচে বাজ্‌নার শব্দ যেন কানে আসচে। আভা অধীর ভাবে বল্লে—কই কেউ তো এল না? ওপরে যাবে না?···এইবার চলো দিকি সিঁড়ির ধারে?

অবিনাশ আর একবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলে ভলাণ্টিয়ারেরা কাউকে ওপরে যেতে দিচ্চে না। একজন বল্লে—মশাই, ওপরে মেয়েদের নিয়ে যেতে আপনাকে পরামর্শ দিই নে। মারামারি হচ্চে সেখানে। আর একটি মেয়েও নেই—কোথায় মেয়েদের নিয়ে যাবেন সেখানে?

আভা লজ্জায় মরে গেল।

ফিরবার পথে, রিক্‌শায় উঠে তখন উত্তেজনা ও আগ্রহ কমে গিয়ে আভার ওপর অবিনাশের করুণা হ'ল। অতগুলো পুরুষের ভিড়ের মধ্যে সেজেগুজে সে থিয়েটার দেখতে এসেচে আশা করে, জানেও না আজকের আসাটা কতটা অশোভন দেখালো। কি ভাবলে সবাই···। ও দুঃখিত হয়েচে থিয়েটার দেখতে না পেয়ে! স্ত্রীকে বল্লে—খুব লেগেচে নাকি কপালে? দেখি? দেখাও হ'ল না, কিছুই না—যাতায়াতে রিক্‌শা ভাড়া ছ'আনা পয়সাই দণ্ড মিছিমিছি!

আভা কিন্তু ভাবছিল তার আঁচলে-বাঁধা রাঙা টিকিট দুখানার কথা। কাল খুকীর বাবা তাকেই রাখতে দিয়েছিল, আজ সে হুঁশিয়ার হয়ে আঁচলে বেঁধে এনেছিল টিকিট দুখানা! কত কষ্টে যোগাড় করা, কোনো কাজেই এল না, মিছামিছি গেল!

পার্থক্য

সকাল হইতে ভিখিরীর উপদ্রব লাগিয়াই আছে।

এদিকে ঘরে চাউল নাই, ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে। গৃহিণী জানাইলেন, চাউল যা আছে তাহাতে আর দিন চারেক চলিবে। বাজারে চাউল নাই এ কথা বলিলে ভুল হইবে, আছে চোরাবাজারে, সাঁইত্রিশ টাকা মণ।

গৃহিণীকে শুনাইয়া বলি—ভাতের ফ্যানে যা কিছু সার অংশ থাকে। ফ্যান যে ফেলে দেওয়া হয় ওতে সত্যিই আমাদের বড্ড···মানে যা কিছু পুষ্টিকর ওর সঙ্গে বেরিয়ে যায়। সাহেবেরা ফ্যান ফেলে না, জাপানীরা ফেলে না।

আমার ইঙ্গিত বাড়ীর কেহই বুঝিল না। ঝরঝরে ভাতই খাইতে লাগিলাম।

শুনিলাম আর দু'দিন চলিবে চাউলে। তার উপর ভিখিরী। সকাল হইতেই শোনা

—মা দু'টি চাল দেন, মা একটু ফ্যান—

মনে সহানুভূতি জাগায় না, রাগ ধরে। ঘরে নাই চাউল, কেবল ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও, সকাল হইতে! হিসাব-করা চাউল আজকাল। এদিকে বাজারে ও-দ্রব্য প্রায় অমিল। সাইত্রিশ টাকা দরে চাউল কিনিয়া কতদিন চালাইব! কায়ক্লেশে যদি বা চলে, ভিখিরীর উপদ্রবে আর তো পারি না! অথচ ভিক্ষা মিলিবে না বলিতে পারি না, সংস্কারে বাধে।

বাল্যে পল্লীগ্রামের বাড়ীতে থাকিতে দেখিতাম, মুষ্টিভিক্ষা হইতে ফকির বৈষ্ণবকে কেহ কখনো বঞ্চিত করিত না। সেই হইতে কেমন একটা সংস্কার দাঁড়াইয়া গিয়াছে—ভিক্ষা না দিয়া পারি না।

কিন্তু আসিলে বিরক্ত হই। না আসিলেই যেন ভালো।

সকালে ছোট ঘরে বসিয়া লিখিতেছি, চাকর বাজার হইতে বাড়ী ঢুকিল হাতে মাঝারি গোছের একটি পুঁটুলি। বাড়ীর ভিতর হইতে মেয়েরা কি চাউল আনিতে পাঠাইয়াছিল? ভাঁড়ার খালি? বলিলাম—ওতে কি রে?

রাজেন চাকরটি জিনিসটা লুকাইয়া লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, ভাবে বুঝিলাম। ধরা পড়িয়া একটু অপ্রতিভ হইল। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—চাল আজ্ঞে।

—ও, কত?

—দু'সের করে চাল আজ্ঞে জহুরীর দোকানে। কন্‌ট্রোল—

—ও, কন্‌ট্রোলের দোকান তাহোলে এখানেও হ'ল? কত দিচ্চে?

—দু টাকার বেশি দেবে না আজ্ঞে।

এটা বাঙলা নয়, বিহার। তবুও এখানে কন্‌ট্রোল খুলিল, দু টাকার বেশি চাউল কাহাকেও দেওয়া হইবে না—এ সব কি?

একজন ভিখিরী আসিয়া হাঁকিল—ভিক্ষে দেন না—চাড্ডি ভিক্ষে—

রাজেন বলিল—ভিক্ষে হবে না যাও, চাল নেই—

লিখিতে লিখিতে বলিলাম—দে এক মুঠো দে—

সঙ্গে সঙ্গে আসিল আর একজন। তাহাকেও ভিক্ষা দেওয়া হইল।

বেলা ন'টা আন্দাজ সময়ে আরও দুইজন। ভিক্ষা লইয়া তাহারাও চলিয়া গেল। এইবার একজন বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। মনে তখন বিরক্তি ধরিয়াছে, রাজেনকে বলিলাম, ভিক্ষা না দেয়। কিন্তু তবুও লোকটা কেন দেরি করিতে লাগিল, কেন তবুও যায় না, বার বার একঘেয়ে চীৎকার করিতে লাগিল। বড়ই রাগ হইল। বাহির হইয়া বলিলাম—ভিক্ষে হবে না, চলে যাও—আবার কি?

লোকটি বৃদ্ধ। পরনে একটুকরা মলিন নেকড়া, হাতে একটা তোবড়ানো টিনের মগ। জীর্ণ শীর্ণ চেহারা বটে, তবে বাংলাদেশের ভিখিরীর মত কঙ্কালসার নয়।

লোকটা মগটা তুলিয়া টানিয়া টানিয়া বলিল—একটু ফ্যান দাও বাবা—বড্ড খিদে পেয়েচে—

রাগিয়া বলিলাম—কি আব্দার রে! আবার ভাতের ফ্যান—

—দেন বাবা একটুখানি—

—ভাগ এখান থেকে! যাঃ—আব্দার ত্যাখো—কোন্ সকালে রান্না হয়েচে, এখন ফ্যান রয়েচে ওর জন্যে!

লোকটা হতাশভাবে চলিয়া গেল, আবার লিখিতে বসিলাম। ইহাতে আমার সংস্কারে বাধিল না। প্রতিদিন বরাদ্দ মত মুষ্টি-ভিক্ষা তো দিয়াছি। ক'জনকে দেওয়া যায়? বেলা বাড়িল, স্নান করিতে যাইব। এমন সময় একটি প্রৌঢ় ব্যক্তি গায়ে অর্দ্ধমলিন পিরান, পায়ে চটি জুতা, হাতে এক গাছা বাঁশের লাঠি, জানালার কাছে দাঁড়াইয়া বলিল—বাবু, আপনারা ব্রাহ্মণ?

মুখ তুলিয়া তারের বেড়ার ওপারে চাহিয়া বলিলাম—কেন, কি চাই?

লোকটা হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—ব্রাহ্মণেভ্যো নমো—

প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলাম—কোথেকে আসা হচ্চে?

—বাবু, ঢুকবো বাড়ীর ভেতর? আমিও ব্রাহ্মণ।

—হ্যাঁ আসুন।

লোকটা বাড়ীতে ঢুকিল বটে, কিন্তু বারান্দায় না উঠিয়া উঠানেই দাঁড়াইয়া বলিল—একটা কথা আছে। অনেক খুঁজেচি, ব্রাহ্মণবাড়ী পাই নি। আমার বাড়ী নদে-শান্তিপুর—মুলাবনীতে আমার এক আত্মীয় কাজ করে, সেখানেই যাচ্চি। সঙ্গে একটি ছোট ছেলে আছে, ওই আতা-তলায় বসিয়ে রেখে এসেচি। একটু খাবার জল যদি আমাদের দেন—

—হ্যাঁ হ্যাঁ—তার আর বেশি কথা কি—বিলক্ষণ। ডেকে আনুন, ডেকে আনুন।

ছেলেটিও আসিল। দেখিয়া বুঝিলাম, ইহারাও দুর্দশাগ্রস্ত ভিক্ষুক। মুখে খাদ্য চাহিতে পারিতেছে না। বলিলাম—আপনাদের খাওয়া হয়নি তো, এত বেলায় কোথায় যাবেন—এখানেই দুটো ডাল ভাত—

—না না, একটু জল খেয়েই যাবো। আপনাকে আর কোন বিরক্ত…মুলাবনীতে আমার ভাইপো—

—সে কি হয়! বসুন বসুন—মুলাবনী এখান থেকে ছ'মাইল পথ।

না খাওয়াইয়া ছাড়িলাম না। দু'জনে খাইয়া দাইয়া বিশ্রাম করিয়া বিকালের দিকে চলিয়া গেল।

রাত্রে শুইবার সময় হঠাৎ মনে পড়িল—এ কেমন হইল? ভাতের ফ্যান চাহিতে ভিখিরীর উপর রাগিয়া উঠিলাম, অথচ নদে-শান্তিপুরের ব্রাহ্মণ শুনিয়া আদর করিয়া দু'জনকে খাওয়াইলাম, তখন তো চাউল বাঁচাইবার কথা মনে উঠিল না?

কেন এমন হয়?

ভাবিয়া দেখিলাম—ইহার কারণ সে ভিখিরী আমার শ্রেণীর মানুষ নয়। নিজেকে আমি ভিখিরীরূপে কল্পনা করিতে পারি না, কিন্তু মনে মনে নিজেকে নদীয়াবাসী দরিদ্র-ব্রাহ্মণরূপে অনায়াসে কল্পনা করিতে পারি।

স্বপ্ন-বাসুদেব

খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের কথা। আজ থেকে প্রায় বাইশ শ' বছর আগের তক্ষশিলা।

নগরীর রাজপথ কোলাহলমুখর। নবারুণোদয় নিজ মহিমায় ধীরে ধীরে উচ্চ চূড়ায় ও স্তম্ভে নবপ্রভাতের বাণী ঘোষণা করচে। তক্ষশিলায় সম্প্রতি দেবী মিনার্ভার এক মন্দির তৈরী হচ্চে, পার্থেননের স্থাপত্যের অনুকরণে—গম্বুজ বা ডোম কোথাও নেই—ছাদ সমতল, অগণিত সুসমঞ্জস বিরাট স্তম্ভশ্রেণী। গ্রীক স্থাপত্য গম্বুজের খিলান গড়তে অভ্যস্ত ছিল না। বহু পরবর্ত্তী কালে সারাসেন সভ্যতার যুগে ইউরোপে এর উৎপত্তি, সারাসেন তথা মূর সভ্যতার দান এটি।

বড় বড় স্প্রিংবিহীন কাঠ ও লোহার তৈরী একার ধরণের গাড়ীতে মাঝে মাঝে দু'চারজন ধনী বণিক ও গ্রীক জমিদারগণ যাতায়াত করচেন। সুন্দরী গ্রীক বালিকাও মাঝে মাঝে রথে চড়ে চলেচে—দেবী এথেনির মত। ব্রোঞ্জের বিরাট জুপিটারমূর্ত্তি প্রস্তরের ছত্রাবরণতলে শোভা পাচ্চে রাজপথের মোড়ে। বণিকগণের আপণশ্রেণীতে কত কি জিনিস—কত দেশ থেকে আহরণ করে আনা।

একটি সুবেশ বালক ভৃত্য একটি দোকানে এসে বল্লে—কলা আছে ?

—আছে, দাম বেশি পড়বে।

—কোথাকার কলা ?

—এই কাছের গাঁয়ের। বুড়ো রোজ টাটকা দিয়ে যায়।

—আর আঙুর ?

—মদ তৈরী করবার জন্যে সামান্য কিছু এনেছিলাম,—নিয়ে যাও।

হঠাৎ রাজপথকে চমকিত করে তূর্য্য বেজে উঠলো। মহারাজ এ্যাণ্টিআলকিডাসের মহামাত্য ডিওন ভ্রমণে বেরিয়েচেন—রাজপথ কাঁপিয়ে শ্বেতাশ্ববাহিত টাঙায়, রাজপুরুষ ডিওন চলে গেলেন —বালক ভৃত্যটি হাঁ করে চেয়ে রইল।

দোকানদার বল্লে—তোমার কর্ত্তা কোথায় চল্লেন ?

বালক তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বল্লে—কি জানি বাপু! সে খোঁজে আমার দরকার কি ?

—ওঁর ছেলে কি এখনো সেই বিদেশে ?

—তিনি কাল এসেচেন মালব থেকে। সেখান থেকে এসেই অসুখ বাধিয়েছেন বলেই ফল নিতে এসেচি এত সকালে। বলবো কি—পদ্মসাকড়ির অবস্থা ভালো না। রাজা মাইনে দেন না ঠিকমত—লুটে-পুটে নিয়ে যা চলে।

দোকানদার অধীরভাবে বলে উঠলো—যাও, যাও—আমরা গরীব লোক, আমার দোকানে ওসব—এক্ষুনি কে শুনবে। তোমার কি, বড়লোকের চাকর—সুন্দর মুখের সব মাপ—

এই কথার মধ্যে কিঞ্চিৎ বক্রোক্তি ছিল। ভৃত্য সে উক্তি গায়ে না মেখেই চলে গেল।

একটু পরে স্বয়ং ডিওনপুত্র হেলিওডোরাস এসে ফলের দোকানের সামনে দাঁড়াল। সুগঠিত-দেহ সৌম্যকান্তি গ্রীক যুবক, রঙ অনেকটা আধুনিককালের পেশোয়ারী মুসলমানের মত। দীর্ঘ দেহ, ঈষৎ কুঞ্চিত কেশ, চক্ষু দুটি নীল নয়—কটা। হেলিওডোরাস চাকা ছুঁড়বার প্রতিযোগিতায় দু'বার সকলকে পরাজিত করে মহারাজ এ্যান্টিআলকিডাসের প্রকাশ্য সভায় পুরস্কার পেয়েচেন। তক্ষশিলার অনেক লোকে তাঁকে চেনে। কপিলা থেকে আনীত বিদেশী সুরা খুব চড়া মূল্যে বিক্রী হয় তক্ষশিলার বাজারে। সাধারণ লোকের সাধ্য নেই তা কেনে—কিন্তু হেলিওডোরাস বন্ধুবান্ধব নিয়ে সরাইখানায় বসে স্ফূর্তি করবার সময়ে কপিলার সুরা ব্যতীত অন্য কিছু চায় না।

ফলের দোকানের মালিক সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে বল্লে—আসুন ছোটকর্ত্তা, আমার আজ বড় সৌভাগ্য—এত সকালে আপনার পায়ের ধুলো পড়লো এ গরীবের দোকানে।

হেলিওডোরাস ঈষৎ গর্ব্বিত স্বরে বল্লে—জুজু এখানে এসেছিল?

—হাঁ কর্ত্তা, এইমাত্র চলে গেল।

—আঙুর দিয়েচ তাকে?

কথার উত্তর দোকানীর কাছ থেকে শুনবার আগেই হেলিওডোরাস চলে গেল। দোকানী অনেকক্ষণ একদৃষ্টে হেলিওডোরাসের অপস্রিয়মাণ সুন্দর চেহারার দিকে চেয়ে রইল।

ডিওনের আর্থিক অবস্থা আজকাল সত্যই ভালো নয়। রাজার দরবারে তিনি সভাসদ বটে, কিন্তু রাজা এ্যান্টিআলকিডাসের নিজেরই আর্থিক অবস্থা যা, তাতে সভাসদদের অর্থ-সাহায্য করবার অবস্থা নয় তাঁর। গান্ধারের রাজা জোজিকাস ও পুরুষপুরের গ্রীক তালুকদার হিরাক্লিয়াসের সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ লেগেই আছে—রাজকোষের যাবতীয় অর্থ এখন ওদিকেই ওড়ে। আপনি বাঁচলে বাপের নাম, সুতরাং ডিওন এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ ঠিকমত বেতন পান না, বাজারের বণিক ও প্রজাদের নিকট নানা ছলে অর্থশোষণ করেন। এঁদের মধ্যে ডিওন প্রধান সভাসদ, সুতরাং তাঁর অত্যাচারে তক্ষশিলার বিত্তশালী প্রজা ও বণিক মাত্রেই তাঁর ওপর যথেষ্ট বিরক্ত।

রাজা এ্যান্টিআলকিডাস ব্যাকট্রিয়ান গ্রীক—সুতরাং ভারতীয় প্রজা যত বেশি উৎপীড়িত হয়—গ্রীক ব্যবসায়ী বা প্রজা তার অর্দ্ধেকও না। দু'বার ভারতীয় বণিকসঙ্ঘ প্রতিবাদ করেছিল সভাসদের এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে। সভাসদ তাই কি, বিনা পয়সায় জিনিস্ দেওয়া হবে না—তিনি যিনিই হোন। ধার নিয়ে উপুড়-হাত করবেন না সব। কিসের খাতির? এ ব্যবস্থা টেকে নি। গান্ধার থেকে সার্থবাহ বণিক সম্প্রদায় উষ্ট্রপৃষ্ঠে উৎকৃষ্ট সুরা ও বিদেশী ফল নিয়ে আসতো—এরা তার উপর অতিরিক্ত শুল্ক বসালে, বাজারে অত চড়া দামে সে সব খাবার লোক রইল না। দু'বার বাজারে দোকান লুঠ হোল—এই সব নানা উপদ্রব। গ্রীক বণিকগণও যে এ অত্যাচার থেকে একেবারে মুক্ত তা নয়, তবুও তাদের প্রতি অত্যাচার

এদের তুলনায় অত্যন্ত কম।

হেলিওডোরাসকে ঠিক এই জন্যে কোনো ভারতীয় প্রজা পছন্দ করতো না। সে ছিল উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্ধত—'গ্রীক ছাড়া অন্য কেউ মানুষ নয়' এই তার মত। তার আদর্শ পুরুষ হ'ল লিওনিডাস, যিনি থার্মপলির গিরিসঙ্কটে অমর হয়ে আছেন, থেমেস্টোক্লিস যিনি টেম্পি গিরিবর্ত্ম রক্ষা করেছিলেন দশ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক হয়ে—দিগ্বিজয়ী অ্যালেকজাণ্ডার,—যাঁর বাহুবলে আজ ভারতে গ্রীক রাজ্য সম্ভব হয়েচে।

ব্যাকট্রিয়ান গ্রীকদের জীবনযাত্রা ও আচারব্যবহার অনেক সময় তার চোখে ভালো লাগতো না। একজন খাঁটি গ্রীক স্কুলমাস্টার তক্ষশিলার রাজসভায় দিনকতক এসেছিলেন, ছেলে পড়াতেন বড়লোকের বাড়ীর, তাঁর নাম পলিকাইলস্—রীতিমত পণ্ডিত। তাঁকে নিয়ে সে সময় কাড়াকাড়ি পড়ে গেল বড়লোকদের মধ্যে, কে তাঁকে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করতে পারে, কারণ এথেন্স থেকে তিনি এসেছিলেন। হেলিওডোরাস তখন বালক, তাকে তিনি বলতেন—তোমাকে দেখে আমার প্রাচীন যুগের গ্রীক যুবকদের কথা মনে পড়ে। শরীরটা স্পার্টার ছেলেদের মত শক্ত করো। এদেশে কিছু নেই। নামেই গ্রীক্।

—কেন?

—গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। এদেশের গ্রীকরা অতিরিক্ত বিলাসী ও আরামপ্রিয় হয়ে পড়েচে। পূর্ব্বপুরুষের রক্তের সে তেজ নেই এদের মধ্যে। শুধু তা নয়, এরা দেশী লোকের সঙ্গে যেভাবে মেশে, অনেকে দেশী খাদ্য খায় ও পরিচ্ছদ ধারণ করে, যেমন সেদিন এক গ্রীক ভদ্রলোকের গায়ে কাশ্মীরী শাল দেখলাম—ছিঃ ছিঃ, লজ্জাও করে না!···বেশি কথা কি বলবো, অনেকে এদেশী মেয়েদের সঙ্গে—

এইসময় স্কুলমাস্টারের হঠাৎ মনে পড়তো যে তাঁর শ্রোতা বালক এবং ছাত্র। স্বজাতির অধঃপতনের দুঃখে যা বলে ফেলেচেন তা যথেষ্ট। বলে উঠলেন—তা ছাড়া, দেখচো না গ্রীক রাজধানী তক্ষশিলা বৌদ্ধ বিহারে ভরা। যাকগে। কবিতা মুখস্থ বলে যাও—

কখনো কখনো ভীষণ গ্রীষ্মের দিনে তক্ষশিলার কোনো প্রমোদ-উদ্যানের মধ্যে নিভৃত কুঞ্জে ছায়াসনে তিনি ছাত্রদের নিয়ে বসতেন। অতীত যুগের গ্রীকদের বীরত্ব, আত্মত্যাগ প্রভৃতি জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করে যেতেন, ইউরিপিডিস্ ও সাফোর কবিতা আবৃত্তি করতেন, প্লেটোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদেশাবলী বুঝিয়ে দিতেন। কয়েক বছর তক্ষশিলায় থাকার পরে তিনি হঠাৎ কোথায় চলে যান। জনশ্রুতি যে, তিনি এই সময় স্বদেশে ফিরতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে আর একবার তিনি প্রিয় জন্মভূমির পবিত্র মৃত্তিকা স্পর্শ করতে চান।

সেই থেকে হেলিওডোরাস পূর্ব্বপুরুষের গৌরবে গৌরবান্বিত, ভারতীয়দের সে ঘৃণাই করে—স্পার্টার যুবকদের আদর্শে শরীর গড়ে তুলেচে—ভারতীয়দের সঙ্গে গ্রীকরা যে বেশি মেলামেশা করে, এটা সে পছন্দ করে না—এমন কি তার পিতা ডিওনকে পর্য্যন্ত এজন্য সে

ঠিক শ্রদ্ধা করতে পারে না। কারণ দু'তিনটি ভারতীয় নর্ত্তকীর বাড়ীতে এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর যাতায়াত। যাক্ সে সব কথা। এদিকে হেলিওডোরাসের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অত্যাচারে তক্ষশিলার অনেকেই অতিষ্ঠ। সে লম্পট নয়, কিন্তু সুরাপায়ী, উদ্ধত—লোকের মান রাখে না, দোকানের জিনিস ধারে নিয়ে গিয়ে দাম দেয় না—দু'তিনটি নরহত্যা পর্য্যন্ত করেচে সুরার ঝোঁকে।

কেন তা বলি।

মেলিবিয়া নামে একটি রূপসী গ্রীক গায়িকা আজ বছর দুই হ'ল ব্যাকট্রিয়া ও গান্ধার হয়ে এখানে আসে উপার্জ্জনের চেষ্টায়। গান্ধাররাজ জোজিলাসের সভায় খুব নাম কিনে এসেছিল। এখানে সে পদার্পণ করার দিনটি থেকে তক্ষশিলার অনেক যুবক ও প্রৌঢ়ের নজরে পড়ে গেল। প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার হিড়িক শুরু হ'ল। বহু গ্রীক যুবক, প্রৌঢ়, এমন কি বৃদ্ধের প্রণয় উপেক্ষা করে (এদের দলে হেলিওডোরাসও ছিল) সুন্দরী মেলিবিয়া প্রসন্নদৃষ্টিতে চাইল সুমঙ্গল বলে এক ভারতীয় বণিকের প্রতি, এমনি অদৃষ্টের ফের। প্রকাশ্য দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে হেলিওডোরাস সুমঙ্গলকে। মেলিবিয়া এতে বাধা দেয়—তার পর একদিন এক সরাইখানায় সামান্য ছলে ঝগড়া বাধিয়ে হেলিওডোরাস সুমঙ্গলকে হত্যা করে। খুব গোলমাল বাধে এ নিয়ে।

রাজদরবারে অভিযোগ উপস্থিত হ'ল হেলিওডোরাসের বিরুদ্ধে। ভারতীয় বণিকসঙ্ঘ রাজাকে ধরলে এর সুবিচার করতেই হবে। তাদের কাছে টাকা ধার না করলে রাজার চলে না। ফলে মহারাজ এ্যান্টিআলকিডাস্ তাঁর সভাসদ ডিওনকে ডেকে বলে দিলেন কিছুদিনের জন্য হেলিওডোরাসকে সরিয়ে দেওয়া দরকার তক্ষশিলা থেকে। মালবের রাজা ভাগভদ্রের সভায় যে গ্রীক দূত ছিল, তার মৃত্যু হয়েছিল সম্প্রতি—সেখানেই আপাতত ওকে পাঠানো হোক। বলা হবে রাজার বিচারে ওর নির্ব্বাসন-দণ্ড দেওয়া হ'ল।

সুতরাং গত শীত ঋতুর প্রারম্ভে হেলিওডোরাস মালবের রাজা ভাগভদ্রের রাজসভায় প্রেরিত হয়।

তক্ষশিলায় পুনরায় আসার উদ্দেশ্য ছিল—মেলিবিয়ার সন্ধানে; কিন্তু হায়! সেই কেলেঙ্কারির পরে বেচারি গ্রীক গায়িকাকে এ রাজ্য ছাড়তে হয়েচে। মেলিবিয়া এখন পুরুষপুরের তালুকদার হিরাক্লিয়াসের অতিথি, অন্তত সেই রকম জনপ্রবাদ।

ডিওন বললে—হেলিওডোর, এখানে আবার এসে ঘুরঘুর করচো কেন? বুড়ো বয়সে কি চাকরিটা খোয়াবো তোমার জন্যে?

—আজ্ঞে না, আমি এসেছিলাম শরীর সারাতে। ওখানে যে দিশি বদ্দি আছে তাদের হাতের শেকড়-বাকড় ওষুধ খেলে হাতী মারা পড়ে, মানুষ কোন্ ছার! আর দেশটাতেও বড় বিষম জ্বরের—

—বাবা, তুমি আমার নয়নের আনন্দ। কিন্তু জুপিটারের শপথ করে বলচি, আমার হাতে একটি পয়সা নেই যা তোমার জন্যে রেখে যেতে পারিবো। এ হতভাগা রাজ্যে কিছু

উন্নতি নেই, এদের ঘুণে ধরেচে। ঋণের বোঝা রাজকোষকে ছাপিয়ে উঠেচে। নতুন দেশে যদি কিছু উপার্জ্জন করতে পারো—আখেরে ভালো হবে।

শরতের অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। ডিওন তার প্রণয়িনীর বাড়ীতে আরও কয়েকটি বন্ধুবান্ধব নিয়ে আমোদ-প্রমোদ করতে গেলেন। তক্ষশিলার মধ্যেই এক সংকীর্ণ রাস্তার ধারে বাড়ীটি। কার্নিসে পাথরের ছোট ছোট থামের মাঝে মাঝে ফোকর-কাটা ইটের নিচু পাচিল।

একজন বললে—শুনেচ হে, কাকানগরের তালুকদারের ছেলে এ্যারিস্টোস্ সম্প্রতি বৌদ্ধ হয়েচে!

অন্য বন্ধু বললে—তুমি যা শুনেচ ক্সানিফাস, সত্যি হওয়া আশ্চর্য্য নয়। রাজা মিনাণ্ডার গ্রীক কুলাঙ্গার, নইলে গ্রীক রক্ত যার গায়ে আছে, সে দেশী ধর্ম গ্রহণ করে কি হিসেবে? ওর শ্বশুরকে আমি জানি, ব্যাক্‌ট্রিয়ায় তার অনেক তাঁলুক-মুলুক, ভালো বংশের ছেলে—এ্যান্টিগোনাস গোনাটাসের মাসতুতো ভাইয়ের শালার বংশ।

—কে?

—ওই রাজা মিনাণ্ডারের শ্বশুর। জামাইয়ের এই কুমতি শুনবার পরে বেচারী একেবারে শয্যাগ্রহণ করেচেন।

নিয়ারা কোথায় গেল?···

ডিওন আজ বেশি সুরা পান করেননি। মন তাঁর ভালো নয়, ছেলেটা আজ কি কাল বাড়ী থেকে চলে যাবে, সঙ্গে এবার তিনি তাঁর প্রিয় বালক-ভৃত্য জোজিফাস ওরফে জুজুকে প্রবাসে ছেলের সেবা করতে পাঠাবেন। ডিওন অনেকদিন বিপত্নীক, বাড়ীতে প্রিয়দর্শন পুত্র ও বালক-ভৃত্যটিও অনুপস্থিত থাকবে। একপাল দাসীদের মধ্যে (তাদের মধ্যে অনেকেই অসন্তুষ্ট, কারণ সময়মত বেতন পায় না) সন্ধ্যা কাটানো এই বয়সে ভাল লাগে?······কি যে করবেন—

নিয়ারা প্রবেশ করলে, বয়সে সে ডিওনের চেয়ে অনেক ছোট, তবুও চল্লিশের কম নয়, কিন্তু দেখায় ত্রিশ। সোনালীপাড় দামী রেশমী অঙ্গাবরণ, দুটি বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে ওর গৌর অঙ্গের শোভা বর্দ্ধিত করচে। কিন্তু মাথায় গ্রীক মহিলাদের ন্যায় পুষ্পমাল্য, সুন্দর চোখের ভুরু কাশ্মীরী জাফ্রানের রেণু, চন্দন ও বার্জ বৃক্ষের আটা মিশিয়ে চিত্রিত করা। তাতে চোখের ভুরু দুটি কালো না দেখিয়ে হলদে দেখাচ্ছে। নিয়ারার পিতা ব্যাক্‌ট্রিয়ান গ্রীক, কিন্তু মাতা পারস্যদেশীয়া।

ক্সানিফাসের কথার উত্তরে নিয়ারা বল্লে—আমার গুরু এলেচেন, তাই আনন্দে কথাবার্ত্তা বলছিলুম তাঁর সঙ্গে।

ক্সানিফাস বল্লে—সে আবার কে?

—তিনি একজন ভারতীয় যোগী। বারাণসী থেকে এসেচেন—

সবাই একবাক্যে বলে উঠলো—আমরা একবার দেখবো—

—তিনি কাউকে দেখা দেন না। কারো কাছে কিছু চান না তো তিনি।

ন্যানিফাস বল্লে—আচ্ছা নিয়ারা, তুমি একজন এদেশী ধাপ্পাবাজের পাল্লায় পড়ে গেলে কি বলে? এ যে-রকম শুরু হোল দেখচি, কবে আমাদের বন্ধু ডিওন মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধ ভিক্ষু না হয়ে দাঁড়ায়!

সুরাপায়ী, বিলাসী, স্থূলদেহ ডিওন পক্ককেশে পুষ্পমালা ধারণ করে একপাশে পর্য্যঙ্কে শুয়ে ছিলেন, তাঁকে মুণ্ডিত-মস্তকে বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশে কল্পনা করে সর্ব্বপ্রথমে প্রৌঢ়া সুন্দরী নিয়ারা হি-হি করে হেসে গড়িয়ে পড়লো, পরে ডিওনের সব বন্ধুই সেই হাসিতে যোগদান করলে।

এমন সময় দেখা গেল, একজন দীর্ঘদেহ কৌপীনধারী লোক, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি মাখা, হাতে কমণ্ডলু, আয়ত চক্ষুর্দ্বয় জ্যোতিষ্মান্—কোন্ সময়ে ছাদের ওপর এসে দাঁড়িয়েচে। সকলে চমকে উঠলো—ডিওন বল্লে—কে তুমি?

সন্ন্যাসী বল্লেন—বাবাজিদের জয় হোক।

—কি?……এ উত্তর শুধু ডিওন দিলেন।

—এই মেয়েটি আমায় বড় মানে। আমি একে এই পাপজীবন থেকে উদ্ধার করতে চাই। আপনারা এখানে আর আসবেন না।

—কোথায় যাবো আমরা? তুমি কোন্ নবাব এলে জানতে পারি কি?

সন্ন্যাসী রোষকষায়িত নেত্রে বল্লেন—বৃদ্ধ লম্পট। পরকালের দিন সমাগত, ভয় হয় না? এখনও এই সব—

সবাই মিলে হুঙ্কার দিয়ে ঠেসে উঠলো—এত বড় স্পর্দ্ধা!……কিন্তু আশ্চর্য্য, কারো সাধ্য নেই যে নিজ নিজ আসন ছেড়ে উত্থিত হয়। ডিওনকে দেখা গেল তাঁর স্থূলদেহ নিয়ে তিনি পর্য্যঙ্ক থেকে উঠবার চেষ্টায় নানারূপ হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি করচেন—এ যেন এক রাত্রির দুঃস্বপ্ন। ……সন্ন্যাসী মৃদু হেসে বল্লেন—নিয়ারাকে আমি কন্যার মত দেখি, মা বলে সম্বোধন করি। ওর পারলৌকিক উন্নতির জন্যে আমি দায়ী। তোমাদের মত সুরাসক্ত লম্পট ওকে অধঃপতনের পথে নিয়ে চলেচ। তোমাদের সাবধান করে দিয়ে গেলাম। এর পরেও যদি এসো, বিপদে পড়ে যাবে। পরে ন্যানিফাসের দিকে চেয়ে বল্লেন—শোনো, তোমার দিন আসন্ন। এই সুরা ও নারী তোমাকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যাবে। পরকালের কথা চিন্তা কর। এখন থেকে পাঁচ মাসের মধ্যে একটি প্রশস্ত রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী পুরাতন কূপে তোমার মৃতদেহ ভাসচে আমি দেখতে পাচ্চি—

ন্যানিফাসের মুখ হঠাৎ বিবর্ণ, পাণ্ডুর হয়ে উঠলো। সুরার নেশা ততক্ষণ তার এবং সকলেরই কেটে গিয়েচে।

—আর ডিওন, তোমার বংশে একটি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আসন্ন। কিন্তু সেজন্যে তুমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিও—বিদায়।……আমি চলে গেলে তোমরা পূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত হবে—বিদায়!……

সন্ন্যাসী অন্তর্দ্ধান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই নিজ নিজ অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হ'লেন। দোরের কাছে নিয়ারা দাঁড়িয়ে, তার মুখে মৃদু হাস্য।

ডিওন বল্লেন—কি?

স্যানিফাস বল্লে—কি?

অন্য সবাই বল্লে—কি?

নিয়ারা নিরুত্তর। একটি দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মতই অতি ক্ষীণ একটি হাস্যরেখা তার ওষ্ঠপ্রান্তে মিশে রইল।

২

শরৎ ঋতু শেষ হয়েচে, প্রথম হেমন্তের সুশীতল বাতাস গত গ্রীষ্মদিনগুলির দাবদাহ স্মৃতিতে পর্য্যবসিত করে তুলেচে। হেলিওডোরাস মালবে আজ মাস দুই ফিরে এসেচে। রাজধানী বিদিশার উপকণ্ঠে একটি বৃহৎ উদ্যানবাটিকা দূর থেকে তার বড় ভালো লাগে। প্রাচীন অশোক, বকুল, বট, নাগকেশর ও সপ্তপর্ণ তরুশ্রেণীর নিবিড় ছায়ায় উদ্যানটি যেন নিভৃত তপোবনের মত শান্তিপ্রদ ও মনোরম। কত পক্ষিকুলের সমাবেশ ও বিচিত্র কলতানে ছায়াবিতানগুলি যেন মুখর।

কয়েকদিন সেদিকে সে একাই গ্রীক রথ হাঁকিয়ে বেড়াতে যায়। টাঙা-জাতীয় এই গ্রীক যানগুলির চলন তক্ষশিলা এবং প্রায় সর্ব্বত্র সভা সভ্য নগর-নগরীতে দেখা যায় আজকাল। স্প্রিং নেই, বড় একটা কাঠের বা লোহার খুরোর ওপরে শকটের যতটুকু বসানো,—তাতে বড় জোর দুজন লোকের স্থান সঙ্কুলান হতে পারে। একদিন সে কি ভেবে প্রাচীরের একটি নিম্নস্থান উল্লঙ্ঘন করে উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করলে। উদ্যান তো নয় যেন নিবিড় বন। বহুকালের উদ্যান, বড় বড় গাছগুলিতে নিভৃত কোণ ও ছায়া রচনা করেচে নানাস্থানে—পাষাণ-বাঁধানো বাপীতটে সুন্দর লতাগৃহ, অশোককুঞ্জ, উৎস, যক্ষমূর্ত্তি ইত্যাদি দ্বারা শোভিত নির্জ্জন উদ্যানের মধ্যে কিছু দূরে প্রাচীন দিনের ভারতীয় স্থাপত্য-প্রণালীতে নির্ম্মিত একটি বিশাল অট্টালিকা বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে দিয়ে চোখে পড়ে—কিন্তু সেখানে কেউ বাস করে বলে মনে হ'ল না। হেলিওডোরাস আপন মনে পরিভ্রমণ করতে করতে একটি পাষাণবেদীতে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলে—তারপর সেখান থেকে বের হয়ে এসে রথ হাঁকিয়ে চলে এল। সেই থেকে মাঝে মাঝে উদ্যানটিতে যায়—কখনও মধ্যাহ্নে, কখনও সন্ধ্যায়, কখনও একাই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে।

বৎসর প্রায় ঘুরে গেল। শীত এল, চলেও গেল। পুরুষপুরে এবার তুষারপাতের সংবাদ পাওয়া গিয়েচে—অতি দুর্দ্দান্ত শীত দিন এবার! ফাল্গুনী চতুর্দ্দশী তিথির মনোরম জ্যোৎস্নালোকে, অজস্র বিহঙ্গকাকলী ও পুষ্পপর্য্যাপ্তির মধ্যে হেলিওডোরাসের দিনগুলি যেন স্বপ্নের মত কাটচে—রাজকার্য্যের অবসানে নিজের রথটি নিয়ে বার হয়ে নগরীর বাইরে বহু দূর পর্য্যন্ত চলে যায়। এখানে সে প্রায় একা, তবে দু'একটি ভারতীয় কর্ম্মচারীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েচে এবং

মালবের ভাষা সে একরকম আয়ত্ত করে ফেলেচে এক বৎসরে।

এই সময়ে একদিন সে তার সেই পরিচিত উদ্যানবাটিকাতে ঢুকলো পথের পাশে রথ থামিয়ে। পুষ্পে পুষ্পে, নববল্লীপল্লবে, চুতমুকুলের সুবাসে, কোকিল-ঝঙ্কারে, প্রাচীন উদ্যান তার বৃদ্ধত্ব পরিহার করে নবযৌবনের রূপ পরিগ্রহ করেচে, নিভৃত লতাগৃহ যেন গ্রীক রতি-দেবতার আসন্ন পাদস্পর্শের আগ্রহে উৎসববেশে সজ্জিত হয়েচে। সেই পাষাণবেদীতে সে মুগ্ধ মনে চুপ করে বসে আছে, এমন সময় কার পদক্ষেপের শব্দে চমকে পিছন ফিরে যা দেখলে তাতে সে বিস্মিত ও বিচলিত হয়ে উঠলো।

একটি রূপসী তরুণী তার পিছনে কিছুদূরে দাঁড়িয়ে। অপূর্ব তার অঙ্গলাবণ্য, ক্ষীণ কটি-তটে রত্নমেখলা, নিবিড় কৃষ্ণ কেশপাশে টাটকা তোলা যূথীগুচ্ছ, গ্রীক মেয়েদের মত দীর্ঘদেহা অথচ তন্বী। মেয়েটি অবশ্য ভারতীয়া, সাজপোশাকেই হেলিওডোরাস বুঝল।

মেয়েটিও তাকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েচে মনে হ'ল হেলিওডোরাসের। বিস্ময়ে তার চারু আয়ত কৃষ্ণ নেত্রদুটি স্তব্ধ অচঞ্চল। কিছুক্ষণ দু'জনের কেউ কথা বল্লে না।

তারপর হেলিওডোরাস উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে—ভদ্রে, এ উদ্যান বোধ হয় আপনাদের। আমি পথিক, বেড়াতে এসে একটু বসেছিলাম—

মেয়েটি কোন কথা না বলে ফিরে যেতে উদ্যত হ'ল।

হেলিওডোরাসের মূঢ়তা ততক্ষণ ঘুচেছে। সে হাজার হলেও গ্রীক ভদ্রলোক। বিনীত স্বরে বল্লে—একটু দাঁড়াবেন দয়া করে? আমার এই অনধিকার প্রবেশের জন্যে আমি বিশেষ লজ্জিত—আমায় যদি ক্ষমা করেন—

মেয়েটি যেন কম্পিত অগ্নিশিখা, নিজের মহিমায় নিজে দীপ্তিমতী। হেলিওডোরাস এই ভারতীয় মেয়েটির অপরূপ রূপমাধুরীতে কেমন বিস্মিত হয়ে উঠেচে। এত রূপ হয় এদেশের মেয়ের? এমন শ্বেতাঙ্গ সুন্দর দেহকান্তি যে-কোনো সুন্দরী গ্রীক তরুণীর পক্ষেও দুর্লভ।… মেলিবিয়া কোথায় লাগে!

হেলিওডোরাস সসঙ্কোচে তার কথা শেষ করবার অতি অল্পক্ষণ পরেই মেয়েটি নম্রস্বরে বল্লে—আপনি কি গ্রীক?

—হাঁ, ভদ্রে—

—অল্প দিন এসেচেন এখানে?

—না ভদ্রে। এক বৎসর হ'ল—আমি রাজসভায় তক্ষশিলার গ্রীক দূত—আমার নাম হেলিওডোরাস—

রূপসী বালিকা বিস্ময়ে কৃষ্ণ ভ্রূযুগল ঊর্দ্ধদিকে ঈষৎ তুলে হেলিওডোরাসের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—ও!……

—কেন? আমার কথা কি আপনি শুনেছিলেন?

—হাঁ। বাবার মুখে শুনেছিলাম সভায় একজন রাজদূত—

হেলিওডোরাস মনে মনে ভাবলে, ইনি বোধ হয় কোনো রাজ-অমাত্যের কন্যা হবেন।

বল্লে—আপনার পিতা রাজসভায় কি পদে—আমি অনেককেই চিনি—

মেয়েটি কিছু বলবার পূর্ব্বেই আরও দুটি সুন্দরী মেয়ে—ওরই প্রায় সমবয়সী—সেখানে এসে পড়লো কোথা থেকে। ওদের দু'জনকে দেখে তারাও যেন অবাক্ হয়ে গিয়েচে। একজন বল্লে—কত খুঁজে বেড়াচ্ছি তোমাকে—বাবাঃ—এখানে কি হচ্চে?

মেয়ে দুটি বিস্ময়ের দৃষ্টিতে হেলিওডোরাসের দিকে চাইলে। সে দৃষ্টির মধ্যে প্রশ্নও ছিল।

হেলিওডোরাস বল্লে—আমি এখানে বেড়াতে এসে একটু বসেছিলাম। আমি জানতাম না যে, আপনাদের বাগান। সেই সময় আপনাদের সখী—

মেয়ে দুটি সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে তাদের সখীর দিকে চেয়ে বল্লে—চলো। মহাদেবী ভাববেন—কতক্ষণ বেরিয়েচি—

এমন সময় আরও তিন-চারটি তরুণী সেখানে এসে দাঁড়ালো। তাদের পেছনে দেখা গেল আরও দুটি আসচে। পেছনের মেয়েগুলি কলরব করতে করতে আসছিল। ওদের মধ্যে কে বল্লে—কি হচ্চে সব জটলা ওখানে? কি হয়েচে?

নববসন্তের বাতাস যেন মদির হয়ে উঠেচে, ওদের সম্মিলিত কণ্ঠের তরল হাস্যকলরবে চূতমঞ্জরী এই পুষ্পলাবণী তন্বী বালিকাদের নূপুর-নিক্কণে।

হেলিওডোরাস প্রথমদৃষ্টা সেই অপরূপ রূপসীকে সম্বোধন করে বল্লে—আমি চলে যাচ্চি, আমায় ক্ষমা করুন—আপনার পিতার নামটি তো শুনতে পেলাম না ভদ্রে?

একজন মেয়ে ভালো করে মুখ না ফিরিয়েই ঈষৎ উদ্ধত স্বরে বল্লে—ওঁর পিতার নাম মহারাজ ভাগভদ্র।

তারপর সবাই মিলে একদল বনহংসীর মত লঘু পদক্ষেপে লতাবিতানের অন্তরালে অদৃশ্য হ'ল।

হেলিওডোরাস কোনরকমে বাগান থেকে বার হয়ে এল।

স্বয়ং রাজকন্যা মালবিকা! এঁর রূপের খ্যাতি বিদিশায় এসে পর্য্যন্ত সমবয়সী দু'একজন বন্ধুবান্ধবের মুখে সে যথেষ্ট শুনে এসেচে। নগরচত্বরে ভ্রমণশীল অনেক মেয়েকে দেখে মনে হয়েচে, রাজকন্যা কেমন রূপসী? এই রকম?

আজ এভাবে···

আশ্চর্য্য! কিন্তু—

হেলিওডোরাসের মাথার মধ্যে কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্চে। উঃ কি গরম আজ! বিশ্রী জায়গা এই বেশনগর। এমন গরমে মানুষ টেঁকে?

অপূর্ব্ব রূপসী এই রাজকন্যা মালবিকা। অপূর্ব্ব···অপূর্ব্ব···অপূর্ব্ব—দেবী মিনার্ভার মত মহিমময়ী, এ্যাফ্রদিতির মত লাস্যময়ী, রূপবতী, সাক্ষাৎ রতিদেবী, এ্যাফ্রদিতি, মূর্ত্তিমতী প্রণয়-কবিতা, সাফোর বহ্নিজ্বালাময়ী প্রেমের কবিতা—সাফোর—

আরও এক মাস কেটে গেল। গ্রীষ্মকাল এসে পড়েচে। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা মাথায় করে ঝাঁকে ঝাঁকে খরমুজা বিক্রী করতে আনচে বাজারে। এই একমাস কি কষ্টে যাপন করচে হেলিওডোরাস সে-ই জানে। কাউকে বলতে পারেনি যে তার সঙ্গে রাজকন্যা মালবিকার দেখা হয়েছিল, কে কি মনে করবে, কার কানে কি কথা উঠবে। এ-সব হিন্দুরাজ্যের আইনকানুন বড় কড়া—কথায় কথায় প্রাণদণ্ড। মৃত্যুকে সে ভয় করে না—কিন্তু নির্বোধের মত মৃত্যুকে ডেকে আনার দরকার কি?···সেইদিনটি থেকে তার শয়নে স্বপনে রাজকন্যা মালবিকা। কতবার সেই উদ্যানের আশেপাশে বেড়িয়েচে···দু'দিন প্রাণ তুচ্ছ করে ঢুকেও ছিল, সেই পাষাণবেদীতে গিয়ে বসেছিল, কিন্তু সে উদ্যান যেমন সে-দিনটির পূর্ব্বে ছিল জনহীন, তেমনি তখনও। অবহেলিত উৎসমুখ, ভগ্ন যক্ষমূর্ত্তি, বনজঙ্গলে সমাচ্ছন্ন পুষ্পবাটিকা, লতাগৃহ···শৈবালাচ্ছন্ন পাষাণ-প্রাসাদ···জনশূন্য অলিন্দ···কিন্তু হেলিওডোরাস আর বাঁচে না···সত্যিকার প্রেম জীবনে এই প্রথম এসেচে তার বহ্নিজ্বালা নিয়ে। জীবনে আর সব কিছু তুচ্ছ হয়ে গিয়েচে ···আর একটিবার সেই অপরূপ রূপসী তরুণী দেবীর সঙ্গে দেখা হয় না? সব কিছু দিয়ে দিতে পারে হেলিওডোরাস···একটিবার চোখের দেখা···সব দিক থেকে অসম্ভব···সে সামান্য রাজদূত, কর্ম্মচারী মাত্র—তাতে বিদেশী, বিধর্ম্মী···অন্যদিকে প্রবলপ্রতাপ মহারাজ ভাগভদ্রের কন্যা সে···

বৈশাখের শেষের দিকে গ্রীষ্মের দাবদাহ আরও বেড়েচে, হেলিওডোরাস কি মনে করে অপরাহ্ণের দিকে সেই উদ্যানবাটিকাতে যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করতে করতে গিয়ে হাজির হ'ল। পক্ক আম্রফলের গন্ধ—বৈশাখ-অপরাহ্ণের উষ্ণ বাতাসে। সেই পাষাণবেদীতে আগেকার আর দু'বারের মত এবারও বসলো। দু'বার নিষ্ফল হয়েচে এই বৃথা প্রতীক্ষা, এবারও হবে সে জানে। তা নয়, সেজন্যে সে আসে নি—কিন্তু এই লতাগৃহের বাতাসে যেন তার দেহগন্ধ মিশিয়ে আছে—পক্ক আম্রফলের গন্ধ যেমন মিশে রয়েচে এই নিদাঘ-অপরাহ্ণের বাতাসে। সে স্বপ্ন দেখতে চায়—ভাবতে চায়—কোথায় কোন্ সুখী প্রেমিক যুগল এমনি জনহীন নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় পরস্পরের হাত ধরে যূথীবনে বিচরণশীল—কত কথা, কত প্রণয়-গুঞ্জন, কত চুম্বন উভয়ের মধ্যে,—সে আর রাজকন্যা মালবিকা।···এমন যদি কোনদিন—

ভাবতে ভাবতে বোধ হয় তার তন্দ্রাকর্ষণ হয়ে থাকবে। গরম তো বটেই···

হঠাৎ যেন একটি সুন্দর হাস্যমুখ কিশোরমূর্ত্তি তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে তাকে এক ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে তুলে বল্লে—আমি কতকাল অপেক্ষা করবো তোমার জন্যে? ওঠো, ওঠো—

কত এলোমেলো স্বপ্ন থাকে মাথায়।

হেলিওডোরাস জেগে উঠলো। বেদীর গায়ে তার খড়্গখানা ঠেকানো রয়েচে, হাতে নিয়ে বাগানের বাইরে তার রথের কাছে এল।

সত্যিই সে উদ্‌ভ্রান্ত, এমন অবস্থায় সে বেশিদিন এখানে কাটাতে পারবে না। পাগল হয়ে যাবে নাকি শেষে?

পথে পা দিতেই একটি বৃদ্ধ ভিক্ষুক ওর কাছে ভিক্ষা চাইলে। ও অন্যমনস্কভাবে কিছু মুদ্রা ওর হাতে দিতে গেল—দেখলে, সেটি একটি স্বর্ণমুদ্রা—ফিরিয়ে নিতে যাবে, কিন্তু পরক্ষণেই অপরিসীম ঔদাসীন্যের সঙ্গে মুদ্রাটি ভিক্ষুকের হাতে ফেলে দিলে। কি হবে অর্থ তার জীবনে? নীরস জীবন, মরুময় জীবন। পিতা ডিওন সুখে থাকুন, কিন্তু তাঁর বংশের পাপ—প্রজাদের অর্থশোষণ, তাদের উপর অত্যাচার—

ভিক্ষুক স্বর্ণমুদ্রা হাতে পেয়ে অপ্রত্যাশিত আনন্দে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলো—বাসুদেব আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন—

হেলিওডোরাসের অন্যমনস্কতা এক চমকে কেটে গেল। বল্লে—কি বলচিস তুই? এই দাঁড়া—

ভিক্ষুক ভয়ে ভয়ে বল্লে—খারাপ কিছু বলি নি বাবা, বাসুদেব আপনার মনের বাসনা পূর্ণ করুন, তাই বলচি—

—কে তিনি?

—মস্ত বড় মন্দির বাসুদেবের—জানেন না?

—খুব জানি। কেন জানবো না—ভারতীয় দেবতার মন্দির। দেখেচি—

—তিনি যে জাগ্রত দেবতা বাবা, যে যা ভেবে মানত করে, তিনি তার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করেন। আমি একবার—

হেলিওডোরাস আর একটি মুদ্রা তার হাতে দিয়ে বল্লে—যা পালা—মুণ্ডু কেটে ফেলে দেবো, আর একটি কথা বল্লে—

সেই বৈশাখী জ্যোৎস্নারাত্রে উদ্‌ভ্রান্ত হেলিওডোরাসের মনে ভিখিরীর এই কথা যেন দৈববাণীর আশ্বাস নিয়ে এলো। বাসুদেব···ভারতীয় দেবতা বাসুদেব···

মনের বাসনা পূর্ণ হবে তার? সে যা চায়? মালবিকাকে না পেলে বিশাল ইরিথ্রিয়ান সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ছাগপদ বনদেবতাদের খুঁজে বের করবে সামোস দ্বীপের বন্য দ্রাক্ষাকুঞ্জের নিভৃত আশ্রয়ে, জলপাই ও মার্টল বৃক্ষের ঝোপে ঝোপে আর্দ্র পাষাণমঞ্চে শুয়ে ওক পাইনের তলে সারাজীবন কাটিয়ে দেবে বন্যফল খেয়ে—ছাগপদ স্যাটিরদের দলে মিশে চিরযৌবনা বনদেবীদের সন্ধানে···অথবা, বনদেবীদের প্রয়োজন নেই···রাজনন্দিনী মালবিকার সন্ধানে সে চিরযুগ ঘুরবে—

পরদিন বৈশাখী পূর্ণিমা। সন্ধ্যার সময় সে গিয়ে বাসুদেবের মন্দিরের বিশাল চত্বরের একপাশে এক গাছতলায় দাঁড়ালো। বিরাট পাষাণমন্দিরের চূড়া ঊর্ধ্বাকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে—মন্দিরের অভ্যন্তরে শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি—মন্দিরের প্রাঙ্গণে শত শত নরনারীর ভিড়—স্থানে স্থানে পুষ্পবিক্রেতা বসে আছে নানা বর্ণের পুষ্পের ডালি সাজিয়ে, দলে দলে মেয়েপুরুষ চলেছে মন্দিরে। সে জানে তাকে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করতে হয়তো বাধা দেবে। তবুও সে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লো সন্ধ্যার অন্ধকারে গা মিশিয়ে। বেশি দূর যেতে

সাহস হ'ল না কিন্তু।

দূর থেকে দেখা গেল গর্ভদেউলের অন্ধকারে ধাতুপ্রদীপের আলোয় বাসুদেবের প্রস্তর-মূর্তির মুখ। কোথায় যেন সে এ মুখ দেখেচে, ঠিক মনে করতে পারলে না। কোথায়?… কবে?

অন্য লোকের দেখাদেখি হাত জোড় করে প্রার্থনা করলে—হে বাসুদেব, আমি বিদেশী, বিধর্মী। তোমার কাছে এসেচি। তুমি নাকি মানুষের মনের বাসনা পূর্ণ কর। আমার মনের বাসনা তুমি জানো, আমি অন্য ধর্মের লোক বলে তুমি আমার প্রার্থনা অবহেলা করতে পারবে না কিন্তু। আমার নাম হেলিওডোরাস—তক্ষশিলায় আমার বাড়ী। মনে করে রেখো—

বাসুদেবের বিশাল মন্দিরের পাষাণচূড়া বৈশাখী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেচে। নরনারীর ভিড় ক্রমশই বাড়চে—হয়তো এখানে আজ কোনো উৎসব আছে। নরনারীদের মধ্যে কেউ কেউ তার দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে গেল—হয়তো ভাবলে একজন গ্রীক যুবক বাসুদেবের মন্দিরে কি করচে?

একটি লোককে দেখে হেলিওডোরাস তাকে ডাক দিলে। লোকটি ছুটে এল তার কাছে, তার গলায় উপবীত, কপালে চন্দনের ফোঁটা, শিখায় পুষ্প বাঁধা।

হেলিওডোরাসের অনুমান যথার্থ, সে মন্দিরের একজন পরিচারক ব্রাহ্মণ বটে।

লোকটিকে সে বল্লে—কত লাগে তোমাদের দেবতাকে কিছু ফলমূল মিষ্টান্ন কিনে দিতে?

একজন গ্রীকের এত ভক্তি দেখে বোধ হয় লোকটি একটু অবাক্ হয়ে ওর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—আপনি কি পূজো দেবেন?

—হ্যাঁ।

—যা দেবেন আপনি। দু দীনার, দশ দীনার—

—তক্ষশিলার স্বর্ণমুদ্রা এখানে চলবে?

—কেন চলবে না হুজুর? শ্রেষ্ঠীর দোকানে ভাঙিয়ে নিলেই চলবে—

—আচ্ছা নিয়ে যাও। আমার নাম হেলিওডোরাস, নাম মনে থাকবে? আমার নামে এই মুদ্রার পরিমাণ ফলফুল মিষ্টান্ন কিনে দেবে—কেমন তো?

—নিশ্চয়ই। বাসুদেবের নামে দিচ্চেন—আপনি দেখচি একজন ভক্ত।

—আচ্ছা যাও—

—আমার দক্ষিণাটা—

হেলিওডোরাস পূজারীকে আরও কিছু দিয়ে সেখান থেকে বার হয়ে মন্দিরের সিংহদ্বারের কাছে এল।

সেই দিনটির পর সে মাঝে মাঝে প্রায়ই বাসুদেবের মন্দিরে এসে একবার করে দেবতাকে তার প্রার্থনা জানিয়ে যায়। মাসের পর মাস চলে গেল, মন্দিরের দেবতা তার প্রার্থনা শুনলেন কই? কোথায় তার মানসীপ্রতিমা…যার জন্যে এত আকুল প্রতীক্ষা? কেবল হাঁটাহাটিই সার।

৪

একদিন এই অবস্থায় মন্দির থেকে বাড়ী ফিরে দেখলে তক্ষশিলা থেকে দূত এসেছে রাজা এ্যান্টিআলকিডাসের সেনাপতি এ্যারিওস্টোসের পত্র নিয়ে। পত্র খুলে পড়লে, এক্ষুনি তাকে ফিরে আসতে হবে তক্ষশিলায়। জরুরী দরকার।

হেলিওডোরাস বিস্মিত হ'ল। দূতকে বল্লে—তুমি কিছু জানো?

সে ব্যক্তি বিশেষ কিছু জানে না। কোন গোপনীয় রাজকার্য্য হবে।

সেইদিনই হেলিওডোরাস তক্ষশিলায় প্রত্যাবর্ত্তন করলে। সেখানে গিয়ে শুনলে, ব্যাপার গুরুতর বটে। মধ্য-এশিয়া থেকে যুদ্ধদুর্ম্মদ শ্বেতকায় হূণদল গান্ধার আক্রমণ করে ভারতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের অত্যাচারে গান্ধার ও কপিলার বহু গ্রাম জনপদ ধ্বংস হয়েছে, বহু নগরী বিধ্বস্ত হয়েছে। পুরুষপুর, বেণুপত্র, মাত্রাবর্ত্তী, বলভী প্রভৃতি রাজ্য বিপন্ন। পুরুষপুরের গ্রীকরাজ হিরাক্লিয়াস ও বেণুপত্রের মহাসামন্ত কুব্জ বিষ্ণুবর্দ্ধন তক্ষশিলার সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। রাজা সৈন্যদল পাঠাচ্ছেন—হেলিওডোরাসকে যেতে হবে যুদ্ধে। হেলিওডোরাস আদেশ পেলে—সেনাপতি এ্যারিওস্টোস ও মহাসামন্ত কুব্জ বিষ্ণুবর্দ্ধনের অধিনায়কত্বে একদল সৈন্য 'চন্দ্রভাগা' পার হয়ে গান্ধারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে—ওদের সঙ্গে অবিলম্বে যোগ দিতে হবে।

তিন বছর কাটলো। আজ বলভী, কাল অন্যত্র, পরশু কপিলা। পর্ব্বত, প্রান্তর, নদী। গান্ধার থেকে পুরুষপুর, পুরুষপুর থেকে গান্ধার। শ্বেতকায় হূণেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত—অনেকবার তাদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ হ'ল মরুভূমিতে, পর্ব্বতের সংকীর্ণ অধিত্যকায়, কত গণ্ডগ্রামের রাজপথে। মানুষ ম'রে পাহাড় হয়ে গেল—যত না যুদ্ধে, তত দুঃখে কষ্টে অনাহারে। হূণের দল রক্তলোলুপ পশুর মত জনপদবাসীদের উপর অত্যাচার করতে লাগলো। রাত্রের আকাশ আলো হয়ে ওঠে দহ্যমান শস্যক্ষেত্রের বা গ্রাম-জনপদের বাসগৃহের রক্ত-অগ্নিশিখায়। মানুষ নৃশংস হত্যার লালসায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেচে। যুধ্যমান সৈন্যবাহিনীর নির্ম্মম রথচক্রতলে শত শত নিরীহ নারী, শিশু, অসহায় বৃদ্ধ পিষ্ট হয়ে মেদরক্তে পথের ধূলি কর্দ্দমাক্ত করে তোলে। সর্ব্বগ্রাসী প্রলয়দেব করাল কৃপাণ দু'হাতে বন্ বন্ করে ঘোরান—শাণিত খড়্গের ফলকে ফলকে সূর্য্যকিরণ ঠিকরে পড়ে। কপিলার উত্তর ভাগ শ্মশান হয়ে গেল এই তিন বৎসরে। গভীর নিশীথে সেখানে মুণ্ডমালিনী করালিনী কালভৈরবীর রক্তসিক্ত জিহ্বা লক্‌লক্ করে অন্ধকারে। শিবাদলের অমঙ্গল চীৎকারে অন্তরাত্মা কাঁপে।

একটি খণ্ডযুদ্ধে হেলিওডোরাস হূণদের হাতে বন্দী হ'ল। কেন তারা তাকে হত্যা করলে না, সে নিজেই জানে না…অবাক হয়ে গেল সে। পশুচর্ম্মের তাঁবুতে উটের দুধ ও ছাতু খেয়ে পর্য্যুষিত পশুমাংস খেয়ে সে এক মাস অতি কষ্টে কাটালো। প্রতিক্ষণেই মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে—অথচ কেন তাকে ওরা মারে না কে জানে? একদিন সে শুয়ে আছে তাঁবুতে,

স্বপ্ন দেখলে এক সুন্দর তরুণ তাকে ঠেলা মেরে উঠিয়ে বলচে—আমার সঙ্গে এসো আমি তোমায় পথ দেখিয়ে দিচ্চি পালাবার—

বাইরের অন্ধকার ছুরি দিয়ে কাটা যায়। এখানে ওখানে হূণ-প্রহরীদের অগ্নিকুণ্ড। আব্‌ছায়া অন্ধকারে চলেচে দুজনে, তরুণ আগে—ও পিছনে। পথপ্রদর্শক তরুণের মূর্ত্তি অন্ধকারে অস্পষ্ট, ভালো দেখা যায় না। সম্মুখেই অজিরাবতী নদী···

—নামো নামো, জলে নামো। মাভৈঃ—

স্বপ্নাচ্ছন্নের মত নামচে হেলিওডোরাস। কন্‌কনে বরফগলা জল, প্রথমে একহাঁটু, পরে কোমর, তারপরে একগলা।

আগে যে যাচ্ছে, সে বলচে,—ভয় নেই। চলে এসো। এই জায়গায় নদীর জল কম, চিনে রাখো এই শালগাছ। ডুবে যাবে না।

একগলা জলে পড়তেই হেলিওডোরাসের ঘুম ভেঙে গেল···ভোর হয়েচে। স্বপ্নের কথা সে ভাবলে। কে এই কিশোর? এ'কে সে কোথাও আরও স্বপ্নে দেখেচে—পরিচিত মুখ। হঠাৎ মনে পড়লো—সেই বিদিশার প্রাচীন উদ্যানবাথি···সেই বাপীতট (স্বপ্নযোগে উদ্‌ভ্রান্ত সে এক দিন এ'কেই দেখেছিল।)—কেন সে বার বার এই কিশোরকে স্বপ্নে দেখে? কে এই তরুণ?

সারাদিন সে স্বপ্নের কথা ভাবলে। তার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল, আজ রাত্রে সে পালাতে চেষ্টা করলে সে কৃতকার্য্য হবে। গভীর নিশীথে তাঁবুর বার হয়ে এল সে—হাতে পায়ে শৃঙ্খল ছিল না। আসবপানমত্ত হূণ-প্রহরীরা অগ্নিকুণ্ডের ধারে তন্দ্রামগ্ন। অদূরে অজিরাবতী নদী, ওই সেই শালগাছ। নিঃশব্দে জলে নেমে চক্ষের নিমেষে সে ওপারে উঠলো গিয়ে শালবনের মধ্যে কুব্জ বিষ্ণুবর্দ্ধনের স্কন্ধাবারে।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল সেই শীতকালের প্রথমেই। দীর্ঘকাল পরে হেলিওডোরাস তক্ষশিলায় ফিরলে। মাসখানেকের মধ্যেই রাজার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে মালবে সে পূর্ব্বপদে ফিরে এল। কিসের যেন আকর্ষণ, কে যেন টানে।

একদিন সে নগরীর বাইরে বেড়াতে বেড়াতে সেই উদ্যানবাটীতে প্রবেশ করলে। সেই শৈবালাচ্ছাদিত পাষাণবেদী, সেই লতাগৃহ, সেই যক্ষমূর্ত্তি-শোভিত বাপীতট—সব তেমনি আছে। যেন কতকাল আগের স্বপ্ন। একদিন সেই রূপসীকে যেন স্বপ্নে দেখেছিল এখানে—সেই বসন্তকালের পুষ্পসৌরভ, সেদিনকার সে সন্ধ্যাটি—সব যেন হিপোলিটাসের সেই করুণ কবিতাটি স্মরণ করিয়ে দেয়—'আপেলগাছের ছায়া, রূপসী-কণ্ঠের গান, সুবর্ণের দ্যুতি—' প্রথম যৌবনের হারানো দিনগুলির দূরাগত বংশীধ্বনি। হায় ভারতীয় দেবতা বাসুদেব! তোমার পাষাণ-দেউলের মত তুমিও কি কঠিন? কিংবা আমি গ্রীক বলে, বিধর্ম্মী বলে, আমায় অবহেলা করলে? কথা কানে তুললে না? সে আজ নেই। সে রূপসী কোনো দূররাজ্যের রাজমহিষী। জীবনে আর তার সঙ্গে দেখা হবে না, সে জানে। কেউ বসে নেই তার জন্যে তিন বৎসর পরে।

আবার বসন্তকাল। সুদীর্ঘ তিন বৎসর পূর্ব্বে এই বসন্তকালে এই সময় মালবিকার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। হেলিওডোরাস কি মনে ক'রে এবার ঠিক তেমনি প্রস্ফুটিত কুসুমগন্ধে আমোদিত পথ দিয়ে যেতে যেতে রথ থামিয়ে সেই উদ্যানটিতে প্রবেশ করলে। কতদিন এখানে আসেনি! সম্পূর্ণ বাস্তব এই পাষাণবেদী। স্বপ্ন তো নয়—বিশাল রাজপুরীর অন্তঃপুর-প্রান্তে সেই রূপবতী তরুণী রাজনন্দিনীও তো স্বপ্ন নয়। এখানে এসে তবুও যেন কেমন একটু স্পর্শ···একদিন এখানকার এই মৃত্তিকায় তো সে এসে দাঁড়িয়েছিল। আজ সে হয়তো বিবাহিতা—কোনো দূর রাজ্যের রাজমহিষী।

কতক্ষণ কেটে গেল। অপরাহ্ন অবসান-প্রায়। বনলক্ষ্মী স্নিগ্ধ বাতাস কুসুমগন্ধে ভরে দিয়েচেন।

হিপোলিটাসের সেই কবিতা 'আপেলগাছের ছায়া, তরুণীকণ্ঠের গীতধ্বনি, স্বর্ণের দ্যুতি—'

হঠাৎ পাষাণ-বেদিকার পিছনে বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে কার পদধ্বনি শোনা গেল। তবে কি সেই কৃষ্ণকায় উদ্যানরক্ষক যাকে একবার সে কিছু পুরস্কার দিয়েছিল! মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখেই হেলিওডোরাস স্তব্ধ হয়ে রইল বিস্ময়ে, ঘটনার অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতায়। সেই অপরূপ রূপসী তরুণী স্বয়ং।

হেলিওডোরাস উঠে দাঁড়ালো। মেঘাবরোধ ছিন্ন করে বিদ্যুৎশিখা একেবারে তার সামনে—কতদিনের স্বপ্নে চাওয়া তার সেই মানসী প্রতিমা! দীর্ঘ তিন বৎসরে তার রূপ এতটুকু ম্লান হয়নি—বরং বেড়েচে।

তার চেয়েও আশ্চর্য্য, তরুণী তার দিকে চেয়ে হাসিমুখে বল্লে—ও, আপনি!

হেলিওডোরাসের ঘোর তখনও যেন কাটে নি—মাথা ও শরীর ঝিম্‌ঝিম্ করচে। সে উত্তর দিল, হাঁ ভদ্রে—

মেয়েটি বল্লে—আপনি অনেকদিন এদিকে আসেন নি—আপনি ছিলেন না এখানে তাও জানি। হূণদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। বীর আপনি। কিন্তু ফিরেছেন কবে তা শুনিনি।

হেলিওডোরাসের গ্রীক রক্ত শরীরের মধ্যকার শিরায় উপশিরায় আগুন ছুটিয়ে দিলে। সে স্থির দৃষ্টিতে তার প্রেমাস্পদার দিকে চেয়ে বল্লে—আমি ফিরে এসেচি এবং এই উদ্যানেও এসেচি কয়েকবার—কিন্তু আপনাকে দেখিনি—

মেয়েটি অবাক্ হয়ে বল্লে—আমাকে?

—আপনাকে খুঁজেচি যে—এই তিন মাস ধরে। গান্ধার থেকে ফিরে পর্য্যন্ত কতদিন এসেচি।

মেয়েটির মুখে যেন অতি অল্প সময়ের জন্য কিসের দীপ্তি, ওর শ্বেতপদ্মের আভাযুক্ত গণ্ডস্থল যেন অতি অল্প সময়ের জন্য রক্তিম হয়ে উঠলো—সে বল্লে—আচ্ছা, আমি শুনেচি, আপনি নাকি যুদ্ধে যাওয়ার পূর্ব্বে বাসুদেবের মন্দিরে যাতায়াত করতেন প্রায়ই—

—হাঁ, ভদ্রে—কে বল্লে ?

—সবাই বলে। আপনি গ্রীক, আপনার ওখানে যাতায়াত নিয়ে নগরীর লোকজনের মধ্যে একটা কৌতুহলের সৃষ্টি হবেই তো—আপনি কি আমাদের দেবতা মানেন ?

—মানি। আজ বিশেষ করে মানচি। বাসুদেব অতি দয়ালু দেবতা, মানুষের প্রার্থনা উনি শোনেন, আজ বুঝলাম।

মেয়েটি বিস্ময়ের সুরে বল্লে—আজ ? কেন ?

—আজই। অভয় দেবেন ভদ্রে ? মার্জ্জনা করবেন একজন বিদেশী লোকের প্রগল্‌ভতা ?

মেয়েটির মুখ হঠাৎ যেন বিবর্ণ হয়ে গেল, পরক্ষণেই সে-মুখে সাহস ও কৌতুহলের দীপ্তি ফুটে উঠলো—সেই সঙ্গে যেন লজ্জাও। মেয়েটি যেন আগে থেকে অনুমান করেচে—সে কি শুনবে এই রূপবান গ্রীক যুবকের মুখ থেকে।

হেলিওডোরাস বল্লে—ভদ্রে, আপনাকে আর একটিবার দেখবো এই প্রার্থনা করেছিলাম দেবতার কাছে।

মেয়ে রক্তিম মুখে চুপ করে রইল মাটির দিকে চেয়ে। কি দীপ্তিময়ী, মহিমময়ী মূর্ত্তি! নিবিড় কৃষ্ণ কেশপাশে সেদিনকার মতই রক্তজবা ও যূথীগুচ্ছ! গ্রীবার কি অদ্ভুত ভঙ্গি!

হেলিওডোরাস বল্লে—আপনাকে না দেখলে বাঁচবো না। আমি এই তিন বৎসর উদ্‌ভ্রান্তের মত বেড়িয়েচি।

মেয়েটি প্রসন্ন হাস্যে বল্লে—কি হবে দেখে বলুন।

দেবী যেন জাগ্রতা হয়ে উঠেচেন—এই অদ্ভুত প্রসন্ন হাসির মধ্য দিয়ে অন্তরশয্যা থেকে সদ্য-জাগ্রতা প্রেমের ও করুণার দেবী যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠেচেন।

হেলিওডোরাস সহাস্যে বল্লে—শুধু দেখবো দেবী, আমার হৃদয়ের সমস্ত অর্ঘ্য—যদি কোনোদিন—

—এই জন্যে যেতেন আপনি বাসুদেবের মন্দিরে ? ঠিক বলচেন ?

—মিথ্যা বলিনি। কত পূজো দিয়েচি পূজারীদের হাতে—আর—

হেলিওডোরাস কুণ্ঠিত মুখে চুপ করে রইল।

—আর কি ?

—মনোবাসনা পূর্ণ হ'লে বাসুদেবকে মূল্যবান কিছু উপহার দেবো—।

রাজকন্যার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো। বাসুদেব ওর মূল্যবান উপহার পাবার প্রত্যাশা করেন কি না! এই বিদেশী যুবক বড় সরল। মায়া হয় ওর ওপর।

মুখে বল্লেন মৃদু হেসে—তারপর বাসুদেবকে ভুলে যাবেন বুঝি ?

—জীবন থাকতে নয় দেবী, আপনি আর বাসুদেব এক তারে গাঁথা রইলেন আমার হৃদয়ে। দু'জনের কাউকেই ভুলবো না।

রাজকন্যা বল্লেন—একদিন আমরা বাসুদেবের মন্দিরে গিয়ে আপনাকে দেখি।

হেলিওডোরাস বল্লে—আমাকে ?

—মন্দিরের সিংহদ্বারের কাছে আপনি একজন পূজারী ব্রাহ্মণের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমি আমার সখীদের সঙ্গে মন্দিরে ঢুকচি—সুনেত্রা আমাকে দেখালে। সুনেত্রাকে ডাকি—

একটু পরে যে মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে রাজকন্যা ফিরলেন, তাকে প্রথম দিন হেলিওডোরাস এখানে দেখেচে।

সুনেত্রা এসেই হেসে বল্লে—আপনাকে আমরা কতদিন এখানে খোঁজ করেচি—আমার সখী—

রাজকন্যা তর্জনী তুলে শাসনের ছলে লজ্জারুণ মুখে বল্লেন—চুপ—সাবধান!

সুনেত্রা বল্লে—এখানে আর আসতেন না কেন? যুদ্ধে গিয়েছিলেন বুঝি?

—হ্যাঁ—কিন্তু ফিরে এসেও ত কতবার এসেচি ভদ্রে—রোজ রোজ তো আর পরের বাগানে আসতে পারি না?

সুনেত্রা ভ্রূকুঞ্চিত করে বল্লে—রোজ রোজ কি আমরা আপনার সন্ধান করতাম নাকি? আপনি দেখচি বড় ধৃষ্ট—যান এখান থেকে আজ। জানেন এটা আমাদের সখীর মাতামহ সঞ্জয়-দত্তের বাগান? নাৎনীকে দিয়ে গিয়েচেন তিনি। এ শুধু আমার সখীর নিজস্ব বাগান—কার অনুমতি নিয়ে আপনি এখানে ঢুকেচেন জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

রাজকন্যা মৃদুকণ্ঠ প্রতিবাদের সুরে বল্লেন—ও কি সুনেত্রা!

পরে হাসিমুখে হেলিওডোরাসের দিকে চেয়ে বল্লেন—আমাদের হূণযুদ্ধের গল্প শোনাবেন?

৬

হায় দেবতা এ্যাপোলো বেলভেডিয়ার! প্রতিদিন চতুরশ্বযোজিত রথে সারা আকাশ পরিভ্রমণ করে সন্ধ্যায় ফিরে আসেন নিজ গৃহে—আপনি দেখেন নি হেলিওডোরাসের দুঃখ··· ডিওন-পুত্র হেলিওডোরাসের? আপনি কি এখন আবার দেখচেন না, কত দুপুরে কত সুন্দর শরৎ ও শীতের অপরাহ্নে বিদিশার পূর্ব্বতন মহামাত্য সঞ্জয়দত্তের প্রাচীন উদ্যানবাটিকায় দুটি প্রেমিক হৃদয়ের গোপন লীলা-খেলা, শুনচেন না তাদের আনন্দগুঞ্জন? মাধবীপুষ্পমঞ্জরীর আড়ালে যার বিকাশ, উদ্যানবাটিকার অরণ্যছায়ায় তার ব্যাপ্তি—দুটি তরুণ হৃদয়ে সে সসঙ্কোচ প্রেম, বিচ্ছেদকালীন ব্যাকুলতা—দেখেন নি এ সব? না দেখেচেন না দেখেচেন, হেলিওডোরাস আর আপনাকে চায় না। দুঃখের দিনে যিনি কৃপা করে তার মনোবাসনা পূর্ণ করেচেন, সেই দেবতাই হেলিওডোরাসের একমাত্র উপাস্য। ভারতবর্ষের পবিত্র মৃত্তিকায় সেই দেবতার অপার করুণার এ ইতিহাস সে অক্ষয় ক'রে রেখে যাবে—যদি গ্রীক রক্ত তার দেহে থাকে।

একদিন মালবিকা বল্লে—হেলিওডোর, বাবাকে বলো—

—মহারাজ কি শুনবেন?

—তা হ'লেও তুমি বলো—গুপ্তভাবে আমাদের এমন সাক্ষাৎ আর বেশিদিন চলবে না।

—আমিও তোমাকে চাই মালবিকা—আমারও চলবে না তোমাকে না পেলে—

—সব হয়ে যাবে বাসুদেবের কৃপায়। চলো আজ দুজনে মন্দিরে যাই—তুমি একদিক থেকে, আমি অন্যদিক থেকে। মানত করে আসি তাঁর কাছে। তাঁর কৃপায় সব সম্ভব।

হেলিওডোরাস ইতিমধ্যে রাজসভায় যথেষ্ট সুখ্যাতি অৰ্জন করেছিল নানাদিক থেকে। তক্ষশিলার প্রধান অমাত্যের পুত্র সে—উভয় রাজ্যের মধ্যে একটা মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় হয়ে উঠচে হেলিওডোরাসের রাজদূতরূপে উপস্থিতিতে। তরুণ দলের সে একজন নেতা—তার সুঠাম দেহকান্তি ও পুরুষোচিত ক্রীড়া ও ব্যায়ামনৈপুণ্যের জন্য তরুণ নাগরিকগণ তাকে অত্যন্ত মানে। তার ওপর হেলিওডোরাসের খ্যাতি রটে গিয়েছিল যে, সে গ্রীক হলেও বাসুদেবের একজন ভক্ত।···

নৃপতি ভাগভদ্র প্রথমে আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি হঠাৎ কেন এ বিবাহে সম্মতি দিলেন তা কেউ জানে না।

স্বয়ং মহারাণী পট্টমহাদেবী কুমারললিতা তার খবর রাখেন।

সেদিন নিশীথরাত্রে রাজা ঘর্মাক্ত-কলেবরে পর্য্যঙ্ক থেকে ধড়মড় করে ঘুম ভেঙে উঠলেন।

রাজ্ঞী ব্যস্তভাবে বল্লেন—কি হয়েচে গো, অমন করচো কেন?

—একটু জল দাও—উঃ কি ভীষণ—! জল দাও—

রাজ্ঞী স্বর্ণভৃঙ্গার থেকে জল দিয়ে বল্লেন—কি হয়েচে—কি হয়েচে—

নৃপতি এক দুঃস্বপ্ন দেখেচেন। এক চণ্ডপুরুষ তাঁর কাছে এসে এক বিশাল শূল আস্ফালন করে হুঙ্কার দিয়ে বলচেন···রে ভাগভদ্র, আমি কে চেনো? তোমার বংশের কুলদেবতা। হেলিওডোরাসের সঙ্গে তোমার কন্যার বিবাহে যদি সম্মতি না দাও—তবে তোমার মালবরাজ্য এই শূলের আগায় উড়িয়ে দক্ষিণ সমুদ্রে ফেলে দেবো—ও আমার জন্ম-জন্মান্তরের ভক্ত। বলেই সেই চণ্ডপুরুষ কি ভীষণ হুঙ্কার ছাড়লে!···শূলের অগ্রভাগ থেকে রক্ত অগ্নিশিখা যেন দাউ দাউ করে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়লো ঘরে ঘরে—উঃ, কি ভীষণ দুঃস্বপ্ন!

রাজ্ঞী বল্লেন—বেশ তো। হেলিওডোরাস সুন্দর ছেলেটি, তাকে আমি দেখেচি—মালবিকার সঙ্গে বড় সুন্দর মানাবে। তোমার মেয়েরও সম্পূর্ণ ইচ্ছে—

বল কি রাজ্ঞী! মেয়ে কি ওকে দেখেচে?

রাজ্ঞী হতাশার সুরে হাত-দুটি শূন্যের দিকে ছুঁড়ে বল্লেন—নির্ব্বোধ নিয়ে ঘর করা যায় তো অল্পবুদ্ধি নিয়ে ঘর করা চলে না—কথাতেই বলেচে। ওরা হ'ল আজকালকার মেয়ে—আর কি আমাদের মত সেকাল আছে? কোনো অমত কোরো না। হেলিওডোরাস আমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করবে বিয়ে হ'লেই, তুমি দেখো। আর ওরকম আজকাল তো হচ্চেই। তক্ষশিলায় আমার এক পিসতুতো বোনের ননদের যে একজন গ্রীক তালুকদারের সঙ্গে বিয়ে হয়েচে—

অতএব হেলিওডোরাসের সঙ্গে মালবিকার বিবাহে বাধা রইল না।

পিতা ডিওন পত্রবাহকের হাতে লিখে পাঠালেন—খুব সুখের কথা বাবা। আমি

তোমাকে এক পয়সা দিয়ে যেতে পারবো না। নিজের আখের যাতে ভাল হয় তাই করো। অর্থই গান্ধারের আপেল, কপিলার সুরা এবং কাশ্মীরী শাল। রাজকন্যাকে বিবাহ কর, ক্ষতি নেই, আখের দেখে নিও।

হেলিওডোরাসের সঙ্গে মালবিকার বিবাহের কয়েকদিন পরে রাত্রে গভীর সুষুপ্তির মধ্যে হেলিওডোরাস দেখলে, সেই নবীন সুন্দর কিশোর, তাকে ঘুমের মধ্যে ঠেলে দিয়ে আব্দারের সুরে অভিমানে রাঙা ঠোঁট ফুলিয়ে বলচে—আমার কথা মনে আছে? আমায় যা দেবে—কবে দেবে? মনে থাকবে?

হেলিওডোরাস চিনলে—দু-বৎসর পূর্বে মহামাত্য সঞ্জয়দত্তের উদ্যানে এই কিশোরকে সে স্বপ্নে দেখেছিল—হূণ-তাঁবুতে রাতের অন্ধকারে এঁকেই সে স্বপ্নে দেখে। একদিন মন্দিরে গিয়ে বিগ্রহের মুখ দেখে তার মনে হয়েছিল কোথায় যেন এ মুখ সে দেখেচে। আজ সে বুঝেচে—

হেলিওডোরাস বিস্ময়ে ও আনন্দে শিউরে উঠলো ঘুমের মধ্যে। ইনিই সেই পরম করুণাময় বাসুদেব! জয় হোক তাঁর। জয় হোক স্বপ্ন-বাসুদেবের! হেলিওডোরাস তোমাকে ভুলবে না।

হেলিওডোরাস ভোলেওনি।

দু-হাজার বছর মহাকালের বীথিপথের অস্পষ্ট কুজ্ঝটিকায় কোথায় মিলিয়ে গিয়েচে। বিদিশা নগরী ও তার বাসুদেবমন্দির আজ অতীতের ভগ্নস্তূপ—কিন্তু তার প্রাঙ্গণতলে পরম ভাগবত হেলিওডোরাসের বিশাল গরুড়-স্তম্ভ ভক্ত ও ভগবানের স্মৃতিচিহ্ন বহন করে আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।···ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।···

অসাধারণ

সীতানাথ ডাক্তারের দোকানে বসিয়া ছিলাম। সকালবেলা। খবরের কাগজ এখনো আসিয়া পৌঁছে নাই—কারণ মফঃস্বল জায়গা। খবরের কাগজ না পৌঁছিলে যুদ্ধের আলোচনা ঠিক জমে না। অদূরবর্ত্তী বাজারে প্রাভাতিক সওদা সারিয়া নবীন মুখুয্যে, শশধর মুহুরী, কেনারাম মুখুয্যে, মন্মথ মুখুয্যে, বলাই দাঁ প্রভৃতি ভদ্রলোক সীতানাথের ডাক্তারখানায় স্নানাহারের সময় পর্য্যন্ত রাজনীতি আলোচনা করিয়া থাকেন। ইঁহারা কোন চাকুরী করেন না। দু-একজন পেনসন-প্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারী, এক-আধজনের বাপের পয়সা প্রচুর। ইঁহারা জার্ম্মানি ও জাপানের সম্বন্ধে বহু ভবিষ্যদ্বাণী করেন, যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্বন্ধে এমন কথাবার্ত্তা বলেন, যাহা স্বয়ং হিটলার, চার্চ্চিল ও তোজোরও অজ্ঞাত। হিটলার কি ভুল করেন, চার্চ্চিলের কি করা উচিত ছিল, জাপান এমনটি না করিয়া যদি এমনটি করিত তাহা হইলে কি ঘটিত—এ সকল মূল্যবান উপদেশ সর্ব্বদাই সেখানে উচ্চারিত হইতেছে।

বর্ত্তমানে কেনারাম মুখুয্যে বলিতেছিলেন—আরে, এই তোমাকে বলি শোনো ভায়া। ভুলটা হিটলারের হোলো কোথায় শোনো। ডানকার্কের যুদ্ধের পরেই—

শশধর মুহুরী বলিয়া উঠিলেন—আঃ, আপনি ঐ এক শিখে রেখেচেন ডানকার্ক আর ডানকার্ক। আসল ভুল সেখানে নয়, আসল ভুল হলো—

এমন সময় একটি পুরুষের হাত ধরিয়া একজন স্ত্রীলোক ডাক্তারখানার বারান্দাতে উঠিয়া আসিল সম্মুখের রাস্তা হইতে। পুরুষটির বয়েস চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ-পঞ্চান্নর মধ্যে যে কোন বয়েস হইতে পারে, রোগা, পরনে খাটো ময়লা ধুতি; মেয়েটির বয়েসও নিতান্ত কম নয়, তবে পুরুষটির অপেক্ষা অনেক কম, ত্রিশ-বত্রিশের বেশি হইবে না। মেয়েটির পরনে তালি-লাগানো শাড়ী, কিন্তু ময়লা নয়—মুখশ্রী একসময় বেশ ভালোই ছিল বোঝা যায়, দেহ খুব সম্ভবত অনাহারে ও ম্যালেরিয়ায় শীর্ণ।

মেয়েটি বারান্দার প্রান্তে দাঁড়াইয়া বলিল—ও ডাক্তারবাবু—

সীতানাথ ডাক্তার উহাদের দিকে একটু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে চাহিয়া বলিলেন—কি চাও?

—বাবু, এঁকে একটুখানি দেখতি হবে।

সীতানাথ ডাক্তার বুঝিয়াছিলেন ইহাদের দ্বারা বিশেষ কোনো অর্থাগমের আশা নাই—যত বড় কঠিন অসুখই হউক না কেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত চেহারা। পরনে তো ওই কাপড়। মাথা তৈলাভাবে রুক্ষ। রোগীর মধ্যে গণ্য করিয়া উৎফুল্ল হইবার কোনো কারণ নাই।

তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন—হয়েচে কি?

মেয়েটি বলিল—হবে আর কি। ওঁর জ্বর ছাড়ে না আজ দুমাস। তার ওপর মেহ। শরীর একেবারে ভেঙে গিয়েচে। আমার উনি ছাড়া আর কেউ নেই। আপনি দয়া করে দেখুন।…বলিয়া মেয়েটি প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। সীতানাথ ডাক্তার বলিলেন—সরে এসো এদিকে—

পরে রোগী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—হুঁ, দেখবো কি, এর মধ্যে অনেক রোগ। কদ্দিন এমন হয়েচে ?

পুরুষটি এবার ক্ষীণস্বরে বলিল—তা বাবু অনেক দিন। আমি আজ তিন-চার মাস ভুগচি। আর এই কাশি, এ কিছুতি যাচ্ছে না—

মেয়েটি হাত তুলিয়া অধৈর্য্যের সুরে বলিল—তুমি চুপ করো দিকিনি! খুব থ্যামোতা তোমার! আমার হাড় মাস জ্বালিয়ে খেলে তুমি—তিন মাস ওঁর অসুখ—

তাহার পর আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিল—ওঁর কথা শোনবেন না। ওঁর কি কিছু ঠিক থাকে? নিজের দিকে ওঁর কোনো খেয়াল নেই—এই শুনুন তবে আমার কাছে—

কথাটা শোনাইল এভাবের যেন লোকটি দার্শনিক কিংবা কবি, অথবা ব্রহ্মদর্শী—সাংসারিক তুচ্ছ বিষয়ে স্বভাবতই ইনি অনাসক্ত। বোধ হয় ঈর্ষাপ্রণোদিত হইয়াই সীতানাথ ডাক্তার পুরুষটিকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন—তোমার গনোরিয়া হয়েচে কতদিন ?

—তা বাবু চার-পাঁচ মাস হবে। সেবার যখন···

মেয়েটি ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়া বলিল, তুমি তো সব জানো কিনা! চুপ করো। না বাবু, দু বছর হয়ে গেল। আমার হাড় মাস ভাজা করে খেলে ওই মিন্সে। কি জ্বালায় যে পড়েচি আমি, মরণ হয় তো হাড় জুড়িয়ে যায় আমার।

কাহার মরণ হইলে তাহার হাড় জুড়ায়, কথার ভাবে ঠিক ধরিতে পারিলাম না।

সীতানাথ ডাক্তার বলিলেন—বাড়ী কোথায় ?

মেয়েটি বলিল—বাড়ী এই ঝিটকিপোতায়। আমরা হাড়ি।

—ও! ঝিটকিপোতায় হাড়ির বাস আছে নাকি ?

—না বাবু, দেশে দেশে ভেসে বেড়াচ্ছি এই ওনারে নিয়ে। বিয়ে করা সোয়ামী ফেলতে তো পারি নে। আজ দুটি বছর উনি বিছেনেয় পড়ে। উঠতি হাঁটতি পারেন না। কত অসুদ বিষুদ করলাম আমাদের দেশে ঘরে, যে যা বলে তাই করি, কিন্তু কিছুতেই সারাতি পারলাম না, দিন দিন যেন মানুষ উঠতি পারে না, খেতি পারে না। তাই আজ বলি—ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যাই—একটু দেখুন আপনি ভাল করে, আমার আর কেউ নেই—

আমি এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া দেখিতেছিলাম। এইবার বলিলাম—তোমার স্বামী কি কাজ করে ?

মেয়েটি ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—কাজ! ওরে আমার কাজের শিরোমণি রে! ও করবে কাজ? সেদিন পূবের সূয্যি পশ্চিম পানে ওঠবে না ?

পুরুষটি লজ্জিতভাবে বলিল—না বাবু, কাজ আমি করি নে। সে ক্ষ্যামতা নেই তো করবো কি। ও-ই ধান ভেনে দাইগিরি করে সংসার চালায়। তা এই বাজারে বড্ড কষ্ট হয়েচে বাবু।

মেয়েটি বলিল, তুমি থামবে বাপু, না বকে যাবে? বাবু শুনুন তবে বলি। কই তুক্কুর বার্ত্তা ও কি জানে? সংসারের কোন খোঁজ রাখে ও?

কৃতজ্ঞতার আবেগ বোধ হয় অসম্বরণীয় হইয়া উঠিল পুরুষটির। সে পুনরায় নম্র স্বরে বলিল—তা যা বললে ও সে কথা সত্যি বটে। ও আমাকে জানতি দ্যায় না। নিজি সব করবে। আমি তো খাটতি পারি নে—আমার এই ডান পাডা একটু খোঁড়া, হাঁটতি পারি নে—এই দেখুন বাবু এই পাডা—

মেয়েটি আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—নাও, আর বাবুদের সামনে তোমার পা বার করতি হবে না—

কিন্তু দেখিলাম মেয়েটির চোখ ছল ছল করিয়া উঠিয়াছে। এই গনোরিয়া-গ্রস্ত খোঁড়া অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধের প্রতি এতটা দরদ ওর! দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

সীতানাথ ডাক্তার বলিলেন—তুমি ধাইয়ের কাজ জানো বললে না?

পুরুষটি এ-কথার উত্তর দিল। বলিল—খুব ভালো ধাই! তা যে বাড়ী যাবে, এক কাঠা করে চাল, একখানা করে কাপড়, একটি করে টাকা—ও-ই খরচ করে আমায় চিকিচ্ছে করাচ্চে বাবু।

মেয়েটি উহাকে থামাইয়া বলিল—তুমি চুপ করো দিকিনি! তুমি কি জানো ও সবের? বাবু, ধাইয়ের রোজগার আগে চলতো ভালই। এখন আপনাদের এখানে হাসপাতাল হয়েচে পোয়াতিদের জন্যি। সব লোক এখানে আসে। আমাদের কাছে কেডা যাবে? ধান ভেনে যা হয়। দু মন ধান ভানলি পাঁচ কাঠা চাল পাওয়া যায়—কিন্তু বাবু, অসুখে ভুগে ভুগে আমার গতর গিয়েচে, আর তেমন খাটতি পারি নে। ধান ভানা বড্ড খাটুনির কাজ। যেদিন ধান ভানি, আজকাল রাত্তিরি বড্ড পা কামড়ায়—

আমি বলিলাম—তোমার কে কে আছে আর?

মেয়েটি সাফ উত্তর দিল—যম।

—জাতে হাড়ি বললে না?

—হাঁা বাবু।

—ঝিটকিপোতা থেকে এলে কি করে? সে তো অনেক দূর।

—নৌকো করে এ্যালাম বাবু।

—ভাড়াটে নৌকো?

—অনেক কেঁদে হাতে পায়ে ধরে তেরো গণ্ডা পয়সা ঠিক হয়েল। ওই আমাদের গাঁয়ের রতন মাজি। আমি তাকে ধরম-বাপ বলে ডেকেচি।

—ধানের চাষ কর?

—না বাবু, ঘর-দোর নেই তার ধানের জমি! বিচুলির ছাউনি একখানা ঘর, তা এবার খসে পড়ছে। না খুঁচি দিলি এবার বর্ষায় সে ঘরে থাকা যাবে না।

বেলা হইয়াছিল। সেদিন চলিয়া আসিলাম। ইহার পর হইতে প্রায়ই দুদিন অন্তর-

মেয়েটি উহার স্বামীর হাত ধরিয়া ডাক্তারখানায় হাজির হয়। কখনো ঔষধের দাম কমাইবার জন্য সীতানাথ ডাক্তারের হাতে পায়ে পড়ে, কোনোদিন স্বামীর সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করে, কবে রোগ সারিবে, নৌকা ভাড়া দিয়া আর পারে না সে—ইত্যাদি।

দেখিয়া শুনিয়া সীতানাথ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ওকে কেমন দেখেন? ওর রোগ সারবে?

সীতানাথ ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন—বিশ্বাস তো হয় না। নানান উপসর্গ। ওর শরীরে কিছু নেই—তবে চেষ্টা করচি, এই যা।

অবশ্য উহাদের সাক্ষাতে এ কথা হয় নাই।

মাসখানেক পরে একদিন ডাক্তারখানায় বসিয়া আছি, মেয়েটি আরও শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আর কিছুদিন এমন ধারা চলিলে ইহারই চিকিৎসার প্রয়োজন হইবে। হয়তো নিজে আধপেটা খাইয়া স্বামীর ঔষধপথ্য ও নৌকাভাড়া যোগাইতেছে। পরনের বস্ত্রও জীর্ণতর হইয়া উঠিয়াছে। সেদিনের কাজ শেষ করিয়া তাহারা যখন চলিয়া যায় তখন মেয়েটিকে ডাকিয়া বলিলাম—শোনো এদিকে!

—কি বাবু?

—ধাইয়ের কাজ করতে পারবে?

সে হাসিয়া বলিল—ঐ কাজই তো করি বাবু। তা আর পারবো না?

আমি উহাদের সঙ্গে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। উদ্দেশ্য আমার বাসাটা তাহাকে চিনাইয়া দেওয়া; সে মাসেই আমার বাসাতে ধাত্রীর প্রয়োজন উপস্থিত হইবে। পথে মেয়েটি বলিল—দিন না বাবু একটা কাজ জুটিয়ে। বড় কষ্টে পড়িচি এনাকে নিয়ে। এক এক শিশি ওষুধ পাঁচ সিকে দেড় টাকা। আমার রোজগার বড্ড মন্দা হয়ে গিয়েচে। আর চালাতি পারচি নে। দিন একটা জুটিয়ে, যা দেবে তাই নেবো। এক কাঠা চাল, একখানা কাপড়, আর না হয় আট আনা পয়সা দেবে—তাই নেবো। আমার খাঁই নেই বাবু অন্য ধাইয়ের মত। তা বাবু আমি রাত্তিরি আঁতুড়ে থাকবো, সেঁক তাপ করবো, ছাড়া কাপড় কাচবো—

অনুনয়ের সুরে বলিল—দিন একটা কাজ জুটিয়ে—

আমি বলিলাম—ওই আমার বাসা। আর দিন আষ্টেক পরে আমার বাসাতে দরকার হবে ধাইয়ের। চলো আমার সঙ্গে, দেখিয়ে আনি। ওকে এখানে বসিয়ে রাখো।...পুরুষটিকে বলিলাম—তুমি এই গাছতলায় বসে থাকো, বুঝলে?

বাড়ীতে আনিয়া ধাইকে দেখানো হইল। কিন্তু বাড়ীতে ও ধাই পছন্দ হইল না, অজুহাত অবশ্য পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত ধাই, উহাদের কি জ্ঞান আছে—ইত্যাদি। কিন্তু আমার সন্দেহ হইল আসল কারণ, মেয়েটি দেখিতে ভাল এবং আমি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি বলিয়া।

পরদিন আবার রাস্তায় দেখা তাহাদের সঙ্গে। ডাক্তারখানায় দুজনে চলিয়াছে।

আমাকে মেয়েটি ডাকিয়া বলিল—ও বাবু, শুনুন—

আমি তাহার কিছু না করিতে পারিয়া লজ্জিত ছিলাম। বলিলাম—বলো—

—আপনার বাড়ীতে হোলো না ?

—ইয়ে—না—ওদের সঙ্গে কমলা ধাইয়ের কথাবার্ত্তা আগেই হয়ে গিয়েচে কি না! তাই—

—যাক্ গে বাবু। আপনি অন্য এক জায়গায় জুটিয়ে দিন না ?

—দেখবো। আরও এক জায়গায় সন্ধান আছে আমার।

—দেখুন। তিনিই দয়া করবেন। চরিতামৃতে প্রভু বলেচেন—

হাড়ির মেয়ের মুখে এ-কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। বলিলাম—তুমি চৈতন্যচরিতামৃত পড় ? লেখাপড়া জান নাকি ?

পুরুষ বলিল—ও জানে।

—বইখানা আছে নাকি তোমাদের বাড়ী ?

—আছে বাবু, ও রোজ পড়ে আমাকে শোনায়। বই পড়ে আর কাঁদে।

মেয়েটি সলজ্জ প্রতিবাদের স্বরে বলিল—তোমার অত ব্যাখ্যানা করতি হবে না, চুপ কর। না বাবু, ওর কথা শোনবেন না। পড়ি একটু একটু সন্দে বেলাডা। তা ও বই পড়ে বোজবার মত অদেষ্ট কি আমাদের আছে বাবু ?

—লেখাপড়া শিখলে কোথায় ?

উহার স্বামী বলিল—ওর মামার বাড়ী ছেল ধরমপুকুর। শূয়োরের ব্যবসা ছেল মস্ত। অবস্থাও ছেল ভাল। এখন তাদের কেউ নেই, মরে হেজে গিয়েচে—নইলে আজ এমন দুর্দ্দশা হবে কেন ওর বাবু ? ও ছেলেবেলায় মামাদের কাছে থেকে ইস্কুলি নেকাপড়া করেল।

—কি ইস্কুল ?

বৌটি ইহার উত্তর দিল, কারণ এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া পুরুষটির সাধ্যাতীত। অতি জটিল প্রশ্ন।

—আপার প্রাইমারি ইস্কুল বাবু।

—পাস করেছিলে ?

—হুঁ। এখানে এসে পরীক্ষা দিয়ে গিইছিলাম।

উহার স্বামী সপ্রশংস মুগ্ধ-দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—বাবু, ও পাস করে দু টাকা ইস্কলাসি পেয়েল।

বৌ ধমক দিয়া উঠিল—তুমি চুপ করো দিকিনি।

পুরুষটি তখনও ঝোঁক সামলাইতে পারে নাই। বলিল—বাবু, আমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে আর নেকাপড়া হোল না ওর। মামারাও মরে হেজে গেল। ও যেমন মেয়ে, আমার হয়েচে সেই যারে বলে—বানরের গলায় মুক্তোর মালা। সব অদেষ্টের ফল আর কি। আমি ওরে খেতি দেবো কি, আমি অসুখে পড়ে পর্য্যন্ত ওই আমারে খেতি দ্যায়। আমার এই চিকিচ্ছেপত্তর ওই সব চালাচ্চে। আজকাল রোজগার নেই ওর—পেট ভরে দুটো খেতিও

পায় না—আমারে বলে, তুমি সেরে উঠলি আমার—

বৌ আবার কড়া ধমক দিয়া উঠিল—আবার! বাবুর সামনে ওই সব কথা? চলো বাড়ী তুমি—ঝাঁটা মারবো তোমার মুখি—তোমার খুব মুরোদ! মুরোদের আবার বাখ্যানা হচ্চে—লজ্জা করে না তোমার?

আমি মধ্যস্থতা করিয়া বলিলাম—কেন, ও তো ভালই বলচে। ওর যা ভাল লেগেচে, তাল বলবে না?

বৌ সলজ্জ সুরে বলিল—না বাবু, যেখানে সেখানে ওসব কথা কে বলতে বলেচে ওকে?

—তা বলুক। কোনো দোষ হয় নি।

—বাবু, আমারে দেন একটা কাজ জুটিয়ে—

—চেষ্টা করবো। একটু অপেক্ষা করো, দেখি দু-একদিন।

—কাজ না পেলি বড্ড কষ্ট হচ্চে! ধান ভানতি শরীর আর বয় না। দু-মণ করে ধান না ভানলি এই যুদ্ধুর বাজারে দুটো লোকের খাওয়া হয়? তাও বাবু শুধু খাওয়া। পরা এ থেকে হয় না। একখানি কাপড় ঠেকেচে। একটা আঁতুড়ের কাজ জুটলি তবু একখান কাপড় পাবো।

কয়েকদিন ধরিয়া তাহাদের আর দেখিলাম না। কাজও কিছু জুটাইতে পারা গেল না। কাহার বাড়ীতে কে অন্তঃসত্ত্বা আছে এ সংবাদ যোগাড় করা আমার কর্ম নয় দেখিলাম।

এই সময় মন্বন্তর শুরু হইয়া গেল। চাউলের দাম আগুন হইয়া উঠিতেছে দিন দিন। আমাদের এই ক্ষুদ্র টাউনের আশপাশের পল্লীগ্রাম হইতে দলে দলে ক্ষুধার্ত নরনারী হাঁড়ি ও মালসা হাতে ফ্যান ভিক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে এমন হইল ফ্যানও অমিল। দশ-বিশ সের ফ্যান কোন গৃহস্থবাড়ীতে থাকে না, যাহা থাকে তাহা প্রথম মহড়াতেই ক্ষুধা-ক্লিষ্ট নর-নারীদের মধ্যে বিলি হইয়া যায়—একটু বেলায় যাহারা আসে, তাহাদের শুধু-হাতে ফিরিতে হয়। লোক দু-একটি করিয়া মরিতে শুরু করিল তাদের মধ্যে। টাউনের কুণ্ডু বাবুরা ও দাঁ বাবুরা প্রতিদিন একশত দেড়শত লোককে খিচুড়ি খাওয়াইতে লাগিলেন। কিন্তু অর্দ্ধোলঙ্গ অনশনক্লিষ্ট দিশাহারা নরনারীদের সংখ্যার তুলনায় তাহা নিতান্তই অল্প। ইহার মধ্যে আবার ত্রিপুরা জেলা হইতে বহু নরনারী আসিয়া কোথা হইতে জুটিল, তাহাদের কথা ভাল বুঝিতে পারা যায় না বলিয়া যে গৃহস্থের দোরে যায়, তথা হইতে তাহারা বিতাড়িত হয়, কোথাও তাহারা তেমন সহানুভূতি পায় না।

এই মহাদুর্য্যোগের হিড়িকে কত লোককে তলাইয়া যাইতে দেখিলাম। কতবার মনে ভাবিয়াছি ওই মেয়েটির কথা। ধান ভানিয়া রুগ্ণ স্বামীর চিকিৎসা চালাইত। নৌকা ভাড়া করিয়া হাত ধরিয়া লইয়া আসিত ডাক্তারখানায়। চৈতন্যচরিতামৃতের কথা বলিত। তাহাদের আর পথেঘাটে দেখি নাই অনেকদিন। সীতানাথ ডাক্তারকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম। সীতানাথ বলিলেন—না, তারা অনেকদিন আসে নি। আর আসবে কি, এই

তো কাণ্ড। ওষুধের দাম দিতে পারে না—ক-শিশি ওষুধের দাম এখনো বাকি।···

অনেকদিন উহাদের দেখি নাই। প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছি।

ভাদ্রমাসের দিকে আমাদের মহকুমায় রিলিফ কমিটির যত্নে লঙ্গরখানা খুলা হইল। সেখানে প্রত্যহ বহু দুঃস্থ নরনারী লঙ্গরখানায় খিচুড়ি খাইতে আসিত। উহাদের মধ্যে একদিন আবার মেয়েটিকে দেখিলাম। একটা মালসায় করিয়া লঙ্গরখানার খিচুড়ি লইয়া কোথায় যাইতেছে।

আমি ডাকিয়া বলিলাম—তুমি কোথায় এসেছিলে?

আমায় দেখিয়া সে লজ্জিত হইল।

বলিল—এই—

—তোমার স্বামী কোথায়?

—ওই পুরনো ডাকঘরের পেছনে বটতলায়। আজকাল হাটতি পারে না মোটে।

—চলো দেখে আসি।

কৌতুহল হইল দেখিবার জন্য, তাই গিয়াছিলাম। গিয়া মনে হইল না-আসিলে আমাকে বড় ঠকিতে হইত—কারণ যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা সচরাচর চোখে পড়ে না।

পুরানো পোস্টাফিসের পিছনে যেখানে গবর্ণমেণ্টের কলেরা ওয়ার্ডের ঘর, তার সামনে বট-তলায় এক ছেড়া চাটাই পাতিয়া বৌটির খোড়া স্বামী শুইয়া আছে। মনে হইল লোকটা চাটাইয়ের সঙ্গে মিশিয়া আছে, এত রুগ্‌ণ। মেয়েটি তার পাশে বসিয়া লঙ্গরখানার খিচুড়ি তাহাকে খাওয়াইতেছে। দুপুর বেলা। রাস্তা দিয়া অনেক লোক যাতায়াত করিতেছে, কেহ চাহিয়া দেখিতেছে, কেহ দেখিতেছে না। খাওয়ানো শেষ হইলে সে কলেরা ওয়ার্ডের কম্পাউণ্ডের টিউবওয়েল হইতে শতচ্ছিন্ন শাড়ীর আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া স্বামীর মুখে নিংড়াইয়া দিল। লোকটা হাঁ করিয়া দু ঢোঁক জল গিলিয়া বলিল—আর একটু খাবো—

মেয়েটি আবার গেল টিউবওয়েলের কাছে, আবার শাড়ীর আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া ওর মুখে দিল। আমি কখনো এমন দৃশ্য দেখি নাই।

বলিলাম—অমন করে জল আনচো কেন?

মেয়েটি বাঁ-হাত দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া বলিল—ঘটি-বাটি কিছু নেই। কিসে জল আনি?

—কেন মালসাটা?

সে মালসাটা তুলিয়া আমার•কাছে আনিয়া দেখাইল। বলিল—সবটা খেতে পারে নি। আধ মালসা রয়েচে। রাত্তিরে দেবো। খাওয়া কমে গিয়েচে একেবারে।

তারপর মালসাটা যথাস্থানে রাখিয়া আসিয়া বলিল—বড্ড কষ্ট হয়েচে বাবু—দিন না একটা কাজটাজ জুটিয়ে? এক কাঠা চাল শুধু—খুব কমের মধ্যে করে দেবো—

এই তাহার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ।

নদীর ধারের বাড়ী

শ্যামলীদের বাসা ছিল পীতাম্বর লেনে। ত্ নম্বর পীতাম্বর চৌধুরীর লেন। সেকেলে পুরনো বাড়ী, দোতলায় ছটি ঘরে ছটি পরিবারের বাস। কলতলায় দুটি বেলা সমানে ঝগড়া চলে জল তোলা নিয়ে। শ্যামলী ওদের মধ্যে একটু দেখতে ভাল, বয়েস তিরিশের সামান্য ওপরে, দু-এক বছর ওপর। চার সন্তানের মা, দুটি মেয়ে, দুটি ছেলে।

বেলা দশটা বাজে।

শ্যামলীর স্বামী খেতে বসেচে। শ্যামলী ডালের বাটিতে হাতা ডুবিয়ে সামনে বসে আছে।

শ্যামলী বললে—ফিরবে কখন ?

শ্যামলীর স্বামীর নাম যদুনাথ ভট্টাচায্য। যদুনাথ একটা সওদাগরি আপিসে সত্তর টাকা মাইনের চাকুরী করে। যুদ্ধের বাজারে তাতে চলে না। খাওয়া-দাওয়ার অসীম কষ্ট। ছেলেমেয়েগুলো দুধ খেতে পায় না ; দুটো শুকনো মুড়ি চিবোয় স্কুল থেকে এসে।

যদুনাথ বললে—ফিরতে সাতটার পরে।

—আর একটা বাড়ী ছাখো, বুঝলে।

—সে তো বুঝলাম, বাড়ী মিলচে কই ? খুঁজতে কি কম করচি ?

—এ বাড়ীতে আর টেঁকা যায় না।

—কালও ঝগড়া হয়েছিল ?

—কবে না হয় ? বিশ্বেস-গিন্নীর সঙ্গে মতির মা-র ঝগড়া কালও খুব। অতদার সঙ্গে শ্যামবাবুর বৌয়ের ঝগড়া।

—জল তোলা নিয়ে ?

—তা আবার কি নিয়ে ? ও তো রোজকার ঘটনা লেগেই আছে। রোজ রোজ এ ইতরামি আর ভাল লাগে না। অসহ্য হয়ে উঠেচে।

যদুনাথ চলে গেল। শ্যামলীর ছেলেমেয়েরা খেয়ে দেয়ে স্কুলে চলে গিয়েছিল ; ছেলে দুটি বড়, তারা হাই-স্কুলে পড়ে। মেয়ে দুটি পড়ে মোড়ের কর্পোরেশন স্কুলে। ছোট রান্নাঘর, একটি লোক কায়ক্লেশে বসে দুটি আহার করতে পারে। আজ ন'টি বছর এ বাসায়, বড় মেয়ে লীলার বয়েস। এই বাসাতেই লীলার আঁতুড় হয়েছিল। রান্নাঘরের সামনে খোলা ড্রেনে তরকারির খোসা, ফেন, শাকের ডাঁটা, চিংড়ি মাছের খোসা জমে দুর্গন্ধ বার হচ্চে। এই দুর্গন্ধ আর এই কুশ্রী দৃশ্য আজ ন' বছর ধরে সহ্য করতে করতে নাক অসাড় হয়ে গিয়েচে, এখন আর দুর্গন্ধকে দুর্গন্ধ বলে মনে হয় না।

বীণা ওপরের তলার মনোরঞ্জনবাবুর মেয়ে। সে শ্যামলীকে ভালবাসে। কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললে—কাকীমা কি রাঁধলে ?

—মুসুরির ডাল আর চচ্চড়ি।

—মাছ আনেন নি কাকাবাবু ?

—নাঃ। দু টাকা চিংড়ি মাছের সের। মাছ আর কি কেনবার জো আছে? উনি গিয়ে ফিরে এলেন।

—এবার রেশনের চালে কাঁকর খুব কম, কাকিমা। আপনারা রেশন আনেন নি?

—বুধবার আসবে রেশনে। এখনো আনা হয় নি। তোমার কাকা যেতে সময় পান নি।

বিকেলে কলে জল আসতেই ওপরের ভাড়াটে গিন্নীরা বড় এক এক বালতি ঘড়া বসিয়ে দিলেন কলের মুখে। একজন একটা তুলে নিয়ে যায় তো আর একজনে একটা বসায়—এই জন্যে চৌবাচ্চায় মোটে কয়েক ইঞ্চির বেশি জল জমতে পায় না। গা ধোবার কি কষ্ট বিকেলে। এই গুমট গরমে স্নিগ্ধ জলে স্নান করতে পারলে কি আনন্দই পাওয়া যেতো। কিন্তু তা হওয়ার জো নেই। এক একজন ছোবড়া আর সাবান নিয়ে নামবে ওপর থেকে, আধ ঘণ্টা ধরে থাকবে। প্রথমে নামবে অভয়া, তারপর নামবে মতির দিদি, এরা দুজনেই ভীষণ ঝগড়াটে। যতক্ষণ তারা কলতলায় গা ধোবে, ততক্ষণ কলে এক ঘটি জল কারো নেবার জো নেই—তাহলেই বাধবে ধুন্দুমার ঝগড়া।

অভয়া বাঙাল দেশের মেয়ে। বেশ সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী। শ্যামলীকে ডেকে বললে—ও দিদি কি হচ্চে?

—কুটনো কুটচি ভাই।

—কি কুটনো?

—ঝিঙে আর ঢেঁড়স। আলু তো বারো আনা সের উঠেচে। আমাদের সাধ্যিতে কুলোলে তো কিনবো!

—রেশন এসেচে?

—না ভাই, বুধবারে আসবে।

—আমায় আধপোয়া চিনি দিতে পারবে দিদি তোমাদের রেশন থেকে?

—আসুক আগে, দেখবো এখন।

এদের মধ্যে সবাই সমান অবস্থার মানুষ। কেরানীর বৌ। পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া দ্বন্দ্ব করে এদের দিন কাটে। পান থেকে চুন খসলেই আর নিস্তার নেই। বিশ্বাস গিন্নী দলের মোড়ল, ওপরের ভাড়াটেদের সর্দ্দার। তিনি সকলের হয়ে ঝগড়া করতে এগিয়ে আসেন। তাঁর সর্দ্দারিতে ওপরের মেয়েরা কোমড় বাঁধে, তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে এই অভয়া। দেখতে সুন্দরী হলে কি হবে, যেমনি স্বার্থপর তেমনি কুটিল মন। এই যে বললে-চিনি দিতে হবে, 'না' বললে আর রক্ষে আছে? কোন কালে এক বাটি নুন ধার দিয়েছিল, সেই ঘটনার উল্লেখ করে খোঁটা দিয়ে বলবে, বরিশালের টানে—আমরা কি কোনদিন কিছু কাউকে দিই নাই কি! সময়ে অসময়ে নুন রে—তেল রে—তা নিয়ে মনে থাকবে ক্যানে? ঘোর কলি যে! কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরালে পাজি—আচ্ছা আমরাও কি আর কখনো কাজে লাগবো না। তখন যেন—ইত্যাদি।

এই বাসাটাতে কি গুমট গরম। দক্ষিণ দিক চাপা, এতটুকু হাওয়া আসে না, প্রাণ

আইঢাই করে গরমে। আজ ন বছর কষ্টভোগ চলচে। এই ঝগড়ার আবহাওয়া আর এই দারুণ স্থানাভাব। সকলের ওপরে এই অপরিষ্কার, নোংরা পরিবেশ। সবাই সমান অশিক্ষিতা, ভাল বললেও এ বাড়ীতে মন্দ হয়। সেদিন অপরাধের মধ্যে ও শশীবাবুর স্ত্রীকে বলেছিল—দিদি, চিংড়ি মাছের খোসাগুলো একেবারে সামনেই ফেললেন, কলতলায় সকলেরই যেতে আসতে হয়—সকলেরই তো অসুবিধে।

আর যাবি কোথায়! শশীবাবুর বৌ চীৎকার জুড়ে দিলে—আমি কি একলা ফেলি নাকি, সবাই তো ফেলে, কেনই বা না ফেলবে ; ভাড়া দিয়ে সবাই বাস করে, কারো একার সম্পত্তি তো নয় ; সবারই সুবিধে এখানে দেখতে হবে—যদি তাতে অসুবিধে হয় তবে গরীব ভাড়াটেদের সঙ্গে বাস করা কেন, তাহলে দোতলা বাড়ী আলাদা ভাড়া নিয়ে বালিগঞ্জে গিয়ে বাস করলেই তো হয়—ইত্যাদি।

শ্যামলীও চুপ করে থাকবার মেয়ে নয়, সে বললে—দিদি, কি পাগলের মত বকচেন ? আপনি চিংড়ি মাছের খোসা ফেলবেন তাতে কেউ বারণ করচে না, তবে আমারই রান্নাঘরের সামনে কেন ফেলবেন ? কেন আমি তা ফেলতে দেবো ?

—ফেলতে দেবে না তোমার কথায় ? কি তুমি এমন লাট সায়েব এয়েচ রে বাপু। তুমি পাগল না আমি পাগল ? রান্নাঘরের বাইরের জায়গা তোমারও যা, আমারও তা—তুমি বলতে আসবার কে ?

—তা বলে পরের সুবিধে অসুবিধে যারা না দেখে তারা আবার মানুষ ? তাদের আমি ঘোর অমানুষ বলি।

এই পর্য্যন্ত গেল সাধারণ ভাবের কথা, একে ঝগড়া বলে অভিহিত করা যায় না। এর পর বাধলো আসল ঝগড়া যার নাম—। শ্যামলীও ছাড়লে না, শশীবাবুর বৌও না—উভয়পক্ষে বাধলো কুরুক্ষেত্র। তারপরে কথা একদম বন্ধ হয়ে গেল দুপক্ষেই। নানারকম শত্রুতা আরম্ভ করলেন শশীবাবুর প্রৌঢ়া স্ত্রী। ছেলেমেয়ের হাত ধরে খোলা ড্রেনে বসিয়ে দিতে লাগলেন সকালবেলা, পায়খানা থাকা সত্ত্বেও। প্রায় শ্যামলীর রান্নাঘরের সামনেই। কিছু বলবার জো নেই। ওই আর এক গোলমাল। একটি মাত্র পায়খানা নিচে। মেয়ে পুরুষ তাতে যাবে। কি নোংরা করেই রাখে মাঝে মাঝে। ভোরে অন্ধকার থাকতে যদি ঘুম ভাঙে, তবে কল পায়খানা ব্যবহার করা যাবে সেদিন, নয়তো বেলা এগারোটা, পুরুষরা সবাই আপিসে বেরিয়ে গেলে। চৌবাচ্চায় তখন দু' ইঞ্চি মাত্র জল থাকে কোনোদিন, কোনোদিন তারও কম।

শ্যামলীর দম বন্ধ হয়ে আসে।···

এমন কি কোনো বাসা পাওয়া যায় না যাতে অন্ততঃ মেয়েদের একটা আলাদা নাইবার জায়গা আছে ?···

আষাঢ় মাসের প্রথম।

ফিরিওয়ালা গলির মধ্যে হাঁকচে—চাই ল্যাংড়া আম—ল্যাংড়া আ-আ-ম—

বৃষ্টি এখনও নামে নি এবার। জ্যৈষ্ঠ মাসের গরম প্রায় সমান ভাবেই চলচে। মতির ছোট বোন এসে বললে—দশ পলা তেল ধার দেবেন কাকিমা?

শ্যামলী বললে—হবে না। তেল নেই।

—আট পলাও হবে না?

—কিছু নেই।

মেয়েটা চলে গেল। শ্যামলী তেল দেবে কি, ওদের কোন আক্কেল নেই। শ্যামলী কি সাধে রিক্ত হয়েচে? উনি খারাপ কলের তেল খেতে পারেন না বলে এক নম্বর কানপুর কিনে আনেন ওঁর আপিসের রেশন বেচে। সে কী ঝাঁজওয়ালা তেল। মতিরা এক কৌশল ধরেচে কি, বিশ পলা সেই ভাল তেল হপ্তায় ধার নেবে, আর ধার শোধ দেবে পাঁচ সিকে সেরের কলের তেল দিয়ে। উনি বলেন, ও তেল খেলে বেরিবেরি হয়। শ্যামলীদের কি হপ্তায় বিশ পলা তেল অপব্যয়ে যায়।

ওরা চালাক আছে। একবার নেবে দশ পলা, তারপর আর একদিন এসে দশ পলা। এক-সঙ্গে নেবে না। একেবারে যেন মৌরসী পাট্টা করে বসেচে।···দেবো না তেল, রোজ রোজ ও চালাকি খাটবে না আমার কাছে। দেখি কি হয়।

কিন্তু মতির মায়ের কৌশল অন্যরকম। সে এতটুকু চটলো না, আবার একবার বাটি হাতে এসে হাজির স্বয়ং মতির মা।

—ও শ্যামলী, দে দিকি ভাই একটু তেল।

—তেল নেই দিদি।

—দিতেই হবে। মাছ ভাজা হচ্চে না, পাঁচ পলা তেল দে—

—যা আছে আমারই কুলোবে না দিদি—

—দেখি তোর তেলের বোতল? দে ভাই আমায় পাঁচ পলা—

অগত্যা শ্যামলী উঠে গিয়ে তেল দেয়, ও আবার পরের কাঁদুনি-মিনতি বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারে না। ঠকচে তো দেখাই যাচ্চে, ঠকুক। লোকে তাতে খুশী হয়, হোক।

কিন্তু এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে দোতলার ভাড়াটেদের মধ্যে মহা ঘোঁটমঙ্গলের সৃষ্টি হোল। মতির মা গিয়ে সাতখানা করে লাগিয়েচে তাদের কাছে।···তেল থাকতেও দিতে চাচ্ছিল না, বোতল দেখতে চাইলুম, তাই তো দিলে। এমন ছোট নজর তো কখনো করতে পারি নে আমরা। এই যে সেদিন বোশেখ মাসে ওঁর পেটের ব্যথা ধরলো রাত্তিরে, যদুবাবু সোডা চেয়ে নিয়ে যান নি আমাদের এখান থেকে। দিই নি আমরা? লোকের কাছে হাত পেতে যেমন নিতে হয়, তেমনি দিতেও হয়। তবে লোকে মানুষ বলে।

তার পরের দিন আর কলতলায় যাওয়া যায় না। বড় বড় বালতি, ঘড়া আর টব পড়লো একের পর এক সকাল থেকে। সে সব সরিয়ে এক বালতি রান্নার জল নিতে গেলেও ঝগড়ায় মুখর হয়ে উঠবে সারা বাড়ীটা—সেকথা শ্যামলী ভাল রকমেই জানে। অনেকবারের

অভিজ্ঞতায় জানে। সুতরাং আষাঢ় মাসের গুমট গরমে বেলা এগারোটা পর্য্যন্ত তাকে অস্নাত অবস্থায় থাকতে হোল। এগারোটার পর কলের জল কখন চলে গেল। যখন সে নাইতে গেল, তখন চৌবাচ্চায় ইঞ্চি চারেক মাত্র জল। কাকের মুখ থেকে তার মধ্যে পড়েচে ভাত।

এই সময়ে একদিন যদুবাবু এসে বললেন, ওগো শোনো, একটা সন্ধান পেয়েচি। রাণাঘাট থেকে নেমে যেতে হয় প্রায় এগারো মাইল উত্তরে, বল্লভপুর বলে পাড়াগাঁ। সেখানে কলকাতার এক বড়লোকের জমিদারি কাছারি ছিল, বিক্রি করে ফেলেছে। মাঝে মাঝে যেতো বলে কাছারিবাড়ীর সংলগ্ন দোতলা বাড়ী তৈরি করেছিল, ওপরে নিচে পাঁচখানা ঘর, বারান্দা, রান্নাঘর, নাইবার ঘর সব আছে। দশ বিঘে জমির ওপর কাছারি বাড়ী, তাতে আম, কাঁঠালের গাছ, কলাগাছ আছে। বাড়ীর সেই জমির নিচে দিয়ে একটা ছোট নদী বয়ে যাচ্চে, তাতে জমিদার বাঁধানো ঘাটলা করে দিয়েচেন, বাড়ীর মেয়েরা যখন গিয়ে থাকতো তাদের নাইবার সুবিধার জন্যে। সবসুদ্ধ তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার টাকা হোলে বাড়ীটা পাওয়া যায়—জমিসুদ্ধ—কিনবো? প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকা সব যদি তুলে নিই—

—অত কমে হবে?

—পাড়াগাঁ। কে সেখানে খদ্দের হচ্চে? যদ্দুর শুনলাম, চাষা গাঁ। গাঁয়েও অত টাকা দিয়ে কেনবার লোক নেই।

—টাকা দেবে কোথা থেকে?

—প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা সব তুলে নিই। তোমার গহনা কিছু দাও আর ইনসিওরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে কিছু ধার করি। আমার কাছেও সামান্য কিছু আছে।

শ্যামলীর মন নেচে উঠলো। কতদিন সে পাড়াগাঁয়ের মুখ দেখে নি। বাপের বাড়ী ছিল হুগলী জেলার তারকেশ্বর লাইনে দাসপুর গ্রামে। সে বংশে বাতি দিতে কেউ নেই। জ্ঞাতি কাকারা পর্য্যন্ত উঠে এসে কলকাতায় বাস করচেন, ঘোর ম্যালেরিয়া, চলে না সেখানে থাকা।

যদি এ সম্ভব হয়।

ভগবান কি এত দয়া করবেন? তা কি তার কপালে সম্ভব হবে?

শ্যামলী বললে—কিন্তু তুমি কোথায় থাকবে?

—কেন, সেখানে।

—আপিস?

—চাকুরি ছেড়ে দেবো। একঘেয়ে হয়ে গিয়েচে এ জীবন। আর ভাল লাগে না। স্বাস্থ্য যেতে বসেচে। একটু সাহস করে দেখি, যা আছে কপালে। ওখানে জায়গা জমি নিয়ে চাষবাস করবো।

—ছেলে দুটোর লেখাপড়া?

—রাণাঘাটে বোর্ডিংয়ে থাকবে। সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে এখন। আর এ যা লেখাপড়া

শিখচে, এ শিখে তো কেরানী হবে ? তার চেয়ে ভাল কাজ ওখানে শিখতে পারবে। বিলেত থেকে লোক গিয়ে আমেরিকায় বাস করে আমেরিকা যুক্তরাজ্য স্থাপন করেছিল। অজানায় পাড়ি না দিলে মানুষ, মানুষ হয়ে ওঠে না। জীবন উপভোগই যদি না করলুম, বেঁচে থেকে কি হবে ? গ্রামের লোকদের কাছে দুটো ভাল কথা বলবো। নাইট স্কুল করবো। বই পড়তে শেখাবো। এ আমার অনেক দিনের ইচ্ছা।

স্বামী-স্ত্রীতে মিলে সারা বিকেল আর রাত ধরে পরামর্শ হোল। শ্যামলীর চোখে রঙীন স্বপ্ন ভেসে উঠেচে—দূরের-পাখী-ডাকা ফুল-ফোটা সুমুখ জ্যোৎস্না রাত্রির প্রহরগুলি। কত অলস মধ্যাহ্নে বনানীকোলে ঘুঘুর ডাক শোনা—বিছানায় আধ-জাগরিত আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় শুয়ে শুয়ে ! কত আম্রমুকুলের গন্ধে সুবাসিত সকাল-সন্ধ্যা।

দিন পনেরো পরে।

যদুবাবুর সঙ্গে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক শ্যামলীদের বাসায় ঢুকলেন। যদুবাবু বললেন, উনি এখানে খাবেন।

শ্যামলীকে আড়ালে বললেন—উনি ওদের স্টেটের নায়েব, ওঁরও নাম যদুবাবু। তবে উনি কায়স্থ। আমাকে বলে কয়ে উনিই বাড়ী দেওয়াচ্ছেন। অতি ভদ্রলোক। একটু ভাল করে খাওয়াও দাওয়াও। সাড়ে তিনের মধ্যে হয়ে যাবে, আর সেই সঙ্গে জমিদারের খাস কিছু রোয়া ধানের জমি আছে, সেটাও ওই সঙ্গে হয়ে যাবে।

আহারাদির পরে ভদ্রলোক অনেকক্ষণ কি পরামর্শ করলেন যদুবাবুর সঙ্গে। তারপর চা খেয়ে বিদায় নিলেন। এর তিনদিন পরে শ্যামলীকে যদুবাবু বললেন, বাড়ী রেজেষ্ট্রি করা হয়ে গিয়েচে।

আষাঢ় মাসের শেষের দিকে জিনিসপত্র গুছিয়ে শ্যামলীরা তাদের নতুন কেনা বাড়ীতে বাস করতে চললো। কলকাতার বাসা একেবারে উঠিয়ে দিলে না, কিছু কিছু জিনিসপত্র ঘরে রেখে ঘর চাবিবন্ধ করে গেল।

রাণাঘাট থেকে ট্রেন বদলে ওরা বেলা দশটার সময় বনগাঁ লাইনের গাংনাপুর স্টেশনে নামলো। আগে থেকে বন্দোবস্ত করার ফলে বল্লভপুর গ্রামের একখানা গরুর গাড়ী স্টেশনে উপস্থিত ছিল।

মাঠ ও বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এ গ্রাম ও গ্রাম পেরিয়ে চললো গাড়ী। বেলা প্রায় তিনটের সময় সামনের একটা ঝাঁকড়া বটগাছ দেখিয়ে গাড়োয়ান বললে—ওই বুঁদীপুরের বনবিবিতলা দেখা যাচ্চে—ওর পরেই বল্লভপুর।

শ্যামলীর বুক দুলে উঠলো। কি জানি কেমন হবে এত আশা-সুখে কেনা বাড়ীটা, কেমন হবে সেখানকার জীবনযাত্রা ! জানাকে ফেলে অজানাকে তো আঁকড়ানো হোল চোখ বুজে, এখন সেই অজানার প্রকৃতি কি, সেটা এখুনি তো বোঝা যাবে আর একটু পরেই। কি গিয়ে দেখবে যে সেখানে, কি জানি ? সর্বস্ব খুইয়ে তার বিনিময়ে কেনা।

ক্রমে আরও আধঘণ্টা কেটে গেল। বেলা বেশ পড়ে এসেচে। এমন সময় গাড়োয়ান বললে—এই যে বাবু বাড়ীর সামনে এসে গিয়েছে গাড়ী। নামুন মা-ঠাকরুন এবার।

দুরু দুরু বক্ষে শ্যামলী নামলো সকলের আগে। যদুবাবু বললেন—না দেখে বাড়ী কেনা। এতগুলো টাকা—বলতে গেলে সর্বস্ব খুইয়ে—এই দূর গাঁয়ে বাড়ী কেনা। তুমি আগে নেমে বাড়ীতে ঢোকো। মেয়েরা ঘরের লক্ষ্মী কিনা, তুমি আগে ঢোকো। আমার তো সাহস হচ্চে না, কি জানি কি রকম হবে! নামো আগে।

—হ্যাগো বাড়ী কি পরিষ্কার করা আছে, না একগলা ধুলো আর মাকড়সার জাল আর চামচিকের বাসা। গিয়ে এখন ঝাঁট দিতে হবে? চাবি কোথা?

গাড়োয়ান শুনতে পেয়ে বললে—মা ঠাকরুন, বাড়ীতেই আছে মুক্তোর মা গয়লানী আর তার ছেলে। তারাই বাড়ী দেখাশুনো করে, নিচের একটা ঘরে আছে। চাবি তো নেই, বাড়ী খোলাই পড়ে আছে।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একটা বাঁশঝাড়ের আড়ালে একেবারে শ্যামলীর সামনেই যে বাড়ীটা পড়লো, সেটা দেখে সে আনন্দে ও বিস্ময়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এই বাড়ী তাদের! এমন বাড়ী এই অজ পাড়াগাঁয়ে!

কলকাতায় এমনি হলদে রঙ-করা সবুজ রঙের জানালা খড়খড়িওয়ালা দোতলা বাড়ী দেখেচে—দোতলাও নয়, বাড়ীটা তেতলা—কিন্তু এমন বাড়ীটা সত্যিই তাদের নিজস্ব!

শ্যামলী আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে বললে—ওগো দ্যাখো, এসে দ্যাখো—

পরক্ষণেই ওর লজ্জা হোল। গাড়োয়ানটা না জানি কি আদেখ্‌লেই মনে করলে ওকে। ততক্ষণে যদুবাবু ও ছেলেমেয়েরা বাঁশঝাড়ের মোড় ছাড়িয়ে বাড়ীর কাছে এসে গিয়েচে। যদুবাবু বললেন—বাঃ, বেশ—বেশ—

রাস্তায় আসতে গাড়োয়ানকে যদুবাবু বাড়ীর কথা বহুবার জিজ্ঞেস করেছিলেন। সে বলেছিল—চমৎকার বাড়ী বাবু। কলকাতার বাবুরা থাকবার জন্যি করেলেন। তেতলা বাড়ী, দরাজ জায়গা, নদীর ধারে বাঁধাঘাট আছে, ফল পাকড়ের গাছ। দ্যাখবেন বাড়ীর মত বাড়ী!

কিন্তু ছোটলোকের সে কথায় আস্থা স্থাপন করতে পারে নি শ্যামলী বা তার স্বামী। এখন বাড়ীটা দেখে মনে হোল গাড়োয়ান অনেক কমিয়ে বলেছিল। বাড়ীটা সম্বন্ধে আসল কথা হচ্চে অনেকখানি ফাঁকা জায়গার মধ্যে বাড়ীটা দাঁড়িয়ে, অথচ ঠিক পাশেই গ্রামের বসতি।

বনানীর ও মাঠের সবুজের মধ্যে হলদে রঙের বাহার।

ওরা হুড়মুড় করে সবাই গিয়ে বাড়ী ঢুকলো। নিচের ঘরে গিয়ে দেখলে সেখানে এক বুড়ি মাদুরের ওপর ঘুমিয়ে আছে। শ্যামলী ডাকলে—ও ঝি—কি যেন নাম ওর—মুক্তোর মা? ও মুক্তোর মা—

বুড়ি ধড়মড় করে জেগে উঠে বসলো। তারপর ঘুমজড়ানো চোখে ওদের দিকে খুব

সামান্য একটুখানি চেয়ে থেকে তাড়াতাড়ি মাদুর ছেড়ে উঠে এসে শ্যামলীর পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করে বললে—পোড়াকপাল আমার মা, ঘুমিয়ে পড়িচি এই অবেলায়। বেন্‌বেলা থেকে ওপরে নিচে সব ঘর ধোলাম, পোঁছলাম, ছাদ ঝাঁট দেলাম, বলি মা ঠাকরুনরা আসচেন, বাবু আসচেন—তা ছাদ তো নয় গড়ের মাঠ, এই হাতির মত বাড়ী ধোয়ানো সামলানো কি এক দিনের কম্মো? আসুন মা ঠাকরুন, আসুন বাবা—

শ্যামলী বললে—তোমার নাম মুক্তোর মা?

—বলে সবাই। বলো না, অদেষ্টের মাথায় মারি সাত খ্যাংরা। নামটাই আছে বজায়, যার জন্যি সে আর নেই। তা হলি কি আজ আমার ভাবনা—

শ্যামলীর ওসব কথা ভাল লাগছিল না। তার ইচ্ছে হচ্ছিল এক দৌড়ে বাড়ীটার ওপর নিচে সব দেখে আসে। কিন্তু কী মনে করবে এরা। কী মনে করবে মুক্তোর মা।

ওরা সবাই মিলে নিচের ঘরগুলো দেখলে। বড় বড় দুটো ঘর, প্রশস্ত থামওয়ালা ঝিলিমিলি বসানো বারান্দা, ওদিকে অন্য একটা ছোট রোয়াকের সামনে রান্নাঘর। শ্যামলীর বড় ছেলে কানাই বললে—মা, এ তো রান্নাঘর নয়, এ আমাদের কলকাতার বাসার ঘরের চেয়েও অনেক বড়। দ্যাখো কেমন আলমারি দেওয়ালের গায়ে?

বড় মেয়ে ডলি বললে—কতগুলো জানলা দ্যাখো মা রান্নাঘরে!

ওপরে সিঁড়ি বেয়ে দুড়দুড় করে সবাই উঠলো। শ্যামলী বললে—ওগো, দ্যাখো কি সুন্দর মেজে। কাঁচে শার্সি বসানো জানলা!

কানাই ও ছোট ছেলে বলাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললে—কি সুন্দর সিনারি, দেখে যাও মা বারান্দা থেকে—ওই তো মাঠটার পরেই কেমন সুন্দর ছোট্ট নদীটা, ওপারে সবুজ মাঠ, কেমন ঝোপ আর বাবলা গাছ, গরু চরচে—ও কি ফুল ফুটেচে ওপারের ক্ষেতে বাবা?

যদুবাবু বললেন—ও ঝিঙের ফুল। বর্ষাকালে সন্দের সময় ঝিঙের ফুল ফোটে কিনা! সত্যি, ভারি সুন্দর সিনারিই বটে, ওগো, দ্যাখো ইদিকে এসে! কি ফাঁকা!

শ্যামলী বললে—তেতলার ঘরটা দেখে আসি চলো।

তেতলার ঘরটি অপেক্ষাকৃত ছোট। কিন্তু খুব বড় বড় তিনটি জানালা তিনটি দেওয়ালে। রাঙা মাটির পালিশ করা মেজে। দরাজ ছাদ, ছাদের ওপর থেকে বহুদূরব্যাপী মুক্ত মাঠের সবুজ বাণী এই আষাঢ় সন্ধ্যায় ওদের অন্তর স্পর্শ করলে। শ্যামলীর চোখে জল এলো। এ যে রূপ-কথার রাজবাড়ী তার কাছে, সে গরীব ঘরের মেয়ে, গরীব ঘরের বৌ, কলকাতার বাসার অন্ধকূপে আজীবন কাটিয়ে আজ কি ভাগ্যে এমন বাড়ীঘর নিজের মনে করবার অধিকার পেল। কানাই ইতিমধ্যে ছুটে এসে বললে—বাঁধাঘাট দেখে এলাম মা। একটু ভেঙে ভেঙে চটা উঠে গিয়েচে চাতালের। তবুও দিব্যি আরামে নাইতে পারবে। ওই তো—দেখা যাচ্চে—এই উঠোনটা পার হয়েই—

যদুবাবু বললেন—নাঃ, সাড়ে তিন হাজার টাকা নিক। জিনিসের মত জিনিস। বাড়ীর মত বাড়ী। ছেলেপুলে নিয়ে দরাজ জায়গায় বাস করো। এই তো পাশেই গাঁয়ের কি

পাড়া। ডাক দিলেই লোক পাবে। কোনো ভয় নেই। আমি এখানেই একটা কিছু করবো। এত লোকের চলচে আর আমার চলবে না? খুব চলবে। তোমরা দাঁড়াও জিনিসপত্তর সব ওপরে নিয়ে আসি। কি কি গাছ আছে মুক্তোর মা?

মুক্তোর মা বললে—তিনাট আমগাছ আছে, সাতটা কাঁটাল গাছ, একটা পেয়ারা গাছ, একটা চালতে গাছ, একটা বিলিতি কুলগাছ, দুঝাড় কলাগাছ, চারটে নারকোল গাছ। বাবুরা নিজির হাতে সব লাগিয়েছিল, থাকবে বলে। শখ করে কলকেতা থেকে চারা এনে এই ওবছর ওই হাখো একটা চাঁপাফুল গাছ বসিয়ে গিয়েচে।

একটু পরে সন্ধ্যা হয়ে অন্ধকার নামলো। শ্যামলীর দুঃখ হোল, এখন আর কিছু দেখা যাবে না। নতুনতর জীবনযাত্রার পথে নতুনতর দেশের প্রতি-পথঘাট চিনে নেওয়া যেতো, ভাল করে দেখা যেতো আলোভরা দিনমানে।

শ্যামলী তাড়াতাড়ি লণ্ঠন জ্বাললে। ডাকলে—মুক্তোর মা, ও মুক্তোর মা—

মুক্তোর মা মালপত্র গাড়ী থেকে নামিয়ে এনে দোতলায় তুলছিল। বললে—কি মা?

—জল আছে বাড়ীতে?

—জল তুলে রেখেচি একটা বালতিতে, আর তো পাত্তর নেই মা তাই তুলতে পারি নি—

—সে কথা বলচি নে, বাড়ীতে জল আছে? কুয়োটুয়ো—

—বাঁধানো পাতকুয়ো আছে। নাওয়ার ঘর আছে, রান্নাঘরের পেছনে। চলুন, আমি দেখিয়ে দি। বাবুদের বাড়ী কোন ত্রুটি ছিল না মা, আগাগোড়া সান বাঁধানো। চৌবাচ্চা আছে বাঁধানো।

—তাতে জল তুলে রাখো নি?

—নাইবেন যদি তবে পাতকুয়োর জলে কেন মা? দিব্যি বাঁধানো নদীর ঘাট, অসাগর জল নদীতে। এখন জোয়ার এসেচে, সব পৈঠেগুলো ডুবে গিয়েচে। চলুন গা ধুয়ে আসবেন।

শ্যামলী নদীর ঘাটেই নাইতে গেল। ঘাটের ঠিক পাশে কি একটা বড় প্রাচীন গাছ। তার ছায়া পড়েছে বাঁধাঘাটের পৈঠেগুলোতে। কি একটা পুষ্পের সুবাস বাতাসে ভুরভুর করচে। এই গাছ থেকেই আসচে।

—কি ফুলের গন্ধ মুক্তোর মা?

—কি একটা লতা এই গাছে উঠেচে মা, কাল সকালে দেখবেন সাদা সাদা ফুল ফুটেচে। ভারি বাস বেরোয় রাত্তিরি।

শ্যামলী জলে নামলো। আজ সে রূপকথার রাজকন্যে। স্নিগ্ধ জল, ওপারের দিক থেকে হাওয়া বইচে। সেই ফুলের সুগন্ধ। তারাভরা আকাশ। এই বাঁধা ঘাট, এই প্রাচীন কি বনস্পতি, এই বনপুষ্প-সুবাস—সব তাদের, নিজস্ব। তারা পয়সা দিয়ে কিনেচে। কলকাতার সেই পচা ড্রেন, কলতলা, অভয়া, বিশ্বাস গিন্নি সব স্বপ্ন হয়ে গিয়েচে একদিনে। তাদের জন্যেই সত্যি কষ্ট হোল। বেচারী মতির মা। বেচারী শশীবাবুর বৌ। ওদের একবার এখানে

আনতে হবে। না, এও স্বপ্ন, এখনো যেন বিশ্বাস হয় না এত সৌভাগ্য।

ডলি চেঁচিয়ে ডাকচে দোতলার বারান্দা থেকে—ওমা, শীগগির গা ধুয়ে এসো—বাবা চা চাইচে—এসো চট করে—

শ্যামলী স্বপ্নলোক থেকে নেমে এল। সাবানের বাক্সটা নেই। আনতে ভুলে গিয়েচে তাড়াতাড়িতে।

—মুক্তোর মা, ছুটে যাও বড়দিদিকে বলগে যাও, ছোট তোরঙ্গের মধ্যে সাবানের বাক্সটা আছে, দিতে।

বিপদ

বাড়ী বসিয়া লিখিতেছিলাম। সকাল বেলাটায় কে আসিয়া ডাকিল—জ্যাঠামশাই ?…

একমনে লিখিতেছিলাম, একটু বিরক্ত হইয়া বলিলাম—কে ?

বালিকা-কণ্ঠে কে বলিল—এই আমি, হাজু।

—হাজু? কে হাজু?

বাহিরে আসিলাম। একটি ষোল সতেরো বছরের, মলিন বস্ত্র পরনে মেয়ে একটি ছোট ছেলে কোলে দাঁড়াইয়া আছে। চিনিলাম না। গ্রামে অনেকদিন পরে নতুন আসিয়াছি, কত লোককে চিনি না। বলিলাম—কে তুমি ?

মেয়েটি লাজুক সুরে বলিল—আমার বাবার নাম রামচরণ বোষ্টম।

এইবার চিনিলাম—রামচরণের সঙ্গে ছেলেবেলায় কড়ি খেলিতাম। সে আজ বছর পাঁচ ছয় হইল ইহলোকের মায়া কাটাইয়া সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছে সে সংবাদও রাখি। কিন্তু তাহার সাংসারিক কোনো খবর রাখিতাম না। তাহার যে এতবড় মেয়ে আছে, তাহা এখনই জানিলাম।

বলিলাম—ও! তুমি রামচরণের মেয়ে ? বিয়ে হয়েছে দেখছি। শ্বশুরবাড়ী কোথায় ?

—কালোপুর।

—বেশ বেশ। এটি খোকা বুঝি ? বয়েস কত হলো ?

—এই দু বছর।

—বেশ। বেঁচে থাক। যাও বাড়ীর মধ্যে যাও।

—আপনার কাছে এইচি জ্যাঠামশাই। আপনি লোক রাখবেন ?

—লোক ? না, লোক তো আছে গয়লা বৌ। আর লোকের দরকার নেই তো। কেন ? থাকবে কে ?

—আমিই থাকতাম। আপনার মাইনে লাগবে না, আমাদের দুটো খেতে দেবেন।

—কেন তোমার শ্বশুরবাড়ী ?

মেয়েটি কোনো জবাব দিল না। অত শত হাঙ্গামাতে আমার দরকার কি? লেথার দেরি হইয়া যাইতেছে। সোজাসুজি বলিলাম—না, লোকের এথন দরকার নেই আমার।

তারপর মেয়েটি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল এবং পরে শুনিলাম সে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল। চাল লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

মেয়েটির কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, হঠাৎ একদিন দেখি, রায়েদের বাহিরের ঘরের পৈঠায় বসিয়া সেই মেয়েটি হাউহাউ করিয়া এক টুকরা তরমুজ থাইতেছে। যে ভাবে সে তরমুজের টুকরাটি ধরিয়া কামড় মারিতেছে, 'হাউহাউ' কথাটি সুষ্ঠু ভাবে সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং ঐ কথাটাই আমার মনে আসিল। অতি মলিন বস্ত্র পরিধানে। ছেলেটি ওর সঙ্গে নাই। পাশে পৈঠার উপরে দু-এক টুকরা পেঁপে ও একথণ্ড তালের গুড়ের পাটালি। অনুমানে বুঝিলাম আজ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে রায়-বাড়ী কলসী-উৎসর্গ ছিল, এসব ফলমূল ভিক্ষা করিতে গিয়া প্রাপ্ত। কারণ মেয়েটির পায়ের কাছে একটা পোঁটলা এবং সম্ভবত তাহাতে ভিক্ষায় পাওয়া চাল।

সেদিন আমি কাহাকে যেন মেয়েটির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিলাম মেয়েটি শ্বশুরবাড়ী যায় না, কারণ সেথানকার অবস্থা খুবই থারাপ, দু বেলা ভাত জোটে না। চালাইতে না পারিয়া মেয়েটির স্বামী উহাকে বাপের বাড়ী ফেলিয়া রাথিয়াছে, লইয়া যাইবার নামও করে না। এদিকে বাপের বাড়ীর অবস্থাও অতি থারাপ। রামচরণ বোষ্টমের বিধবা স্ত্রী লোকের বাড়ী ঝি-বৃত্তি করিয়া দুটি অপোগণ্ড ছেলেমেয়েকে অতি কষ্টে লালন পালন করে। মেয়েটি মায়ের ঘাড়ে পড়িয়া আছে আজ একবছর। মা কোথা হইতে চালাইবে, কাজেই মেয়েটিকে নিজের পথ নিজেই দেখিতে হয়।

একদিন আমাদের বাড়ীর ঝি গয়লা-বৌকে কথায় কথায় জিজ্ঞেস করাতে সে বলিল—হাজু নাকি আপনার বাড়ী থাকবে বলেছিল?

—হ্যাঁ। বলেছিল একদিন বটে।

—থবরদার বাবু, ওকে বাড়ীতে জায়গা দেবেন না, ও চোর।

—চোর? কি রকম চোর?

—যা সামনে পাবে, তাই চুরি করবে। মুখুয্যে বাড়ী রাথে নি ওকে, যা তা চুরি করে থায়, দুধ চুরি করে থায়, চাল চুরি করে নিয়ে যায়—আর বড্ড থাই থাই—কেবল থাবো আর থাবো। ওর হাতীর থোরাক জোগাতে না পেরে মুখুয্যেরা ছাড়িয়ে দিয়েচে। এথন পথে পথে বেড়ায়।

—ওর মা ওকে দেখে না?

—সে নিজে পায় না পেট চালাতে। ওকে বলেচে, আমি কনে পাবো? তুই নিজেরটা নিজে করে থা। তাই ও দোরে দোরে ঘোরে।

সেই হইতে মেয়েটির ওপর আমার দয়া হইল। যথনই বাড়ী আসিত, চাল বা ডাল, দু-চারিটা পয়সা দিতাম। বার দুই দুপুরে ভাত থাইয়াও গিয়াছে আমার বাড়ী হইতে।

মাসখানেক পরে একদিন আমার বাড়ীর সামনে হাউ মাউ কান্না শুনিয়া বাহিরে গেলাম। দেখি হাজু কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের বাড়ীর দিকে আসিতেছে। ব্যাপার কি? শুনিলাম মধু চক্রবর্ত্তী নাকি তাহার আর কিছু রাখে নাই, তাহার হাতে একটা ঘটি ছিল, সেটিও কাড়িয়া রাখিয়া দিয়াছে—তাহাদের বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল, এই অপরাধে।

রাগ হইল। আমি গ্রামের একজন মাতব্বর, এবং পল্লীমঙ্গল সমিতির সেক্রেটারী: তখনই মধু চক্রবর্ত্তীকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। মধু একখানা রাঙা গামছা কাঁধে হন্তদন্ত হইয়া আমার বাড়ী হাজির হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম—মধু, তুমি একে মেরেচ?

—হাঁ দাদা, এক ঘা মেরেচি ঠিকই। রাগ সামলাতে পারি নি, ও আস্ত চোর একটি। শুনুন আগে, আমাদের বাড়ী ভিক্ষে করতে গিয়েচে, গিয়ে উঠোনের লঙ্কা গাছ থেকে কোঁচড় ভরে কাঁচা পাকা ঝাল চুরি করেচে প্রায় পোয়াটাক। আর একদিন অমনি ভিক্ষে করতে এসে, দেখি বাইরের উঠোনের গাছ থেকে একটা পাকা পেঁপে ভাঙচে, সেদিন কিছু বলি নি —আজ আর রাগ সামলাতে পারি নি দাদা। মেরেচি এক চড়, আপনার কাছে মিথ্যে বলবো না।

—না, খুবই অন্যায় করেচ। মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলা, ওসব কি? ইতরের মত কাণ্ড। ছিঃ—যাও, ওর কি নিয়ে রেখেচ ফেরত দাও গে যাও।

হাজুকেও বলিয়া দিলাম, সে যেন আর কোনদিন মধু চক্রবর্ত্তীর বাড়ী ভিক্ষা করিতে না যায়।

এই সময় আকাল শুরু হইয়া গেল। ধান-চাল বাজারে মেলে না, ভিখিরীকে মুষ্টি ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ। এই সময় একদিন হাজুকে দেখিলাম ছেলে কোলে গোয়ালপাড়ার রাস্তায় ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। আমাকে দেখিয়া নির্ব্বোধের মত চাহিয়া বলিল—এই যে জ্যাঠামশায়।... যেন মস্ত একটা সু-সংবাদ দিতে অনেকক্ষণ হইতেই আমাকে খুঁজিতেছে।

আমি একটু বিরক্তির সহিত বলিলাম—কি?

—এই! আপনাদের বাড়ীও যাবো।

—বেশ। আমাদের বাড়ীতে প্রসাদ পাবি আজ—বুঝলি?

হাজু খুব খুশী। খাইতে পাইলে মেয়েটা খুব খুশী হয় জানি। কাঁটালতলার ছায়ায় রোয়াকে সে যখন খাইতে বসিল, তখন দুজনের ভাত তাহার একার পাতে। নিছক খাওয়ার মধ্যে যে কি আনন্দ থাকিতে পারে তাহা জানিতে হইলে হাজুর সেদিনকার খাওয়া দেখিতে হয়। স্ত্রীকে বলিয়া দিলাম—একটু মাছ-টাছ বেশি করে দিয়ে ওকে খাওয়াও...।

একদিন বোষ্টমপাড়ার হরিদাস বৈরাগীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের পাড়ার হাজু শ্বশুর-বাড়ী যায় না কেন?

—ওকে নেয় না ওর স্বামী।

—কারণ?

—সে নানান কথা। ও নাকি মস্ত পেটুক, চুরি করে হাঁড়ি থেকে খায়। দুধের সর

বলবার জো নেই কড়ায়, সব চুরি করে খাবে। তাই তাড়িয়ে দিয়েচে।

—এই শুধু দোষ? আর কিছু না?

—এই তো শুনিচি, আর তো কিছু শুনি নি। তারাও ভাল গেরস্ত না। তাহলে কি আর ঘরের বৌকে তাড়িয়ে দেয় খাওয়ার জন্যে? তারাও তেমনি।

কিছুদিন আর হাজুকে রাস্তাঘাটে দেখা যায় না। একদিন তাদের পাড়ার বোষ্টমবৌ বলিল—শুনেছেন কাণ্ড?

—কি?

—সেই হাজু আমাদের পাড়ার, সে যে বনগাঁয়ে গিয়ে নাম লিখিয়েচে।

আমি দুঃখিত হইলাম। এদেশে নাম লেখানো বলে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করাকে। হাজু অবশেষে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করিল! খুব আশ্চর্য্যের বিষয় নয় এমন কিছু, তবু দুঃখ হয় গ্রামের মেয়ে বলিয়া। এখানেই এ ব্যাপারের শেষ হইয়া যাইত হয়তো, কারণ গ্রামে সব সময়ে থাকিও না, থাকিলেও সকলের খবর সব সময় কানেও আসে না।

পঞ্চাশের মন্বন্তর চলিয়া গেল। পথের পাশে এখানে ওখানে আজও দু একটা কঙ্কাল দেখা যায়। ত্রিপুরা জেলা হইতে আগত বুভুক্ষু নিঃস্ব হতভাগ্যেরা পৃথিবীর বুকে চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। এ জেলায় মন্বন্তরের মূর্ত্তি অত তীব্র ছিল না। যে দেশে ছিল, সে দেশ হইতে নিঃস্ব নরনারী এখানে আসিয়াছিল, আর ফিরিয়া যায় নাই।

পৌষ মাসের দিন। খুব শীত পড়িয়াছে। মহকুমার শহরে একটা পাঠাগারের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গিয়াছি, ফিরিবার পথে একটা গলির মধ্যে দিয়া বাজারে আসিয়া উঠিব ভাবিয়া গলির মধ্যে ঢুকিয়া কয়েক পদ মাত্র অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় কে ডাকিল—ও জ্যাঠামশায়।

বলিলাম—কে?

—এই যে আমি।

আধ অন্ধকার গলিপথে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম। একটা চালাঘরের সামনে পথের ধারে একটি মেয়ে রঙীন কাপড় পড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে, কাপড়ের রঙ অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, আমি শুধু তাহার মুখের আবছায়া আদল ও হাত দুটি দেখিতে পাইলাম।

কাছে গিয়া বলিলাম—কে?

—বা রে, চিনতে পারলেন না? আমি হাজু।

হাজু বলিলেও আমার মনে পড়িল না কিছু। বলিলাম—কে হাজু?

সে হাসিয়া বলিল—আপনাদের গাঁয়ের। বা রে ভুলে গেলেন? আমার বাবার নাম রামচরণ বৈরাগী। আমি যে এই শহরে নটী হয়ে আছি।

এমন সুরে সে শেষের কথাটি বলিল, যেন জীবনের পরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে এবং সেজন্য সে গর্ব্ব অনুভব করে। অর্থাৎ এত বড় শহরে নটী হইবার সৌভাগ্য কি কম

কথা, না যার তার ভাগ্যে তা ঘটে? গ্রামের লোক, দেখিয়া বুঝুক তার কৃতিত্বের বহরখানা।

আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সে বলিল—আসুন না দয়া করে আমার ঘরে।

—না, এখন যেতে পারবো না। সময় নেই।

—কেন, কি করবেন?

—বাড়ী যাবো।

সে আবদারের স্বরে বলিল—না। আসতেই হবে। পায়ের ধুলো দিতেই হবে আমার ঘরে। আসুন—

কি ভাবিয়া তাহার সঙ্গে ঢুকিয়া পড়িলাম তাহার ঘরে। নিচু রোয়াকে খড় ছাওয়া, রোয়াক পার হইয়া মাঝারি ধরণের একটি ঘর, ঘরে একখানা নিচু তক্তপোশের উপর সাজানো গোছানো ফর্সা চাদর পাতা বিছানা। দেওয়ালে বিলিতি সিগারেটের বিজ্ঞাপনের ছবি দু-তিনখানা। মেমসাহেব অমুক সিগারেট টানিতেছে। একখানা ছোট জলচৌকির উপর খানকতক পিতল-কাঁসার বাসন রেড়ির তেলের প্রদীপের অল্প আলোয় ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। মেঝেতে একটা পুরানো মাদুর পাতা। বোষ্টমের মেয়ে, একখানা কেষ্টঠাকুরের ছবিও দেওয়ালে টাঙানো দেখিলাম। ঘরের এক কোণে ডুগিতবলা এক জোড়া, একটা হুঁকো, টিকে তামাকের মালসা, আরও কি কি।

হাজু গর্ব্বের স্বরে বলিল—এই দেখুন আমার ঘর—

—বাঃ, বেশ ঘর তো। কত ভাড়া দিতে হয়?

—সাড়ে সাত টাকা।

—বেশ।

হাজু একঘটি জল লইয়া আসিয়া বলিল—পা ধুয়ে নিন—

—কেন? পা ধোয়ার এখন কোনো দরকার দেখচি নে। আমি এখুনি চলে যাবো।

—একটু জল খেয়ে যেতে হবে কিন্তু এখানে জ্যাঠামশায়।

এখানে জলযোগ করিবার প্রবৃত্তি হয় কখনো? পতিতার ঘরদোর। গা ঘিন্ ঘিন্ করিয়া উঠিল। বলিলাম—না, এখন কিছু খাবো না। সময় নেই—

হাজু সে কথা গায়ে না মাখিয়া বলিল—তা হবে না। সে আমি শুনচি নে—কিছুতেই শুনবো না—বসুন—

তাহার পর সে উঠিয়া জলচৌকি হইতে চায়ের পেয়ালা তুলিয়া আনিয়া সযত্নে সেটা আঁচল দিয়া মুছিয়া আমাকে দেখাইয়া বলিল—দেখুন, কিনিচি—আপনাকে চা করে খাওয়াবো এতে—চা করতে শিখিচি।

ড্রেসডেন চায়না নয়, অন্য কিছু নয়, সামান্য একটা পেয়ালা। হাজুর মনস্তুষ্টির জন্য বলিলাম—বেশ জিনিস, বাঃ—

ও উৎসাহ পাইয়া আমাকে ঘরের এ জিনিস ও জিনিসদেখাইতে আরম্ভ করিল। একখানা

আয়না, একটা টুকনি ঘটি, একটা সুদৃশ্য কৌটা ইত্যাদি। এটা কেমন ? ওটা কেমন ? সে এসব কিনিয়াছে। তাহার খুশী ও আনন্দ দেখিয়া অতি তুচ্ছ জিনিসের প্রশংসা না করিয়া পারিলাম না। এতক্ষণ ভাবিতেছিলাম, ইহাকে এ পথে আসিবার জন্য তিরস্কার করি এবং কিছু সদুপদেশ দিয়া জ্যাঠামশায়ের কর্তব্য সমাপ্ত করি। কিন্তু হাজুর খুশী দেখিয়া ওসব মুখে আসিল না।

যে কখনো ভোগ করে নাই, তাহাকে ত্যাগ করো যে বলে, সে পরমহিতৈষী সাধু হইতে পারে, কিন্তু সে জ্ঞানী নয়। কাল ও ছিল ভিখারিণী, আজ এ পথে আসিয়া ওর অন্নবস্ত্রের সমস্যা ঘুচিয়াছে, কাল যে পরের বাড়ী চাইতে গিয়া প্রহার খাইয়াছিল, আজ সে নিজের ঘরে বসিয়া গ্রামের লোককে চা খাওয়াইতেছে, নিজের পয়সায় কেনা পেয়ালা-পিরিচে—যার বাবাও কোনোদিন শহরে বাস করে নাই বা পেয়ালায় চা পান করে নাই। ওর জীবনের এই পরম সাফল্য ওর চোখে। তাহাকে তুচ্ছ করিয়া, ছোট করিয়া, নিন্দা করিবার ভাষা আমার যোগাইল না।

সংকল্প ঠিক রাখা গেল না। হাজু চা করিয়া আনিল। আর একখানা কাঁসার মাজা রেকাবিতে স্থানীয় ভাল সন্দেশ ও পেঁপে কাটা। কত আগ্রহের সহিত সে আমার সামনে জল-খাবারের রেকাবি রাখিল।

সত্যিই আমার গা ঘিন্ ঘিন্ করিতেছিল।

এমন জায়গায় বসিয়া কখনো খাই নাই। এমন বাড়ীতে।

কিন্তু হাজুর আগ্রহভরা সরল মুখের দিকে চাহিয়া পাত্রে কিছু অবশিষ্ট রাখিলাম না। হাজু খুব খুশী হইয়াছে—তাহার মুখের ভাবে বুঝিলাম।

বলিল—কেমন চা করিচি জ্যাঠামশায় ?

চা মোটেই ভালো হয় নাই—পাড়াগেঁয়ে চা, না গন্ধ, না আস্বাদ। বলিলাম—কোথাকার চা ?

—এই বাজারের।

—তুই নিজে চা খাস ?

—হুঁ, দুটি বেলা। চা না খেলে সকালে কোনো কাজ করতে পারি নে, জ্যাঠামশায়।

আমার হাসি পাইল। সেই হাজু!—

ছবিটি যেন চোখের সামনে আবার ফুটিয়া উঠিল। রায়বাড়ীর বাহিরের ঘরের পৈঠার কাছে বসিয়া খোলাশুদ্ধ তরমুজের টুকরা হাউ হাউ করিয়া চিবাইতেছে। সেই হাজু চা না খাইলে নাকি কোনো কাজে হাত দিতে পারে না।

বলিলাম—তা হোলে এখন উঠি হাজু। সন্দে উতরে গেল। আবার অনেকখানি রাস্তা যাবো।

হাজুর দেখিলাম, এত শীঘ্র আমাকে যাইতে দিতে অনিচ্ছা। গ্রামের এ কেমন আছে, সে কেমন আছে, জিজ্ঞাসাবাদ করিল। বলিল—একটা কথা জ্যাঠামশায়, মাকে পাঁচটা

টাকা দেবো, আপনি নিয়ে যাবেন ? লুকিয়ে দিতে হবে কিন্তু টাকাটা। পাড়ার লোকে না জানতে পারে। মার বড় কষ্ট। আমি মাসে মাসে যা পারি মাকে দিই। গত মাসে একখানা কাপড় পাঠিয়ে ছিলাম।

—কার হাতে দিয়ে দিলি ?

—বিনোদ গোয়ালা এসেছিল, তার হাত দিয়ে লুকিয়ে পাঠালাম।

—তোর ছেলেটা কোথায় ?

—মার কাছেই আছে। ভাবচি, এখানে নিয়ে আসবো। সেখানে খেতে-পরতে পাচ্চে না। এখানে খাওয়ার ভাবনা নেই জ্যাঠামশায়, দোকানের খাবার খেয়ে খেয়ে তো অছেদ্দা হোল। সিঙ্গেড়া বলুন, কচুরি বলুন, নিমকি বলুন—তা খুব। এমন আলুর দম করে ওই বটতলার খোট্টা দোকানদার, অমন আলুর দম কখনো খাই নি। এই এত বড় বড় এক একটা আলু—আর কত রকমের মশলা—আপনি আর একটু বসবেন ? আমি গিয়ে আলুর দম আনবো ? খেয়ে দেখবেন।

নাঃ, ইহার সরলতা দেখিয়াও হাসি পায়। রাগ হয় না ইহার উপর। বলিলাম—না, আমি এখন যাচ্ছি। আর ওই টাকাটা আমি নিয়ে যাবো না, তুমি মনিঅর্ডার করে পাঠালেও তো পারো। অন্ত লোকে দেবে কি না দেবে—বিনোদ যে তোমার মাকে টাকা দিয়েচে কিনা, তার ঠিক কি ?

হাজুর এ সন্দেহ মনে উঠে নাই এতদিন। বলিল—যা বলেচেন জ্যাঠামশাই, টাকাটা জিনিসটা তো এর ওর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিই। মা পায় কি না পায় তা কি জানি।

—এ পর্য্যন্ত কত টাকা দিয়েচ ?

—তা কুড়ি পঁচিশ টাকার বেশী। আমি কি হিসেব জানি জ্যাঠামশাই ? মা কষ্ট পায়, আমার তা কি ভালো লাগে ?

—কার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিস ?

হাজু সলজ্জ মুখে চুপ করিয়া রহিল। বুঝিলাম আমাদের গ্রামের লোকজন ইহার নিকট যাতায়াত করে।

বলিলাম—আচ্ছা, দে সেই পাঁচটা টাকা।—চলি—

—আবার আসবেন জ্যাঠামশায়। বিদেশে থাকি, মাঝে মাঝে দেখে শুনে যাবেন এসে।

গ্রামে ফিরিয়া হাজুর মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া টাকা পাঁচটি তাহার হাতে দিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—আর কেউ তোমাকে কোনো টাকা দিয়েছিল ?

হাজুর মা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—কই না। কে দেবে টাকা ?

বিনোদ ঘোষের নাম করিতে পারিতাম। কিন্তু করিলে কথাটা জানাজানি হইয়া পড়িবে। বিনোদ ভাবিবে আমারও ওখানে যাতায়াত আছে এবং হাজুর প্রণয়ীদের দলে আমিও ভিড়িয়া গিয়াছি এই বয়সে। কি গরজ আমার ?

জন্মদিন

আজ সকালের দিনটাই যেন কি রকম।

যা-কিছু করবার ছিল, শেষ হয়ে গিয়েচে রায় বাহাদুরের, প্রথম যৌবনে যখন রাতুলপুর লালমোহন একাডেমির তিনি হেডমাস্টার—মাসিক বেতন ত্রিশ টাকা মাত্র, তখন সেই রাতুলপুরের স্কুলে পায়া-ভাঙা চেয়ারে বসে সম্মুখস্থ নিবিড় বাঁশবনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে কত কি দেখতে পেতেন সিনেমার ছবির মত। দেখতেন, এ দুঃখ থাকবে না, জীবন আসচে সামনে। সে জীবনে কলকাতায় তাঁর ভিলা হবে বালিগঞ্জে, মোটর থাকবে, কলিং-বেল টিপলে উর্দ্দিপরা খানসামা ঘরে ঢুকবে। তখন ছিল স্বপ্ন, স্বপ্ন ছিল অপূর্ব্ব রঙে রঙিন।

আজ তাঁর বয়েস একষট্টি। আজ একষট্টিতে পা দিলেন। লেক প্লেসের বাড়ীর, নতুন বাড়ীর তেতলায় যে ছোট ঘরটি তাঁর শোবার ঘর, সে ঘরে আজ ভোরে জেগে উঠে দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারের দিকে চোখ পড়তেই রায় বাহাদুর দেখলেন আজ সাতাশে আষাঢ়, তেরশো বাহান্ন সাল। একষট্টি বছরে পড়লেন তিনি আজ।

সকালটা কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন নয়। দিব্যি রোদ উঠেচে বাড়ীর ছাদের মাথায়, সোঁদালি গাছগুলোর মগ-ডালে। মন কেমন চঞ্চল হয়ে উঠলো, চা-পানের পর বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ছোট মেয়ে স্মিতা বলেছিল—বাবা, টোস্ট ভাজা হচ্চে, দুখানা খেয়ে যাও চায়ের সঙ্গে—

—নাঃ। ও কি মাখন? আজকাল মাখন বলে যা বিক্রি হয় ও-দিয়ে টোস্ট আমাদের খাতে সয় না। তোরা খা—

বলে রায় বাহাদুর বেরিয়ে পড়েচেন।

খানিকটা এ-দিক ও-দিক ঘুরে রায় বাহাদুর লেকের ধারের বেঞ্চিতে এসে বসলেন। একখানা মিলিটারী বোট কিছু দূরে ভাসাতে চেষ্টা করচে। একখানা লরি নিকটের রাস্তায় স্টার্ট দেওয়ার প্রচেষ্টায় প্রচুর গ্যাস ও শব্দ ছাড়ছে। নাঃ, কোথাও যদি একটু শান্তি আছে।

একষট্টি হোল তা হোলে। যখন তিনি ষোল সতের বছরের ছেলে, তখন মনে আছে কারো বয়েস বত্রিশ কি চৌত্রিশ বছর শুনলে তাকে প্রৌঢ় বলে মনে হোত। চল্লিশ বছরের লোক তো ছিল বৃদ্ধের মধ্যে গণ্য। আর এরই মধ্যে তাঁর একষট্টি বছর বয়েস হয়ে গেল? নিজেকে খুব বেশী বুড়ো বলে মনে করতে পারছেন না রায় বাহাদুর। সেদিনও তো ধর্ম্মতলার চুলকাটার সেলুনে বসে চুল ছাঁটিয়েছেন—কত দিন আর হবে? রায় বাহাদুর মনে মনে একটা মোটামুটি হিসেব করবার চেষ্টা করলেন। কাশী থেকে এসেচেন সে-বার। বেশ মনে আছে। লেসলির বাড়ীতে তাঁর শালাকে সে-বার চাকুরী জুটিয়ে দিলেন গণেশ সরকারের সাহায্যে। গণেশ সরকার তাঁর সহপাঠী, দুজনে একসঙ্গে সে-কালের সিটি কলেজে পড়ে-

ছিলেন, গণেশ সরকার দেসলির বাড়ী বড় চাকরী করতো—এখন অবসর নিয়েছে। গণেশেরও বয়েস, তা হোল বাট-একবট্টি। দু-এক বছর কম বা দু-এক বছর বেশী। ওতে কিছু যায় আসে না।

সেটা হবে ১৯২০ সাল, দেখতে দেখতে পঁচিশ বছর হয়ে গেল—নিতান্ত কমই বা কি? ভাবলে মনে হয়—সেদিনকার কথা। হিসেব করলে দেখা যায়, হাওড়ার পুলের তলা দিয়ে অনেক জল চলে গিয়েচে তার পর।

তবে ওই যা ভাবছিলেন রায় বাহাদুর। বয়েস হোলে কি হবে, আর পাঁচ জন বুড়োর মত তিনি নন। এমন কি পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন বছরের লোককে তিনি অনেক সময় বুড়ো বলে উল্লেখ করে থাকেন। নাতি ও ছেলেমেয়ের কাছে বলেন—সেই বুড়ো নাপিতটা আজ এসেছিল যে? নিজের চেয়ে দু-এক বছর কম বয়সের লোককে বলেন—আরে একেবারে বুড়ো মেরে গেলে যে! ছ্যা ছ্যা—দাঁতগুলো সব খুইয়েচ দেখচি।

তাঁর দাঁত এখনো অটুট আছে। দাঁতেই নাকি যৌবন, তিনি মনে মনে ভাবেন এবং পাঁচ জনকে বলেও বেড়ান। নিজের কাছে এই সত্যটা প্রমাণ করবার জন্যে তিনি মাঝে মাঝে পার্কে নির্জনে বসে চানাচুর ডাল-বাদাম-ভাজা কিনেও খেয়ে থাকেন।

—এই, কি দিচ্ছিস্ ও? দুটো ডাল-ভাজা বেশি করে দিস। টাকার ভাঙানি নেই? ব্যাটারা সব ডাকাত। চার পয়সার ডাল-বাদাম নিলাম, বলে কি না টাকার ভাঙানি নেই! এই নে—যা—

বেশ জায়গা করেচে এই লেক। এই বেঞ্চিখানা বড় ভালো লাগে। মাঝে মাঝে এখানে এসে বসেন। নির্জ্জনে বসে থাকতে ও ভাবতে বেশ লাগে। বাড়ীতে বড় গোলমাল, বসে ভাববার সময় নেই। ভাববার কথা অনেক কিন্তু বাইরের ঘরে ছেলে ও নাতিদের পড়ার মাস্টার এসে গিয়েচে এতক্ষণ—সুস্মিতার ঘরে সুস্মিতার বন্ধু অলকা ও ডাক্তারবাবুর নাতনি বেলা এসে গিয়েচে। অত গুজ্ গুজ্ ফুস্ফুস্ কেন? সুস্মিতার মাথা বিগড়ে দেবে ওই ডাক্তারবাবুর ধিঙ্গী নাতনিটা। কম্যিউনিস্ট! সেদিন কোথা থেকে একটি গাদা ওই সব কম্যিউনিস্ট বই-পত্তর সুস্মিতার বিছানায়। আজকাল কি যে হচ্চে দেশে! মেয়েছেলেদের মধ্যেও কি না ওই সব!

এই তো গেল বাইরের ঘরের কথা। যদি বাইরের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসবেন, তবে অমনি প্রতিবেশী বৃদ্ধ ভুবনবাবু এসে জুটবে।

—এই যে রায় বাহাদুর। বসে আছেন নাকি? তামাক খাবেন না সকালবেলা। আজ কাগজ দেখেন নি এখনো—ওকিনাওয়ার ব্যাপারটা দেখেচেন? ঘোল খাইয়ে ছাড়লে আমাদের বাবাজিদের। চা?…তা হয় হোক, আপত্তি নেই।

নয়তো অবিনাশ দালাল এসে বলবে—রায় বাহাদুর, কেমন আছেন? বেশ, ভালো ভালো। শুনে খুশী হোলাম। আর আমাদের এখন—ইয়ে, একটা কথা। হরিশ মুখুয্যে রোডের বাড়ীখানা একবার দেখবেন? আজই যেতে হয়। ওদের এটর্নিরা বড্ড প্রেস

করছে। কাল আপনাকে ভাবলাম একবার ফোন করি। কটার সময় সুবিধে হবে? ওর চেয়ে ভালো আর পাবেন না—তবে বায়নার আগে রেজিষ্ট্রি আপিসগুলো একবার সার্চ করতে হবে। সে আমি করিয়ে দেবো, আপনাকে কিছু করতে হবে না। চা? এত বেলায়—আচ্ছা, তা—চিনি কম দিয়ে, হ্যাঁ—

কিংবা আসবে গলির জীবন মুখুযো, ওর ভাইপোর একটা চাকরীর জন্যে অনুরোধ করতে। তিনি যত বলেন, আজকাল তাঁর হাতে কিছু করবার নেই, চাকরী কোথা থেকে করে দেবেন—ততই তাঁকে আরও চেপে ধরে। বাড়ীর ভেতরে যে থাকবেন, সেখানেও বিপদ কম নয়। গৃহিণীর নানা রকম তাগাদা—ভাগনী-জামাইয়ের বাড়ী তত্ত্ব না পাঠালে নয়, ওপরের ঘরের পাখাখানা মেরামত করে দাও—নানা ফইজৎ।

তার চেয়ে এই বেশ আছেন।

পাশের বেঞ্চিতে একজন বৃদ্ধ লোক নাক টিপে বসে জপ কিংবা প্রাণায়াম করছে। ওদিকের বেঞ্চিতে একটি যুবক বসে লেকের জলের দিকে চেয়ে রয়েচে। এত সকালে আর কোথাও কোনো লোক নেই।

হ্যাঁ, যা ভাবছিলেন। জীবনটা যেন কি রকম হয়ে গেল। রাতুলপুরের সেই দিনগুলি এই সকালবেলার রোদের মত স্বপ্নমাখা ছিল। এখন সে স্বপ্নের আবেশও স্মৃতি থেকে টেনে আনতে পারেন না। সেই রাতুলপুরের স্কুলের চটাওঠা দেওয়ালটা। নবীন নাপিত চাকর ঘণ্টা বাজাতো। তাঁর জন্যে টিফিনের সময় বাজার থেকে নিমকি রসগোল্লা এনে দিত। নবীনের ছেলেটি মারা গেল টাইফয়েডে, ক্রি পড়তো স্কুলের নিচের ক্লাসে। তার জন্যে একদিন স্কুল বন্ধ হোল। হেডমাস্টার ছিলেন গুরুচরণ সান্যাল। অনেক দিনের প্রবীণ শিক্ষক। তাঁকে বলতেন, আপনি হচ্চেন ইয়ংম্যান, কেশববাবু, এ সব স্কুলে আপনার পোষাবে না। এ সব কাজ কাদের জানেন, যাদের ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। যেমন ধরুন আমাদের। এ বয়েসে কোথায় যাচ্ছি বলুন!

বেরিয়েছিলেন রাতুলপুর স্কুল থেকে তার পরের বছরেই। ভবিষ্যতের সন্ধানে। ভবিষ্যৎ তাঁকে একেবারে প্রতারণা করে নি। অনেকের চেয়ে তাঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেচে। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, সব দিয়েও ভবিষ্যৎ তাঁকে যেন কিছুই দেয় নি। তাঁর স্বপ্নকে কেড়ে নিয়েচে, আশাকে কেড়ে নিয়েচে, ফুরিয়ে গিয়েচেন তিনি, নিঃশেষে ফুরিয়ে গিয়েচেন। যে ভবিষ্যৎ আজ অতীত, তাতে তিনি জেতেন নি—ঠকেচেন।

আজ তাঁর বয়েস—থাক বয়েসের কথা। ওটা সব সময় মনে না করাই ভালো। বয়েসের কথা মনে না আনবার জন্যেই তিনি পার্কে বসা ছেড়ে দিয়েচেন। তাঁর বাড়ীর কাছে একটা পার্ক আছে, ছোট পার্কটাতে লেক-পাড়ার পেন্‌সনপ্রাপ্ত জজ, সবজজ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, বড় কেরানী প্রভৃতি বৃদ্ধের দল নিয়মিত ভাবে বেড়াতে আসে। এ-বেঞ্চিতে ও-বেঞ্চিতে বসবে আর সামাজিক ও শারীরিক কথাবার্তা বলবে। অমুকের নাতনির বিয়ের কি হোল, অমুকের নাতনি এবার ম্যাট্রিকে বৃত্তি পেয়েচে। মেয়ে ছেড়ে ওরা নাতনিতে নেমেচে। নাতনি

সম্বন্ধে এমন উচ্ছ্বসিত হবে, যেন কারো নাতনি কোন দিন ম্যাট্রিক পাশ করে নি। সব নাতনিই অসাধারণ, সাধারণ নাতনি একটাও চোখে পড়ে নি। নাতনির প্রসঙ্গের পরে উঠবে বাতের প্রসঙ্গ, দাঁতের ব্যথার প্রসঙ্গ, রক্তের চাপের প্রসঙ্গ। যমদূত যেন দণ্ড উঁচিয়ে বসে আছে পার্কটার প্রত্যেক বেঞ্চিখানার ওপরে। সে আবহাওয়ায় বসলেই মনে হয়—

"এবার দিন ফুরুলো
সমুঝে চলো
ইহকাল পরকাল হারিও না—"

কিংবা—"মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর"
কিংবা—"বাঁশের দোলাতে উঠে কে হে বটে
যাচ্চ তুমি শ্মশানঘাটে—"

ইত্যাদি।...

দিন কতক গিয়ে তাই রায় বাহাদুর আর ওই সব ক্ষুদ্র সামাজিক পার্কে যান না, যেখানে বাত-ব্যাধিগ্রস্ত পেন্‌সনভোগী বৃদ্ধদের যাতায়াত। তার চেয়ে আসেন তিনি এই লেকের ধারে, শ্যাম-বনকুঞ্জ পাও যে! হরিৎবর্ণ দ্বীপটি জলের এক দিকে, কত সুগঠিত-দেহ তরুণ, কত প্রণয়চপলা তরুণী কলেজের ছাত্রী আসে যায়। ওয়াকাইয়ের দল কলহাস্তে চটুলপদে বেড়ায় মাঝে মাঝে, ঠোঁটে রঙ, থাকির আঁটসাট পোশাক পরনে। না, এখানে লাগে ভালো। যৌবনের হাওয়া বয় সর্ব্বদা!

তিনি এখনো বাঁচবেন অনেক দিন। হাত দেখিয়ে বেড়ান এখানে সেখানে রায় বাহাদুর, সেদিন কার্জ্জন পার্কে এক উড়িয়া জ্যোতিষী তাঁকে বলেচে। তা ছাড়া এ তিনি জানতেন। তাঁর আয়ু যে প্রায় নব্বুইয়ের কান ঘেঁষে যাবে, জ্যোতিষী না বললেও তা তিনি জানেন।

আজ এত পয়সা রোজগার করেও, কলকাতায় এত বড় বাড়ী করেও, ভি-এইট ফোর্ড চালিয়েও মনে হচ্ছে রাতুলপুরের সেই দিনগুলো চব্বিশ বছরের সতেজ যৌবন নিয়ে যদি আবার ফিরে আসতো···সেই বাঁশবনের দিকে চেয়ে স্বপ্ন দেখা···ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজাতো নবীন নাপিত···কত নির্জ্জনে বসে জীবনের ভবিষ্যতের স্বপ্ন বিভোর হয়ে থাকা···

তখন ছিলেন গরীব স্কুল-মাস্টার, আজ তিনি বড়লোক। স্কুল-মাস্টারি ছেড়ে এক বন্ধুর পরামর্শে ব্যবসা ধরলেন, ইন্‌সিওরেন্সের কোম্পানী খুললেন নিজে, বড় আপিস হোল, ধুলোমুঠো ধরলে সোনামুঠো হোতে লাগলো। দেশহিতকর কাজও দু'চারটা যে না করেচেন এমন নয়, পয়সা যথেষ্ট হয়েচে। ছেলেরা বলে—ভালো গাড়ী কিনুন বাবা। একখানা মার্সেডিজ বেন্‌জ দেখে এলাম কাল—খরগোশের মত নিঃশব্দে চলে—কি ফোর্ড গাড়ীতে চড়বেন চিরদিন!

যুদ্ধের আগেকার কথা অবিশ্যি। তেলের অভাব ছিল কি?

কিছু ক্যালকাটা প্রপার্টিজও করলেন, যার জন্যে কলকাতায় বড়লোকেরা হা করে থাকে।

বাড়ী বিক্রী থাকলেই রায় বাহাদুর কিনবেন। এটর্নির আপিসে গিয়ে হয়তো জানা গেল বাড়ী থার্ড মর্টগেজ। প্রথম দুই বন্ধকী খতের টাকা শোধ দিয়েও বাড়ী কিনেছেন, জেদের বশবর্ত্তী হয়ে। দিনকতক জমি কেনাবেচা আরম্ভ করলেন। এই লেক অঞ্চলে, বালিগঞ্জ ষ্টোর রোড, গড়িয়াহাটা অঞ্চলের অনেক বাড়ী তাঁর জমির ওপরে। এসব কাজে ঠকেছেনও অনেক, দায়শূন্য ভেবে যে সম্পত্তিতে হাত দিয়েছেন, রেজিষ্ট্রি অফিস অনুসন্ধান করে দেখা গেল তার অবস্থা কাহিল। মানুষকে বিশ্বাস করা যে কত বিপজ্জনক!

আজ সব করেও তিনি ফুরিয়ে গিয়েছেন। বড় ছেলে আপিসে বেরোয়। ভালো কাজ বোঝে, তাঁর অভাব কেউ অনুভব করে না আপিসে, ঘরেও না। মেয়ে-ছেলেরা এখন মালিক হয়েছে, নিজেরাই ব্যবস্থা করে, তাঁকে জিজ্ঞেস করে না অনেক সময়। কেবল গিন্নী এখনো পুরনো দিনের সুর বজায় রেখেছেন, তাঁকে না হুকুম করলে গিন্নীর চলে না। মুখনাড়া মুখ-ঝাড়া সব তাঁরই ওপরে। আসলে পুত্রবধূদের প্রতাপে তিনিও প্রায় অর্দ্ধ বাতিল। সুন্দরী বড় পুত্র-বধূটির দাপট সবচেয়ে বেশি, কলেজে-পড়া মেয়ে, মুখের কাছে কেউ এগোতে পারে না, মুখের সৌন্দর্য্যে ত্রিভুবন জয় করতে পারে। বাড়ীর ঝি-চাকর তার কথায় মরে বাঁচে। বুড়ো-বুড়িকে বড় কেউ একটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না।

তাই তো বলচেন, তিনি ফুরিয়ে গিয়েচেন। একষট্টি বছরেই ফুরিয়ে গেলেন।,

আজ গাড়ীর পঞ্চম চক্রের মতই তিনি অনাবশ্যক। ওই রাজুলপুরে তিনি প্রথম প্রেমে পড়েন। পুরুত-গিন্নি করতেন বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী, তাঁর মেয়ে, নাম নিরুপমা। শহরের তুলনায় —তাঁর বড় পুত্রবধূ প্রতিমার তুলনায় হয়তো নিরুপমা তত কিছু ছিল না, তবুও সে সুন্দরী ছিল, মুখশ্রী চমৎকার। বাড়ীতে আর কেউ থাকতো না পুরুত ঠাকুরের, নিরুপমার সঙ্গে বুড়ো জলপাই-গাছের তলায় দুপুরের ছায়ায় লুকিয়ে দেখা হোত মাঝে মাঝে। ষোল বছরের সুশ্রী কিশোরী।

একদিন নিরুপমা দুটি পাকা আতা দু হাতে নিয়ে এসেছিল।

হেসে বললে—তুমি আতা খাও?

—কেন খাবো না?

—এই নাও। আমাদের গাছের আতা।

—শুধু আতা দিলে আতা নেবো না—

নিরুপমা চোখ বড় বড় করে বললে—তবে কি?

—আর কিছু দিতে হবে ঐ সঙ্গে—

—কি?

—এই দেখিয়ে দিচ্চি কি—সরে এসো—

—ধ্যেৎ—ভারি দুষ্টু তো!…

হাত ঝাড়িয়ে নিরুপমা ছুটে পালিয়ে গেল হরিণীর মত চটুল গতিতে…

আর এক দিন।

বিশেশ্বর চক্রবর্তী সেদিন তাঁর মায়ের তিথি উপলক্ষে ব্রাহ্মণভোজনে গ্রাম্য মাস্টারটিকেও নিমন্ত্রণ করেছেন। খেতে বসেচেন ভাবী রায় বাহাদুর। পরিবেশন করচে নিরুপমা, আরও পাঁচ-ছ জন ব্রাহ্মণ একত্র খেতে বসেচে। হঠাৎ খেতে খেতে মুখ তুলে দেখলেন নিরুপমা ঘরের মধ্যে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাঁর দিকে চেয়ে আছে। উনি ঈষৎ হেসে ফেলতেই নিরুপমাও মৃদু হেসে জানলা থেকে সরে গেল।

কালকের কথা বলেই মনে হচ্ছে।

অথচ কত কাল হয়ে গেল—চল্লিশ বছর!

আজও চোখ বুজলে নিরুপমার সে সলজ্জ দুষ্টুমির হাসি তিনি দেখতে পান। এক-আধ দিন নয়, এ রকম কত ঘটনা ঘটেছিল এক বছর ধরে। নিরুপমার সঙ্গে তাঁর বিবাহের প্রস্তাবও হয়েছিল। বিবাহ হয়েও যেতো কিন্তু গ্রামের বিধুভূষণ মজুমদার এক সামাজিক জোট পাকালেন। রায় বাহাদুর কিশোরকুণি থাকের ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ কৃষ্ণনগরের রাজারা যে বংশের। তখনকার আমলে কিশোরকুণি থাকের পাত্রকে কুলীনেরা কন্যাদান করতেন না। সেকালে এমনিই ছিল। বিবাহ ভেঙে গেল। রায় বাহাদুর বিদেশী লোক, কেউ তাঁকে খবর দেওয়ার ছিল না। বিবাহের দিন নিরুপমা কেঁদেছিল, না, কাঁদে নি?

শুধু সংবাদটা পাবার জন্যে রায় বাহাদুর কত চেষ্টা করেচেন, কেউ এ সংবাদ তাঁকে দিতে পারে নি। আর কখনো নিরুপমার সঙ্গে তাঁর দেখাও হয় নি।

কেই বা তাঁকে সংবাদ এনে দেবে?

এই ঘটনার কিছু দিন পরে রায় বাহাদুর সে গ্রাম ত্যাগ করে আসেন। আর যান নি কোনো দিন। জীবনের প্রথম প্রেম, সে সব দিনের কথা ভাবলেও হারানো যৌবন আবার ফিরে আসে যেন।

ওখান থেকে চলে আসবার পর তিনি কত বার ভেবেছেন, নিরু আজ কোথায় আছে? কেমন আছে? তাঁর জন্য নিরু কি ভেবেছিল?

এ সংবাদ তাঁকে আর কেউ দেয় নি। বিবাহ করেছিলেন বড়লোকের সুন্দরী মেয়েকে। কিন্তু নিরুকে ভোলেন নি কোনো দিন। প্রথম প্রথম খুবই ভাবতেন, মধ্যে দশ-বিশ বছর আর তেমন ভাবতেন না, অর্থ উপার্জ্জনের নেশায় ভুলে ছিলেন। এখন আবার মাঝে মাঝে মনে হয়।

একটি তরুণ যুবক এসে কিছু দূরে একটা নারকোল গাছের তলায় দাঁড়ালো। এ-দিকে ও-দিকে চেয়ে যেন সে কাউকে খুঁজচে। রায় বাহাদুর সচকিত হয়ে উঠলেন। ছোকরা নিশ্চয়ই ওর প্রেমিকার সন্ধানে এসেচে। তাঁর ছোট ছেলে অমিয়জীবনের বয়সী। আজকাল অমনি হয়েচে যে। তাঁদের সময়ে কিছুই ছিল না। তরুণী অভিসারিকাদের পক্ষে স্বর্ণযুগ চলেচে এটা। কই, ছোকরা একা বসে আছে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে, তিনি কই? মানে, মা লক্ষীটি? এখনো আসেন না কেন?

আজ রায় বাহাদুরের ইচ্ছে হোল মাতুলপুরে যাবেন। একবার গিয়ে দেখে আসবেন।

তাঁর মনে হচ্ছে, চল্লিশ বছর যেন কেটে যায় নি, যেন তিনি নবা যুবকই আছেন, ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফ আছে তাঁর, যেন তিনি ব্লাডপ্রেসারে ভুগচেন না আজ দু বছর, যেন তাঁর বাত হয় নি গেবার আশ্বিন মাসে এবং বাতে কিছুদিন শয্যাশায়ী হয়ে ছিলেন না—যেন রাতুলপুরের আম শিমুল জাম কাটালের ঘন ছায়ানিকুঞ্জে চিরযৌবনা নিরুপমা আজও কিশোরী, তাঁরই আশায় পথ চেয়ে বসে আছে।

গাছতলার সেই যুবকটি কিছু দূরে একটা বেঞ্চির ওপর হতাশ ভাবে বসে পড়েচে। বেচারী!

সেই রাত্রেই রায় বাহাদুর মনে মনে ঠিক করে ফেললেন। তিনি রাতুলপুরে যাবেনই। কাল সকালে উঠেই যাবেন। ছোট মেয়ে সুমিতা এসে বললে—বাবা, রাত্রে কি খাবে? বৌদিদি বলে পাঠালেন—

রায় বাহাদুর মুখ খিঁচিয়ে বললেন—কেন তিনি কি জানেন না আমি রাতে কি খাই? যাও পর্দাটা তুলে দাও—

সুমিতা মুখের অপূর্ব্ব ভঙ্গি করে চলে গেল। রায় বাহাদুরের দোতলার দক্ষিণমুখী বসবার ঘর। সামনের দেওয়ালে সবই জানালা। জানালার পর্দা খুলে দিয়ে চলে গেল। পুরু গদি-আঁটা গিল্টি কৌচে বসে শেড দেওয়া লম্বা ডালের আলোতে রায় বাহাদুর অন্যমনস্ক ভাবে একখানা বাংলা মাসিক পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিলেন। এসব পত্রিকা-টত্রিকা এনেচে মেয়ে বা বৌমারা, তিনি এসব পড়েন না।

বড় পুত্রবধূ প্রতিমা রূপের হিল্লোল তুলে ঘরে ঢুকে বললে—আমায় ডেকেচেন?

—হ্যাঁ। আমি কি খাবো জিজ্ঞেস করে পাঠিয়েচ কেন? আমি কি খাই?

প্রতিমা জানে শ্বশুর বৃদ্ধ হয়ে ইদানীং খিটখিটে হয়ে পড়েচেন। সে সান্ত্বনার সুরে বললে—না, সে জন্যে না। আপনি দুদিন কিছু খাচ্চেন না রাত্রে, বলেন সাবু করে দাও। তা আজও কি সাবু খাবেন, না লুচি খানকতক গরম গরম করে আনবো। ভালো মাগুর মাছ আছে কি না, তাই বলে পাঠালুম—

—মাগুর মাছের কথা কেউ আমাকে তো বলে নি। সবাই হয়েচে—

—তা হলে দুখানা লুচিই আনি গে ভেজে।

—হ্যাঁ, রাত তিনটে কোরো,—

—দশ মিনিটের মধ্যে আনচি বাবা।

না, এ সংসারে সুখ নেই। তাঁর মুখের দিকে কেউ তাকায় না।

গিন্নি কি এতই ব্যস্ত যে একবার এসে তাঁর খাওয়ার খোঁজ নিতে পারেন না? আজ যদি—

প্রতিমা একটু পরেই রূপোর থালায় লুচি সাজিয়ে ও একটা থুয়ো বসানো ছোট রূপোর বাটিতে মাছের ঝোল নিয়ে ঘরে ঢুকলো। রায় বাহাদুর বললেন—তোমার শাশুড়ী কি করচেন?

প্রতিমা সুললিত ভঙ্গিতে আঁচল সামলে নিয়ে বললে—মা ঠাকুরঘর থেকে বেরোন নি তো ?

—বেশ, বেরুতে হবে না।

—বসুন, জল নিয়ে আসি বাবা, টেবিলেই খাবেন তো ?

রায় বাহাদুর বিরক্তির সঙ্গে বললেন—রেডিওটা সর্বদা ঝং ঝং করলে আমার মাথা ধরে যায়। কে খুলেচে রেডিও ? ছোট বৌমা বুঝি ? বন্ধ করে দাও—ও নাকি-সুরে গান সর্বদা বরদাস্ত করতে পারি নে—

রাতুলপুরেই যাবেন তিনি। অসহ্য হয়ে উঠেচে এ সংসার। শান্তি বলে জিনিস নেই এখানে। একবার গিয়ে ঘুরে আসবেন প্রথম যৌবনের শত মধুস্মৃতিমাখা গ্রামটিতে। হয়তো নিরুপমার সঙ্গে দেখা হয়েও যেতে পারে—অন্তত সেই সব জায়গাতেও আবার গেলে জীবনের একঘেয়েমিটা কেটে যাবে।

মাথা ধরেচে বেজায়। শুধু ওই রেডিওটার জন্যে। কতবার তিনি বারণ করেচেন—কিন্তু এ বাড়ীতে তাঁর কথা কেউ আমলে আনে ? সাধে কি তিনি—শরীর কেমন ঝিম ঝিম করচে।

মধ্য-রাত্রে বড় পুত্রবধূ প্রতিমার ছোট খোকাটি জেগে মায়ের ঘুম ভাঙালো। প্রতিমা উৎকর্ণ হয়ে শুনলো দোতলায় শ্বশুরের ঘর থেকে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক গোঙানির শব্দ আসচে। সে তখুনি নিচে এসে সকলের ঘুম ভাঙালো। রায় বাহাদুর বিছানায় গুটি-গুটি হয়ে অস্বাভাবিক ভাবে শুয়ে আছেন, তাঁর মুখ থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ বার হচ্চে। বড় ছেলে বাড়ী নেই। ছোট ছেলে ফোন করে দিলে ডাক্তারকে। তারপর নিজেও ছুটলো। খুব হৈ-চৈ উঠলো। সবাই ঝুঁকে পড়লো বিছানার ওপরে, বড় মেয়েকে আনতে মোটর ছুটলো বাগবাজারে। ঝি, চাকর, মেয়ের দল, পুত্রবধূর দল, নাতি-নাতনিরা মিলে লোকে লোকারণ্য ঘরের ভেতর। রায় বাহাদুর কি একটা বলচেন অস্পষ্ট গোঙানির মধ্যে—কেউ বুঝতে পারচে না। প্রতিমা কান পেতে ভালো করে শুনে বললে—নিরু কে ? নিরু কার নাম ? নিরু নিরু করে যেন কি বলচেন।

ডাক্তার এসে বললে, স্ট্রোক হয়েচে। সেবাশুশ্রূষা চললো, বড় ছেলেকে টেলিগ্রাম করা হোল রংপুরে। সেখানে সে যুদ্ধের বড় কনট্রাক্টারির কাজে গিয়েচে। ট্রাঙ্ক-কল করা গেল মেজ ছেলেকে ঝরিয়ার কয়লার খনিতে।

সেদিন বেলা বারোটার আগে রায় বাহাদুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

কাঠ বিক্রি বুড়ো

আমি গাছ বিক্রি পছন্দ করি না। কোনো গাছ যদি কেউ কাটে তবে আমার বড় কষ্ট হয়। লোককে পরামর্শ দিই গাছপালা দেশের সম্পদ, ধরণীর শ্রী ওরা বাড়িয়েচে ফুলে, ফলে, ছায়ায় সৌন্দর্য্যে—ওদেরই ডালে ডালে দিন রাত কত বিহগ-কাকলী, ওদের কেটে নষ্ট কোরো না।

সুতরাং যখন গ্রামের ঘাটে কাঠের নৌকো এসে লাগলো, আমি সেটা পছন্দ করি নি।

একদিন সকালে বসে লিখচি, একজন দাড়িওয়ালা বুড়ো মুসলমান এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে আমায় সেলাম করলে হাত তুলে।

বললাম—কি চাই?

—বাবুর গাছ বিক্রি আছে, বিক্রি করবেন?

—কি গাছ?

—বাবুর বাড়ীর পেছনে বিলিতি চট্‌কা আছে, বাগানে শিশু আছে, কলুচট্‌কা আছে।

লোকটার কথায় দক্ষিণের টান! বললাম—বাড়ী দক্ষিণে?

—হাঁ বাবু, বসিরহাটের ওপার। টাকি শ্রীপুর।

—গাছ কিনতে এসেচ নাকি?

—বাবু, আমাদের নৌকো এসেচে ঘাটে। কাঠ বোঝাই হয়ে কলকাতায় যাবে। আপনার এদিকে যদি বাগান-টাগান পাওয়া যায় কিনবো।

বাগান কেনা শুনে আমি আগেই চটেচি, সুতরাং লোকটার সঙ্গে ভালো করে কথা বললাম না।

ও বললে—বাবু, গাছ বেচবেন?

—না।

—ভালো দর দেবো বাবু।

—কি রকম দর শুনি?

—তা বাবু আপনার বড় চট্‌কা গাছটা চল্লিশ টাকা দর দেবো।

আমি আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না! এ অঞ্চলে ও গাছের দাম যুদ্ধের আগে একজন বলেছিল ছ টাকা। যুদ্ধের মধ্যে ওর দাম উঠলো চোদ্দ টাকা। ওটাকেই সর্ব্বোচ্চ দাম বলে আমি ভেবেছিলাম। একটা বুনো চট্‌কা গাছের দাম চোদ্দ টাকা—ওই যথেষ্ট। আশাতিরিক্ত দর। আর এখন এ বলে কি!

চল্লিশ টাকা একটা চট্‌কা গাছের দাম—এ কথা পাঁচ বছর আগেও কেউ কানে শোনে নি। আমার বাগান-সংলগ্ন জমিতে এরকম চট্‌কা গাছ পাঁচ-ছটা আছে, বেশ মোটা পয়সা পেতে পারি দেখচি গাছ কটা বিক্রি করলে।

হঠাৎ মনে পড়লো নেপল্‌স উপসাগরের তীরে কোনো এক বড় গাছতলায় মিনি বসে বই লিখতেন, নীল জলরাশি তাঁর চোখের সামনে দূর স্বপ্ন-জগতের বাণী ভাসিয়ে আনতো, দৃশ্যমান

জগতের ওপারে যে বৃহত্তর স্বপ্ন-জগৎ দিক থেকে দিগন্তরে বিস্তৃত। আমি একটা রঙীন ছবিতে নেপল্‌স উপসাগর তীরে এই ধরনের গাছের ছবি দেখেছিলাম। চটকা গাছগুলো দেখতে ঠিক তেমনি। মনে মনে আমি ওদের নাম দিয়েছিলাম মিনির গাছ। টাকার জন্যে সে গাছগুলো কেটে উড়িয়ে দেবো?

লোকটাকে বললাম—না হে, ও গাছ বিক্রি হবে না।

সেই থেকেই কাঠের নৌকা নিয়ে লোকটা আমাদের গ্রামের ঘাটে রয়ে গেল। দু-তিনটি বড় বড় বাগান কিনে তার সমস্ত গাছ কাটিয়ে গুঁড়িগুলো নৌকা বোঝাই করতে লাগলো—ডালপালা সস্তাদরে গ্রামের লোকজন জ্বালানির জন্যে কিনে নিলে ওর কাছ থেকে। রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপটা অনেকদিন থেকে পোড়ো, ভূতের বাসা হয়ে আছে—কারণ একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি ছাড়া রায়-বাড়ীতে বর্তমানে আর কেউ থাকে না। লোকটা রায়-কাকাকে বলে সেই চণ্ডীমণ্ডপের এক-পাশে আছে, আরও দুটি সঙ্গী নিয়ে—চণ্ডীমণ্ডপের উত্তর দেওয়ালের গায়ে বাইরের দিকে একখানা খেজুর-পাতার চালা উঠিয়ে নিয়ে সেখানেই রান্না করে খায়। একটা বাঁশের তিকৃড়িতে হাঁড়িকুড়ি রাখে।

গাছগুলো কেটে ফেলচে গ্রামের ছায়াসম্পদ ও শ্রীকে নষ্ট করে—এজন্যে কাঠ-বিক্রি বুড়োকে আমি পছন্দ করতাম না। ওর সঙ্গে বেশি কথাও বলতাম না।

নদীর ধারে ওদের নৌকো থাকে, যেখানে নদীর পাড় খুব ঢালু, বড় বড় উলু ঘাসের বন, ডাঁট বন, পটপটি গাছ—সেখানে ওদেরই কাটা এক কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে থাকি বিকেলে, বেশ ফাঁকা জায়গা, অনেক দূর পর্যন্ত আকাশ দেখা যায়। নীল আকাশের নিঃশব্দ বাণীর মত নেমে আসে অপরাহ্ণের শান্তি।

কাঠ-বিক্রি বুড়ো আমার কাছে আসে নৌকো থেকে নেমে।

আমি বলি—আর কতদিন আছো? গাছগুলো তো দেশের সাবড়ালে।

আমি কি বলচি ও বুঝতে পারে না। গাছগুলো সাবাড় করলে ক্ষতি যে কি, তা ওর বোঝবার বুদ্ধি নেই। ও বললে—না বাবু, কি আর এমন লাভই বা হবে, বড্ড খরচ পড়ে যাচ্ছে।

—কিসের খরচ?

—এই জন-খরচ, কাটাই খরচ।

—কলকাতায় কি দরে বিক্রি হে?

—আজ্ঞে সাড়ে তিন টাকা কিউবিক ফুট। মিথ্যে কথা বলবো না আপনার কাছে।

লোকটা আর কিছু ইংরেজী জানুক আর না জানুক কিউবিক ফুটের মাপটা জানে। কারণ ওই করেই খায়। তাছাড়া ওকে দেখে আমার মনে হয় লোকটা সরল, সাদাসিদে। কুটিল, ধূর্ত ব্যবসাদার নয়। ও আমায় তামাক সেজে এক একদিন খাওয়ায়। সুখদুঃখের দুটো কথা বলে।

ক্রমে যত দেখি বুড়ো বড় বড় বাগান কেটে উড়িয়ে দিচ্ছে, ততই ওর ওপর আমার বিতৃষ্ণা,

জন্যে। পয়সার জন্যে এরা সব পারে।

রাস্তাঘাটে দেখা হোলে ভালো করে কথা বলি নে।

বুড়ো কিন্তু যেচে কথা বলতে আসে আমার সঙ্গে। প্রায় তিনচার মাসের বেশি আমাদের গ্রামে আছে, গ্রামের সকলের নাম-ধাম ভালো করেই জেনে ফেলেচে। কে কোথায় কাজ করে, কত মাইনে পায়, কার কি রকম অবস্থা এ সব ওর জানা হয়ে গিয়েচে। মাঝে মাঝে আমার বাড়ী এসে সন্ধ্যার সময় বসে। তামাক খায়, প্রতিবেশীর মত গল্প করে। একদিন আমায় বললে —বাবু বুঝি বই লেখেন।

—হ্যাঁ।

—বই ছাপান কোথায় ?

—কলকাতায়।

—কত খরচ পড়ে ?

—পাঁচ-ছশো, হাজার।

—তা বাবু আপনার মত আমাদের যদি হোত। চিরজীবনটা কষ্ট করেই কাটলো। একটা ছেলে আছে, জমিদারি কাছারিতে কাজ করে টাকির বাবুদের। আট টাকা মাইনে পায়। বাবুরা ওকে বড় ভালোবাসে। আবদুল না হলে কোন কাজ হবে না নায়েববাবুর। সাইকেলের পিছনে তুলে নিয়ে সাতক্ষীরে যায় মোকদ্দমার দিন থাকলি। আর বছর পুজোর সময় বাড়ী এলো, তা ডিম এনেলো চার কুড়ি। আর গাওয়া ঘি—

বুড়ো দিব্যি গল্প জমিয়ে বসে। তামাক খায়। কিছুক্ষণ পরে আবার চলে যায়।

মাঝে মাঝে ওকে জিজ্ঞাসা করি—কেমন লাভ হবে এবার ?

—কি জানি বাবু ?

—অনেক গাছ তো কাটলে।

—ওতে কি হয় বাবু—এখনো অনেক গাছ কাটতি হবে।

—মোটা টাকা লাভ করবে এবার।

—দোয়া করুন বাবু, তাই যেন হয়। কনটোলের কাপড় একখানা দিতি পারেন বাবু, নইলে ন্যাংটা হতি হবে।

অনেকদিন ধরে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। বুড়োও নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে, আমিও থাকি নিজের কাজে ব্যস্ত। এমন কি ওর কাছে কিছু ডালপালা কিনেছিলাম জ্বালানির জন্যে, তার দাম নিতেও এল না।

এই সময় আমাদের গ্রামে আমাদের এক তরুণ প্রতিবেশী টাইফয়েড জ্বরে পড়লো। তার চাষবাস আছে, বাজারে ছোট একখানা কলের দোকান আছে, স্ত্রী ও পাঁচটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে আছে।

রোগ দিন দিন বেড়ে ক্রমে বাঁকা পথ ধরলো। আমরা পাড়ার সবাই রাত জেগে

লেখাশুনা করি, দু-তিনটি ছোকরা আমাদের নির্দেশ অনুযায়ী দূরের থেকে কখনো ওষুধ, কখনো ডাক্তার, কখনো ফল, কখনো বরফ আনতে দিনে রাতে চার-পাঁচবার ছুটোছুটি করে। তরুণী স্ত্রী ও ছেলেমেয়েগুলির মুখের দিকে চেয়ে গ্রামের লোকেরা কোনো কষ্টকেই কষ্ট বলে গ্রহণ করে না।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল না।

চব্বিশ দিন জরভোগের পর রোগী মারা গেল। গ্রামের মেয়েরা চার-পাঁচদিন ধরে ব্যস্ত রইল সভোবিধবা মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিতে। পুরুষেরা ব্যবস্থা করতে লাগলেন ওদের বিষয়-আশয় কি হবে, চাষবাসের কি বন্দোবস্ত করা যায়।

কান্নাকাটির গোলমালে দিন দশ বারো কেটে গেলে একদিন সন্ধ্যাবেলার একটা দৃশ্য দেখলুম, যা আমার আছে এত ভাল লাগলো যে শুধু যেন সেই ঘটনার কথা বলতেই এ গল্পের অবতারণা।

বেলা আর নেই, ছিপগুলি নিয়ে পুকুর থেকে ফিরচি মাছ ধরে, ওদেরই বাড়ীর পাশ দিয়ে। দেখি যে সেই কাঠ-বিক্রি বুড়ো মুসলমান ওদের উঠোনে বসে তরুণী বিধবাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। রাস্তার ধারেই ওদের রান্নাঘরের ছেঁচতলা, প্রতিবেশীর স্ত্রীটি বসে কি কাজ করচে রান্নাঘরের দাওয়ায় আর বুড়ো বসে আছে ছেঁচতলায়। শুনলাম ও বলচে—সব দিকই দেখুন মা ঠাকরোন, বেঁচে চেরকাল কেউ থাকে না। তিনি অল্প বয়সে গিয়েচেন এই হোল আসল কষ্ট। তা আপনার কাচ্চাবাচ্চাদের মুখির দিকে চেয়ে আপনি কোমর বাঁধুন। নইলি আজ আপনি অস্থির হলি, ওরা কোথায় দাঁড়াবে মা ঠাকরোন? চোকির জল আর ফ্যালবেন না—আপনার চোকি জল দেখলি বুক ফেটে যায়—

আমি ততক্ষণ দাঁড়িয়ে গিয়েচি। দেখি যে বুড়ো মুসলমান ময়লা গামছায় খুঁটে নিজের চোখের জল মুছে ফেলচে।

এর চেয়ে কোনো অপূর্ব্বতর দৃশ্যের কল্পনা আমি করতে পারি নে।

সেই সন্ধ্যায় একটি অতি মধুর গীতি-কাব্যের মত মনে হোল এর উদার আবেদন।

হারুণ অল রসিদের বিপদ

জানিপুর থেকে দুটি ছেলে পড়তে আসে ইস্কুলে।

এ অঞ্চলে আর ইস্কুল নেই, ওদের বাড়ীর অবস্থা ভালো, যদিও সাতপুরুষের মধ্যে অক্ষর পরিচয় নেই, তবুও বাপমায়ের ইচ্ছে, যখন ধান বেচে কিছু টাকা পাওয়া গেল, তখন ছেলেরা লেখাপড়া শিখুক। চাষা লোকেদের জন্তে লেখাপড়ার দরকার আছে বই কি। ধানের হিসেব, জন মজুরের হিসেব রাখাও তো চলবে।

ওরা আসে মাদলার বিলের ধারের বড় মাঠের ওপর দিয়ে। আজকাল সকালে ইস্কুল, সোঁদালিফুলের ঝাড় দোলে মাঠের মধ্যে, কত কি পাখী ডাকে, বড় বড় খোলাওয়ালা গেঁড়িগুলো বিলের দিকে নামে মাঠের পথ বেয়ে, আশ ধানের জাওলা খায় লুকিয়ে ছাড়া গরুতে। ওরা পরামানিকদের বাগানের আম কুড়তে কুড়তে চলে আসে মাঠ ও বাগানের মধ্যে দিয়ে, যদি সামনে বিপিন মাস্টারের বেতের ভয় না থাকতো ইতিহাসের ঘণ্টায়, তবে বড় মজাই হোতো। কিন্তু তা হবার নয়, এমন সুন্দর পথযাত্রার শেষে অপেক্ষা করচে রুক্ষমূর্তি বিপিন মাস্টার ও তাঁর হাতের খেজুর ডালের বেত।

একটি ছেলের নাম হারুণ, আর অপরটির নাম আবুল কাসেম। দুটি বেশ দেখতে, পাড়া-গাঁয়ের ছেলে, শান্ত চেহারা, অতি সরল, কলকাতা তো দূরের কথা, মহকুমার টাউন বনগাঁও কখনো দেখেনি। আবুলের হাতে অনেকগুলো পদ্মফুল, মাদলার বিল থেকে তুলেচে, ক্লাসের টেবিল সাজাবে, ফণি মাস্টার ফুল ভালোবাসেন, তাঁকে দিতে হবে।

হারুণ বললে—এই আবুল, এঁচড় পাড়বি?

—কোথাকার রে?

—চল না, রাস্তার গাছের। ও গাছ তো সরকারি, তুমিও পাড়তে পারো, আমিও পারি।

—কি হবে এঁচড়? বিপ্‌নে মাস্টারকে দিবি?

—তাই চল, যাবার সময়ে ওর বাড়ীতে দুখানা বড় দেখে দিয়ে যাই। মারের দায়ে বেঁচে যাওয়া যাবে এখন।

বেত্রভীতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার এ পথ ওদেরই আবিষ্কৃত। যেদিন ওরা এঁচড় দেয়, সেদিন ইতিহাসের ঘণ্টায় ওদের দেখতে পান না যেন বিপিন মাস্টার। অন্য সবাইকে মারেন। ওরা গাছে উঠে দুখানা বড় এঁচড় সংগ্রহ করলে। হারুণ উঠলো গাছে, আবুল রইল নীচে দাঁড়িয়ে। কোষ-ওয়ালা বড় এঁচড়। ইতিহাসের পড়া কারো হয় নি আজ।

রাস্তার ধারে বিপিন মাস্টারের টিনের বাড়ীটা। বাইরে কেউ নেই।

হারুণ ডাকলে—স্যার, স্যার—

বিপিনের স্ত্রী ঘুমচোখে বাইরে আসতে আসতে বলছিলেন—আপদগুলো সকালবেলাই এলে—

এমন সময় ওদের হাতের এঁচড় দেখে থেমে গিয়ে মুখে হাসি এনে, গলার সুর মোলায়েম করে বললেন—কিরে? এঁচড়? কোত্থেকে আনলি?

ওরা এঁচড় ফেলে চলে এলো। বিপিন মাস্টার ইস্কুলে গিয়েচেন ওদের আগে। আজ তাঁরই প্রথম পিরিয়ডে ক্লাস। একটু দেরি করে ক্লাসে ঢুকলে আট আনা জরিমানা করা তো বাঁধাধরা রুটিনের কাজ।

ওরা ঢুকলো ক্লাসে দুরু দুরু বক্ষে।

বিপিন মাস্টার কড়া সুরে হেঁকে বললেন—এই যে! হারুণ আর আবুল—এদিকে এসো—

ওদের একজন পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। বিপিন মাস্টার বললেন—দেরি কিসের ?

—আজ্ঞে, এঁচড়—

—কি ? এঁচড় ? কিসের এঁচড় ? সরে এসো এদিকে—

পিঠে বেত পড়বার আর দেরি নেই দেখে হারুণ ভূমিকাবাহুল্য না করে সংক্ষেপে আসল কথাটা বলবার প্রচেষ্টায় উত্তর দিলে—আপনার বাড়ীতে এঁচড়—

—কি ? আমার বাড়ীতে ? তার মানে ?

—এঁচড় দুখানা বেশ বড় বড়। আপনার বাড়ীতে দিয়ে এলাম।

—কবে ?

—এখন স্যার। তাইতে তো দেরি হোল—এঁচড় পাড়তে দেরি হোল—

বিপিন মাস্টারের উদ্যত বেত্র নেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। এ যে কতবড় অমোঘ মহৌষধ ওরা দুজনেই তা জানে। বিপিন মাস্টার আর কোনো কথা বললেন না, ওরা দুজনে গট্ গট্ করে ক্লাসের মধ্যে ঢুকে সামনের বেঞ্চির ভালো ছেলে যুগলকে ঠেলে সরিয়ে সেখানে বসবার চেষ্টা করতে যুগল দাঁড়িয়ে উঠে বললে—দেখুন স্যার, আমি কতক্ষণ থেকে বসে আছি এখানে আমাকে ঠেলে ওরা বসতে যাচ্ছে এত দেরিতে এসে—

বিপিন মাস্টার মুখ খিঁচিয়ে বললেন—বসতে চাইচে তা হয়েচে কি ? তোমার একার জন্যে বেঞ্চি হয় নি—সরে বসে ওদের বসতে দাও। ওরা কি দাঁড়িয়ে থাকবে—জেঁপো ছোকরা কোথাকার—

হারুণ এক ঠ্যালা মেরে যুগলকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে বসে পড়লো। আবুল বললো যুগলের ওখানে। যুগল বেচারীকে উঠেই যেতে হোল দুদিক থেকে ঠ্যালা খেয়ে। বিপিন মাস্টার দেখেও দেখলেন না। আজ তিন পিরিয়ড বিপিনবাবুর।

ওরা বুঝে-সুজেই আজ এঁচড় এনেচে। তিন পিরিয়ডের ধাক্কা সামলাতে হবে তো ? কিন্তু তার চেয়েও বড় ধাক্কা আজ পৌঁছলো এসে। ওরা দুজনে ক্লাসের বাইরে এসে দেখলে একখানা ঘোড়ার গাড়ী স্কুলের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে।

হারুণ বললে—কে রে ? কে এল ?

আবুল ঠোঁট উল্টে বললে—কি জানি !

এমন সময় ওপর ক্লাসের শিবনাথ মাস্টার বারান্দা দিয়ে আসতে আসতে বললেন—যাও সব ক্লাসে গিয়ে বোসো। ইন্‌স্পেক্টর বাবু এসেচেন—এখুনি ক্লাস দেখতে আসবেন—

সব ছেলে চুপচাপ ক্লাসে এসে বসে। আবুল ও হারুণ সেই সঙ্গে এসে বসে। ওদের গাঁয়ের পাশে রসুলপুর, সব মুসলমান চাষীদের বাস। সে গ্রাম থেকে পড়তে আসে একটি ওদের বয়সী ছেলে, নাম তার হায়দার আলি। হারুণ বললে—আমাদের পরণে ময়লা কাপড়—

হায়দার বললে—তাতে কি হয়েচে ?

—মার খাবি এখন—

—ইস্, তা আর জানি নে! মারলেই হলো।

কথাটা বললে বটে, কিন্তু মনে ততটা ভরসা ছিল না হারদারের। ভয়ে ভয়ে সে ক্লাসে গিয়ে ঢুকলো। একটু পরে সাহেবি পোশাক পরা ইন্‌স্পেক্টর এবং তাঁর পেছনে হেডমাস্টার ওদের ক্লাসে দেখা দিলেন। বিপিনবাবু চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

ইন্‌স্পেক্টর বাবু বললেন—এটি কোন ক্লাস? বেশ বেশ। এদের কিসের ঘণ্টা?

বিপিনবাবু বললেন—ইতিহাসের।

—বেশ বেশ।

পরে হারুণের দিকে চেয়ে বললেন—কি নাম?

হারুণ ভয়ে ভয়ে বললে—হারুণ অল-রসিদ।

—অ্যাঁ?

—স্যার, হারুণ-অল-রসিদ।

—বোগদাদ থেকে কবে এলে?

—আজ্ঞে, স্যার?

—বলি বোগদাদ ছেড়ে এখানে ছদ্মবেশে নয় তো?

হারুণ বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল। হেডমাস্টার হাসলেন।

—সরে এসো এদিকে। ইতিহাস পড়েচ?

—আজ্ঞে, স্যার।

—কুতুবুদ্দীন কে ছিলেন?

হারুণ বললে—রাজা।

—কোথাকার রাজা? কোথায় থাকতেন?

—বিলেতে।

—বেশ। আকবর কে ছিলেন?

—হারুণ ভেবে বললে—সেনাপতি—

—কার সেনাপতি?

—রাজার।

—কোন রাজার?

—বিলেতের।

—বাঃ বাঃ,—হারুণ-অল-রসিদ বোগদাদী, বেশ ইতিহাসের জ্ঞান তোমার। বোগদাদের খবর কি?

—অ্যাঁ?

—বলি বোগদাদের খবর কি?

হারুণ ভাবলে বোগদাদ হয়তো তাদের গ্রামের ইংরেজি নাম। তাই সে বললে—খবর ভালো, স্যার।

হেডমাস্টার ও ইন্‌স্‌পেক্টর হো হো করে হেসে উঠলেন। এর মধ্যে হাসবার ব্যাপার কি আছে, হারুণ তা খুঁজেই পেলে না। বিপিন মাস্টারের দিকে হঠাৎ ওর নজর পড়তেই দেখলে তিনি রোষকষায়িত নেত্রে ওর দিকে চেয়ে আছেন—ওকে গিলে খাবেন এই ভাব।

হারুণ ভেবে পেলে না কি এমন অন্যায় কাজ সে করে বোসলো।

বিপিন মাস্টার নিশ্চয়ই চটেছে, ওঁর মুখে তার রেশ আছে।

ইন্‌স্‌পেক্টর ওর দিকে চেয়ে বললেন—বেশ মজার ছেলেটি, সো সিম্পল্।

হেডমাস্টার বললেন—পাড়াগাঁয়ে বাড়ী, কিছুই জানে না।

—চলুন, অন্য ক্লাসে যাওয়া যাক।

ঘণ্টাখানেক পরে হেডমাস্টার এসে ওদের ক্লাসে বললেন—পুণ্যশ্লোক নৃপতি হারুণ-অল-রসিদের নামে তোমার নাম। তাঁর কথা কিছু জানো? তিনি ছিলেন গরীবের মা-বাপ, ছদ্মবেশে প্রজাদের দুঃখ দেখে বেড়াতেন। শিখে রেখো।

বিপিন মাস্টার ছুটির আগে ওদের ক্লাসে এসে বেত আস্ফালন করে বললেন—সরে এসো এদিকে, মুখ্যুর ধাড়ি। ক্লাসের মুখ হাসিয়েচ আজ। বেত লাগাই এসো। হারুণ কাঁদো কাঁদো মুখে এগিয়ে যেতেই হেডমাস্টারের ঘর থেকে স্কুলের চাকর এসে বললে—হারুণকে ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু ডাকচেন।

কি বিপদেই আজ পড়েচে ও। কার মুখ দেখে না জানি আজ সে উঠেছিল।

অফিসঘরে ওকে ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু জিজ্ঞেস করলেন—বাড়ী আপাতত কোথায়?

হারুণ ভয়ে ভয়ে বললে—জানিপুর।

—কতদূর এখান থেকে?

—দু মাইল, স্যার।

—কি খেয়ে এসেচো?

—পান্তা ভাত।

—মনসুর কোথায়?

—আজ্ঞে?

—খোজা মনসুর?

নাঃ, কি বিপদেই আজ ভগবান তাকে ফেললেন। এ সব কথা সে জীবনে কখনো শোনে নি। কেন এত বড় বড় লোক খাপছাড়া কথা বলে, যার কোনো মানে হয় না? উত্তর দিতে না পারলে এখুনি বিপ্‌নে মাস্টার বেত উঁচিয়ে আসবে মারতে।

হারুণের মুখ শুকিয়ে গেল। ও করুণ নয়নে একবার ইন্‌স্‌পেক্টরবাবুর দিকে চেয়ে দেখে চোখমুখ নিচু করলে। একবার এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলে বিপ্‌নে মাস্টারটা ও-ঘরে কোথাও আছে নাকি। সকালের এঁচড় পাড়া আজ একেবারে মাঠে মারা গেল। অদৃষ্ট আর কাকে বলে? নাম রেখেচেন তার বাপ-মা, তার কি দোষ?

কখন তার চোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো ওর অজ্ঞাতসারে।

ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু বললেন—কেঁদো না খোকা। যাও, বাড়ী যাও। তোমার নামটা খুব বড় একজন ভালো লোকের নাম। ইতিহাসের প্রসিদ্ধ লোক, বুঝলে, যাও—

স্কুল থেকে বাড়ী যাবার পথে আবুল বললে—এঁচড় আজ না দিয়ে কাল দিলেই হোত। আজ তো পড়াই হোল না। তোকে কি বলছিল রে ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু?

হারুণ বললে—তুই পাড়গে যা এঁচড়। বিপ্‌নে মাস্টারকে আজ এখুনি চার-পাঁচখানা দিয়ে আসি। কাল নইলে আজকের শোধ তুলবে। কি মুশকিলে পড়েছিলাম আজ বল্‌ তো!

বেলা দুপুর উত্তীর্ণ হয়ে গেলে দুজনে বাড়ী পৌঁছল।

সুলেখা

অজ-পাড়াগাঁয়ের পথে যখন গাড়ী ঢুকলো তখন সুলেখার কান্না এল। এই সে কলকাতার ইস্কুলে-কলেজে পড়েছিল? এই পাড়াগাঁয়ে শ্বশুরবাড়ী হবে, যত অশিক্ষিতাদের মাঝখানে দিন কাটাতে হবে! কলকাতার নীলিমাদের বাড়ী গিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় চায়ের আড্ডা, সেখানে জগদীশ বড়ুয়া ও হিরণ্ময় মিত্র সম্বন্ধে আলোচনা, ভয়েল কাপড়ের জরির ধারে কি রঙের পাড় সেলাই হবে এ-সম্বন্ধে গভীর গবেষণা, গৌরীদের বাড়ী গিয়ে রেডিওতে নতুন নতুন গান শোনা—সব শেষ হয়ে গেল। গানের সে ভীষণ ভক্ত। ভালো গান শুনতে পেলে আর কিছু সে চায় না।

এ-সবের এই পরিণতি?

এই জন্যে কাকা তাকে ইস্কুলে দিয়েছিলেন? না দিলেও পারতেন। আরও অল্প-বয়সে বিয়ে দিলেও চলতো। তার চোখ ফোটবার আগেই। কথাটা সে কাউকে বলতেও পারলে না, বলতে পারলে বোঝা নেমে যেতো অনেক।

স্বামীকে তার পছন্দ হয়েছিল।

স্বামী শ্যামবর্ণ, অল্প বয়েস। বি-এ পাশও করেচেন। কিন্তু হোলে কি হবে, তিনি বিদেশে চাকরি করেন, গল্প-গুজব করবার জন্যে তাঁকে পাওয়া যাবে না সব-সময়। অশিক্ষিতাদের মধ্যে অজপাড়াগাঁয়ে একা-একাই দিন কাটাতে হবে। মরে যাবে সে। নীলিমা কলেজে পড়ে রইল, ও এবার আই-এ পাশ করবে,—সামনে কত আনন্দভরা মুক্ত জীবন!

সে আটকে গেল, ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল-ঝাঁঝির দামে। জীবনের গতি ওর বন্ধ হয়ে গেল।

সন্ধ্যা হয়েচে······

একটি জীর্ণ একতলা বাড়ীর সামনে ওদের গাড়ী এসে পৌঁছলো। কতকগুলো প্রাচীনা,

কতকগুলো পাড়াগেঁয়ে-বৌ, তাদের মুখে চোখে না আছে বুদ্ধির দীপ্তি, না আছে কিছু, তারাই এসে সুলেখার চারিধারে ভিড় জমালে। কলকাতার বাসাতেই বৌভাত হয়ে গিয়েছিল। কোনো আচার-অনুষ্ঠান বাকি ছিল না, থাকলে আরও বিরক্তিকর হয়ে উঠতো ব্যাপারটা।

স্বামীর ছুটি নেই। তিনি তাকে পৈতৃক-বাড়ীতে প্রাচীনদের হাতে পৌঁছে দিয়েই সরে পড়লেন। মিলিটারি চাকরি, বিশেষ ছুটিছাটা নেই। যদি সময় পান, পুজোর সময় আসবেন বলে গেলেন।

সমীর চলে গেলে, সুলেখা কান্নায় ভেঙে পড়লো। একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে গেল সে। কি-ভাবে দিন কাটবে এখানে বুড়িদের মধ্যে? যারা বাইরের জগতের কোনো সংবাদ রাখে না এমন তিনকাল-গিয়ে-এককালে-ঠেকা দন্তহীন বুড়োদের মধ্যে।

টাকা ছিল না কাকার। নতুবা শহরে বিবাহ হোতো।

যাক সে কথা। ছেলে দেখে বিয়ে দেওয়া। ছেলে সত্যিই ভালো। স্বামীকে সে গর-পছন্দ করে নি। ভালো ছেলে, পাশকরা, স্বাস্থ্যবান। গ্রামের বাড়া জীর্ণ বটে, কিন্তু বেশ বড়। অনেক নাকি জায়গা-জমি আছে, প্রজাপত্তর আছে, আগান-বাগান, পুকুর, বাঁশঝাড় আছে। বনেদি সেকেলে গৃহস্থ।

তবে ওই যা কথা, সেকেলে—একেবারে সেকেলে।

শাশুড়ি সুলেখাকে দিয়েচেন একছড়া ভারি সেকেলে মুড়কি-মালা হার। দিয়ে বলেছিলেন —বৌমা, বড় পয়মন্ত জিনিসটা। আমার শাশুড়ি আমাকে এই হার দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন, আমি তোমাকে দিলাম আবার। তুমি আবার দিও তোমার ছেলের বৌকে—জন্মোএইস্ত্রী হও, আমার মাথায় যত চুল আছে ততদিন সমীর বেঁচে থাকুক!

সুলেখা শাশুড়ির পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। হারছড়াটা ভারি বটে, কিন্তু একালে ও-হার কেউ পরে? গৌরী কি ভাববে, কলেজের অনুদি কি ভাববে, যদি ও আজ মুড়কি-মালা হার গলায় দিয়ে কলকাতায় গিয়ে হাজির হয়?

দিন পাঁচ-ছয় কেটে গেল।

সুলেখাকে ভোরে উঠে কাজকর্মে বড়-জা নীরদাকে সাহায্য করতে হয়। অবিশ্যি নতুন বউ বলে এখনো কাজের ভার তেমন ঘাড়ে চাপে নি, কিন্তু নীরদাকে দিয়ে সে বুঝতে পারে এ সংসারে পুরনো বউ হয়ে গেলে কি ধরনের খাটুনিটা আশা করা যায়।

নীরদা উদয়াস্ত খাটে, টিন-টিন ধান সেদ্ধ করে, বোঝা-বোঝা ক্ষার কাচে, খই মুড়ি ভাজে, দু-বেলা রান্না করতে আসে, এখন ওরা একবেলার ভার সুলেখার উপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টায় আছে বোধ হয়। নিতান্ত চক্ষুলজ্জায় বলচে না।

সুলেখা রাঁধতে জানে না যে তা নয়—কিন্তু গেঁয়ো রান্না চচ্চড়ি, সুক্তুনি, মোচার ঘণ্ট, ঝালের ঝোল, বড়ির টক—এসব সে রাঁধতে জানে না। তাছাড়া, ভালোও লাগে না এসব তার। এ-ভাবে জীবন নষ্ট করার কি মানে হয়?

সুলেখা সুন্দরী মেয়ে, কলেজের থিয়েটারে গতবার মালিনীর পার্ট নিয়েছিল। সুশ্রী চেহারার জন্যে আর চমৎকার গানের গলার জন্যে যা মানিয়েছিল ওকে! গৌরীর মা টিসু-শাড়ি পরিয়ে, সোনার গহনা দিয়ে, কপালে অলকাতিলকা এঁকে ওকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিলেন—ইংরেজী অধ্যাপিকা তরুণী উষাদি গ্রিন্-রুমে এসে ওকে কিভাবে অভিনন্দিত করলেন—এসব কথা তো আর বছর রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের দিনের!

আজ মনে হচ্ছে কত কাল…

সে-সব দিন শেষ হয়ে গেল।

এর চেয়ে তার না-ই বা বিয়ে হোতো? থাকতো সে উষাদির মত, নলিনীদির মত, মিস সেনের মত, মিস বিধুবালা গাঙ্গুলির মত অবিবাহিতা।

হাতে ভ্যানিটি-ব্যাগ ঝুলিয়ে, খাটো ছাতা-হাতে ট্রাম ধরতে ছুটতো বেলা সাড়ে দশটায়। যেখানে খুশি তুমি যাও, সিনেমা ছাখো, নাচগানের জলসা ছাখো ফার্স্ট ক্লাসে নিউ এম্পায়ারে—কি মজা!

সকালবেলা। ওর বড়-জা এসে বললে—রাঙা-বৌ, এক কাজ করতে হবে যে!

সুলেখা বললে—কি দিদি!

—কলাইয়ের ডাল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এগুলো ছাদে নিয়ে গিয়ে রোদে দাও, তারপর বেলা পড়লে ঝেড়ে তুলতে হবে। বুঝলে?

—বেশ।

—পারবে তো?

—করি নি কখনো, তবে চেষ্টা করি।

সুলেখা ডাল ছাদে দিয়ে এসেছে, তারপর আর ডালের কথা ওর মনে নেই। দুপুরে আহারের পরে একটু শোবামাত্র ওর ঘুম এসেচে। বেলা দুটোর সময় কালো-ভোমরার মত মেঘ করে নেমেচে ঝম্ ঝম্ জল। ও অঘোরে ঘুমুচ্চে তখন। ঘুম যখন ভেঙেচে তখনও সমানে বৃষ্টি হচ্চে। শ্রাবণ মাসের বৃষ্টি খানা-ডোবা ভর্ত্তি করে ফেলেচে দু ঘণ্টার মধ্যে। সুলেখা উঠে চোখ মুছতে মুছতে জানালা দিয়ে দেখে অবাক হয়ে গেল। বৃষ্টির এমন রূপ সে শহরে দেখে নি কখনো। বকুল গাছের গুঁড়িটা কালো দেখাচ্ছে বৃষ্টির ধারায়। ছাতারে পাখীগুলো অঘোরে ভিজচে—এ যেন রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটার কথা মনে এনে দেয়—

এদের কোনো ব্যবস্থা নেই। এই সময় খেতে হয় গরম-গরম চা। সে নতুন-বৌ, চা তৈরি করতে যেতে পারে না। কিন্তু কারো কি সেদিকে দৃষ্টি আছে, না কেউ কিছু বোঝে?…ও-মাগো, ওদের বাড়ীর বুড়িটা কি করে ভিজচে এই জলে নারকোলপাতা কুড়ুতে। পাড়াগেঁয়েদের কাণ্ডই আলাদা।

এমন সময় ওর জা ঘরে ঢুকে বললে—রাঙা-বৌ, ডালগুলো তুলেছিলে ছাদ থেকে?

সর্ব্বনাশ! সেকথা একদম মনে নেই সুলেখার। লজ্জায় তার সুন্দর মুখ লাল হয়ে উঠলো। অপ্রতিভ সুরে বললে—ওই যাঃ! সেকথা মনেই নেই দিদি—এক্ষুনি আমি যাচ্ছি ছাদে—

লজ্জায় সুলেখার মনে হচ্ছিলো যে, মাথা কুটে মরে।

এই সব অশিক্ষিতার দল তাকে কি রকম আনাড়িই না মনে করচে। তাকে 'স্মার্ট' বলে সবাই জানতো কলেজে। সুলেখা ধড়মড় করে উঠে ছুট দিল ছাদের দিকে, ওর জা সস্নেহে ওর দিকে চেয়ে বললেন—ছুটতে হবে না রাঙা-বৌ, বোসো—বোসো।

—বলবো কি দিদি, ডাল যে ভিজে নষ্ট হয়ে গেল!

—সে কি এখনো ছাদে আছে ভাই? তুমি ঘুমুচ্ছিলে যখন বিষ্টি এল, সে আমি তুলে আনলুম যে।

কৃতজ্ঞতায় সুলেখার সুন্দর চোখের দৃষ্টি, বিনত হয়ে এল। সত্যি ভালো লোক বটে, তার জা। মজা দেখবার মত লোক নয়। ও বললে—বাঁচলুম দিদি। ধন্যবাদ। তুমি আমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচালে।

সুলেখার জা মুখে কাপড় দিয়ে হেসে বললে—রাঙা বৌয়ের থিয়েটারি-ধরনের কথা শুনে হেসে মরি! ও-মাগো…

এ-একটা মস্ত বড় পরাজয়ের দিন বলে সুলেখা মেনে নিলে।

ডাল কখনো তোলে নি সে, অতশত তার মনে থাকে না পাড়াগাঁয়ের লোকের মত।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ও-পাড়ার কামিনী এসে বললে—কি হচ্ছে গো বৌদিদি?

—চুল বাঁধচি, এলো ঠাকুরঝি। চুলের দড়িটা ধরো তো।

—গান করবে?

—সন্দে-বেলা গান করলে, শাশুড়ি আমায় ভালো চোখে দেখবেন? একেই তো আনাড়ি হয়ে আছি এ-বাড়ির মধ্যে। সে হবে না ভাই। তবুও তুমি আজ প্রথম বললে গানের কথা।

—কেউ বলে নি বুঝি তোমায় বৌদিদি?

—কে আর বলচে।

এই সময় সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো ঘন হয়ে—কামিনী চলে যাবার জন্যে বাইরে এসে দাঁড়ালো। বললে—চলি আজ বৌদিদি, আর একদিন আসবো।

এক-পসলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েচে সেদিন বিকেলে। সুলেখার ঘরের জানালার ঠিক বাইরে নেবুগাছে নেবুফুল ফুটেচে—বৃষ্টিসজল অপরাহ্নের বাতাসে ভুরভুরে নেবুফুলের গন্ধ…

বড় জা নীরদা ওর ঘরে ঢুকে বললে—কি হচ্ছে রাঙা-বৌ?

—আসুন দিদি। কি আর হবে, এমনি বসে আছি।

—রান্নাঘরে চলো। দুটো ডাল ভাজবো, তুমি বসে বসে কুলোয় ঝাড়বে।

—আচ্ছা দিদি, সবসময় এসব কাজ তোমাদের ভালো লাগে? একটু অন্য রকমের কাজ—একটু ভালো কাজ…

নীরদা হেসে বললে—সময় নেই ভাই। দেখচো তো সংসারের কাজ নিয়ে বেহাত্তি। —ওরই মধ্যে সময় করে নিতে হয়—

বিরক্তিতে সুলেখার মন ভরে উঠলো। এমন সব অশিক্ষিতাদের মধ্যেও সে এসে পড়েচে। এরা শুধু জানে ডাল ভাজতে আর ভাত রাঁধতে। শুধু খাওয়া আর খাওয়া।

নীরদা বললে—তুমি তো রাঙা-বৌ নতুন এসেচো। এখন প্রথম প্রথম তোমার খারাপ লাগবে—এর পর এই আবার লাগবে ভালো। তখন অন্য কিছুতে মন যাবে না।

সুলেখা মনে-মনে বললে—সে দিন আমার জীবনে হঠাৎ না আসুক।

চক্ষুলজ্জার খাতিরেও ওকে গিয়ে ডাল ভাজতে বসতে হোলো রান্নাঘরে। দুটি ঘণ্টা সে কি খাটুনি! নীরদা ডাল ভেজে দিচ্ছে আর ও আনাড়ি-হাতে কুলোতে ঝাড়চে। অনেক রাত্রে ঘুম-চোখে সুলেখা এসে যখন বিছানায় শুয়ে পড়লো, তখন তার মন অবসাদে ও ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েচে। কি কর্মফলে এমন সংসারে সে এল?

অনেক রাত্রে সেদিন ঘুম ভেঙে উঠে সুলেখা শুনলে কে গান গাইচে···

সুলেখা উৎকর্ণ হয়ে শোনবার চেষ্টা করলে—গুন্ গুন্ করে কে গান ভাঁজচে—নিপুণ-কণ্ঠের আলাপ। ও ভাবলে—বা রে, এমন জয়জয়ন্তী আলাপ করে কে?

সুলেখা নিজে গায়িকা। সে বুঝলে, যে এই গুন্ গুন্ সুরে আলাপ করচে, সে নিপুণা গায়িকা। সুলেখা অমন আলাপ করতে পারলে নিজেকে ওস্তাদ মনে করতো। কিন্তু এ কি সম্ভব?

এখানে কে গান গাইবে এমন?

সুলেখা আরও শোনবার জন্যে বাইরে এসে দাঁড়ালো, সেই সময় গানও হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। যে গাইছিল, সে অন্যমনস্কভাবেই একটুকরো গান অল্প একটু সময়ের জন্যে গাইছিল—ঠিক গান গাইবার জন্যে নয়।

সুলেখা ঘুম ও বিস্ময়জড়িত চোখে এসে শুয়ে পড়লো। সকালে উঠে এ-ঘটনার কথা ওর মনে ছিল না, কিন্তু একটু বেলা বাড়লেই মনে এলো রাত্রের সেই অস্পষ্ট জয়জয়ন্তীর সুর। তখুনি সে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলে সমস্ত ঘটনাটা। স্বপ্নের ব্যাপার হয়তো সমস্তটা···

গ্রামের ও-পাড়ায় সুলেখা কখনো যায় নি। এবার একদিন ও-পাড়া থেকে কয়েকটি মেয়ে ওকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেল। তারা সকলেই একবাক্যে সুলেখার রূপের প্রশংসা করলে, চা খেতে বলে রান্না-বান্নার গল্প করলে। এরা চোখ থাকতে অন্ধ নাকি? এমন যে সুন্দর লাইলাক-রঙের জরিপাড় শাড়ী পরে আছে সুলেখা, তার দিকে কারও চোখ গেল না? কেউ বললে না—সে-কথা! না বললে বিখ্যাত ছবি 'মায়ামুকুর' সম্বন্ধে পুড়িয়ে-খেতে একটা বাক্যি। সুলেখা ওদের কাছে 'মায়ামুকুর'-এর গল্পটা করেচে, ওর সব গানগুলিই সে গাইতে পারে এ-কথাও জানিয়ে দিয়েচে, অথচ—গান গাইতে বললেও না তাকে কেউ! হিরণ্ময় মিত্রের গান সবগুলো—কে জানে না হিরণ্ময় মিত্রকে, তাঁর সুকণ্ঠকে?

সুলেখার ইচ্ছে হোল, এই মূঢ় অশিক্ষিতা মেয়েগুলোর সামনে একবার হারমোনিয়মটা

টেনে নিয়ে 'চাঁদের দেশের রাজকুমারীর কিংবা 'এবার ফাল্গুন এলে এসো এসো'র অপূর্ব সুরগুলো ঘর ভরিয়ে দেয়।

কারণ, যে-বাড়ীতে ওকে নিয়ে গিয়েছিল, একটা ভাঙা হারমোনিয়ম ছিল সে-বাড়ীতে। একটি এগারো-বারো বছরের ছোট মেয়ে বেসুরে একটা সেকেলে শ্যামাসঙ্গীতও গেয়েছিল—বোধ-হয় তাকেই বিশেষ করে শোনাবার জন্যেই। এ-গ্রামে কেউ বোধহয় খবর রাখে না যে সে একজন গায়িকা।

বাড়ী ফিরে দেখলে, ওর জা তাদের বড়া ভাজবে বলে তালেড় রস বার করচে। ওকে দেখে বললে—রাঙা-বৌকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে তোমরা?

মেয়ের দল বললে—তুমি তো আর যাবে না বড়বৌদি, তুমি গেলে অবিশ্যি আজ খুব ভালো হোতো। আমাদের সে ভাগ্যি কি আর আছে।

নীরদা বললে—বোস সবাই। তালের ফুলুরি খাবি। রাঙা-বৌ, তুমি তালের গোলাটা করো, আমি কড়ায় তেল চড়িয়ে দিই।

একটি ধামা বড়া ভেজে যখন ওরা উঠলো তখন রাত ন'টা। মেয়ের দল ইতিমধ্যে দু'দশটা বড়া খেয়ে চলে গিয়েচে। সুলেখার এসব কাজ অভ্যাস নেই। ঠায় বসে থাকা রান্নাঘরের গরমে কতক্ষণ পোষায়? এরা শুধু জানে, ভোজনের তরিবৎ করতে সকাল থেকে রাত বারোটা পর্য্যন্ত।

মনে পড়লো, ওদের কলেজের এক অধ্যাপক বলেছিলেন, বাঙালীর ঘরে রান্নার বন্দোবস্ত যে ধরনের, তাতে খাটুনি এবং আয়োজন যত বেশি, খাদ্যবস্তুর পুষ্টিকারক গুণ তত নেই! জিবে ভালো লাগানোর দিকে যত লক্ষ্য, খাদ্যের গুণাগুণের দিকে তত লক্ষ্য থাকলে আজ বাঙালীর স্বাস্থ্য এত খারাপ হোতো কি?

বসে-বসে শুধু নির্ব্বোধের মত একরাশ তালের বড়া ভাজা…

ওর বড়-জা রান্নাঘরে বসে ওকে বললে—রাঙা-বৌ, আমার ঘর থেকে গামছাখানা নিয়ে এসো না ভাই, গা ধুয়ে নিই কুয়োতলা থেকে। বড্ড গরম লাগচে বড়া ভেজে।

সুলেখা বললে—আলো আছে তোমার ঘরে?

—নেই। হারিকেনটা নিয়ে যাও ভাই।

বড়-জার ঘরে ঢুকে গামছা খুঁজতে গিয়ে সুলেখার চোখে পড়লো একটা জিনিস।

ঘরের ছোট্ট টেবিলটার ওপর একখানা খাম পড়ে আছে, 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' ছাপা আছে তার ওপরে। খামটাতে নাম লেখা আছে, নীরজাসুন্দরী মিত্র, রায়গ্রাম, বাহিরগাছি পোষ্ট, জেলা নদীয়া। তাড়াতাড়ি সে খামখানা খুলে ফেলে পড়লে—সতেরোই আগস্ট তারিখে নীরজা-সুন্দরী মিত্রের গান আছে রেডিওতে, তারই চিঠি ও কনট্রাক্ট ফরম্। উল্টেপাল্টে দেখলে সুলেখা, কোনো ভুল নেই কোথাও। নির্ঘাৎ রেডিও-কনট্রাক্টের চিঠি।

কিন্তু কার নামে? নীরজাসুন্দরী মিত্র কে? একটা অস্পষ্ট সন্দেহ ওর মনে জাগলো। তাই যদি হয়? তখুনি সে রান্নাঘরে ছুটে এসে চিঠিখানা দেখিয়ে বললে—এ কার চিঠি, দিদি?

নীরজাসুন্দরী কে?

ওর মা ভাজিছল্যের হাসি হেসে বললে—দূর! ও-আবার তুমি দেখতে গিয়েচো? আমারই নাম। নীরজা থেকে পাড়াগাঁয়ে সবাই বলে—নীরদা।

—কিন্তু মিত্র কেন? ঘোষ হবে তো?

—বিয়ের আগের নামটাই চলে আসচে রেডিও-আপিসে। ওরা আর বদলায় নি। ও কিছু নয় ভাই—রেখে দে। ঠাকুরপোকে বারণ করে দিইছিলাম, নতুন বৌকে একথা বোলো না, আবার লজ্জা করে। তাছাড়া আমার দাদার বারণ ছিল, শ্বশুরবাড়ীর গ্রামে এসব কথা জানালে কে কি বলবে। দাদা আমাকে গান শিখিয়েছিলেন কিনা? হিরণ্ময় মিত্র, নাম শুনেচ বোধহয়?

বিখ্যাত গায়ক হিরণ্ময় মিত্রের ছোট বোন ও শিক্ষা সুগায়িকা নীরজাসুন্দরী মিত্র তার সামনে বসে তালের বড়া ভাজচে! সুলেখা শ্রদ্ধায় ও স্নেহে নিজের আঁচল দিয়ে বড়ো জার মুখ মুছে দিতে দিতে বললে—একদিন দিদি জয়জয়ন্তী ভাঁজছিলেন তাহলে আপনিই অনেক রাতে? ঘুমের ঘোরে শুনে সেদিন—পায়ের ধুলো দিন—তখন আমি ধারণাই করতে পারি নি। এতদিন বলা উচিত ছিল আমাকে। আমি কি করে জানবো?

রূপো-বাঙাল

আমি সকালে উঠেই চণ্ডীমণ্ডপে যেতাম হীরু মাস্টারের কাছে পড়তে।

আজ ঘুম ভাঙতে দেরি হওয়ায় মনে হলো কাল অনেক রাত্রে বাবা বাড়ী এলেন মরেলগঞ্জ কাছারী থেকে। আমরা সব ভাইবোন বিছানা থেকে উঠে দেখতে গেলাম বাবা আমাদের জন্যে কি কি আনলেন।

চণ্ডীমণ্ডপের উঠোনে পা দিতেই রূপো কাকা আমাদের বকে উঠলো—এ্যাঃ রাজপুত্তুর সব উঠলেন এখন! মারে গালে এক এক চড় যে চাষালিটা এমনি যায়! বলি, করে খাবা কি ভাবে? বামুনের ছেলে কি লাঙল চষতি যাবা?

বাবা বাড়ী থাকতেও রূপো কাকা আমাদের চোখ রাঙাবে।

দাদা ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলে—রাতে ঘুম হয় নি রূপো কাকা।

—কেন রে?

—ছারপোকায় কামড়ে। বাব্বাঃ, যা ছারপোকা খাটে।

—যা যা তাড়াতাড়ি পড়তে যা।

রূপো কাকা আমাদের আত্মীয় নয়, বাবার বন্ধু নয়, বাড়ীর গোমস্তা কি নায়েব নয়, এমন কি রূপো কাকা হিন্দু পর্য্যন্ত নয়। রূপো কাকা আমাদের কৃষাণ মাত্র। মাসে সাড়ে তিন টাকা মাইনে পায়।

রূপো কাকার আসল নাম রূপো বাঙাল, ও জাতে মুসলমান। আমাদের গাঁয়ের চৌকিদারও ও। পিসিমার মুখে শুনেছি রূপো কাকা নাকি সাজিমাটির নৌকাতে চড়ে ওর কুড়ি বাইশ বছর বয়সের সময় দক্ষিণ দেশ থেকে আমাদের গ্রামের ঘাটে নিরাশ্রয় অবস্থায় এসে নেমেছিল। কেন এসেছিল দেশ থেকে তা শুনি নি। সেই থেকে আমাদের গ্রামেই রয়ে গিয়েচে—বিদেশ থেকে এসেছিল বলে উপাধি 'বাঙাল'—এ উপাধিরই বা কারণ কি তা বলতে পারব না।

রূপো কাকা আমাদের বাড়ীর কৃষাণগিরি করচে আজ বহুদিন। আমাদের ও জন্মাতে দেখেচে। কিন্তু সেটা আশ্চর্য্য কথা নয়, আশ্চর্য্যের কথা হচ্ছে এই যে, ও আমার বাবাকে নাকি কোলে করে মানুষ করেচে। অথচ রূপোকাকাকে দেখলে তেমন বুড়ো বলে মনে হয় না।

আমারই ঠাকুরদাদা হরিরাম চক্রবর্ত্তী গাড়ু হাতে নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সায়েবের ঘাটে কই মাছ কেনবার জন্যে। রূপো কাকা সাজিমাটির নৌকাতে বসে ছিল। ওর অবস্থা দেখে হরিরাম চক্রবর্ত্তী ওকে গ্রামে আশ্রয় দেন। সে সব অনেক দিনের কথা। রূপো কাকার বয়স এখন কত তা জানি না, মোটের উপর বুড়ো। ঠাকুরদাদা যখন মারা যান, বাবার তখন পঁচিশ বছর বয়েস। বাবাকে তিনি নায়েব পদে বহাল করে গেলেন জমিদার বাবুকে বলে করে। সেই থেকে বাবা আছেন মরেলডাঙা কাছারীতে। আর বাড়ীতে বিষয়সম্পত্তি দেখা-শোনা, প্রজা, খাতকপত্র এ-সব দেখা-শুনো করার ভার ঐ সাড়ে তিন টাকা মাইনের কৃষাণ রূপো কাকার ওপর।

আমাদের অবস্থা ভাল গ্রামের মধ্যে—এ কথা সবার মুখেতে শুনে এসেচি জ্ঞান হয়ে অবধি। বড় বড় চার-পাঁচটা ধানের গোলা। এক একটিতে অনেক ধান ধরে। কলাই মুগ অজস্র। প্রজাপত্র সর্বদা আসচে খাজনা দিতে।

এ সব দেখা-শুনা করে কে?

রূপো কাকা সব দেখা-শুনা করতো। আশ্চর্য্যের কথা, বাবা বিশ্বাস করে এই সামান্য মাইনের মূর্খ কৃষাণকে এত সব বিষয়-আশয় দেখবার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

বাবাকে সবাই ভীষণ ভয় করে চলতো; মুখের ওপর কথা বলতে সাহস করতো না কেউ। কিন্তু রূপো কাকা বাবাকে বলতো—বলি, ও বাবু, তুমি যে এলো বাড়ীতি ন মাস ছ মাস অন্তর, এতডা বিষয় দেখে কে বল তো। আদায়-পত্তর ত এ বছর কিছু হলো নি। হাতীর পাঁচ পা দেখেচো নাকি? এত বড় সংসারটা চলবে কিসি?

বাবা ছ মাস অন্তর দু-তিন দিনের জন্য বাড়ী আসেন।

বাবার অনুপস্থিতিতে গোলার চাবি খুলে রূপো কাকা ধান পাড়তো, কলাই মুগ পাড়তো। খাতকদের কর্জ্জ দিতো। নিজের দরকার হলে নিজেও নিতো।

আমরা সব ছেলেমানুষ, কিছুই বুঝি নে। ঠাকুরমা প্রবীণা বটে, কিন্তু ভালমানুষ। বিষয়-আশয়ের কিছুই বুঝতেন না। আমাদের আছে সব, কিন্তু দেখে নেবার লোক নেই।

সে অবস্থায় সব কিছুর ভার ছিল রূপো কাকার ওপর।

বাবা বাড়ী এসে পরদিন চণ্ডীমণ্ডপে বসতেন মহাজনী খাতা খুলে।

বলতেন—কে কি নিয়েচে রূপো?

রূপো কাকা বলতো—লিখে রাখো, সনাতন ঘোষ ছ কাঠা কলাই, দু কাঠা বীজ মুগ, কড়ি ছ কাঠা—

—আচ্ছা।

—হয়েচে? আচ্ছা লেখো—বীরু মণ্ডল দু বিশ ধান, কড়ি পাচ সলি—

—আচ্ছা।

—হয়েচে?

—হয়েচে।

—রূপো বাঙাল একবিশ ধান দু কাঠা কলাই—

—আচ্ছা।

—হয়েচে?

—হয়েচে।

—লেখো, কাটু কলু চার কাঠা কলাই, কড়ি চার কাঠা। ময়জদ্দি সেখ, ধান এগার কাঠা, কড়ি সাত কাঠা।

এইভাবে রূপো কাকা অনর্গল বলে চলেচে গত দু মাসের মধ্যে কর্জ্জ দিয়েচে যাকে যতটা জিনিস। ওর সব মুখস্থ, কোনো কিছু ভোলে না। ওরই হাতে গোলার চাবির থোলো। যাকে যা দরকার দিয়ে সব মনে করে রেখে দিয়েচে, বাবার খাতায় লেখাবার জন্যে।

একদিন একটা ঘটনা ঘটলো।

রূপো কাকার জ্বর হয়েছিল, আমাদের বাড়ীতে আসে নি দু-তিন দিন।

এমন সময় বাবা বাড়ী এলেন মরেলডাঙা থেকে। এসেই রূপোকে ডেকে পাঠালেন। রূপো জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে বললে—বল গে যাও, আমি জ্বরে উঠতি পারচি নে। এখন যেতি পারবো না—জ্বরে মরচি। তা সীতানাথ আর আসতে পারলে না পায়ে পায়ে? তার একটু এলে কি মান যেতো?

বাবা বাবু মানুষ। নতুন বাবু, রূপো বাঁধানো ছড়ি হাতে নিয়ে বেড়ান, কোঁচা হাতে নিয়ে। ঘড়ির চেন ঝোলে বুকে, হাতে থাকে ঝকঝকে আংটি। প্রজাপত্তরের কাছে খুব খাতির। বাবাকে যখন লোকে ফিরে এসে একথা বললে, তখন বাবা একেবারে তেলেবেগুনে উঠলেন জ্বলে। কিন্তু তখন কিছু না বলে গুম্ হয়ে রইলেন।

এর দিন পাঁচ-ছয় পরে রূপো কাকা সেরে উঠে আমাদের বাড়ী এল। বাবা তখন চণ্ডীমণ্ডপে বসে হিসেবের খাতাপত্র দেখছিলেন। ওকে দেখেই কড়া সুরে বলে উঠলেন—রূপো!

—কি ?

—তুমি মনে মনে কি ভেবেচ জিজ্ঞেস করি ? তোমার এতবড় আস্পর্দ্ধা, তুমি বলো আমি পায়ে পায়ে তোমার বাড়ী যাবো ? তুমি জানো, কার সামনে তুমি দাঁড়িয়ে আছ ? তোমার মুণ্ডুটা যদি কেটে ফেলি তা হলে খোঁজ হয় না তুমি জানো ? এত বড়লোক তুমি হোলে কবে ?

রূপো কাকাও সমানে গলা চড়িয়ে উত্তর দিলে—তা তুমি মাথা কাটবে না ? এখন কাটবে না ? এখন কাটবে বৈকি ! হাঁারে সীতেনাথ, তোকে যে কোলে করে মানুষ করেছিলাম একদিন, মনে পড়ে ? এখন তুমি বড় হয়েচ, বাবু হয়েচ, সীতেবাবু—এখন তুমি আমার মুণ্ডু কাটবা না ? বড্ড গুণবন্ত হয়েচিস তুই, হ্যাঁ সীতেনাথ—

'তুমি' ছেড়ে রূপো কাকা, সামান্য সাড়ে তিন টাকা মাইনের কর্ম্মচারী হয়ে মনিবকে 'তুই' বলেই সম্বোধন আরম্ভ করলে সকলের সামনে।

বাবা বললেন—যা যা, বকিস নে—

—না বকবো না—তুই বড্ড তালেবর হয়েচিস আজকাল, বড্ড বাবু হয়েচিস—তুই আমার মুণ্ডু নিবি না তো কে নেবে ?

বলেই রূপো কাকা হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললে।

আমার ঠাকুরমা ছিলেন বাড়ীর মধ্যে। রূপোর কান্না শুনে তিনি বাইরে ছুটে এসে বাবাকে যথেষ্ট বকলেন।

বাবা বললেন—তা বলে আমায় ওরকম বলে কেন ?

ঠাকুরমা বললেন—তুই কাকে কি বলিস সীতে, তোর একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই ? তুই কি ক্ষেপলি ?

বাবা কলম ছেড়ে বাড়ীর মধ্যে উঠে এলেন, তারপর রূপো কাকার হাত ধরে বললেন—রূপোদা, তুই কিছু মনে করিস নে। আমার বলা ভুল হয়ে গিয়েচে, বড্ড ভুল হয়েচে।

রূপো কাকার রাগ কমে না, বললে—না, আমার দরকার নেই কাজে। ঢের হয়েচে। নে, তোর গোলার চাবিছড়া রেখে দে—মুই আর ওসব ঝামেলা পোয়াতে পারবো না। নে তোর চাবিছড়া।

কতবার বোঝানো হলো, রূপো কাকা কিছুতেই শুনবে না। চাবির থোলো সে খুলে বাবার সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

শেষে বাবা বললেন—বেশ, তা হলে আমিই বাড়ী ছেড়ে যাই। রইল গোলা পালা, প্রজাপত্তর। আমি কাল সকালের গাড়ীতেই বেরুচ্চি—

রূপো কাকা ঝাঁঝের সঙ্গেই বললে—তুই চলে যাবি তা তোর কাচ্চাবাচ্চা মানুষ করবে কেডা ?

—কেন, তুমি ?

—মোর দায় পড়েচে। তোরে কোলেপিঠে করে মানুষ করলুম বলে কি তোর ছেলে-

পিলেও কোলেপিঠে করে মানুষ করবো ? আমি কি আর জোয়ান আছি ? এখন বুড়ো হইচি না ? ওসব ঝামেলা আমার দ্বারা আর হবে না—

—না আমি আর থাকবো না। কালই যাবো চলে।

—কোথায় যাবি ?

—মরেলগঞ্জ চলে যাবো। ঠিক বলচি যাবো। আমার বড্ড কষ্ট হয়েচে রূপোদা, তুমি আমায় এমন করে বললে শেষকালে। আমি গৃহত্যাগী হবো, হবো, হবো—বলেই বাবা ফেললেন কেঁদে।

রূপো কাকা অমনি উঠে এসে বাবার হাত ধরে বললে—কাঁদিস নে শীতেনাথ, কাঁদিস নে, ছিঃ—মুই আর তোরে কি বললাম ? তুই-ই তো কত কথা শুনিয়ে দিলি—কাঁদিস নে—

শেষে দুজনেরই কান্না।

আমরা ছেলেমানুষ, অবাক হয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম দুই বড় লোকের কান্না। দাদা আমায় কনুইয়ের গুঁতো মেরে মুখে হাত চেপে হি হি করে হেসে উঠলো। আমরা অবিশ্যি দূরে গোলার নিমতলায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।

ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি মিটমাট হয়ে গেল। বাবাও দেশত্যাগী হলেন না, রূপো কাকাও চাকরি ছাড়লেন না।

রূপো কাকা রাত্রে চৌকিদারি করতো। অনেক রাত্রে আমাদের বাড়ী এসে ঠাকুরমাকে জাগিয়ে দিয়ে বলতো—ওঠো বৌমা, জাগন থাকো। রাত খারাপ। চণ্ডীমণ্ডপে শন্নিসি ঘোষ ও হীরু মাস্টার শুয়ে থাকতো, তাদের জাগিয়ে দিয়ে বলতো—একেবারে অত নাক ডাকিয়ে ঘুমোও কেন ? ওঠো, মাঝে মাঝে তামুক খাও আর গোলাগুলোর চারিধারে বেড়িয়ে এস না—

একটা অদ্ভুত দৃশ্য কতদিন হীরু মাস্টার দেখেচে।

আমাদের গল্প করেচে সকালবেলা।

সব গ্রাম ঘুরে এসে অনেক রাত্রে চৌকিদারি পোশাক পরে লাঠি হাতে রূপো কাকা অন্ধকারে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের পৈঠার ওপর বসে থাকতো।

এক এক দিন হীরু মাস্টার বাইরে এসে ওকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করতো—কে বসে ?

—মুই রূপো।

—বসে কেন ? এত রাতে ?

—তোমরা তো দিব্যি ঘুমোচ্চ, তোমাদের আর কি ? গোলার ধান যাবে শীতেনাথের যাবে। চোরের যা উপদ্রব হয়েছে তার খবর কি জানবা ? মোর ওপর ঝক্কি কত ! মোর তো তোমাদের মত ঘুমুলি চলবে না। শীতেনাথের এ ঝামেলা আর কদ্দিন পোয়াবো। এবার এলি চাবিছড়া তার হাতে দিয়ে মুই খোলসা হবো। এ আর পারি না বুড়ো বয়সে হ্যাঙ্গাম আসচি—

হীক মাস্টার বলে—ঘুমোও গে যাও—

—কিন্তু মুই যে তোমাদের মত নিশ্চিন্দি হতে পারি নে তার কি হবে। ধানগুলোর ঝক্কি যে মোর ঘাড়ে ফেলে সে বাবু দিব্যি চাঙ্গা হয়ে বসে আছেন। এবার আসুক, কিছুতেই আর এ বোঝা ঘাড়ে রাখচি নে মুই।

কিন্তু নিজের ইচ্ছেতে তার ছাড়তে হয় নি। বৃদ্ধ বয়সে তিন দিনের জ্বরে রূপো কাকা আমাদের গোলার দায়িত্ব নামিয়ে চলে গেল। এও সাত-আট বছর পরের কথা। আমরা তখন স্কুলে পড়ি। সবসুদ্ধ ত্রিশ-বত্রিশ বছর ও ছিল আমাদের বাড়ী।

বাবার সঙ্গে আমরাও দেখতে গেলাম রূপো কাকাকে।

রূপো কাকার ছোট চালাঘর। একদিকে ডোবা, একদিকে বাঁশঝাড়। ছেঁড়া মলিন কাঁথা মুড়ি দিয়ে শীর্ণ, শাদা দাড়ি রূপো কাকা পুরনো মাদুরে শুয়ে। রূপো কাকার ছেলের নাম বেজা, লোকে বলে বেজা বাঙাল। বেজা আমাদের দেখে বললে—আসুন বাবুরা, দেখুন দিকি বাবারে? জ্ঞান নেই, ভুল বকচে—

বাবা ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললেন—ও রূপোদা? কেমন আছ, ও রূপোদা—

রূপো কাকা চোখ মেলে বললে—কেডা? সীতেনাথ? কবে এলে?

—এই পরশু এসেচি।

—বেশ করেচ। এই শোনো, খাতার মুড়োয় লিখে রাখো, মুই চিঁড়ে খাবার বেনামুরি ধান নিইচি চার কাঠা, আহাদ মণ্ডল কলাই দু কাঠা, বাড়ী দু কাঠা, বিষ্টু ধেবিসি ছ কাঠা ধান, বাড়ী চার কাঠা—মোর ধান পোষ মাসের ইদিকে দিতি পারবো না বলে দিচ্চি—ভুলে যাবো, লিখে রাখো—

এই রূপো কাকার দায়িত্বের শেষ। আর কোন কথা বলে নি রূপো কাকা। সেদিন সন্ধ্যেবেলা রূপো কাকা আমাদের গোলা-পালার দায়িত্ব চিরদিনের মত ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল।

বিশ্বস্ত লোকেদের জন্যে কি কোন স্বর্গ আছে?

যদি থাকে, আমাদের বাল্যের রূপো কাকার আসন অক্ষয় হয়ে আছে সেখানে।

আজ ত্রিশ বছর আগেকার কথা এসব। এই সব চোরাবাজারের দিনে, জুয়োচুরির দিনে, মিথ্যে কথার দিনে বড্ড বেশি করে রূপো কাকার কথা মনে পড়ে।

তেঁতুলতলার ঘাট

হারুর আজ আর জ্বর আসে নি। এখন তার মনটাতে বেশ স্ফূর্তি আছে। জ্বর এলে আর স্ফূর্তি থাকে না। কিছু না কিছু নিরানন্দ আসেই। আজ চার মাস ধরে সমান ভাবে ম্যালেরিয়া জ্বর, পেট-জোড়া পিলে, আর সর্ব্বদাই ভয় ওই বুঝি জ্বর এলো।

অনেকেই ওকে দেখে বলে—ইস্। ছেলেটার মৃত্যু দশা হয়েছে একেবারে। এবার বুঝি বা মরে।

এ সব বলতো এমন সব লোকে, যারা ওকে ভালবাসার চোখে দেখে না। যে ভালোবাসার চোখে দেখে সে কি এমন কথা বলতে পারে? হারুও তা বুঝতো, বুঝে চুপ করে থাকতো। জ্বর আসাটা যেন ওর মস্ত অপরাধ, এজন্যে সে একদিকে যেমন বাড়ীতে বাবা ও পিসিমার, অন্য দিকে পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছেও অপরাধী।

ওর মা বলে—সকলের হাড় জ্বালালি তুই বাপু, কারু সোয়াস্তি নেই তোর জন্যে।

অথচ কেমন সুন্দর দিনগুলি। সুনীল আকাশ, অদ্ভুত ধরনের সুনীল আকাশ। ঝলমলে রোদ পড়েচে পথঘাটের দুধারে বনে ঝোপে। রাস্তাঘাট এখনো খট খট করচে। আজ দিন কুড়ি একদম বৃষ্টি বন্ধ। চাষারা রোজ গাজিতলায় রোজ-পালুনি করচে। আল্লা আল্লা বলে মাঠে বুক চাপড়ে চীৎকার করচে, বৃষ্টির চিহ্নও নেই। মেঘই নেই আকাশে তার বৃষ্টি। ধান এবার হবে না সবাই বলচে।

এই সব দিনে প্রত্যেক ঝোপে, প্রত্যেক লতার তলায় যখন রোদ পড়ে, যখন মউটুসকি পাখী বন-চন্দনা লতার আগায় মুখ উঁচু করে দোল খায়, কটুগন্ধ ঘেঁটকোল ফুলের দল ঝোপে ঝাড়ে ফোটে, তখন ঘর আর বার একাকার হয়ে যায়, ঘরে মন বসে না।

হারু তখন পাশের বাড়ীর চুনুর আর মণ্টুর বাড়ী যায়।

মণ্টু মায়ের জন্যে ডাঁটা শাক তুলচে ওদের বাড়ীর সামনের ক্ষেতে। ওকে দেখে বললে —কিরে, আজ জ্বর আসে নি তোর?

যেন তার জ্বর আসাটা প্রভাতকালে সূর্য্যোদয়ের মত একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। কেন যে ওরা জ্বরের কথাটা মনে করিয়ে দেয়! হারু বললে—না, জ্বর কিসের? চল বেড়িয়ে আসি।

—মাকে ডাঁটাগুলো দিয়ে আসবো। তুই একটু দাঁড়া।

—এ ক্ষেত করেচে কে?

—তুই জ্বরে পড়ে ভুগবি, দেখতে তো আসবি নে? এবার এ ক্ষেত আমি করেচি। মা বললে, ডাঁটা করে রাখ জমিটাতে, তাই জমিটা করলাম।

হারুর মনে দুঃখ হলো বার বার তার জ্বর আসার উল্লেখ করাতে। একবার এত রাগ হলো, সে বেড়াতে যাবে না কারুর সঙ্গে। একাই সে পথে পথে আগেও খেলা করতো, এখন জ্বর হওয়ার পর থেকে মনটা কেমন হয়ে পড়েচে, একা বেড়াতে ভয় ভয় করে,

আগে যে সাহস ছিল, এখন আর সেটা নেই। নয়তো মণ্টুর মত সঙ্গীকে সে গ্রাহ্যও করে না।

দুজনে অবশেষে বেরিয়ে গেল নদীর ধারে। কাঠ-কাটা নৌকা এসেছে পূব দেশ থেকে, বড় বড় গুঁড়ি পড়ে আছে এদিকে ওদিকে। বর্ষাকালে অনেক গুঁড়ির গায়ে তেলাকুচো লতা উঠেচে, দু'একটা তেলাকুচো ফলও ফলেচে।

কি মায়া যে জায়গাটার!

হারুর বড় ভাল লাগে। খেলা করবার মত জায়গা।

মণ্টু ও হারু কতক্ষণ সেখানে খেলা করলে, খেলা করবার উৎসাহ কারো কম নয়। তেলা-কুচো লতায় ফল মণ্টু তুলতে গেলে হারু তুলতে দিলে না। কেন, বেশ তো দুলচে লতার আগায়, একটা আধপাকাও হয়েচে, তুলবার কি দরকার? বেশ দেখাচ্চে গাছে। বেনে-বৌ জোড়ায় জোড়ায় বেড়াচ্চে কালকাসুন্দে গাছের ঝোপে ঝোপে।

কতক্ষণ কেটে গিয়েচে দুজনের কারো খেয়াল নেই।

মণ্টু কাছে গিয়ে বললে—অমন করে বসলি কেন রে? জ্বর এল নাকি?

—নাঃ—

—দেখি গা—ওরে বাসরে, গা যে পুড়ে যাচ্চে—বাড়ী যা বাড়ী যা—

হারু বিমর্ষভাবে বললে—তুই জ্বরের কথা অত করে মনে করিয়ে দিলি কেন? আমি ভুলে ছিলাম বেশ। যেমন তুই মনে করিয়ে দিলি, অমনি আমার জ্বর এল।

মণ্টু বললে—না, না রে, তোর এমনিও জ্বর আসতো, আমি মনে করে দেওয়ার জন্যে কি আর জ্বর এল? ও তোর ভুল কথা। চ, বাড়ী চ—

বাড়ীতে আজ চিংড়ি মাছ দিয়ে ডাঁটার চচ্চড়ি হচ্চে সে দেখে এসেচে। কলাইয়ের ডাল দিয়ে ওই চচ্চড়ি দিয়ে ভাত খেতে যে লাগে!

মাকে না বললেই হলো যে জ্বর হয়েচে। মণ্টুকে পথ থেকেই সরিয়ে দেওয়ার জন্যে বললে—তুই বাড়ী যা—আমি একা যেতে পারবো—

—যেতে পারবি ঠিক?

—খুব। ভারি তো একটুখানি জ্বর। ও এখুনি সেরে যাবে। তুই যা—

হারু বাড়ী ফিরে দেখলে রান্না এখনো হয় নি। কিন্তু দেরি করতে গেলে চলবে না, সে জানে এর পরে এমন ভীষণ কম্প উপস্থিত হবে যে রোদে গিয়ে বসতেই হবে, নয় তো লেপ মুড়ি দিয়ে গিয়ে শুতে হবে। গায়ে কাঁটা দেবে, বমি হবে। সুতরাং ভাত যদি খেতে হয় তবে আর দেরি করা উচিত হবে না, এখুনি খেতে বসা উচিত।

মা জ্বর এসেচে বুঝতে পারলেই সব মাটি। আর ভাত দেবে না। ও রান্নাঘরের দোরে দাঁড়িয়ে নির্বিকার ভাবে বলে—মা, খিদে পেয়েচে।

—কোথায় গিয়েছিলি রে সকাল বেলা?

—খেলা করছিলাম নদীর ধারে।

ইচ্ছে করেই সে মল্টুর নাম করলে না। যদি এরা তাকে ডেকে পাঠায় বা এমনি কিছু, তবে সে বলে দেবে জ্বরের কথা। সে বললে—ভাত দাও খিদে পেয়েচে—

—আজ এত তাড়া কেন?

—আমার যা খিদে পেয়েচে!

—এখনো চচ্চড়ি হয় নি। শুধু ডাল আর ভাত নেমেচে—

—তাই দাও, তাই দিয়েই খাবো—

ভাত খেতে বসে হারুর মনে হলো, না খেতে বসলেই ভাল হতো। জ্বর চেপে আসচে। শীত এত বেশি করচে যে রোদে না বসলে আর চলে না। উঃ দাঁতে দাঁতে লাগচে এমন শীত! ভাত খেয়েই সে গিয়ে বাড়ীর পিছনে নিমগাছটার তলায় রোদে বসলো। একটু পরে ওর ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপুনি ধরলো, এদিকে রোদে পিঠ পুড়ে যাচ্ছে, কেমন একটা ঘোর ঘোর ভাব ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলেচে। হারু বুঝলে ভীষণ জ্বর এসেচে ওর।

ওর মা বললে—বসে আছিস কেন রোদে? শরীর খারাপ হয় নি তো?

—হুঁ।

—হুঁ মানে কি? জ্বর আসচে? সরে আয় ইদিকে দেখি, পোড়ারমুখো ছেলে, তবে ভাত খেলি কি মনে করে? এমন করে ভুগে মরবি কদ্দিন?

বেশ। যেন তারই দোষ। তার যেন ইচ্ছে যে রোজ জ্বর আসে। বাপ মায়ের অভ্যেস সব দোষ ছেলের ঘাড়ে চাপানো।...হুঁশ হলো যখন ওর আবার, তখন বেলা গিয়েচে। রাঙা রোদ কাঁটাল গাছটার মাথায়। শালিক পাখীর দল ভাঙা পাঁচিলের ওপর কিচ্ কিচ্ করচে। ওর মুখ তেতো হয়ে গিয়েচে, মাথা ভার, চোখে কেমন ঝাপসা ভাব।

ও বললে—কি খাবো মা?

—কি আবার খাবি? ভাত খেয়ে জ্বর এসেচে, খাবি কি আবার? সাবু করে দেবো রাত্তিরে।

হারু নাকি সুরে বললে—না, সাবু আমি খাবো না—হুঁ-উঁ-উঁ—

—না সাবু খাবো না, তোমার জন্যে আমি পিঠে-পুলি করি। চুপ করে শুয়ে থাক।

ভোর রাতে ঘাম দিয়ে হারুর জ্বর ছেড়ে গেল। তার পর ঘুম ভেঙে যায়। শরীর খুব হালকা মনে হয় এবং খুব খিদে পায়। অত রাতে আর কে কি খেতে দেবে, সে চুপ করে শুয়ে থাকে ভোরের আশায়। ভোরের আলো খড়ের ঘরের দেওয়ালের মাথা দিয়ে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও মাকে ডাক দিতে লাগলো।

ওর ঘুমকাতুরে মা চোখ না মেলেই এপাশ ওপাশ ফিরে বলতে লাগলো—বাবাঃ, সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পরে একটু যে শোবো সে জো নেই। একটু চোখ বুজিয়েছি অমনি ষাঁড়ের মত চিৎকার!—হাড় ভাজা ভাজা হয়ে গেলো!

হারু নাকি-সুরে বললে—সবে চোখ বুজেচো বুঝি! রোদ উঠে গিয়েচে গাছপালার মাথায়। আমার খিদে পেয়েচে—উঠে ভাখো কত বেলা—

অবশ্য এও অতিশয়োক্তি। রোদ ওঠে নি, সবে ভোরের আলো ফুটেচে মাত্র! ওর মা ওঠবার বিশেষ কোনো আগ্রহ দেখালে না। ছেলের এ নাকি-সুরে চীৎকার সকাল বেলার দিকে—এ নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। হারু খানিকটা কান্নার পরে আপনি চুপ করে।

বিছানা ছেড়ে উঠতেই বেশ আনন্দ লাগে। আজ কি সুন্দর দিনটা। কেমন পাখীর ডাক বাঁশ গাছের মগডালে। কাল মা বলছিল আজ কুমড়োকাটা সংক্রান্তি। যে যার গাছ থেকে যা পারবে চুরি করবে—শসা, লাউ, কুমড়ো—যার যা ইচ্ছে, কেউ কিছু বলতে পারবে না বা সাহসও করবে না।

অন্য কিছু নয়, গানি বুড়ির উঠোনের মাচায় সেই যে শসা গাছ! চমৎকার শসার জালি দুলচে কঞ্চির আড়ালে আড়ালে। কতবার লোভ হয়েচে ওর, কিন্তু বুড়ি বড় সতর্ক। আজ ওবেলা রাতের অন্ধকারে একটা দা হাতে গোটা পাঁচ-ছয় শসার জালি আর গোটা শসাকে যদি সাবাড় করা যায়—

উৎসাহে বিছানা ছেড়ে সে উঠে পড়লো।

মণ্টুদের বাড়ী গিয়ে এখুনি পরামর্শ করতে হবে। খাওয়ার কথা সে ভুলেই গেল। এত কান্না, এত অনুযোগ যে খাওয়ার জন্যে।

এক ছুটে সে পৌঁছুল মণ্টুদের বাড়ী। মণ্টু ওর জ্যাঠামশায়ের পাশে বসে সকালবেলা মুড়ি খেতে খেতে ধারাপাত মুখস্থ করছিল। হারুকে দূর থেকে আসতে দেখে সে বিশেষ কোনো উৎসাহ প্রকাশ করলে না, কারণ এখন জ্যাঠামশায়ের হাত এড়িয়ে খেলতে যাওয়া অসম্ভব।

সৌভাগ্যের কথা মণ্টুর জ্যাঠামশায় এই সময় তামাক সাজতে গেলেন বাড়ীর মধ্যে।

হারু ছুটে এসে বললে—আজ কী দিন মনে আছে?

মণ্টু পেছন দিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত করে বললে—কী দিন?

—কুমড়োকাটা আমাবস্যে—

—কে বললে?

—সকলকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখ—

—কি করবি?

—তুই আর আমি বেরুবো। গানি বউয়ের বাড়ী সেই শসা গাছ আছে তো? আজ রাত্তিরে সব শসা—কি বলিস?

—তুই এখন যা, জ্যাঠামশায় আসচে, ওবেলা আমি তোদের বাড়ী যাবো।

হারু সতৃষ্ণ নয়নে ওর মুড়ির দিকে চেয়ে বললে—কি খাচ্ছিস?

—মুড়ি।

—দে না একগাল?

এবার হারুর কানেও জ্যাঠামশায়ের খড়মের শব্দ পৌঁছেচে। সে তাড়াতাড়ি কাপড়ে অকারণ ডান হাতখানা মুছে মণ্টুর সামনে পেতে বললে—শীগ্‌গির দে, তোর জ্যাঠামশায়—

আসচে। পরক্ষণে এক মুঠো মুড়ি মুখে পুরে দিয়েই সে ছুটে পালালো। মনে ভাবলে—বুড়ো এসে পড়লেই বকতো, আমায় দেখতে পারে না মোটে। কি কেমন মণ্টুটা! একগাল মুড়ি কত কটা দিলে ছাখো—দিব্যি মচমচে মুড়ি—

তারপর সে বাড়ী পৌঁছে দেখলে তার মা সামনের উঠোন ঝাঁট দিচ্চে। খাবার দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা ও উদ্যোগ কিছুই নেই এ বাড়ীতে।

মা ওই এক রকমের লোক হারু জানে। অন্য লোকের মায়ের মত নয়। কাল রাতে যে খাইনি, জানে সবই, দাও না বাপু খেতে সকাল সকাল! কাণ্ডখানা বেশ! একটু বেলা হোলে মা যদিও খেতে দিলে, সে মাত্র একবাটি সাবু। সে প্রতিবাদ করতে গেলে ওর মা ঝাঁজার দিয়ে বলে উঠলো—হ্যাঁ তোমাকে লুচি ভেজে দিই, পিটেপুলি গড়িয়ে দিই, কাল সারারাত জ্বরে শুবোছো কিনা।

যেন জ্বর না হোলেই মা তাকে লুচি ভেজে আর পিঠেপুলি করে খাওয়ায় আর কি! সে এ বাড়িতে নয়। এ বাড়ীর বাঁধা আছে চাল ভাজা, তিনশো-ত্রিশ দিন। লুচি!

কিন্তু ভাত? মা কি আজ ভাতও খেতে দেবে না নাকি? কথাটা সে ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলে।

—ভাত খাওয়ার সময় আমায় সেই গাওয়া ঘি একটু দিতে হবে কিন্তু—

—ভাত খাবে কে?

—কেন, আমি।

—ইস্! বলে, কত সাধ যায় রে চিতে, মলের আগায় ঘুন্টি দিতে—সারারাত জ্বরে কোঁ কোঁ করে ওনার ভাত না খেলে চলবে কেন?

—কি খাবো তবে?

—শিউলিপাতার রস তো খেলি নে সকালবেলা। একটু বেলা হলে দেবো অখন পাতা বেটে—আর সাবু।

হারু মিনতির সুরে বললে—না সাবু নয়, দুখানা রুটি, মাছের ঝোল দিয়ে। তোমার পায়ে পড়ি মা—পুরনো জ্বর তো, ওতে কিছু হবে না।

—আচ্ছা যাক্, দেখবো অখন।

সুতরাং মনে আর একবার খুশীর ঢেউ উঠলো হারুর। শরীর তার খুব হালকা হয়ে গিয়েচে, জ্বর না এলেও পারে। সকলে বলে শরীর হালকা হয়ে গেলে জ্বর আর নাকি হয় না। সে একা মাঠের ধারে বোষ্টম বাগানের পথে বেড়াতে গেল! ও বাগানের খুব নিবিড় একটা ঝোপঝাড়ের মধ্যে আছে সেই বুড়ো মাদার গাছটা। একবার রজুন কাকার দলে মিশে সে গিয়েছিল সেখানে। রজুন কাকা অদ্ভুত লোক, বড় বয়সের ছেলে, ওর গোঁপ দাড়ি বেরিয়ে গিয়েছিল, তবু ও তাদের সঙ্গে খেলতো। কত নতুন নতুন খেলা শিখিয়েছিল। তার দলে খেলতে বেরুলে শুধুই মজা, কত রকমের মজা। কিন্তু রজুন কাকা চলে গেল কোথায়, একদিন হঠাৎ কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল এ গাঁ থেকে, দুবার পুজো এলেছে গিয়েচে

তারপর—আর আসে নি।

মাদার গাছটা খুঁজে পাওয়া গেল না। তিজে ঝোপ-ঝাপ—কত পটপটি ফল দুলচে গাছে গাছে। বড় বড় পটপটি ফল। আজকাল সব ছেলেই বর্ষাদিনে পটপটি ফল ছোড়ে, তাদের শিখিয়েছিল সেই রজুন কাকা। একটা বাঁশের চোঙের মধ্যে পটপটি ফল পুরে একটা কাঠি দিয়ে ঠেলে দিলেই ফট-ফটাশ! যেন বন্দুকের শব্দ! তাই ওর নাম পটপটি ফল।

আজকাল সবার হাতে দেখো একটা বাঁশের চোঙ আর কাঠি আর পটপটি ফলের গোছা। রজুন কাকা না থাকলে আজ আর কাউকে পটপটি খুঁড়তে হোত না।

দুটো বড় বড় তিৎপল্লার ফুল ফুটেছিল উঁচুতে। লতার-আগে দুলচে। হাত বাড়িয়ে নাগাল পাওয়া যায় না। এক থোলো পটপটি ফুলই নিয়ে যেতে হবে কিন্তু বহু চেষ্টা করেও সে কোনোটাই সংগ্রহ করতে পারলে না। বেলা হয়েচে অনেক, ক্ষিদেও বেশ পেয়েচে।

বাড়ী গিয়ে রুটি আর মাছের ঝোল খাবে—কি মজা! এতক্ষণ রুটি হয়েও গিয়েচে। সে রোগা মানুষ, মা নিশ্চয়ই তার জন্যে আগে করে রাখবে। আজ সে বেশ ভালো আছে, আজ আর জ্বর আসবে না। জ্বর বোধহয় সেরে গেল। একটু একটু খুব সামান্য শীত বোধ হচ্চে, কিন্তু সেটা জ্বরের দরুন নয়। বর্ষাকাল, আর এই বনঝোপে তো রোদ পড়ে না তাই, মনটুরও শীত করতো, যদি সে আজ এই বনে ঢুকতো।

হারু ঝোপের বার হয়ে ছায়াবহুল সরু বনপথ ছেড়ে চওড়া রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। এই চওড়া রাস্তা ওদিকে নাকি কেষ্টনগর পর্যন্ত চলে গিয়েচে, বাবার মুখে সে শুনেচে। একসারি ধান বোঝাই গরুর গাড়ী মন্থর গতিতে আসচে ওদিক থেকে। হারু একটা পিটুলি গাছের তলায় আধ-রোদ আধ-ছায়ায় বসে বসে গরুর গাড়ী দেখতে লাগলো।

বোধহয় একটু বেশীক্ষণ বসা হয়ে গেল। যে সময় উঠবে ভেবেছিল, সে সময় ওঠা হোল না। রোদটা বেশ মিষ্টি লাগচে। না, জ্বর হয় নি তার। বর্ষাকালে রোদ সকলেরই ভালো লাগে।

বাড়ীতে যখন সে পৌঁছুলো, তখন বেলা বারোটা। হাতে তার গোটাকতক পিটুলি ফল। ওর মা বললে—ওমা, ই কি কাণ্ড! এই বলে গেলি ক্ষিদে পেয়েচে, আমি কখন রুটি করে বসে আছি। কোথায় ছিলি? ভালো আছিস তো?

—হুঁ—

—কোথায় ছিলি?

—মাদার পাড়তে গিয়েছিলাম বোষ্টমদের বাগানে।

—জ্বর হয় নি তো?

—না—

কিন্তু ওর কথার ধরন আর চোখ মুখের ভাব ওর মায়ের কাছে ভালো বলে মনে হোল না। কাছে ডেকে বললে—তোর চোখ মুখ রাঙা দেখাচ্চে কেন রে? ইদিকে সরে আয়, গা দেখি—বাপরে, গা পুড়ে যাচ্চে! যা শুয়ে পড় গিয়ে, আর খেতে হবে না।

যখন ওর জ্বরের ঘোর কাটলো, তখন রাত হয়েচে। হারু চোখ মেলে চেয়ে দেখলে তক্তপোশের কোণে দেওয়ালের গা ঘেঁষে রেড়ির তেলের পিদিম জ্বলচে, ঘরে কেউ নেই। জ্বর ছেড়ে গিয়েচে। তখনকার খিদে এখনও রয়েচে। সে কিছু খায় নি দুপুর থেকে। মা কোথায় গেল? সে ক্ষীণ স্বরে ডাকলে—ও—মা—আ—আ—

কেউ উত্তর দিলে না। মা রান্নাঘরে কাজ করচে বোধহয়, কিংবা হয়তো পাশের নিতাই কাকার বাড়ী গিয়েচে।

একটু পরে ওর মাকে সন্তর্পণে পা টিপে টিপে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেখে ও একটু অবাক হয়ে গেল। মা অমন করে হাঁটচে কেন? আমলব চুরি করবে নাকি? সে তো আমলব চুরি করবার সময় অমনি···মা এসে ওর মুখের ওপর ঝুঁকে দেখতে গেল। চোখ তাকিয়ে থাকতে দেখে যেন একটু অবাক হয়ে গিয়ে নরম মোলায়েম সুরে বললে—বাবা হারু। কেমন আছ বাবা?

—ভালো।

—দেখি?

ওর গায়ে হাত দিয়ে ওর মা তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—ওঃ, কি ঘাম ঘেমেচিস! এঃ, সব যে ভিজে গিয়েচে। হারুও তা লক্ষ্য করলে বটে। কাঁথা ভিজে সপ সপ করচে! ও বললে—মা, আমার খিদে পেয়েচে।

—খিদে পেয়েচে বাবা? আচ্ছা দেবো এখন। আহা বাবা আমার, সোনা আমার, শোও। আসচি আমি।

মা ঘর থেকে চলে গেলে ও ভাবলে মা এমন নরম হয়ে গেল কেন? অন্য সময় মা তো খেতে চাইলে বলে ওঠে—জ্বর ছাড়তে না ছাড়তে খিদে! ছেলের কেবল খিদে আর খাই খাই, জ্বর হয়েচে, চুপ করে শুয়ে থাক।

কিন্তু মা আজ অমন মিষ্টি, অমন মোলায়েম সুরে কথা বলচে কেন? পা টিপে টিপে হাঁটা—হঠাৎ হারুর মনে পড়ে যায় আজ না সেই কুমড়োকাটা অমাবস্যে! ওঃ, ভালো কথা মনে পড়েচে। এখন সবে সন্ধ্যে, তার তো জ্বর ছেড়ে গিয়েচে। এইবার মণ্টুকে ডেকে নিয়ে গানি বুড়ীর বাড়ী শসা চুরি করতে যেতে হবে! আরও একটু রাত হোক। ততক্ষণ সে খেয়ে নিক।

ওর মা একটু বার্লি নিয়ে ঘরে ঢুকে বললে—এটুকু খেয়ে নাও তো বাবা। উঠো না, শুয়ে থাকো লক্ষ্মী ছেলে—ও লক্ষ্মী ছেলে আমার—

ও বিস্মিত সুরে বললে—কেন, আমার সে ওবেলাকার রুটি? আমি খেয়ে শসা কাটতে যাবো এক জায়গায়।—আজ কুমড়োকাটা অমাবস্যে যে। জানো না?

ওর মা বিষণ্ণ ভাবে ঘাড় নেড়ে বললে—খুব জানি বাবা, তুমি শোও। কুমড়োকাটা অমাবস্যে গিয়েচে কাল—তুমি এই দুদিন ধরে বেহুঁশ। মা মঙ্গলচণ্ডী, সারিয়ে দাও মা, সেরে গেলে পুজো পাঠিয়ে দেবো বটতলায়—

জোড়হাতে বটতলায় উদ্দেশে ওর মা প্রণাম করে।

দুই দিন

রামনগর বারোয়ারি তলায় আজ খুব জাঁকের যাত্রা। কলকাতা থেকে দল এসেচে, বেশ বড় দল! রসিক বাঁড়ুয্যের যাত্রার দল, যার নাম এ অঞ্চলের লোকের যথেষ্টই শোনা, কিন্তু এত বড় দল কি পাড়াগাঁয়ে আসে যখন তখন? এবার বহু চেষ্টার ফলে ওদের আনা হয়েচে। রামনগর উচ্চ-প্রাথমিক পাঠশালা থেকে ফেরবার পথেই কাতু এ সংবাদটি জোগাড় করে এনেচে। এ নিয়ে অনেক কথাবার্তাও হয়ে গিয়েচে কাতু ও তার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে।

ননী ওদের বাড়ী এল পেয়ারা পাড়তে। কাতুর বাবা দুর্গাচরণ মজুমদার চোখে দড়ি বাঁধা চশমা পরে বাইরের ঘরে বসে জমিজমাসংক্রান্ত কাগজপত্র দেখছিলেন।

ননীকে দেখে বললেন—কি?

দুর্গাচরণ বড় কড়া প্রকৃতির মানুষ। ননী ভয়ে ভয়ে বললে—জ্যাঠামশায়, কেতো আছে?

—কেন? কি দরকার তোমার?

—জ্যাঠামশায়, দুটো পেয়ারা পাড়বো?

—তা পাড়বে না কেন? তোমাদের জন্যেই তো গাছ করে রাখা। কেন পাড়বে না?

ননীর সাহসে কুলোল না আর পেয়ারার সম্বন্ধে কোনো কথা তুলতে। সে চলে যাচ্ছে বাড়ীর বার হয়ে, এমন সময়ে কাতু তাকে দেখতে পেয়ে বাড়ীর ভেতর থেকে ছুটে এল।

ননী বললে—ভাই, তোর বাবা পেয়ারা পাড়তে দিলে না—

কাতু আশ্বাস দিয়ে বললে—বাবা এখুনি উঠলো বলে। নসবাপুর যাবে খাজনার তাগাদা করতে। সেই ফাঁকে তুই আর আমি পেয়ারা পাড়বো। আজ রাত্রে যাত্রা শুনতে যাবি নে?

—তুই যাবি? দল খুব ভালো, না?

—ও বাবা। কলকাতার বড় দল, দেখিস কি চেহারা, কি সব সাজগোজ, কি গান—

—তুই কি করে জানলি? দেখিচিস নাকি?

—সবাই বলচে রামনগরের বাজারে। দুশো টাকায় এক রাত—আর আমাদের বেলেডাঙার দল আর-বছর ত্রিশ টাকায় এক রাত গাইলে—বাবোঃ, কিসের সঙ্গে কিসের কথা। দুশো টাকা আর ত্রিশ টাকা।

কাতু আর ননী খুব হেসে উঠলো এক চোট। তাদের মনে হলো এমন একটা মজার কথা তারা কখনো বলে নি বা শোনবার সুযোগ পায় নি। উৎসাহের চোটে কাতু রসিক বাঁড়ুয্যের দলের গুণাগুণ অনেক বাড়িয়ে বলে। তাদের দলের ভীম যে সাজে তাকে নাকি সে দেখে এসেচে, এক হাঁড়ি ভাত ডাল তার সামনে বেড়ে দেওয়া হয়েচে, তা সে একা খাচ্ছে। তার চোখ দুটো লাল ভাঁটার মত, দেখলে ভয় হয়। গলার সুর কি! যেন বাঘের গলায় আওয়াজ। ওদের তলোয়ারগুলো কিন্তু সত্যিকার তলোয়ার, অস্ত্র অস্ত্র বাজে দলের

মত রাঙ বা টিনের নয়।

বলা বাহুল্য এ সবের কিছুই কাতু দেখে আসে নি। সে অবিশ্যি যাত্রা দলের বাসাতে গিয়ে দেখেছিল অনেকগুলো লোক কলার পাতা পেতে ভাত খেতে বসেচে, তার মধ্যে কোন্‌টা ভীম কোন্‌টা নকুল কোনটা বেদব্যাস সে তার কিছুই জেনে আসে নি।

ননী সব শুনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—তোর বাবা তোকে নিয়ে যাবে। আমার আমার মামা যেতে দেবে না। মামা যদি দেয়, মামীমা তো খাঁড়া উঠিয়ে আছে! আমার বড় ইচ্ছে যেতে।

দুই বন্ধুতে পরামর্শ করলে। ওরা যাবে নিশ্চয়ই। ননীকে যদি মামা না যেতে দেয় তবে সে লুকিয়ে যাবে কাতুর বাবার সঙ্গে। দুজনেরই বুক দুরদুর করচে কি হয় কি হয়।

সন্ধ্যার আগেই দুর্গাচরণ মজুমদার চাদর কাঁধে ফেলে লাঠি হাতে নিয়ে লণ্ঠন ঝুলিয়ে যাত্রা শুনতে বেরুলেন। কাতু গেল বাবার সঙ্গে, কিন্তু ননী বেচারীর মামা প্রসন্ন না হওয়ায় তার বাড়ীর বাইরে পা দেওয়া সম্ভব হোল না।

কাতুর মন বেলুনের মত ফুলে উঠেচে। এখুনি সে রসিক বাঁড়ুযোর যাত্রা দেখতে পাবে এখানে!

এ অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হবে এখুনি!

কতকগুলো লোক এসে আসরে আলো জেলে দিয়ে গেল। লোকের ভিড় জমে গেল আসরে। বহু দূর-দূরান্তর থেকে লোক দেখতে এসেচে রসিক বাঁড়ুযোর যাত্রা, তাদের হাতে চিঁড়ের পুটুলি, বগলে তামাক টিকের চোঙা। আসরের বাইরে এক-একখানা থান ইঁট পেতে সবাই বসে গেল।

আসরে বাদ্যযন্ত্র আনা হোল। সুর বাঁধা, টুং টাং করতে আধঘণ্টা কাটলো। কাতুর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙে ভাঙে। রাজা কতক্ষণে আসবে। ও বাবাকে জিজ্ঞেস করলে—কি পালা হবে বাবা?

দুর্গাচরণ অন্য এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন, ধমক দিয়ে বললেন—দেখো এখন কি হবে। আমি কি জানি? দুর্গাচরণ যে লোকটির সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি বললেন—সত্যি আজ এদের কি প্লে হবে জানো? নল-দময়ন্তী এদের নামকরা প্লে, দ্যাখো কি হয়।

এমন সময় পালার প্রোগ্রাম বিলি হোল আসরে। কাতু তার বাবার খানা চেয়ে নিলে। তারপর পড়ে দেখেই বিস্ময়ে আনন্দে বাবাকে দেখিয়ে বললে—বাবা, এই দেখো নল-দময়ন্তীর পালা হবে। নল-দময়ন্তী বাবা—দেখো না? ও বাবা—নল-দময়ন্তী—

—আঃ, নল-দময়ন্তী তা কি করতে হবে? নাচবো? চুপ করে বসে দ্যাখো।

যাত্রা আরম্ভ হয়ে গেল। বিস্ফারিত চোখে কাতু একদৃষ্টে চেয়ে দেখলে পঞ্চনল জাঁকজমকের সঙ্গে লম্বা চুমকির কাজ-করা জরির পোশাক পরে সভাস্থল আলো করে বসেচে।

কি তাদের হাত-পা নাড়ার কায়দা, কি তাদের তরবারির আস্ফালন!

ইন্দ্রের সঙ্গে বরুণের কথা কাটাকাটির কি বাহার !

আর গান ? এমন সুন্দর সুরের গান এ পর্য্যন্ত সে শোনে নি এ পাড়াগাঁয়ে।

দৃশ্যের পর দৃশ্য বদলে চলেচে। প্রত্যেক দৃশ্যে অভিনব ঘটনার সমাবেশ, নতুন নতুন সুরের গান, নতুন নতুন সুন্দর মুখ। পরীর মতো মেয়েরা। মেয়ে নয়, ওরা পুরুষ, কাতু জানে না যে এমন নয়, কিন্তু দু-একটি মেয়ে সম্বন্ধে, কাতু ঠিক বুঝতে পারলে না ওরা ছেলে, না সত্যিই মেয়ে।

সে বাবাকে বললে—বাবা, ও বাবা—

দুর্গাচরণ বললেন—কি ? কেন কথা বলচো ? চুপ করে থাকো।

—ওরা মেয়ে না ছেলে ?

—চুপ করে বসে থাকো। বকো না।

কাতু তন্ময় হয়ে গিয়েচে, তার বাহ্যজ্ঞান নেই। একটা দৃশ্যে তার মন নেচে উঠলো। এবার বোধ হয় যুদ্ধের আয়োজন চলবে। কবিরাজ যে সেজেছে তার কি বিকট চেহারা আর সাজসজ্জা। সত্যিই লোকটা খারাপ নাকি ? নিশ্চয় লোকটা খুব বদমায়েস। বুড়ো কঞ্চুকী কি হাসিয়েই গেল।

এইবার একটা করুণ দৃশ্যের অবতারণায় সভার লোক কেঁদে ভাসিয়ে দিল, সেই সঙ্গে কাতুও।

রাজ্যহারা নল বনে দিশাহারা অবস্থায় একটা বৃক্ষতলে আশ্রয় নিয়েচেন (বৃক্ষতলে আশ্রয় নেওয়ার ব্যাপারটা অবিশ্যি নলের বক্তৃতার মধ্যে দিয়েই প্রমাণ পেয়েচে, কেন না তিনি বসে আছেন আসরের ঝাড় লণ্ঠনের তলায়), সঙ্গে রয়েচেন নিরাভরণা দময়ন্তী। প্রোগ্রামে আছে অলক্ষ্যে বিধিলিপির সঙ্গীত—নলের করুণ বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আসরের সকলে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখচে বিধিলিপি সাজঘর থেকে বেরুল কি না।

কাতু অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে উঠেছে।

কিন্তু ঠিক যে সময় একটি বালককণ্ঠের মধুর সঙ্গীতের সুরে আসর ভরে গিয়েচে, দেখা গেল ধীরে ধীরে বিধিলিপি গান গাইতে গাইতে আসরে ঢুকচে, সেই সময় দুর্গাচরণ মজুমদার হাই তুলতে তুলতে বললেন—চলো অনেক রাত হয়েচে। যাওয়া যাক। বাড়ী চলো—ছাতি নাও হাতে—

কাতু অবাক। বাবা কি সত্যিই বাড়ী যেতে চায় ? ঠিক এই সময় মানুষে পারে আসর ছেড়ে বাড়ী চলে যেতে ? কাতু বললে—বাবা, এখন বাড়ী যাবেন কি বলচেন ? আমি যাবো না বাবা।

—না না চলো। ও আর কি দেখবে সারারাত জেগে। রাত দশটা। ওই নাকে কান্না চলবে এখন সারা রাত। চলো, চলো—ছাতিটা নে হাতে—ভিড়ে হারিয়ে যাবে। কাল আবার জেমালাতে খাজনার তাগিদে যেতে হবে ভোরে।

চলে আসতেই হোল। উপায় নেই কাতুর। ওর চোখে জল ভরে এল। বাবার ওপর

বিরাগে ওর মন তিক্ত হয়ে উঠেচে। কেমন লোক বাবা? কিছু বোঝে না। এমন সুন্দর জায়গা—!

রাগে সে বাবার সঙ্গে কথা বললে না সারা রাস্তা।

পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর পরের কথা।

কার্ত্তিকচরণ মজুমদার সকালে উঠে কাগজপত্র দেখচেন। কার্ত্তিকের মহাজনী কারবার আছে, আড়ত আছে ধানের ও পাটের। গত পঞ্চাশের মন্বন্তরে ধান-চাল হাত ফিরতি করে বেশ কিছু লাভও করেচেন। তাঁর কর্ম্মচারী হরিপদ এসে বললে—বড় বাবু ছে-কাটি কখানা গাড়ী যাবে?

—যে কখানা জোগাড় হয়। মাল কত?

—দাদনের মাল হবে পঞ্চাশ মণ। আর ইদিক ওদিকে যা যোগাড় হয়।

—পাঁচখানা এখান থেকে নিয়ে যাও।

—লরির জন্যে শম্ভুকে খবর দিতে বলে দেলাম।

—লরি একখানা নয়, দুখানা। আমের গুঁড়ি যাবে সাতটা। চার টন।

—আপনি বেরুবেন কখন?

—আমি খেয়ে দেয়ে বেরুবো। তুমি চলে যাও আগে—

এমন সময়ে কার্ত্তিক মজুমদারের দশ বছরের পুত্র নীলু এসে বললে—বাবা আজ থিয়েটার হবে রামনগরে। দেখতে যাবো বাবা।

থিয়েটারের নিমন্ত্রণপত্র কার্ত্তিক মজুমদার পেয়েছিলেন বটে, রামনগরের তরুণ-সংঘ আজ কি যেন একটা প্লে করবে তাতে লেখা ছিল। কিছু চাঁদাও তারা নিয়ে গিয়েছিল একদিন এসে। কিন্তু কর্মব্যস্ত কার্ত্তিকের সে কথা স্মরণ ছিল না।

নীলু বললে—বাবা যাবে তো?

—দেখি আজ আবার অনেক গোলমাল। যেতে পারি কিনা দেখি।

—সে হবে না বাবা। তুমি না গেলে আমি যাবো কার সঙ্গে? আমার দেখা হবে না। থিয়েটার কক্ষনো আমি দেখি নি—

—আচ্ছা, যাও, সকালে উঠে এখন পড়গে যাও—সে তো ওবেলা, তার এখন কি?

এই সময়ে পাটের মহাজন ফলেয়ার মানিক মণ্ডল উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে বললে—বড় বাবু, আমার তার কি হোল?

—কিসের?

—আমার সেই মামলা আজ মিটিয়ে দেন বাবু।

—দেবো। আজ পঞ্চাশ মণ আনচি দাদনের মাল, আরও একশো মজুত। তোমার কখানা লরি?

—দুখানার বায়না দেওয়া আছে। মাল বেশী হোলে আরও একখানা আনবো।

আমায় দুশো মণ যোগাড় করে দিতে হবে আপনায়। একটু নেকনজর করুন—

কার্ত্তিক তাকে আশ্বাস দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলেন চা খেতে। কার্ত্তিকের স্ত্রী বললেন—তা যাও না একবার খোকাকে থিয়েটার দেখিয়ে আনো না? পাড়াগাঁয়ে ও-সব জিনিস তো কখনো হয় না—এবার হচ্ছে যখন ওকে দেখিয়ে আনো। ও কখনো দেখে নি।

কার্ত্তিককে অগত্যা যেতে হলো সন্ধ্যায় সময় রামনগরের বাজারে, স্ত্রীর নিতান্ত পীড়াপীড়িতে। নতুবা ঝগড়া বাধে। কিন্তু মন তাঁর ভাল ছিল না। কর্ম্মচারীরা সংবাদ দিয়েচে দাদনের পাট আশানুরূপ আদায় হয় নি। প্রায় সাড়ে সাত হাজার টাকা ছড়ানো রয়েচে চাষী মহলে ধান আর পাটের দাদন বাবদ। এত দুর্ভিক্ষের সময় চড়া দামে ধান চাল বিক্রি করে মোটা টাকা ঘরে এনেছিল বলেই এবার আশায় আশায় এত টাকা ছড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু বাজার হঠাৎ নেবে যাবে বুঝতে পারা যায় নি। ধানের দামও অত্যন্ত কম, পাটও তথৈবচ। তারপর অতগুলো ছড়ানো টাকার বদলে ধান বা পাট আদায় হোল না আজও।

নীলু দুধ-চিঁড়ের ফলার খেয়ে এসেচে। ছেলেমানুষের খিদে বেশী। কার্ত্তিক কিছু খেয়ে আসেন নি, তিনি অর্থ উপার্জ্জন-শক্তি অর্জ্জন করবার সঙ্গে সঙ্গে পরিপাক-শক্তি হারিয়েছেন। রাত্রে খান দুখানা রুটি আর একটু দুধ। আগে খেতেন সুজির রুটি কিন্তু এখন যুদ্ধের বাজারে ঘনীভূত অবস্থায় সুজি পাওয়া যায় না, আটার রুটিই খেয়ে থাকেন।

সন্ধ্যার পরেই থিয়েটার আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু চ্যাংড়া ছোকরাদের ব্যাপার, হৈ চৈ করতে দুঘণ্টা কাটবার পরে রাত সাড়ে নটার সময় কনসার্ট বাজনা শুরু হলো। একালের থিয়েটারে ও সব অচল বলে কোন শহর-ঘেঁষা অতি-আধুনিক তরুণ সভ্য আপত্তি তুলেছিল। শেষ পর্য্যন্ত আপত্তি টেঁকে নি। কনসার্ট না বাজলে এ পল্লীগ্রামে থিয়েটার জমবে কেন?

কার্ত্তিক ছেলেকে নিয়ে একেবারে সামনের আসনে বসেচেন। তার কারণ এ নয় যে তিনি ভালোভাবে অভিনয় দেখতে পাবেন সেই উদ্দেশ্যে। এর প্রধান কারণ রামনগরের বাজারের প্রসিদ্ধ আড়তদার শরৎ নাথ ওখানে বসেছে। শরৎ নাথ এ অঞ্চলের বড় আড়তদার, তার পাশে বসে কার্ত্তিক মজুমদার ব্যবসায়ের কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তিনি আসলে জানতে চান শরৎ নাথের দাদন অনুযায়ী পাট ধান আদায় হচ্ছে কিনা। কেন এ বৎসর তাঁর এ বিপর্য্যয় ঘটলো।

শরৎ নাথ ঘুঘু লোক, তিনি ব্যবসার প্রকৃত সংবাদ কাউকে প্রকাশ করতে রাজী নন। দুজনেই যখন কথাবার্ত্তায় মশগুল তখন স্টেজে বন্দী অক্ষম সাজাহান জাহানারার হাত ধরে বিলাপ করচেন।

শরৎ নাথ বললেন—আর ভায়া, সে জুত বাজারের নেই। নতুন ধান সাড়ে তিনটাকা মণ। আলমপুর পরগণা ভোর পাটের দাদন ছড়িয়েচি, দুশো মণ পাট এখনো মজুত হয় নি ৯

ব্যবসার দিন চলে গিয়েচে।

কার্ত্তিক মজুমদার বললেন—আরে দাদা, তোমরা হলে হাতী। গেলেও দু-পাঁচ হাজার, মরবে না। আর আমরা হচ্চি মশা, সামান্যতেই কষ্ট পাবো। তারপর—

নীলু বলচে—বাবা, ওই ত্যাখো আওরংজেব—বাবা, ভারতবর্ষের ইতিহাসে আছে আওরংজেবের কথা—সেই আওরংজেব—

—আঃ, তুমি খোকা বোকো না।

শরৎ নাথকে কার্ত্তিক সব কথা খুলে বলেন নি। ব্যবসার গুপ্ত কথা কেউ বলে না।

পাঁচশো মণ পাট তিনি চিনিলি কাপাসডাঙ্গার আড়তে জমা করে রেখেচেন, গরুর গাড়ী অভাবে আনতে পারচেন না। সদর আড়তে, এখান থেকে লরিতে বোঝাই দেবেন।

গরুর গাড়ীর কি ব্যবস্থা করে থাকেন শরৎ নাথ, এইটি কার্ত্তিক মজুমদার জানবার উদ্দেশ্যে বার বার সেই কথাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলতে লাগলেন।

সাজাহান বলচেন—দেবো লাফ, দিই লাফ—

নীলুর চোখ বেয়ে জল পড়চে। সে কথার অর্থ যে সব বুঝচে তা নয়, সাজাহানের কথা বলবার ভঙ্গিতে তার কান্না আসচে।

নীলু বললে—বুড়ো কি বলচে বাবা? ও লাফ দেবে কোথায়?

কার্ত্তিক মজুমদার জবাব দিলেন—আঃ চুপ করো। শোন কি বলচে। দুষ্টুমি করতে নেই।

দুষ্টুমি সে কি করলে, বুঝতে না পেরে নীলু চুপ করে রইল।

আরও ঘন্টাখানেক কাটলো। শরৎ নাথ পাঁচখানা গরুর গাড়ী কাল সকালে পাঠিয়ে দেবার অঙ্গীকার করেচেন।

বললেন—কত সকালে?

—এই সাতটার সময়।

—তোমার বাড়ী পাঠাবো, না আড়তে?

—সদর আড়তে।

—লরি যোগাড় আছে?

—সে জন্যে ভাবনা নেই। সুবল লরি দেবে বলেচে—ইষ্টিশানে পৌঁছে দেবে মাল।

—তাড়া রপকরা না টিপ পিছু?

—টিপ পিছু।

জহরৎউন্নিসা রাজসভায় আওরংজেবকে হত্যা করতে গিয়েছিল এইমাত্র। খুব একচোট হাততালি পড়তেই কার্ত্তিক মুখ তুলে চেয়ে দেখলেন। সুলতান সোলেমানের সঙ্গে আওরংজেবের কথা কাটাকাটি হচ্চে। কার্ত্তিক মজুমদার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কত রাত হয়েচে? এগারো?

আর তিনি থাকতে পারচেন না। কাল সকালে উঠে সদর আড়তে শরৎ নাথের প্রেরিত

পাঁচখানা গাড়ী বাদে আরও অন্তত পাঁচখানা গাড়ীর যোগাড় রাখতে হবে।

নীলু বললে—না বাবা, আমি এখন উঠবো না—কেমন জায়গাটা হচ্ছে আর তুমি উঠচো এখন—

—চলো চলো। ওসব দেখবার অনেক সময় আছে। কাল রাত থাকতেই আমাকে উঠে মুচিপাড়ায় লোক পাঠাতে হবে গাড়ীর জন্যে। তোমাদের কি? ভাবনা চিন্তে তো নেই, বাবা —নাও ওঠো—

নীলু নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে কাঁদো কাঁদো মুখে বাবার সঙ্গে আসরের বাইরে এলো।

বাইরে এসে দাঁড়িয়েও সে সতৃষ্ণ ও সাগ্রহ দৃষ্টিতে পিছন ফিরে বার বার দূরের আলোকিত স্টেজটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো।

কার্ত্তিক মজুমদার বললেন—হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে—হাঁ করে দেখচো কি পেছন ফিরে? চোখ দিয়ে চেয়ে পথ হাঁটো—অন্ধকার রাত্তির—

মাকাল-লতার কাহিনী

এই বর্ষায় আমাদের গ্রামের নানা বনে ঝোপে মাকাল-লতার নিভৃত বিতান রচিত হয়েচে। আমি মাকাল-লতা বড় ভালোবাসি। যেদিন প্রথম আমার চোখে পড়লো মাকাল-লতার বিচিত্র রচনা, তখন মন আনন্দে ভরে উঠলো।

তারপর সেই সুন্দর দিনটি এল, যেদিনে দেখলুম মাকাল-লতার ঝোপে ঝোপে কাঁচা সবুজ ফল ধরেচে। সবুজ, মসৃণ, চিক্কণ গা পুষ্ট ফলগুলির। আমি রোজ বেড়াতে যাই, নাইতে যাই, ঝোপে মাকাল ফলের শ্যামল রূপ দেখি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে।

ঘন বর্ষার দিনে নদীর তীরে, নিভৃত মৌন বনবিতানে নীল আকাশের তলায় ঝোপেঝোপে সবুজ আপেলের মত ফলগুলি, একদৃষ্টে কতক্ষণ ধরে চেয়ে থাকি। প্রজাপতি ওড়ে, পাখী গান গায়।

এ বছর বর্ষা তেমন হয় নি আজও, তবুও নদীর ধারে দুটি বনের ঝোপে মাকাল-লতা যথেষ্ট বেড়ে সারা ঝোপটির মাথা ঢেকে ফেলেচে। আর একটি মাকাল-লতা সুন্দর ঝোপ গজিয়ে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেচে গোপালনগর বাজার ছাড়িয়ে পুরোনো ডাকঘরটার সামনের বটতলায়।

ডাকঘরের এ ঝোপের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, মটর-লতার মটর ফলের গুচ্ছ ও মাকাল ফল পাশাপাশি দুলচে। মনে হবে পারস্য দেশের সূর্য্যতপ্ত কোনো উদ্যানে আপেল ও দ্রাক্ষাগুচ্ছ একসঙ্গে ফলেচে—বাংলাদেশের ঘরোয়া জঙ্গল এ নয়। তারপর হঠাৎ একদিন দেখি মাকাল-লতার ফলগুলির কোনো কোনোটাতে রং ধরেচে। ক্রমে সেগুলোতে একটু করে রং চড়লো সূর্য্যতাপে, রাঙা টুকটুকে সিঁদুর গোলা ফলের রং, ঘন সবুজ ঝোপের সবুজপত্রসম্ভারের মধ্যে

রূপসী নববধূর মুখের মত উঁকি মারচে রাঙা টকটকে সুঠাম সুগোল ফলগুলি। এই দুটি মাকাল-ঝোপ আমার কাছে কি অপূর্ব্বই লাগে! নদীর ধারেরটিও এই বটতলার।

নদীতীরের ঝোপ সৃষ্টি হয়েচে এক নিবিড় লতাবিতানের নিভৃত ছায়াগহন আশ্রয়ে। একটা শাঁই-বাবলা গাছের মাথায় মাকাল-লতা উঠে জড়িয়ে জড়িয়ে এই ঝোপ তৈরী করেচে। শাঁই-বাবলা গাছ এমন সুন্দর, যেখানে থাকে সেখানে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে না দেখে থাকা যায় না। সরু সরু লম্বা পাতা, আঁকা বাঁকা শাখা প্রশাখা, ভাদ্রমাসে সাদা মঞ্জরীর মত ফুল হয়েচে একসঙ্গে বহু, আর ওদের মুখ থাকে নীল আকাশের পানে উঁচু হয়ে। তারই ওপরে সেই মাকাল-লতার ঝোপ—আর মাথা থেকে ঝুলে ঝুলে পড়েচে এদিক ওদিকে মাকাল-লতার দীর্ঘ ডালগুলি, আর তার প্রতি গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে, লতাগ্রভাগে, সবুজ পত্রান্তরালে চিক্কণ শ্যাম অথবা লাল টকটকে মাকাল ফল।

এর অদ্ভুত সৌন্দর্য্যের জন্যে পটভূমি রচনা করেচে পাশে বড়গোয়ালে-লতার আর একটি বড় ঝোপ—একদিকে একটা আম্রবৃক্ষের নত শাখা, দশ বর্গফুট আন্দাজ সুনীল আকাশ আর গাছের তলায় শেওড়া, বৈঁচি, ভাঁট, বনকচু, বনআদা, সন্ধ্যামনির নিবিড় জঙ্গল। প্রভাতের অপূর্ব্ব রৌদ্র পরিস্রুত হয়ে আসে বড়-গোয়ালে-লতার বড় বড় পানের মত পাতার মধ্যে দিয়ে, ওই পাতার উল্টো পিঠগুলো যেন স্বচ্ছ দেখতে সূর্য্যকিরণে, একটি সজল ছায়া বিস্তৃত হয়ে আছে বনতলে, মেঘনগরীর উর্দ্ধের নীলাকাশ তার বাণী পাঠিয়েচে তার ওই দশ বর্গফুট বয়সের প্রতিনিধির হাতে। শালিক, ছাতারে, ঘুঘু, দোয়েল, নীলকণ্ঠ, শ্যামা, দুর্গা, টুনটুনি প্রভৃতি পক্ষিকুলের সম্মিলিত প্রভাত-কাকলীতে মুখর হয়ে উঠেচে বনবাণী।

এরই মধ্যে সুদীর্ঘ নম্রমুখ লতা যেখানে মাটি ছুঁয়ে দুলচে, সেখানে লতার প্রতি গ্রন্থিতে দুলচে রাঙা টুকটুকে মাকাল ফল। ভাদ্রমাসে বেশির ভাগ মাকাল ফলই পেকেচে, কচিৎ দু-চারটে কাঁচা আছে।

এই মাকালঝোপ কি জাদু জানে। বোধ হয় কোন ঐন্দ্রজালিক লুকিয়ে থাকে ওর শ্যাম বনানীর অন্তরালে, মানুষের মনকে মোহগ্রস্ত করে ফেলে এক মুহূর্ত্তে—যে মুহূর্ত্তে বনতলে ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ানো যায় সেই মুহূর্ত্তেই। কোন অসাধারণ ঐন্দ্রজালিক আর তার ইন্দ্রজাল এ!

এই ক্ষুদ্র মাকাল-লতার ঝোপে আমার মন কেন মোহাবিষ্ট করে তার কারণ আমি জানি নে বললে কবিজনোচিত ধোঁয়াটে বর্ণনা দ্বারা জিনিসটাকে ঘোরালো করা যেতো। কিন্তু এর কারণ আমি জানি।

কি জানি?

তাই কি বিশ্লেষণ করে বলার কথা?

ঝোপের পাশে দাঁড়ালুম সেদিন প্রভাত বেলায়। কাঁধে গামছা, হাতে সাবানের বাক্স, ইছামতীতে বনসীমতলার ঘাটে স্নান করতে যাচ্ছিলুম। ইচ্ছে করেই ঘুর পথ দিয়ে গেলাম শুধু এই মাকাল ফলদোলানো দেখবো বলেই।

রোজই দেখি। দেখবার সুযোগ একদিনও ছাড়ি নে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ঊর্ধ্বে একটি অকলুষ, উদার, দিব্য জগতের অকথিত বাণী এই মাকাল-লতার ঝোপের পথে আমার মনে প্রবেশ করে। সারা নাক্ষত্রিক বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে এই অদ্ভুত সুন্দর রাঙা ফলগুলি! রঙের কি তীক্ষ্ণ কনট্রাস্ট! চিক্কণশ্যাম লতাবীথির শ্যামল পত্রপুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে টুকটুকে রাঙা ফলগুলি···আপেল ফলের মত গড়ন অবিকল, তবে পাকা আপেল হয় হলদে-লালে মেশানো—এর একেবারে সিঁদুরের মত রং।

এর মধ্যেই বিশ্ব। এই মাকালঝোপের নিচেই। এই যে মাকাল-লতাগুলো এদিক ওদিক অদ্ভুতভাবে ঝুলচে গাছ থেকে পড়ে, তার গাঁটে গাঁটে পাকা ফল, এই যে রহস্যময় সুন্দর দৃশ্য যার দিক থেকে চোখ ফেরানো যায় না, অবাক হয়ে বিমুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকতে হয়—এই সৃষ্টির আইডিয়ারূপী বীজ কার মধ্যে ছিল? কোন দেবতা তিনি? কত বড় শিল্পী তিনি?

'কল্পনাসৃষ্টিবীজঞ্চ'।

কার মহতী কল্পনার মধ্যে এ সুন্দর মাকাল-লতার দুলুনি, এর শ্যামপত্রগুচ্ছ, এর টুকটুকে রাঙা, সুগোল, সুঠাম ফলগুলো ছিল বীজরূপে অধিষ্ঠিত? বাষ্পাগ্নিপ্রোজ্জ্বল শত শত সহস্র সহস্র লক্ষ কোটি নীহারিকা যিনি সৃষ্টি করেচেন, সেই মহারুদ্রের ভয়াল রূপ কোথায় মহাশূন্যের দূর প্রান্তে; আর কোথায় এই ক্ষুদ্র পৃথিবীগ্রহের এককোণে সুনিভৃত নির্জ্জন লতাবিতান, সূর্য্যের সে বিরাট হাওয়ার বাষ্পতেজ বহু মাইল ব্যাপী বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে, সজল বর্ষার মধ্য দিয়ে, বসন্তদিনের জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়ে, বনবিহঙ্গকাকলীর মধ্য দিয়ে, বনকুসুমের সুবাসের মধ্য দিয়ে পরিস্রুত হয়ে মোলায়েম হয়ে প্রভাতের রৌদ্ররূপে যে লতাবিতানকে আলো করেচে,—আর তারই মধ্যে এই সুন্দর চিক্কণ, সুপুষ্ট, রাঙা মাকাল-ফল লতাগ্রভাগে দোদুল্যমান!

যিনি অগ্নিতে, যিনি জলেতে।

যিনি মহারুদ্র, তিনিই চিরপ্রাচীন অথচ চিরতরুণ পুষ্পধন্বা দেবতা···সৃষ্টি বজায় রাখতে কামদেবের আবির্ভাবের প্রয়োজনে হয়তো। মুখে মুখে এক কবিতা রচনা করলুম সেই অজানা শিল্পী দেবতার উদ্দেশে···

হেথা নীল আকাশের তলে
প্রজাপতি ওড়ে ফুলে ফুলে,
হোথা কোথা কত দূরে
'ওরিয়ন সেটি' ঘোরে
সঙ্গে তার সুশুভ্র বামন।*

কবিতা হিসেবে লোকে হাসবে হয়তো। কিন্তু লোকদের জন্যে এ রচিত নয়—যাঁর উদ্দেশে সেই প্রভাতের কনকদ্যুতিমণ্ডিত বনবীথিতলে এ কবিতা মুখে মুখে রচিত, তিনি

* ওরিয়ন সেটির সহকারী নক্ষত্র, ইংরেজীতে 'হোয়াইট ডোয়ার্ফ' শ্রেণীর।

কৃপা ও প্রশ্রয়ের স্মিতহাস্তে দক্ষিণপাণি প্রসারিত করে গ্রহণ করেচেন অক্ষমের সে স্তুতি। 'ওমিক্রন সেটি'র অগ্নিলীলার মধ্যে এই গোল গোল রাঙা মাকাল ফলের স্বপ্ন লুকানো আছে। 'ওমিক্রন সেটি'র চারিপাশে ঘূর্ণ্যমান গ্রহরাজি যদি থাকে, যদি সেখানে অনন্তযৌবনা দেবকন্তারা সে দেশের বনবীথির অন্তরালে, সেখানকার অজ্ঞাত বসন্তদিনে অলস শয়নে শুয়ে দিনপাত করেন, কে জানে সেই বনবীথির মাঝে এমন মাকাল-লতা, এমন দোদুল্যমান ফলগুচ্ছ, ঘনসবুজ ঝোপের অন্তরালে এমন টুকটুকে রাঙা ফল হয়তো আছে।

মাকাল ফলের আয়ুষ্কাল বেশী দিন নয়, একমাস দেড়মাস। সুপক্ব অবস্থায়ও দিন-পনেরো গাছে দোলে, তারপর একদিন ঝরে পড়ে যায়। তাই রোজ দুবেলা যেতাম মাকাল ঝোপের তলায়—একমাস দেড়মাস ধরে কত রূপে একে দেখেচি—এই লতাবিতানকে। প্রভাতের আলোতে, ঘনবর্ষার মেঘমেদুর সন্ধ্যায়, নির্জ্জন ভাদ্র দ্বিপ্রহরে নিস্তব্ধ প্রশান্তির মধ্যে উদার নীলাকাশের তলে ঘুঘু ডাকা উদাস বনানীর পটভূমিতে, সুন্দর জ্যোৎস্নারাতের প্রথম প্রহরের জ্যোৎস্নায়। বাবলার হলদে ফুল আর সাঁই-বাবলার ফুলের শিষ, তার মধ্যে দুলে দুলে হলদে-ডানা সাদা-ডানা প্রজাপতির মেলা, তার মধ্যে দোদুল্যমান মাকাল-লতার নিবিড় ছায়াগহন আশ্রয়, তপোবনের ন্যায় স্নিগ্ধ, পবিত্র। খানিকটা সেখানে দাঁড়ালেই সৌন্দর্য্যে অভিভূত হয়ে পড়ি, কেমন যেন সারাদেহ শিউরে ওঠে, মন অপূর্ব্ব ভাবে ও স্বপ্নে বিমুগ্ধ হয়ে পড়ে—এ আমি এই গত এক মাসের মধ্যে অন্তত ছ সাতদিন দেখেচি। সে স্বপ্ন কিসের কি করে বলবো, আম্রশাখা ও সাঁই-বাবলার ফুলে ভরা শাখার পিছনকার নীল আকাশের স্বপ্ন, কোনো মহাশিল্পী মহাদেবতার প্রত্যক্ষ আবির্ভাবের স্বপ্ন, সবুজ ঝোপের মাথায় ফলন্ত রাঙা মাকাল ফলগুলির স্বপ্ন—গভীর সৌন্দর্য্যের স্বপ্ন। পাগল করে দেয় ওই স্বপ্ন।

আমি জানি, তেমন ভাব ও স্বপ্নালুতা সারা বছরে একদিন এলেও জীবন ধন্য হয়ে যায়—তাই এই মাকাল-লতার সীজন্-এ এল মাসে সাতদিন।

এ মাকাল লতার ঝোপ যেন পবিত্র দেবায়তন, অতি পবিত্র অতি সুন্দর। সৌন্দর্য্যের পূজারী যে, এই দেবায়তনে দেবতার আবির্ভাব সে দর্শন করবে। এখানে জাগ্রত ও প্রত্যক্ষ দেবতাকে নিত্য প্রণাম করবে।

জয় হোক মাকাল ফলের! জয় হোক 'ওমিক্রন সেটি'র। কত বড় ও কত ছোট। কিন্তু উভয়ের মধ্যেই আর্টিস্টের আবির্ভাব অতি প্রত্যক্ষ, অতি বিচিত্র। যার মন খারাপ হয়েচে সে অমৃতের সাগরে এসে তীর্থজল আহরণ করুক। প্রত্যক্ষ করুক ঋগ্বেদের শিবরুদ্রীয় স্তোত্রের অমর বাণী। বৃক্ষের পত্রেও তুমি, পত্রের পতনেও তুমি।

আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি মাকাল ফল ঝরে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে, মাকাল-লতার শ্যাম শোভা অন্তর্হিত হবে, বনভূমি আগামী বৎসরের শ্রাবণদিনের প্রতীক্ষায় থাকবে—সুপক্ব মাকাল ফলের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায়। ঝরঝর বাদল দিনের অপরাহ্ণে আবার এদের দল আসবে ঘুরে, যেমন এরা আসে প্রতি বর্ষা ঋতুতে, কত বৎসর, কত শতাব্দী, কত যুগ ধরে…অনন্তের অসীম প্রতিনিধির মতো…কেউ খবর রাখে, কেউ রাখে না।

বংশলতিকার সন্ধানে

সন্ধ্যার কিছু আগে নীরেন ট্রেন হইতে নামিল। তাহার জানা ছিল না এমন একটা ছোট্ট স্টেশন তাদের দেশের। কখনো সে বাংলা দেশে আসে নাই ইতিপূর্ব্বে এক কলিকাতা ছাড়া।

নীরেনের দাদামশাই রায় বাহাদুর শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন বাংলা-দেশের পল্লীগ্রামে গিয়া সে যেন জল না ফুটাইয়া খায় না, মশারি ছাড়া শোয় না, নদীর জলে না স্নান করিয়া তোলা জলে স্নান করে।. নীরেনের স্বাস্থ্যটি বেশ চমৎকার, ডাম্বেল মুগুর ভাঁজিয়া শরীরটাকে সে শক্ত করিয়া তুলিয়াছে, বড়লোকের দৌহিত্র, অভাব অনটন কাহাকে বলে জানে না। মনে নীরেনের বিপুল উৎসাহ। চোখের স্বপ্ন এখনও কাঁচা, সবুজ।

একটা লোক প্ল্যাটফর্ম্মের প্রান্তে দাঁড়াইয়া প্ল্যাটফর্ম্মে সাজানো দূর্ব্বাঘাসের ওপর গরু ছাড়িয়া দিয়া গরুর দড়ি হাতে দাঁড়াইয়া ছিল। নীরেনের আহ্বানে সে নিকটে আসিল। নীরেন বলিল—রামচন্দ্রপুর কতদূর জানো?

লোকটা বলিল—কেন জানবো না? মেটিরি রামচন্দ্রপুর তো? এখেন থে ঝাড়া তিনকোশ পথ—

—তিন কোশ।

—হাঁ বাবু। কনে যাবেন সেখানে?

—বাঁড়ুয্যে বাড়ী।

—তা যান বাবু এই পথ দিয়ে—

নীরেনের কাছে এ সব একেবারেই নতুন। এই আসন্ন সন্ধ্যায় মাঠের মধ্যের পথ দিয়া সে যাইবে তিনক্রোশ দূরের গ্রামটিতে। ওই মাঠের মধ্যে কত মাটির ঘরে ভর্ত্তি পাড়াগাঁয়ে পাশ কাটাইয়া তাহাকে যাইতে হইবে। মাত্র ছাব্বিশ বৎসর বয়স যার—দুনিয়া তার পায়ের তলায়, সে অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে স্বর্ণখনির সন্ধানে বাহির হইতে পারে, সে উত্তরমেরু-অভিযানে একঘণ্টার নোটিশে যোগ দিতে পারে, মাত্র একটা ছোট স্যুটকেসের মধ্যে টুথব্রাশ আর তোয়ালে পুরিয়া।

চৈত্র মাস। স্টেশনের পিছনে মাঠের ধারে বড় একটা নিম গাছ। ফুটন্ত নিমফুলের ভুরভুরে সুবাস বাতাসে। নিমগাছ অবশ্য তাদের আলিগড়েও আছে, কিন্তু এমন রহস্যময়ী অজানা সন্ধ্যা মাঠের প্রান্তে তাহার জীবনে কটা নামিয়াছে?

নীরেন জানে, যদিও সে দিল্লী ও আলিগড়ে মানুষ, একবার কানপুরে আসিয়া ভাবিয়াছিল প্রায় বাংলাদেশের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে বুঝি। পাঞ্জাবের অসম জলহাওয়ায় তার শরীর গড়িয়া উঠিয়াছে—হয় ভীষণ শীত, নয়তো দুর্দান্ত গরম—একশো বত্রিশ ডিগ্রী উত্তাপের

হাওয়া গা-হাত-পা পুড়াইয়া বহিতেছে—সেখানে গ্রীষ্মের দুপুরে বসিয়া বসিয়া বাদশাহী তন্থানা ও সুন্দরী ইরাণীদের স্বপ্ন লুর আগুনে ঝলসাইয়া যায়।

নীরেন মাঠের মাঝখানের পথ বাহিয়া হন্ হন্ করিয়া হাঁটিয়া চলিল। দূর মাঠের প্রান্তে চাঁদ উঠিতেছে—নিশ্চয় আজ পূর্ণিমা, নতুবা সন্ধ্যার পরে চাঁদ উঠিবে কেন? দুখানা গ্রাম পথে পড়ে—রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া গ্রাম্য লোকেরা দেখিতেছে। একজন বলিল—কনে যাবা?

—রামচন্দ্রপুর।

—বাড়ী কনে?

—কলকাতা।

কলকাতা বলাই সহজ, কারণ আলিগড় বলিলে ইহারা কিছুই বুঝিবে না। কিছুদূর গিয়া আর একটি ক্ষুদ্র পল্লী—নীরেন্দ্র নাম জিজ্ঞাসা করিল। রাস্তার ধারেই একটা পুরানো কোঠাবাড়ী, গোটা দুই নারিকেলগাছ, দুটি বড় ধানের গোলা নারিকেল গাছটির তলায়। জন পাঁচ-ছয় লোক গোলার কাছে উঠানে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে কথাবার্ত্তা বলিতেছে—নীরেনকে দেখিয়া বলিল—বাড়ী কোথায়?

—কলকাতায়।

—এদিকি কোথায় যাওয়া হবে?

—রামচন্দ্রপুর।

তাহারা পরস্পর চাওয়াচাওয়ি করিয়া বলিল—এই রাত্তিরি সেখানে যাতি পারবেন না।

নীরেন বলিল—কেন?

—তিনকোশ পথ এখান থেকে, তা ছাড়া গরম কাল, মাঠের পথ, সাপ-খোপের ভয়। কার বাড়ী যাবা রামচন্দ্রপুর?

—বাঁড়ুয্যে-বাড়ী।

—কোন বাঁড়ুয্যে-বাড়ী? সে গাঁয়ে ব্রাহ্মণ তো নেই?

—এক বুড়ী আছে না?

—আছেন বটে এক মা ঠাকরোন। ওই বাঁওড়ের ধারে গোলাবাড়ীতে থাকেন। তা তিনি আবার মাঝে মাঝে তাঁর জামাইয়ের বাড়ী যান কিনা? দেখুন, আছেন কিনা।

সেখানে পৌঁছাইতে নীরেনের বড্ড রাত হইয়া গেল। গ্রামটিতে চারিধারে বাঁশবন আম-বনের নিবিড় ছায়া, প্রথমেই গোয়ালাদের পাড়া, তারপর বড় মাঠ একটা, গোটা দুই বড় পুকুর, শেওলায় ও কচুরীপানায় ভর্ত্তি।

পথের ধারে একটা খড়ের ঘরে তখনও টিম টিম করিয়া আলো জ্বলিতেছিল। নীরেনের প্রশ্নের উত্তরে একটি লোক উত্তর দিল, সেই গ্রামই রামচন্দ্রপুর বটে। বাঁড়ুয্যে-বাড়ীর বুড়ী? হাঁ, আর একটু আগে বাঁওড়ের ধারে সারি সারি নারিকেল গাছওয়ালা বড় আটচালা খড়ের ঘর।

নীরেন বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিল। বড় একখানা আটচালা ঘরের পাশে ছোট রান্নাঘর, সেখানে আলো জ্বলিতেছিল।

নীরেন উঠানে দাঁড়াইয়া ডাকিল—বাড়ীতে কে আছেন ?

একটি বৃদ্ধা টেমি হাতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—কে ডাকে ?

—আমি।

—কে বাবা তুমি ?

—আমাকে কি চিনতে পারবেন ? আমি আলিগড় থেকে আসচি।

বুড়ী টেমিটা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া নীরেনের মুখ দেখিবার চেষ্টা করিল। তাহার মুখে কৌতুহল ও সন্দিগ্ধতার রেখা। হাতের তালু চোখের উপর আড় করিয়া ধরিয়া আলো হইতে চোখ বাঁচাইবার ভঙ্গি করিয়া আরও দু-এক পা আগাইয়া আসিয়া বলিল—কে বাবা ?

—আমার বাবার নাম ৺রাজকৃষ্ণ মুখুয্যে—

বুড়ী আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বলিল—রাজকেষ্ট ? রাজকেষ্ট ?

—আমাদের পৈতৃক বাড়ী ছিল গড় মুকুন্দপুর—আমার ঠাকুরদাদার নাম ৺তারিণীচরণ মুখুয্যে—আমার মায়ের বাপের বাড়ী ছিল সামতাবেড়ে, মায়ের নাম ছিল অমিয়বালা—

—ও ! এখন বুঝলাম। তুমি আমার মেয়ের সইয়ের ছেলে !

—হ্যাঁ দিদিমা।

—এসো এসো ভাই ! কত কালের কথা সব। তোমাদের মুখ দেখে মরবো এইটুকু বোধ হয় ছিল অদেষ্টে। আর সবাই ছেড়ে গিয়েচে বাবা, শুধু আমিই পড়ে আছি।

—সইমা কোথায় ?

—সে তো আজকাল এখানে থাকে না। সে থাকে তার শ্বশুরবাড়ী, এই পাশের গাঁ।

—আমি তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে এসেচি।

—আজ রাত্তিরে এখানে থাকো। কাল যেও এখন সকালে। এখান থেকে দু-কোশ।

—এই যে বললেন পাশের গাঁ ?

—মধ্যে মাদারহাটির মাঠ আর জলা পড়ে যে ভাই। দু-কোশের বেশী ছাড়া কম হবে না।

নীরেন হাত পা ধুইয়া ঠাণ্ডা হইয়া বসিল। এ যেন নতুন একটা জগতে সে আসিয়া পড়িয়াছে। এমন দেশে সে কখনো আসে নাই। যে দেশে তাহার জন্ম, সে দেশে এত বনজঙ্গল কেহ কল্পনা করিতে পারে না গ্রামের মধ্যে। নতুন ধরনের গাছপালা, অসংখ্য পাখীর কলকাকলী, বনফুলের মৃদু সৌরভ। বুড়ীর রান্না শেষ হইতে রাত দশটা বাজিল। কেবল সোঁদা সোঁদা মাটির গন্ধ বাহির হওয়া লেপাপোঁছা মাটির ঘরের দাওয়ায় কলার পাতা পাতিয়া বুড়ী তাহাকে খাইতে দিল। রাঙা আউশ চালের ভাত, পেঁপের ডালনা, সোনা-

মুগের ডাল, উচ্ছে ভাজা, আলুভাতে, ঘন আওটানো সরপড়া দুধ, দুটি পাকা কলা, একদলা আখের গুড়ের পাটালি। অদ্ভুত রান্না বুড়ীর হাতের। আলিগড়ের পশ্চিমা পাচকের হাতের রান্না খাইয়া সে আজীবন অভ্যস্ত—এমন চমৎকার রান্নার সঙ্গে পরিচয় ছিল না!

উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সুরে বলিল—এমন রান্না কখনো খাই নি দিদিমা! শুনতাম বটে বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ের রান্নার কথা—কিন্তু এ যে এমন চমৎকার তা ভাবি নি—

বুড়ী হাসিয়া বলিল—রান্না করতে পারতেন আমার শাশুড়ী। তাঁর কাছেই সব শেখা। ডাকসাইটে রাঁধুনি ছিলেন আটখানা গাঁয়ের মধ্যি—

বুড়ীর কথার মধ্যে যশোর জেলার টান নীরেনের বড় ভাল লাগিল।

শুইয়া শুইয়া উঠানের নারিকেল বৃক্ষশ্রেণীর পাতার কম্পন দেখিতে দেখিতে নীরেন ভাবিতেছিল, এই তাহার স্বদেশ, তাহার অতি প্রিয় স্বদেশ। এই তাহার মায়ের জন্মভূমি, পিতার জন্মভূমি, পূর্ব্বপুরুষদের জন্মভূমি—বাংলা দেশ। কেন এতকাল সে মাতৃভূমিকে ভুলিয়া ছিল? ভাগ্যের দোষ। সে কি জানিত এত সৌন্দর্য্য বাংলাদেশের রাত্রির অন্ধকারে? গন্ধভরা অন্ধকারে? পাখীর ডাকের মধুর তান সে হিমালয়ে শুনিয়াছে। আলমোড়ায় ল্যান্সডাউনে শুনিয়াছে। তাহার ধনী মাতামহের সঙ্গে কয়েকবার সে সব স্থানে সে গিয়াছিল। দেবতাত্মা নগাধিরাজ মাথায় থাকুন—মাথায় থাকুক ক্যামেলস-ব্যাক-এর অপূর্ব দৃশ্য, মুসৌরীর অতুলনীয় গিরিশোভা—এখানকার পক্ষীকুলের সুমিষ্টকাকলী যেন বহুপরিচিত বিগত দিনের প্রিয়জনের বার্ত্তা বহন করিয়া আনে, কত দিনের ঘরোয়া কাহিনী এদের সঙ্গে জড়ানো।

বুড়ী বলিল—ঘুম হচ্চে না ভালো গরমে বুঝি? পাখা নেবা একখানা?

—না দিদিমা। নতুন জায়গা বলে ঘুম আসচে না, গরমে নয়।

—এবার ঘুমিয়ে পড়ো ভাই—

—হ্যাঁ দিদিমা—?

—কি ভাই?

—আমার বাবাকে আপনি দেখেছিলেন?

—না ভাই, আমার কোথাও যাতায়াত ছিল না। শুনিচি তাঁর কথা, দেখি নি কখনো—তোমাদের গাঁ ছিল তো—

—গড় মুকুন্দপুর।

নাম শুনিচি, তবে যাই নি সেখানে।

সকালে উঠিয়া বুড়ি বলিল—হ্যাঁ ভাই, তোমরা শহরের লোক, সকালে কি খাও?

নীরেন হাসিয়া বলিল—যা খাই, তা কি দিতে পারবেন দিদিমা? চা?

বুড়ি বলিল—ও আমার পোড়া কপাল। ও-সব যে কখনো খাই নি, ভাই, ও-সবের পাটও নেই। একটু বেলের শরবত করে দি। ডোবার ধারের বেলগাছটায় কাল দুটো পাকা বেল পেড়েছিলাম ভাই।

চায়ের বদলে বেলের শরবত! উপায় কি? খাইতেই হইল তাহাকে। বুড়ী বলিল—তুমি কি মনে করে এসেছিলে ভাই?

সেই কথাটা বলাই নীরেনের পক্ষে শক্ত। সে যে জন্য আসিয়াছে প্রিয় পৈতৃক পল্লীগ্রামটিতে, বৃদ্ধা কি সে কথা বুঝিতে পারিবে? সে বলিল—বেড়াতে এলাম দিদিমা।

—এর আগে কখনো আস নি?

—না দিদিমা।

দুপুরের আগেই তাহার যাওয়ার ইচ্ছা ছিল এখান হইতে, কিন্তু বুড়ী ছাড়িল না। দুপুরের পরে রোদ অত্যন্ত চড়িল। বেলা চারটার আগে বাহির হওয়া সম্ভব হইল না। যাইবার সময় বুড়ী তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিল—এসো, এসো, ভাই, তোমার সইমার সঙ্গে দেখা-শুনো করে আবার এখানে আসবে কিন্তু। ভুলে যেও না ভাই। আচ্ছা ভাই।

আধ ঘণ্টার মধ্যে নীরেন আসিয়া মাদারহাটির মাঠ ও জলার মধ্যে পড়িল। প্রকাণ্ড বিল, পদ্মফুল ফুটিয়া থৈ থৈ করিতেছে, পদ্মের পাতার ভিড়ে জল দেখা যায় না, একদিকে একটি অন্তর্দ্বীপ মতন স্থানে অনেকগুলি বড় বড় গাছ—নীরেনের ইচ্ছা হইল ওই গাছগুলির তলায় সে কিছুক্ষণ বসিয়া বিশ্রাম করে। এই সুন্দর জলাভূমি যেন কাশ্মীরের ডাল বা উলার হ্রদের মত শোভাময়, কিন্তু এসব স্থানে টুরিস্ট ব্যবসায়ীদের ঢাক পিটানোর শব্দ নাই, সুতরাং এমন সুন্দর একটি সৌন্দর্য্যময় স্থানে কখনো কেহ আসে না।

সইমাদের গ্রামটিতে জঙ্গল তত নাই—ব্রাহ্মণপাড়ায় অনেকগুলি কোঠাবাড়ী, প্রায়ই সব চাষী গৃহস্থ, বড় বড় গোলা উঠানে, গোয়ালবাড়ী ভর্ত্তি গরু। একজনের উঠানে দোতলা বাড়ী তৈয়ারি হইতেছে, উঠানের বাতাবী লেবু গাছের তলায় মজুরেরা দুমদাম শব্দে সুরকি ভাঙিতেছে। নীরেন সেখানে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—চক্কত্তিদের বাড়ী যাব কোন্ দিকে?

একজন বলিল—কোন্ চক্কত্তি? অনেক চক্কত্তি আছে এ গাঁয়ে।

—৺ভুবনমোহন চক্কত্তি—

—সে ও পাড়ায়। ওই তেঁতুল গাছের পাশের রাস্তা দিয়ে যান—

আধঘণ্টা পরে সে সইমাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার প্রদত্ত পিঁড়িতে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছিল। নীরেন দেখিল তাহার সইমার বয়স খুব বেশি নয়, মাথার চুল এখনও এক-গাছি পাকে নাই, রং বেশ ফর্সা, দোহারা চেহারা, এক সময়ে যে ইনি সুন্দরী ছিলেন, এখনও দেখিলে বোঝা যায়।

সইমা চোখের জল ফেলিলেন। অনেক আশীর্ব্বাদ করিলেন। পাকা বেলের শরবত, মুগের ডাল ভিজানো ও আখের গুড় খাইতে দিলেন। সইমাকে পাইয়া নীরেন যেন হারানো মায়ের সান্নিধ্য বহুদিন পরে অনুভব করিল। সে সইমাকে কখনো দেখে নাই এর আগে। সইমা কিন্তু তাহাকে দেখিয়াছিলেন সে যখন দুই বৎসরের খোকা, তখন। প্রৌঢ়া মহিলার বহু পুরানো দিনের শোকস্মৃতি উথলাইয়া উঠিল আজ তাহাকে পাইয়া। এমন কত লোকের নাম করিতে লাগিলেন যাহাদের কথা মায়ের মুখে আলিগড়ে নীরেন শুনিত বাল্যকালে—

কত বাল্যস্মৃতি-জাগানো নামাবলী। দেশের-ঘরের সব লোকের নাম। বাঁচিয়া আছে কেউ কেউ এখনও—তবে বেশির ভাগই মারা গিয়াছে।

সইমা বলিলেন—তোর মুখে সইয়ের মুখ যেন মাখানো রয়েচে—

নীরেন হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল।

—সই বড় সুন্দরী ছিল। গ্রামের কাজকর্মে যখন সেজেগুজে নেমন্তন্ন খেতে কি বিয়ে-থাওয়ায় জল সইতে যেতো তখন লোকে দু দণ্ড চেয়ে দেখতো। এদানি রোগে শোকে আর কিছু ছিল না চেহারায়। এখান থেকে চলে যাওয়ার পরে আর কখনো দেখা হয় নি সইয়ের সঙ্গে। সে কতদিন হবে রে নীরু?

নীরেন মনে মনে হিসাব করিয়া বলিল—তা প্রায় তেইশ-চব্বিশ বছর হোল।

—সই মারা গিয়েচে কতদিন?

—বেশি দিন না, বললাম যে বছর পাঁচেক হবে।

—তাহলে সই বেঁচে থাকলে এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস হোত—

—তা হবে, আমারও হোল ছাব্বিশ। আপনার ছেলেও তো আমার বয়সী হবে, না সইমা?

সইমা আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন—কোথায় ছেলে বাবা? সে ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েচে অনেক কাল।

রাত্রে নীরেন খাইতে বসিয়াছে, সইমা সামনে বসিয়া খাওয়ার তদারক করিতেছেন।

নীরেন বলিল—আপনার আর দিদিমার রান্না সমান। এমন রান্না অনেকদিন খাই নি।

সইমা বলিলেন—তোর মাও ভাল রাঁধতো রে—যখন কপাল পুড়লো, এ দেশ থেকে সেই পশ্চিমে চলে গেল, তখন সে কি কান্না! বলে—সই, আর কি তোর সঙ্গে দেখা হবে? এই যাওয়াই আমার শেষ যাওয়া। সে ভাগ্যিমানী স্বগ্‌গে চলে গেল, আমিই রইলাম পড়ে।

নীরেন হাসিয়া বলিল—আপনি না থাকলে আজ কার মুখ চেয়ে এখানে আসতাম বলুন সইমা? সইমা দুধের বাটি নীরেনের সামনে রাখিয়া পাখার বাতাস দিয়া দুধ জুড়াইতে জুড়াইতে বলিলেন—তোকে যত্ন করবার দিন যখন আমার ছিল, তখন এলি নে। এখন কি আছে সইমার, কি দিয়েই বা তোকে যত্ন করবো? হ্যাঁরে, এতদিন পরে কি মনে করে এলি ঠিক বল তো?

—বলি সইমা, আপনি বুঝতে পারবেন। জানেন, আমি দুবছর বয়সে বাংলা দেশ ছেড়ে গিয়েছিলাম?

—সে তো খুব জানি।

—আর কখনো এদেশে আসি নি এর মধ্যে?

—তাও জানি।

—এতকাল পরে মায়ের ও বাবার বাক্সের কতগুলো পুরনো চিঠি পড়লাম সেদিন। পড়ে মনটা বড় ব্যাকুল হল জন্মভূমি দেখবার জন্যে। সে সব চিঠিতে আপনার নাম আছে,

আমার এক পিসিমার নাম আছে। আমি বাবাকে কখনো দেখি নি, তাঁর সম্বন্ধে, আমার ঠাকুরদার সম্বন্ধে—আরও অনেক নাম আছে বাবার এক পুরনো খাতার মধ্যে—সকলের সম্বন্ধে আমার জানবার বড় ইচ্ছে হোল। আমি জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত মামার বাড়ীর সকলকে দেখে আসচি, বাপের বাড়ীর বা নিজের বংশের কিছু খবর রাখি নে। সেই সব খুঁজে পেতে বার করবো বলেই এলাম।

—ওমা আমার কি হবে! কোথাকার পাগল ছেলে ছ্যাখো—

—না সইমা, আপনি ভেবে দেখুন আমার মনের অবস্থা। আমার ছাব্বিশ বছর বয়স হয়েচে কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমাদের বংশের কোনো খবর রাখি নে। বাপের বাড়ীর কোনো লোকের কথা জানি নে! অথচ আমার ভয়ানক ইচ্ছে জানবার। আপনি হয়তো ভাববেন এ আবার কি, আমার কিন্তু সইমা ঘুম হয় না এই সব ভেবে—সত্যি বলচি—আপনি আমায় বলে দিন কি ভাবে আমি তা করতে পারি—আমি তো কাউকে চিনি নে—বাংলাদেশের ছেলে, কিন্তু কোনো খবর রাখি নে দেশের।

—সব বলে দেবো, এখন খেয়ে শুয়ে পড়ো দিকি দুষ্টু ছেলে আমার!

নীরেন হাসিল। অনেকদিন পরে যেন হারানো মাকে ফিরিয়া পাইয়াছে, সেই ধরনের হাসি সইমার মুখে। ভাগ্যিস সে আসিয়াছিল। শ্যামল বাংলা মা যেন সইমার মূর্ত্তিতে তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাইতেছেন।

চৈত্র মাসের রাত্রি। হু হু দক্ষিণা হাওয়া খোলা জানালা দিয়া বহিতেছে। কি একটা ফুলের তীব্র সুবাস বাতাসে। নীরেন বাংলাদেশের অনেক কিছু গাছপালা চেনে না—কিন্তু তাহার কি ভালো লাগে এই সব পল্লীগ্রামের আগাছা জঙ্গল! আজ দু দিন তিন দিন মাত্র ইহাদের সহিত পরিচয়—তবুও যেন মনে হয় কত দিনের নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় তাহার শিরা-উপশিরায় রক্তের সহিত আবদ্ধ ইহাদের প্রাণস্পন্দন। এই সব বনস্পতির সহিত সেও একদিন তাহার প্রিয় জন্মভূমির এই মাটিতে জন্মিয়াছে।

সে একখানা খাতা আনিয়াছে সঙ্গে।

খাতাখানা তাহার পিতামহ ৺গদাধর মুখোপাধ্যায়ের স্বহস্ত-লিখিত। তাহাদের গ্রামের কত প্রাচীন দিনের তুচ্ছ গ্রাম্য ঘটনা ইহাতে কেন যে তাহার পিতামহ টুকিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনিই বলিতে পারিতেন। ক্ষুদ্র এক অখ্যাত পল্লীগ্রামের প্রাচীন ইতিহাসে কার কি ফল? অমন কত গ্রাম, কত অগুনতি গ্রাম বাংলা দেশে। কে জানিতে চাহিতেছে তাহাদের ইতিহাস? গরজই বা কাহার?

আজ রাত্রে আলোর সামনে বসিয়া খাতাখানা সে খুলিয়া দেখিল। সইমা তাহার বিছানা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ঘরে সে একা। মাটির ঘর। ছোট জানালা, কাঠের গরাদ। জানালার বাহিরে একটা কি গাছে থোকা থোকা সাদা সাদা ফুল ঝুলিতেছে—কতক ফাটিয়া তাহাদের ভিতরকার রাঙা রাঙা বীচি বাহির হইয়াছে—দিনমানে

নীরেন লক্ষ্য করিয়াছিল।

খাতার পাতায় লেখা আছে—

"২২শে চৈত্র। ১২৭২ সাল···"

এইটুকু পড়িয়াই নীরেন অবাক হইয়া যায়। কত কালের কথা! ১২৭২ সালেও পৃথিবী এমনি সুন্দর ছিল, এমনি বসন্ত নামিত এ পাড়াগাঁয়ের বন বুকে, এমনি কোকিল ডাকিত রাত্রি দিনে? সে তখন ছিল কোথায়? কোন্ অতীত দিনের কাহিনী এ সব?

মনে পড়ে আলিগড়ে তাদের দোতলার পড়ার ঘরে বসিয়া এই ডায়েরির পুরাতন তারিখগুলা সে পড়িয়া বিস্মিত হইত—কিন্তু তাহার চেয়েও অনেক বেশি বিস্ময় রহস্যের অনুভূতি আজ তাহার মনে।

তারপর লেখা আছে—

"আজ রামলোচন রায়ের প্রথম পক্ষের স্ত্রী উহাদের আমবাগানে হারাধন মুস্তফির সহিত ধরা পড়িলেন। ইহা লইয়া আজ জ্যাঠামশায়দের চণ্ডীমণ্ডপে সারাদিন তামাডোল চলিতেছে। রামলোচনের স্ত্রী বলিয়াছেন তিনি নিষ্কৃবি। আমের গুটি ঝড়ে পড়িতেছে, তাহাই কুড়াইতে গিয়াছিলেন, হারাধন মুস্তফির কথা কিছু জানেন না। আজ রামলোচন রায়ের স্ত্রীকে দেখিয়াছি। বয়স হইলেও চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। খুব সুন্দরী। সোনা কুমোরের বৌ ইহার কাছে দাঁড়াইতে পারে না—"

নীরেন এই ডায়েরিটুকু পড়িয়া কতবার মনে মনে হাসিয়াছে।

পিতামহ গদাধর মুখুয্যে বহুকাল সাধনোচিত ধামেই সম্ভবত প্রস্থান করিয়াছেন, নীরেনের মায়ের বিবাহ তখনও হয় নাই। সে পিতামহের কার্য্যের সমালোচনা করিতেছে না, তবুও মনে হয় এই কুম্ভকার বধূটির এইখানে উল্লেখ থাকার কারণ কি? বিশেষ করিয়া ঠাকুরদাদা ইহারই নাম করিলেন কেন? গ্রামের সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বলিয়া? না—

হায় রে সে ১২৭২ সাল! আর রামলোচন রায়ের নিরপরাধা সুন্দরী পত্নী যিনি নির্জ্জন দুপুরে বাগানে আমের গুটি কুড়াইতে গিয়া হারাধন মুস্তফির সঙ্গে নিজের নাম যোগ করিবার সুযোগ দিয়া মিথ্যা কলঙ্ক কুড়াইয়াছিলেন একদিন প্রায় আশি বৎসর পূর্ব্বের এক সুমধুর কোকিলমুখরিত, পুষ্পসুবাসামোদিত, প্রেমোজ্জ্বল বসন্তদিনে—কোথায় তিনি? আর কোথায় তাঁহার রূপের প্রতিদ্বন্দ্বী সোনা কুম্ভকারের রূপসী বধূ? আজ এই সব পল্লীগ্রামের মাটিতে তাঁহাদের নাম নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়াই যাইত যদি না তাহার পরোপকারী পিতামহ গদাধর মুখুয্যে এত ঘটা করিয়া উক্ত বধূদ্বয়ের ইতিহাস তাঁহার ডায়েরিতে নিঃস্বার্থ ভাবে লিখিয়া রাখিতেন!

হাসি পাইবার কথাই তো।

নীরেন ডায়েরি বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল, কিন্তু আজ রাত্রে তাহার বংশের পূর্ব্বপুরুষেরা যেন ভিড় করিয়া আশেপাশে তাঁহাদের অদৃশ্য অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন। তাঁহাদের ইতিহাস ভালো করিয়া জানিবার জন্যই তো সে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া বাংলাদেশে তাহার

জন্মভূমি অঞ্চলে আসিয়াছে এত কাল পরে। তাঁহারা ঘুমাইতে দিবেন না।

সকালে সইমা ডাকিয়া ঘুম ভাঙাইলেন—ও নীরু, ওঠ বাবা, বেলা ঝাঁ ঝাঁ করচে—

নীরেন ধড়মড় করিয়া বিছানার উপরে উঠিয়া বসিল।

সইমা বলিলেন—তোর আবার চা খাওয়ার অভ্যেস আছে, না?

—ছিল তো সইমা।

—এখানে কি করি উপায় তাই ভাবচি—

—ভাবতে হবে না। এখানে না হোলেও চলবে।

—তা কি হয় বাবা? দেখি। যার যা অভ্যেস—

—না সইমা, কিছু চেষ্টা করতে হবে না। তা হলে আমি দুঃখিত হবো।

সইমা কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু আধঘণ্টা পরে এক পেয়ালা ধূমায়িত চা আনিয়া তাহার সামনে রাখিলেন এবং একটা বাটিতে একবাটি মুড়ি। রায়বাড়ী হইতে চা চাহিয়া আনিয়াছেন, সেখানে বাড়ীসুদ্ধ সবাই চা খায়।

নীরেন চা পাইয়া মনে মনে খুশী হইল। মুখে বলিল—কেন বলুন তো এ সব—পরের বাড়ী থেকে আনতে যাওয়া?

সইমা বলিলেন—তোর মা থাকলে করতো না?

—তা কি জানি।

—করতো রে করতো। শুনবি তোর মায়ের কথা?

—কি, বলুন।

—তোর মা বড্ড শান্ত ছিল।

—মাকে আমি দেখেচি, শান্ত ছিলেন সবাই বলতো।

—একবার সই আর আমি নাইতে গিয়েচি ঘাটে। সাঁতার দিয়ে দুই সই মিলে নদীর মাঝখানে গিয়েচি। এমন সময় ঘাট থেকে কে চেঁচিয়ে বললে নদীতে কুমীর এসেচে। আমরা তো তাড়াতাড়ি ঘাটের দিকে এগুচ্চি, এমন সময় সইকে আমি ভয়ে জড়িয়ে ধরলাম। সই যত বলে ছাড়ো ছাড়ো দুজনেই ডুবে যাবো, আমি ততই ভয়ে সইকে জড়াই।

নীরেন রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিল—তারপর?

—তারপর আর কি? দুজনেই বেঁচে উঠলাম, একখানা নৌকো আমাদের এই অবস্থায় দেখতে পেয়ে ছুটে এল।

—তখন আপনারা একগ্রামেই থাকতেন?

—হ্যাঁ রে, নইলে আর সই বসবো কি করে। পাগল ছেলে আর কি!

কথাটা নীরেন সন্ধ্যাবেলা তাহার খাতায় লিখিয়া রাখে।

গ্রাম্য-জীবনের কোনো কথা সে বাদ দিতে চায় না। মরুপর্বত ভেদ করিয়া সুদূর পাঞ্জাব হইতে ছুটিয়া আসা (কোনো কটাক্ষ কেহ করিবেন না) তবে কিসের জন্য?

সইমার শ্বশুরবাড়ী এটা। কিন্তু একটি দেওরপো ছাড়া এখানকার বাড়ীতে কেহ

থাকে না। দুটি দেওর বাহিরে চাকুরি করে, সেখানেই পরিবার লইয়া থাকে; যে দেওরপো এখানে আছে ওটি পিতৃমাতৃহীন অনাথ। জ্যাঠাইমার কাছে মানুষ হইতেছে। জ্যাঠাইমা ভালও বাসেন।

দেওরপোর নাম কানু। কানু নীরেনকে খুব ভালো চোখে দেখে নাই। এই দুর্মূল্যের বাজারে ইনি আবার কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিলেন! কেন রে বাবা। যে তিন বিশ ধান হইয়াছিল, ইনি এখানে আসিলেন,—তাহাতে ক'দিন যায়? জ্যাঠাইমাও দেখিতেছি নীরু বলিতে অজ্ঞান!

কানু আসিয়া বলিল—যাত্রা দেখতে যাবেন?

—কি যাত্রা?

—এই দিগি—গোনাই যাত্রা।

—সে আবার কি?

—দেখবেন এখন। দিন দিকি একটা টাকা চাঁদা।

নীরু একটা টাকা বাহির করিয়া কানুর হাতে দিল।

গোনাই যাত্রার আসরে বসিয়া নীরেন যাত্রা তত দেখে নাই, যত সে এই সুন্দর রাত্রিটি ও যাত্রার আসরের পরিবেশের কথা চিন্তা করিয়াছে। যেখানে যাত্রার আসর, সেটা ছোট একটা মাঠ, তার চারিপাশে বনজঙ্গল, একদিকে বনের প্রান্তে একটা কামারের দোকান, সেখানে এখনও হাপরে আগুন জ্বলিতেছে। বাঁশের খুঁটিতে পাল টাঙানো হইয়াছে। পান বিড়ির দোকান বসিয়াছে, চাষা লোকে যাত্রা দেখিতে আসিয়া পানের দোকানের সামনে ভিড় করিতেছে। একটা মুচুকুন্দ চাঁপার গাছতলায় ফুল পড়িয়া বিছাইয়া আছে। বাতাসে মুচুকুন্দ চাঁপার সুবাস।

একটি গ্রাম্য মেয়ে ছিল গোনাই বিবি। তারই সুখ দুঃখের কাহিনী। নীরেনের পক্ষে এমন বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু যারা শ্রোতার দল, তাদের সারারাত্রি জাগিয়া দেখিবার বস্তু। ভ্রাতার বিরহে কাতরা তরুণী গোনাই বিবির সে করুণ গান, 'ও বছির, বছির রে, বৈঠা হাতে নিলি রে' অনেকের চোখে জল আনিয়া দিল।

নীরেন ভাবিতেছিল বহুদূরের লিপুলেক গিরিবর্ত্মে বরফ গলিয়াছে। দলে দলে ঝব্বুর পিঠে বোঝাই দিয়া যাত্রীরা চলিয়াছে মানস সরোবর ও কৈলাসের পথে। গুরলা মান্ধাতার তুষারাবৃত শৃঙ্গ শারদদিনের সূর্য্যকিরণে সোনার রং ধরিয়াছে। তাহার দাদামহাশয়ের বন্ধু করালীচরণ মজুমদার সস্ত্রীক এই মাসের শেষে মানস সরোবরে রওনা হইবেন, সঙ্গে যাইবেন নীরেনের দিদিমা ও বড় মামীমা, বাড়ীর গোমস্তা নাড়ু চক্কত্তি। আলিগড় হইতে আলমোড়া। আলমোড়া হইতে ধারচুলা। ধারচুলা হইতে লিপুলেক পাস। লিপুলেক হইতে মানস সরোবর। সে নিশ্চয় যাইত ওখানে থাকিলে।

কিন্তু সেজন্য তার দুঃখ নাই।

বাংলাদেশে সে আসিয়াছে মাতৃভূমির সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের সন্ধানে। গাছপালার

পাখীর কাকলীর মধ্যে দিয়া সে পরিচয় দিনে দিনে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে। ঐ মুচুকুন্দ চাঁপার ফুল যেন কতকাল পূর্ব্বের কোন বিস্মৃত অতীত শৈশবদিনে তাহার অজ্ঞাতসারে একদা সৌরভ বিতরণ করিয়াছিল—মায়ের মুখের সঙ্গে সে দিনটির ছন্দ একই তারে গাঁথা হইয়া আছে তার মনের বীণায়।

পরদিন গ্রাম্য নদীর ধারে একটা বড নিমগাছের তলায় সে দাঁড়াইল।

কমপিটিশন

শিবশঙ্কর সকালে উঠেই দু দফা ফোন করলেন। একবার য়্যাটর্নি রায় ও মিত্রের জীবনধন রায়কে ও আর একবার প্রসন্নদাস বড়ালের অংশীদার ও কর্ত্তা হরিদাস বড়ালকে, কারণ ওদের আপিস এখনো খোলে নি।

—নমস্কার, কি খবর?

—আসুন একবার। কতদূর করলেন?

—আসবো এখন?

—এখানেই চা খাবেন।

একটু পরে বাড়ীর বাইরে মোটরের শব্দ শোনা গেল এবং জীবনধন রায় ঘরে ঢুকলেন। জীবনধন রায়ের পরনে সাহেবি পোশাক, চোখে স্টীলের ফ্রেমের চশমা, পায়ে পেটেন্ট চামড়ার চকচকে বুট, বগলে ফোল্ডিং ব্যাগ।

—আসুন, মিঃ রায়, বসুন। নমস্কার।

—নমস্কার।

—ওরে, চা নিয়ে আয়। তারপর?

—তৈরি। সরেজমিন তদারক করবেন না?

—রেজেস্ট্রী আপিস সার্চের রেজাল্ট কি?

—ভালো। দাগী মাল নয়, তবে দেড়—দেড়ের কমে হবে না। আমাদের তিন পার্সেন্ট।

শিবশঙ্করবাবু হরিশ মুখুয্যের স্ট্রীটে তিনতলা বড় বাড়ী কিনচেন এঁদের দালালিতে। দেড় লক্ষ টাকা দাম, য়্যাটর্নিরা তিন পার্সেন্ট কমিশন নেবেন—আসল কথা হচ্ছে এই।… রূপোর ট্রে ভরে টোস্ট, ডিম সেদ্ধ, আলু সেদ্ধ ও লেটুস সেদ্ধ এল, তার সঙ্গে চায়ের সিকার, দুধ চিনি আলাদা।

শিবশঙ্করবাবু বললেন—মিষ্টি দিই নি—কারণ আমাদের এ বয়সে—

—না না। থাক। তারপর আমার গাড়ী রেডি, চলুন একবার সরেজমিনে। জিনিসটা দেখুন।

—বেড রুম কতগুলো?

—উনিশটা রুম সবসুদ্ধ ওপরে নিচে। ছটা বাথরুম, এ বাদে বাইরে তিনটে আলাদা পাইখানা। খুব ভালো বাড়ী। কুণ্ডু কোম্পানীকে রাজী করাতে বেগ পেতে হয়েছে খুব। বুড়ো একেবারে বেঁকে বসেছিল শেষকালে।

—এখন যেতে পারবো না—মাপ করুন। এখন বেলা দশটা পর্য্যন্ত মরবার ফুরসত নেই—এখুনি আবার লোক আসবে—

—আচ্ছা উঠি তাহলে। ওবেলা আপিসে ফোন করবেন এখন—ওখান থেকে যাওয়া যাবে।

একটু পরে হরিদাস বড়ালকে আবার ফোন করা হোল।

—নমস্কার, কি খবর? হাঁা, একবার, করেছিলাম—হাঁা—এই আধ ঘণ্টা আগে। হাঁা। সোনাটার কি হোল। বারের দাম কত বললেন? তিন আনা? আমার চাই কিছু—হাঁা—
—হাঁা—হাঁা—আচ্ছা। আজ?—হাঁা—আচ্ছা। আপিসে? আচ্ছা।

সাধারণ লোকে এ কথাবার্ত্তা থেকে বিশেষ কিছু বুঝবে না, কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার ওপর 'বড়াল বার' নামক বিখ্যাত সুবর্ণের বাট কিনবার পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়ে গেল।

ক্রয়-বিক্রয়ের পালা শেষ হোতেই শিবশঙ্করের আপিস ম্যানেজার ও তদারককার মিঃ ঘোষাল ঢুকে শিবশঙ্করকে খানিকটা মাথা নিচু হয়ে নমস্কার জানিয়ে একটা চেয়ারে বসলেন। দুজনের মধ্যে যে কথাবার্তা শুরু হোলো তা স্কোয়ার ফুট রেট, পার্সেন্ট, ইস্পাতের জালতি, সিমেন্ট, এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম, গ্যারিসন্ এনজিনিয়ার প্রভৃতি শব্দে পরিপূর্ণ ও কণ্টকিত। আজই মিঃ ঘোষালকে আপিসের কাজে তেজপুর যেতে হচ্ছে, ফোনে এখুনি আসাম মেলে বার্থ রিজার্ভ সম্বন্ধে শেয়ালদা স্টেশনের কর্ম্মচারীর সঙ্গে আলাপ হোলো। অন্য অন্য কথার পরে বেলা ন'টার সময়ে মিঃ ঘোষাল বললেন—তা হোলে আমি উঠি—

—কত টাকার দরকার?

—সতেরো হাজার তো ওদের পেমেন্ট করতে হবে, আর পুজোর ব্যবস্থা—তাও তিন হাজার নেবে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, হাজার খানেক দিতে হবে উপদেবতাদের। মিসেস বর্দ্ধনকে একটা প্রেজেন্ট দিতে হবে ভাল দেখে। কি দেওয়া যায়, স্যার, আপনিই বলুন।

—একটা জড়োয়ার কিছু দাও গিয়ে—হাজার খানেকের মধ্যে। বিশ হাজারের একটা চেক নিয়ে যাও—

—আজ্ঞে স্যার, ব্যাঙ্কে টাকা ভাঙানোর আমার সুবিধে হবে না। একটায় আসাম মেল। তার আগে আমার অনেক কাজ। একবার আপিসে যেতে হবে। ড্রয়ারের মধ্যে কাগজপত্র রয়েচে, নিয়ে যেতে হবে। গহনাই বা কিনবো কখন?

—আচ্ছা গহনার জন্যে আমি সুরেশকে পাঠিয়ে দিচ্ছি বসিদালের বাড়ী। যদি কিছু ভালো থাকে দেখে আসুক। সেজন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি এখান থেকে বাড়ী যাও—নেয়ে খেয়ে গাড়ী নিয়ে ব্যাঙ্কে গিয়ে আগে চেক ভাঙাও। ওখান থেকে ইস্টিশানে চলে যাও—গহনা যদি পাই সুরেশকে দিয়ে ট্রেনে পাঠাবো। মিসেস বর্দ্ধনকে খুশী রাখা

চাই ঘোটের ওপর। দেবতাকে তুষ্ট রাখতে হোলে দেবীর পূজা না দিলে হয় না। কমপিটিশনের বাজার, বুঝে কাজ করবে।

ডাক এল। একগাদা চিঠি। হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি একবার দেখে নিতে নিতে শিবশঙ্কর ডেকে বললেন—ও রিতুয়া, নিয়ে যা—বড় বৌমার চিঠি, নিয়ে যা—সুলেখার—ছোট বৌমার—ওপরে দিগে যা। আর শোন—বলে আয় আমি চান করবো এখুনি।

খাবার ঘরে বড় পুত্রবধূ নন্দা ভাত নিয়ে এলো টেবিলে। ছোট বাটিতে কাঁচামুগের ডাল, বে-মশলার মৌরলা মাছের ঝোল আর কাগজি লেবু কাটা পৃথক ডিশে। সামান্য একটু ঘরে পাতা দই শ্বেতপাথরের বাটিতে। শিবশঙ্কর খেয়ে হজম করতে পারেন না, লিভারের রুগী। পুত্রবধূ বললে —ও বেলা কখন ফিরবেন বাবা?

—তা কি বলতে পারি কখন ফিরবো? নানা কাজ। তারপর আজ অ্যাটর্নির সঙ্গে গুরুতর কাজ রয়েচে। কেন?

পুত্রবধূ হেসে বললে—আমরা ভাবচি বেহালা যাবো পিকনিক করতে। গাড়ীখানার দরকার ছিল—

—ও। তা—কটার সময় যাবে। গাড়ী না হয় শোভা সিং আপিস থেকে নিয়ে আসবে এখন। তোমাদের পৌঁছে দিয়ে চলে আসবে। আসবার সময় তোমরা ট্যাক্সিতে এসো। পৌঁছে গাড়ী ছেড়ে দিও—বিমান কোথায়? ওপরে আছে?

পুত্রবধূ মুখ নত করে বললে—তা তো জানি নে বাবা।

—তার মানে? বেরিয়েছে?

পুত্রবধূ পায়ের নখে মাটি খুঁটতে খুঁটতে সেদিকে চেয়ে থেকে উত্তর দিলে—উনি কাল রাত্তিরে তো বাড়ী আসেন নি।

—সে কি কথা! কালও আবার আসে নি—হুঁ—

শিবশঙ্কর ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন, আর কিছু বললেন না।

বেলা একটা। শিবশঙ্করের আপিস বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে। বেশি বড় আপিস নয়। জন আট নয় কেরানী বিবিধ খাতা নিয়ে ব্যস্ত। একজন ছোকরা টাইপরাইটারে ঠকঠক টাইপ করচে। শিবশঙ্করকে আপিসে ঢুকতে দেখে সবাই একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। সন্ত্রস্ত হবার কথা।

দেখতে আপিস ছোট হোক, কিছু দিন আগে এই আপিসে বসেই শিবশঙ্কর সরকার চালের কারবারে কম করেও সাত লক্ষ টাকা মুনাফা পেয়েচেন। তেরশ' পঞ্চাশ সালে দুর্ভিক্ষের বছর। তেরো সিকে দরে ধানের মণ কিনে সাড়ে ষোল টাকা মণ দরে ধান বিক্রি করেন। চালের কনট্রাক্ট নিয়ে এক হাজার টন চাল খরিদ করেন ত্রিপুরা জেলা থেকে। তারপর সে দেশে চালের দর উঠে গেল চল্লিশ টাকা মণ।

ভালো কাজ করেন নি তা নয়। দেশের বাড়ীতে প্রায় দু হাজার লোককে ফেন-ভাতের খিচুড়ি খাইয়েচেন, কাপড় বিতরণ করেচেন কত লোককে। সম্প্রতি দুটি মিলিটারী

কন্‌ট্রাক্টের কাজে শিবশঙ্কর অনেক টাকা রোজগার করেছেন। দুহাতে ঘুষ বিলিয়েও ছ লক্ষ টাকা ঘরে এনেছেন। এ বাদে খুচরো কারবার তাঁর অনেক রকম আছে; এই ছোট আপিসটাতে বসে সারা বাজারের গুপ্ত খবর রাখচেন। টেলিফোনের বিরাম বিশ্রাম নেই এক মিনিট। বাজারে তাঁর বহু চর সর্ব্বদা ঘোরাঘুরি করচে, শেয়ার মার্কেট থেকে সর্ষে পর্য্যন্ত কোনো বাজারের গুপ্ত খবর ওদের জানতে বাকি নেই।

মোটের উপর শিবশঙ্করের দিন যাচ্ছে ভালো, ধুলো-মুঠো করলে সোনা-মুঠো হচ্ছে। আর কি অসম্ভব খাটিয়ে লোক শিবশঙ্কর! চরকির মত ঘুরচেন এখানে ওখানে, এ আপিস ও আপিস, কত লোকের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করচেন, কত লোক তাঁর বাড়ী গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করচে—যে লোক এমনি নরম হয় না, তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করে অগ্রসর হতে হচ্ছে, ছুঁচ যেখানে গলে না, সেখানে হাতী গলিয়ে দিচ্ছেন শিবশঙ্কর,—পয়সা কি অমনি হয়?

শিবশঙ্করের অভিজ্ঞতা এই যে, অর্থ উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে দয়া মায়া চক্ষুলজ্জা ইত্যাদি দুর্ব্বলতা। যে বিচক্ষণ কারবারী সে এ সব মানবে না। কম্‌পিটিশনের বাজার, চক্ষুলজ্জা এখানে খাটে না।

আর একটা অভিজ্ঞতা, অবিশ্যি বড় মূল্যবান অভিজ্ঞতা যে, ঘুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে। শিবশঙ্করবাবু বলেই থাকেন—ওহে এমন লোক দেখলাম না যে পুজো পেলে খেতে চায় না। তবে বেশি আর কম। কেউ চায় ষোড়শোপচারে পুজো, কারো বা চাল কলা, কারো চিনির নৈবিদ্যি—ঢের ঢের দেখলাম হে, যেখানে ভেবেচি এর কাছে কেমন করে যাবো, এত বড় পদস্থ লোক···পুজো দাও, বাস্ সব ঠিক! সবাই সমান, তবে ওই যে বললাম, বেশি আর কম। চুরি করার সুবিধে জোটে নি যার, সেই সাধু।

বেলা একটার সময় একটি রোগা, দীর্ঘ চেহারার সাহেবি পোশাকপরা লোক শিবশঙ্করের আপিসে এসে ঢুকলো।

শিবশঙ্কর বললেন—কি খবর? আসুন, বসুন।

—বড্ড বেশি চায়।

—কত?

—সাড়ে পাঁচ করে কাঠা।

শিবশঙ্কর বিস্ময়ের সুরে বললেন—জমি কার? ব্যাঙ্কের?

—আজ্ঞে না, মাগনলাল মুখনলাল ক্ষেত্রীর। একবার মর্টগেজ আছে। রেজিস্ট্রি আপিস সার্চ করা হয়েচে।

—বড় বেশি দর বলছে না?

—ও অঞ্চলে ওর কম দর নেই। এর পরে সাত পর্য্যন্ত উঠবে। ন কাঠা একসঙ্গে আর পাওয়া যায় না ওর। আপনি কাল নিজে একবার চলুন—বায়নাপত্তর রেজিস্ট্রি না করলে দু-তিনটে খদ্দের ঘুরিয়ে রয়েচে।

এই সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। অল্প খানিকক্ষণ কথা বলে শিবশঙ্কর ফোন রেখে

সামনের লোকটিকে বললেন—য়্যাটর্নির আপিস থেকে বলচে হরিশ মুখুযোর ষ্ট্রীটের বাড়ীটা এখুনি দেখতে যেতে হবে। চলুন না বাড়ীটা দেখে আসবেন—

উভয়ে মোটরে বার হয়ে সোজা হরিশ মুখুয্যে ষ্ট্রীটে সেই নম্বরের বাড়ীর সামনে এসে দেখলেন মিঃ ঘোষাল তাঁদের পূর্ব্বেই সেখানে মোটর থামিয়ে অপেক্ষা করচেন।

বাড়ীর ওপরের নিচের সব ঘর, বাথরুম, দরদালান, ছাদ সব ঘুরে দেখা হলো। মিঃ ঘোষাল বললেন—মতামত দিন মিঃ সরকার।

—মতামত আর কি, নেওয়া হবে।

—তিন পার্সেন্টের কথা স্মরণ রাখবেন। ও আমাদের একটা শর্ত্ত। নয়তো আমারই হাতে ছুটো খদ্দের। আপনি ক্রেতা, আপনার কাছ থেকে কমিশন নেওয়া নিয়ম নয় জানি—কিন্তু এখানে অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা—

—সে যা হয় হবে। ইলেকট্রিক ইন্‌স্টলেশন নেই কেন? অত বড় বাড়ী—

—ছিল। ওয়্যারিং করে নিতে, যা খরচ পড়বে তা তো আপনি বাদ পাচ্চেন। ওই বাড়ী কি তুইয়ের কমে হয়—চার লক্ষ সত্তর হাজার পঁচাত্তর হাজার তো উইদাউট এনি ডাউট! আপনি বলুন, এখুনি এক মাড়োয়ারি খদ্দের—

—না, না, সে কথা বলি নি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—

শিবশঙ্কর একাই আপিসে ফিরলেন, তখন বেলা পৌনে তিন।

আপিসের চাকর কারুয়া বললে—হুজুর, টেলিফোন দুবার বাজিয়েছে। হামি নম্বর লিয়ে রাখিয়েসে।

—কই নম্বর?

—হুজুরের ঘরের টেবিলমে আছে। মধুবাবুকে দিয়ে লিখিয়ে রাখিয়েসে। এক তো সাউথ ওয়ান ফাইভ—

শিবশঙ্কর চাকরকে থামিয়ে দিয়ে বললে—আচ্ছা, আচ্ছা, তুই যা—এক পেয়ালা চা জলদি তৈরি কর—

—আউর কুছ, বাবু?

—আজ বাড়ী থেকে টিফিন আসে নি কেউ? ফল-টল?

—না হুজুর। সড়া পোচা দু আপেল হুজুরের টেবিলমে ছিল, ও হামি ফেকিয়ে দিয়েসে—ও কালওয়ালা—

—বেশ করিচিস। যা চা নিয়ে আয়—

কারুয়া অনেক দিনের চাকর; আগে শিবশঙ্করের বাড়ীতে ছিল, এখন কাজকর্ম্মের সুবিধের জন্যে ওকে আপিসে নিজের খাসকামরার চাকর রেখেচেন শিবশঙ্কর। শিবশঙ্কর কি খান না খান, কি তাঁর অভ্যেস, কারুয়া এ সব জানে। কারুয়ার আনীত চায়ের পেয়ালাতে চুমুক দিয়ে শিবশঙ্করবাবু ভাবছিলেন আরও কিছু জমির সন্ধান নিতে হবে।

জমি বড় দরকার।

এই সব অঞ্চলে বড় বড় প্লটের সন্ধানে আছেন।

শিবশঙ্কর কাগজ-কলমে ছোট্ট একটু হিসেব করে নিলেন। লাখ দুই টাকার জমি কিনে রাখতে হবে। টালিগঞ্জের দিকে কিছু জমি এখনো আছে। ব্যাঙ্কের জমি কিছু আছে লেক আর ঢাকুরে যাদবপুর অঞ্চলে।

'টাকা হোলে মাটি করো' মস্ত বড় কথা। অত বড় ইনভেস্টমেণ্ট নেই টাকার। দালালেরা নানারকম সন্ধান নিয়ে আসে। তাঁর টেবিলের ড্রয়ারে আছে জমিজমা-সংক্রান্ত নানা রকম খবর, দালালদের দেওয়া। শিবশঙ্করবাবু ড্রয়ার খুলে অর্দ্ধ-অন্যমনস্ক ভাবে সেগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলেন। মেদিনীপুর জেলায় শালের জঙ্গল একশো কুড়ি বিঘে এক প্লটে। ধানের জমি ওই সাথে এক প্লটে সত্তর বিঘে, মাঝখানে বড় পুকুর।

বর্দ্ধমান জেলায় ধানের জমি নব্বুই বিঘে। বনপাশ স্টেশনের কাছে।

কুস্থারডি কয়লাখনির এক তৃতীয়াংশের মালিকানা স্বত্ব, বড় বাংলোঘর, ইঁদারা, ছোট বাগান একত্রে।

রানাঘাট টাউনে রেলের নিকট স্টেশন রোডের ওপর দুখানা বাড়ী, রেলের ওপারে বাইশ বিঘের সেগুন বাগান, ইঁটের ভাঁটা।

যশোর জেলায় মৌজা ধরমপুর ও মৌজা চণ্ডীরামপুর—দুইটি বড় মৌজা নীলামে উঠেচে। সামনের মাসের বারোই তারিখে যশোর সদরে নীলাম হবে। লোক পাঠিয়ে শিবশঙ্কর জেনেচেন মৌজার আদায় ভালো, একাত্তরটি জমার মধ্যে উনিশটি খাস হয়ে গিয়েচে এবং আশা আছে আরও আটটি জমা এই বছরের মধ্যেই খাস হবে। বাকি খাজনা পড়ে আছে প্রজাদের কাছে কয়েক হাজার টাকা।

হাজারীবাগ জেলায় সিংজানি-ভোজুড়ি অভ্রের খনি ও শালবন, বাংলো, ইঁদারা এবং কিছু ধানের জমি।

উল্টোডিঙির খাল ধার থেকে সামান্য দূরে ৺মহেশচন্দ্র সিমলাইয়ের বাগানবাড়ী ও পুকুর, বাগানে জমির পরিমাণ দশ বিঘে। কলমের আম, লিচু, ফলসা, ম্যাঙ্গোস্টিন প্রভৃতি ফলের গাছ। দোতলা বাড়ী।

অভ্রের খনির ওপর ঝোঁক বেশি শিবশঙ্করের। দু-পার্সেন্টের অনেক বেশি আসবে টাকার ওপর। স্বাস্থ্যকর স্থান, মাঝে মাঝে গিয়ে থাকাও যাবে, কলকাতায় তো যা খান হজম হয় না, লিভারের রোগে কষ্ট পাচ্চেন।

আর বাকী সব পাড়াগেঁয়ে জমিজমা, ধানক্ষেত—নাঃ, ওদের কি মূল্য আছে? জমি কিনতে গেলে কলকাতায়। কলকাতার সম্পত্তির মত সম্পত্তি নেই—বাড়ী বা জমি। মহেশ সিমলাইয়ের বাগানবাড়ী ভালো, ফলবান গাছ অনেকগুলো, নার্সারি করবার জন্যে কেউ ভাড়া নিতে পারে, অনেকখানি জমি—মূল্যবান সম্পত্তি হয়ে উঠতে পারে দু চার বছর পরে। দালালে বলচে আটবট্টি হাজার, তিনি বলচেন পঞ্চাশ হাজার। যদি ওটা হয়, তবে খুবই ভালো।

শিবশঙ্কর ফেঁপে উঠলেন তো সেদিন। ক'বছরের কথা আর? কি ছিল শিবশঙ্করের? বারাসাতের কাছে ভবনহাটি বিষ্ণুপুর, ক্ষুদ্র গ্রাম, সেখানেই পৈতৃক বাড়ী। অবিশ্যি নিতান্ত গরীব ছিলেন না, সেকেলে বড় গৃহস্থ, তবে ইদানীং নামেই ছিল তালপুকুর, ঘটি ডুবতো না।

নিজের বুদ্ধিতে শিবশঙ্কর সব করেচেন। বীরের মত করেচেন, বীরের মতই ভোগ করে যাচ্ছেন শিবশঙ্কর। এখনো হয় নি, লেক অঞ্চলে বড় একখানা বাড়ী করবার শখ তাঁর, কিন্তু পছন্দসই জমি পাচ্ছেন না।

তেজপুরের কাজটা যদি হাতে এসে যায়, তবে নির্ঘাত তিন লক্ষ ঘরে আসবে। হিসেব করে দেখা আছে তাঁর। এই বছরের শেষেই টাকাটা হাতে আসতে পারে, যদি বিলের টাকা গভর্নমেণ্ট এ বছরেই শোধ করে। পূজো দিলে শেষের ব্যবস্থা চটপট হয়ে যাবে। শিবশঙ্করকে কাজ শেখাতে হবে না, ঘুঘু হয়ে বসে আছেন তিনি। অনেস্টি বলে জিনিস নেই এ বাজারে। অনেস্টি একটা মুখের কথা মাত্র। কমপিটিশনের বাজার, অনেস্টিতে হয় না। টাকা…টাকা…চাই, টাকা। দুনিয়াতে টাকা ছাড়া আর কিছু নেই। টাকা যে পথে আসে আসুক। টাকা রোজগারের এই তো সময়। যুদ্ধের বাজারে যে যা করে নিতে পারে। কলকাতার হাওয়ায় টাকা উড়চে…যার বুদ্ধি আছে ধরে নাও। কিছুই এখনো রোজগার করা হয় নি। অনেক কিছুই বাকী।

কেবল একটা ব্যাপার শিবশঙ্করকে বড় চিন্তিত করে তুলেচে।

বড় ছেলে বিমান প্রায়ই রাত্রে বাড়ী আসে না। নিজের আলাদা একখানা মোটর কিনেচে। নানা রকম কথা কানে গিয়েচে শিবশঙ্করের। ঠিক বুঝতে পারচেন না এখনও তিনি। বিমান এমন ছিল না। বড় বৌমা প্রায়ই কাঁদেন, সুলেখার মুখে শুনতে পান তিনি। গিন্নি কিছু বলেন না, এজন্যে গিন্নির ওপর শিবশঙ্কর সন্তুষ্ট নন। গিন্নির প্রশ্রয় না পেলে বিমান এমন হতে পারতো না। যত নির্ব্বোধ নিয়ে হয়েচে তাঁর সংসার।

টেলিফোন বেজে উঠে শিবশঙ্করের চিন্তাজাল ছিন্ন করে দিলে।—হ্যাঁ, কে? ও আচ্ছা—বেশ, বেশ। তুমি চলেই এসো এখানে। দেরি করো না।

একটি শৌখীন বাবুমত লোক, চোখে সোনাবাঁধানো চশমা, ঘরে ঢুকলো দশ মিনিট পরে। এই লোকটি ঘরে ঢোকবার পরে শিবশঙ্কর সতর্ক দৃষ্টিতে ঘরের দরজার দিকে দু-তিনবার চাইলেন। লোকটি চাপা মৃদুস্বরে মিনিট দশেক কথা বলে তারপর হঠাৎ স্বাভাবিক স্বরে ফিরে এসে বললে—বেশ, যাই তা হোলে।

—বোসো, বোসো—

—বুঝতে পারলে না? সামলে রাখতে বলিগে যাই! সিনেমায় আজকাল নাম করে উঠেচে মেয়েটা, দেখতে পরমা রূপসী—মৌমাছির ঝাঁক কম নয়। বুঝতে পারলে না? ঠিক আটটাতে—

বেলা ছটার পরে শিবশঙ্কর ড্রাইভারকে ডেকে বলে দিলেন—শোভা সিং, চলা যাও

বেহালামে। বৌমাদের লে আও। হাম ট্যাক্সিমে যায়েঙ্গে। ঠিক করে লে আও, যেন মিলিটারি গাড়ীমে ধাক্কা মাৎ লাগে—

—বহুৎ আচ্ছা হুজুর—বলে শোভা সিং গাড়ী নিয়ে চলে গেল।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আপিসে নানা কাজ সেরে সাড়ে সাতটার সময় শিবশঙ্কর ট্যাক্সি নিয়ে বার হোলেন। ভবানীপুরের একটা ছোট গলির মধ্যে গাড়ী ঢুকলো। আগের শৌখীন লোকটি বারান্দা থেকে নেমে এসে বললো—এসো ভায়া, এসো—চা খাবে না?

—আর এখন চা নয়। চলো—

—এখনো দেরি আছে। আমি কাপড় পরে নি। আসচি—

দুজনে আবার গাড়ী নিয়ে চললেন—বেলতলা রোডের পার্কের কাছাকাছি একটা বাড়ীর সামনে এসে গাড়ী দাঁড়ালো। দুজনে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। লোকটি বললে—আমি ফোন করেছিলুম, আটটার সময় সব সরিয়ে দিও। খুব সুন্দরী, আর বয়েস উনিশের বেশী নয়। নিজের চোখেই গ্যাখো ভায়া, এ শর্ম্মার নাম গোপাল চকোত্তি। মাসে চারশোতেই রাজি করিয়ে দেবো—তুমি শুধু দেখে যাও,—সিনেমাতে আজকাল নাম কি! যত সব চ্যাংড়া ছোকরার ভিড় সেই জন্যে—

ওপরে দিব্যি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর বারান্দা, ফুলের টব সাজানো। অর্কিডের টব ঝুলচে বারান্দার ছাদের প্রান্ত থেকে।

সঙ্গী লোকটি কড়া নাড়তেই ওদিকের দরজা দিয়ে যে তরুণটি সিগারেট মুখে বেরিয়ে এসে পাশের সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে গেল—শিবশঙ্কর যেন ভূত দেখলেন তাকে দেখে।

শিবশঙ্করের সঙ্গী বললে—ওই গ্যাখো, যত সব ছেলে ছোকরার মরণ—সিনেমার ইয়ে কিনা? আসল কমপিটিশন হচ্চে এদের কাছে টাকায়—সে কমপিটিশনে দাঁড়ানো চ্যাংড়াদের কর্ম্ম নয়—ও কি! দাঁড়ালে যে? কি হোলো?

শিবশঙ্কর ততক্ষণ দম নিলেন।

যে ওদিকের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল, সে বিমান, তাঁর ছেলে বিমান।

ব্ল্যাকমার্কেট দমন কর

চিঠিখানা পাইয়া বড়ই রাগ হইল। সকালে চা পান করিয়া সবে সেরেস্তায় আসিয়া বসিয়াছি, আর অমনি পিওন আসিল। ঘড়িতে দেখিলাম মাত্র আটটা। বলিলাম—আজ এত সকালে?

পিওন বলিল—না বাবু, সকাল আর কই? আপনার দুটো মনিঅর্ডার আছে, তাবলাম আগে বিলি করে তবে অন্য জায়গায় যাই—একটু পরে মক্কেলের ভিড় হোলে তখন আপনি ফুরসত পাবেন না হয়তো। নিন, সই দুটো করে দিন—পঞ্চাশ টাকা আর আটাশ টাকা এগারো আনা—

মক্কেলদের টাকা অবশ্য। কোর্টের খরচা। বিজন মুহুরীকে ডাকিয়া বলিলাম—ছাখো তো এসমাইল বদ্দি বাদী, ফজলুল গাজি বিবাদী। কেসের তারিখটা কত ?

বিজন আমাদের সেরেস্তায় অনেকদিনের মুহুরী। আমার ও আমার দাদার। আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেবের আমল হইতে উহারা এখানে আছে। বিজনের বাবা ৺রামলাল চক্রবর্ত্তী আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের মুহুরী ছিলেন। আমাকে ও আমার দাদাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। বিজনের সঙ্গে বাল্যে খেলাধূলা করিয়াছি, আবার সেই বিজন আমাদের সেরেস্তায় মুহুরীগিরি করিতেছেও আজ বাইশ বৎসর। খুব হুঁশিয়ার লোক।

বিজন খাতা দেখিয়া বলিল—২২শে আগস্ট। কত টাকা পাঠিয়েচে এসমাইল ?

—আটাশ টাকা এগারো আনা—

—ফেরত দিন মনিঅর্ডার, সই করবেন না বাবু—

—কেন ?

—আপনার চার টাকা আর কোর্টফির দরুন আমার কাছে ধার দু টাকা ওর মধ্যে ধরা নেই।

—ঠিক তো ?

—ঠিক বাবু, এই দেখুন খাতা—

লিখিয়া দিলাম 'রিফিউজড্'। অফটি সই করিয়া লইলাম, মুহুরীকে বলিলাম—টাকা দেখে নাও। ভজু চাকর আসিয়া বলিল—বাবু, বাজারের টাকা—

—দাদার কাছে নিগে যা—

—তিনি বাড়ী নেই। বেড়িয়ে ফেরেন নি এখনো। মা ঠাকরুন বলে দিলেন, মাছ এক সের আর মাংস এক সের লাগবে।

—মাংস আবার কি হবে আজ ? আঃ, বিরক্ত করলে সব। খরচ করেই সব উড়িয়ে দিলে। রোজ মাংস। নিয়ে যা একখানা নোট—বিজন একখানা দশ টাকার নোট দাও তো ফেলে এ দিকে। দুধের তিন টাকা শোধ করে দিয়ে আসবি আজ। বুঝলি ?

পিওন হাসিয়া বলিল—বাবু, আপনাদের বড় সংসারে আপনারা যদি রোজ মাংস না খাবেন তো খাবো কি আমরা ? আপনাদের দিয়েচেন ভগবান খেতে। আপনারা খাবেন না ? ও আড়াই টাকা মাছের সের হোলেও আপনাদের গায়ে লাগে না, তিন টাকা হোলেও আপনাদের গায়ে লাগে না। আমরা এক টাকাতেই মরি।

পিওন ও চাকর চলিয়া গেল। যাইবার সময় আমার ইঙ্গিতে বিজন পিওনকে একটা সিকি ফেলিয়া দিল। দুজন চাষীলোক ঘরে ঢুকিয়া বলিল—বাবু ছালাম। শরৎবাবু উকিলের বাড়ী কি এডা ?

—হ্যাঁ, কেন ?

—একটা মকদ্দমা আছে বাবু। আরজি করে দিতে হবে একটা—

—কি কেস ? কোথায় বাড়ী ?

—বাবু, আমার বাড়ী যাইপুর আর এ আমার খালাতো ভাই, এর বাড়ী ন-হাটা। আমাদের একটা আমবাগান ছেল—তা আমার চাচা হবিবর সেখ—

মকেল জটিল গল্প ফাঁদিবে বুঝিয়া বিজন মুহুরীকে বলিলাম—এদের কেস শোনো। আমি ততক্ষণ ডাকের চিঠিগুলো দেখে নি—খবরের কাগজখানা চোখ বুলিয়ে যাই। যাও তোমরা ওদিকে যাও—টাকা এনেচ সঙ্গে ?

—হ্যাঁ বাবু।

—কত টাকা ? আরজি করার কি ছ টাকা লাগবে। সব জিনিসের দাম বেড়েচে, চার টাকায় আর হবে না।

—তা দেবো বাবু যা লাগে—আমাদের হুজুর তবে বাবু কি নেগগেরো, এই আমার খালাতো ভাই—

—যাও ওদিকে যাও—

এইবার ডাকের চিঠি খুলিতে খুলিতে এই চিঠিখানা পাইলাম। পড়িয়া বিরক্ত বোধ হইল। চিঠিখানা এই—

শুভাশীর্ব্বাদমস্তু রাশয় বিশেষ:

বাপজীবন অত্র সকল কুশল জানিবা। তোমাদের অনেকদিন কোনো সংবাদ পাই নাই। পরে লিখি যে আমাদের গৃহদেবতা শালগ্রামের পূজার জন্ত তোমরা যে ২৸৹ প্রতি মাসে পাঠাইয়া থাক, তাহা এ যাবৎ নিয়মিত পাইয়া আসিতেছি। কিন্তু লিখি যে বর্ত্তমান অবস্থায় সকল জিনিস আক্রা। এক সের আলো চাউলের মূল্য মাখমহাটির বাজারে আট হইতে দশ আনা। একটি পাকা কলা এক পয়সা মূল্যে হাটে বিকায়। এ অবস্থায় পূজার দরুন প্রতি মাসে ছয় টাকা করিয়া না দিলে আর পারা যাইতেছে না। সকল দিকে বিবেচনা করিয়া আগামী মাস হইতে ছয় টাকা করিয়া পাঠাইবে। খুড়া মহাশয় রামধন চক্রবর্ত্তী সম্প্রতি পায়ে আঘাত পাইয়া বড় কষ্ট পাইতেছেন জানিবা। বধুমাতাদের আশীর্ব্বাদ জানাইবা।

সাং বাহিরগাছি
বর্দ্ধমান জেলা

ইতি—
নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীহরিসাধন দেবশর্ম্মা

একটু পরে দাদা বেড়াইয়া ফিরিলেন, তাঁর পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। বিজনকে বলিলাম—একবার বড়বাবুকে ডাক দাও তো। উনি বোধ হয় সেরেস্তায় গিয়ে বসেচেন।

দাদা আসিয়া বলিলেন—কি রে ?

—এই দেখো হরি ভট্‌চাজ আজ দেশ থেকে চিঠি লিখেচে, ছ টাকা না পাঠালে মাসে মাসে আর সে ঠাকুরপুজো করবে না।

দাদা পত্র পড়িয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—ও! ঠাকুর-পূজোতেও ব্ল্যাক মার্কেট! দয়া করে তো টাকা দিচ্ছি। নামেই পৈতৃক ভিটে, কখনো যাইও নে। জ্ঞাতিরা বাড়ীতে আছে। ও টাকা তো স্টাইপেণ্ডের সমান দিচ্ছি আমরা। বেশ, না পূজো করেন, না করবেন। টাকা একদম বন্ধ করে দাও সামনের মাসে। গৃহই নেই তো গৃহদেবতা।

তাহাই করিলাম। দু মাস কোনো টাকা গেল না। চিঠিপত্রও নয়।

দু মাস পরে আর এক চিঠি দেশের। খুলিয়া পড়িলাম—

শুভাশীর্ব্বাদমস্তু মাশয় বিশেষ:

অত্র পত্রে কুশল জানিবা। পরে লিখি যে বাবাজীবন তোমাদের পৈতৃক গৃহদেবতা শালগ্রাম সেবার জন্ত যে ২৷৶৹ করিয়া মাসে মাসে পাঠাইয়া থাকো তাহা আজ দুই মাস বন্ধ হওয়ার কারণ কিছু বুঝিলাম না। আমরা তোমাদের বংশের কুলপুরোহিত। বর্ত্তমানে অবস্থা দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। যাহা পাঠাইতেছিলে না দিলে পূজাও বন্ধ হয়, সংসারের সাহায্যও পাওয়া যায় না। অতএব টাকা পাঠাইতে বিলম্ব করিবা না। খুড়া মহাশয় সম্প্রতি সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন! পত্রপাঠ টাকা মনি অর্ডার যোগে পাঠাইবা। বধূমাতাদের আশীর্ব্বাদ দিবা।

ইতি—

সাং বাহিরগাছি — নিত্যাশীর্ব্বাদক

বর্দ্ধমান জেলা — শ্রীহরিসাধন দেবশর্ম্মা

দাদাকে পড়াইলাম। দাদা বলিলেন—দাও পাঠিয়ে। বদমাইশি ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। ব্ল্যাক মার্কেট করতে এসেচে ঠাকুরপূজোয়!

সেইদিনই দাদার বড় ছেলে—শুভেন্দু কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিল। তাহার পরনে কাঁচি ধুতি দেখিয়া বলিলাম—এ কোথায় পেলি রে? কত নিলে?

শুভেন্দু প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। দাদার বড় ছেলে। বেশ শৌখীন। সে হাসিয়া বলিল—কাকা, কত বল তো?

—কি জানি বাপু, আমরা বুড়ো মানুষ। ও সব আগে তো পাঁচ-ছ টাকা ছিল।

—ত্রিশ টাকা একখানা। তাও লুকিয়ে এক দোকান থেকে সন্ধ্যের পর কেনা। এমনি কোথাও মেলবার জো নেই। ভাল না? জরির আঁজি ত্যাখো—

এই সময় দাদাও আসিলেন। দুজনেই কাপড় দেখিলাম। দেখিয়া শুভেন্দুর রুচিনৈপুণ্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিলাম।

ভুণ্ডি

আমি সকালে উঠে বসে কাগজপত্র নিয়ে ঘাঁটিচি, এমন সময়ে একটি তেরো চৌদ্দ বছরের ছোট মেয়ে রাঙা শাড়ী পরে আমাদের বাড়ীতে ঢুকলো। আমাদেরই গ্রামেরই মেয়ে নিশ্চয়, তবে একে কোথাও দেখিনি বলে চিনতে পারলাম না। মেয়েটির এই অল্প বয়সেই বিয়ে হয়েছে, ওর কপালে সিঁদুর, হাতে সোনা-বাঁধানো শাঁখা। শ্যামবর্ণ, একহারা চেহারার মেয়ে। মুখখানি বেশ চলচলে, বড় বড় চোখ দুটি। কানে দুটি সোনার দুল। জিজ্ঞেস করলুম—কার মেয়ে তুই রে?

মেয়েটি সামান্য একটু হেসে মাটির দিকে চোখ রেখে বললে—বিশ্বনাথ কামারের।

—বিশুর মেয়ে? বেশ, বেশ। তোর দেখচি বিয়ে হয়েচে এই বয়সে। কোথায় শ্বশুরবাড়ী?

মেয়েটির খুব লজ্জা হোলো শ্বশুরবাড়ীর কথায়। সে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে বললে—নারানপুর।

—কোন নারানপুর? খিরে-নারানপুর?

—হ্যাঁ।

—কদ্দিন বিয়ে হয়েছে?

—এই ফাল্গুন মাসে।

—শ্বশুরবাড়ী থেকে এলি কবে?

—পরশু এসেচি কাকাবাবু।

—আচ্ছা যা বাড়ীর মধ্যে যা।

গ্রামের মেয়ে বাপের বাড়ী এসেচে, এ-পাড়া ও-পাড়ায় সব বাড়ী ঘুরে বেড়াচ্চে। বড় স্নেহ হলো খুকীটির ওপর। এই গ্রামেরই মেয়ে, আহা!

কিন্তু খানিকক্ষণ পরে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে দেখি মেয়েটি মায়ের ঘরের মেঝেতে চুপ করে বসে আঁচল নিয়ে নাড়চে। কেউ ওর দিকে মনোযোগ দিচ্চে না, কেউ ওর সঙ্গে কথা বলচে না। প্রথম প্রথম হয়তো কথা বলেছিল মেয়েরা, এখন আর ওর কাছাকাছি কেউ নেই, ও একাই বসে আছে। কামারদের মেয়ে, তার সঙ্গে কে কথা বলে বেশিক্ষণ?

আমায় দেখে মেয়েটি বললে—কাকাবাবু, ও কিসের ছবি?

—ও আমার ফটো।

—আপনার ছবি?

মেয়েটি ফটো কথা বোধ হয় বুঝতে পারে নি। বললুম—হ্যাঁ আমার ছবি।

—কে করেচে কাকাবাবু?

মেয়েটি এতক্ষণ বিস্ময় ও প্রশংসার দৃষ্টিতে ঘরের দেওয়ালের কতকগুলো ফটো, সিগারেটের বিজ্ঞাপনের মেমসাহেব, ক্যালেণ্ডারের ছবিগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। পল্লীগ্রামের

ঘরের দেওয়ালে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যামিনী রায় বা রেম্‌ব্রান্টের ছবি অবিশ্যি টাঙানো ছিল না।

—ও মেমসাহেব কি করচে কাকাবাবু ?

—সিগারেট খাচ্চে।

—ওমা, মেয়েমানুষ সিগারেট খায় ?

—মেমসায়েবরা খায়। দেখেচিস কখনো মেমসায়েব ?

—হুঁ।

—কোথায় ?

—রাণাঘাট ইস্টিশানে। আড়ংঘাটা যাচ্ছিলাম যুগলকিশোর দেখতে, তাই দেখি রেলগাড়ীতে বসে আছে। সাদা ধপ ধপ করচে একেবারে।

দেখলুম ও একা বসে থাকলেও দেওয়ালের ওই অকিঞ্চিৎকর ছবিগুলো দেখে বেশ আমোদ পাচ্ছে। আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আমি আবার ঢুকলাম ঘরে কি কাজে। মেয়েটি সেখানে ঠায় বসে আছে সেই ভাবেই। ওকে কেউ গ্রাহ্যও করচে না বাড়ীর মেয়েরা। তাতে ওর কোনো দুঃখ নেই, দিব্যি একা একা বসে আছে। চলেও যায় নি।

ও যে আমাদের ঘরে ঢুকে মেজের ওপর বসে আছে, এই আনন্দে ও ভরপুর। দিব্যি লাল রং দেওয়া বাঁধানো মেজে, ঘরের বিছানা আসবাবপত্র দামী নয়, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেওয়ালে যে শ্রেণীর ছবি, সে তো বলাই হোলো। একখানা টেবিল, একটা চেয়ারও আছে। টাটার টেবিল ল্যাম্প আছে একটা। কতকগুলো মাটির পুতুল—যেমন গণেশ-জননী, গরু, হরিণ, টিয়াপাখী, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি—একটা কাঠের তাকে সাজানো আছে।

গৃহসজ্জার এই সামান্য রূপই ওর চোখে আশ্চর্য্য ঠেকেচে, খুকীর চোখ দেখলে তা বোঝা যায়। আমার কষ্ট হোলো—ওকে কেউ আদর করে ওর সঙ্গে কথা বলচে না। ও সেটা আশাও করেনি। আমাদের গ্রামে তেমন ব্যবহার কামার-কুমোরদের মেয়েদের সঙ্গে কেউ করে না। ওরা ঘরে ঢুকে বসতে পেয়েচে, এতেই ওরা অত্যন্ত খুশী আছে।

আমি তেল মেখে নাইতে যাবো। নারকোল তেল আজকাল পাওয়া যায় না বলে বাড়ীর মেয়েদের জবাফুল মতো গন্ধ তেলের বোতল আসে দোকান থেকে—হেন কল্যাণ, তেন কল্যাণ।

আমি বোতল থেকে তেল বের করে মাথায় মাখচি দেখে ও চেয়ে রইল।

আমি বললাম—গন্ধতেল একটু মাখবি, খুকী ?

মেয়েটি অবাক হয়ে গেল। এমন কথা কেউ ওকে বলে নি, কোনো ব্রাহ্মণ-বাড়ীর কর্ত্তা তো নয়ই।

বললে—হ্যাঁ।

—এসে আয় দিকি মা।

তারপর তার চোখদুটির অবাক দৃষ্টিকে অবাকতর করে দিয়ে আমি নিজের হাতে তার

মাথায় খানিক গন্ধতেল মাখিয়ে দিলাম, খোঁপা-বাঁধা চুলের ওপর ওপর। ও হেসে ফেললে। অনাদৃতা আদর পেয়ে লজ্জা পেলে।

বললাম—কি রকম গন্ধ ?

—চমৎকার, কাকাবাবু !

—কি তেল বল দিকি ?

—কি জানি ?

—খুব ভালো গন্ধতেল।

ভারি খুশী হয়েচে ও।

বললে—আসি তা হোলে কাকাবাবু ? বেলা হয়েচে।

—এসো মা। আবার এসো একদিন—

চলে গেল খুকী। কতটুকু আর তেল দিলাম ওর মাথায়। কিন্তু কি আনন্দ আমার স্নান করতে নেমে নদীজলে। উদার নীল আকাশে কিসের যেন সুস্পষ্ট, সৌন্দর্য্যময় বাণী। অন্তরের ও বাইরের রেখায় রেখায় মিল। চমৎকার দিনটা। সুন্দর দিনটা।

পিদিমের নিচে

একটিমাত্র গ্রামে আমার বাল্যে এই ধরনের এক ব্যক্তিকে আমি দেখেছিলাম। কেউ তার জীবন-চরিত লেখেনি, কেউ জানেও না তাকে, কিন্তু আমি জানি এবং যতটুকু জানি বা নিজের চোখে দেখেছিলাম, লিখে রাখা উচিত ভেবে লিখে রাখলাম।

আমার ছেলেবেলায় দিন কতক মাসির বাড়ীতে কাটিয়েছিলাম সে গ্রামে। আমার তখন বয়স ন-দশ বছরের বেশি নয়।

গঙ্গার ধারের পথ দিয়ে একদিন মাসতুতো ভাই নন্দর সঙ্গে পাশের গ্রাম আমিনপুরে চাল আনতে যাচ্ছিলাম। বিকেল বেলা, বর্ষাকাল, গঙ্গায় জলে খুব ঘোলা এসেচে, জল বেড়ে লাতনলির বড় চড়া ডুবে গিয়েচে, ঝিঙে পটলের ক্ষেত জলের অত্যন্ত ধারে এসে পড়েচে।

হঠাৎ নন্দ আমায় ধমক দিয়ে বললে—এই, সরে আয়।

—কি রে ?

আমার মুখ থেকে কথা বেরুতে না বেরুতে ঝুপ করে অনেকখানি পাড় ভেঙে পড়লো অনেক নিচে ঘোলা জলের আবর্তের মধ্যে। আমার শরীর ঝিমঝিম করতে লাগলো।

নন্দ বললে—এখুনি গিইছিলি যে।

সত্যিই তাই। আর একটু হোলে আমি গিয়ে পড়তাম গঙ্গাগর্ভে। তখন সাঁতার জানতাম না। জলে পড়লে আর বাঁচবার উপায় ছিল না। আমার বড় ভয় হোলো,

গঙ্গার ধার বেয়ে বেয়েই রাস্তা অনেক দূর চলে গিয়েচে! যদি আবার পাড় ভাঙে, বিশ্বাস কি।

নন্দকে বললাম—নন্দদা, আমি যাবো না, তুই যা। আমি বাড়ী যাই—বলেই স্বীকার করতে এখন লজ্জা হয়, কেঁদে ফেললাম।

নন্দ কাছে এসে বললে—ওই ত্যাখো, নাও, কেঁদে উঠলি কেন? কি মুশকিলেই পড়া গেল ত্যাখো। বাড়ী যেতে পারবি নে একলা। চল তোকে পাগল ঠাকুরের আস্তানায় রেখে আসি।

এইভাবে এই অদ্ভুত লোকটির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটলো।

এ অঞ্চলে আমি আছি আজ মাস দুই। পাগল ঠাকুরের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনে আসচি এতদিন। শুনেছিলাম প্রথম আমার মাসিমার মুখে। আমি বলেছিলাম—সে কে মাসিমা?

—গঙ্গার তীরে থাকে। সাতনলির চরের এপারে।

—কে সে?

—জেতে বুনো। ওখানে আস্তানা করে আছে ঘর বেঁধে আজ বিশ ত্রিশ বছর। আমার তো বিয়ে হয়ে এখানে এসে এস্তক শুনে আসচি। অনেক ছোট জেতের গুরুদেব। মাঘ মাসে তার ওখানে মেলা বসে, লোকজন আসে, দোকান পসার জমে।

—আমি একদিন দেখতে যাবো?

—না, যায় না। বুনো বাগ্দি, ছোট জেতের কাণ্ড, সেখানে কি দেখতে যাবি তুই? ছুঁলে যাদের গঙ্গাস্নান না করলে শুদ্ধ হয় না!

সেই বিকেলে আমার মাসতুতো ভাই নন্দ আমায় পাগল ঠাকুরের আস্তানায় বসিয়ে রেখে চলে গেল। বললে—ফিরে না আসা পর্য্যন্ত বসে থাকবি—

একটা বাবলা বনের মধ্যে দুখানা খড়ের ঘর। একটা ছোট গোয়াল ঘর, তাতে দুটি গাই-গরু বাঁধা। একখানা ঘরের দাওয়া অত্যন্ত নিচু, সেখানে খানকতক পিঁড়ি আর খেজুরের চেটাই পাতা। বাবলা গাছে ফুল ধরেচে, ফুল ঝরে ঝরে নিকোনো পুঁছোনো পরিষ্কার উঠোনটা ছেয়ে রেখেচে। একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক গোয়াল ঘরে ঘুঁটের সাঁজাল দিচ্ছে। আর কেউ কোথাও নেই।

এমন সময় একটি লোক বাবলা বনের ওধার থেকে বড় ঘরখানার দাওয়ায় এসে একখানা দা রেখে দিলে। তার কাঁধে এক বোঝা সবুজ জোলা ঘাসের আঁটি। লোকটার লম্বা দাড়ি বুকের উপরে পড়েচে, মাথায় লম্বা লম্বা জট পাকানো চুল, পরনে অতি মলিন এক কাপড়—দেখে পাগল বলে মনে হয়।

লোকটা আমাকে লক্ষ্য করে বললে—কে ওখানে? কে গা?

আমার ভয় হয়েচে। আমি আমতা আমতা করে বললাম—এই—এই—ওই আমার মাসির বাড়ি—

সেই বৃদ্ধা বললে—বাঁওনদের ছেলে। বোধ হয় বাবুদের বাড়ীর। ভূপেনবাবুর নাতি নন্দ বসিয়ে রেখে গেল। ভয় কি খোকা? ভয় কি? শসা খাবা?

শসা খাবো কি, লোকটার হাবভাব ও রক্তবর্ণ বড় বড় চোখ দেখে আমার প্রাণ তখন উড়ে গিয়েচে। আমি কাঠের পুতুলের মতো আড়ষ্ট হয়ে বসে আছি। দস্যু ডাকাতের গল্প শুনেচি, সেই দস্যু-ডাকাতদের একজন নয় তো?

হঠাৎ লোকটা আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললে—ভয় কি, বাবাঠাকুর? ভয় কি? কিছু ভয় নেই। বোসো।

তারপর একেবারে কাছে এসে অত্যন্ত মোলায়েম স্নেহের হাসি হেসে বললে—আহা বালক!

আমি চুপ করে বসে আছি। বোবার শত্রু নেই।

লোকটা বললে—নাম কি বাবাঠাকুর?

ভয়ে ভয়ে বললাম—পতিতপাবন মুখোপাধ্যায়—

—পতিতপাবন? বাঃ, বেশ, বেশ। পতিতপাবন যিনি, তিনিও তোমার মতো। আহা-হা! আহা!

লোকটা শেষের কথাগুলো কাঁদো কাঁদো সুরে জোরে জোরে উচ্চারণ করলে। তারপর বললে —ওগো, পতিতপাবনের ভোগ দেবে কি দিয়ে? আমার বাড়ী এসেচেন দয়া করে, সে অদৃষ্ট করি নি যে বাবাঠাকুর। তোমার ও মুখে কি তুলে দেবো? পাকা তাল একটা নিয়ে যাও—তালের বড়া ভেজে দিতে বোলো তোমার মাসিমাকে—

আমার কথাগুলো ভালো লাগলো এবং ভয়ও অনেক চলে গেল। কিন্তু ওর রকম-সকম দেখে মনে হোলো লোকটা পাগল ঠিকই। তাই ওকে পাগল ঠাকুর বলে।

পাগল ঠাকুর ছোট ঘরটার দাওয়ায় গিয়ে বসে আমায় কাছে ডাকলে। হাতছানি দিয়ে বললে —এসো পতিতপাবন, এসো এসো—

বৃদ্ধা বললে—ওকে ডেকো না, ভয় পেয়েচে।

কিন্তু আমি সম্প্রতি নির্ভয় হয়েচি দেখাবার জন্যে পাগল ঠাকুরের পাশে গিয়ে বসলাম।

পাগল ঠাকুর একখানা খেজুরের চেটাইয়ের উপর বসে এক কল্কে তামাক না গাঁজা কি সাজলে। আমায় বললে—তুমি বাঁওন?

—হ্যাঁ।

—পায়ের ধুলো দেবে একটু?

—আমায় ছুঁয়ো না। মাসিমা বারণ করেচে।

পাগল ঠাকুর হেসে উঠে বললে—কেন, নাইতে হবে বুঝি? তা আমার ছুঁলে তোমায় নাইতে হবে না। আমি বাঁওন নই, কিন্তু দয়াল গুরুর নামে থাকি। তিনি আমাদের সকলের চেয়ে বড়। দাও, পায়ের ধুলো—

পাগল আমায় পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে কি যেন একটা অদ্ভুত ভাব হোলো। একটা অদ্ভুত আনন্দের ভাব, সে মুখে বলে বুঝিয়ে দিতে পারবো না, বিশেষতঃ তখন আমি বালক, বিশ্লেষণ ও তুলনা করে দেখবার ক্ষমতা ছিল না। এখন এক একবার ভাবি, পাগল ঠাকুরের পায়ের ধুলো নেওয়াটা হয়তো একটা ছুতো—আমাকে স্পর্শ করবার জন্যেই ও পায়ের ধুলো নিতে চেয়েছিল।

তারপর ও একটা গান করলে। গান আমার মনে নেই, কিন্তু বেশ গলার সুর ওর। গান গাইতে গাইতে ওর চোখে জল এল, গাল বেয়ে জল পড়তে লাগলো। 'ও আমার হৃদ্-কমলের পরমগুরু সাঁই'—এই কথাটা বার বার ছিল গানের মধ্যে।

গান শেষ করেও বার বার বলতে লাগলো—কিছু খাওয়াতে পারলাম না, বাবাঠাকুর। একটা পাকা তাল নিয়ে যাও, বড়া করে দিতে বলো তোমার মাসিমাকে।

আমার ভয় এখন সম্পূর্ণরূপে কেটে গিয়েছিল। আমি বললাম—তুমি কি কর এখানে ?

পাগল ঠাকুর হা হা করে হেসে উঠে আমার দিকে চাইল। তারপর সস্নেহ সুরে বললে—বাবাঠাকুরের কথা শোনো। হাসতে হাসতে মরি যে! খুব আনন্দ জুটিয়ে দিলেন সন্দেবেলা গুরুগোসাঁই। বলে কিনা—কি কর ? আমি এখানে থাকি বাবাঠাকুর। আর কি করবো ? গুরুগোসাঁইকে ডাকি।

—কে সে ?

—ওই, ওই—

পাগল আঙুল তুলে আকাশের দিকে দেখিয়ে বললে—উনি।

আমার খুব ভালো লাগছিলো এই অদ্ভুত লোকটাকে। এই অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি তার দিকে যথেষ্ট আকৃষ্ট হয়ে পড়েচি দেখলাম। এই সময় সন্ধ্যের অন্ধকার নামলো। গায়ের রোঁয়া আর দেখা যায় না। ও উঠে দোরে জল দিয়ে ধুনো জ্বাললে। উঠোনের একটা ইটের মতো উঁচুমতো জায়গাতে প্রদীপ নিয়ে রেখে দিলে। আমি বললাম—তোমাদের তুলসী-গাছ নেই ?

—কেন বাবাঠাকুর ?

—আমাদের বাড়ী আছে। মাসিমা পিদিম দেয় সন্দেবেলা।

—তুলসী রাখি নে তো বাবাঠাকুর। গুরুগোসাঁই ওই পিঁড়িতেই আছেন। তুলসী কি হবে ?

—তুমি পুজো কর না বুঝি ? তুলসী পাতা না হোলে পুজো হয় না।

পাগল ঠাকুর হেসে বললে—হয় বাবা, হয়। কেন হবে না ? সব ফুলে, সব পাতাতেই তাঁর পুজো হয়। তবে পূজো-আচ্চা আমি করি নে বাবা।

—কর না ?

—না, বাবাঠাকুর। আমি ছোট জাত, বুনো। তোমার পুজো কি কত্তে পারি আমি ? গুরুগোসাঁই পায়ে রাখেন যদি তবে আর পুজোয় দরকার কি ? ফুল বেলপাতা দিয়ে পুজো,

করবে তোমরা—বাঁওনেরা। আমাদের ছোট জেতের হাতে ও সাজে না। পুজো কত্তে নেই আমাদের।

—তুমি তো ভালো লোক।

—কে বললে আমি ভালো লোক?

—সবাই বলে, আমি শুনিচি।

—তুমি যখন বলচো বাবাঠাকুর, তখন ভালোই হবো।

এই সময় আমার মাসতুতো ভাই ফিরে এসে আমায় ডাক দিল, তার সঙ্গে আমি বাড়ী চলে গেলাম। বাড়ী যাওয়ার আগে ওরা আমাকে তাল দিলে, শসা দিলে, আবার আসতে বলে দিলে।

পাগল ঠাকুরের সঙ্গে আমার এই প্রথম দেখার পরে প্রায় পাঁচ বছর কেটে গেল। মাসিমার বাড়ীর সেই গ্রামে আমার যাওয়া ঘটে নি এই পাঁচ বছরের মধ্যে।

১৯১৩ সালে তৃতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন পেয়ে ইস্কুলের ঝক্কি কিছুদিন এড়াবার জন্যে চলে গেলাম আবার মাসিমার বাড়ী।

মাসিমা বললেন—এসো, এসো বাবা। বুড়ো মাসিকে ভুলেই গেলে। থাক—থাক্—বেঁচে থাকো, দীর্ঘজীবী হও।

আমার মনে আছে, দু-একটা কথার পরে আমি বুড়ীকে জিজ্ঞেস করলাম—মাসিমা, সেই পাগল ঠাকুর আছে তো?

মাসিমাকে 'বুড়ী' বললাম বটে কিন্তু তিনি সত্যিকার বুড়ী এখনও ঠিক নন। যৌবনে তিনি সুন্দরী ছিলেন। আমি যখনকার কথা বলচি তখনও তিনি তত মোটা হন নি, বেশ দোহারা, সুঠাম চেহারা, ফর্সা রং, বড় বড় চোখ। মাথার চুল কেবল ছোট করে ছেঁটে ছিলেন বিধবা হওয়ার পর। দেহে জরার আক্রমণের কোনো চিহ্ন তখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। তার ওপর মাসিমা ছিলেন গ্রাম্য জমিদারের ঘরের বধূ। চাল-চলনে একটা সেকেলে বনেদী ও স্পর্শ-তীক্ষ্ণ ঈষৎ গর্বিত আভিজাত্য সদা-সর্বদা বর্তমান থাকতো। মাসিমা তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন—কে? ও সেই পাগল ঠাকুর—হ্যাঁ, বেঁচে আছে। কেন, তাঁর খোঁজে তোমার কি দরকার?

এখানে 'তোমার' কথাটার প্রয়োগ যে বিরক্তিসূচক তা আমার বুঝতে দেরি হলো না। মাসিমা জমিদারের বাড়ীর বৌ। তাঁর বোনপো যে তাঁদেরই গ্রামের এক ছোট জাতের গুরুর সঙ্গে মিশবে এটা তাঁর ভালো লাগলো না। অবিশ্যি এটুকুও বলা উচিত যে, তাঁরা নামেই তখন জমিদার, কিছুই ছিল না তখন, সংসারে বিষম টানাটানি চলছিল, তাও জানতাম। নতুবা নন্দ জমিদারের ছেলে হয়ে কাঁটাদ'র হাট থেকে বেগুন বয়ে আনবে কেন কি হাটে?

মাসিমার প্রশ্নের জবাব দিলাম—আমার কোনো দরকার নেই সেখানে। সেবার

আলাপ হয়েছিল, তাই বেঁচে আছে কি না জানতে চাইচি।

—বাঁচবে না তো যাবে কোথায় ?

—মেলা হয় ?

—পাগল ঠাকুরের মেলা ? কেন হবে না, যত বেটা বুনো বাগ্দির গুরুদেব, শুধু ব্যাটারা এসে পায়ের ধুলো নেয়, হৈ হল্লা করে। ঝাঁটা মারো। গুরু—গুরু! গুরু এমনি গাছের ফল কিনা!

আমি কিন্তু বিকেলেই পাগল ঠাকুরের বাড়ী গিয়ে হাজির। সেবারকার সেই প্রথম দর্শনের স্মৃতি আমার বালক-মনে একটি রহস্যজনক স্থান অধিকার করে আছে তখনও। আবার তাদের সেই দুখানা খড়ের ঘর, নিকোনো পুঁছোনো গোবর-লেপা উঠোন, ঝিঙের ফুল-ফোটা গঙ্গার তীরে অপরাহ্ণ শোভা কতকাল পরে দেখলুম।

পাগল ঠাকুরের দাড়ি আরও শাদা হয়ে নারদ মুনির মত দেখতে হয়েচে। তবে বার্দ্ধক্য-জনিত কোনো শীর্ণত্ব বা দৌর্ব্বল্য নেই শরীরে। খুব শক্ত সমর্থ, লাঠি লাঠি চেহারা। মুখে সেই হাসি। এবার আর আমি নিতান্ত বালক নেই। অনেক জিনিস বুঝি। আগের ভয় আর নেই।

—বললাম তোমাকে বড় ভালো লেগেছিলো সেবার—বড্ড মনে হোতো তোমাকে—

হেসে বললে—গুরু-গোঁসাইয়ের কৃপা বাবাঠাকুর, তুমি যে পতিতপাবন, পতিতকে উদ্ধার করতে আসবা না ?

—ওসব কথা আমায় বলতে নেই। তুমি আমার নাম মনে রেখেচ যে দেখচি ?

—তুমি আমায় মনে রেখেছিলে, তাই আমিও তোমার কথা মনে রেখেছিলাম। আয়নায় মুখ যে বাবাঠাকুর। যেমন দেখাও তেমনি দেখি।

—একটা গান কর—

ওকে আর দ্বিতীয়বার খোশামোদ করতে হোলো না। সেবারকারের সেই বৃদ্ধাকে দেখলাম এবার। তাকে ডেকে বললে—একতারাটা দাও তো। পতিতপাবন ঠাকুরকে একটা গান শোনাই—কিন্তু বাবা, একটা কথা বলি ?

বলে সে হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইলে।

আমি বললাম—কি ?

ও একটা আলাভোলা, অসহায় ধরনের অনুরোধ যেন করচে, এমনি ভাবে বললে—আমি যেমন তোমায় গান শুনিয়ে গেলাম, তুমি পতিত উদ্ধার করতে এমনি ধারা আসবা তো…বলি হ্যাঁ গা ? ও ঠাকুর ?…

নাঃ, ও পাগলামি শুরু করেচে আবার। কাকে কি বলে যে।

পাগল ততক্ষণ একতারা বাজিয়ে গান শুরু করে দিয়েচে—

ও আমার হৃদ্-কমলের পরম গুরু সাঁই,
রেতে আলো দিনে তারা রাত নাই দিন নাই।

তোমার দেখা বাঁশের ঝাড়ে
অরূপ রূপের পাথার পাড়ে
বাঁশের ফুলে ভুবন আলো দেখতে এলাম তাই।
চলার পথে বাদল দিনে তোমার সেই
বাঁশতলাতে দিও ঠাঁই,
ও আমার হৃদ্-কমলের পরম গুরু সাঁই···

সেই ছেলেবেলার শোনা গানটা।···ওর গান গাওয়ার ধরনটা আমার বেশ লাগে। চোখ উল্‌টে উদাস-নেত্রে ওপর পানে চেয়ে—সে ভাবই আলাদা। গলা ভালো নয়, ভাঙা গলা, ছুটো বেসুরো সুর যেন গলা থেকে বেরিয়ে আসচে—তাই কি, চোখ দিয়ে যখন ওর দরদর জল নেমে এল, তখন আমাদের গ্রামের বিখ্যাত যাত্রার জুড়ি দাশু পরামানিকের চেয়েও ওকে সুকণ্ঠ বলে মনে হোলো।

আরও একটা তারপর আর একটা। সরাটির চরে ঝিঙে-ফুল ফুটে ছিল সেবার, ঝিঙে-ফুলের হলুদ-ক্ষেত আর পাগল ঠাকুরের গানের ক্ষ্যাপাটে সুর একতারে বাঁধা। ধু-ধু সরাটির চরে, নির্জন সরাটির চরে ঘুলি-ঘুলি আধ অন্ধকারে কেউ ঝিঙের ফুল ফুটতে দেখেছিলে ত্রিশ বছর আগের এক ভাদ্র সন্ধ্যায়? তা হোলে পাগল ঠাকুরের গান বুঝতে পারবে।

আমি একমনে শুনচি। হঠাৎ গান থামিয়ে ও বললে—কি খাবা?

—কিছু না।

—সে বললে হবে কেন? আমারে পেরসাদ দেবে এখন কে?

—আমি খেতে আসি নি তোমার কাছে। তোমাকে দেখতে এসেচি। পাঁচ বছর পরে এলাম।

পাগল ঠাকুর বিস্ময়ের সুরে বললে—পাঁচ বছর হয়ে গেল এরি মধ্যে? কি জানি, দিন রেতের হিসেব তো রাখি নে। হ্যাঁ, তা তুমি অনেক বড় হয়ে গিয়েচ বাবাঠাকুর। তখন ছিলে এত বড়—ওগো শোনো—

সেই বুড়ী কাছে এসে বললে—কি বলচো? খোকাবাবু কে?

আমি বললাম—চিনতে পারলে না? সেই এসেছিলাম পাঁচ বছর আগে? নন্দর মাসতুতো ভাই, আমার নাম পতিতপাবন।

—বাবাঠাকুর, বড় খুশী হলাম তুমি এয়েচ। আর চোখে ঠাওর হয় না আগেকার মত। ভালো আছো?

—হ্যাঁ, তা আছি। এখন ইস্কুলে পড়চি—এবার থার্ড ক্লাসে উঠেচি ফার্স্ট হয়ে।

—তা হবে। তোমাদের সব ভালো হোক, গুরু-গোসাঁইয়ের দয়ায় সব নিরুগী হয়ে থাকো।

পাগল ঠাকুর বললে—ঘরে কিছু আছে? বাবাঠাকুরের সেবায় লাগাও।

আমার দুর্বল প্রতিবাদ সত্ত্বেও সেবা-লাগানোর কাজে এল একটি পাকা পেঁপে। আমি

খাচ্চি, ও হাত পেতে বালকের মত হয়ে অথচ নারদ মুনির মত দাড়ি নিয়ে আমার ঠাকুরদাদার বয়সী লোক নিঃসঙ্কোচে বললে—তাও একখানা।

দিলাম। যেন আমার সমবয়সী খেলুড়ে। বললাম—তোমার এখানে থাকতে ভালো লাগে।

পাগল ঠাকুর হেসে বললে—তোমাকেও যে আমার রাখতি ভালো লাগে। থাকবা এখানে?

—ইচ্ছে তো করে। বাড়ীর লোকে থাকতে দেবে না যে।

পাগল ঠাকুর একটা মাটির পাত্র থেকে গুড় তুলে নিয়ে দা-কাটা তামাক মাখলে বসে বসে। একটা কল্কে ভরে তামাক সেজে হাতে করেই টানতে লাগলো। নিজেই একট হাঁড়ি চড়ালে উঠোনের এক উনুনে।

আমি বললাম—হাঁড়িতে কি হবে?

—বাবাঠাকুর, ক্ষিদে পেয়েচে, কিছু খাবো। দুটো চাল দিয়ে যাও গো—

হাঁড়িতে এক খুঁচিটাক মোটা রাঙা আউশ চাল ফেলে দিয়ে একটু পরে বড় বড় গোটা-কতক পাকা যজ্ঞিডুমুর সামনের জঙ্গলের থেকে পেড়ে নিয়ে আঠা সুদ্ধই ফেললে হাঁড়িতে। আমি বসে বসে ওর খাওয়ার মজা দেখচি। ও আবার আমার পাশে এসে তামাক খেতে লাগলো। আমায় বললে—বাবাঠাকুর, ওপাড়ের বুনোপাড়া উচ্ছন্নে গেল ওলাউঠোতে। রোজ সেখানে যাই, সারাদিন থাকি, এই খানিকটা আগে এইচি, তাই বড্ড ক্ষিদে পেয়েচে।

—সেখানে কি কর?

—আমি কি কিছু করি? তিনি—গুরু-গোসাঁই করান। যাদের কেউ নেই আমার অকেজো হাত দিয়ে তিনি তাদের মুখে জল দেন, ওষুধ দেন। আমার হাত ধন্য হয়ে গেল, আমার হাত না দিয়ে অন্য কারো হাত নিলেই পারতেন। তেনার কৃপা।

—গুরু-গোসাঁই কে, আজ বলতে হবে।

—ওই যে উনি—নিরাকার, সব ঘটে আছেন যিনি। তাই তো তুমি আমার পতিতপাবন ঠাকুর। তুমিও যা, তিনিও তা—তোমার মধ্যেই তিনি। যারা রুগী, ওলাউঠোয় বমি করচে, হলদে হয়ে গিয়েচে চোখের শির, হাতে পায়ে খিঁচুনি ধরেচে, গলা ঘড়ঘড় করচে—তাদের মধ্যে জনায় জনায় তিনি। তিনি উঁকি মারেন ওদের চোখের মধ্যে থেকে। বেশ দেখতে পাই—বমি ঘাঁটি, ঘেন্না আসে না, মনে হয় গুরু-গোসাঁইয়ের সেবা করচি। খেলা, সব তাঁর খেলা। তাঁর আবার রোগ! লীলা!

—আমায় নিয়ে যাবে বুনোপাড়ায়? তোমার সঙ্গে যাবো।

—ওরে বাবা রে! অমন কচি সুন্দর নতুন হাত বমি ঘাঁটবার জন্যে নয়। তার এখন দেরি আছে, ও সবের জন্যে তাড়াতাড়ি কি? পড়ো, এখন খুব মন দিয়ে পড়ো।

একটু পরে ও ভাত নামালে। একটা আওট কলার পাতে ঢেলে যজ্ঞিডুমুরগুলো টিপে টিপে নুন তেল দিয়ে মাখলে। আমায় বললে—কিছু মনে কোরো না বাবাঠাকুর, আমি

খাই ? হুকুম করো—

আমার অনুমতির প্রয়োজন কি, বুঝলাম না। তবু বললাম—বারে, খাও, আমি কি বলবো ? খাও—শুধু ডুমুর-ভাতে খেতে পারবে ?

—কেন পারবো না, বাবাঠাকুর। একটা যা হয় হোলেই হোলো। জিবের সুখ যত বাড়াবে, ততই বাড়ে। ওর মধ্যে কিছু নেই। কে হাট-বাজারে ছোটে দুটো খাওয়ার জন্যে ? জঙ্গলে গুরু-গোসাঁই সব করে রেখেচেন। ডুমুর আছে, তেলাকুচো ফল আছে—

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললাম—তেলাকুচো ?

—হ্যাঁ বাবাঠাকুর, তেলাকুচো ভাতে খাও, ভাজা খাও, তেলাকুচোর পাতা ভাজা খাও—দিব্বি জিনিস। পেয়ারা-ভাতে ভাত খেয়ে একমাস কাটিয়ে দিই। উঠোনে ওই ছাখো পেয়ারা গাছ। পেয়ারা হয় নি, তাহলে তোমায় দিতাম। কেন যাবো বলো হাটে-বাজারে ?

—তোমার উঠোনে তরি-তরকারি কর না কেন ?

—বড্ড খাটতে হয় ওর পেছনে। ঝঞ্ঝাট। কে অত ঝঞ্ঝাট করে ? সে সময়টা গুরু-গোসাঁইয়ের নাম নিলে কাজ হবে। ওই শসার গাছ করা হয় শুধু গুরু-গোসাঁইয়ের সেবার জন্যে।

পাগল ঠাকুর খেয়ে উঠে এঁটো পাতা ফেলে দিলে। রাজ্যির কুকুর জড়ো হয়েছিল আগে থেকে, পাতের অনেকগুলো ভাত ওদের সামনে ছড়িয়ে দিলে।

আবার তামাক সাজতে বসলো। তামাক খেতে খেতে বুড়ীকে বললে—পাকাটি ছাও গোটা-কতক, একটা মশাল করি।

আমি বললাম—কি হবে ?

—এখুনি আবার বুনোপাড়ায় যেতে হচ্চে। দুটো রুগী এড়িয়ে আছে, দেখে এসেচি। তাদের ফেলে থাকতে পারবো না। নবীন ডাক্তারকে বলে এসেচি যাবার জন্যে। এখন গুরু-গোসাঁইয়ের কৃপা হোলে সেরে উঠতে পারে। আর তিনি যদি চরণে টানেন—তবে হয়েই গেল —আহা-হা !

ওর চোখে প্রায় জল এসে পড়লো। আমার হঠাৎ বড় উদ্বেগ হোলো ওর জন্যে। ও যেন আমার আত্মীয় কত কালের। আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললাম—তুমি যেও না সেখানে। যদি তোমার হয় ? বড় খারাপ রোগ—

পাগল ঠাকুর হেসে বললে—ওই ছাখো, বাবাঠাকুরের কথা—তাঁর নিয়ে সব। তাঁর যদি ইচ্ছে হয় এই খোলসটা বদলাবো, তবে তাই হবে। তিনি যেখানে নিয়ে যাচ্চেন, সেখানে যেতেই হবে। আমি তো যাচ্চি নে, তিনি নিয়ে যাচ্চেন,—তাই যাচ্চি। আমি কেউ নই।

একটা অদ্ভুত ভাব ওর মুখে ফুটে উঠলো কথা ক'টা বলবার সময়। বুড়ী বললে—রাত্তিরে ফেরবা তো ?

ও বললে—তা বলা যায় না। তুমি ঝাঁপ খুলে রেখো, আসি তো ঝাঁপ খুলে ঢুকবো। চলো বাবাঠাকুর, সন্দে হয়েচে, তোমায় পৌঁছে দিয়ে ওই পথে চলে যাই।

আমি বললাম, আমার এগিয়ে দিতে হবে না, একাই যেতে পারবো। কারণ মাসিমা টের পেয়ে যাবেন যে আমি এতক্ষণ কোথায় ছিলাম। তিনি পছন্দ করবেন না আমার এখানে আসা-যাওয়াটা। মনে মনে তা আমি জানি। সুতরাং কত বেলতলা দিয়ে একাই বাড়ী চলে গেলুম। মাসিমাকে পাগল ঠাকুরের কথা কিছু বলি নি। তিনি নিজেই জিজ্ঞেস করলেন—ওদিকে গিইছিলি নাকি?

—কোন দিকে?

—পাগল ঠাকুরের আখড়ায়?

—হ্যাঁ। একটু বসে ছিলাম। বেশ ভালো লোক। কোথায় কলেরা হয়েচে, নিজে গিয়ে তাদের সেবা করচে রাত্তির বেলাতে।

—হুঁ।

ঐ পর্য্যন্ত। উনি চুপ করে গেলেন, বুঝলুম না রাগ করলেন কিনা।

তার পরদিন আবার বিকেলে পাগলের আখড়ায় গিয়ে হাজির হই। কিসের একটা টান অনুভব করলাম, না গিয়ে থাকা গেল না।

পাগল ঠাকুর আপন মনে বসে গান করছিল একখানা তালপাতার চেটাই পেতে। ওর গানই ওর উপাসনা, ওর মুখে গান শুনলেই আমার তা মনে হয়েচে। আমার বয়েস কম হোলেও আমি তখন অনেক বুঝি। ওর মত ভক্তি আমি কারো দেখি নি। মাসিমাকে বাড়ী ফিরে কথাটা আমি বলেছিলাম। মাসিমা গীতা নিয়মিত পাঠ করতেন, রামায়ণ মহাভারত তাঁর বড় প্রিয় ছিল, ব্রত উপবাস করতেন, রোজ ভোরে গঙ্গাস্নান করে পুজো-আচ্চা করতেন বেলা নটা পর্য্যন্ত। কৃষ্ণ ঠাকুরের ছবিতে চন্দন মাখাতেন, ফুল দিতেন। পাগল ঠাকুর ওসব কিছু করে না অথচ সে ভক্ত লোক, এ কথা মাসিমা বুঝবেন না। তবুও মাসিমা মন দিয়ে কথাটা শুনলেন, শুনে চুপ করে রইলেন।

পাগল ঠাকুরকে বললাম—কখন এলে কাল রাত্তিরে?

—সারারাত ছিলাম বাবাঠাকুর। দুটোই মারা গেল, শ্মশানে গেলাম তাদের ভাসিয়ে দিতে।

—পোড়ালে না?

—গরীব লোকদের পোড়াচ্চে কে বাবাঠাকুর! কাঠকুটো কোথায়? গুরু-গোসাঁইয়ের নামে গঙ্গার বুকে ভাসিয়ে দিলাম—আর ভাবনা কিসের? দেহটা হাঙর কুমীরে খেলেও দেহ দিয়ে জীবের উপকার হোলো। পুড়িয়ে দিয়ে ফল কি, বলো? ওদের একটা ছেলেকে নিয়ে এলায় আমার এখানে। ওই ত্যাখো, কাঠ কুড়িয়ে আনচে, ছোট ছেলে, কেউ নেই—গুরু-গোসাঁই তাই আমার ঘাড়েই চাপালেন। তাঁর হুকুম।

ও এমনভাবে কথা বলচে যেন ভগবান ওর সঙ্গে পরামর্শ করেন সব কথায়, আমার হাসি পেল। যা হোক, ওর মন ভারি সরল।

আমাকে ওই পাগল ঠাকুর ভয়ানক বেঁধেচে, ক্রমে বুঝচি। বিকেল হোলে আসতেই হবে

যেন ওর এখানে। ও আমাকে কিছু খেতে দেবে, তারপর গান শোনাবে। কোনো বৈষয়িক কথা ওর মুখে শুনি নি। অনেক পরে বয়েস হোলে এ সব ভালো করে বুঝেছিলাম।

আমি বললাম—তুমি মাছ ধর ?

—না, বাবাঠাকুর।

—তোমার বাড়ী কোথায় ছিল ?

অন্য লোক হোলে এ কথার উত্তর দেয় না। কিন্তু পাগল ঠাকুরের মত সরল লোকের কোনো কিছুই গোপনীয় নেই। সে বললে—শঙ্করপুর। কাঁচরাপাড়ার ওদিকে, এখান থেকে আট-ন কোশ।

—বাড়ী-ঘর আছে সেখানে ?

—কিছু নেই। আমরা গরীব লোক, খড়ের কুঁড়ে ছিল, ভেঙে গিয়েচে, ভিটেতে কিছু নেই —মস্ত এক তালগাছ হয়ে আছে, সেবার দেখে এলেছিলাম।

—আপনার জন কেউ নেই ?

—এই যে বাবাঠাকুর, ভুল কথা বলে। আপনার জন নেই কেন, এই তুমিই তো আমার আপনার জন। গুরু-গোসাঁই সবাইকে আপন করে দিয়েচেন যে। ক'দিন থাকবে ?

—আর দুদিন ছুটি আছে মোট।

—মোটে দুদিন ? তারপর চলে যাবা। দুঃখু দিতে আসো কেন বলো তো। তুমি চলে গেলে আমার বড্ড কষ্ট হবে দিন-কতক। বিকেলটা কাটবে না। গুরু-গোসাঁইয়ের ইচ্ছা···

বলে সে দীর্ঘশ্বাস ফেললে। সেই মুহূর্তে ও আমার বড় কাছে এসে পড়লো, আর দূরের লোক রইল না।

বাকি দুদিনও রোজ বিকেলে ওখানে যাই। বুনোদের সেই ছোট ছেলে এরই মধ্যে নিজের হয়ে গিয়েচে। সে দেখি রান্নাঘরে আউশ চালের পান্তা ভাত বেগুনপোড়া আপনিই হাঁড়ি থেকে বেড়ে নিচ্চে দিব্যি। নিজের ঘরের মত।

পাগল ঠাকুর আমায় নিয়ে ছোট ঘরের দাওয়ায় বসে আর গান করে। একতারা বাজিয়ে ওর বেসুরো গলায় যখন গান করে, তখন প্রতিদিন এই গঙ্গার চরে কোনো বিরাট দেবের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করি···ওদিকে বিষ্ণুপুর গ্রামের বাঁশবন, ঘোষপাড়ার বাবুদের লিচুবাগান—সব কেমন অদ্ভুত মনে হয়, সরাটির চরের কাশবনের পেছনে মস্ত আকাশটা লাল হয়ে ওঠে অস্ত-সূর্য্যের আভায়।

আমার অল্প বয়েস বলেই হোক বা যে জন্যেই হোক, কি অদ্ভুত টান যে হয়ে উঠেছিল পাগল ঠাকুরের ওপর। এখন মনে ভাবলে আশ্চর্য্য হই। বাল্যের সে কয়টি দিনের আনন্দ আর ফিরে পাবো না, তেমন ধরনের আনন্দও আর পাই নি কখনো।

পাগল ঠাকুর গান থামিয়ে একতারা নামিয়ে রেখে একগাল হেসে বললে—আনন্দ করো, আনন্দ করবার জন্যেই একপাশে পড়ে আছি। গুরু-গোসাঁইয়ের দয়ায় শুধু

আনন্দ নিয়ে আছি ।

ওর হাসিভরা উজ্জ্বল চোখ দুটি আর নারদের মত সাদা দাড়ি, শিশুর মত সরল মুখ ওর কথার সত্যতা সপ্রমাণ করতো···সেই আনন্দ ছোঁয়াচে রোগের মত পেয়ে বসতো সবাইকে, যে ওর সংস্পর্শে আসতো ।

এর একটা উদাহরণ মধ্যে একদিন প্রত্যক্ষ করলাম । কোথা থেকে একদল মেয়ে-পুরুষ ওর ওখানে এল । বোঁচকা-বুঁচকি এক একটা পিঠে বাঁধা । শুনলাম ওরা পাগল ঠাকুরের শিষ্য । এই যে মাসিমা বলেন, ছোট জেতের গুরু ।

কিন্তু গুরুর মত সম্ভ্রমসূচক ব্যবহার করে ওরা দূরে রইল না । সবাই একসঙ্গে বসে তামাক খেলে হাতে হাতে কল্কে পরিবেশন করে । পাগল ঠাকুরের চারিদিকে গোল হয়ে বসে একতারা বাজিয়ে গান করলে, হাসিখুশি, আনন্দ, খাওয়া-দাওয়া । ওদের মুখ দেখে মনে হোলো জীবনে ওদের কোন দুঃখকষ্ট নেই । খাওয়া-দাওয়া তো ভারি, পাগল ঠাকুরের ভাণ্ডার কারো আপন নয়, যার খুশি নিজের হাতে চাল বার করে নিচ্ছে, বুনোপাড়া থেকে দুটো রাঙা শাকের ডাঁটা নিয়ে এল, ডুমুর পাড়লে—চড়ালে ভাত, নুন ছড়িয়ে সবাই আওট কলার পাতায় ভাত ঢেলে একসঙ্গে খেলে, গুরুও বাদ গেলেন না । দিনটা আনন্দ করে সন্ধ্যের দিকে সবাই বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে চলে গেল ।

আমিও চলে এলাম তার পরের দিন ।

এরপরে আবার সে গ্রামে যাই যেবার ম্যাট্রিক পাস দিয়ে কলেজে ঢুকেচি ।···মাসিমা আগের চেয়ে বৃদ্ধা হয়ে পড়েচেন, চোখে ভালো দেখতে পান না ।

বললাম—পাগল ঠাকুর বেঁচে আছে ?

মাসিমা বললেন—আছে না তো যাবে কোথায় ? তোমার বুঝি সেখানে যাওয়া চাই-ই ? আহা, কি যে দেখেচ ওর মধ্যে তুমি ! ছেলেবেলা থেকে দেখে আসচি এই কাণ্ড—

পাগল ঠাকুরকে অন্য চোখে দেখলাম । সেই ছোট খড়ের ঘরের আশ্রম, সেই সদানন্দ সাদা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ, সব তেমনি আছে । চার বছর আগের মত চেহারাই আছে, বিশেষ কোনো পরিবর্তন নেই । আমাকে দেখে বললে—বাবাঠাকুর যে ! আয়ে, এসো, এসো, তোমার কথা কত বলি । কবে এলে ?

—আজই । তুমি ভালো আছ ?

—গুরু-গোসাঁইয়ের কৃপায় আছি ভালোই । বসো, গান শোনবা ?

—গান শোনবার জন্যেই তো আসা ।

—পদা খাবা না ছেলেবেলাকার মত ?

—না, শোনো, এখন আর ছেলেমানুষ নই । তুমি যা খুশি খেতে দিতে পারো, ভাত পর্য্যন্ত । ছেলেমানুষ নই আর, কারো এক্তারবিধ মধ্যে নেই এখন । তোমার এখানে খাবো, তাতে দোষ কি ? রাঁধো না তেমনি ডুমুর-ভাতে ভাত ?

পাগল ঠাকুর ভয়ের ভান করে হেসে বললে—ও বাবারে, বাওনের জাত মেরে দিই এই সন্দেবেলা! তা হবে না—আর কি খাবা বলো? ওগো শোনো ইদিকে—এঁকে চেনো? সেই যে—

বুড়ী কুঁজো হয়ে পড়েচে আরও, চোখেও ভালো দেখে না মনে হোলো। কাছে এসে বললে—কে?

—ওই সেই যে ভূপেনবাবুদের বাড়ীর ছেলেটি কত বড় হয়েচে আর কি চমৎকার দেখতে হয়েচে ভাখো। শোনো, দুটো চাল আর কাঁটাল বীচি ভাজা ভেজে নিয়ে এসো তো, খেতে দিই। চা খাও বাবাঠাকুর? চা করে দিতে পারি। একজন এখানে চা রেখে গিয়েচে, সে মাঝে মাঝে এসে চা খায়। খাবে?

—করো।

চা করতে গিয়ে ওরা দুজনে বিষম বিপদে পডলো। বুড়ো-বুড়ী নানা পরামর্শ করে, একবার জল ফোটায়, আবার নামায়—আধ ঘণ্টা হয়ে গেল, রান্নাঘর থেকে বেরোয় না। কাঁসার ঘটিতে গরম জল আর চা একসঙ্গে গুড় সহযোগে সিদ্ধ করে অবশেষে এক ব্যাপার করে নিয়ে এল, সবাই মিলে অর্থাৎ তিনজনেই মহা আনন্দে তাই পান করা গেল।

তারপর তামাক সাজতে সাজতে বলেন—এইবার কি খবর বলো বাবাঠাকুর—

—তোমায় দেখতে এলাম।

—আমায় কি আর দেখতে আসবা? ভালোবাসো তাই, নইলে আমি কি একটা দেখবার মত লোক?

—জানো, তোমাকে একজন দার্শনিক বলে মনে হয়?

—সে কি বাবাঠাকুর?

—আমার মনে হয় তুমি একজন দার্শনিক। সত্যিকার দার্শনিক—ঋষির মত লোক। তোমাকে লোকে চেনে না।

—ওসব কথা আমায় বলো না। আমাকে তিনি পায়ের দাস করে রেখেচেন। তাঁর দয়া। আমার কোন গুণ নেই, বাবাঠাকুর। আনন্দে রেখেচেন, আনন্দে আছি। গান শোনো—

আমার চোখ অনেকটা খুলেচে আগেকার চেয়ে। বৃদ্ধের সরল পবিত্র মুখভাব আর সহজ আনন্দ ওকে আমার চোখে ঋষির পদবীতে উঠিয়ে দিয়েচে।

পাগল ঠাকুর যদি ঋষি নয়, তবে ঋষি কে? লেখাপড়া জানলে, আর দু-তিন হাজার বছর আগেকার ভারতবর্ষের লোক হোলে এই লোকেই উপনিষদ রচনা করতো—পদ্মাটির চরের মত উদার হোতো তার বাণী, ঝিঙে-ফুলের সৌন্দর্য্য থাকতো তার ভাষায়, সন্ধ্যের সকালে বাঁশবনের পাখীকুজনের মত শান্ত সহজ আনন্দ মিশিয়ে থাকতো তার অঙ্গে অঙ্গে।

কিন্তু একে কেউ চিনলে না।

আমার সারা জীবন ওর হস্ত সহজ আনন্দের মন্ত্রে দীক্ষিত। যেবার বিবাহ করে মাসীমাকে নববধূ দেখাতে গিয়েছিলাম ওঁদের গ্রামে, ভেবেছিলাম পাগল ঠাকুরের ওখানেও নিয়ে যাবো, আসল উদ্দেশ্য ছিল সেটাই—কিন্তু পাগল ঠাকুরকে আর দেখতে পাই নি।

সেও এক বিকেলে গেলাম ওর আখড়াতে। বাবলা গাছের তলায় ওর সমাধি। ওদের সম্প্রদায়ে নাকি সমাধি দেওয়াই নিয়ম। মাটির একটা লম্বা ঢিবি, বাবলাফুল ঝরে ঝরে পড়েচে তার ওপর। কোনো শিষ্য কতকগুলো দোপাটি ফুলের গাছ রোপণ করে দিয়েচে মাটির ঢিবিটার চারিপাশে—পাগল ঠাকুরের নশ্বরদেহের হাড় ক'খানা ওরই তলায় মাটি মুড়ি দিয়ে আছে।

ওকে এখানকার কেউ চিনলে না। আমার মাসীমা তো এত গীতাপাঠ করেন, মন্ত্র জপ করেন, তিনিই বলেন—হ্যাঁ বাবু, তোমার সেই পাগল ঠাকুর আজ বছর দুই হোলো মারা গিয়েচে। কে জানে, ওসব ছোটলোকের খবর রাখি নে, রাখবার সময়ও পাই নে—

সেই বুড়ী কেবল বেঁচে আছে আজও। তাকে সন্ধ্যের পিদিম জ্বালতে দেখলাম সমাধির সামনে। রেড়ির তেলের মাটির পিদিম। খড়ের ঘরের খড় উড়ে পড়েচে। আখড়ার অবস্থা অতি খারাপ, কারো দৃষ্টি নেই এদিকে মনে হোলো। সংসারে এমনিই হয়।

হে অরণ্য কথা কও

বড় রচনার ফাঁকে ফাঁকে—দৈনন্দিন কাজের মধ্যে এমন কিছু লিখতে ইচ্ছে করে যার সঙ্গে প্রতিদিনকার ইতিহাসের কিছু যোগ থাকে, অথচ যা খুশি তাই লেখা যায়, মনের মধ্যে যখন যে ভাব ফেনিয়ে ওঠে—ভাল সাহিত্যের দরবারে যে সব কথার জবাবদিহি করতে হয় না। তাই থেকেই ডায়েরী লেখার শুরু—এগুলো যে কোন দিন ছাপার মুখ দেখবে তা মনে ছিল না। প্রকাশকের চাপে হঠাৎ একখণ্ড ছাপা হল—তারপর আরও, তৃণাঙ্কুর, ঊর্ম্মিমুখর, উৎকর্ণ। পাঠকরা আগ্রহ করে পড়েন এর স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েই ডায়েরীর এই ক-টা পাতা ছাপতে সাহস পাওয়া গেল।···অরণ্য-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা যেখানটায় বেশী, বর্ত্তমান গ্রন্থে সেই সব অংশগুলোই প্রকাশ করা হয়েছে। ইতি—

কাল বারাকপুরে গিয়ে এসেচি সুদীর্ঘ ন' মাস পরে। আগের ডায়েরী লেখার পর দশ-এগারো মাস কেটে গিয়েচে। গত আষাঢ় মাসেই কল্যাণী অসুখে পড়ে, ভাদ্র মাসে একটি কন্যাসন্তান হয়ে মারা যায়—তারপর কল্যাণী একটু সেরে উঠলে গত ১৫ই ভাদ্র ওকে নিয়ে যাই কোলাঘাটে শ্বশুরবাড়ীতে। শ্বশুরমশায় তখন ছিলেন কোলাঘাটে, গত ৺পূজার সময় যে ভীষণ ঝড় হয় সে সময় আমি তখন ওখানেই। তারপর ওঁরা চলে গেলেন ঝাড়গ্রামে, কল্যাণীও সঙ্গে গেল, সেখান থেকে আমরা গেলুম ঘাটশিলা গত কার্ত্তিক মাসে। এতদিন ওই অঞ্চলেই ছিলুম, কাল এসেচি এখানে।

মঙ্গলবার দিন যখন গাড়ী এসেচে খড়্গপুর, তখন বাংলা দেশের সবুজ ঘাসভরা মাঠ, টল-টলে জলে ভর্ত্তি মেদিনীপুর জেলার খাল বিল দেখে আমাদের ইছামতীর কথা মনে পড়লো। খড়গপুর থেকে তখন সবে নাগপুর প্যাসেঞ্জার ছেড়েচে, কল্যাণী বলে উঠলো—"আজই চলো বারাকপুর যাই, ইছামতী টানচে।"

আমারও মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে তখন যশোর জেলার এই ক্ষুদ্র পল্লী-গ্রামটির জন্যে। যত দেশ-বিদেশেই বেড়াই, যত পাহাড়-জঙ্গলের অপূর্ব্ব দৃশ্যই দেখি না কেন, বাল্যের লীলাভূমি, সেই ইছামতীর তীর যেমন মনকে দোলা দেয়—এমন কোথাও পেলাম না আর। কিন্তু সেদিন আসা হোলো না, এই ক'দিন কাটলো কলকাতা ও ভাটপাড়ায়। তারপর কাল বনগাঁ হয়ে বাড়ী এসেচি কতকাল পরে।

চোখ জুড়িয়ে গেল বাংলার এই বন-ঝোপের কোমল শ্যামলতায়, তৃণভূমির সবুজত্বে, পাখীর অজস্র কলরোলে। সিংভূমের রুক্ষ, অনুর্ব্বর বৃক্ষ-বিরল মরুদেশে এতকাল কাটিয়ে, যেখানে একটা সবুজ গাছের জন্যে মনটা খাঁ খাঁ করে উঠতো, মনে আছে কাশিদার সেই বাঁধের ধারে খানিকটা সবুজ ঘাস দেখে ও সেদিন রাজবাড়ী যাবার পথে একজনদের বাড়ী একটা ঝাঁকড়া পত্রবহুল বৃক্ষ দেখে অবাক হয়ে চেয়ে ছিলাম—সেই সব প্রস্তরময় ধূসর অঞ্চল থেকে এসে এই পাখীর ডাক, এই গাছপালার প্রাচুর্য্য কি সুন্দর লাগছে! যেন নতুন কোন দেশে এসে পড়েচি হঠাৎ, বাল্যের সেই মায়াময় বনভূমি আমার চোখের সামনে আবার নতুন হয়ে ফিরে এসেচে, সব হয়ে উঠেচে আজ আনন্দ-তীর্থের পুণ্য বাতাস-স্পর্শে আনন্দময়, নতুন চোখে সব আবার দেখচি নতুন করে। আজ ওবেলা ইছামতীতে নাইতে নেমে সে কি আনন্দ! ও পারের সেই সাঁইবাবলা গাছটা, আর বছর আমি আর কল্যাণী নাইতে নেমে যে গাছটার ডালপালার মধ্যে আটকে-পড়া অস্ত-সূর্য্যের রাঙা রোদের অপূর্ব্ব শ্রী মুগ্ধচোখে চেয়ে দেখতাম—সে গাছটা তেমনি আছে। তারপর বিকেলে নগেন খুড়োর ছেলে ফুচুর সঙ্গে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে সেই নাবাল জমিটার ধারে নরম সবুজ ঘাসের উপর বসে ভাব-ছিলাম গত মার্চ মাসে দেখা মানভূমের সেই নাকটিটাঁড় বনের কথা, মানভূমের বৃক্ষলতাহীন পথের কাঁকর ছড়ানো টাঁড়ের কথা, বাম্বিয়াবুরু ফরেস্টে উনিশ শো ফুট উঁচু পাহাড়ে সেই রাত্রিযাপনের কথা, চাইবাসাতে ভবানী সিং ফরেস্ট অফিসারের বাড়ীর বিস্তৃত কম্পাউণ্ডে বসে গত চৈত্র সংক্রান্তির দিন অপরাহ্নে চা খেতে খেতে দূরবর্ত্তী বরকেলা শৈলমালার আড়ালে সূর্য্য

অস্ত যাওয়ার সে দৃশ্যের কথা—মাঠাবুরু পাহাড়ে শালবনের মধ্যের উঁচু পথ দিয়ে কাঠ-কয়লা মাথায় করে বয়ে নামাচ্চে যে হো মেয়েরা, যাদের মজুরী চার বার দুর্গম পথে ওঠানামা করলে মাত্র সতেরো পয়সা, তাদের কথা—গত পূর্ণিমার আগের পূর্ণিমায় বহরাগড়া থেকে কেশুর-দা রিজার্ভ (বাঁশের) ফরেস্ট দেখতে যাওয়া ও বগরাচোড়া গ্রামের সেই উড়িয়া ব্রাহ্মণ ও গ্রাম্য স্বর্গ বাউড়ি দেবীর মন্দিরের পাশে স্তূপীকৃত প্রাচীন পাথরের দেব-দেবীর হাত-পা ভাঙা মূর্তিগুলির কথা। বাঘমুণ্ডী পাহাড়ের মাথায় সেদিন দুপুরে আমি, সুবোধ ও সিন্‌হা সাহেব বসে ছিলাম, শৈলসানুতে বসন্তের পুষ্পিত লতা, পলাশ ও গোলগোলি, নীচের উপত্যকায় অজস্র ঘেঁটু ফুল। সুবোধ ঘোষ 'আরণ্যক' পড়ে শোনাচ্ছে সিন্‌হা সাহেবকে, আমি বসে বসে একদৃষ্টে বাঘমুণ্ডী শৈলারণ্যের সে সুন্দর রূপ দর্শন করচি, সেই শঙ্খ ও শোভা নদীর কথা (কি চমৎকার নাম দুটি! শঙ্খ ও শোভা!)—এই সব কত কি ছবি গত ক'মাসের স্মৃতির ভাঁড়ার থেকে হাতড়ে বার করে দেখচি মনের চোখে আর চোখ চেয়ে দেখচি বাংলা দেশের যশোর জেলার এক ক্ষুদ্র পল্লীর মাঠে সম্পূর্ণ অন্য এক দৃশ্যের সামনে বসে, সামনে আমার শৈলমালার ampitheatre-এ ঘেরা ভালকী ফরেস্ট নয়, (হঠাৎ মনে পড়লো ভাল্‌কী ফরেস্টের মধ্যে আমার আবিষ্কৃত সেই অপূর্ব্ব বন্য সরোবর "লিপুদারা"র কথা, সেই উত্তুঙ্গী চুনা পাথরের শৈল-গাত্র, সেই নটরাজ শিবের মত দেখতে সাদা গাছটা যার নাম আমি রেখেছিলুম শিববৃক্ষ, সেই লিপুকোচা গ্রামের লোকদের সন্ধ্যার অন্ধকারে বন্য হস্তীর ভয়ে মশাল জ্বালিয়ে আমাকে ও ফরেস্ট অফিসার মিঃ সিন্‌হাকে আমাদের বনমধ্যস্থ তাঁবুতে পৌঁছে দেওয়া) এ হোল আসসেওড়া, ষাঁড়া, শিমুল, কেঁয়োঝাঁকা গাছের বন, চারিদিকে ছায়াভরা অপরাহ্ণে কোকিল-কূজনে চমক ভেঙে যায় যেন, ভাবি এ বাংলা দেশ, বাংলা, চিরকালের বাংলা মা। নতুবা এত বিশ্বপুষ্পের সুগন্ধ কোথায়? এত পাখীর ডাক কোথায়? যারা চিরদিন গ্রামে পড়ে থাকে, তারা কি বুঝবে এ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মহনীয় রূপ, তাদের মন তো আকুল হয়ে ওঠেনি বাংলার বাঁশবনের ছায়ায় ঘাটের ধারের মাটির পথে বেড়াবার জন্যে, চোখ পিপাসিত হয়ে ওঠেনি একটু সবুজ বনশ্রী দেখবার জন্যে?

রাত অনেক হয়েচে। আমি ডায়েরী লিখচি, কল্যাণী পাশে শুয়ে বই পড়চে। অনেক দিন পরে দেশে এসে ও খুব খুশি। আজ বলচে ওবেলা, "আমাদের এ বাড়ীটা কেমন ভালো, কেমন ছাদ—না? সত্যি, বাড়ীটা আমারও ভাল লাগচে। ঘন ছায়াভরা বাগান ও বনে ঘেরা। ঐ বড় বকুল-গাছটায় বাল্যদিনের মত জোনাকীর ঝাঁক জ্বলচে জানালা দিয়ে দেখচি, বিলঝিলের ডোবায় কটকটে ব্যাঙ ডাকচে আর বনে ঝোপে কত কি কীটপতঙ্গ যে কুস্বর করচে তার ইয়ত্তা নেই।

আবার মনে পড়চে সেই কতদূরের শঙ্খ ও শোভা নদীর তীর, গভীর নাকটিটাঁড়ের বন-মধ্যস্থ কৃষ্ণ প্রস্তরের সেই গণ্ডশৈল ও আদিম মানবের চিহ্নযুক্ত গুহা, ভালকী জঙ্গলে বন্য বরমকোচা গ্রামের সেই মুণ্ডা যুবতীটি, যে আমায় বলেছিল—"তুই কি করচিস এ বনে আমাদের? ভালো ভালো জায়গা দেখে বেড়াচ্ছিস্ বুঝি?" অবিশ্যি এত ভাল বাংলায় বলেনি।

আর মনে পড়চে নিমজ্জির বনে সেই পলাশ ফুলের শোভা গত বসন্তে ও মাঠা গ্রামের সাঁওতালের মত চেহারা সেই ভুবনেশ্বর বাঁড়ুয্যের কথা। সুদূর নাকটিটাঁড়ের বন ও বক্র শঙ্খ নদীর তীরবর্তী জ্যোৎস্নাপ্লাবিত শিলাসন। সাঁওতালের মত দেখতে, মিশ কালো—নাম বল্লে, ভুবনেশ্বর বাঁড়ুয্যে। আমি চমকে উঠেছিলাম। বাইরে হঠাৎ গিয়ে দেখি কৃষ্ণা চতুর্থীর ভাঙা চাঁদ উঠেচে—বাইরে জ্যোৎস্না। কল্যাণীকে ডেকে বাইরে গিয়ে বসলুম। খুব বৌ-কথা-কও পাখী ডাকচে। বাঁশবনে রাতজাগা আর একটা কি পাখী ঠক্ ঠক্ শব্দ করচে। বাংলা-পল্লীর জ্যোৎস্নারাত্রির রূপ প্রাণ ভরে দেখি কত রাত পর্য্যন্ত বসে বসে।

খুকু নেই ব্যারাকপুরে, বিয়ে হয়ে এখান থেকে চলে গিয়েচে কোথায় তার শ্বশুরবাড়ী—সেখানে। বহুদিন দেখা হয়নি তার সঙ্গে।

জীবনই এ রকম, এক যায়, আর আসে।

মহাকালের বিরাট পটভূমি নিত্য শাশ্বত—তার সামনে জগতের রঙ্গমঞ্চে কত নরনারীর আসা যাওয়া!

ভালো কথা, গত মাঘ মাসে কলকাতায় সুপ্রভার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তার একটি খুকী হয়েচে, নাম তার রেখেছে রাখী, বেশ খুকীটি। সুপ্রভা আমার খুকীর কথা কত জিজ্ঞেস করলে।

রেণুর সঙ্গেও এবার কলকাতায় দেখা, সে বেথুনে পড়চে সেকেণ্ড ইয়ারে। বোমা পড়বার তৃতীয় দিনে তারা পালিয়ে গেল কলকাতা থেকে তাদের দেশে। এখনও ফেরেনি দেখে এলুম।

এখানে এসে জীবন আরম্ভ করেছি আট মাস পরে। আজ সকালে ইছামতীতে নাইতে নেমেছি, বেলা ৮॥টা হবে, শান্ত নদীজল, ওপারে সবুজ ঘাসেভরা মাঠ ও ঝিঙে-পটলের ক্ষেত, এপারে ফণি চক্কত্তির জমির বাগান, সাঁইবাবলা ও শিরীষ গাছের আঁকা-বাঁকা ডাল-পালার সৌন্দর্য্য। কোকিলের ছেদহীন কূজন সকালের আকাশ যেন ভরিয়ে রেখেচে, প্রস্ফুট ভুঁত ফুলের সুবাস বাতাসে। কালু মোড়লের ছেলে গনি ও নগেন খুড়োর ছেলে ঘুচু ঘাটে নাইচে। গনি আমের চালান নিয়ে গিয়েছিল নফর কোলের বাজারে। একচল্লিশ দিন কলকাতায় ছিল, আজ এসেচে। দেশে এসেচি আজ চারদিন, এখনও এখানকার নতুনত্ব কাটেনি। ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে যে কত সৌন্দর্য্য তা দেখবার সুযোগ ও সুবিধা কি সকলের ঘটে? চৈতন্যকে প্রসারিত করে দেওয়া চাই, নতুবা শুধু চোখ দিয়ে দেখলে কিছুই হয় না। মনকে তৈরি করে নিতে হয় এজন্যে, এর সাধনা চাই। বিনা সাধনায় কিছু হয় না। উচ্চতর অনুভূতির জন্যে মনের আকূতি সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। আকূতি থেকে ইচ্ছা, ইচ্ছা থেকে কর্ম-প্রবৃত্তি।

আজ হাওড়া সঙ্ঘ থেকে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের সভাপতিত্ব করবার তাগিদ এল।

কলকাতা থেকে ফিরেচি কাল বৈকালে। ইউনিভারসিটি মিটিংএ সেখানে অনেকদিন পরে সুনীতিবাবু ও বহু পুরোনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা। মায়াদি ও বেলুকে নিয়ে রাত ৯টার সময়ে বাণী রায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে কলকাতার অন্ধকার ভরা রূপের সঙ্গে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছিল। গ্রামে ফিরলুম রবিবার বৈকালে, বেশ একটু মেঘবৃষ্টি দেখা দিলে, সামান্য একটু কাল-বৈশাখী বৈশাখের বিকেলে। তারপরেই আকাশে দেখা দিলে রাঙা মেঘস্তূপ, আমি বেড়াতে গেলুম নদীর ধারের মাঠে, গাছপালার কি চমৎকার সৌন্দর্য্য। মুগ্ধ করে দেয় আমাকে, চেয়ে দেখে সত্যিই বিস্ময় লাগে। কত কি গাছ, কত ধরনের পাতা! বিশ্বরূপের কত কি রূপ! যেদিকে চোখ পড়ে অবাক চোখে চেয়ে থাকি। বরোজপোতার বাঁশের বনে কচু ঝাড়, বেত গাছের মত পাতা কি একটা গাছ, তারই পাশে বাঁশের জগা নত হয়ে আছে—নিভৃত নিরালা বনভূমি, কোথায় সেই নাকটিটাঁড়ের শালবন করঞ্জ পুষ্প-সুবাসিত অপরাহ্নের বাতাস, মাঠাবুরু পাহাড়ের শিখররাজি। বিবাট হস্তীমুণ্ডের মত পরিদৃশ্যমান কাঁড়দাবুরুর শিখর—আর কোথায় বাংলার শ্যাম সৌন্দর্য্য। নদীজলে বিকেলে নাইতে নেমে ইছামতীর কালো জলে দেখি ভগবানের আর একটি রূপসৃষ্টি।

যিনি অগ্নিতে যিনি জলেতে
যিনি শোভন এ ক্ষিতিতলেতে

উপনিষদের ঋষিরা শুধু দার্শনিক ছিলেন না, দ্রষ্টা ছিলেন, কবি ছিলেন।

পরশু এলুম উত্তরপাড়া রাজবাড়ীতে রবীন্দ্র জন্মোৎসব সম্পন্ন করে। মাস্টার মশায় অতুল গুপ্ত, সজনী, বুদ্ধদেব, বাণী রায় সবাই একসঙ্গে যাওয়া গেল। বেশ মজা করে মিটিং করা গেল —ভাটপাড়ার আশালতার সঙ্গে দেখা হল অনেকদিন পরে—প্রায় আঠারো বছর পরে। ঘটে গেল জিনিসটা আমার সেই গল্পটির মত। একটি ছোট ছেলে এসে বল্লে, "আপনাকে আমার মা ডাকচেন।"

গেলুম একটা পুরোনো দোতলা বাড়ী—রাজা জ্যোৎস্নাকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রাসাদের সামনে।

একটি মেয়ে এসে ঝুপ্ করে নীচু হয়ে পায়ের জুতোর উপর দুহাত বুলিয়ে বল্লে—"দাদা, কেমন আছেন? কি ভাগ্যি যে আপনি এলেন এখানে!"

—"ও, আশা না?"

—"হ্যাঁ দাদা। এখন বড়-মানুষ হয়ে গিয়েচেন—আপনি কি এখন গরীব বোনকে চিনতে পারবেন?"

ঠিক একটি ছোট গল্প। কিছুদিন আগেই এ গল্প আমি লিখেচি কি একটা কাগজে।

পরদিন ফিরলুম বনগাঁয়ে। স্টেশনে নেমে—অম্বরপুরের একখানা গরুর গাড়ী যাচ্ছে, তাতেই চড়ে বসলুম—প্রথম শেওড়া গাছ ভাট গাছ দেখে কি আমার আনন্দ!

এবার বিভূতিদের বাড়ী গিয়ে উঠেছিলাম।

সিংভূমের ডিভিসনাল ফরেস্ট অফিসার মিঃ সিন্‌হা হঠাৎ এসে হাজির। পচা রায় ও আমি ওঁকে নিয়ে বেলেডাঙ্গার পুলে গেলাম। চাঁদ উঠেচে, আজ পূর্ণিমা। ঝাড় ঝাড় সোঁদালি ফুল মাঠে। কত ঝোপে ঝোপে পাকা বৈচি তুলে খেতে খেতে আমরা গেলুম। ক্লান্ত দেহে জ্যোৎস্নালোকে ইছামতীর জলে এসে নামি আমাদের বনসিমতলার ঘাটে। মিঃ সিন্‌হা সাঁতার দিয়ে একেবারে ওপারে—তিন্তুও ছিল। উঠে মাধবপুরের সবুজ ঢেউ-খেলানো ঘাসের মাঠ দেখে এল ওরা। পরদিন S. D. O.কে আনালুম, হাট থেকে ফিরে এসে দেখি S. D. O. ও সুরেন বসে। তাদের চা খাওয়ানো গেল—নিগ্রোর প্রতি আমেরিকানদের অত্যাচারের কত কাহিনী বর্ণনা করলেন মিঃ সিন্‌হা।

তার আগের দিন ঊষা চৌধুরী এসে হাজির। আমি নারাণদা'র শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ খেতে সবে বসেচি—এমন সময় কল্যাণী চিঠি লিখে পাঠালে—মিসেস্ চৌধুরী এসেচেন। উনি এখুনি চলে যাবেন। তখুনি এসে দেখি ঊষা সত্যিই খাটের ওপর বসে আছে। ওকে নিয়ে আমরা সবাই গেলুম নদীর ধারে। ঊষা নদী দেখে খুব খুশি—বালিকার মত খুশি।

অতএব বোঝা গেল বিদেশাগত দুটি লোকেরই ভাল লেগেচে আমাদের স্বচ্ছসলিলা ইছামতী—পুলিনশালিনী ইছামতী।

আবার কাল কলকাতা গিয়ে সজনীর সঙ্গে ঊষাদের বাড়ী বেড়াতে গিয়ে বহুকাল পরে অশ্বিনী—আমাদের ৬০, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের সেই বাল্যবন্ধু অশ্বিনীর সঙ্গে দেখা।

অনেকে গল্প করচি—ঊষারা কাল চলে যাচ্ছে লাহোরে—অনেকে দেখা করতে এসেচে—হঠাৎ ওর মধ্যে একটি লোক বল্লে—বিভূতি না?

অবাক হয়ে বললুম—চিনতে পারচি নে তো?

—তা চিনতে পারবে কেন? আমি অশ্বিনী।

তখুনি আমি তার শার্ট ধরে টেনে আনতে আনতে বললুম—দাও দিকি আমার প্রথম বিয়ের সেই ঘড়িটা—। আজ ২৭ বছর পরে দেখা—সেই সময়ই ও আমার ঘড়িটা নিয়ে গিয়েছিল—গৌরীর বাপের দেওয়া সেই পকেট ঘড়িটা! কত বছর আগে!

মহাদেব রায়কে নিয়ে গেলুম শ্রীমতী বাণী রায়ের বাড়ী। চা খেয়ে কত গল্প। বেশ ভাল বেলফুল ফুটেছিল, তুলে দিলেন ওঁরা। ওঁর মা সুলেখিকা গিরিবালা দেবী দুখানা বই উপহার দিলেন।

মহাদেববাবুর সঙ্গে পুরী যাওয়ার সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। ৬ই মে রওনা হবো হাওড়া থেকে।

রোজ নদীর কালো জলে গিয়ে সন্ধ্যায় নামি। কালও কুঠীর মাঠ বেড়িয়ে এসে সন্ধ্যায় স্নান করতে নামলাম আমরা দুজনে। রাঙা মেঘ করেচে সারা আকাশময়, ওপারের সাঁইবাবলা গাছটার ফাঁকে ফাঁকে রাঙা আলো যেন আটকে আছে। কি কালো জল! ভগবান যেন অত্যন্ত শান্ত রূপ ধরে আছেন—যেমন তাঁর অত্যন্ত অপরূপ মূর্ত্তি দেখেছিলাম সেদিন নতিডাঙার মরাগাঙের ধারে বসে। পাশে নতিডাঙার প্রকাণ্ড বটগাছটা, ওপারে,

আরামডাঙার মাঠে আউশ ধানের কচি সবুজ জাওলা ও খেজুর গাছের সারি। সাদা সাদা বক চরচে ঘন সবুজ কচুরিপানার দামে। এ জগতে যেন যুদ্ধ নেই, অশান্তি নেই, চালের দোকানের দীর্ঘ শ্রেণী নেই, উড়ন্ত এরোপ্লেন থেকে বোমাবর্ষণ নেই।

আম কুড়োনো এ সময় একটা আনন্দের ব্যাপার। আজ সকালে নদীর ধারে যাচ্চি, তেঁতুলতলী আম গাছটার তলায় দেখি হাজরি জেলেনী আম কুড়ুচ্চে। আমি যেতে না যেতে থপ্ করে একটা আম তুলে নিলে তলা থেকে। তখনও ভাল করে ভোর হয়নি। পাগলা জেলের মা আর হাজরি জেলেনী এই দুজন আম কুড়ুবার উদ্বেগে বোধ হয় রাত্রে ঘুমোয় না—নইলে অত সকালে ওঠে কি করে? সেদিন পাগলা জেলের মা ওর ঝুড়ি থেকে একটা পাকা আম আমায় দিয়ে গিয়েছিল। এইমাত্র একটা মশা মারলুম।

আজ কল্যাণীকে নিয়ে ফুচু, হর, বুধো প্রভৃতি ছোট ছোট ছেলেরা নৌকো নিয়ে বেড়াতে গেল বিকেলে, আমিও সঙ্গে গেলুম। অনেক দিন ওপারে যাইনি—মাঠ ছাড়িয়ে যে একটা পথ আছে, সেটা ভুলে গিয়েছিলুম। সেই পথ পর্যন্ত গিয়ে একটা নিমগাছ থেকে ডাল ভেঙে নেওয়া হোল দাঁতনের জন্যে। আমি নিজে নৌকো বেয়ে ঘাটে ভিড়িয়ে দিলাম—যেমন ও-বেলা তেঁতুলতলা ঘাট থেকে সাঁতার দিয়ে এসেছিলুম আমাদের ঘাটে। জলে নামলুম দুজনে, জল খুব বেড়েচে। আর বর্ষার আকাশে মেঘের দৃশ্য অদ্ভুত। সেই সাঁইবাবলা গাছটার ডালে ডালে রাঙা আলো। দেখে একটা অন্তঃপ্রেরণা মনে জাগলো—বিশ্বের মহাশিল্পীর পরিকল্পনার মহনীয়তা আমার চোখের সামনে সুপরিস্ফুট। নীল আকাশের দেবতার উদ্দেশে প্রার্থনা করি—এই পটভূমি নিয়ে এদেশের একখানা Epic উপন্যাস লিখবো আমি। নীল কুঠীর পুল থেকে শুরু করবো।

গত ৫।৬ দিন ভীষণ বর্ষার পর আজ প্রথম রোদ উঠেচে। এখনও অনেক আম—তেঁতুল-তলীতে আম কুড়ুই রোজ। গাছতলায় পাকা আম কুড়ুই। আজ ভোরে মুখ ধুয়ে ফিরচি নদীর ঘাট থেকে, বাঁশতলীর একটি টুকটুকে আম টুপ্ করে পড়লো আমার সামনে—কুড়িয়ে নিয়ে এলুম। কল্যাণী সেটি লক্ষ্মীকে দিলে।

বিকেলে শ্যামাচরণ দা'র ছেলে হর বল্লে, নৌকো বেড়াতে যাবেন না? আমি তখন বেরিয়ে গিয়েছি বাঁশ-বাগানের পথে গাব গাছটার কাছে। অনেকদিন যাইনি নৌকোতে—কেবল যা গিয়েছিলুম কাল না পরশু। নলে জেলের নৌকো ছাড়া হোল। বেশ মেঘমুক্ত বিকেলটি, না গরম, না ঠাণ্ডা। দুধারে দীর্ঘ দীর্ঘ নলখাগড়ার শ্যামল সবুজ ঝোপ, ছোয়ারা লতা, বন্তেবুড়ো গাছের সারি, জলজ ঘাসের ঝোপ—সবুজ, সবুজ, এত সবুজও আছে এদেশে; সবুজ সৌন্দর্যের ফুলঝুরি যেন চারিধারে। ক্রমে কুঠী ছাড়িয়ে গেল। নীলকুঠী এখন আর নেই, ভাঙা হাউজ ঘর আছে—এমন ঘন বন সেখানে যে দিনমানেই বাঘ লুকিয়ে থাকে। ঐ সেই ঝিনুকের স্তূপ নদীর ধারটাতে, গত ফাল্গুনমাসে ছেলেরা ঝিনুক তুলেচে—তার পচা গন্ধ

আকাশ বাতাস ভরিয়েচে, কাছে যাওয়া যায় না। কুঠী ছাড়ালুম, আবার নদীর দুধারে ঘন সবুজ উলুবন, জলের পাড়ে জলজ ঘাস ও বন্তেবুড়োর গাছ, উচ্ছে পটলের ক্ষেত, কুমড়োর ক্ষেত—শান্ত শুভ্র পল্লীশ্রী, এতদিন ছোটনাগপুরের ঊষর কাঁকর ও পাথরের দেশে বাস করে এসে চোখ জুড়িয়ে গেল, মন জুড়িয়ে গেল।

সবাইপুরের কাছে এসে ইছামতীর তীরের সৌন্দর্য্য আরও রহস্তময় হয়ে উঠলো। যেন তীরভূমির এই প্রাচীন অশ্বত্থ গাছটা, ওই প্রাচীন ঝাঁড়া গাছগুলো আমায় চেনে আমার বাল্যকাল থেকে। যেন এখনি বলবে—এই গ্যাখো সেই খোকা কত বড় হয়েচে। সবাইপুরের বাঁক ছাড়িয়ে অদূরে কাঁচিকাটার খেয়ায় কারা পার হচ্চে। একটি ছোকরা, সঙ্গে একটি প্রৌঢ়া, দুটি ছেলেমেয়ে, একখানা সাইকেল। ছোকরা বল্লে, আস্তর হাটে তাদের বাড়ী। পাশেই মরগাঙের খাল, বহুদিন পরে আমি ঢুকলাম নৌকো করে এই খালের মধ্যে। ছোট একটা বাঁশের পুলের তলা দিয়ে বাঁ ধারে আরামডাঙার বাঁশবন খেজুর বাগানের তলা দিয়ে ঐ গ্রামের একটা ঘাটে পৌঁছুই। ছোট্ট খালের এই ঘাটটি ঠিক যেন একটি ছবি। ছায়ানিবিড় স্নিগ্ধ অপরাহ্ন, নীল-আকাশ, ঘন সবুজ জলজ ঘাস ও দূর্ব্বাস্তৃত তৃণক্ষেত্র—সামনে কতকগুলি প্রাচীন গাছের আধ অন্ধকার তলায় একটা পুরোনো ইটের দরগা। কত কাল এদিকে আসিনি, আমারই গ্রামের পেছনে আরামডাঙার এই ঘাট কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না—হয়তো কখনো আসিই নি—অথচ কোথায় লিপুদারায় সেই বন্য সরোবর, ভালকীর সেই ঘন অরণ্য, মানভূমের মাঠাবুরু শৈলশ্রেণী, বামিয়াবুরু ও চিটিমাটি, রাঁচির পথে হিনি জলপ্রপাত ও পোড়াহাট রিজার্ভ ফরেস্ট। কোথায় দিল্লী, কোথায় আগ্রা, কোথায় চাটগাঁ, কোথায় শিলং, দার্জ্জিলিং কোথায় না গিয়েচি! অথচ জীবনে কখনো আসিনি আমার গ্রাম থেকে মাত্র দু মাইল দূর আরামডাঙার এই ছবিটির মত সুন্দর, তীরতরু-শ্রেণীর নিবিড় ছায়াতলে অবস্থিত প্রাচীন পীরের দরগা ও ছোট্ট ঘাটটিতে। একটা বড় জিউলি গাছ, আমগাছ, বড় একঝাড় জাওয়া বাঁশ ওপারের, সামনে ছোট্ট খালের ঘাটটি—হাত দশ-বারো চওড়া মরগাঙের খালের এপারেই বর্ষা-সতেজ উলুবন, দূরবিস্তৃত মাঠ বেলেডাঙার সীমানায় মিশে গিয়েচে। সূর্য্যাস্তের রাঙা রং আকাশে।

পরদিন বিকেলে গেলুম আরামডাঙার এপারে 'কলাতলার দোয়া'তে। নতিডাঙার বড় বট-গাছটা ছাড়িয়ে ওপথে কতদূর গেলুম। এ পথে কত কাল আসিনি। ডাঁশাখেজুর তলা বিছিয়ে পড়ে আছে পথের ধারে খেজুর গাছের। মোল্লাহাটির পথে শুধুই ঝুরি নামানো প্রাচীন বটের ছায়া, ঘন পত্রপল্লবের আড়ালে পড়ন্ত বেলায় বৌ-কথা-কও ডাকচে।

আজ নৌকো বেড়াতে গিয়ে একেবারে মাধবপুর। অনেককাল আগে এই রকমই নৌকো বেড়াচ্ছিলুম আমি আর ভরত। বহুকাল আগে আমার বাল্যকালে, দিগম্বর পাড়ুইয়ের একখানা খেয়া নৌকোতে আমি আর ভরত হাটবারের দিন লোক পারাপার করতাম রায়পাড়ার ঘাটে। এক মেঘাবৃত সন্ধ্যায় মাঠ ভেঙে গিয়েছিলুম মাধবপুরে পার্ব্বতীদের বাড়ী। পার্ব্বতী বিশ্বাস

জাতে কাপালী, গোপালনগরের হাটে বেগুন বেচে, আমার সঙ্গে ছেলেবেলায় রাখাল মাস্টারের পাঠশালায় পড়তো। সেই আর এই।

তারপর কত জায়গায় বেড়ালুম জীবনে—এই সুদীর্ঘ বত্রিশ বছরের মধ্যে কিন্তু মাধবপুর আর কখনো আসিনি। গ্রামের মধ্যে ঢুকে প্রথমেই গোয়ালপাড়া—একটা লোক গাড়ু হাতে পথে যাচ্ছে, জিজ্ঞেস করতে বল্লে, ঋষি ঘোষের বাড়ী। একটা বড় কাঁঠাল বাগান, অনেক কাঁঠাল ঝুলছে, জেলি বল্লে—দেখুন দাদা, কত আম পেকে!

চাষা গাঁ মাধবপুর। সব খড়ের ঘর, ঝকঝকে তক্‌তকে উঠোনে সিঁদুর পড়লে তুলে নেওয়া চলে। গোলাপালা, ছোট ডোবা, বাঁধানো মনসাতলা ইত্যাদি মাটির পথের দুধারে। একটা চালাঘরে কয়েকখানা বেঞ্চি পাতা। সেটা নাকি গ্রাম্য পাঠশালা। কয়েকটি লোক সেখানে বসে আছে। একটি ছোকরার বাড়ী বসিরহাট—সে নান্টু প্রসাদকে চেনে।

সামনে মনসা সিজের বেড়া দেওয়া একটা পুরানো কোঠা বাড়ী—নগেন রায় বলে এক ব্রাহ্মণের বাড়ী। তিনি ছ বছর হোল বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গিয়েচেন—তাঁর স্ত্রী থাকেন বাড়ীতে, ছেলেপুলে নেই।

এই মাধবপুর, ক্ষুদ্র কৃষকদের গ্রাম মাত্র—কিন্তু আমার মনে চিরকাল রহস্যময় হয়ে ছিল। ভালো করে আজই দেখলুম এ গ্রামকে, বত্রিশ বছর আগে সেই যে ভরতের সঙ্গে এসেছিলুম, সে অতি অল্পক্ষণের জন্যে এবং শুধু পার্ব্বতীদের বাড়ীতেই। গ্রামটা ভাল করে বেড়িয়ে দেখলুম এত কাল পরে—আজ প্রথম।

মনে পড়লো সংসারের টানাটানি হোলে বাবা আসতেন এই মাধবপুরে এক এক বিকেল বেলায় নৌকায় পার হয়ে—আমার বাল্যকালে। বাবার পুণ্যচরণ-ধূলিপূত-মাধবপুর!

পরদিন বিকেলে বেড়াতে গিয়ে নতিডাঙার বটতলা পেরিয়ে মরাগাঙের ধারের সেই জালি ধানের ক্ষেতটাতে বসি। কি শান্তি, কি শ্যামলতা এই দৃশ্যটার। ওপারে আরামডাঙার মাঠ, খেজুর চারা—গরু চরচে, মরাগাঙের ঘন সবুজ কচুরীপানার দামের ওপর শুভ্রপক্ষ বক বেড়াচ্ছে মাছ খুঁজে খুঁজে—পাশের বাবলা কাঁটার বেড়া দেওয়া একটা ঝিঙে ক্ষেতে হলদে ঝিঙের ফুল ফুটে আছে এই মেঘভরা বিকেলে। যিনি সূর্য্যে, নক্ষত্রে নিওন, হিলিয়াম, হাইড্রোজেন গ্যাস ও নানা ধাতুর আগুন জেলে রেখেচেন তিনিই এই শ্যামল সবুজ শান্ত তৃণভূমি, এই সৌন্দর্য্যভরা পল্লীদৃশ্যের সৃষ্টি করেচেন, তিনিই আগুনে, তিনিই জলেতে—অদ্ভুত contrast! সূর্য্যের বিশাল অগ্নিকটাহের সৃষ্টি শুধু এই শ্যাম বনশোভার, এই তৃণাবৃত প্রান্তরকে সম্ভব করবার, রূপ দেবার প্রাক্‌-আয়োজন মাত্র। আগুন কেন? জল সম্ভব হবে বলে।

হঠাৎ দেখি মেঘ করে আসচে। কালবৈশাখী নিশ্চয়—ছুটতে ছুটতে একমাইল এসে নদীতে আমাদের বনসিমতলার ঘাটে নামি। কি চমৎকার নদীজল, পুণ্য-সলিলা ইছামতী প্রতি সন্ধ্যার নিস্তব্ধতায় গত দশ পনেরো বছর ধরে আমায় কত কি শিখিয়েচে। ভগবানের

কত রূপই প্রত্যক্ষ করেছি ইছামতীতে সাঁতার দিতে দিতে এমনি কত নিদাঘ সন্ধ্যায়, বর্ষা অপরাহ্ণের বৃষ্টিধারামুখর নির্জ্জনতায়। আজ দেখলুম, কুঠীর দিকে কি অদ্ভুত কালো মেঘসজ্জা—উড়ে আসচে ভাঙা নীল কুঠীটার জঙ্গলের দিক থেকে আমাদের ঘাটের দিকে। কি সে অদ্ভুত রূপ! বিশ্বরূপের এ সব রূপ—এ পটভূমিতে, এমন অবস্থায় দেখবার সৌভাগ্য আমায় দিয়েচেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম। তিনিই দয়া করে যাকে দেখতে দেন, সে-ই দেখে।

সারাদিন কাটলো ট্রেনে। তিন বার অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখলাম—একবার ব্রাহ্মণী নদীর সেতুর কাছে বিস্তৃত কটা রংয়ের বালুরাশির ওপর দিয়ে শীর্ণকায় দ্বিধারা ব্রাহ্মণী বয়ে চলেচে—দূরে নীল পর্ব্বতমালা, ঘন সবুজ বনানী। বাংলাদেশের বন অথচ তার পেছনে আকাশের গায়ে সিংভূমের চেয়ে শ্যামলতর শৈলশ্রেণী। আর একবার এই রকম দৃশ্য দেখলাম কটকের এপাশে মহানদীর সেতু থেকে এবং ওপাশে কাটজুড়ির সেতু থেকে। ট্রেন যত পুরীর কাছাকাছি আসতে লাগলো বনবনানী ততই শ্যামলতর, নারিকেল কুঞ্জ ততই ঘনতর, দোলায়মান বেণুবনশ্রেণী ততই নবতর রূপ পরিগ্রহ করতে লাগলো। ভুবনেশ্বর স্টেশনের কাছে অনেকদূর পর্য্যন্ত মাকড়া পাথরের মালভূমি বা টাঁড় এবং এক প্রকারের সাদা ফুল-ফোটা ঝুপি গাছের ঘন সবুজ বন। বাংলাদেশের চেয়েও শ্যামল এসব অঞ্চলের তৃণভূমি ও বনানী। বনপুষ্পের বৈচিত্র্য তেমন চোখে পড়লো না। বর্ষার দিন, ভুবনেশ্বরের এদিক থেকে বর্ষা শুরু হয়েচে, ক্রমেই বৃষ্টি বাড়চে বই কমচে না। পুরীর ঠিক আগের স্টেশন হোল মালতীপাতপুর। উড়িষ্যার এই ক্ষুদ্র পল্লী যে একটি শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যভূমি শুধু তার ঘন নারিকেলকুঞ্জ ও শ্যাম বন-শোভায়—এ আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

পুরী স্টেশনে গজেনবাবু ও সুমথ এসে আমাদের নামিয়ে নিয়ে যেতে যেতে গল্প করচে—হঠাৎ সামনে দেখি অকুল সমুদ্রের নীল জলরাশি! সে কি পরম মুহূর্ত্ত জীবনের! সমস্ত দেহে যেন কিসের বিদ্যুৎ খেলে গেল। কল্যাণী দেখি হঠাৎ অবাক হয়ে হাঁ করে চেয়ে আছে। সমুদ্র দেখেছিলুম বহুকাল আগে কক্সবাজারে—আর এই ২০।২১ বছর পরে আজ পুরীর সমুদ্র দেখলুম।

সন্ধ্যায় ৺জগন্নাথের মন্দির দেখে এলুম। শ্রীচৈতন্য যেখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন, সে স্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে সর্ব্বশরীর যেন অবশ হয়ে গেল। আধ অন্ধকার গর্ভদেউলে বহু নরনারী দাঁড়িয়ে জগন্নাথের বিগ্রহ দর্শন করচে—ভক্তবৃন্দের মুখে হরিধ্বনি, নানা মন্দিরের গর্ভগৃহ, সেখানে ধোঁয়া প্রদীপের মিটমিটে আলোয় কত কি দেবদেবীর বিগ্রহ, যুঁই ফুল ও পদ্মমালার সুগন্ধ বাতাসে, বিরাটকায় পাষাণ দেউল, কোথাও সংস্কৃত স্তোত্র উচ্চারিত হচ্চে পাণ্ডাদের মুখে—আমাদের সঙ্গী পাণ্ডা বলচে এই নীলাচল, এখানে শুধু নীলমাধবের মন্দির তৈরি হয়েচে—বাইরের আনন্দবাজারে নারিকেলের তৈরি নানা রকম মিষ্টান্ন ভোগ ও তাদের সংস্কৃত নাম, প্রাচীন দিনের ভারতবর্ষ যেন এখানে বাঁধা পড়ে আছে।

সকাল থেকে দুর্য্যোগ চলচে। পুরীর বীরেন রায় একজন প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ। তিনি এবং কয়েকটি ভদ্রলোক এলেন গজেনবাবুর ওখানে, আমার সঙ্গে দেখা করতে। ধার্য্য হলো ওবেলা আমায় নিয়ে নাকি সম্বর্দ্ধনা করবেন, সেকথা বলে গেলেন।

বেরিয়ে ফিরবার পরেই অত্যন্ত বৃষ্টি শুরু হোল। এদিকে পাণ্ডাঠাকুরের ছড়িদার বলে গেল যে একটার সময় মহাপ্রসাদ পাঠাবে। ক্ষিদেতে নাড়ী জলে যাচ্ছে, বাইরে ভীষণ দুর্য্যোগ, মহাপ্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার নেই। অনেকক্ষণ পরে বৃষ্টি থামলো, প্রায় সাড়ে চারটে বিকেল—তখন 'কণিকা' প্রসাদ এল।

হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দর্শন করতে যাবার পূর্ব্বে কল্যাণী আমি উমা সবাই মিলে সমুদ্রতীরে অনেকক্ষণ বেড়িয়ে এলুম। কল্যাণী বহু ঝিনুক কুড়ুলে। অনেকদিন আগে এই দিনটিতে বারাকপুরে খুকু আমার সঙ্গে নাইতে গিয়ে 'মাটি আনি' বলে আমায় ফাঁকি দিয়ে ডাঙায় উঠে ছুট দিয়েছিল। তখন সে ব্যাপারটাতে কি দুঃখই হয়েছিল মনে। পায়ে হেঁটে চালকী চলে গিয়েছিলুম জাহ্নবীর ওখানে, মনে কষ্ট নিয়ে। আজ কোথায় জাহ্নবী, কোথায় সে খুকু, কোথায় বা সে দিনের মনের কষ্ট! জীবনে এক যখন চলে যায়, তখন বড়ই কষ্ট হয় প্রথম প্রথম, কিন্তু শীঘ্রই অপরদল এসে তাদের স্থান পূর্ণ করে—তারাই আবার হয়ে দাঁড়ায় কত প্রিয়।

গজেনবাবুদের সঙ্গে হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দেখতে গেলুম। শ্রীচৈতন্যদেব এখানে ছিলেন আঠারো বছর—তাঁর শ্রেষ্ঠ ভক্ত হরিদাস ঠাকুর যখন মারা যান, তখন তিনি নিজে তাঁকে কাঁধে নিয়ে এসে এখানে সমুদ্রতটে বালুকা খুঁড়ে সমাধিস্থ করেন। কালক্রমে এখন সেখানে বড় বড় বাড়ী হয়ে উঠেচে চারধারে। স্থানটি অতি শান্তিপ্রদ, মনে একটি উদাস পবিত্র ভাব এনে দেয়। দুটি বালক শিষ্য হাতে ঝুলি নিয়ে মালা-জপ করচে, তারাই সব দেখালে।

সেই পথেই পুরুষোত্তম মঠে গিয়ে পেছনের একটি অতি সুন্দর স্থানে বসলুম। ডাইনে দূর-প্রসারী ঝাউবন, পাশেই টোটা গোপীনাথের বাগানে অজস্র কাঁঠালগাছ, সামনে বিস্তৃত বালুচরের পারে অপার নীলাম্বুরাশি সফেন ঊর্ম্মিমালা বুকে নিয়ে তটভূমিতে আবার আছড়ে পড়চে। সে দৃশ্য দেখে আর চোখ ফেরাতে পারিনে, উঠতে ইচ্ছে হয় না। এই তো বিশ্বরূপের মন্দির, এই আকাশ, এই ঝাউবন, এই অপার নীল সমুদ্র। এ ছেড়ে কোথায় যাবো?

গজেনবাবু কেবল বলে, চলুন বিভূতিবাবু, সভার সময় হোল। সাতটাতে সভা।

মন্মথবাবু বল্লে—আপনাকে দেখচি ওঠানো দায়, সভার সব লোক এসে যে হাঁ করে বসে থাকবে—চলুন।

১০৮শ্রী তীর্থপতি মহারাজ এই পুরুষোত্তম মঠের মোহান্ত। তিনি বিলেতে গিয়েছিলেন গৌড়ীয় মঠ থেকে প্রচার করতে। তাঁর সঙ্গে বহু আধ্যাত্মিক আলোচনা হোল। বৈষ্ণবদের কি বিনয় ও ভক্তি। অত বড় পণ্ডিত বল্লেন হাত জোড় করে, আমি আপনাদের দাসানুদাস

হতে চাই। আবার কবে দেখা পাবো?

ওখান থেকে এসে সবাই গেলুম সভাস্থলে। ডাঃ অমিয় চক্রবর্ত্তী সভাপতিত্ব করলেন। আমার গলায় ফুলের মালা দিয়ে আমার রচনা সম্বন্ধে অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথা অনেকে বল্লেন। গজেনবাবু ও মিঃ পালিত বল্লেন, আমার 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' নাকি রোমা রোঁলার 'জাঁ ক্রিস্তফ'-এর চেয়েও বড়।

দিব্যি জ্যোৎস্নারাত্রে কল্যাণী, উমা, বীরেন রায়, গজেনবাবু, মন্মথবাবু সবাই মিলে একটা চায়ের দোকানে চা খেয়ে এলুম। উত্তাল সমুদ্রে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেচে, হু হু হাওয়া বইচে, যাকে বলে সত্যিকারের 'sea breeze' বা ডাচ 'Zee brugge' অর্থাৎ সমুদ্রের হাওয়া।

রাত্রে আবার ভীষণ বৃষ্টি। সকালে উমা ও কল্যাণী সমুদ্রে স্নান করতে গেল। ওরা সমুদ্রে স্নান করে খুব খুশি হয়ে এল।

একটু পরে বৃষ্টি কেটে গিয়ে বেশ রোদ উঠলো—উমাকে রেখে কল্যাণীকে নিয়ে আমি শ্রীমন্দির দর্শন করতে যাচ্চি, পথে ছাতার মঠ ও রাধাকান্ত মঠ দেখে বার হচ্চি, এমন সময় মহাদেববাবু পেছন থেকে ডাকচেন। সঙ্গে প্রতাপবাবু। আমরা গিয়ে এমার মঠ দেখি। ভারতবর্ষের মধ্যে এই মঠটি সবচেয়ে বিত্তশালী। কেমন নীচু-নীচু ঘরগুলি, দেওয়ালে নানারকম quaint ছবি আঁকা, পাথরের কারুকরা থাম, খাঁচায় টিয়া ময়না পাখী, শান্ত পরিবেশ—যেন প্রাচীন ভারতবর্ষের কোনো রাজপ্রাসাদ। তারপর গেলুম মন্দির দেখতে। গজেনবাবুর মা সেখানে উপস্থিত, তিনি বল্লেন, রত্নবেদী দেখবার দেরি আছে একটু, বৌমাকে নিয়ে একটু বোসো। একটি সাধু ভাগবত পাঠ করচেন, সেখানে খানিকটা বসি। তারপর মন্দিরের সব দিক ঘুরে ঘুরে দেখলুম বেলা বারোটা পর্য্যন্ত। মন্দির তো নয়, পাহাড়। ঐ আবার সেই কথা মনে পড়ে—প্রাচীন দিনের ভারতবর্ষ সেখানে যেন অচল হয়ে বাঁধা পড়েছে পাথরের বাঁধনে। গগনচুম্বী গম্ভীরা কি অসাধারণ শক্তি ও বিরাটত্বের পরিচয় দিচ্ছে! জগমোহনের কি গঠনভঙ্গি! নাটমন্দিরের সরল ও সহজ স্থাপত্যের মধ্যে একটি সখ্য ভাব জড়ানো। ভোগগৃহের সামনে সেই স্তম্ভ বর্ত্তমান আজও, যে স্তম্ভটিতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে শ্রীচৈতন্য প্রতিদিন জগন্নাথ দর্শন করতেন। পাণ্ডারা এক জায়গায় তাঁর হাতের আঙুলের ছাপ দেখায়—আমার বিশ্বাস হোল না যে সে তাঁর আঙুলের ছাপ—আর দেখালেই বা কি। শ্রীচৈতন্য এসেছিলেন অধ্যাত্ম বিষয়ে পথ দেখাতে, ধর্ম্ম-উপদেশ দিতে। তাঁর প্রচারিত নাম-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য যদি কেউ ভাল না বোঝে, তবে তাঁর হাতের আঙুলের ছাপ দেখে সে কোন্ স্বর্গে যাবে?

মন্দির দেখতে বেজে গেল সাড়ে বারোটা। কিছু কিছু মিষ্টান্ন ভোগ কিনে উমার জন্যে বাড়ী আনা গেল। ভোগ আসতে বড় দেরি হয়, আজও হোল—বেলা সাড়ে চারটার সময় ভোগ এল।

আজ সমুদ্রের উত্তাল রূপ। ঝড়বৃষ্টি কেটে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়েচে, সুনীল সমুদ্র

যেন নিজের আনন্দে নিজে মত্ত হয়ে বড় বড় ঢেউ তুলে কূলে আছড়ে আছড়ে পড়চে। দীর্ঘ টানা ঢেউয়ের রাশি মাথায় সাদা ফেনার পুঞ্জ নিয়ে বহুদূরব্যাপী একটি রেখার সৃষ্টি করেচে। দুপুর বেলায় কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের সেই রূপ দর্শন করলুম! মন্মথবাবু এসে বল্লে, চলুন চা খেয়ে আসি আর সস্তায় জুতো নিয়ে আসি মুচিপাড়া থেকে। ওর সঙ্গে বেরিয়ে হঠাৎ আবার সমুদ্রের সঙ্গে দেখা। আর আমি যেতে পারলুম না কোথাও। অবাক হয়ে চেয়ে বসে পড়লাম। কি বিরাটত্বের আভাস ওই দূরবিসর্পী নীল রূপের মধ্যে, ঊর্ম্মিমালার সফেন আকুলতায়, তটরেখায় বিলীয়মান শ্যামলিমায়। স্থলভূমির শেষ হয়ে গেল এখানে, দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত এই নীলাম্বুরাশির ওপার নেই, আবার এপারে এই এশিয়া মহাদেশের উত্তর প্রান্ত, ইনিসে ও লেনা নদীর মুখ। অবিশ্যি দক্ষিণ মেরু মহাদেশের তুষারাবৃত নির্জ্জন ভূভাগের কথা তুলচি নে এখানে। নুলিয়ারা সেই বিক্ষুব্ধ বীচিমালা পার হয়ে ডিঙিতে মাছ ধরে আনচে—একটা sword fish দেখলুম আনচে—প্রকাণ্ড করাতখানা ঝক ঝক করচে।

মুচিপাড়ার জুতো দেখতে গিয়ে একটা দোকানে বসে সবাই গল্প করচি। একটি পথ-চলতি লোক এসে হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে আছে। হঠাৎ দেখি সে গালুডির সেই হরিপদ ডাক্তার। অনেকদিন পরে দেখে খুব খুশি হই। বল্লে—বেড়িয়ে বেড়িয়েই জীবনটাকে নষ্ট করলুম বিভূতিবাবু।

সন্ধ্যাবেলা আমার এখানে আড্ডা বসলো—অনেকগুলি ভদ্রলোক এলেন আড্ডা দিতে—যদু মল্লিকের পৌত্র বৃন্দাবন মল্লিক প্রভৃতি। জ্যোৎস্নারাত্রে আবার সমুদ্রের ধারে গিয়ে কতক্ষণ গল্প-গুজব করি।

সন্ধ্যায় আজ বীরেন রায়, বৃন্দাবন মল্লিক, গজেনবাবু, মন্মথ ঘোষ প্রভৃতির সঙ্গে চক্রতীর্থে সমুদ্রতীরে বালির ওপর গিয়ে কতক্ষণ বসে ছিলাম। দ্বাদশীর জ্যোৎস্না সমুদ্রের উপর পড়ে তার তরঙ্গরাজির রূপ বদলে দিয়েচে, ধু ধু নির্জ্জন বালুচরের গায়ে আছড়ে এসে পড়চে ঊর্ম্মিমালা—চৈতন্যদেব চক্রতীর্থে সমুদ্রের এই রূপ দেখেই নাকি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন—আজ ৪৫০ বছর আগের কথা। সেই সমুদ্র এখনও ঠিক তেমনি আছে, সেই তরঙ্গ-ভঙ্গ, সেই নির্জ্জন বালুতট, সেই ঝাউবনশ্রেণী, সেই উদাস অস্পষ্ট চক্রবালরেখা।

বীরেন রায় আজ সকালে প্রাচীন তোসালি নগরের অনেক পুরোনো পুঁথি, পোড়ামাটির খেলনা, পাথরের মালা ইত্যাদি দেখালেন। উড়িষ্যার প্রাচীন শিলা সংগ্রহ ইনি করে এসেচেন চিরকাল ধরে। কত টাকা নষ্ট করেচেন এদের পেছনে অথচ ক্লিভ্‌ল্যাণ্ড মিউজিয়ম থেকে যখন ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে ওঁর সংগৃহীত জিনিসগুলি কিনতে চাইলে, তখন উনি তাদের না দিয়ে সামান্য ছ'হাজার টাকা নিয়ে আশুতোষ মিউজিয়মে দান করলেন। আজ গালুডির সেই হরিপদ-বাবু ভোরে আমার এখানে এসেছিলেন।

সবাই মিলে খুব আড্ডা দিয়ে চা খাওয়া গেল 'আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'-এ—তারপর ওরা

সব মুচিপাড়ায় গিয়ে জুতো দেখলে। বৃন্দাবন মল্লিক এসে রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরীতে নিয়ে গেল। চক্রতীর্থে জ্যোৎস্নায় বেলাভূমির বালুর ওপর বসে অনেকক্ষণ আড্ডা দেওয়ার পরে ফিরে এলুম আমার বাসায়। কত রাত পর্য্যন্ত সেখানে আড্ডা। বীরেন রায় একবার এক বড় বুদ্ধমূর্ত্তি জঙ্গলের মধ্যে কি ভাবে আবিষ্কার করেছিলেন, সে গল্প করলেন। হঠাৎ বুদ্ধের ধ্যান-প্রশান্ত সুন্দর মুখ দেখে বলে উঠলেন, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি। ঢেন্‌কানল স্টেটে এক প্রাচীন মন্দির দেখতে গিয়ে উনি পড়েছিলেন king cobra-র হাতে। ভগবান সর্ব্বভূতে আছেন ভেবে হঠাৎ নাকি মহিম্নস্তোত্র আবৃত্তি করতে আরম্ভ করলেন চোখ বুজে। অনেকক্ষণ পরে চোখ খুলে দেখলেন সর্প অদৃশ্য হয়েচে।

দুপুরের পরে শঙ্কর মঠে গিয়ে একটি চমৎকার গোপালমূর্ত্তি দর্শন করলুম। দোর বন্ধ রয়েচে দেখে আমি দোর খুলে গিয়ে মেজেতে চুপ করে বসলুম—কেমন একটি সুঘ্রাণ বেরুচ্ছে পুষ্প ও চন্দনের। শ্বেত প্রস্তরের মেজেতে ঠাণ্ডা ও শান্ত পরিবেশের মধ্যে গোপালের মূর্ত্তির সামনে বসে রইলুম কতক্ষণ।

সকালে উঠে সামনের ঘরের বুড়ো-বুড়ীকে নিয়ে হরিদাস ঠাকুরের মঠে গেলুম ও পুরুষোত্তম মঠে অনেকক্ষণ ধরে ধর্ম্ম-উপদেশ শুনলুম।

'যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী'। সর্ব্বদা জেগে থাকতে হবে। আলস্যই পাপ। আসবার সময় শঙ্কর মঠের শ্রীগোপাল বিগ্রহ দেখে চলে এলুম। ছোট্ট ঘরটিতে পুষ্প চন্দনের সুবাস। আহারের পর একটু বিশ্রাম করে কল্যাণী ও উমাকে নিয়ে যাচ্ছি—একটি বাড়ীতে কথকতা হচ্চে 'প্রহ্লাদ-চরিত্র'-এর। অনেকক্ষণ বসে শুনলুম। মন্দিরের কাছে হরিদাস ঠাকুরের সিদ্ধ বকুল দেখতে গেলুম। ৫০০ বছরের পুরোনো বকুল গাছ আজও দাঁড়িয়ে! মোহান্ত মহারাজের সঙ্গে আলাপ হোল। কলকাতার একটি সুন্দরী মহিলাকে 'মা' বলে মনটাতে বড় ভক্তি হোল।

আজ সকালে বীরেন রায়ের বাড়ী বসে তাঁর দুর্লভ প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহাবলী দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হোল, আজ না পয়লা আষাঢ়। চলুন গিয়ে কালিদাস উৎসব করা যাক্। এমন সময়ে এল বৃন্দাবন মল্লিক, বল্লে—আপনি বলেছিলেন 'দেবযান' পাঠ করবেন লাইব্রেরীতে—অনেক লোক এসে বসে আছে।

গেলুম। যাবার আগে সিদ্ধেশ্বরবাবুদের বাড়ী 'রমা ভিলা'তে গিয়ে খানিকটা বসলাম। ১৯২৩ সালে একবার সিদ্ধেশ্বরবাবুদের বাড়ী থেকে এখানে আসবার কথাবার্ত্তা সব ঠিক, আমি আমার মেস্ থেকে বাক্সবিছানা সব বেঁধে নতুন একটা শতরঞ্চি কিনে (যখন কিনি সুধার কাকা আবার তখন সেখানে উপস্থিত) মুটের মাথায় চাপিয়ে ওদের বাড়ী এসে দেখি সিদ্ধেশ্বরবাবুর জ্বর হয়েচে, যাওয়া হবে না। ১৯২৪ সালের পৌষ মাসে আর একবার ওরা

পুরী আসে, আমি যাই ভাগলপুরে। বরেন এসেছিল আমার স্থানে। ১৯৩৪ সালে সুপ্রভা ও তাঁর বাবা যখন আসেন, তখনও আমার আসবার সমস্ত ঠিক, সুপ্রভা চিঠি লিখলে, আমি পুরীর টিকিট পর্যান্ত কিনে আনলাম। সমুদ্রস্নানের জন্যে একটা কোমরবন্ধ পর্য্যন্ত কিনলাম কিন্তু আসা হোল না।

এতদিন পরে 'রমা ভিলা'তে এসে সেই সব পুরোনো কথাই মনে পড়ছিল। আজ আর কেউ নেই—কোথায় বা সেই সিদ্ধেশ্বরবাবু, কোথায় বা অক্ষয়বাবু। এত সাধ করে 'রমা ভিলা'র সদর ফটক সেবার ১৯২৩ সালে করানো হোল—ওরা কোথায় চলে গেল! গেটটি আজও আছে দেখে এলুম।

লাইব্রেরীতে কালিদাস উৎসব সম্পন্ন হোল। প্রিয়রঞ্জন সেনের দাদা কুমুদবন্ধু সেন বক্তৃতা দিলেন। আমি কিছু বললাম সভাপতি হিসাবে। মনে পড়লো বারাকপুরে গ্রীষ্মের ছুটি অতিবাহিত করবার সময়ে প্রতি বৎসর খুকুর কাছে বলতাম—আজ ১লা আষাঢ়, খুকু এসো কালিদাসকে স্মরণ করি। এতকাল পরে ভাল করেই স্মরণ করা হোল কালিদাসকে। বিকেলে আবার খুরদারোড থেকে আমাকে নিতে এল—সেখানেও ওবেলা 'বর্ষা-মঙ্গল' অনুষ্ঠিত হবে। পুরী থেকে তো কাল চলেই যাবো। খুরদারোড পর্য্যন্ত ফার্স্ট ক্লাসে নিয়ে গেল রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়কে, তুষারকান্তি ঘোষকে এবং আমাকে। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, গুমট বেশ। ডাঃ সরকারের বাংলোর বাইরের মাঠে সবাই মিলে জমিয়ে আড্ডা দেওয়া হোল। রাধাকুমুদবাবু ও তুষারকান্তিবাবু ভূতের গল্প আরম্ভ করলেন—রাত সাড়ে দশটায় সভা। আমার প্রথম বক্তৃতা—সবাই খুব হাততালি দিলে। মহাদেব রায়ের বক্তৃতা অতি চমৎকার হয়েছিল।

পরদিন সকাল আটটার সময় থেকে সারাদিন ট্রেনে। মহানদী ও কাটজুড়ি নদীদ্বয়, দূরের নীল শৈলমালা, কাটজুড়ির বিস্তীর্ণ বালুচর ও তার ধারে সুদৃশ্য কটক শহরটি বেশ লাগলো। সারাদিন চলেচে ট্রেন, সন্ধ্যার কিছু আগে সুবর্ণরেখা পার হয়ে বাংলাদেশে পড়লাম। অমরদা' রোড্ স্টেশন থেকে কয়েকটি গোরা সৈনিক উঠলো এবং সারারাত গানে-গল্পে তাদের সঙ্গে বেশ কাটানো গেল।

ভোরে সাঁতরাগাছি। টিকিট নিয়ে নিলে এখানে এবং হাওড়া নেমেই সোজা শেয়ালদ' হয়ে বারাকপুরে চলে এলুম। এতদিন পরে ইছামতীতে স্নান করে বড় তৃপ্তি হোলো। কোথায় ভুবনেশ্বরের কুচিলা বন, খণ্ডগিরি উদয়গিরির গুহাবলী, পাথার তীর্থ পুরীর নীলাম্বুরাশি—আর কোথায় নলখাগড়া বন্কেবুড়ো গাছের সারি ও ইছামতী নদী।

বিকেলে নদীর ধারে নিবারণের পটলের ভুঁইয়ে বসে রইলুম কতক্ষণ। শান্ত বর্ষা, শ্যামল গাছপালা। বিশ্বরূপের আর এক রূপ এখানে। কুঠীর মাঠে সেই জায়গাটায় গেলুম যেখানে খুকুর আমলে একটা বালির ঢিবি ছিল, খেঁকশেয়ালীতে গর্ত্ত করেছিল—আমি গিয়ে বসতুম।

বাদলা নেমেছে—মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। ইন্দু রায় ও হাবু-ফুচুকে সঙ্গে নিয়ে মাছ ধরতে যাই। হাবু ও ফুচুর সঙ্গে কালও গিয়ে কাঁচিকাটার পুলের নীচে কচুরিপানার জড়ো করা স্তূপের উপর বসে আরামডাঙার শ্যামল মাঠ ও খেজুর গাছের সারিরদিকে চেয়ে মনে হলো এ যেন ঠিক সেই বিলিতি ছবিতে South-sea Island-এর দৃশ্য দেখচি। বর্ষা-সতেজ কচি ঢোঁচরা ঘাসগুলো জলের ধারে কেমন বেড়ে উঠেচে আর তার কি শোভা। একটা রাখাল ছোঁড়া মরাগাঙের ধারের ক্ষেত থেকে কাঁকুড় তুলে খাচ্চে দেখে হাবু তাকে কেবল বলতে লাগলো—ও ভাই, একটা কাঁকুড় দে না তুলে ক্ষেত থেকে।

অনেক অনুরোধ উপরোধে সে একটা মাঝারি সাইজের কাঁকুড় তুলে নিয়ে আসতেই হাবু ও ফুচু সেটার ভাগ নিয়ে ঝগড়া বাধালে। প্রবহমান ক্ষীণকায়া তটিনীর কূলে বসে পুঁটিমাছ ধরা ছোট্ট ছিপ ফেলে মাছ ধরি আর কাঁচা কাঁকুড় খাই—বেশ লাগে এ জীবন!

আজ বেলা তিনটের সময় ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি ও সেই সঙ্গে ঝড়। ঝড়বৃষ্টির কোনো কামাই নেই আষাঢ় মাস পর্যন্ত। দিনগুলি ঠাণ্ডা, সজল বাতাস বয় সারাদিন। আজ মেঘবৃষ্টির পরে বেড়াতে বার হই বাঁওড়ের ধারের পথ দিয়ে নতিডাঙার সেই বটগাছটা পর্যন্ত। সেই বিশাল প্রাচীন মহীরুহ তার ঘন সবুজ শাখা প্রশাখা বিস্তার করে আছে মজা নদীর ধারে, দূর বিস্তৃত মাঠে আউশ ধানের জাওলা বেড়ে উঠেচে, যেদিকে চাই সেদিকেই ঘন শ্যাম ভূমিশ্রী—আর সকলের ওপর উপুড় হয়ে আছে আষাঢ়ের ঘন কালো মেঘ। কি নব নীল নীরদ-মালা, দেখে মনে হল তখুনি বিশ্বশিল্পীর এ শিল্প আমি যদি না দেখি, তবে এ পাড়াগাঁয়ের কেউই আর দেখবে না। শিল্পী হিসাবে, কবি হিসাবে আমার কর্তব্য হচ্চে এই অদৃশ্য সৌন্দর্য্যের অপরাজিত আয়তনের সঙ্গে ভাল করে পরিচিত হওয়া। মেঘের কোলে এক জায়গায় সাদা বক উড়চে—ঠিক বেলে-ডাঙার পুলটার কাছে। খেজুর গাছ আছে একটা সেইখানে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসচি। অবাক হয়ে গেলুম উড়ন্ত বক দুটিকে সেই বর্ষার মেঘ থম্‌কানো অপরাহ্নে কাজল কালো মেঘের গায়ে উড়তে দেখে। জগতে এত সৌন্দর্য্যও আছে। কোথায় এর তুলনা? ধন্যবাদ হে মহাশিল্পী, তুমি আজ আমাকে তোমার সৃষ্ট রূপজগৎকে দেখবার সুযোগ দিলে। এর ভাষা সৌন্দর্য্যের ভাষা, কি বলতে চায় এ মুখর প্রকৃতি—এই বন, মেঘ, তৃণাবৃত প্রান্তর, উড়ন্ত বক, খেজুর গাছের সারির মধ্যে দিয়ে নীরব গম্ভীর ভাষায়, তা যে কান পেতে শুনতে চায় সে শুনতে পাবে। কিন্তু ঐ যে বাগ্‌দীরা মরগাঙের ধারে বসে মাচা বেঁধে সারি সারি জলি ধান পাহারা দিচ্চে—ওরা কেউ শুনতে চায়ও না, পারও না।

সকালবেলা আজ বাঁওড়ের ধারের পথে বেড়াতে গেলুম। নীল আকাশ, গাছপালার প্রাচুর্য্য, বনবিহঙ্গের কূজন আমার মনকে অপূর্ব্ব আনন্দ রসে অভিষিক্ত করে রাখলে। একস্থানে বসে চারিধারে চেয়ে চেয়ে দেখি—কি চমৎকার অপরূপ সৌন্দর্য্যশিল্প ভগবানের। কুঠীর মাঠে পেয়ারা গাছটার তলায় এসে বসলুম নরম সরস সবুজ ঘাসের ওপর গামছা পেতে। যেন কত বন, এমন সবুজ তেলাকুচা লতায় সাদা সাদা ফুল ও ঝলমলে সূর্য্যালোকে প্রজাপতির

আনন্দ-নৃত্য দেখে দেখে সারাজীবন কাটিয়ে দিলেও আমার আনন্দ কখনও পানসে হয়ে যাবে না—এই রৌদ্রদীপ্ত প্রভাতের আনন্দ, এই তরুলতার শ্যামল রূপের আনন্দ, নীল আকাশের আনন্দ।

বিষম বর্ষা কমেচে আজ ক'দিন। বিরাম-বিশ্রামহীন বর্ষা, মেঘমেদুর আকাশ। কাল আমরা (কল্যাণী, তিনু ও আমি) বিকেলে কুঠির মাঠ দিয়ে মরগাঙের খাল পার হয়ে আরাম-ডাঙা বলে ছোট মুসলমানের গ্রামটিতে বেড়াতে গিয়েছিলুম। একটা বাড়ীতে বৌয়েরা কল্যাণীকে খুব যত্ন করে পিঁড়ি পেতে দিলে, পান সেজে দিলে, একটা কাদের ছোট ছেলে এনে ওর কোলে দিয়ে আপ্যায়িত করলে। বেশ লাগলো ওদের সরলতা। মরগাঙের ধারে যখন বসেচি, তখন সবুজের কি বিপুল সমারোহ চারিদিকে! সামনে আরামডাঙা, ওদিকে বেলেডাঙা যেন সবুজের সমুদ্রে ডুবে আছে। যখন আমাদের ঘাটের কাছাকাছি এসেচি, তখন মেঘের ফাঁকে আষাঢ়ী পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র একটু'একটু উঁকি মারচে—মেঘভাঙা সেই জ্যোৎস্নাতেই আমরা নদীজলে স্নান করতে নামলুম। সন্ধ্যায় ট্রেন যাওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। কিন্তু গতকাল রাত্রে জ্যোৎস্নার কি অপূর্ব্ব শোভা রাত দশটার পর দেখা দিল সারাদিনের বৃষ্টিস্নাত আকাশে। বাইরের রোয়াকে দাঁড়িয়ে দেখি আনন্দ পাতা, সজ্‌নে গাছ, বাঁশঝাড়, বনকাপাসের ডাল—এ সবের ওপর সেই অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নার কি শোভা—বিশ্বরূপকে একেবারে প্রত্যক্ষ করলুম সামনে। ছেলেবেলা যখন পাঁচড়া হয়েছিল—তখন এ সময় দেশে ছিলুম, আর কখনো থাকিনি।

আজ বড় সুন্দর শরতের রোদ। নাইবার পূর্ব্বে পেয়ারাতলায় গিয়ে বসি কুঠীর মাঠে, প্রজাপতি উড়চে ফুলে ফুলে। শ্যামল বনঝোপ কি সুন্দর চারিদিকে। কে যেন এসে পেছন দিক থেকে চোখ টিপে ধরবে সব সময়েই মনে হয়। উঠে আসতে ইচ্ছে করে না—কি সৌন্দর্য্য! ঘাটে এসে যখন স্নান করতে জলে নামি—তখন নদীর ওপারের নীল শোভা হৃদয় মুগ্ধ করে দিলে। কাল বনগাঁ থেকে জমি কিনে ফিরে আসবার পথে ইন্দু বারিক, আমি ও সন্তোষ খুব ভিজে গেলুম ঝড়-বৃষ্টিতে।

পরশু নুটু ধলভূমগড়ে ফিরে গেল। অনেকদিন পরে সে দেশে এসেছিল—দিন চারেক ছিল। একদিন ইন্দুর সঙ্গে বেলেডাঙার ধারের সেই সুন্দর জায়গাটাতে বেড়াতে গিয়েছিলাম—একদিন মরগাঙে আমাদের কেনা জমিগুলোতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। পরশু বিকেলে ইন্দু, মধু কামার ও খুড়ো মাছ ধরচে—আমি বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে হাজির। আকাশের এই অদ্ভুত রং ও রচনার তলায় দলে দলে মানুষে এই রকম মরগাঙের ধারের মত জাল ফেলচে, ছিপে মাছ ধরচে, যুগল ঘোষের মত গরু চরাচ্চে, তামাক খাচ্চে, পটলের ভুঁই নিড়ুচ্চে—এমনি ঝিঙের ক্ষেতে হলুদ ফুল ফুটচে, কত শত বছর থেকে ভরসন্ধ্যেবেলা—এমনি

শান্ত, অনাড়ম্বর জীবনধারা চলচে।

কাল উষার পত্র পেলুম লাহোর থেকে, ম্যাট্রিক পাশ করেচে খবর দিয়েচে। সুখী হলুম খবর পেয়ে। সামনের শনিবারে পাথুরেঘাটার অক্ষয় ঘোষের ছোট মেয়ে বুড়ির বিয়ে। সেখানে নিমন্ত্রিত আছি, যেতে হবে শনিবারে।

ক'দিন ভীষণ বৃষ্টির পরে আজ দুদিন আকাশ একটু পরিষ্কার হয়েচে। গত শনিবার ২৬শে শ্রাবণ অক্ষয়বাবুর মেয়ে ছোট বুড়ির বিয়ে হয়ে গেল—সেখানে রামজোড়, ছট্টু সিং, সরণপ্রসাদ, যুগল তাদের সঙ্গে দেখা। বহুদিন পরে ইসমাইলপুরের সেই আবহাওয়া যেন ফিরে এল। আগামী শনিবারে এখান থেকে ঘাটশিলা যাবো, স্থটু চিঠি লিখেচে।

পরশু ফণি কাকা মাছ ধরতে গিয়েছিল সুন্দরপুরের নীচে মরগাঙে, আমি তার খোঁজে সুন্দরপুর পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম। ওপথে অত দূর অনেকদিন যাইনি। বন কলমীর ফুল ফুটেচে ঝোপের মাথায়, চারিধার ভরপুর সবুজ, কি অদ্ভুত শোভা ঝোপগুলির। এই ঝোপ-ঝাপ এ অঞ্চলের একটি বৈশিষ্ট্য—এর সৌন্দর্য্য বর্ষাকালে যে দেখবে সে মুগ্ধ হবে। আর আমার সেই পেয়ারাগাছের তলাটা। সেখানে ছোট ছোট পাতাওয়ালা ভ্যাদ্‌লা-ঘাস্ হয়েচে, যেন সবুজ মখমলের আসন বিছানো, মাথার ওপর নত হয়ে আছে পেয়ারা ডালটি। সুরেনদের বাড়ীর পেছনে আর একটা ঝোপে বনকলমী ফুটেচে দেখে সেদিন আমি আর চোখ ফেরাতে পারিনে। বিশ্বশিল্পীর এই অপূর্ব্ব সৃষ্টির ও সৌন্দর্য্যের প্রকাশ মনের গভীর অন্তস্তলে সচেতন ভাবে গ্রহণ যে করতে পারে, এ পৃথিবী, ফুলফল, নীল আকাশ, উদার ভূমিশ্রী তার কাছে আপনরূপে ধরা দেয়।

কাল কলকাতা গিয়েছিলুম—সকালে গিয়ে রাত ন'টায় ফিরি। আজ ক'দিন থেকেই আমাদের ঘাটে নাইতে গিয়ে সাঁতার দিয়ে চলে যাই, কূলে কূলে ভরা নদীর ধারে বনঝোপ, সাঁইবাবলা গাছ, নীল আকাশ, শরতের রোদ, ঘুঘুর ডাক—সত্যিই যেন বহুকাল পূর্ব্বেকার বিস্মৃত বাল্যদিনে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। সাঁতার দিয়ে বাঁশতলায় উঠি, তারপর নিভৃত বনচ্ছায়ায় একস্থানে একটি বনকলমী ফুলের ঝোপের কাছে বসে রইলুম, ওদিকে কি একটা গাছের মাথায় মাকাল লতা উঠে কেমন একটা চমৎকার ঝোপের সৃষ্টি করেচে। রোদ না থাকলে, নীল আকাশ না থাকলে কি শরৎ মানায়? এতদিন শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি! গরম রোদ হবে, লতা-পাতার কটুতিক্ত গন্ধ বার হবে, তবে শরতের স্বপ্নলোক নামবে নীল আকাশের অনন্ত মুক্তির চন্দ্রাতপতলে।

আজ কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে সেই পেয়ারা গাছটার তলায় চুপ করে বসি—গাছে উঠিও। গাছে উঠলে যেন অন্য মানুষ হয়ে যেতে হয়—বন্য-প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ যেন আরও নিবিড় আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। নিবারণের ভুঁই থেকে জলে নামলুম ও সাঁতার দিতে দিতে কত নল-খাগড়ার বন, ভাসমান কচুরিপানার দাম, কলমীলতার পাশ কাটিয়ে

দোদুল্যমান কত বাবুই পাখীর বাসা, নীল আকাশের তলায় শরৎ মধ্যাহ্নের শুভ্র মেঘস্তূপের দিকে চেয়ে চেয়ে এসে পৌছুলাম বনসিমতলার ঘাটে।

অভিলাষ জেলে ওপারে দোয়াড়ি ঝাড়তে ঝাড়তে বলছে—বাবু যোলার গাঙে এমন ভেসে বেড়াচ্চেন কেন? কত আপদ বালাই থাকে, বিপদের কথা কি বলা যায় বাবু? অমন বেড়াবেন না।

অপূর্ব্ব শান্তি ও আনন্দ পাই প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মভাবে এমনি ধারা মিশিয়ে দিয়ে।

বিকেলে আজ বাঁওড়ের ধারে বেড়াতে গিয়ে সেই অশ্বত্থ গাছটার ওপর উঠে বসলুম খানিকক্ষণ। দূরে বাঁওড়ের নির্ম্মল জল, আমার চারিপাশে নিস্তব্ধ বনানী। এক জায়গায় কি অজস্র বনকলমী ফুলই ফুটেচে! জেলেপাড়ার ঠিক পেছনের মাঠটাতে। শাকারীপুকুরের রাস্তা দিয়ে ঘন বনের মধ্যে দিয়ে চলে এলুম।

আজ দুপুরে তুলা সাঁওতালের সঙ্গে হেঁটে এলুম বরাজুড়ি। শরতের নীল আকাশ, দূরে দূরে নীল শৈলশ্রেণী, বাটাইজোড় পার হয়ে ঢ্যাংজুড়ি সারাডোবা প্রভৃতি সাঁওতালী গ্রাম পার হয়ে গেলুম অবশেষে বরাজুড়ি বলে গ্রামে, খোলার অর্ডার দিতে। খোলা অর্থাৎ চাল ছাইবার খাপরা। কি সুন্দর গ্রামটি, ঢুকেই আমার ভাল লাগলো, ছায়া নেমে এসেচে শরৎ অপরাহ্ণের মৌলবনে ও শালবনে, দীঘিতে রক্ত মৃণাল ফুটেচে, শ্যাম ধানের ক্ষেত ঠেকচে সুদূরের নীল শৈলমালায়। কার্ত্তিক গোরাই বলে একজন দোকানদার আমাকে খাতির করে চা খাওয়ালে —বল্লে, ধানের জমি বড় সস্তা। দোকানে লোকে এ বিশ্বব্যাপী দুর্দ্দশার দিনে ঘটি বাটি বাঁধা রেখে ছোলা, কলাই (এ দেশে বলে বিরি) নিয়ে যাচ্চে। সন্ধ্যার আগে চলে এলুম। তখন বেশ ছায়া নেমেচে, গুটকে কেবলই মংলার নিন্দে করচে সারাপথ। আজ এসে পড়লুম সেই চমৎকার কথাটি—

"On the contrary, the wise man is conscious of himself, of God. If the road I have shown to lead to this is very difficult, it can yet be discoverd. And clearly it must be very hard when it is so seldom found. For how could it be that it is neglected practically by all, if salvation were close at hand and could be found without difficulty? But all excellent things are as difficult as they are rare,

Ethics—Spinoza.

"The really valuable things in human life are individual—what is of most value in human life is more analogous to what all the great religious teachers have spoken of."

Power—Bertrand Russel.

"The ultimate realities of the universe are at present quite beyond

the reach of science, and probably are for ever beyond the comprehension of the human mind." —Sir James Jeans.

"There can never be any real opposition between religion and science; for the one is the complement of the other…It was not by accident that the greatest thinkers of all ages were deeply religious souls."

Max Planck.

ওপরের কথাগুলো সমর্থন করে আমারই অনুভূতির, যে অনুভূতির কথা আমি এই ডায়েরীর নানা স্থানে নানা আকারে লিখেচি। সেই স্তব্ধ চিন্ময় ভাবলোক যার সন্ধান মেলে নদীতীরে নেমে-আসা অপরাহ্ণের নির্জ্জনতায়, বনঝোপে ফোটা বনকলমী ফুলের উদাস শোভায়, আঁধার নিশীথে মাথার ওপরকার জলজ্বলে নক্ষত্র ছিটানো ছায়াপথের বিরাট ইঙ্গিতে। যে জীবনরহস্যের মূল ঊর্দ্ধাকাশে, শাখা প্রশাখা ধরণীর ধূলিতে।

মিঃ সিন্‌হার মোটরে আমি ও কল্যাণী ধলভূমগড়ে হুটুর বাসায় এসে দেখি গুটুকে, মংলা ও গোপাল উপস্থিত। ওখানে বিকেলের দৃশ্যটি বেশ চমৎকার হয়েচে; চা খেয়ে চলি আবার মোটরে, চাকুলিয়া থেকে বর্ষাস্নাত বনের দৃশ্য দেখতে দেখতে মান সমুড়িয়া হয়ে বহরাগড়া ডাক-বাংলো পৌঁছে গেলুম। সেদিন কত রাত পর্য্যন্ত গল্প করি। পরদিন অর্থাৎ গতকাল খাড়া মৌদা হয়ে বম্বে রোড দিয়ে দুধকুণ্ডী রিজার্ভ ফরেস্টের বাংলোতে। খড়ের ঘাটোয়ালি বাংলো, চারিধারে আম ও ফলবান বৃক্ষের কুঞ্জ। নিকটেই বন আরম্ভ হয়েচে, জানালা দিয়ে চোখে পড়চে—এতোয়া বৃষ্টিস্নাত বনভূমি থেকে বন্য শনের ফুল ও বন্য কলাফুলের মত কি ফুল নিয়ে এল। বৃষ্টি পড়চে—কল্যাণী রবীন্দ্রনাথের 'মালঞ্চ' পড়চে, আমি টেবিলে বসে ভাবচি, এ যেন আমার ক্রীত মৌজা, ওই বন আর এই ঘাটোয়ালি বাংলো যদি আমার থাকতো এমন নির্জ্জন স্থানে তবে লিখবার কত সুবিধাই না হোত। কতক্ষণ পরে মিঃ সিন্‌হা বন তদারক করে ফিরে এলেন, আমরাও একটা বনের মধ্যে যেতে যেতে বনবিভাগের রোপিত বোনা গাছ ও শিশুগাছ দেখলাম। বিকেলে বাংলোতে বেড়াতে এলেন হেডমাস্টার মহাশয়। কাল এখানে মিটিং আছে। কি থৈ থৈ করচে space এখানে ডাকবাংলোর আশেপাশে। অস্ত আকাশের রং অতি অদ্ভুত। গত ফেব্রুয়ারি মাসে দৃষ্ট সেই সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়ে দেখি আশ্রমটা একেবারে ভেঙে পড়ে গিয়েচে, চালের খড় খসে পড়চে, আমরা সন্ধ্যার পরে আসবার সময় দুটি ছোকরাকে সেখানে দেখলুম—সেই অন্ধকারে ঘরের মধ্যে তারা কি করচে? ওরা নাকি ওখানে আমোদ করতে এসেচে। এই ভাঙা বাড়ীতে এরা গল্প করে বসে। আমাদের তখনই মনে সন্দেহ হোল—পরে শুনলুম ওরা ওখানে বসে গাঁজা খায়। মৃদু জ্যোৎস্নালোকে কতক্ষণ সাঁকোর ওপর বসে ভগবদ্বিষয়ে চর্চ্চা করি। কত রাত পর্য্যন্ত গল্প করলুম বাংলোতে বসে।

সকালে মেঘ ও ঠাণ্ডা দিন। মোটরে কল্যাণী, আমি ও মিঃ সিন্‌হা চলে গেলুম কেশরদা বাঁশবনে।· এই বিরাট বাঁশবনের রোপণ ইত্যাদি কাজ বনবিভাগ থেকে করা হয়েচে। ফুরুল হক Ranger বল্লে—হুজুর, দু'হাজার কাঁটালের চারা পোঁতা হয়েচে।

আমরা কেশরদা গ্রামে চলে গেলুম। এই গ্রামটি বাঙালী ও উড়িয়া অধিবাসীদের গ্রাম। কথার মধ্যে অনেক উড়িয়া শব্দ মেশানো। আমাদের মোটর যেতে অনেক লোক এল—বল্লে, এবার খাদ্যের অভাবে বড়ই কষ্ট হয়েচে লোকের। কল্যাণীকে নিয়ে গ্রামদেবী স্বর্ণ বাউড়ীর মন্দির দেখি। বহু পুরোনো মূর্ত্তি—নাকমুখ ভাঙা, মন্দিরের আশে পাশে অমন ছোট-বড় কত মূর্ত্তি পড়ে আছে। কৃষ্ণ পাণ্ডা বলে ওই মন্দিরের পূজারীর বাড়ী আমরা গিয়ে বসলুম। ওরা কল্যাণীকে নামিয়ে নিয়ে গেল। মাটির ঘর, দেওয়ালে সুভাষ বসু ও গান্ধীর ছবি। একটা লোকের বোধ হয় জ্বর হয়েচে, সে খাটিয়ায় শুয়ে আছে—বল্লে, ম্যালেরিয়া নয়, কারণ ম্যালেরিয়া জ্বর এখানে নেই। কঙ্কালসার ছোট ছোট ছেলে মেয়ে এল ২৫।৩০টি, এরা নাকি ডোমদের ছেলে, সারাদিন ভিক্ষে করে বেড়ায়; এক এক মুঠো সবাই দেয়। চিন্তামণি পাণ্ডা এক ধামা মুড়ি নিয়ে ছেলেদের এক এক মুঠো মুড়ি সবাইকে দিলে, তারপর তারা কাঠ ও গরু চরানো নিয়ে দুঃখ করলে। আমাকে পাণ্ডাঠাকুর বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে চিঁড়ে, দই ও দুধ খাওয়ালে। একটা ঘরে নিয়ে গেল, বেতের ঝাঁপি যে কত রয়েচে সারি সারি—৺পুরীর দোকানেই সেই বেতের ঝাঁপির মতো। কোনো ঘরে একটা দরজা জানালা নেই, অন্ধকার সব ঘর। বেলা একটার সময় ওখান থেকে ডাকবাংলো গিয়ে স্নানাহার সেরে নিই। তখনই একটা স্কুলের ছেলে ডাকতে এল, আমরা গেলুম মিটিং এ। হেডমাস্টারের বাড়ীতে চা ও খাবার খেলুম সাহিত্য সভার পরে। গ্রীক যুবক হেলিওডোরাসের যেন আবির্ভাব হোল বহু শতাব্দী পরে।

সন্ধ্যার সময় কল্যাণীকে নিয়ে সুবর্ণরেখার এপারে বোনালি ঘাটে গিয়ে বসলুম। ওপারে ময়ূরভঞ্জের শৈলমালা, বড় একটা শৈলমালার ওপর প্রকাণ্ড একখানা কালো মেঘ ঝুঁকে পড়ে আছে। এপারে মাঠে নিসিন্দে গাছের বেড়াব ধারে বসে আছি। ভগবানের উপাসনা করলুম সেখানে। কল্যাণী গাইলে, যো দেবাগ্নৌ যোহপ্সু ইত্যাদি উপনিষদের সেই গম্ভীর বাণী।

জ্যোৎস্না উঠেছে—চতুর্থীর ভাঙা চাঁদ। কিন্তু থৈ থৈ করচে মুক্ত space বহরাগড়া ডাক-বাংলোর সামনে। কত রাত পর্য্যন্ত আমরা জেগে বসে থাকি রোজ রোজ—এমন দূরপ্রসারী space আর কোথায়? জ্যোৎস্নারাত্রে আমরা বেড়াতে গেলাম সেই সন্ন্যাসীর ভাঙা আশ্রমটির কাছে।

সকালে বহরাগড়া থেকে বেরিয়ে ধলভূমগড়ে স্টুটুর মেডিক্যাল ক্যাম্পে এলুম। সেখানে ভাত খেয়ে আবার মোটরে বার হই। একটা কুলীর মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েচে ডিনামাইট ফাটাতে গিয়ে। কল্যাণী তাকে দেখে বড় কাতর হয়ে পড়লো। ধলভূমগড়ের ক্যাম্পটি

বেশ জায়গায়! সামনে দূরবিস্তৃত শালবন ও সবুজ ধানবন। আজ চাকুলিয়ার হাট, সাঁওতাল মেয়েরা ঝাঁটা নিয়ে বিক্রি করতে আসচে চাকুলিয়ার হাটে। কল্যাণী কেবল বলচে, ঝাঁটা কিনলে হোত!

ওখান থেকে এলুম ঘাটশিলা। বেলা ৫টার সময় চা খেয়ে আবার মোটরে বার হই এবং সুবর্ণরেখা সেতু পার হয়ে রাখা মাইন্‌স্‌ মিলিটারী ক্যাম্পে লেফ্‌টেনান্ট জহুরী ও বোসের আতিথ্য গ্রহণ করি।

সকালে রাখা মাইন্‌স্‌ থেকে চা খেয়ে বার হয়ে কালিকাপুর রোড আপিসে এসে গল্পগুজব করি। সেখানে হেলিওডোরাসের গল্পটি পাঠ করি। বেশ জায়গা কালিকাপুর। চাইবাসা এলুম বেলা বারোটার সময়ে। দ্বিজুবাবু এলেন ঘাটশিলা থেকে—খুব মিটিং হোল। সারা রাত্রি কোলহান পার্কে রাত জেগে আবৃত্তি ইত্যাদি করা গেল ও শেষ রাত্রের জ্যোৎস্নালোকে চলে এলুম মোটরে চক্রধরপুর। দ্বিজুবাবুকে নামিয়ে দিয়ে আমরা সেই অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নালোকে পোড়াহাট পাহাড় ও বনানীর মধ্যে দিয়ে হেসাডি বাংলোতে পৌছুলুম। মোটরে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল আজ আমাদের দেশের হাটবার ছিল।

মোটরেই ঘুমিয়ে নিলাম। ভোর হোল—চা খেয়ে চলে এলুম হিড্‌নি falls-এ। স্থানটির কি অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য। উত্তুঙ্গ শৈলগাত্র বেয়ে এই বড় ঝর্ণাটা পড়চে—চারিপাশে ঘন বনানী, চুণা পাথরের ধ্বসে পড়া চাঁই। স্নান করার সময়ে রাঁচির হুড্রু জলপ্রপাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বনের মধ্যে দিয়ে সরু পায়ে চলার পথ বেয়ে আমি, সুবোধবাবু, মিঃ সিন্‌হা ও পরেশ সান্যাল চলে এলুম। জলপ্রপাতের এপারে পাথরের আসনে বসে লিখচি। জলপ্রপাতের গভীর শব্দ বনের বনস্পতিতে প্রতিধ্বনিত হচ্চে যুগ-যুগান্তের বাণীর মত। কি গভীর শোভা! এক ধারে বনে অসংখ্য Lantana Camera ফুটে আছে। কানের কাছে সুবোধ কেবল বলচে, চলুন ফিরে যাই, চলুন ফিরে যাই। এই নির্জ্জন বনের মধ্যে এই অপূর্ব্ব গম্ভীর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে বসে সেই সৌন্দর্য্য-স্রষ্টার উদ্দেশে প্রার্থনা নিবেদন করি। এই স্থানে বনের পরিবেশের মধ্যে বসে তাঁর কথাই আগে মনে পড়ে। ওপরে নীল আকাশ, চারিদিকে বনশ্রেণীর নির্জ্জনতা—সত্যিই হরি রায়ের কথা, আমাদের গ্রামের বহু হতভাগ্যের কথা এখানে না মনে হয়ে পারে?

এবার এই ক'দিনের মধ্যে কত জায়গায় বেড়ালুম। বহরাগড়ার সেই মুক্ত space, কেশবদা গ্রামের সেই উড়িয়া পাড়ার বাড়ী, ধলভূমগড়ের মুক্ত সবুজ ধানের ক্ষেত্র ও শালবন, রাখা মাইন্‌স্‌-এর মিলিটারি ক্যাম্পে চাঁদ ওঠা রাত্রে বোসের সঙ্গে গল্প করচি। সকালে এলুম কালিকাপুর, সেখান থেকে চাইবাসা, আবার কল্যকার মত শেষরাত্রের জ্যোৎস্নালোকে চাইবাসা থেকে ৪২ মাইল দূরবর্ত্তী হেসাডি বাংলোতে মোটরে আগমন পোড়াহাট অরণ্যের মধ্যে দিয়ে—তারপর আজ এই হিড্‌নি জলপ্রপাতের স্নান সকালবেলা!

চলার গান সার্থক হোক জীবনে। চরৈবেতি।

সামনে চেয়ে দেখি উত্তুঙ্গ শৈলগাত্রের গায়ে থাকে থাকে ঘনশ্যাম বনানী, রাঙা পাথর ও মাটির কম্পিত পর্ব্বতগাত্র, অনেক উঁচুতে বড় বড় বট অশ্বত্থের মত বনস্পতি, তার ওপরে শরৎ দুপুরের নীল আকাশ, পাশেই বিশাল হিড্‌নি প্রপাতের তুলোর বস্তার মত দ্রুত নীয়মান জলধারা, তার ডানপাশে আবার বন, তার নীচে ল্যাণ্টানা ক্যামেরার জংলী রঙীন ফুল। ছায়া পড়েচে মেঘের—অন্য কোনো শব্দ নেই, শুধু জলপতন ধ্বনি দ্বারা বিখণ্ডিত নৈঃশব্দ্য আর বনবিহঙ্গ কাকলী। প্রকৃতির এমন নিভৃত লীলা নিকেতনে মন সৃষ্টিমুখী হয়ে ওঠে, বিশ্বের স্রষ্টার অপূর্ব্ব রহস্যের দিকে মন যায় চলে—এখানে মানুষ ছোট হয়ে গেছে—এই আকাশ, এ কোয়ার্টজাইটের চাঁই বাঁধানো সুবিশাল শিলাসন, এই বনানী, এই ফেনপুঞ্জবাহী দ্রুতপতনশীল জলধারা—এরাই বড়।

পরেশবাবু সেখানে বসে গান গাইছেন। মিঃ সিন্‌হা ডায়েরী লিখচেন—সুবোধ সর্ব্বদা ব্যস্ত, সে চলে গিয়েচে মোটরে। কল্যাণীকে একবার আনতে হবে এখানে। কতদূর এখান থেকে বারাকপুর, কুঠীর মাঠের আমার সেই পেয়ারাগাছের তলাটা, কূলে কূলে ভরা ইছামতী ও তার তীরে কাশের ফুল ফোটা চরভূমি! সেই আমাদের নৌকো করে বনগাঁয়ে যাওয়া আজ যেন স্বপ্ন বলে মনে হয় না কি!

সত্যিই মনে হচ্চে কে যেন আমার হাত ধরে দেশে বিদেশে নিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চেন নতুবা তো গ্রামে বসে বারিক মণ্ডল ও ফণিকাকার সঙ্গে ধান বোনার গল্প করতাম, হরিপদদার সঙ্গে মোকদ্দমার ষড়যন্ত্র করতাম।

ভগবানকে এজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।

তারপর কি চমৎকার রাস্তা দিয়ে মোটরে এসে বসলুম। সুবোধবাবু যে রাস্তা দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, সে রাস্তা এটা নয়, এপথে বড় বড় বনস্পতির ঘন ছায়া—এক ক্ষুদ্র ঝর্ণার ওপর পাথরের সাঁকো, একটা শিউলি গাছে যথেষ্ট কুঁড়ি ধরেচে। যেন ঋষির পবিত্র তপোবনের স্থান। তারপর চারিদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়ের শোভাও অদ্ভুত। মোটর চললো কালকার রাত্রের বনভূমি ভেদ করে। বনকলমী ফুল আরও কত কি ফুল বনের মধ্যে ফুটেচে এই বর্ষা শেষে। ২০০০ হাজার ফুট উঁচু টেবো বাংলোর ধার দিয়ে গাড়ী চলেচে—পাশে বর্ষার উদ্দাম এক পাহাড়ী নদীর গৈরিক জলধারা। শিউলি গাছ মুকুলিত হয়েচে এ বনেও। সুবোধকে বলি—সাহিত্যিকদের জন্য আপনারা P. W. D. থেকে এখানে একটা বাংলো তৈরি করে দিন না! যেখান থেকে সমতলভূমির দৃশ্য সুন্দর দেখা যায়, সেখানেই এ কথা উঠলো। জলতেষ্টা পেয়েছিল, রাঁচি রোডে নেমে নাকৃটি বাংলোতে এসে গাড়ী থামিয়ে জলের সন্ধানে গেল ড্রাইভার। বেলা তখন একটা, কিন্তু ডাকবাংলোর চৌকিদারের টিকি দেখা গেল না কোথাও। তখন জলের আশা ছেড়ে দিয়ে চক্রধরপুরে এসে জল খাওয়া গেল, নগেনবাবুর ছেলে জল নিয়ে এল।

রাত্রে সুবোধবাবুর বাড়ী দু'চারটি ভদ্রলোকের সামনে গল্পপাঠ করলুম।

আজ দিনটি বেশ পরিষ্কার। পরশু রাত্রে সারারাত্রি হৈ হৈ-এর পরে খুব আরামের ঘুম হয়েচে। সুবোধ ও অবিনাশবাবু এসে চা খাওয়ার সময়ে গল্প করলেন—চালের দর, ট্রেনে ভীষণ ভিড়। প্রেমচাঁদের গল্প 'বেটি কা ধন' ও 'সুহাগ কী শাড়ী' দুটি হিন্দীতে পাঠ করা হোল চায়ের টেবিলে। এখানে বেশ সাহিত্যিক আবহাওয়া। মনে পড়চে কাল এ সময় সৌন্দর্য্যময় বনভূমির মধ্যে বসে ছিলাম। এখনও যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি সেই উত্তুঙ্গ শৈলগাত্র, রাঙা মাটি ও চূণা পাথরের ধ্বস নামা খাড়া দেওয়াল, সেই অজস্র Lantana পুষ্প। আজ আকাশ খুব নীল, হেসাডি ডাকবাংলোতে কাটানোর উপযুক্ত দিন যেন এগুলি।

সন্ধ্যায় সুবোধবাবুর বাড়ীতে চায়ের আসরে আমার গল্প দুটি পড়া হোল—গ্রীক যুবক হেলিও-ডোরাস কি করে বাসুদেবের ভক্ত হোল ও 'ভিড়'। রাত্রে ফিরে এসে খেয়ে শুয়ে পড়ি। কোল্‌হান্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কে মিত্র, আরও কয়েকটি উকীল উপস্থিত ছিলেন।

ভোরে উঠে আমি ও মিঃ সিন্‌হা চা খেয়ে হিন্দি সাহিত্যিক প্রেমচাঁদের বই পড়ি। জগৎ সিং এসে ভাওে ভাওে অর্থাৎ 'আমি বার বার বলচি' গল্পটি করেন। এই গল্পটি ওঁর মুখে কতবার শুনেচি—যতবার শুনি, নতুন লাগে প্রতিবার। সুবোধবাবু এসে বল্লে—সে ডেপুটি কমিশনার মিঃ কেম্পের গাড়ীতে টাটা চলে যাচ্ছে। একটু পরে ঘাটশিলা থেকে মুকুল চক্কত্তি এল। তারপর আমরা মোটরে বার হয়ে ভবানী সিংয়ের বাড়ী যাই। গত ৩০শে চৈত্র এঁর বাড়ীতে কম্পাউণ্ডে বসে আমরা চা খেয়েছিলাম—চাঁইবাসার বাইরে অপূর্ব্ব মুক্ত space-এর বাহার, একদিকে নীল শৈলমালা—বরকেলা ও সেরাইকেলা। আমার মনে হল সেরাইকেলা শৈলমালাই বরাবর গিয়ে বুরুডি ও বাসাডেরার পাহাড়ে শেষ হয়েচে, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নাম। মস্ত বড় হাট বসেচে চাঁইবাসায়—বাসমতী চাল বিক্রি হচ্ছে ৩২৲ টাকা মন। কিন্তু অতি সুন্দর চাল।

সেই সন্ধ্যায় ট্রেনে এসে টাটানগর পৌছে গেলুম ও বাদাম পাহাড়ের যে গাড়ীখানা প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে, তাতেই শুয়ে রইলুম। ছোটনাগপুরের অধিবাসী হয়ে গিয়েচি আজকাল। বরকাকানা ও মুরী থেকে রাঁচি এক্সপ্রেস আসবে তারই সন্ধানে বার বার গাড়ী থেকে নামচি কিন্তু গাড়ী পেলুম না। ভোরে বম্বে মেল ধরে ঘাটশিলা পৌছুই। আসানবনী ছাড়িয়ে দূর থেকে আমাদের অতি পরিচিত সিদ্ধেশ্বর ডুংরির মোচাকৃতি শিখরদেশ দেখে মনে কি আনন্দ! বাড়ী এসেচি মনে হোল বহুদিন প্রবাস যাপনের পর। ওই সেই মিলিটারি ক্যাম্প রাখা মাইন্‌স্-এর—শনিবার রাত্রে যেখানে লেফটেনাণ্ট জহুরী ও বোসের অতিথি হয়ে রাত কাটিয়েছিলাম। গালুডির বিষ্ণু প্রধান যাচ্ছে এ গাড়িতে, সে নমস্কার করে বল্লে, কোথায় নামবেন? আমি বল্লাম, ঘাটশিলায়।

রেডিও বক্তৃতা দিয়ে বারাকপুর গিয়েছিলুম একদিনের জন্যে। শিউলি ফুল ফুটচে দেখে

এসেচি। বেশ লাগলো একটা দিন। তবে ম্যালেরিয়াতে সবাই ভুগচে। ফণি রায় ও আমি একসঙ্গে বেলা দুটোর গাড়ীতে চলে এলুম। ঘাটশিলা যেদিন এলুম, সেদিন সুরেশ বাবুও এলেন আমার সঙ্গে।

ক'দিন খুব জ্যোৎস্না। আজ চতুর্দ্দশী, কাল কোজাগরী পূর্ণিমা। রাত চারটা পর্য্যন্ত দ্বিজেন মল্লিকের বাড়ী বসে গল্প করলুম—তারপর মনে হোল আজ জ্যোৎস্নাটি মাটি করবো? কোথাও যাবো না? অত রাত্রে সেই অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না রাতে হন্ হন্ করে হেঁটে চলে গেলুম ফুলডুংরি।

রাত ন'টা। বেশি রাত্রির জ্যোৎস্না। আমার সেই প্রিয় স্থানটিতে পাথরের ওপর গিয়ে যোগাসনে বসলুম। দূরে বুরুডি ও বাসাডেরা পাহাড় ও বনানীর মাথায় একটি নক্ষত্র অনন্তের হৃদ্‌স্পন্দনের মত টিপ টিপ করে জ্বলচে। জ্যোৎস্নাস্নাত বনভূমি ও ফুলডুংরি পাহাড়ের সে রূপে মন মুগ্ধ, স্তব্ধ ও বিস্মিত হয়ে উঠেচে। মুখে কথা বলতে পারি নে—এমন একটি অবশ, আড়ষ্ট ভাব। ভগবানের উপাসনা এখানে নীরব ও ভাবঘন, সমাহিত। বিশাল প্রান্তরের যে দিকে চাই—জ্যোৎস্নালোকিত ধরিত্রী যেন জন্মমরণ-ভীতি-ভ্রংশী কোন্ মহা-দেবতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিলনের আনন্দে নিস্পন্দ সমাধিতে অন্তর্মুখী। শুধু দেখা যায় বসে বসে এর অপূর্ব্ব রূপ, শুধু অনুভব করা যায় গোপন অন্তরে এর সে নীরব বাণী। চারি-দিকে নিঃশব্দ; এক তো নির্জ্জন প্রান্তর—এত রাত্রে এখানে কেউ আসে না—ভূতের ভয়ে স্থানীয় লোক এদিকে নাকি থাকে না বেশি রাত্রে—মানুষের গলার সুর এতটুকু কানে গেলে মনের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায় আমার—সুতরাং প্রাণভরে এই নির্জ্জনতা ও নৈঃশব্দ্যের বাণী শুনলাম বসে বসে কত রাত পর্য্যন্ত। সন্ধ্যাবেলা এখানে বসলে ভয় হয়—এই বুঝি কোন কলকাতার চেন্‌জার বাবুরা পুত্রপরিবারসহ হাওয়া খেতে এসে পড়ে কলকোলাহল করতে করতে! এত রাত্রে মন একেবারে নিরুদ্বেগ সেদিক থেকে। বেশ জানি এ সময় জনপ্রাণী আসবে না এদিকে। মন শঙ্কাশূন্য ও নিরুদ্বেগ না হোলে কি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যসুধা উপভোগ করা যায় ঠিকমত?

আমি ক'দিন ধরে ভাবচি এমনি সব নির্জ্জন স্থানের কথা। সেদিন পাঠকবাবু বলছিল, রাইপুর (C. P.) থেকে ১৮৪ মাইল দূরে বাস্তার স্টেটের রাজধানী জগদলপুরের গল্প। ধাম্-তারি ছাড়িয়ে (রাইপুর থেকে ৫০ মাইল দূর) ঘন বন পথের দুধারে—এমন এক বনের মধ্যে মানব বসতি থেকে বহুদূরে খুব বড় বড় গাছের ছায়ায় শিলাসনে বসে আছি, সকাল বেলাটি, অসংখ্য পক্ষীকুলের কলরব, অদূরে স্নিগ্ধ সলিলা গোদাবরী (ওখানে অবিশ্যি গোদাবরী নেই, আমার কল্পনা) কুলুকুলু রবে উপলবন্ধুর পথে বনপাদপের ছায়ায় ছায়ায় বয়ে চলেছে। নির্ভয়ে বিচরণশীল মৃগযূথ আমার শিলাসনের কাছে কাছে তৃণ আহরণ করচে—এমন একটি ছবি প্রায়ই মনে আসে।

কাল বিকেলে ফণি এল—ওর সঙ্গে অমরবাবু এসেচেন কিনা দেখতে গেলুম। পথে ব্রাউন সাহেবের সঙ্গে দেখা—ব্রাউন বল্লে, অমরবাবু আসেনি। তারপর রেলের বাঁধের ওপর

দুজনে বসলুম, বেশ চাঁদ উঠেচে। পরশু কল্যাণী, উমা ও বৌমাকে নিয়ে ফুলডুংরি বেড়াতে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে ছিলাম।

আজ মিঃ সিন্‌হা চিঠি লিখেচেন তাঁর সঙ্গে সারেণ্ডা বেড়াতে যাবার জন্যে। ৮ই তারিখে এখান থেকে চাইবাসা যাবো—সেখান থেকে সারেণ্ডা রওনা হবো। সারেণ্ডা বিখ্যাত অরণ্য, প্রাকৃতিক দৃশ্যও অতি অপূর্ব্ব। সিংহভূমের বিখ্যাত বন। ওখানে বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ কি ছাড়তে আছে?

ঘাটশিলা থেকে বন ভ্রমণের জন্য বেরিয়ে রাত ১১টার গাড়ীতে চাইবাসা রওনা হই। সঙ্গে রইল ওভারসিয়ার নসিরাম। বেশ শীত রাত্রে। সিন্‌হা সারেণ্ডা-বনের ভার পেয়েছিলেন এ মাসে। গোটা বনটা ঘুরে আসবেন, আমায় নিমন্ত্রণ করেচেন। তাঁরই আহ্বানে আসা।

চাইবাসাতে সুবোধবাবুর আপিসে বসে সকালে চা খেলুম ও অনেক গল্পগুজব হোল। কাল বেলা একটার সময় চাইবাসা থেকে রওনা হয়ে এলুম হাটগামারিয়ায় পরেশ সান্যালের ওখানে। তারপর বনপথে মোটর ছুটলো। টক্‌টকে লাল মাটির পথ ও দুধারে ঘন জঙ্গল। আগে নোয়ামুণ্ডী, পরে এলুম গুয়া। দুই জায়গাতেই টাটা ও আর একটি কোম্পানীর লৌহ সংগ্রহের ব্যবস্থা রয়েচে—লোহার পাহাড় কেটে লৌহ প্রস্তর টন টন গাড়ী বোঝাই করে নিয়ে চলেচে। গুয়াতে একটি বাঙালী ভদ্রলোকের বাড়ী চা পানান্তে আবার ঘনতর জঙ্গলের পথে এলুম কুমডি বাংলোতে। নিবিড় বনের মধ্যে দিয়ে পথ, কারো নদী পার হয়ে অদ্ভুত বনশোভা—ফুটন্ত পিটুনিয়া ও বন্য কাঞ্চনের প্রাচুর্য্যের মধ্যে সন্ধ্যায় গাড়ী কুমডি পৌছে গেল। ডাকবাংলোর কাছেই বনের ভেতর দিয়ে কোইনা নদী কলকল শব্দে বয়ে চলেচে। আজ শুক্লা চতুর্দ্দশী—কাল রাসপূর্ণিমা। জ্যোৎস্নারাত্রে আমরা পায়ে হেঁটে কোইনা নদী পার হয়ে বনের মধ্যে কতদূর বেড়াতে গেলুম। লোকালয় নেই কোথাও—গুয়া ছাড়িয়ে ষোল মাইল অবিচ্ছেদে অরণ্যপথ দিয়ে এসে বন বিভাগের এই বাংলো। বনের পথে বেড়াতে বেড়াতে দেখলুম সেই বিরাট অরণ্যের প্রাচীন বনস্পতি শ্রেণীর মধ্যে শুক্লা চতুর্দ্দশীর জ্যোৎস্নার রূপ। জ্যোৎস্নারাত বিশাল অরণ্যানী যেন প্রাচীন ঋষির মত শান্ত, সমাহিত। এক-একটা গাছ নাকি ১৫০।১৬০ বছরের। আমার প্রপিতামহের শৈশবেও এ সব গাছ এমনিই ছিল।

বড় ঠাণ্ডা। শিশির পড়চে। কারো নদীর ধারে অনেকক্ষণ বসে তারপর বাংলোতে ফিরে এলুম। বন্য হস্তীর ভয়ে বেশিক্ষণ জঙ্গলের মধ্যে বসতে সাহস হোল না।

আজ বেলা ১২টার সময়ে মোটরে রওনা হয়ে মাইল চারেক গিয়ে এক বনের মধ্যে গাড়ী রেখে শশাংদা বুরু আরোহণ শুরু করলাম। শশাংদা বুরু সারাণ্ডা অরণ্যের সর্ব্বোচ্চ পাহাড় —উচ্চতা ৩০৩৮ ফুট। প্রায় কালিম্পং-এর উচ্চতা। মোটর ছেড়ে ৫।৬ জন লোক বনপথে পাহাড়ের গা কেটে বনবিভাগের তৈরি রাস্তা বেয়ে চলেচি। একদিকে শৈলগাত্রে নিবিড় অরণ্য, ছুটি ঝর্ণা বনের মধ্যে কলধ্বনি করে নেমে চলেচে। বনের মধ্যে বন্য কদলী-বৃক্ষ—

ঠিক যেন চন্দ্রনাথ পাহাড়ের মত। একটা স্থানে এসে পাহাড়ের ওপর উঠতে আরম্ভ করলুম। খাড়া উঠেচে, অতি দুরারোহ শৈলগাত্র, নিবিড় বনের মধ্যে সোজা হয়ে উঠে চলেচে। একটা বনমোরগ আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে বনের মধ্যে পালালো। বড় বড় মোটা মোটা শাল, ধ, করম, আসান, লুদাস, পানজন, আল্দী, বন্য কাঞ্চন, চীহড় লতা আরও শ' দুশো রকমের গাছ ও লতাপাতা। ৬০।৭০ বছরের পুরোনো চীহড় লতা (bohinia vallai) গাছের মাথার কাছে ঠেলে উঠেচে। এক এক জায়গায় পাহাড়ের ও বনের ফাঁকে দূরের ছোট বড় পাহাড় চোখে পড়ে। চাড্ডা গাড়া নামক পার্ব্বত্য ঝর্ণার কলকল জলপতন ধ্বনি বনে বনে, স্তরে স্তরে যেন নেমে চলেচে নীচের দিকে—উপত্যকার নিবিড় অরণ্যে এ গম্ভীর শব্দ একটি উদাত্ত সঙ্গীতের সৃষ্টি করেচে। বড় ক্লান্তি হচ্চে। এত দুরারোহ পাহাড়—শেষের দিক যেন আরও বেশি। পা যদি সামান্য একটু পাথরেও আটকে যায়—তাও যেন তুলে ফেলতে কষ্ট হচ্চে। ঘন ঘন হাঁপাচ্চি—মাঝে মাঝে বুকের মধ্যে এক রকম যন্ত্রণা হচ্চে। ধূমপান করবার জন্যে সেই খাড়া পথের এক জায়গায় বসলুম। সামনের দৃশ্য আরও স্পষ্ট করবার জন্যে সঙ্গের বনবিভাগের গার্ড কুড়ুল দিয়ে bohinia vallai-র একটা মোটা লতা কেটে দিলে। Forest Officer ও রেঞ্জ অফিসার শ্রীরাসবিহারী গুপ্তকে একটি গল্প শোনালুম। দুজনেই শুনে খুব খুশি। যেখানে চাড্ডা ঝর্ণা পড়চে—সেখানে নালা পার হবার সময়ে মিঃ সিন্‌হা বললেন—Take courage in both hands, দাদা। আমি বললুম—একটা হাত আটকানো—লাঠি ধরে আছি যে! প্রকাণ্ড আম গাছ বনের মধ্যে এই স্থানে দেখলুম। আজ গোপালনগরের হাট, এতক্ষণ হাটে চলেচে লোকে।

ওপরে উঠে প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ তৃণক্ষেত্রের ওপর দিয়ে চলে গিয়ে একটা জলাশয়ের ধারে এলুম। সেখানে নরম কাদায় কত রকম পশুর পদচিহ্ন। হো ফরেস্ট গার্ডকে আমরা ডেকে বললুম—কি কি জঙ্গলের জানোয়ারের পায়ের দাগ আছে দেখ। সে দেখে বল্লে—হুজুর হাতী, বাইসন, সম্বর বুনো শুওর বেশি। আমি বললুম—বাঘের পায়ের দাগ?

—নেই হুজুর। বাঘ এখন এখানে জল খেতে আসবে না। একটা গাছের ছায়ায় গাছের ডাল-পালা বিছিয়ে আমরা শুয়ে পড়লুম। চা পান করে বেলা ৪টার সময় রাসবিহারীবাবু বল্লেন—চলুন, বড্ড হাতীর ভয় বেলা পড়লে। তারপর এখানে কি ভাবে একটা বাঘের গর্জ্জন শুনেছিলেন, সে গল্প করলেন। হো কুলী বললে—বাবু রাৎ আনা—উনি বুঝতে পারেন না। শেষে দেখলেন কুলী পিছিয়ে পড়চে। তখন শুনলেন বাঘ ডাকচে বনের মধ্যে। আর একবার একটা হাতীর হাতে পড়েছিলেন, কুলী ছিল সঙ্গে। সে ওঁকে পাহাড়ের ওপর থেকে ঢালুর দিকে জোর করে নামিয়ে নিয়ে গেল। আসবার সময় আরও অদ্ভুত দৃশ্য। হলদে রোদ দূর পাহাড়ের মাথায়, অরণ্যবনস্পতি-শীর্ষে। নামচি, নামচি—সেই দুরারোহ পথে হুড়কে পড়ে যাওয়ার ভয় প্রতি মুহূর্ত্তে। রোদ কমে এল। বনের ছায়া নিবিড়তর হচ্চে। এক জায়গায় barking deer ডাকচে, ঠিক কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ আওয়াজ করে। বনের

আমলকী পাড়িয়ে নিয়ে খেতে খেতে এলুম। বনের মধ্যে কামিনী ফুলের গাছ দেখলুম এক স্থানে।

নীচে নেমে বনের মধ্যে দিয়ে প্রায় দেড় মাইল হেঁটে এসে আমাদের মোটরের কাছে এলুম। গুয়া রেল স্টেশন থেকে শশাংদাবুরু প্রায় ১৬॥ মাইল। এ অপূর্ব্ব বনশোভা যদি কেউ দেখতে যান তবে হেঁটে তাকে আসতে হবে এই ১৬॥ মাইল পথ। কোথাও কোনো লোকালয় নেই—শশাংদাবুরু মালভূমি বা তার আশপাশে কোথাও একখানা বন্যগ্রাম পর্য্যন্ত নেই। পথে যথেষ্ট বন্য হস্তীর ভয়। আমরা মোটরে আসচি কুমডিতে শশাংদাবুরু থেকে নেমে—হঠাৎ ফরেস্ট গার্ড হো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লে—হাতী! হাতী!

আমরা সকলে চেয়ে দেখি উপত্যকার ওপারে শৈলসানুর বনে একটা লাল রংএর ধুলো মাখা হাতী বনের মধ্যে আমাদের দিকে পিছন ফিরে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কেবলই ভাবচি শশাংদাবুরুর ওপরে কেউ যদি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে বেশ হয়।

আজ আবার রাসপূর্ণিমা। সন্ধ্যায় বাংলোর বারান্দাতে বসে চা খাচ্চি—পূর্ণচন্দ্র উঠলো বনের মাথায়। গোপালনগরের হাট করে বাড়ী ফিরচে পঞ্চা মাস্টার ওর গরুর গাড়ীতে। বাংলোটি চমৎকার স্থানে। চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা, ঘন বন। পাশেই দিনরাত শুনচি কোইনা নদীর কুলুকুলু শব্দ বনের মধ্যে। জ্যোৎস্নারাত্রে নদীর ধারে একটা শালগাছের শুক্‌নো গুঁড়ির ওপর গিয়ে বসলুম। আমি ও মিঃ সিন্‌হা। জল চক্ চক্ করচে জ্যোৎস্নায়।

আজ ভগবানের বিরাটরূপ প্রত্যক্ষ করেচি শশাংদাবুরুর শৈলারণ্যে—তিনিই সব জায়গায় ছড়িয়ে রয়েচেন। প্রাচীন বনস্পতিতে তাঁর গম্ভীর রূপ—আবার বন্য লুদাম, বন্য চিরেতার অতি সুন্দর পুষ্পে তাঁর কমনীয় রূপ। তিনি অব্যক্ত, অনন্ত।

আমার মনে হয় সারেণ্ডা ভ্রমণের মন ছিল আমার বহু দিনের। তাই তিনিই দয়া করে যোগাযোগ ঘটালেন। এ এক মূল্যবান অভিজ্ঞতা জীবনের। সেই শৈলশীর্ষে রাঙা রোদ, ঘন বনে সেই চাড্‌ডা ঝর্ণার জলপতন ধ্বনি, সেই প্রাচীন বনস্পতি-শ্রেণী, দূরে দূরে অগণ্য শৈলমালার সমারোহ—সেই সুগন্ধি বন্য কুসুমরাজি—এ সব যদি আমি না দেখতুম মনের মধ্যে এর ছবি যদি না এঁকে রাখতুম—তবে আমার জীবন ফাঁকা থেকে যেতো। হে বিশ্বশিল্পী, তোমাকে এই করুণার জন্য ধন্যবাদ।

কি চমৎকার কমলালেবু কুমডি বনবিভাগের বাংলো-সংলগ্ন বাগানে। ফলভারে গাছ অবনত হওয়া বলে—সত্যিই তাই। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। সকালে খেয়ে দেয়ে আমরা বনপথে থলকোবাদ রওনা হলুম। সারাণ্ডা অঞ্চলের বনের মধ্যে কোথাও ফাঁক নেই—৩৩০ বর্গ মাইল (ছয় লক্ষ একর) ব্যাপী ছেদহীন নিবিড় অরণ্য। কোইনা নদী পার হয়ে কিছুদূরে বড় বড় শাল গাছ দেখা গেল। পথে বনে সত্যিই চাঁপাফুলের গাছ দেখা গেল—ভেড্‌লেডিয়া নয়, সত্যিই চাঁপা। কোদলিবাদ নামক বন্য গ্রামে একটি বনান্তবর্ত্তী ক্ষুদ্র কুটিরে মিঃ সিন্‌হা ছিলেন ১৯২৬ সালে—যখন তিনি প্রথম বনবিভাগে ঢোকেন। আমরা

সেই কুটিরে গেলুম—বন এসে পৌঁছেচে ঘরের উঠানে। চারিধারে বন ও পাহাড়। মিঃ সিন্‌হা বল্লেন—অদূরে বনে barking deer ডাকতো—কত শুনেছি। বিকেল ৪টার সময় থলকোবাদ বাংলোতে এসে গাড়ী থেকে নামলুম। জঙ্গল ও পাহাড়ে ঘেরা একটি ক্ষুদ্র শৈলোপরি এই অতি সুন্দর বাংলোটি অবস্থিত। আমরা পাহাড়ের প্রান্তে বাংলোর কম্পাউণ্ডে বসে চা খাচ্চি, নিকটেই শৈলারণ্যে কর্কশ স্বরে একটা পাখী ডেকে উঠলো। বিজয় আরদালী বল্লে—ময়ূর। সে এই সারাণ্ডা বিভাগে অনেকদিন আছে। তারপর একটা গম্ভীর শব্দ শোনা গেল—মিঃ সিন্‌হা বল্লেন—সম্বর। আমি বাংলোর পিছনে একটা নির্জ্জন স্থানে গিয়ে খানিকটা বসলুম। পাথর বেরিয়ে আছে, শুকনো খটখটে জায়গা। অজস্র বনতুলসীর গাছ। সন্ধ্যার আগে আমরা থলকোবাদ গ্রাম ছাড়িয়ে বনের মধ্যে বেড়াতে গেলুম। আমি, রাসবিহারী গুপ্ত ও মিঃ সিন্‌হা। ঘন বন, অন্ধকারে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকচে। ওঁরা প্রথমটা যেতে চাননি হাতীর ভয়ে। সারেণ্ডা অরণ্য বন্য হস্তীতে পরিপূর্ণ। একজন কর্ম্মচারী বলছিল বাংলোর কম্পাউণ্ডে রোজ রাত্রে হাতী আসে। যেখানে সাইন-বোর্ডটা আছে, সেখানে তিন দিন আগে হাতী এসে সাইনবোর্ডখানা উপড়ে ফেলেছিল খুঁটিসুদ্ধ। আবার পোঁতা হয়েচে। বনের মধ্যে আমরা বসে আছি, সেই ঘন-অন্ধকারে ভরা বনভূমির কি রূপ! ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায় এখানে, এই সময়ে। চাঁদ উঠলো একটু পরে দূরে বনের মাথায়। রাসবিহারীবাবু বল্লেন—আজ দেখচি পূর্ণিমা। আমিও লক্ষ্য করলুম পূর্ণচন্দ্রই বটে। যদিও ভেবেছিলুম কালই পূর্ণচন্দ্র উঠেছিল। দুটি লোক বনের মধ্যে শুঁড়ি পথ বেয়ে অন্ধকারে আসছিল—আমাদের দেখে ভয়ে থমকে দাঁড়ালো। কাছে এসে বল্লুম—কোথায় গিয়েছিলি? তারা বল্লে—বাজারে।

—কোথায় বাজার?

—বালজুড়ি।

—কতদূর?

—পাঁচ ক্রোশ বাবু। বোনাইয়ের মধ্যে।

শুনলুম এই অরণ্যের দক্ষিণে কেউনঝর ও বোনাই স্টেট্—পশ্চিমে গাংপুর। উড়িষ্যার বনপর্ব্বত-সঙ্কুল দুটি রাজ্য। কি চমৎকার পূর্ণচন্দ্র উঠলো বনের ফাঁক দিয়ে। পেছন দিকে চেয়ে চেয়ে দেখচি বনের গাছের গায়ে জ্যোৎস্না পড়ে অদ্ভুত শোভা হয়েচে। এ বারাকপুরের বাঁশবন নয়—শ্বাপদসঙ্কুল বন্যগজ-অধ্যুষিত ময়ূর-নিনাদিত অরণ্যভূমি—সারাণ্ডা। সিংভূমের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, নিবিড়তম ও ঘনতম অরণ্য।

কয়েকটি গাড়োয়ান Bengal Timber Co-'র কাঠ বোঝাই করে থলকোবাদ গ্রামে সন্ধ্যাবেলায় গাছতলায় রেঁধে খাচ্চে। আমরা গিয়ে আলাপ করলুম। তাদের নাম বিরসা, লীলা সব মাহাতো। বাড়ী জেরাইকেলা। দিন এক টাকা হিসাবে পায় গাড়ী-ভাড়া বাবদ। বন-জঙ্গলের পথে প্রত্যেক মাসে তিনবার আসে ভাড়া বইতে। দু'দিন করে থাকে।

আমরা বল্লুম—কি রাঁধচিস ?

—ভাত আর দাল।

—আর কিছু ?

—না বাবু।

বনের মধ্যে রওনা হবে শেষ রাত্রে উঠে। এই ভীষণ শীতে শালগাছের তলায় মুক্ত হাওয়ায় শুয়ে রাত কাটাবে। বিছানা নেই—একখানা বন্য খেজুরের ছেঁড়া চেটাই ও আধ-ছেঁড়া পাতলা মলিন কাঁথা সম্বল। শুনলুম পথে বাঘের উপদ্রব আছে। গত বছর চলন্ত গাড়ী থেকে বাঘে অনেক বলদ নিয়ে পালিয়েছিল। রাসবিহারীবাবু এ উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলেন, কিন্তু মিঃ সিন্‌হা বল্লেন—সম্বলপুরের অরণ্যে সকাল আটটার সময় গরুর গাড়ী থেকে বলদ নিয়ে গিয়েচে বাঘে—তিনি জানেন, স্বচক্ষে দেখেছেন।

ভাবলুম—এই দরিদ্র সরল লোকগুলিই ভারতবর্ষের প্রাণবস্তু। অথচ কি দুঃখপূর্ণ জীবন এদের! নিরাবরণ আকাশতলে হিমবর্ষী রাত্রে কাঁথা গায়ে শোবে, বাঘের মুখে রাত্রে গাড়ী চালাবে —মজুরি কত, না দৈনিক একটাকা!

অনেক রাত্রে বাংলোর বাইরে চেয়ার পেতে বসলুম। অদূরে গম্ভীর শৈলারণ্যের জ্যোৎস্নাস্নাত রূপ কি বর্ণনা করা যায়? ভগবানকে যদি ঠিকমত উপলব্ধি করতে চাও, তবে এইখানে এই পট-ভূমিতে সেই বিরাটের রূপ ধ্যান কর—লোকালয়ের কলকোলাহল থেকে বহুদূরে ময়ূর-নিনাদিত অরণ্যভূমির প্রান্তে। এই হিমবর্ষী আকাশতলে ঐ দরিদ্র গাড়োয়ানদের ছেঁড়া চেটাইতে শুয়ে রাত কাটাও। একটা প্রবন্ধ লিখ্‌ব, প্রবন্ধটার নাম দেবো—'বনান্তে সন্ধ্যা'। ভগবানের সৌন্দর্য্য যে সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করচি—যেদিকে চাই, সেদিকেই বিরাটের আসন পাতা, সেই মহাশিল্পীর হাতের কাজ চারিদিকে ছড়িয়ে। জয় হোক তাঁর।

এক জায়গায় পাতার কুঁড়ে বেঁধে জনকতক লোক রেঁধে খাচ্চে সন্ধ্যাবেলা। ওদের হো ভাষায় কি জিজ্ঞেস করলে রাসবিহারীবাবু। ওরা হো ভাষাতেই জবাব দিলে। শুনলাম ওদের বলে 'খারাকাশি', বোনাই ও গাংপুর স্টেট্ থেকে আসে আমের কাঠ চেরাই করতে। ওদের পাতার কুঁড়ের কাছে একটা বিরাট আট ফুট পরিধি-বিশিষ্ট শালগাছ, উচ্চতায়ও প্রায় ৫০।৬০ ফুট। বনস্পতি একেই বলে—বৃক্ষ-আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা হয় দেখলে।

গভীর রাত্রি। আমরা বাংলোর বাইরে ত্রিশ গজ আন্দাজ গেলুম। রাসপূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র মাথার ওপর উঠেচে। একটা উঁচু টিলা—অথবা সেটা এই পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়া—সেখানে ঘাস নেই, শুকনো খটখটে জায়গা—মাঝখান দিয়ে পথ, দুধারে শাল ও আমলকী বন, আজ বৈকালে যেখানে গিয়ে বসেছিলুম সেখানটাতে গিয়ে দাঁড়াই। জ্যোৎস্নার বর্ণনা নেই—এ জ্যোৎস্না-স্নাত বনভূমি ও অদূরবর্ত্তী শৈলমালার বর্ণনা নেই। কে দিতে পারে এর বর্ণনা? গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে একমাত্র শব্দ ঘন বনের মধ্যে কোথায় অবিশ্রান্ত জল-পতনধ্বনি। এ ধ্বনি বনের মধ্যে চাত্‌রা বর্ণায় শুনেছি শশাংদাবুরু আরোহণের সময়, এ শব্দ শুনেছি কাল ও পরশু রাত্রে কোইনা নদীতে ঘন বনে—কুমডি বাংলোতে—আবার

থলকোবাদ বাংলোতেও শুনেচি। কোথায় একটা সম্বর হরিণ পূর্ব্বদিকের পাহাড়ে গম্ভীর আওয়াজ করলে। মাথার ওপরে দু-চারটে নক্ষত্র, সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখা যাচ্চে।

টিলার দক্ষিণে যে শালবন, তার শিশিরসিক্ত পত্রপুঞ্জ জ্যোৎস্নায় চক্‌চক্ করচে। ডাইনে একটা গাছের গায়ে বন্যহস্তী তাড়ানোর উঁচু মাচা। এই গভীর রাত্রে অরণ্য-নিঃশব্দতার মধ্যে—দূরবর্ত্তী অপরিচিত পাহাড়ী ঝর্ণার জল-পতনধ্বনি ও দু-একটা নৈশপাখীর কূজন দ্বারা বিখণ্ডিত যে গম্ভীর নৈঃশব্দ্য, এর মধ্যে কান পেতে থাকলে যেন কার বাণী শুনতে পাওয়া যায়। শুনলামও তাঁর বাণী, শুনে সারা হৃদয় মন জয়ধ্বনি করে উঠলো সেই বিরাট স্রষ্টা, সেই সৌন্দর্য্যশিল্পী, সেই রহস্যময় অনন্তের উদ্দেশে। মুখে কিছু বলা যায় না। পনেরো মিনিট বাইরে ছিলাম এই পৌর্ণমাসী রজনীর মায়াময় জ্যোৎস্নালোকে বাংলো থেকে কিছুদূরে বনের মধ্যে টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে, যেখান থেকে বাংলোর সাদা বাড়ীটা বা কোনো লোকালয়ের চিহ্ন চোখে পড়ে না, শুধু মনে হয় একা একা আমি এই জনহীন গম্ভীর বনভূমিতে এই গভীর রাত্রে আকাশ ও বনের দিকে চেয়ে আছি —এই পনেরো মিনিটে পনেরো বছরের জ্ঞান সঞ্চার হোল। চোখ যেন খুলে গেল। তাঁর জয় হোক।

সকালে উঠেচি—মিঃ সিন্‌হা ডেকে বল্লেন—ময়ূর দেখুন! পাশের উপত্যকায় মাঠের মধ্যে ছ-সাতটি বড় বড় ময়ূর দেখে বড় খুশি হই। বেলা দশটার সময় মোটরে বার হয়ে আমরা 'কোদলিবাদ ১৫-এর' ঘন জঙ্গলে গেলুম। কারাউলি নামক একটি ক্ষুদ্র নদী প্রথমে পেলুম। বড় বড় পাথর বাঁধানো জায়গা। পাথরের ওপর দিয়ে নদী বয়ে চলেচে। বনের পথে নামচি উঠচি—দুধারে শৈলশ্রেণী—আবার এক ঝর্ণা। তারপর কোইনা নদী ঘন বনের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে। কোইনা নদীর পাষাণময় তীরের ঘন বনের ধারে বসে আমি ১৯৩১ সালের ব্ল্যাকউড্‌স ম্যাগাজিনে 'Cast adrift in the woods' বলে একটা ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়তে লাগলুম। মাঝে মাঝে মুখ তুলে চেয়ে দেখি ঝোপ ও লতা দিয়ে তৈরি নিবিড় বন যেন বাংলা-দেশের বনের পদ্ধতি-বিশিষ্ট—যেন কুঠী মাঠের বন—শুধু শাল আসান নয়। পথে তিন রকমের ফুল অজস্র ফুটে—দেবকাঞ্চন, বন্য পিটুনিয়া ও ঈষৎ সুগন্ধ-বিশিষ্ট এক রকমের হলদে ফুল, বেশ দেখতে। কামিনী ফুলের গাছ জঙ্গলের মধ্যে যথেষ্ট। সকালে চমৎকার আলোছায়ার খেলা জঙ্গলে—নিবিড় ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্যালোক এসে পড়েছে, বন্য-পক্ষীর কূজন, কোইনা নদীর মর্ম্মর কলতান, বামে-নদীর ওপারে প্রায় দুশো গজ দূরে পাহাড়শ্রেণী কি সুন্দর লাগছিল। ভগবানকে মন থেকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হয়। আরও কিছুদূরে গিয়ে কোইনা নদী আর একবার ঘুরে আমাদের পথে এসে পড়ল—এখানে একদিকের পাড় উঁচু ও প্রস্তরময়, নিবিড় বনাবৃত। এখানে অনেকক্ষণ বসলুম। কমলালেবু দিলেন মিঃ গুপ্ত। কি পাখীর গান। কি বনানীশোভা! ভূতধাত্রী ধরিত্রী অপূর্ব্বরূপে সজ্জিতা এই ঘনবন পর্ব্বতান্তরালে।

আজ সকালে উঠে ঘন বনের পথে মিঃ সিন্‌হা, মিঃ গুপ্ত ও আমি রওনা হই বোনাই

স্টেটের সীমানা দেখতে। পথে গভীর অরণ্যের মধ্যে কোইনা নদী (যার সঙ্গে আমার একবার পরিচয় হয়েচে কুমডি বাংলোর পাশে) কুলুকুলু তানে বয়ে চলেচে, হঠাৎ আমার নজর পড়লো প্রস্তরবহুল একটি চমৎকার জায়গা কোইনা নদীর মধ্যে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি, বনের মধ্যে যেখানেই এসব দেশে নদী বয়ে যায়, সেখানে গতিপথে নানা সুন্দর দৃশ্যের সৃষ্টি করেই অগ্রসর হয় নদী, পদে পদে রমণীয় শোভা বিতরণ করতে করতে চলে। পাথরের বড় বড় চাঁই, গাছপালা, বিহঙ্গ-কাকলী, সুস্নিগ্ধ তরুচ্ছায়া, মর্ম্মর জল-কলতান—যাকে বলে বিউটি স্পট্ (beauty spot) তার আর বাকী রইল কি? কিন্তু এ জায়গার বিশেষত্ব এই, এখানে নদীর মধ্যে যে চড়াসৃষ্টি হয়েচে, যেখানে বালি, বড় জোর পাথরের নুড়ি কি দু-দশখানা পাথরের চাঁই থাকা উচিত ছিল, সেখানে বহুদূর পর্য্যন্ত স্থান মাকড়া পাথর (Labrite) দিয়ে যেন বাঁধানো। কত হাজার বছর ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে কোইনা নদী এমনি বয়ে চলে মাটি ক্ষইয়ে তুলে ফেলে তলাকার পাথর বার করে ফেলেচে, সে পাথরেরও নানাস্থানে মৌচাকের মত অসংখ্য গর্ত্ত সৃষ্টি করেচে। তার প্রায় ৫০।৬০ হাত চওড়া, ১৫০ হাত লম্বা এক সমতল পাষাণের চত্বর-মত নদীর খাতের মধ্যে, কে যেন পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে রেখেচে। ঘন বন এর উভয় পাশে, থলকোবাদ নিজেই বনের মধ্যে—সেখান থেকে ছ' মাইল এসেচি মোটরে ঘনতর অরণ্যের মধ্য দিয়ে—তারপর এই সুন্দর ছায়াভরা, পাষাণময় জলকলতান-মুখর, জনহীন স্থানটি। আরও কিছুদূরে একটি বন্যগ্রাম, নাম করমপদা, তার ওধারে সুয়াগাঁও ও বনগাঁও ব'লে আরও দুটি গ্রাম। গ্রাম বলতে যা বোঝায় তা এসব নয়, বনবিভাগ থেকে এদের বিনাখাজনায় চাষের জমি দেওয়া হয়। ফসল করে তুলতে পারে না বন্যহস্তী ও সম্বর হরিণের উপদ্রবে। বনগাঁও গ্রামের দৃশ্যটি ছবির মত। গাড়ী থেকে নেমে আমরা একটা ছোট্ট টিলার ওপরে বসলুম শালগাছের ছায়ায়, আমাদের সামনে ক্ষুদ্র কোইনা নদী সরু নালার মত বয়ে চলেচে, কারণ এই নদীর উৎপত্তি স্থান অদূরবর্ত্তী বোনাই সীমান্তের শৈলমালা, এখান থেকে মাইল খানেক মাত্র দূর। নদীর ওপারে ঢেউ-খেলানো জমি পাহাড়ের মত উঠে গিয়েচে, তার গায়ে হরিৎবর্ণ ফুলে ভরা সরগুঁজা ক্ষেত, সবুজ কুরথীর ক্ষেত, দশটা খড় ও মাটির কুটির, গরু-মহিষ চরচে মাঠে, মেয়েরা কাজ করচে ক্ষেতে, ওদের সকলের পেছনে কেউন্‌ঝর রাজ্যের ঘনবনাবৃত শৈলমালা। স্থানটি গভীর অরণ্যের মধ্যে এবং চারিদিকে দূরে দূরে পাহাড়। আরও এগিয়ে গেলুম বোনাই রাজ্য ও সারেণ্ডা বনের সীমান্তে। একটা উঁচু পাহাড়ের গায়ে পাঁচশ' ফুট জায়গা ফাঁকা, সব গাছ কেটে সীমা চিহ্নিত করা হয়েচে। তারপর আমরা নেমে গেলুম—ভাবলুম, বোনাই স্টেট্ একবার বেড়িয়ে আসা যাক না। রাস্তা ক্রমশঃ নীচের দিকে নেমে গিয়েচে ঘনবনের মধ্য দিয়ে—কোনোই পার্থক্য নেই সারেণ্ডা অরণ্যের সঙ্গে। মোটা মোটা লতা বড় বড় প্রাচীন বনস্পতিশ্রেণীকে পরস্পর সংযুক্ত করেচে, ফাঁক রাখেনি কোথাও, কালকার সেই হলুদ ফুল পথের ধার আলো করে ফুটে আছে, নিস্তব্ধতা তেমনি গভীর, যেমন কিছু পূর্ব্বে সারেণ্ডাতে দেখেচি।

নেমে যেতে আমাদের সামনে পড়লো একটা সংকীর্ণ উপত্যকা, দুদিকে পাহাড়শ্রেণী যার

ঘেরা। শুধুই বনস্পতির সমারোহ, শুধুই বনশীর্ষ, শুধুই সবুজের মেলা ; একটা কুসুম গাছের তলায় আমরা বসলুম। বনের মধ্যে কর্কশস্বরে কি পাখী ডাকচে। ফরেস্ট গার্ডকে বললুম—ময়ূর ? সে বল্লে—নেহি হুজুর, ধনেশ পাখী। বড় বড় ঠোঁটওয়ালা ধনেশ পাখী দেখেছি বটে, কিন্তু দেখেছি কলকাতার খাঁচায় বন্দী অবস্থায়। এমন ঘন বনে তার আদিম বাসস্থানে, উড়িষ্যার বোনাই স্টেটের অরণ্যে ওর ডাক শুনবো, এ ভাগ্য কখনো হয়নি। ভেবে দেখলুম যেখানে বসে আছি, নিকটতম রেলস্টেশন থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৭০ মাইল—এও জীবনে কখনো ঘটেনি ! কলকাতায় যেতে হোলে এখান থেকে কদিনের হাঁটাপথে গুয়া বা জেরাইকেলা গিয়ে ট্রেনে চড়তে হবে।

বসে আছি, আমাদের সামনের সরু পায়ে-চলা পথ দিয়ে এক কৃষ্ণকায় তরুণ দেবতার মত যুবক, চাতে-বোনা খাটো মোটা কাপড় পরনে, এক হাতে তীরধনু, অন্য হাতে একটা পুঁটুলিতে কি বাঁধা—মাথায় লম্বা লম্বা কালো চুলে কাঠের চিরুনি গোঁজা—ব্যস্ত ও চঞ্চলভাবে কোথায় চলেচে। আমরা ডাকলুম ওকে। সে বল্লে, গির্জ্জায় যাচ্চে, বড় ব্যস্ত। হো ভাষায় বল্লে—মিঃ গুপ্ত তার সঙ্গে কথা বল্লেন এবং সে কি বলচে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। নাম তার মসি, কি তার হাসি, কি তার মুখের সুন্দর ভঙ্গি। তাকে না দেখলে এই গভীর অরণ্য-প্রদেশ যেন জীবন্ত হয়ে উঠতো না। প্রাচীন দিনের মৌন অরণ্য যেন মুখর হয়ে উঠলো ওর মুখের ভাষায়। ভাল লেগেচে সেই বন্য যুবকের আনন্দ-চঞ্চল গতি, হাসিমাখা মুখ, সরল চোখের চাহনি। নিকটেই কুন্তী বলে একটা গ্রাম আছে বোনাই স্টেটের। পথে টেতী নায়েক বল্লে—গাঁয়ের লোককে বাঘে মেরেচে, পাঁচ বছর আগে সে নাকি দেখেচে। এক বৃদ্ধ লোককে আমরা মোটরে উঠিয়ে নিলাম, তার নাম শামো, তার ভাইয়ের নাম কামো। উড়িয়া ভাষায় কথা বল্লে।

তারপর রাত্রে ও-বেলার সেই কোইনা নদীর সুন্দর জায়গাটাতে এসেচি। ঘন বনের মধ্যে চাঁদ উঠেচে, আমরা মোটরে এসে পৌঁছুলাম। শামো (কামোর ভাই—সে নিজের পরিচয় দিতে গেলে সর্ব্বদাই ভাইয়ের উল্লেখ করে।) এবং কয়েকটি লোক এই বনের মধ্যে আগুন করে বসে আছে। আমাদের জন্যে তাদের এখানে থাকতে বলা হয়েছিল।

জ্যোৎস্না-প্লাবিত বনভূমি। রাত্রি দেড়টা। বিশাল সারেণ্ডা অরণ্যের মধ্যে পার্ব্বত্য কোইনা নদীর কলতানের মধ্যে বসে আছি, কৃষ্ণাদ্বিতীয়ার চাঁদ মাথার ওপর এসেচে। মহামৌন অরণ্যানী যেন এই জল-কলতানের মধ্যে দিয়ে কথা বলচে। সে কি অদ্ভুত, রহস্যময় সৌন্দর্য্য—এর বর্ণনায় কি ভাষা আছে ? যে কখনো এমন হাজার বর্গমাইল নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যে বন্য নদীর পাষাণ-তটে জ্যোৎস্নালোকিত গভীর নিশীথে না বসে থেকেচে, তাকে এ গভীর সৌন্দর্য্য বোঝাবার উপায় নেই। এই বন্যহস্তী-ব্যাঘ্র-অধ্যুষিত অরণ্যের মধ্যে এই কোইনা নদী হাজার হাজার বছর এমনি বয়ে চলেচে, হাজার হাজার বছর ধরে প্রতি পূর্ণিমায়, প্রতি শুক্লপক্ষে, চাঁদ এমনি উঠে বনভূমি পরিপ্লাবিত করেচে, এই কোইনা নদীর এই সুন্দর স্থানটিতে আলো-ছায়ার জাল বুনেচে, এমনি সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেচে—কিন্তু কেউ দেখতে আসেনি এর

অদ্ভুত রূপ। নদীর মধ্যে ক্ষুদ্র যে একটি জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়েচে, সেই জলটি অনবরত পড়ে পড়ে এক ক্ষুদ্র সরোবরের মত হয়েচে······ওপারের বিরাট বনস্পতিশ্রেণীর ছায়া এখনও তার ওপর থেকে অপসারিত হয় নি—যদিও চাঁদ মাথার ওপরে, জলপ্রপাতের জলধারা চাঁদের আলোয় চক্ চক্ করচে, শিকররাশি গভীর শীতের রাত্রের ঠাণ্ডায় জমে ধোঁয়ার মত উড়চে—ওর পাষাণময় তটে বসে মনে হোল, বনের মাথায় ওই যে দু'চারটি নক্ষত্র দেখা যায়, ওই নক্ষত্রলোক থেকে অপরিচিত রূপসী দেববালাগণ অদৃশ্য চরণে নেমে আসেন এমনি জ্যোৎস্নাশুভ্র নিশীথ রাত্রে ওই গভীর অরণ্যানী-মধ্যস্থ সরোবরে জলকেলি করতে ইতর চক্ষুর অন্তরালে। মহাকাল এখানে অচঞ্চল, স্তব্ধ, মৌন বনস্পতিশ্রেণীর মত ধ্যান-সমাহিত। এই আকাশ, এই নির্জ্জন জ্যোৎস্না, এই নিশীথ রাত্রি, এই গভীর অরণ্য যেন কি কথা বলচে—সে শব্দহীন বাণী ওই বন্য নদীর চঞ্চল কলগীতিতে মুখর হয়ে উঠচে প্রতি ক্ষণে—কিংবা গভীর অরণ্য নিঃশব্দতার সুরে সুর মিলিয়ে অন্তরাত্মার কানে তার সুগোপন বাণীটি পৌঁছে দিচ্চে। চুপ করে বসে জলের ধারে আকাশের দিকে চেয়ে, চাঁদের দিকে চেয়ে, বনস্পতি-শ্রেণীর মধ্যে জ্যোৎস্নালোকিত শীর্ষদেশের দিকে চেয়ে সে বাণীর জন্য চোখ বুজে অপেক্ষা করো—শুনতে পাবে। সে বাণী নৈঃশব্দ্যের বটে, কিন্তু অমরতার বার্ত্তা বহন করে আনচে। এই অরণ্যই ভারতের আসল রূপ, সভ্যতার জন্ম হয়েচে এই আরণ্য-শান্তির মধ্যে, বেদ, আরণ্যক, উপনিষদ জন্ম নিয়েচে এখানে—এই সমাহিত স্তব্ধতায়—নগরীর কলকোলাহলের মধ্যে নয়। আজ এখানে এসে মনে হচ্চে, অশোকের সময়েও এই কোইনা নদী ঠিক এমনি বয়ে চলতো এই গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে—এই অরণ্য আরও গভীরতর ছিল—তারও পূর্ব্বে আর্য্যদের ভারতবর্ষ প্রবেশের দিনও এই নদী এখানে এমনি চঞ্চল কলোচ্ছ্বাসে নৃত্যশীলা বালিকার নূপুরবাজানো পা-দুটির মত নৃত্যভঙ্গীতে ছুটে চলতো, উদাসীন প্রকৃতি এমনি সাজিয়েছিল এ বনভূমিকে কিন্তু কেউ কখনো দেখুক না দেখুক—প্রশ্নও করেনি। আজ আমরা এসেচি, করুণাময় বিশ্বশিল্পী যেন প্রসন্ননেত্রে হাসিমুখে নীরবতার মধ্যে দিয়ে ওই জলকলতানের মধ্যে দিয়ে বলচেন—কেউ দেখে না, কত যুগ-যুগান্তর থেকে এমনি সাজিয়ে দিই—প্রতি দিনে, সন্ধ্যায়, প্রতি রজনীতে—আজ এলে তোমরা এতদিনে? বড় আনন্দ হচ্চে আমার। দেখ, ভাল করে দেখ।

জয় হোক তাঁর, জয় হোক সে মহাদেবতার!

তারপর শাম্যের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলি। ওর ভাই কামো কেমন আছে? সত্তর বছরের বৃদ্ধ, এই করমপদা নামক বন্য গ্রামেই তার জন্ম, আর কোথাও যায়নি—যাবেও না। পঞ্চাশ বছর আগে একবার চাইবাসা গিয়েছিল—রেলগাড়ী জীবনে কখনো চড়েনি। তাকে আমরা মোটরে আতিসিয়াং পর্য্যন্ত নিয়ে এলুম।

তারপর সেই নিবিড় অরণ্যের শিশিরসিক্ত গাছপালায় গভীর রাত্রের জ্যোৎস্নালোক পড়েচে—সে কি চমৎকার রূপ। মোটরে ফিরবার সময় চেয়ে দেখি কত গাছ, কত পাথর, কত নিবিড় বনঝোপ—আমার ঠাকুরদা সেদিন ছেলেমানুষ ছিলেন—এসব বনে তখনও ঠিক

এমনি জ্যোৎস্না পড়তো—হে প্রাচীন অরণ্যানী, এই অঞ্চলের যে ইতিহাস তুমি জানো, কেউ তা জানে না।

পরদিন সকালে চা পান করে মোটরে বেরুলাম আমি ও মিঃ সিন্‌হা। সুন্দর পাহাড় ও বনের পথে খুব উঁচু পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। এক জায়গায় বনের মধ্যে O. T. T. কোম্পানী রেলওয়ে স্লিপার চেরাই করচে। আজই সকালে একদল ময়ূর দেখেছিলুম থলকোবাদ বাংলো থেকে। লৌহপ্রস্তর ছড়িয়ে পড়ে আছে বনের মধ্যে, কোনো কোনটি বেশ ভারী, প্রায় ৫০ ভাগ লোহা আছে শতকরা। ওখান থেকে আর এক জায়গায় এসে শৈলচূড়ার ওপারের রাস্তা দিয়ে যাচ্চি—দূরে দূরে আরও পাহাড় দেখতে পেলাম। কিন্তু নেমে দূর পাহাড়ের দৃশ্য দেখতে গিয়ে আর কিছুই দেখতে পাইনে, বড় বড় গাছে চোখের দৃষ্টি আটকেচে। কমলালেবু খেলুম বসে। একটা পাইথনের খোলস পড়ে আছে পথে, মুড়ে দিলেন কাগজে মিঃ গুপ্ত। তারপর দূর দূর পাহাড়ের দৃশ্য দেখতে দেখতে, পাশের চওড়া বনাবৃত উপত্যকাভূমির দিকে চোখ রেখে নামচি—ওপর থেকে দেখতে পাচ্চি পথ নেমে নেমে চলেচে এঁকেবেঁকে পর্ব্বতের গা দিয়ে। হঠাৎ একটি সুন্দর স্থানে এলুম, বাংকিগাড়া বা ওরেপুরা বলে একটি নদী বয়ে চলেচে সংকীর্ণ উপত্যকা-পথে। ওপরের টিলার বড় বড় শাল গাছের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি কুটির! পথে একটা শালগাছ দেখেছিলুম একশ পঁয়ত্রিশ বছরের পুরোনো, দশ ফুট বেড় গুঁড়ির। আমার ঠাকুরদাদা যখন জন্মাননি, প্রপিতামহ ঠাকুর যখন যুবক, তখন এই শাল ছিল ক্ষুদ্র চারা, কি শক্তি ছিল ওর মধ্যে যে এই ক্ষুদ্র ২ ইঞ্চি চারা এই বিশাল বনস্পতিতে পরিণত হয়েচে, এখনও নাকি বাড়চে। ব্রহ্মশক্তি রয়েচে বিশ্বের সব তাতে। এই সব না দেখলে শুধু 'যো ওষধিষু যো বনস্পতিষু' আওড়ালে কি হবে। উপলব্ধি করা চাই। ব্রহ্মশক্তিকে উপলব্ধি করা চাই। বাবুডেরাতে চা পান করে আমরা রওনা হলুম—বেলা সাড়ে তিনটা। তারপরেই ঘন বনের পথ, নিবিড় ট্রপিক্যাল অরণ্যানী যেন, ডিকেনড্রাম ফুল ফুটে আছে—ফুল নয়, কচি পাতা, দেখতে ফুলের মত। একদিকে ওরেবুরা বয়ে চলেচে সংকীর্ণ উপত্যকা-পথে নিবিড় বনের মধ্যে দিয়ে। আসাম অঞ্চলের মত অরণ্য। ধনেশ পাখী ডাকচে বনে। একস্থানে মোটরের পথে আবার এই সুন্দরী পর্ব্বতদুহিতা আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়ালো। কুলুকুলু তানে ওর সাহুনয় অনুরোধ, আমাকে ভাল করে দেখ। চলে যেও না। এই স্থানটিতে একটি ক্ষুদ্র জলপ্রপাত, নদীর মধ্যেই। সুনিবিড় বনস্পতিশ্রেণীর ছায়ায় ছায়ায় নদী বয়ে চলেচে, এক পাড়ে দুটি তিনটি কুটির বনের মধ্যে। সাবাই ঘাস বিছানো। তার ওপর বসে ভগবানের সৌন্দর্য-সৃষ্টি মনে মনে উপভোগ করলুম। চমৎকার স্থান বটে। পেছনের বড় বড় গাছে অপরাহ্নের রাঙা রোদ। যেন মুনিঋষিদের আশ্রম, মনে হয় পুরাকালে কোনো উপনিষদের কবি ও দার্শনিক ঋষি এমনই সুন্দর, নিভৃত, শান্ত বনঝর্ণার তীরের কুটিরে পার্ব্বত্য অরণ্যের ঘন ছায়ায় বনকুসুমের সুগন্ধ, চঞ্চল উচ্ছ্বাসময়ী বন্য নদীর নৃত্যচ্ছন্দের নূপুর-ধ্বনি ও বিহঙ্গের কলতানের মধ্যে বসে সমাহিত মনে উপনিষদ রচনা করেছিলেন, বিশ্বদেবের উপাসনা আপনা-আপনি

সরল ও সহজ আনন্দের মধ্যে দিয়েই এখানে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, তাঁর উদ্দেশে মনের কৃতজ্ঞতাই তাঁর পূজার অর্ঘ্য। এই স্থানটির নাম দিলুম বনশ্রী।

জেরাইকেলা থেকে আট মাইল এ স্থান, সোজা রাস্তা, চলেচে জেরাইকেলা স্টেশন।

আবার চলেচি, পথে জেরাইকেলা থেকে পাঁচ মাইলে পড়লো সাম্‌টা নালা। এমন চমৎকার নদীগুলির নাম এদেশে মোটেই সুন্দর নয়—বড় কর্কশ নাম দেয় হো ভাষায়। আমাদের বাংলা দেশের অনেক বাজে নদীরও নাম এদের চেয়ে কত ভাল। এই সাম্‌টা নালা পার হয়েই এক রাস্তার মোড়—এক রাস্তা গিয়েচে থলকোবাদ তিরিলপোসি হয়ে। সাম্‌টা নালা বেয়ে কিছুদূর এসে গাছপালার প্রকৃতি যেন বাংলা দেশের মত। ঘন নিবিড় বনানী, বনকলা গাছ, ঝোপঝাপ লতাপাতা, ঠিক যেন বাংলা দেশ। আমার ভিটেতে ব্যারাকপুরে যে গাছ আছে, যার চটিজুতোর মত ফল হয়, এখানে ছোটনাগপুর ইন্‌ডাস্ট্রিস থেকে যেখানে গাছ কেটেচে সেখানে অবিকল এমনি গাছপালা। শালগাছ নেই, বাংলার মত আরণ্য গাছ। দশ মাইল দূরে একটি অতি সুন্দর উচ্চ স্থান থেকে ঠিক যেন হিমালয়ের দৃশ্য—সামনে সংকীর্ণ উপত্যকায় সাম্‌টা সাপের মত কুণ্ডলী নিয়ে বেঁধে কুণ্ডলীর বেষ্টনীর মধ্যে সবুজ একটি দ্বীপ সৃষ্টি করেচে—সামনে স্তরে স্তরে পাহাড় উঠেচে, তার ওপর দিয়ে রাস্তা এ কে বেঁকে চলেচে—দূরে একটি কুটির দেখা যাচ্ছে উপত্যকার ওপরে সবুজ বনানীর মধ্যে ডুবে আছে। শুনলাম নিকটেই কোথায় বনের মধ্যে একটি জলপ্রপাত ও একটি গুহা আছে। "In the mountain fastnesses of Hazaribag" ভাগলপুরের সেই উকীল বাবুর কথা মনে পড়লো। সে পার্ব্বত্য দৃশ্য দেখবার বাসনা ১৯২৬ সাল থেকেই আছে, তহশিলদারের ভাইয়ের মুখে সাতনামা পাহাড়ের বর্ণনা শুনে যা দেখবার বাসনা জেগেছিল। ভগবানের সৃষ্টি দেখে বেড়াবো এই তো চাই। তারপর আমার মুক্তি হোক না হোক, আমি স্বর্গে যাই না যাই—এসব ভাবনা আমার নেই। আমি না থাকলেই বা কি? সেই অপূর্ব্ব শিল্পী যিনি এই দৃশ্য সৃষ্টি করেচেন—যুগে যুগে তিনি থাকুন, তাঁর সৃষ্টি চলুক এমনি সুন্দর ভাবে কল্প থেকে কল্পান্তরে, কত শত বিশ্বে, কত সহস্র ব্রহ্মাণ্ডে, রূপে রূপে তিনি লোকলোকান্তর পূর্ণ করে মহাকালের পথহীন পথে অনন্তকাল একা চলুন, চঞ্চল বালকের মত সরল, চপল, আনন্দোজ্জল নৃত্যচ্ছন্দে হেসে গেয়ে। তিনি দীর্ঘজীবী হোন, চিরজীবী হোন।

ফরেস্টার বুড়ীউলি হো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লে—ওই হেন্দেকুলি B. T. T. কোম্পানীর কুলীর তাঁবু। আমরা চলে এলুম পাহাড়ের পথ ঘুরে ঘুরে শুধু বনফুলের শোভা দেখতে দেখতে হেন্দেকুলি তাঁবুতে। এখানে বন বিভাগের একটা ছোট্ট বাংলো আছে পথের পাশের উঁচু টিলাতে। নিচেকার জমিতে সাম্‌টা নালার ধারে অনেক কুলি মেয়ে-পুরুষ সন্ধ্যায় সারি সারি আগুন জেলে ভাত রাঁধছে। ওরা গাঙপুর স্টেট থেকে এসে 'আরাকাশি' অর্থাৎ কাঠ চেরাইয়ের কুলীর কাজ করচে। সেই বনের মধ্যে সন্ধ্যার ঘন ছায়ায় জন কুড়ি-ত্রিশ মেয়ে-পুরুষকে ভাত রেঁধে খেতে দেখে এমন ভালো লাগলো। ওপরে পাতা-ছাওয়া কুঁড়েঘরে বসে ওদের সঙ্গে গল্প করি আগুনের পাশে বসে। ওদের টিলার বাংলো থেকে সামনের

পাহাড়ের ও চারিপাশের বনের দৃশ্য অতি গম্ভীর। এই হেন্দেকুলি ক্যাম্প জেমাইকেলা স্টেশন থেকে দশ মাইল। বেড়াতে এসে এখানেও একদিন থাকা যায়। হেন্দেকুলি ছাড়িয়ে জঙ্গল আবার নিবিড়তর, সাম্‌টা নালার দিকে পথ ঘুরে ঘুরে নামতে লাগলো হেন্দেকুলি থেকে—ক্রমেই ঘন জঙ্গল, এখানে দুটি তিনটি রঙীন বন-মোরগকে পথের এপাশ থেকে ওপারে জঙ্গলের মধ্যে উড়ে যেতে দেখলুম—তখন সন্ধ্যা হয়ে আসচে, অন্ধকারে অরণ্যপথ নিবিড় হয়ে গম্ভীর শোভা ধরেচে। ফরেস্টার বলচে, এ পথে বড় বাঘ আর হাতীর ভয়। গাড়োয়ানদের গরু প্রায়ই বাঘে মারে। হাতী তো এখন এই সন্ধ্যায় বার হয়। বাঘও এই সময় পাওয়া যায়। দুদিকের কালো অন্ধকারে ঢাকা বন যেন চেপে ধরেচে ক্ষুদ্র মোটরখানা। ভয় করচে দস্তুরমত। আমরা অবিশ্যি থলকোবাদ পৌঁছবার আগে একটা Barking deer (কোৎরা) ছাড়া কিছুই দেখলুম না। চা খেয়ে বাংলোতে আগুনের ধারে বসে গল্প করলুম, তারপর আমার বাংলোর কাছেই অন্ধকারে একটু বেড়িয়েও এলুম। কাল সারারাত্রি কেটেছে জাতি সিরাং-এ কোইনা নদীর পাষাণময় গর্ভে। আজ ঘুমুতে হবে সকাল সকাল। কোৎরা ডাকচে গভীর বনে। ভাঙা চাঁদ উঠেছে বনের মাথায়। রাত্তে ভোর হোল ঘুমিয়ে।

পরদিন সকালে উঠলুম। খুব ভোর। অদূরবর্ত্তী শৈলচূড়ার বনানীশীর্ষে এখনও প্রাতঃ-সূর্য্যের আলো পড়েনি। যেখানে জল গরম করা হচ্ছে, সেখানে আগুন পোয়াতে গেলুম। Ada Cambridge-এর 'The Restrospect' বইখানা পড়লুম রোদে বসে। আজ এখুনি থলকোবাদ থেকে চলে যাবো তিরিলপোসি। কল্যাণীকে ও মন্মথদাকে পত্র দিয়েচি। কল্যাণীর জন্যে মন কেমন করচে।

ভাবলুম, ওকে আনলে হোত। এই দৃশ্য দেখে কি খুশিই হোত।

ব্যারাকপুরের লোক এখন কি করচে? আমাদের মোটর বারান্দার সামনে এনে জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হচ্ছে। দুপুরবেলা। ১২॥ হবে, সামনে রৌদ্রকরোজ্জ্বল পার্ব্বত্য অরণ্যের পটভূমিতে শুভ্রকাণ্ড শিমূল গাছটার দিকে চেয়ে কত কথাই মনে হয়। বারাকপুর, সেই ইছামতী তীরের বনঝোপ থেকে এ সময় বনমরচে ফুলের সুগন্ধ উঠচে—কত দিন দেখিনি। বিরাট সারেণ্ডা অরণ্যানীর মধ্যে বসে প্রকৃতির মনোহর রূপ, অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য, এই বনানী, এই শৈলমালা দেখতে দেখতে বহুদূরের সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামটির সেয়াকুল-ঝোপের কথা কেন বার বার মনে পড়চে। কেন পড়চে কে বলবে?

থলকোবাদ বাংলো থেকে বের হয়ে বাংলোর সামনে পয়োপ্রণালী দেখতে ঢুকলুম জঙ্গলের মধ্যে। এমন জঙ্গল যে ভয় হোল এই দুপুরেই বুঝি বাঘে ধরে। মোটর ছেড়ে গিয়েছিলুম, আবার চলে এলুম গাড়ীতে। ছোট্ট যে পাহাড়ী নদী বয়ে যাচ্ছে থলকোবাদের সামনে, জেলার গেজেটিয়ারে তার উল্লেখ আছে। সারেণ্ডার ও সাধারণতঃ সিংভূমের সব পার্ব্বত্য নদী ও ঝর্ণা সম্বন্ধেই কর্ণেল ডালটনের উক্তি প্রণিধানযোগ্য:—"In the reserved forests

the wooded glens and valleys, traversed by rivers and hill streams, have a peculiar charm. Here will be found pools, shaded and rock-bound in which *Diana* and her nymphs might have deported themselves."

থলকোবাদ বাংলোর নিকটে যে ক্ষুদ্র ঝর্ণাটি কুলুকুলু শব্দে বনের নীরবতা ভঙ্গ করে আপন মনে নেচে চলেচে, তার সম্বন্ধেও এ কথা বলা যায়। যদিও ওয়েবুরা ও সামটা নালা সম্বন্ধে এবং কোইনা নদী সম্বন্ধে এ কথা বেশি খাটে।

কর্ণেল ডালটনের উক্তি আমি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে বসে পড়ি বোধ হয় ১৯৩৪ সালে। তখন থেকেই সারেণ্ডা ফরেস্ট দেখবার ইচ্ছে ছিল। কে জানতো তা এভাবে পূর্ণ হবে একদিন, ন বছর পরে সারেণ্ডা অরণ্যের মধ্যে তিরিলপোসি বন্য গ্রামের বনবিভাগের বাংলোতে বসে একথা লিখবো।

আরও কিছুদূর এসে এক জায়গায় বনের মধ্যে ঢুকে আমরা শিশিরদা বলে একটা জলাভূমি দেখতে গেলুম। সুনিবিড় বনানী, ঢুকতে যাচ্চি এমন সময় ভীষণ চীৎকারে বনভূমি কাঁপিয়ে কি জানোয়ার ডেকে উঠলো। সঙ্গের ফরেস্টার বল্লে—কোৎরা অর্থাৎ Barking deer—কিন্তু সামান্য হরিণে যে এত শব্দ করতে পারে প্রথমে এ বিশ্বাস হচ্ছিল না। বনের চেহারা দেখে ভয় হয়ে গেল। ডানদিকে পাহাড়ের সানুদেশে নিবিড় অরণ্য, বাঁয়ে কিছুদূর গিয়ে একটা জলাভূমি, শুধু দামদলে পূর্ণ, জল দেখা যায় না—অজস্র কাশফুল ফুটেচে—এই পাহাড়ী পাথরের দেশে এমন জলাভূমি আর কোথাও দেখিনি—সারা সিংভূমে আছে কিনা সন্দেহ। সারেণ্ডাতে তো নেইই।

আমরা পাঁচ-ছজন যাচ্ছি—মিঃ সিন্‌হা তিরিলপোসির ফরেস্টার, একজন হো, দুজন গার্ড। কিন্তু ওরাই বলেচে বুনো হাতীর বড় ভয় এখানে, যেতে যেতে জলার ধারে হাতীর পায়ের চিহ্ন দেখলাম অনেক জায়গায়। একটা প্রকাণ্ড আমগাছকে কি একটা শক্ত লতায় এমনি জড়িয়ে ধরেচে যে দেখে কেমন যেন বিস্ময় বোধ হোল। কখনো দেখিনি এমন, আমগাছের পাতা দেখা যায় না নীচের দিকে, যা কিছু পাতা সবই সেই লতাটার। তারপর একটা নরম মাটি-ওয়ালা জমি পড়লো। সেখানকার বড় গাছগুলো কাটা হয়েছে বনবিভাগ থেকে—ফলে এক প্রকার কাঁটাওয়ালা ফলের গাছ হয়েচে আমাদের দেশের ওকড়া ফলের মত। পা রাখবার স্থান নেই এতটুকু।

ফরেস্টার বল্লে—এই জায়গায় একটা 'খো' আছে পাহাড়ের গায়ে।

—'খো' কি ?

—কেভ্‌।

আমরা তো তখনি কৌতূহলী হয়ে উঠলুম। দেখতেই হবে গুহা। মিঃ সিন্‌হা একবার বল্লেন—চলুন, বেলা যাচ্চে, জায়গাটা ভাল নয়। ফরেস্ট গার্ড কিছুক্ষণ আগে হাতীর গল্প বলছিল। একজন ফরেস্টারকে কি ভাবে বেলা চারটার সময় তিরিলপোসি থেকে আসবার সময় হাতীতে তাড়া করেছিল, কি ভাবে সে সাইকেল ফেলে পালালো। এই বনের মধ্যে

এ গল্প সাহসপ্রদ নয় এ কথা বলাই বাহুল্য। তবে বুনো হাতীর ও বাঘের গল্প সারেণ্ডার সর্ব্বত্র এ ক'দিন শুনে শুনে খানিকটা অভ্যস্তও হয়ে গিয়েছি।

বল্লুম—চলুন, দেখেই আসা যাক একবার।

সেই কাঁটাওয়ালা ফলগুলো কাঁটার মত কাপড়ে ও জামায় বিশ্রীভাবে বিঁধে যেতে লাগলো। এক জায়গায় সামান্য একটু ফাঁকা জায়গায় নরম মাটিতে কি দেখে ফরেস্টার হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। বল্লে—বাঘের পায়ের দাগ। বড় বাঘ।

—ঠিক তো?

—একেবারে ভুল নেই—

ফরেস্ট গার্ডও বল্লে—বড় বাঘের পায়ের দাগ। আর দেখুন, হুজুর, এগুলো বাইসনের—

তা বলে তো ফেরা যায় না। বল্লুম।

এক জায়গায় বন্য অশ্বগন্ধার পাতা তুলে দেখালে ফরেস্টার। আর একটা পরিষ্কার স্থান দেখিয়ে বল্লে—সম্বর এখানে রোদ পোয়ায়। সম্বরের পায়ের দাগ দেখুন কত—

সত্যি, অনেক জানোয়ারের পায়ের দাগ বটে। সম্বর কিনা জানি না, গরু বা মহিষের পায়ের দাগের মত—তবে তার চেয়ে কিছু ছোট। বাইসনের পায়ের দাগ ঠিক মহিষের মত।

ফাঁকা জায়গা পার হতে পনেরো মিনিট সময় লাগলো। স্থানটি অতীব wild—তিনদিকে বনাবৃত পাহাড়ে গোল করে ঘিরেচে, জলাভূমির দিকে সংকীর্ণ ফাঁক। লোহা-চোঁয়ানো রাঙা জলের একটা ঝর্ণা ফাঁকা মাঠ দিয়ে জলাভূমির দামদলের মধ্যে প্রবেশ করলো। রাস্তা থেকে অনেকদূর, প্রায় এক মাইলের বেশি। লোকালয়ের তো চিহ্নই নেই এসব অঞ্চলে। তার ওপর কাঁটাওয়ালা ফলের নীচু আগাছার জঙ্গলের মধ্যে বাইসন, হাতী ও বাঘের পায়ের দাগ। বেলা পড়ে এসেচে। জানোয়ারে তাড়া করলে পালাবার পথ নেই।

কিন্তু গুহা না দেখে ফিরচি না। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম মাঠ পেরিয়ে—সামনে যে পাহাড় তারই নীচে গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড গুহা, মুখের দিকে প্রায় মাটি থেকে ন'ফুট উঁচু, লম্বায় পঁচাত্তর ফুট। গুহার মাঝখান দিয়ে পাহাড়ের ওপর দিক থেকে ক্ষুদ্র একটি লোহা-চোঁয়ানি রাঙা জলের ঝর্ণা বেরুচ্চে। ভেতরের দিকে উচ্চতা ক্রমশঃ কমে কমে এক-ফুট দেড়-ফুট দাঁড়িয়েচে, যেখান থেকে রাঙা ঝর্ণা বেরুচ্চে সেখানে।

কি গম্ভীর দৃশ্য!

ঘন ছায়া বনে, ঘন অন্ধকার গুহার ভেতরের দিকে। গুহা ওখানে শেষ হল না, ভেতরের দিকে আরও আছে, দেখাই যায় না। গুহার সামনে ঠিক গুহার ছাদ ছুঁয়ে মোটা মোটা প্রাচীন ধাওড়া ও আমগাছ। আমগাছ ও ধাওড়া গাছে কাছির মত লতা উঠেচে জড়িয়ে জড়িয়ে—গুহার মধ্যে বসে শুধু দেখা যাচ্চে সামনের নিবিড় সুপ্রাচীন জঙ্গল। অন্ধকার নামচে বনস্পতির ভিড়ে। রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডের বনবর্ণনায় কবি বাল্মীকি প্রাচীন ভারতবর্ষের বনের যে চিত্র দিয়েচেন, সেই বর্ব্বর অরণ্য-প্রকৃতি এই গুহার সামনে, আশে-

পাশে, সর্ব্বত্র বহু মাইল নিয়ে। দেখলে ভয় হয়, কৌতুহল হয়, বিস্ময় হয়—আবার কি জানি কেন শ্রদ্ধাও হয়।

হঠাৎ ফরেস্টার বল্লে—পাশে আর একটা গুহা আছে—

—কতদূরে ?

—এই পাশেই হুজুর।

দুর্গম লৌহপ্রস্তরের boulder ও জলা, নরম মাটি ঘন জঙ্গলে। জমি উপরের দিকে উঠচে। পাশের পাহাড়ের ছাদটা ক্রমনিম্ন হয়ে এসে এই গুহা তৈরি করেচে বেশ বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু ক্ষইয়ে গুহা তৈরী হোল কি ভাবে ? ঐ লোহা-চোঁয়ানো ঝর্ণা কি এর হাতিয়ার ?

পাশেই সে গুহা দেখলুম। ঢুকলাম তার মধ্যে। এটা আরও বড়, বাঁদিকে উঁচু ঢিবি মত, লোহা-চোঁয়ানি জল রাঙা পলি ফেলে আন্দাজ লক্ষ বৎসরে এই মাটির স্তূপ তৈরি করেচে। ফরেস্টার দেখালে—আবার একটা বাঘের পায়ের দাগ দেখুন হুজুর—

সত্যি, ঠিক গুহার মুখে লোহা-চোঁয়ানো রাঙা মাটিতে।

—আর দেখুন, শাহী আর হরিণের পায়ের দাগ—বহুৎ।

—শাহী কি ?

মিঃ সিনহা বল্লেন—পর্কুপাইন—

ভাবলুম বাঘ আর অন্যান্য বন্য জন্তুর আড্ডা তো হবেই এমন গুহাতে। এরও সামনে তেমনি ঘন জঙ্গল, খুব মোটা একটা জংলি আম গাছ। নিবিড়, দুর্ভেদ্য জঙ্গল চারিপাশে।

কত কথা মনে আসে।

প্রাগৈতিহাসিক মানব কি এ গুহায় বাস করতো ? মেঝের মাটি খুঁড়লে বোধ হয় তাদের চিহ্ন পাওয়া যায়। কত লক্ষ বছরের মৌন ইতিহাস এই গুহার মেজেতে আঁকা আছে—ওই সব বন্য জন্তু-জানোয়ারের মত। কতকাল আগে, পৃথিবীর কোন্ আদিম শৈশবে এ গুহা তৈরী হয়েচে আপনা-আপনি—কোন্ আদিম মানববংশ প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম অরণ্যানীর মধ্যে এখানে বাস করতো, কত লক্ষ লক্ষ বৎসর দূরে মন চলে যায় মহাকালের বীথি-পথ বেয়ে। বিস্ময়ে মন স্তব্ধ হয়ে যায়।

বেশি ভাবতে পারা যায় না। ঐ বনানী-শীর্ষে রাঙা রোদ যেমন আজ, তেমনি কত লক্ষ কোটি লক্ষ কোটি সূর্য্যাস্ত,সূর্য্যোদয়, লক্ষ কোটি লক্ষ কোটি পূর্ণিমা অমাবস্যা দেখেচে এই সুপ্রাচীন পার্ব্বত্য-গুহা—যার তুলনায় বেদ-গাথা রচয়িতা ঋষিরা, উপনিষদের কবিদার্শনিকেরা, বেদব্যাস, বাল্মীকি, বুদ্ধ, কপিলাবাস্তু, অশোক কলিঙ্গযুদ্ধ—কালকার কথা।

আচ্ছা, কেউ থাকতে পারে এখানে একা ? উপনিষদের ঋষিরা কি এমনি নিবিড় বনের গুহায় একা থাকতেন ? এখনও কি সাধুসন্ন্যাসীরা ঠিক এমনি নির্জ্জন অরণ্যে এমনি গুহায় একা থাকেন ?

এসবের উত্তর কে দেবে ? মাথা ঘুরে ওঠে যেন ভাবলে। কত অদ্ভুত অদ্ভুত কথা মনে জাগে। মানুষের যাতায়াত নেই এ গুহায়, তাই এত অদ্ভুত লাগচে, ভয় হচ্ছে। এখান যদি

লোকালয়ের মধ্যে হোত, রেল স্টেশন থেকে এক মাইল হোত, সাধু-সন্নিসিরা ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকতেন, দেওঘরের তপোবনের গুহার মত—তবে কি এমন অদ্ভুত লাগতো? মোটেই না।'

ফরেস্টার বল্লে—চলিয়ে হুজুর। বহুৎ জানোয়ার রহ্‌তা হ্যায় হিঁয়া—চলিয়ে হিঁয়াসে—

মিঃ সিনহা বল্লেন—বেলা প্রায় চারটা, চলুন, এখানে আর থাকা ঠিক হবে না—

আবার সেই কাঁটাওয়ালা ফলের জঙ্গলের মাঠ ও নিবিড় বন পার হয়ে তিরিলপোসি—খসকোবাদ রোডে গাড়ীর কাছে এলুম। আসবার সময় আবার হাতীর গল্প উঠলো—কে যেন বল্লে—এখানে হাতী তাড়া করলে পালাবার পথ নেই—সত্যিই বটে। একদিকে জলা, অন্যদিকে পাহাড়ী ঢাল, বনে ভরা। পেছনে সেই কাঁটাওয়ালা বাঁচির জঙ্গল। কি একটা বোটকা গন্ধ পেলুম এক জায়গায়।

ফরেস্টার বল্লে—সেও পেয়েচে বটে। যাবার সময় এত ভয় হয়নি, আসবার সময় বোধ হয় বাঘ আর হাতীর পায়ের দাগ দেখবার দরুনই মনের মধ্যে এই ছায়ানিবিড় অপরাহ্ণে বিশেষ সাহস খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বেলা সাড়ে পাঁচটায় তিরিলপোসি বাংলোয় পৌঁছে গেলুম।

আজ সকালে চা খেয়ে জঙ্গলের মধ্যে অনেকদূর গেলুম পায়ে হেঁটে। সিংলুম নালা বলে একটি অতি চমৎকার ঝর্ণা বা পাহাড়ী নদী থেকে খানা কেটে জল আনা হচ্ছে তিরিলপোসি গ্রামের শস্য-ক্ষেত্রে। সেটা দেখতে গেলুম আমরা। সিংভূম বা সারেণ্ডাতে যেখানে বনের মধ্যে পাহাড়ী ঝর্ণা সেখানেই সৌন্দর্য্য—এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সুন্দর পাথর-বিছানো ঠাণ্ডা জায়গায় জলে পা ডুবিয়ে নিবিড় বনছায়ায় বসে ঝর্ণার মর্ম্মরধ্বনি শুনতে লাগলুম একা একা। চোখে পড়চে শুধু গভীর নিস্তব্ধ অরণ্য, যেদিকে চাই। বেলা বারোটায় ফিরে এলুম। বিকেলে বোনাই স্টেটের বালজুড়ির দিকে যে রাস্তা গিয়েচে পর্ব্বত ও অরণ্য ভেদ করে সেদিকে চললুম। সামনে ঘোর জঙ্গলের দিকে রাস্তা নেমে গিয়েচে দেখে মিঃ সিন্‌হা বল্লেন—সন্ধ্যে হয়েচে, আর এখন জঙ্গলে যাওয়া ঠিক হবে না। এই তো জানোয়ারদের বেরুবার সময়। যদি হাতী তাড়া করে ওপরের দিকে উঠে পালাতে গেলেই হাতীতে ধরবে, বড় বিপজ্জনক। মাকড়সার জাল বনে সর্ব্বত্র।

সুতরাং ফিরলুম। একটা বড় পাথর-বিছানো স্থানে গাছের তলায় বসলুম। সন্ধ্যা হয়ে আসচে, সামনের জমি ঢালু হয়ে গিয়ে সিংলুম নালার খাতের দিকে চলেছে। তার ওধারে ঘোর বনে সমাচ্ছন্ন শৈলমালা অন্ধকার দেখাচ্ছে। একটা গাছের ডাল মাথার অনেক ওপরে নত হয়ে আছে। মন এসব স্থানে সম্পূর্ণ অন্যদিকে যায়। কত ধরনের চিন্তা মনে আসে। জীবনের রহস্যের গভীরতার দিকে আপনা-আপনি ছুটে চলে।

কল্যাণীর কথা আজ সারাদিন মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে। হয়তো আমার চিঠি ও পাবে কাল।

ঠিক সন্ধ্যায় হয়তো বনগাঁ শিচুতলা ক্লাবে যতীনকা, মন্মথদা, সুবোধদা সব বসে গল্প করচে, আজ বিশ বছর রোজ যে ভাবে গল্প করে, তার ব্যতিক্রম নেই।

খুব ভোরে উঠেছিলুম, বেশ জ্যোৎস্নায় নীরব সামনে পর্ব্বত ও অরণ্য। শুকতারা জলজল করচে পূবদিকের আকাশে। খলকোবাদ থেকে কাঠবোঝাই গরুর গাড়ীর দল শেষরাত্রি আড়াইটায় উঠে চলেচে জেরাইকেলা। এখন পাঁচটা হবে। সকালে বনের মধ্যে বেড়াতে গিয়ে বসি, বড় বড় শালগাছ, ওদিকে বনাবৃত পর্ব্বত, চারিদিকেই পাহাড় ও বন, মাঝে ফাঁকা ক্রমনিম্ন একটু মাঠমত—সেখানে মোটা মোটা শালগাছ ও শালচারা। ঘন বনে ঘেরা পর্ব্বতের পটভূমিতে শৈলচূড়ার একটি বড় গাছ ছোট্ট দেখাচ্ছে। বিশ্বদেবের উপাসনা এখানেই সার্থক ও সম্পূর্ণ।

চা-পানান্তে অপূর্ব্ব বনপথে গাংপুর স্টেট্ ও সারেণ্ডার সীমানায় অবস্থিত টিকালিমারা নামক গ্রামে চললুম। এ পথ তৈরী হয়ে পর্য্যন্ত বোধ হয় কখনো মোটর আসেনি, গরুর গাড়ীও চলে না, সবুজ ঘাসবনে ঢাকা রাস্তা কোন্‌টা বন কোন্‌টা রাস্তা চিনবার জো নেই। মনে হচ্চে যেন মাঠের মধ্যে দিয়ে গাড়ী চলেচে। দুধারে নিবিড় বন, অনেক ভাল দৃশ্য খলকোবাদ থেকে জেরাইকেলা রাস্তায় চেয়ে। গরুর গাড়ীর চাকার দাগ নেই পথে, জন নেই, প্রাণী নেই, সকালের আলো এসে পড়েছে সুদীর্ঘ ও প্রাচীন শাল, আমলকী, প্যাঠডুমুর, ধওড়া গাছের শীর্ষভাগে—কোথাও মোটা মোটা লতায় জড়াজড়ি করে বেঁধেছে ডালে ডালে, গুঁড়িতে গুঁড়িতে, দেবকাঞ্চন ফুল ফুটেচে সর্ব্বত্র, শিউলি গাছের কত জঙ্গল, এত শিউলি গাছ এদিকের বনে যে এমন অন্য কোথাও দেখিনি, কোথাও ফলে ভরা আমলকীর ডাল পথিপার্শ্বের বিশাল গাছ থেকে রাস্তার ওপর নত হয়ে আছে ছবির মত, কোথাও পাহাড়ী ঝর্ণা বড় বড় শিলাখণ্ডের ওপর দিয়ে ছায়ানিবিড় সুঁড়ি-পথে কুলুকুলু বয়ে চলেচে, কোথাও বা একটা বন-মোরগ মোটরের শব্দে রাস্তার ওপর থেকে ওপাশের বনে উড়ে পালালো, কোথাও রাস্তা ক্রমে নামচে, নামচে, সামনে উচ্চ-বনাবৃত শৈলমালা—আমরা ঠিক যেন চলেচি পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা মারবার জন্তে ব'লে মনে হচ্চে, কোথাও রাস্তা ও মোটর একেবারে ডুবে যাচ্চে গভীর বনের মধ্যে সমতল উপত্যকায়, সেখানে চারিদিকে বন ও পাহাড়ের সবুজ দেওয়াল কিছু দেখা যায় না—আবার কোথাও পাহাড়ের গায়ে উঠে চলেচি, কোথাও সুদীর্ঘ বনস্পতিশ্রেণী ছায়াভরা বনবীথির সৃষ্টি করেচে, গাছে গাছে চৌহড়ের লতা দুলচে।

অবশেষে আমরা বিটকেলসোয়া গ্রামে পৌঁছে গেলুম। চারিদিকে উঁচু পাহাড়, ছোট ছোট ছেলে-পিলে মোটরের শব্দ শুনে ছুটে এল। প্রেমানন্দ নামে একজন মুণ্ডা খ্রীষ্টান আমাদের সব দেখিয়ে বেড়াতে লাগলো। একটা কাঠের ও খোলার ঘরে গ্রাম্য গীর্জ্জা। শুনলাম এ গ্রামের বেশির ভাগ অধিবাসী মুণ্ডা খ্রীষ্টান। মনোহরপুর থেকে জন নামে এক 'খ্রীষ্ট' (এখানে পাদ্রীকে এই বলে) এসে রবিবারে এদের উপাসনা করায়। প্রেমানন্দ এক সময়ে প্রচারকের কাজ করবার জন্তে এই গ্রামে এসে এখানেই রয়ে গিয়েচে। বেশ

বড় খোলার বাড়ী করেচে, লাউ কুমড়া লতা উঠিয়েছে। একটি গৃহস্থের নাম ফিলিপ টোপনো। ঘন্‌শা মুচির মত চেহারা। এত খ্রীষ্টান এখানে কেন? এ কথার উত্তরে ফরেস্টার খুন্টিয়া বল্লে—পালকোটের রাজা এক সময়ে হো-দের ওপর বড্ড অত্যাচার করে। তখন এরা খ্রীষ্টান হয়। মিশনারীদের প্ররোচনায়।

বাঘের অত্যাচার এই সব বন্য গ্রামে। তিনমাস আগে একজনকে বাঘে ধরেছিল। ওরা গরু চরাচ্ছিল বনের ধারে, বাঘে এসে ওকে ধরে। সঙ্গের লোকেরা টাঙি দিয়ে বাঘ তাড়িয়ে দেয়। বেলা বারোটার সময় ওকে বাঘে ধরে। লোকটার নাম শামুয়েল মান্‌কি। আমাদের বারাকপুরের গ্রামের বাগানে পাড়ার যে কোনো মুসলমান ছোকরার মত চেহারাটা। গাছের ছায়ায় বসে লোকটাকে ডেকে আমরা তাকে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলুম—কত বড় বাঘ রে?

—খুব বড় বাঘ হুজুর।

—তোর কোনো হুঁশ ছিল?

—না, আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।

একটা বাড়ীতে মস্ত বড় একটা শুক্‌নো পাতার টোকা ঝুলছে। দেখতে চাইলাম, নিয়ে এসে দিলে। বোহিনিয়া ভ্যালাইয়ের বড় বড় পাতা দিয়ে করে।

এক স্ত্রীলোক পাতার কুঁড়েঘরে বসে কাঁদচে। তার স্বামী মারা গিয়েচে শুনলুম। তার কান্না দেখে বড় কষ্ট হোল। মানুষের দুঃখের প্রকাশ যেমন বাংলাদেশে, এখানেও এই সুদূর বন্যগ্রামেও তেমনি। কোনো তফাৎ নেই।

দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের পাহাড়ের ওপারে গাংপুর স্টেট। দক্ষিণ-পূর্ব্বে বোনাই স্টেট্। যে রাস্তায় আমরা এলুম এই রাস্তা চলেচে বোনাই স্টেটের বালজুড়ি গ্রামে, এখান থেকে পাঁচ মাইল। নিভৃত বনের মধ্যে বালজুড়ির পথে এক জায়গায় খ্রীষ্টান মুণ্ডা কুলীরা কাজ করচে। তাদের হাজিরা নেওয়া হোল ঘন বনের ছায়ায় বসে। এই পথে আজ মাস দুই আগে প্রকাণ্ড নরখাদক রয়েল বেঙ্গল ব্যাঘ্র একটি মানুষ মেরেচে।

কুলীদের নাম:—

নান্দী কুই

সুনি কুই

রাইমতী কুই

চাম্পু কুই

রাহিল কুই

ক্রিষ্টিনা কুই

যশোমনি কুই

বোবাস মুণ্ডা

ইলিসাবা কুই

বাইবেলের বহু চরিত্রই এই ঘন জঙ্গলে মাটি কাটচে, সবাই মেয়েছেলে। 'কুই' এদেশে হো ভাষায় কুমারী মেয়ের নামের শেষে বলে।

বর্ষাকালে ছ'মাস গ্রামের লোক জংলী ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকে। এখানে বলে "কান্দা"। নানারকম মিষ্ট কন্দও নাকি আছে। তাছাড়া জংলি আম, বেল ও কাঠডুমুরের পাকা ফলও বনে মেলে। কাঠডুমুর (Ficus Cunia) বাংলাদেশে নেই—এই অঞ্চল ছাড়া অন্যত্র কোথাও দেখিনি। প্রেমানন্দ গ্রামের মুণ্ডারি বা সর্দার। বল্লে—এখানে চালের বড়ই কষ্ট, বোনাই স্টেটে ৴৩ সের চাল টাকায়, কিন্তু এখানে আনতে দেয় না হুজুর। পথের মধ্যে বোনাই আর সারেণ্ডার সীমানায় সিপাই বসিয়ে রেখেচে।

চলে এলুম। একটা ঝর্ণা গ্রামের মধ্যে দিয়ে বইচে—এর নাম বিটকেল সোয়া নালা, আসলে এই গ্রামের নামেই এর নাম। স্বচ্ছন্দগতি নৃত্যপরায়ণা বন্য নদীর নাম আর কি ক'রে হবে! এই একমাত্র লোকালয়ের মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়ে আবার নাচতে নাচতে ঢুকে পড়লো বোনাই স্টেটের অরণ্যভূমিতে। তার এই নাম!

বেলা বারোটা। আমরা ফিরলুম, চমৎকার শান্ত গ্রামখানি। এই ঘন বনের মধ্যে এর জন্ম ও মরণ। বিস্‌রার বাজার থেকে চিনি, আটা, তেল আনে। বিস্‌রা ষোল মাইল দূর এখান থেকে। মহুয়ার তেল খায়, ও নাকি ঘি'র মত, স্যামুয়েল মান্‌কি বল্লে। খ্রীষ্টান হয়েচে বটে কিন্তু অসুখ হোলে বনে গিয়ে লুকিয়ে বোংগা পুজো করে।

ফিরে এলুম বনের পথ দিয়ে। স্নান করেই খেয়ে তখুনি আবার মোটরে বার হই টোয়েবু নামে একটি নিবিড় বনে অবস্থিত একটি জলপ্রপাত দেখতে। তিরিলপোসি বাংলো থেকে থলকোবাদের পথে চার মাইল গিয়ে গাড়ি রেখে হেঁটে চল্লুম বনের মধ্যে। সঙ্গে ফরেস্টার খুন্টিয়া, দুজন ফরেস্ট গার্ড, মিঃ সিন্‌হা। বনে অত্যন্ত আগাছা, বিশেষতঃ সেদিনকার সেই ওকড়া জাতীয় ফল। ক্রমশঃ নিবিড় থেকে নিবিড়তর বনে ঢুকে গেলুম। এমন বনের চেহারা এই সারেণ্ডাতেও আর দেখিনি। কিন্তু অদ্ভুত সৌন্দর্য্য সে ঘোর বনের। বিশাল বনস্পতি-শীর্ষে কম্‌প্রিটাম ডিকেনড্রামের সাদা পাতা গজিয়ে ঠিক ফুলের মত দেখাচ্ছে, এ লতা যে অত উঁচুতে উঠতে পারে তা জানতাম না। একস্থানে সুঁড়িপথের দুধারে নদী কাঁঠান নামক এদেশী গাছের জঙ্গল, বড় বড় আমগাছ, শালগাছ, মোটা মোটা লতা ডালে পালায় জড়িয়ে দুর্ভেদ্য ও দুষ্প্রবেশ্য করে রেখেচে বনভূমি। ভয় হয় এ বনে ঢুকতে, বিশেষত যে রকম হাতী আর বাঘের ভয় বনে। এক এক স্থানে সুঁড়িপথটুকু ছাড়া ডাইনে বাঁয়ে কিছুই দেখা যায় না। চলেচি, পথ আর ফুরোয় না। ওকড়া জাতীয় শুকনো ফল সারা গা এমন কি মাথার চুলে পর্য্যন্ত আটকে যাচ্চে। কোথাও নিবিড় সেগুন বন, কোথাও জলাভূমি, কোথাও কাঁটাবন, পথ নেই বল্লেই হয়। একস্থানে নরম মাটিতে মস্ত বড় বাঘের পায়ের থাবা আঁকা। হাতীর নাদ আর পায়ের দাগ তো সর্ব্বত্র। বাইসনের পায়ের দাগও আছে। এক জায়গায় ফরেস্ট গার্ড দুটি দাঁড়িয়ে বনের দিকে চেয়ে আপনাদের মধ্যে কি বলতে লাগলো। কি ব্যাপার? বাঘ দেখেচে নাকি,

না হাতী ? মিঃ সিন্‌হা ধমক দিয়ে বল্লেন—আরে ক্যা হায় বোলো না। ওরা বল্লে—বানর, হুজুর।

ক্রমে একটা প্রস্তরময় স্থানে এলুম। একটি পাহাড়ী ঝর্ণা পাথরের ওপর দিয়ে চলেচে। আমি ভাবলুম, এই বুঝি সেই জায়গা। কিন্তু ফরেস্ট গার্ড থামে না। চলেচে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, শুধু তার পৃষ্ঠদেশ দেখতে পাচ্চি। এই সরু বনপথ নাকি বোনাই স্টেট্ থেকে আসবার শর্ট-কাট্—তাই ওদিকের বালাজোড় প্রভৃতি স্থান থেকে এ পথে পথিক লোক আসে। কিন্তু কেমন সে পথিক যে এই বন্য গজ ও ব্যাঘ্র অধ্যুষিত নিবিড় ও দুর্ভেদ্য বনপথ দিয়ে শর্ট-কাট্ করে সোজা সড়ক ছেড়ে, কত বড় তার বুকের পাটা তা বুঝতে পারলুম না। আবার কিছুদূর গিয়ে আর একটি প্রস্তরময় স্থানেও পাহাড়ী নদী। এখানে ক্ষুদ্র একটি cascade-এর সৃষ্টি করে ঝর্ণাটি চলেচে বয়ে। বেশ জায়গাটি, ভাবলুম, পৌঁছে গিয়েছি বুঝি—এই সেই টোয়েবু ঝর্ণা। দু-চারটি বন্যঘাসে ছাওয়া কুটির এখানে রয়েচে বনস্পতিদের ছায়ায়, বনবিভাগের কুলীরা গত বর্ষাকালে লতা কাটতে এসে এখানে ছিল ; তারাই তৈরি করে রেখেচে—এখন কে আর থাকবে এখানে ? শুনেছিলুম মাত্র দু'মাইল, অথচ তিন মাইল এসে গিয়েচি, আন্দাজে মনে হচ্চে, একঘণ্টা ধরে অনবরত হাঁটচি, অথচ টোয়েবু জলপ্রপাতের শব্দও তো শুনচিনে কোথাও। আবার পাহাড়ের মত উঁচুপথে পাথর ডিঙিয়ে চড়াইয়ের পথে উঠি, আবার উৎরাইয়ের পথে নামি—একস্থানে ফণি-মনসার গাছ অনেক, কালো পাথরের রুক্ষ জমিতে যথেষ্ট জন্মেচে। এবার বাঁদিকে জলের শব্দ পেলুম—আমাদের হাত-পাঁচেক নীচে অনেকখানি স্থানে পাথর বেরিয়ে আছে, তার ওপর দিয়ে জল গড়িয়ে পড়চে। এ ছাড়িয়েও ফরেস্ট গার্ড চলে যাচ্চে।

আমরা বলি—আর কতদূর ?

—এই হুজুর, তবে নামতে হবে নীচে।

আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ওপরের পথটা ছেড়ে মালভূমির নীচের দিকে নামতে লাগলুম উপত্যকার সমতলে। কাঁটায় কণ্টকময় বনফুলে এই চার মাইল আসতে পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রি রি করে জ্বলচে। কিন্তু নেমে গিয়ে হঠাৎ যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যভরা দৃশ্য ক্লান্ত চক্ষুর সামনে খুলে গেল, তার বর্ণনা দেওয়া বড় কঠিন। সেই ছায়ানিবিড় অপরাহ্ণ, সেই বাঘের পায়ের থাবা-আঁকা ঘোর জঙ্গলের পথে না হেঁটে এলে, সেই জনমানবের চিহ্নহীন বনানীর গোপন অন্তরালে লুকানো গম্ভীরদর্শন জলপ্রপাতের কথা কি করে বোঝাবো ?

অনেক বড় বড় চৌরস পাথরের বড় বড় boulder ঝর্ণার মুখে পড়ে আছে, তারই একটার ওপরে গিয়ে বসলুম। বেলা তিনটা বাজে, এখুনি সেখানে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। আমার সামনে একটা জলাশয়, ঘন কালো ঈষৎ সবুজাভ তার জল। এই জলাশয় নাকি অত্যন্ত গভীর, জলের চেহারা দেখলে তা বোঝা যায় বটে—'টোয়েবু' মানে 'মোচড়ানো ঘাড়'। এক হো জাতীয় লোক এখানে মাছ ধরতে এসেছিল স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। মাছ ধরে ধরে সে স্ত্রীকে ডাঙায় দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছিল, স্ত্রী লুফে লুফে নিচ্চে—একবার হঠাৎ বিস্মিতা স্ত্রীর হাতে

এল তার স্বামীর মস্ত-মোচড়ানো ঘাড়টা। সেই থেকে বন্ধ অপদেবতার ভয়ে এখানে কেউ মাছ ধরতে আসে না। অথচ মাছ নাকি খুব আছে।

আমাদের সামনে জলাশয়ের ওপারে প্রায় সত্তর আশি ফুট লৌহ-প্রস্তরের (Hematite quartzite) অনাবৃত দেয়াল খাড়া উঠেচে, তার শীর্ষে অপরাহ্ণের হল্‌দে রোদ্র, তার গায়ে গাছের মোটা মোটা শেকড় ঝুলচে। বড় বড় ঝুলন্ত পাথরের চাঁই জায়গায় জায়গায় যেন মোটা শেকড়ের বাঁধনে আটকে আছে ফাটলের গায়ে। এই পাহাড়ের দেয়ালের বাঁদিকে প্রায় সাত আট ফুট চওড়া জলধারা দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে সশব্দে প্রায় ২৫ ফুট ওপর থেকে নীচের বন্ধ অপদেবতার লীলাভূমি সেই সরোবরটাতে পড়চে। এই স্থানটি নিবিড় বনে ঘেরা, একটা সংকীর্ণ গহ্বরের বা বড় ইঁদারার মত—যেন ইঁদারার মধ্যে বসে মাথার দিকে চেয়ে আছি। বড় বড় আম, গাচাকেন্দ্‌ বা গাবগাছ, বেত, ফার্ণ, লম্বা লম্বা তৃণ, লুদাম, করঙ আরও অসংখ্য বন্য গাছে ছায়ানিবিড়। জলপতনধ্বনি দ্বারা দ্বিখণ্ডিত সেই গম্ভীর অরণ্যানিঃশব্দতা সুদূর অতীতের কথা, অন্তরের কথা, বিশ্বদেবের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কথাই কানে কানে বলে, সমাহিত মনে শুনতে হয়। এই রকম জলাশয় সম্বন্ধেই কর্ণেল ডল্টনের সেই উক্তিটি খাটে :—"**Pools, shaded and rock-bound in which Diana and nymphs might have deported themselves.**"

অনন্তের মৌন ইতিহাস এখানে আঁকা আছে পাথরের দেওয়ালের স্তরে স্তরে। বৈদিক আর্য্য ঋষিদের আমলেও এই ঝর্ণা ঠিক এমনি পড়তো ঘোর বনের মধ্যে, লোকচক্ষুর অন্তরালে এখানে লক্ষ লক্ষ পূর্ণিমার চাঁদ উঠেচে, লক্ষ লক্ষ অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার হয়েচে, বন্য-জন্তুর বংশের পর বংশ নির্ভয়ে জলপান করেচে—রেল্ হবার আগে, বন বিভাগের সৃষ্টি হওয়ার আগে বন্য লোক ছাড়া অন্য কারো চোখেই পড়েনি এ সৌন্দর্য্যভূমি। কে আসবে মরতে পথহীন জঙ্গলে, জানেই বা কে, খোঁজই বা করত কে? এই বিংশ শতাব্দীতেও এ স্থান নিকটবর্ত্তী রেলস্টেশন থেকে বনপথে একুশ মাইল। তার মধ্যে তেরো মাইল নিবিড় বনানী, শেষের চার মাইল নিবিড়তর বন, যার মধ্যে দিয়ে কোন সময়েই দলবদ্ধ না হয়ে বা উপযুক্ত পথ-প্রদর্শক না নিয়ে কখনই আসা উচিত নয়। পথ হারিয়ে যাবার খুবই সম্ভাবনা, একবার পথ হারিয়ে গেলে জনমানবের চিহ্নহীন এই ঘোর জঙ্গলের মধ্যে বন্যহস্তীর পদতলে, রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মুখে প্রাণ হারাতে হবে। অথচ কি সৌন্দর্য্য-ভূমিই লুকিয়ে রেখেচে প্রকৃতিদেবী মানবচক্ষুর অন্তরালে। হলদে রোদ রাঙা হয়ে আসচে, আর থাকা ঠিক নয়। সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। নিবিড় পথে চার মাইল গিয়ে মোটরে উঠতে হবে। এই পড়ন্ত বেলাতে হাতী বাঘ বেরিয়ে থাকে সাধারণত। রওনা হয়ে ঝর্ণার ওপারের দিকটাতে চওড়া পাথরের ওপর অনেকটা বসলুম। কতদূর লৌহপ্রস্তরের তৈরী ঢালু পর্ব্বতগাত্র বেয়ে ঝর্ণাটা নীচে নেমে ওই জলপ্রপাতের ও ঝর্ণার সৃষ্টি করচে। এ আর একটি অপূর্ব্ব স্থান কিন্তু আর বসা চলে না। আবার সেই দুর্গম পথে রওনা হলাম। পথে সেই বাঁশের কুটিরগুলির স্থানে এসে মনে হোল বড় চমৎকার, এখানেই থেকে যাই। সেগুনের জঙ্গলের মধ্যে নরম

মাটিতে আমি একটা নরম পায়ের দাগ দেখিয়ে বল্লাম—দেখুন আর একটা।

মিঃ সিন্‌হা বল্লেন—বহুৎ বড় পায়ের দাগ। রয়েল বেঙ্গল টাইগার—

তখন সন্ধ্যার আর দেরি নেই। বনানী অন্ধকার হয়ে এসেচে—হঠাৎ মনে পড়ল আজ আমাদের দেশে গোপালনগরের হাট, পঞ্চামাস্টার বেগুন বিক্রি করচে, মনো খুড়ো পানের দোকানে পান বিক্রি করচে। ওরা সেই ক্ষুদ্র স্থানে জন্মে চিরকাল ওখানেই আনন্দে আছে, জগতের কি-ই বা দেখলে?

এক জায়গায় বড় বড় আমগাছ, কি ফুলের সুগন্ধ বাতাসে, ঠাণ্ডা সন্ধ্যাবাতাসে বনানী থেকে ব্যারাকপুরের পল্লী প্রান্তে এ সময় যেমন সুগন্ধ ওঠে তেমনি পাচ্চি। রাধালতার ফুল এখানেও দেখলাম ঝোপের মাথায়। ঝন্দী কাঁটালের কালো পাতার রাশি অন্ধকার আরও কৃষ্ণতর করে তুলেচে। ওই ফুটস্ত বনস্পতি-শীর্ষে কম্‌প্রিটাম ডিকেনড্রাম লতার ফুল শোভা পাচ্ছে। ঘন গম্ভীর দৃশ্য বনানীর। সন্ধ্যায় সারেণ্ডা ফরেস্টের নিভৃত বনপথ দিয়ে যাওয়ার এ অভিজ্ঞতার তুলনা হয় না।

ফরেস্টার এক জায়গায় এসে বললে—ঠিক এখানে মল্লিকবাবু ফরেস্ট রেন্‌জার মস্ত বড় রয়েল বেঙ্গল টাইগার দেখেছিল—রাস্তা পার হয়ে বনের দিক থেকে ওদিকেই যাচ্ছিল, মল্লিকবাবু বলে —চাকরি ছেড়ে দেবো, সারেণ্ডায় আর চাকরি করবো না।

প্রতিপদে ভয় হচ্ছে। একবার ফরেস্ট গার্ড বনের দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়ালো। বুকের মধ্যে টিপ টিপ করে উঠলো—কি রে! দাঁড়ালি কেন? সে বল্লে—জংলী মোরগ হুজুর।

ধড়ে প্রাণ এল যেন—চলো বাপু। বন-মোরগ দেখে আর এখন কাজ নেই। এই সুনিবিড় অরণ্যে হাতী ও বাঘ হায়েনা চলাফেরা করচে, মানুষ মারচে—তার গল্প থলকোবাদে শুনেচি, কুমডিতে শুনেচি, বনগাঁয়ে শুনেচি আবার আজ বিটকেলসোয়াতেও শুনেচি। নিজের চোখে দু-তিন দিন বড় বাঘের থাবার দাগ দেখলুম মাটিতে—এবং তা হয়তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগের। আজই দেখেচি এক জায়গায় হাতী মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েচে তার দাগ। হাতীর বাইসনের ও সম্বরের পায়ের দাগ তো সর্ব্বত্র—ওর হিসেব কে রাখে। সুতরাং বন পেরিয়ে যাওয়াই ভালো।

ফরেস্টার বলচে—কাছেই এসেচি মোটরের। দু'রশি আছে। তখন একবার বনের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চেয়ে নিলুম। কি গম্ভীর দৃশ্য অরণ্যানীর, নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় কত উঁচুতে রাধালতার আর কম্‌প্রিটাম লতার কচি পাতা। ঘন বনে অন্ধকার হয়ে এসেচে। লোকালয় থেকে বহুদূরে সারেণ্ডা ফরেস্টের অভ্যন্তরভাগে দাঁড়িয়ে গোপালনগর হাটের কথা ভাবচি।

বাড়ী এসে অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে এই ডায়েরী লিখচি। খেয়েদেয়ে একবার বাইরে গেলুম, কি ঝক্ ঝক্ করচে নক্ষত্রগুলি পাহাড়ের মাথায়, অনন্ত ব্যোমে মহাকালের জ্যোতিঃ-ত্রিশূলের মত Orion জ্বলছে—এখানে ওখানে কত তারা, বিরাট ছায়াপথ জ্বলজ্বল করচে—বিশ্বদেবের ভাণ্ডারে কত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, কোটি beauty spot—তাঁর অনন্ত

দৃষ্টি কি করে আমরা বুঝব—শুধু মনে মনে তাঁর জয়গান করেই বিস্ময়ের অবসান করি।

রাত সাড়ে চারটায় উঠলুম, বাইরে গেলুম। জ্যোৎস্না উঠেছে, কালকের মত শুকতারা জলজল করচে, দূরের পাহাড়ের মাথার দিকে চেয়ে বাল্যের বারাকপুরের বাঁশবনে বাঁড়ী, বাবা মার কথা মনে এল। শৈশবের সমস্ত অবস্থা—আমাদের দারিদ্র্য, বালক হয়ে আমার সমস্ত মনের ভাব যেন আমাকে পেয়ে বসলো শেষরাত্রে। জীবন কি অপূর্ব্ব! কি অমৃতময়—জন্মে জন্মে শত শত বারাকপুরের মধ্যে দিয়ে শত বৈচিত্র্য, পিতামাতার কোলে বার বার আসি যাই ক্ষতি কি? শুধু যেন বিশ্বদেবকে মনে রাখি, তার অনন্ত রূপের অনন্ত বৈচিত্র্য দেখবার চোখ যেন পাই।

সকালে শালবনে বেড়াতে গেলুম। দূরে পাহাড়ের মাথায় কাল যেমন দেখেছিলুম একটা গাছ—বড় বড় বনস্পতি চারিধারে, বনের শান্ত শ্যামল সমারোহ। প্রাণভরে দেখি। চেয়ে থাকি।

শেষরাত্রে কালীর বোন পুঁটি দিদিকে স্বপ্ন দেখলুম, আশ্চর্য্য! পুঁটি দিদি যেন মার মত স্নেহে আমায় কি খেতে দিলেন। অল্প বয়সের পুঁটি দিদি।

আজ সকাল ন'টায় তিরিলপোসি থেকে স্নানাহার করে বার হয়েচি। সারেণ্ডা অরণ্যে ফাঁক কোথাও নেই—শুধুই চলেচে জঙ্গল। এক জায়গায় নেমে আমরা পাৎলা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম, সেখানে কাঠকয়লার ভাঁটা করে কয়লা পুড়ুচ্চে। তারপর কিছুদূর এসে এক জায়গায় দীঘা নামক বন্যগ্রাম। তার প্রান্তভাগে 'বিরহেরি' নামক যাযাবর বন্য জাতির আবাস, নেমে দেখতে গেলুম। অনেক ছেলেমেয়ে ও পুরুষ রোদে বসে চীহড় লতার দড়ি পাকাচ্চে। এই ওদের উপজীবিকা। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেচে দড়ি, শিকা—সব তৈরি করে চীহড়ের বাকল থেকে। খুব শক্ত দড়ি হয়। এক গ্রামে সপ্তাহ দুই থাকে, তারপর অন্য গ্রামে চলে যায়। কোথাও নির্দ্দিষ্ট জায়গা নেই থাকবার। একটি রূপী বাঁদর নিয়ে এল বিক্রি করতে। আমরা নিলাম না। বেশ সুন্দর পাথরে-কোঁদা চেহারা ওদের।

দীঘা ছেড়ে সামটা গ্রামের পথে আমরা চললুম। আবার জঙ্গল, পাশে একটা ঝর্ণা ও গভীর খাদ। এক এক সময় মনে হয় সরু পথে গাড়ীগুলি উল্‌টে যাবে। তেমনি গভীর অরণ্য। এপথে অনেক বাঁশ দেখলুম পাহাড়ী ঢালুর জঙ্গলে, এক জায়গায় বন্যকদলীও দেখা গেল।

সামটা গ্রাম বনের বাইরে। খ্রীষ্টান ও হিন্দুর বাস, তবে হো-দের বাসই বেশী। একটি ছেলের নাম বল্লে, চন্দন তাঁতি। একটু সভ্য কাপড় পরা ওরই মধ্যে। বল্লাম—তুমি খ্রীষ্টান?

—না, আমি হিন্দু।

—কালী-দুর্গা পূজা কর, না বোঙ্গা পূজা কর—

—বোঙ্গা পুজো করি।

একটা গাছের নীচে এরা মুরগী বলি দেয় ও আতপ চাউল নৈবেদ্য হিসেবে দেয়। সিং-বোঙ্গা এদের পরম দেবতা—সূর্য্যদেব। আরও বিভিন্ন বোঙ্গা আছে—এক এক রোগের এক এক বোঙ্গা।

সামটা থেকে এলুম জেরাইকেলা। এখানে এক ছোকরার সঙ্গে আলাপ হোল Range আপিসে। বাড়ী খুলনায়, এখন এখানেই দু-তিন বৎসর জঙ্গলে কাঠের ব্যবসা করে বাস করচে। রেঞ্জ আপিসে দেখা করতে এল—শুনলাম এখানে বেশ ম্যালেরিয়া।

জেরাইকেলা থেকে রওনা হয়ে তিন মাইল যেতে গভীর অরণ্য শুরু হোল। একদিকে গভীর অরণ্যভরা নদীখাত, অন্যদিকে পাহাড়ের দেওয়াল। পোঙ্গা পর্য্যন্ত সমানই অরণ্য, এক্সপোর্ট নাকা নামক বনবিভাগের কর্ম্মচারীর আবাসস্থানের কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলচি, একজন লোককে ডুলি করে নিয়ে যাচ্চে, জঙ্গলে B. T. T. কোম্পানীর কাজ করছিল, ম্যালেরিয়া ধরেচে।

আবার জঙ্গল। পোঙ্গা এলুম বেলা আড়াইটাতে। আগে এখানে B. T. T. কোম্পানীর আপিস ছিল, এখন কিছু নেই। পোঙ্গা থেকে মনোহরপুরের পথে রওনা হই—মিঃ সিন্‌হা ১৯২৪ সালের নভেম্বর মাসে বনবিভাগের শিক্ষানবীশী করতে এই পথে একা সাইকেলে আসেন, অতি দুরারোহ ও জঙ্গলাকীর্ণ পথ—এর আগে বনের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না তাঁর। কি ভাবে একা এখানে এলেন, আজ তাঁর মুখে শোনা পর্য্যন্ত এই পথ দেখবার বড় ইচ্ছা ছিল—এবার সে পথও দেখলুম এবং কোলবোংগা নামক গ্রামে যে কুটিরে তিনি রাত্রি কাটিয়েছিলেন, সেটাও দেখলুম। কুলিরা সন্ধ্যায় এখানে পৌছে আর তাঁর জিনিস নিয়ে যেতে চাইল না। এখন সে কুটিরের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েচে, পূর্ব্বে আঠারো বছর আগে বন এখানে ঘনতর ছিল। কোলবোংগার প্রান্তে এক পাহাড়ের ওপর একটি ছোট্ট কুটিরে এক গোসাঁই জাতীয় কৃষক বাস করে। বৃদ্ধ গোসাঁই ধান ঝাড়চে পাহাড়ের ওপরে খামারে। সেখান থেকে সুন্দর দৃশ্য চারিদিকে এবং খুব উঁচু পর্ব্বতমালা ও শিখরদেশ। সভ্যতার চিহ্ন কিছু কিছু দেখা গেল এর পরে, খিনডুং নামক স্থানে—এক্সপোর্ট নাকার আপিসের সামনে কয়েকটি বালক স্কুল থেকে আসচে। তাদের কাছে ডাকলুম, ওরা মনোহরপুর ইউ. পি. স্কুলে পড়ে, দু'মাইল দূরবর্ত্তী কোলবোংগা গ্রাম থেকে মনোহরপুরে পড়তে যায়।

মনোহরপুর এলুম—দূর থেকে রেলের ধোঁয়া দেখে মনে আনন্দ হোল। কোইনা নদী পার হয়ে মনোহরপুর বাজারে এলাম—চায়ের দোকান, খাবারের দোকান—কি আশ্চর্য্য জিনিস যেন। চোখে চশমা ভদ্রলোক ছড়ি হাতে বেড়াচ্চে, এ যেন এক নতুন দৃশ্য আজ আট-ন'দিনের জঙ্গলের গভীর নির্জ্জনতার পরে। দোকান বলে জিনিস আছে দুনিয়ায়, সেখানে পয়সা দিলে তুমি সিগারেট, খাবার, চা কিনে খেতে পারো—ডাকঘর আছে, ইচ্ছামত চিঠি লিখে ফেলতে পারো, এ যেন নতুন অভিজ্ঞতা।

মনোহরপুর বাংলো স্টেশনের কাছে একটি পাহাড়ের ওপরে। বেলা পাঁচটায় সেখানে

পৌঁছে গেলাম। চারিদিকের দূরে ও দূরের শৈলশ্রেণী দেখা যায় এই পাহাড়ের ওপরে বসে। সূর্য্য অস্ত যাচ্চে, আমি বাংলোর কম্পাউণ্ডে দাঁড়িয়ে ভাবচি ঐ ঘন শৈল্যারণ্য থেকে এসেচি, ওরই মধ্যে কোথায় সেই শিশিরদা জলাভূমি, গুহা, ওরই দুর্গম প্রদেশে সেই অপূর্ব্ব সুন্দর টৌয়েবু জলপ্রপাত, আত্তিসিরাং, বাঘের থাবা আঁকা সেগুন বন।

বনের দেবতা মারাং বোংগাকে প্রণাম।

আজ সকালে উঠে একটু বেড়াতে গেলুম। বাঙালীর মুখ অনেকদিন দেখিনি। মনোহরপুর বাজারের পথে সুধীর ঘোষ বলে এক ভদ্রলোকের বাড়ী গিয়ে উঠলুম। তাঁর বাড়ী খুলনায়। আনন্দ হওয়াতে তিনি চা খাওয়ালেন, ভাত খেতে বল্লেন। বড় ভদ্রলোক। সেখানে বসে সারেণ্ডা ফরেস্টের গল্প করলুম। এসে চা খেয়ে 'দেবযান' লিখতে বসি। মিঃ সিন্‌হা আপিস তদারক করতে গেলেন। রেন্‌জ অফিসারের নাম সুলেমান কায়কাট্টা, হো খ্রীষ্টান। রোদ পিঠে দিয়ে বসে লিখলাম অনেকক্ষণ। তারপর তেল মাখলুম রোদে বসে। মনে পড়চে নদীর ধারের কথা বারাকপুরের, হয়তো ছোট এড়াঞ্চির ফুল ফুটেচে এতদিন। ফণিকাকা তামাক খেতে খেতে গল্প করচে বাবিকের সঙ্গে। সামান্ত বিশ্রাম করলাম খাওয়ার পরে, তারপর ঘুম ভেঙে গেল। সেদিন শ্যামাচরণদা'র বোন পুঁটিদিদিকে স্বপ্ন দেখেছিলুম, যেন মায়ের মত যত্ন করচে। কল্যাণীর কথা ভাবচি, এতক্ষণে সে কি করচে?

বাইরে চেয়ে দেখচি, রোদ পড়েচে পাহাড়ের শালগাছের গায়ে। বিকেলের রোদ, হঠাৎ মনে পড়লো বাসান গাঁয়ে মোহিনী কাকার চণ্ডীমণ্ডপের কথা। কে আছে সেখানে এখন? কি করচে তারা? মুরাত্তিপুরে আমার মামার বাড়ীর সেই ছাদটি, সেই শৈশবের লীলাভূমি কলামোচা আমতলা—এত স্থানে বেড়ালুম, এখনও যেন মামার বাড়ীর পিছনের বাঁশবন রহস্যময় মনে হচ্ছে। শৈশবের মতই। বারাকপুরের তেঁতুলগাছটার তলায় আমাদের বাড়ীর পাঁচিলের পিছনে কখনো যাইনি, বাগানে পাড়ার বহুস্থানে কখনো যাইনি আমাদের গাঁয়ে। উঠে পাহাড়ের ওপরে রোদে একটা পাথরে বসলুম। বাংলোর ঠিক পিছনেই পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ অংশ। তার একটু নীচের অংশে আমাদের বাংলো। এক মিনিটেই পাহাড়ের মাথায় গিয়ে বসলুম। আমার সামনে বিস্তৃত সারেণ্ডা ও কোলহান শৈলমালা, আংকুয়া লৌহখনি বহুদূর থেকে লাল দেখাচ্ছে জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের মাথায়। সারেণ্ডা পর্ব্বতমালা ও ছোটনাগপুর মালভূমির সংযোগস্থলে সারেণ্ডা টানেলের মধ্যে দিয়ে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ চলে গিয়েচে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে। ঐ পর্ব্বতমালার ওপারে বহুদূরে ঘাটশিলা, যেখানে কল্যাণী রয়েচে। তারও বহুদূরে ওধারে বারাকপুর, আমার উঠানে ছায়া পড়েচে, কুঠির মাঠের সেই জলাভূমিটি, তিহু যেখানে ধান কাটচে, তার ধারে জেলেরা জমি চষেচে এবার দেখে এলাম—ওদের কথা মনে পড়ে গেল। ঐ পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে ঐদিকে কোথায় সেই বনমধ্যস্থ গুহা, ঐ দিকে কোথায় সেই অতি সুন্দর টৌয়েবু জলপ্রপাত কোথায় সেই বাঘের পায়ের থাবা আঁকা সেগুনবন, কোইনা নদীর

গর্ভস্থ পাষাণময় স্থান জাতিসিরাং, দেবকাঞ্চনফুলের মেলা। বিশ্বদেবের উপাসনা এমন স্থানেই সম্ভব ও সার্থক।

চা খেয়ে বেড়াতে বার হই। গিরিনবাবুর সঙ্গে দেখা, দেবীবাবুর শ্বশুর? অনেকদিন আগে পোসোইতা স্টেশনে দেখা হয়েছিল। ইনি আমায় জঙ্গল দেখাবেন, এক সময় ধারণা ছিল। হরজীবন পাঠক এখানকার একজন লক্ষপতি কাঠব্যবসায়ী। মোটা মোটা শাল কাঠ পড়ে আছে বহুদূর পর্য্যন্ত স্টেশন ইয়ার্ডে। বনস্পতি উচ্ছেদ করে এ ব্যবসা আমার পোষাবে না। যিনি বনস্পতিতে আছেন, আমি তাঁকে মানি। মনে হবে প্রাণীহত্যা করচি। অরণ্যের সৌন্দর্য্য নষ্ট করচি। তবে কথা এই—B. T. T. কোম্পানী জঙ্গল উজাড় করে পয়সা লুটে ইংলণ্ডে পাঠাচ্চে। আমাদের দেশের লোক হরজীবন পাঠক কিছু খায় তো ভালই।

কোইনা ও কোয়েল নদীর সঙ্গমস্থান দেখতে গিয়ে বেলা গেল। প্রকাণ্ড বড় খ্রীষ্টান মিশন নদীর ধারে। তারপর নৃসিংহ দাস সাধুজীর আশ্রমে গিয়ে বসলুম; বেশ শান্তিপূর্ণ স্থান, দক্ষিণ কোয়েল নদীর তীরে। নৃসিংহ দেবের মূর্ত্তি আছে মন্দিরে, সাধুজীর এক চেলা এখন মোহান্ত, উনি মারা গিয়েছেন এক-দেড় বৎসর। আরা জেলার এক পণ্ডিতজী—বড় দীন, বিনয়ী—হরজীবন পাঠককে খুব খাতির করলে। জী সরকার, বৈঠিয়ে, জী সরকার, দেখিয়ে।

এত ভাল লাগলো কেন পণ্ডিতজীকে? বল্লে—সাধুজী যব রহতে তব মেজাজ একদম গদ্ গদ্ হো যাতা। বহুৎ রঙ্গিলা সাধু থে। পণ্ডিতজী খোশামোদ করচে পুনঃপুনঃ লক্ষপতি ধনী হরজীবন পাঠক ও মোহান্তজী দুজনকেই। রোজ সন্ধ্যাবেলা পণ্ডিত সম্ভবতঃ আশ্রমে এসে বসে, গল্প করে, প্রসাদ-ট্রসাদ পায়।

নৃসিংহ দাস সাধুর ইষ্টদেবতা এক ক্ষুদ্র শিলামূর্ত্তি। তিনি নাকি সব বাড়ী বাগান তাকে করে দিয়েচেন। সুন্দর ফুলের গন্ধ বেরুচ্চে বাগানে। চাঁপা, মল্লিকা, আম, হেনা, দারুচিনি, এলাচ—সব গাছ আছে এ বাগানে। সাধুজী আমাদের পানজেরি ও কলা দিলেন প্রসাদ-স্বরূপ। পানজেরি কখনো খাইনি, দেখলুম ধনের গুঁড়ো আর চিনি। আশ্রমটি সত্যিই ভাল লাগলো।

বাড়ী এসে উঠলুম, রাত আটটা। মন্মথদা আজ আমার চিঠি পেয়েচে, কল্যাণীও পেয়েচে মন্মথদার বাইরের ঘরে দরজা বন্ধ করে নিশ্চয়ই সব বসে গল্প করচে, আমার চিঠিখানাও পড়চে।

আজ সকালে উঠে রোদে বসে খানিকটা লিখি 'দেবযান'। তারপর কোলবোংগার পথে যেতে পাকেমণ্ডটু বলে একটি গ্রামে পাহাড়ের ওপর কিছুক্ষণ বসলুম। সুলেমান কারকাট্টা ও মিঃ সিন্‌হা বস্তী তদারক করছিলেন, সেই সময় আমি পাশের পাহাড়টাতে গাছের ছায়ায় বসি। সামনে বেশ সুন্দর দৃশ্য, পাহাড়ের পর পাহাড়। একটা গাছ ঠিক চাঁপাগাছের মত, কিন্তু একটি ছেলে বল্লে ওতে ফুল হয় না, ছোট ছোট বীচিমত হয়—অর্থাৎ

mendoandia exerta, এই গাছই এ দেশে সর্ব্বত্র, দেখতে চাঁপা গাছের মত। ছেলেটির নাম দিবাকর দাস, হিন্দিতে কথা বলে, জাতে তাঁতি। এদেশে হিন্দু হোলেই তাঁতি হবে, নয়তো গোসাঁই হবে। বাকী সব হো আর মুণ্ডা। ভাষা হো ছাড়া আর কিছু নেই—তবে একটু শিক্ষিত লোকে হিন্দী জানে। ছোকরা চাকুরী চায় এক্সপোর্ট নাকার গার্ড। বলে দিলুম চাকুরীর জন্যে। যদি ওর হয় বড় আনন্দ হবে আমার।

কোলবোংগা গ্রামে সেই গোসাঁই-এর বাড়ীটা ওই পাহাড়ের মাথায়। তারপর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে অনেকদূর গেলুম। সেদিন যে নদীগর্ভে বসে চা খেয়েছিলুম পাথরের ওপর, তার নামটি বেশ ভাল—'মহাদেব শাল'। ওটা পার হয়ে বনের মধ্যে ঢুকে ঘন লতা-দোলানো নিবিড় জঙ্গলের পথে আবার দুটি নদী পার হলুম—বড় বড় পাথরের ওপর দিয়ে গভীর বনচ্ছায়ায় কুলুকুলু শব্দে বয়ে চলেচে। সকালে কত কি পাখী ডাকচে বনে বনে। নিস্তব্ধ বনানী, একই দৃশ্য সারেণ্ডার ঘনজঙ্গলে। সাড়ে পাঁচ মাইল মাত্র দূর মনোহরপুর স্টেশন থেকে অথচ কি নিবিড় বন। ধলভূমে এমন বন নেই কোথাও।

ফিরে আসতে কোইনা নদীর ধারে এক্‌স্‌পোর্ট নাকার আপিসে তদারক করতে দেরি হয়ে গেল। বাড়ী ফিরে স্নান করে কিছু বিশ্রাম করলুম। পাহাড়ের ওপর বাংলোর পিছনে গিয়ে বসি রাঙা রোদভরা বিকেলে। চারিদিকে স্তরে স্তরে ঘন নীল শৈলশ্রেণী, একটার পেছনে আর একটা, তার পেছনে আর একটা, থৈ থৈ করচে শুধুই পাহাড়। ডাইনে খুব উঁচু একটা পাহাড়ের গায়ে রাঙা লৌহপ্রস্তর বার হয়ে আছে—ঐ হোল চিড়িয়া খনি। বেঙ্গল স্টীল কোম্পানী ওখান থেকে লৌহপ্রস্তর কেটে এনে রেলযোগে মনোহরপুর এনে ফেলচে স্টেশনের পাশে। কত কথা মনে পড়লো পড়ন্ত রোদে দূরের শৈল-শ্রেণীর দিকে চেয়ে। কল্যাণী রয়েচে কতদূরে, কি এখন করচে, ওর জন্যে মন হয়েছে ব্যস্ত। আর পাঁচদিন কোনরকমে কাটালে হয়। গৌরীর কথা—আজ ২১শে নভেম্বর, সেই ২০ নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে এই সময় প্রথম গিয়েচি, সেই উদ্বেগ, 'যতবার আলো জ্বালাইতে যাই' সেই গানটার কথা। এই সময়েই সে মারা যায়। জাহ্নবীর কথা—সেও এই সময়, বোধ হয় আজই হবে। আজই আবার গোপালনগরের হাট, এতক্ষণে পঞ্চামাস্টার বেগুন বিক্রী করচে, মনো খুড়োর দোকানে লেগেচে ভিড়। সেই ছায়াভরা বনপথে ছোট এড়াঞ্চির ফুল ফুটেচে হয় তো। ১৯৩৫ সালে আজকার দিনে আশুতোষ হলে কবি নোগুচির বক্তৃতা শুনেছিলুম আর ভেবেছিলুম গ্রামের নাজন হয়তো নদীর ধারে মাঠে কলা-বেগুনের ক্ষেতে গরু চরাচ্চে। আজও তাই ভাবচি, দূরে গেলেই দেশের কথা আমার মনে পড়ে। কল্যাণী দেশে যেতে চায়, ওকে নিয়ে যাবো।

বিকেলে মিঃ সিন্‌হা, আমি ও হরজীবন পাঠক আশ্রমে বেড়াতে গেলুম। সুন্দর লতা-বিতান, কত ফুল ফলের গাছ। নদীর ধারে নিভৃত কুটির-মধ্যে বিশ্রামের জন্য বেদী, হেনা ফুলের সৌরভ। পবিত্র পুরনো তপোবনের শান্ত পরিবেশ। খাঁটি ভারতীয় সভ্যতা ও আবহাওয়া। নৃসিংহ দাস বাবাজির সমাধি ফুল দিয়ে সাজিয়ে রেখেচে, সেখানে তার চেলা

বসে গাঁজা খাচ্ছে সন্ন্যাসী। নদীর ধারে লতাকুঞ্জ, মধ্যে ক্ষুদ্র শিবমন্দির। মন আপনিই অন্তর্মুখী হয়ে যায় এই জায়গায় এসে। সাধুজির কাছে বসলুম, তিনি আসনে বসে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়চেন, ধুনি জ্বলছে সামনে। ইনিই বর্ত্তমান মোহান্ত।

ওখান থেকে বেরিয়ে সুধীর চাটুয্যের বাড়ী এলুম আমরা সবাই। সুধীরবাবু অতি বিনয়ী, আমরা গিয়েচি বলে বড় খুশি। চা এনে দিলেন, ঘন ঘন পান ও সিগারেট দিলেন। সরল, অমায়িক ভদ্রলোক—আমাদের দেশের মত কথার টান।—বল্লেন—একসঙ্গে বসে ছুটি খাবো বড্ড ইচ্ছে ছিল, তা হোল না। আপনি দয়া করে আমার এখানে এসেছেন।

অনেকদূর পর্য্যন্ত উনি আর হরজীবনবাবু আর একটি ছোকরা সঙ্গে এলেন। সুধীরবাবু পানিতরের কথাও জানেন, আমার প্রথম শ্বশুরবাড়ী। বল্লেন—'পান্‌তর', বাবা যেমন বলতেন। কতকাল পরে ঐ গ্রামের ঐ উচ্চারণ শুনলুম এতদূরে বসে।

বিশ্বদেবের জয় হোক।

*

সকালে মনোহরপুর থেকে এখানে আসবো, হরজীবন পাঠক ও সুধীরবাবু এসে খুব গল্পগুজব করলেন। আমি আর কখনো মনোহরপুর আসি না আসি, বাংলোর পেছনের পাহাড়টাতে উঠে বসে রইলুম পূবদিকে চেয়ে।

খেয়ে বেলা দুপুরের পর মোটরে উঠে কোলবোংগার পথে পোংগা আসবো, এক জায়গায় ফরেস্ট গার্ড আমাদের অতি দুর্গম ও ভীষণ কাঁটাজঙ্গলের পথে বাঁশবন দেখাতে নিয়ে গেল পাহাড়ের ওপারে লুবড়া নালা ভ্যালিতে। অতি কষ্টে সেখানে গিয়ে পৌঁছে আমি বনের মধ্যে উপত্যকার দিকে মুখ করে বসলুম, মিং সিন্‌হা, রেন্‌জার সুলেমান কারকাট্টা ও ফরেস্টার —ওরা সব নীচে গেল। সুলেমান বল্লে—বহুৎ steep নালা, আপ তো উতারনে নেহি· সকেঙ্গে—

আমি বসে দূরের পাহাড়শ্রেণীর শোভা দেখচি সামনের গাছপালার ফাঁক দিয়ে। এমন সময় ওরা ফিরে এল, আমার জেদ ধরে গেল যে ওরা যা করেচে আমিও তা পারবো। এই জেদ থেকেই সারেণ্ডা পর্ব্বতারণ্যের মধ্যে একটি সুন্দর এমন কি সুন্দরতম স্থানের আবিষ্কার করা সম্ভব হোল।

মিঃ সিন্‌হা বল্লেন—আসুন, আসুন—দেখুন কেমন সিনারি। আমি গিয়ে চেয়ে অবাক হয়ে গেলুম। মাত্র চল্লিশ ফুট নেমেচি যেখানে বসে ছিলুম সেখান থেকে। একখানা চওড়া পাথর যেন শূন্যে ঝুলচে, তার নীচে আরও কয়েক থাক প্রস্তরের সোপান, মাত্র হাত ছ-সাত —তারপরই প্রায় ন'শো ফুট খাড়া নীচু উৎরাই—পাথর ফেলে দেখলুম চার পাঁচ সেকেণ্ড পরে তবে প্রথম পতনের শব্দ পাওয়া যায়, তারপরে গুরুগম্ভীর শব্দে গড়াতে গড়াতে যেন কোন অতলস্পর্শ গহ্বরে গিয়ে পড়ে। মাথা নীচু করে গিয়ে দাঁড়াতে ভরসা হয় না, মাথা ঘুরে পড়ে যাবো ঐ অত্যন্ত নীচে উপত্যকার মেজেতে, যেখানে বন্য বাঁশঝাড়, আরও কত কি গাছের মাথা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপের মত দেখা যাচ্ছে। আমাদের এই পাহাড়টার উচ্চতা

২২২৬ ফুট,-১৫০ ফুট আর উঠতে হয়তো বাকী, সবটুকুই উঠেচি তা ছাড়া। সামনে ৯০০ ফুট খাড়া নীচু উৎরাই সরল রেখায় নেমে গিয়েচে। আমাদের সামনে ১৬৫৬ ফুট উঁচু একটা পাহাড়ের মাথা—আমাদের নীচে একটু ডানদিকে ঘেঁষে। সামনের উপত্যকাভূমি নিবিড় সবুজ, মেষলোমের মত বৃক্ষশীর্ষে ভর্ত্তি। তার ওপারে স্তরে স্তরে উঠচে শৈলশ্রেণীর পেছনে শৈলশ্রেণী, সমুদ্রের তরঙ্গমালার মত। আমাদের এই Vantage point-টি একটি খাঁজে অবস্থিত, দুদিকে চলে গিয়েচে বনাবৃত দুই শৈলবাহু বহুদূর পর্যন্ত। বাঁদিকের বাহুতে অনাবৃত পাথর বেরিয়ে আছে বহু স্থানে, একটা বটগাছ হয়েচে, আরও অনেক বড় বড় গাছ থাকে থাকে নেমে হঠাৎ যেন শূন্যে ঝুলচে। ঐ একটা শিববৃক্ষ আমাদের কত নীচে ডান দিকে, ঐ মনোহরপুর টাউনের অস্পষ্ট সাদা সাদা বাড়ীগুলি দেশলাইয়ের বাক্সের মত দেখাচ্ছে, কোলবোংগার পাহাড়টা সমতলভূমির সঙ্গে মিলে সমান হয়ে গিয়েচে এতদূর থেকে। বনভূমি নিনাদিত হচ্ছে ময়ূরের কেকারবে, নিম্নের উপত্যকার জঙ্গলে। এই নির্জ্জন গহনারণ্যে ময়ূরের কেকারব, ওপরে দ্বিপ্রহরের নীলাকাশ, বহু বহু নিম্নে সংকীর্ণ উপত্যকায় পার্ব্বত্য ঝর্ণা লুবড়া নালার কালো খাত—আমাদের আশেপাশে বিশাল বনস্পতিশ্রেণী, আমলকী গাছ, বাঁশঝাড়, পাহাড়ের অনাবৃত প্রস্তরময় অংশ, চীহড় লতা, রামদাঁতনের কাঁটা লতা, শূন্যে ঝোলা একটি কি গাছ আমাদের সামনে—এক ধরনের লজ্জাবতী ফুলের মত বনফুল—পর্ব্বতসানুতে, যেন এক বিরাট চিত্রকরের বিরাট ছবি। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য চোখের সামনে মুক্ত হল! না দেখলে এ দৃশ্যের বিরাট মহনীয়তা, গাম্ভীর্য্য, ভয়, বিস্ময়, সৌন্দর্য্য কিছুই বোঝানো যাবে না। আমাদের কত নীচে বাঁশবনে পাখী উড়ছে একদল। ন'মাইল এ স্থান মনোহরপুর থেকে। তারপর অতি কষ্টে বহু দুর্গম কাঁটাবন ভেঙে আবার মোটরের কাছে পৌছলাম। পথপ্রদর্শক না থাকলে অসম্ভব নামা পুনরায় পথে। ফরেস্ট রেনজার পথ হারিয়ে গেল। আমরা অন্তদলে অন্তপথে ভুলে চলে গেলুম। নামচি, নামচি—রাস্তা আর আসে না। তেমনি রামদাঁতনের কাঁটালতা সর্ব্বত্র—পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল কাঁটায়। এই স্থানে কখনো কেউ আসেনি আমি বলতে পারি।

মিঃ সিন্‌হা এ পথে এসেছিলেন ১৯২৫ সালে নভেম্বর মাসে—ঠিক এমনি সময় কোলবোংগা থেকে সাইকেলে। যতই অগ্রসর হই বোংগায় দিকে, সেই ঘোর জঙ্গলের মূর্ত্তি দেখে মনে হয় এ দেখচি ট্রপিক্যাল ফরেস্ট। এই পথে একটি তরুণ যুবক একা কি ভাবে এসেছিল তাই ভাবি। তিনি তখন নববিবাহিত, পথের চেহারা দেখে ভয়ে উইল করতে চাইলেন, এক এক স্থানে এমন জঙ্গল যে চারিধার থেকে চেপে ধরচে ঘোর জঙ্গলে। ঝর্ণার জল খেতে খেতে অগ্রসর হয়ে এই পোংগায় এসে পৌছোন। একদিকে একটা ঝর্ণা, বড় বড় পাথর—অবশেষে আমরা পৌছে গেলুম একটা খোলা জায়গায়। সুরগুজার ক্ষেতে ফুল ফুটে আছে দেখে মনে হোল লোকের বাস দেখচি রয়েচে এখানে। এইখানে B. T. T. কোম্পানীর করাতের কারখানা ছিল আগে। জায়গাটার নাম হোল পোংগা। এই ব্রিটিশ কোম্পানী সিংভূমের এ অঞ্চলের বনভূমির যাবতীয় কাঠ কেটে চালান দিচ্ছে আজ চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর

ধরে। এদের শেয়ার হোল্‌ডারদের মধ্যে পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বার পর্য্যন্ত আছে। একটা খুব বড চালাঘরে এদের ফরেস্ট ম্যানেজার মিঃ লক্‌মার থাকে। কেরানীদের থাকবার জন্ত একটা ধাওড়া ঘর আছে। ' দু-একজন বাঙালী মেয়েকে যেন দেখলাম, তবে ঠিক বলতে পারি না।

তারপর মাইল খানেক এগিয়ে এসে আমরা উম্‌রিয়া বলে একটা জায়গায়, মিঃ সিন্‌হা যে ঘরে থাকতেন ১৯২৫ সালে, তাই দেখতে গিয়ে দেখি সেখানে বসবাস নেই। কিন্তু অপূর্ব্ব সুন্দর স্থান। উম্‌রিয়া বলে একটি পাহাড়ী নদী বয়ে যাচ্ছে খুব শব্দ করে, বেশ চওড়া নদী —অসংখ্য পাথর ছড়ানো। একদিকে কি সুন্দর বনের বড় বড় গাছ ও পাষাণময় উচ্চ তীর। অপরাহ্নের ছায়া পড়ে এসেচে, রোদ হলদে হয়েচে—পানিতরের তেতলা বাড়ীর ছোট্ট ঘরটা যেন এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। অনেকক্ষণ নদীর ধারে বসে রইলুম, কুলুকুলু শব্দ যেন এই বনশ্রীর অনন্ত সঙ্গীত। যেদিন ভারতে প্রথম বেদগাথার উদাত্ত সুর ধ্বনিত হয় উম্‌রিয়া ঝর্ণা তখন বহু, বহু প্রাচীন। বেদপারগ ও রচয়িতা ঋষিদের অতি অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের শৈশবেও এ এমনি বয়ে চলতো ঘনতর বনানীর মধ্যে আপনাতে আপনি মত্ত, চপল খুশিতে ভরা বন্য মেয়ের মত প্রাণোচ্ছল নৃত্যচ্ছন্দে ছুটে ছুটে, আজকার দিনের মত তখনও তার দুধারে ফুটতো দেবকাঞ্চনের ফুল, বন্য শেফালী, পাষাণের তটে কত শরৎ ও হেমন্ত সকালে ঝরা ফুলের রাশি ছড়িয়ে দিত আজও যেমন দেয়, কত চাঁদ উঠেচে, কত পাখী গেয়েচে ওর দুধারের শৈলারণ্যে। সে কি প্রাণ-মাতানো কুহুকুহু ধ্বনি, বাঁদিকের বাঁকে বড় বড় গাছের মাথায় কম্‌প্রিটাম ডিকেন-ড্রাম লতার কচি পাতায় হল্‌দে রোদ মাখা সে কি সৌন্দর্য্য, কি শান্তি, কি নিস্তব্ধতা—কাদা নেই, ধুলো নেই—শুধু পাষাণময় তীর, উপলবিছানো নদীগর্ভ। এইসব স্থানে প্রাচীন দিনে তপোবন ছিল, নইলে আর কোথায় থাকবে?

এরই কাছে ঘন বনের মধ্যে বনবিভাগের সংরক্ষিত অঞ্চলে (preservation plot) ১৮০।২০০ বছরের পুরনো শালগাছ দেখলুম। আমার ঠাকুরদাদা যখন বালক, তার আগে থেকেও এ গাছ এখানে রয়েচে—তবে তখন ছিল চারা মাত্র। বনস্পতিদের যারা দেখেনি, তারা উপনিষদের ঋষিদের মন্ত্র 'যো ওষধিষু, যো বনস্পতিষু' একথার মর্ম্ম বুঝবে না।

সন্ধ্যার আগে আমরা অপূর্ব্ব সুন্দর বনপথে ছোটনাগ্‌রা এলুম। সামনে গুয়ার উঁচু পাহাড়, আগে ভেবেছিলুম সলাইয়ের চিড়িয়া খনির। রাঙা পাথর বার করা জায়গাটা যেমন মনোহরপুর বাংলোর পাহাড় থেকে দেখা যায় তেমনি। সুন্দর জায়গাটি—স্টেশন থেকে কুড়ি বাইশ মাইল দূরে চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা বনে ঘেরা স্থানটি—তবে একটা বন্য গ্রাম আছে, তারা বাজরা সরগুঁজা ইত্যাদি বুনেচে ক্ষেতে। পোংগা থেকে ছোটানাগরার এই রাস্তাটির অত্যন্ত সুন্দর দৃশ্য, একদিকে বড় বড় পাথর ও নির্জ্জন ঘন বনের মধ্যে দিয়ে পদে পদে সৌন্দর্য্যভূমি সৃষ্টি করতে করতে ছুটে চলেচে উম্‌রিয়া নদীটি—বাঁদিকে ঘন বন, কম্‌প্রিটাম্ ডিকেনড্রামের মোটা মোটা লতা গাছের মাথায় ঠেলে উঠে এদিকে ওদিকে নিরালম্ব অবস্থায় শূন্যে দুলচে, যেমন উম্‌রিয়া নদীর দুধারে উঁচু মাস্তুল-সমান বনস্পতিদের মাথায় এমনি লতা দুলছিল, সাদা সাদা কচি পাতার সম্ভার নিয়ে, যেন সাদা ফুল ফুটেচে কোপের মাথায়। রোদ

রাস্তা হয়ে এসেচে গুয়া পাহাড়ের মাথায়। আমরা ওদিকে দিয়ে ঘুরে আবার এদিকে এসে পড়েচি। এই পাহাড়ের ওপারে গুয়া, steep রাস্তা দিয়ে উঠে বনের মধ্যের পথে সাড়ে ছ' মাইল মাত্র, কিন্তু মোটরের রোড দিয়ে বাইশ মাইল।

আমি বললুম—তবে শশাংদাবুরু এখান থেকে কেন দেখা যাবে না? তিন হাজার ফুট উঁচু পাহাড়—সেদিন শশাংদাবুরুর মাথা থেকে আমরা ছোটানাগরা দেখেছিলুম—এখান থেকে কেন শশাংদাবুরু দেখা যাবে না?

গুয়ার সমশ্রেণীতে যে পাহাড় টানা চলে গিয়েচে—তারই এক জায়গায় শশাংদাবুরু, খুব উঁচু—আমরা ঠিক করলুম।

সন্ধ্যায় একটি ঝর্ণার ধারে নিবিড় অন্ধকার বনে, গ্রাম থেকে কিছুদূরে বসি। সারেণ্ডার সব স্থানই ভাল, কত সহস্র beauty spot যে এর মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়ানো—তা কে বলবে? আমার আবার সব জায়গাই ভাল বলে মনে হয়, সুতরাং চারিদিকেই beauty spot-এর ভিড়ে দিশাহারা হয়ে আছি। নক্ষত্র উঠেচে অন্ধকার আকাশে বনস্পতি-শীর্ষে। চলে এলুম তাড়াতাড়ি, কি জানি হাতীটাতী আসতে পারে।

বড় শীত। আগুনের পাশে বসে সারদানন্দের 'রামকৃষ্ণদেবের জীবনী' পড়ি।

আজ সকালে উঠেচি খুব ভোরে। সূর্য্য তখনও ওঠেনি। বেশ শীত। চা খেয়ে বসে লিখচি। তার পরে মালাইয়ের পথে পাঁচ মাইল গিয়ে বাঁদিকে জঙ্গলের গায়ে হেন্দেসিরি পাঠকজির saw-mill দেখতে গেলুম। কাছেই একটি ঝর্ণা বয়ে যাচ্চে, নির্জ্জন বনে ঘেরা beauty spot, তার মধ্যে ছোট্ট কারখানাটি। একটা পাহাড়ের ওপরে মালিকের জন্যে এক ছোট্ট বাংলো করে রেখেচে, মাটির মেজে গোবর দিয়ে রেখেচে। এখানে বসে লেখা-পড়ার কাজ বেশ চলে!

বেলা একটার সময় ফিরে তেন্‌তারি ঘাটে গিয়ে কোইনা নদীতে পার হওয়া যায় কিনা দেখে এলুম। কোইনা নদীর সঙ্গে বার বার দেখা হচ্চে, প্রত্যেক বাংলোতে থাকতে। কেবল দেখা হয়নি তিরিলপোসি থাকতে। অপূর্ব্ব শোভা এই বন্য নদীর, তেন্‌তারি ঘাটেও তাই, বড় বড় পাথর বাঁধানো তটভূমি বনস্পতিশ্রেণীর মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেচে। এক জায়গায় চুপ করে বসে রইলাম।

Range Officer বল্লে, 'ছোটানাগরা' নামের অর্থ এখানে একটা লোহার নাগরা বা ঢোল আছে বনের মধ্যে পড়ে, প্রাচীন দিনে মানুষের চামড়া দিয়ে ঢাকা হোত এবং বাজানো হোত।

পথে আসতে মোটরের স্প্রিং ভেঙে গেল, বেলা তখন দু'টো। এসে স্নানাহার করে কিছু বিশ্রাম করলুম। 'দেবযান' লিখি।

তারপর বেলা পড়লো—পশ্চিম দিকের পাহাড়ের আড়ালে সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন, চারিধারে পাহাড়ে-ঘেরা জায়গাটার কি চমৎকার শোভা হোল। আমরা একটু বেড়িয়ে এলুম পথ দিয়ে। একটা ঘাসওয়ালা পাহাড়ে উঠতে গিয়ে কাপড়ে ঘাসের বিচি লেগে গেল।

বাংলোর পেছনে ছোট্ট টিলাটার পাথরের ওপরে বসলুম সন্ধ্যায়। আকাশে নক্ষত্র উঠেচে, বনের মাথায়, পূবদিকে একটা গাছের আড়ালে পড়েচে সেই জলজলে নক্ষত্রটা, ফুলডুংরি থেকে সেদিন রাত্রে যেটা দেখেছিলুম। পশ্চিম আকাশে বনের পাথরে পাহাড়ের মাথায় অস্ত দিগন্তের রাঙা আভা।

অসীম নক্ষত্রময় ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত সৃষ্টি। একমনে বসে যোগাসনে সেই বিশ্বস্রষ্টার কথা যাঁরা চিন্তা করেন, এইসব সন্ধ্যায়, এই সব বনানীর শান্ত পবিত্রতায়—তাঁরা সাধু, যোগী। তাঁদের কথা জানি না, তবে চারিদিকে চেয়ে এই সন্ধ্যায় মন ভরে উঠলো বটে। বিশ্বদেবের উদ্দেশে আপনিই মাথা নত হয়ে আসে। দূরের ক্ষুদ্র বারাকপুর গ্রামে এখন নদীতীরে ছায়া পড়েচে, দূরে মাঠে পড়েচে, লিচুতলা ক্লাবে মন্মথদা ও যতীনদা বসে গল্প জুড়েচে—কল্যাণী ঘাটশিলায় সন্ধ্যাদীপ দেখাচ্চে, কতদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি।

জীবনের কত অদ্ভুত রহস্য—অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! এমন স্থানে এমন সময়ে জীবনটাকে ভেবে দেখবার অবকাশ পায় ক'জন? কর্ম্মকোলাহলমুখর শহরে মানুষ নিজেকে বুঝতে জানতে পায় না। এই নিস্তব্ধ গম্ভীর বনপ্রান্ত, ঐ শৈলমালা, অগণ্য নক্ষত্রদল মাথার ওপরে, সন্ধ্যার মায়া—আলো-মাখানো দিগন্ত, বনশীর্ষ শৈলচূড়া, ঝিঁঝিঁর ডাক—সবই মনকে অন্তর্মুখী হতে সাহায্য করে।

আজ শীত কম। অনেকক্ষণ বসে রইলুম পাহাড়টাতে। তারপর অন্ধকার ঘনীভূত হোল। মিঃ সিন্‌হা বাংলোর টেবিলে বসে লিখচেন দেখতে পাচ্ছি, হাতীর বা বাঘের ভয়টা তত নেই এখানে।

উনি ডাকলেন—দাদা—

আমি বল্লাম যাই—

আজ সকালে উঠে আমরা মোটরে সলাই বাংলোতে এলুম। পথে ছোটানাগরা গ্রাম ছাড়িয়ে একটা লতা-ঝোপের মধ্যে দুটি লোহার ঢোল পড়ে আছে। একটা ছোট, এক ফুট ব্যাসবিশিষ্ট, অন্যটি আড়াই ফুট ব্যাসবিশিষ্ট। এই জঙ্গলে এক রাজা ছিল—তার নাম অভিরাম টুং। তার আমলে এখানে বাড়ী ছিল। ছোট ঢোলটা মানুষের চামড়া দিয়ে ছাওয়া হোত ও বাজানো হোত।

সলাই বাংলোটি বড় চমৎকার স্থানে অবস্থিত। বামে, সম্মুখে, অতি নিকটেই ঘন বনাবৃত পর্ব্বতমালা দু'হাজার ফুট উঁচু। পর্ব্বতের পটভূমিতে সামনেই খুব বড় মোটা প্রায় দশ ফুট ব্যাস্‌যুক্ত গুঁড়িওয়ালা এক শিমুলগাছ। তার পেছনে অসংখ্য বনপাদপ, নটরাজের মত তাণ্ডব নৃত্যের ভঙ্গীতে শাখাবাহু ছড়িয়ে কি একটা গাছ বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে শোভা আরও বাড়িয়ে দিয়েচে। প্রভাতের শিশিরসিক্ত নিস্তব্ধ বনস্থলীতে কতপ্রকার বনবিহঙ্গের অদ্ভুত কূজন। বারান্দায় চেয়ার পেতে শুনচি একটা পাখী টুং টুং টুং টুং করে ডাকচে, আর একটা পোকা টিয়ার মত যেন বুলি বলচে, চোখ বুজে কান পেতে শুনচি ও পক্ষীকুলের কলতান। বাম

দিকের খুব উচ্চ পাহাড়ের এক জায়গায় অনেকখানি অনাবৃত পাথর বেরিয়ে আছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইচে। ঈষৎ কুয়াশা লেগে আছে সামনের পর্ব্বতগাত্রে—যেন মনে হচ্চে নীচেকার বনে বুঝি কেউ আগুন দিয়েচে, তারই ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠচে পাহাড়ের গায়ে। বাঁদিকে পাহাড়ের নীচে কোইনা নদী বইচে পদে পদে সৌন্দর্য্যভূমি রচনা করে। ট্রলি করে লো যেতে যেতে ঘন বনের ডান দিকে দু জায়গায় এমন সুন্দর চওড়া পাষাণময় নদীগর্ভ বনের ফাঁকে চোখে পড়লো। তার ওপারে কম্‌ব্রিটাম লতার ফুল-ফোটা বিশাল শৈলসানুর অরণ্যানী। কি গম্ভীর শোভা! সিংভূমের ও সারেণ্ডার বনান্তরালে কত স্থানে কত সৌন্দর্য্যভূমি ভগবান যে ছড়িয়ে রেখেচেন, কৃপণের মত দু'একটাকে গুনেগেঁথে রাখেন নি—ধনী দাতার মত দু'হাত পুরে ছড়িয়েছেন হাজারে হাজারে। এই পথ দিয়ে ট্রলিতে সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরবার সময় রাঙা রোদ মাখানো পর্ব্বত ও বনানাশীর্ষে সামনের দুইয়া লৌহখনির অনাবৃত রক্তবর্ণ লৌহপ্রস্তরের পর্ব্বতগাত্রে বহু উচ্চ শৈলশিখরে মোটা মোটা লতা-দোলানো, অসংখ্য দেবকাঞ্চন ফুল-ফোটা, ময়ূর ও ধনেশ পাখীর ডাকে মুখর অরণ্যানী দেখতে দেখতে ওই কথাই বার বার মনে পড়ছিল। সন্ধ্যায় ফিরবার পথে ঘন ছায়া পড়েচে বনে বনে, চারিধারে পাহাড়ের ছায়া—কোনো অজানা বনপুষ্পের সুবাস অপরাহ্ণের শীতল বাতাসে। আমি মিঃ সিন্‌হাকে বল্লুম—কিসের বেশ গন্ধ পেয়েছেন? Range Officer সুলেমান কারকাট্টা ছিল ট্রলিতে, সেও কিছু বুঝতে পারলে না। আংকুয়া জংশন থেকে চিড়িয়া মাইন্‌স্ পর্য্যন্ত একটা লাইন গিয়েচে, একটা গিয়েচে দুইয়া মাইন্‌সে। এ দুটিই বেঙ্গল আয়রণ ও স্টীল কোম্পানীর খনি। মনোহরপুর থেকে এই পনেরো মাইল এরা ঘন বন পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে ছোট লাইন পেতেচে এ দুই লৌহপ্রস্তরের পর্ব্বত থেকে ore নিয়ে যাবার জন্যে, মনোহরপুর রেলওয়ে সাইডিং-এ। কলকাতার ক'জন এই সুন্দর রেলপথটির খবর রাখে? আংকুয়া জংশনে একটা সেলুন পেলুম, তাতে চিড়িয়া মাইন্‌সের বড় সাহেব মিঃ মেরিডিথ যাচ্ছে। তার সঙ্গে গল্প করতে করতে গেলুম। সে বল্লে, চিড়িয়াতে ফুটবল আছে, টেনিস আছে, রেডিয়ো আছে। আবার চলেচি ছোট্ট ট্রেনে বনপথে, বাঁদিকে হামশাদা নদী বনের পথে মর্ম্মর শব্দে বয়ে গিয়ে কোইনাতে মিশেচে। চিড়িয়াতে পৌছে দেখি সামনের বহু উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে খাড়া রেলপথ উঠেচে পর্ব্বতশিখরে। Skip উঠেচে মোটা তারের বন্ধনে—রাঙা ধুলোমাখা হো কুলী মেয়েরা সর্ব্বত্র কাজ করচে। আমাদের Skip দিয়ে ওপরে উঠবার সময়ে বেশ লাগলো, কখনো উঠিনি—কিন্তু ভয়ও করলো খুব। কল্যাণী কখনো উঠতে পারতো না এ পথে—ও যা ভীতু! ওপরে উঠে নীচে চেয়ে সমতলভূমির অপূর্ব্ব দৃশ্য চোখে পড়লো। ১৪৩০ ফুট ওপর থেকে নীচের দিকে দেখচি এমন ভাবে, ঠিক যেন একটা উঁচু বাড়ীর ছাদের কার্নিসে ঝুঁকে আছি। এ সব দৃশ্য চোখে না দেখলে বোঝানো যায় না।

এই লৌহপ্রস্তরের বিরাট শৈলমালা লেদাবুরু, অজিতাবুরু ও বুদ্ধাবুরু এই তিনটি নামে অভিহিত। এর সর্ব্বোচ্চ শিখর হোল বুদ্ধাবুরু ২৭০০ ফুট উঁচু। অনাবৃত লৌহপ্রস্তরের বিরাট শৈলগাত্র সেদিন পনেরো মাইল দূর মনোহরপুর বাংলো থেকে দেখেছিলাম। সৃষ্টির আদিম

যুগে এত লোহা পৃথিবীর উষ্ণ গলিত ধাতুস্রাব থেকে তৈরী হয়েছিল কিংবা ফুটন্ত গর্ভকেন্দ্র থেকে ঠেলে উঠেছিল—কে বলবে! মাথা ঘুরে যায় এই বিরাট বস্তুপুঞ্জ এক জায়গায় পর্ব্বতাকারে জমাট বাঁধা অবস্থায় দেখলে। কি সে মহাশক্তি, কোন সে মহাদেবতা—এই সব বস্তুপিণ্ড যিনি লীলাচ্ছলে সাজিয়ে গিয়েচেন, কোন্ প্রচণ্ড শক্তির বলে এই বিশাল লৌহপর্ব্বত পৃথিবীগর্ভ থেকে উত্থিত হয়েচে, এসব ভূতত্ত্ববিদেরা বলবেন, আমরা শুধু বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে চেয়েই আছি।

আমরা চলেচি আসলে 'আংকুয়া ২৯' নামক বনবিভাগের চিহ্নিত অংশে, একটি নাকি জল-প্রপাত আছে, তাই দেখতে। খনির খাদ হচ্ছে পাহাড়ের ওপারে, আমাদের সামনে আবার প্রায় ৪০০।৫০০ ফুট উঁচু খাড়া রেলপথে Skip উঠেচে আরও উচ্চতর পর্ব্বত শিখরাঞ্চলে। রাঙা লৌহপ্রস্তরের ধূলিমাখা হো কুলি মেয়েরা হাসিমুখে কাজ করচে। এদের মধ্যে অনেকে দেখতে বেশ সুন্দর।

মাইল দেড় খনির করা workings-এর মধ্য দিয়ে হাঁটবার পরে আমরা জঙ্গলে প্রবেশ করলুম—এসব রিজার্ভ ফরেস্ট। ধনেশপাখী ডাকচে বনে। সেই যে একপ্রকার কাঁটাওয়ালা ফল, ওকড়া ফলের মত, যা কাপড়ে লেগে সেদিন টোয়েবু যাবার পথে জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, তা এখানেও লাগতে লাগলো। অতি দুর্গম পথ—একটি নালা ধরে নালার খাতের পাষাণ বাঁধানো—একদম লৌহপ্রস্তর বাঁধানো—গর্ত দিয়ে বড় ছোট পাথর ডিঙিয়ে নামচি, নামচি, নামচি। ফরেস্ট গার্ডকে বলচি আমরা, ও Falls কেত্না দূর?

সে প্রথমে বল্লে—এক মাইল। এখন বলচে দেড় মাইল। তারপর পথ যতই দুর্গম হয়ে আসে, ও ততই বলে, দু' ফার্লং।

কিন্তু একেবারে বিরাট wilderness-এর মধ্যে দিয়ে ক্রমনিম্ন পাহাড়ী ঝর্ণার পাষাণময় গতিপথ বেয়ে নামচি, নামচি—আশেপাশে চেয়ে দেখচি তূণ, পানজন, বট, আসান, শিববৃক্ষ (sterculia urens), পান, আরও কত মোটা মোটা লতা, কম্‌প্রিটাম লতা, বন্যকন্দ, বন্য অশ্বগন্ধা—কত কি গাছপালা। এক জায়গায় বড় বড় পাথর বেরিয়ে আছে পাহাড়ের গায়ে, ঝর্ণার জল পড়ে একটা গর্ত মত সৃষ্টি করেচে পাথরের ওপর। ছোট্ট একটি গুহাও।

ফরেস্ট গার্ড একটা জায়গায় এসে বল্লে—আওর তিন ফার্লং।

সেখানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েচে। নালাটা হঠাৎ চল্লিশ ফুট ওপর থেকে নীচে পড়ে একটা গভীর খাতের সৃষ্টি করেচে এবং গভীর থেকে গভীরতর খড্ কেটে ক্রমনিম্ন খাড়া ঢালু পথে বহু, বহুদূরে নেমে গিয়েচে ঘন বনের মধ্যে দিয়ে—দূরে জলপতনধ্বনি শুনতে পেলুম বটে।

অদ্ভুত, গম্ভীর এই স্থানের দৃশ্য। বর্ণনা করা যায় না। আমরা দেখলুম আরও তিন ফার্লং গিয়ে আজ আর ফিরতে পারবো না। চিড়িয়া খনির Skip বন্ধ হয়ে যাবে। তখন দুর্গম ঢালুপথে হেঁটে নিচে নামবে কে?

ফরেস্ট গার্ড বল্লে—জলপ্রপাত ওখান থেকে দেখা যাবে না। ঢালুপথে অনেকটা নামতে হবে—তিন ফার্লং গিয়ে, তবে দেখা যাবে।

তিনটে বেজেচে—'আংকুয়া, ২৯' Falls মাথায় থাকুক। ১৭৬০ ফুট পর্ব্বতশিখর যেখানে বসে আছে, পার্ব্বত্য ঝর্ণা সেই গভীর খাতের একেবারে প্রান্তে। সুলেমান কারকাট্টা বল্লে ম্যাপ দেখে—এ জায়গাটা ১৭৬০ ফুট উঁচু।

সেখানে বসে টিফিন বক্স্ থেকে বার করে পুরী, কাটলেট, কলা ইত্যাদি খেলুম। ফরেস্ট গার্ড দুটি খড়কুটো জ্বালিয়ে চা করলে। মহিষের দুধের মাখন জমে গিয়েচে শীতে, মাখন-চা হোল।

খেয়ে সেই বনের পথে আবার ফিরলুম। কি ভীষণ নিস্তব্ধ জনহীন wilderness। যে এসব না দেখেচে, তাকে এর গাম্ভীর্য্য কিছুই বোঝানো যাবে না। সারেণ্ডা অরণ্যের অন্তরালে হাজারো সৌন্দর্য্যভূমি ছড়ানো—আমি আফ্রিকায় যেতে চেয়েছিলুম বন দেখতে। আবার সেই কাঁটাওয়ালা ফল—এদেশী নাম 'মিন্‌তো জোটো', কাপড়ে জামায় লেগে ভারি হয়ে গেল। উঠচি, উঠচি—চড়াইয়ের দুর্গম পার্ব্বত্যপথ। অতিকষ্টে চলেচি, ঘন ঘন হাঁপাচ্চি। কক্ কক্ শব্দ করে বিচিত্র বর্ণের বন-মোরগ পালিয়ে গেল।

খনিতে এলুম, বেলা পড়েচে, কি সুন্দর সমতলের দৃশ্য। অনাবৃত লৌহ প্রস্তরের শৈলগাত্রেরই বা কি ভীমদর্শন চেহারা। এক জায়গায় অনেকখানি কোয়ার্টজাইট পাথর বেরিয়ে আছে অনেক ওপরে—যেমন নিচের ঝর্ণার দুধারে অনেক জায়গায় অতি অদ্ভুতভাবে ছিল। Skip দিয়ে একটি তরুণী হো মেয়ে উঠে এল বেশ শান্তভাবে। যারা কখনো skip-এ ওঠেনি তাদের মূর্চ্ছা যাওয়ার কথা। আমরা নামচি, অনেকগুলি রাঙা ধূলিমাখা কুলি-মেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে দেখচে, এঞ্জিন-ড্রাইভারকে বলচে—ঠারো, ঠারো।

নামবার সময়ে ঢালুর দিকে চেয়ে ভয় করলো—যেন কোন্ নরকে নেমে চলেচি। যদি শেকল ছিঁড়ে যায়, তবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে হবে। ট্রেনে এলুম আংকুয়া জংশন—ট্রলিতে সেই অপূর্ব্ব বনপথে এলুম সবাই। বড্ড ঠাণ্ডা বাতাস লাগচে সামনে থেকে ট্রলির বেগে, বনপুষ্পের সুবাস বাতাসে, দুপাশে বনে বনে অজস্র দেবকাঞ্চন (bohinia purpuria) ফুল ফুটে। ধনেশ পাখী ডাকচে বনে। বাঁদিকে কোইনা নদীর ওপারে পর্ব্বত-শীর্ষেও বনস্পতি-শীর্ষে রাঙা রোদ। সলাই বাংলো তিন মাইল, এখানে আমাদের মোটর আছে।

ওই সামনে ছুইয়া খনির শিখরদেশ দেখা যাচ্চে রাঙা দগ্‌দগে ঘার মত সবুজ শৈলগাত্রে—ঠিক সবুজ নয়, ধূসর শৈলগাত্রে।

এ বনে যজ্ঞডুমুর ও শিমুল, আম ও পান্‌জন গাছ অনেক, আলোকলতা ও চটি জুতোর মত ফলবিশিষ্ট সেই গাছটাও যথেষ্ট। শেষোক্ত গাছটা আমাদের বারাকপুরের ভিটেতে আছে।

মনেও পড়লো বারাকপুরের কথা—কুঠির মাঠে শীতের অপরাহ্ণ নেমেচে, আলকুশীর লতা দুলচে বনে-ঝোপে, ইন্দু রায় তার বাড়ীতে বসে ফণিকাকার সঙ্গে গল্প করচে,—বেশ দেখতে পাচ্চি।

সলাই থেকে তখনি মোটর ছাড়া হোল। সুলেমান কারকাট্টাকে আমরা মোটরে

উঠিয়ে নিলুম—নতুবা সাইকেলে এই সন্ধ্যায় সলাই থেকে ছোটানাগরা সাড়ে সাত মাইল ভীষণ বনের পথে যেতে হবে। হাতীর বড় ভয় এ সময়। বাঁদিকে সেই সুউচ্চ প্রায় ২০০০ ফুট উঁচু পর্ব্বতমালার দিকে চেয়ে আছি। মোটর ছুটচে বেগে, কখনো ঘন বনে ঢুকচে কম্‌ব্রিটাম লতার শাদা কচি পাতা দোলানো ঝোপের মধ্য দিয়ে, কখনো উঠচে, কখনো নেমে পার্ব্বত্য নদী পার হচ্চে। আমি দেখচি বাঁদিকের পাহাড়ে কোথাও খানিকটা অনাবৃত পর্ব্বতগাত্র, কোথাও একটা গাছ। এই সন্ধ্যায় কল্যাণীর কথা বড় মনে হচ্চে, ওকে হয়তো কাল দেখবো।

অনেক দূরে ইছামতীর পারে একটি তেতলা বাড়ীর ওপরের ঘরটিতে—সেখানে এখন কেউ থাকে না—যে ছিল, অনেক কাল আগে সে কোথায় গিয়েচে। গৌরী—তার কথা মনে হচ্চে আজ সন্ধ্যায়। এই সময়ে সে মারা গিয়েছিল আজ বিশ বৎসর আগে।

ভগবান তার মঙ্গল করুন।

দুদিকের বন সন্ধ্যার অন্ধকারে নিবিড়তর দেখাচ্চে, সেদিনকার সেই ছোট্ট ঝর্ণাটি পার হলুম, যার ধারে লতাকুঞ্জে রাজা অভিরাম টুংয়ের ঢোল পড়ে আছে।

অনেক রাত্রে একবার আমি বাইরে এলুম, আকাশের দিকে চেয়ে দেখি নক্ষত্রসমূহ ঠিক হীরকখণ্ডের মত জ্বলচে, গুয়ার পাহাড়ের মাথায় একটা নক্ষত্র দপ দপ করচে, একবার নিবচে আবার জ্বলচে যেন। আকাশে নক্ষত্রসমূহের এমন দীপ্তি বাংলা দেশে তো দেখিই নি, এমন কি মনে হয় ঘাটশিলাতেও দেখিনি।

একটা সারেণ্ডা বা সিংভূম দর্শনেই আমি মুগ্ধ, কিন্তু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অমন কত অনন্ত কোটি beauty spot ছড়ানো রয়েচে, ঐ সব নক্ষত্রে কি বিচিত্র জীবনধারা, আত্মার অনন্ত গতিপথে ওদের নিয়েও তাঁর লীলা। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। বনপাহাড়ের মাথার ওপরে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের লীলা, শুধু তাঁর কথাই মনে আনে।

সকালে উঠে দেখি খুব কুয়াশা হয়েছে, সাদা ধোঁয়ার মত কুয়াশার রাশি উপত্যকা থেকে উঠচে ওপরে, গুয়ার পাহাড় ঢেকে দিলে। বড্ড শীত। পাহাড়ের নীচে বনশ্রেণী কুয়াশায় ঢাকা, ধীরে ধীরে সূর্য্য উঠলো। সূর্য্যদেবকে প্রণাম করলুম।

আজ এখান থেকে চলে যাবো। সারেণ্ডা অরণ্যের কাছে বিদায় নিলুম, হে সুপ্রাচীন অরণ্য, তোমায় প্রণাম করি। শত বিস্ময়ের সৌন্দর্য্যভূমি তোমার মধ্যে হাজার বৎসর ধরে লুকানো ছিল, কেউ আসেনি দেখতে—এতদিনে দেখে ধন্য হয়ে গেলাম। আজ ষোল দিন ধরে বনপুষ্প সুবাস উপভোগ করেচি তোমার বনে বনে, তোমার বনবিহঙ্গের কলগীতি শুনে কান জুড়িয়েচি শহরের কলকোলাহলের পরে, তোমাকে প্রণাম করি। কত দেবকাঞ্চন ফুল, কত লুদাম, কত অপরিচিত নাম-না-জানা ফুল, কেকাধ্বনি, জলপ্রপাতের জলপতনধ্বনি জনহীন গহন বনে, সেই গুহা দুটি, কত বন্যলতার অদ্ভুত মনোরম ভঙ্গি, ধনেশ পাখীর কর্কশ চীৎকার, ক্রুদ্ধ barking deer-এর ঘেউ ঘেউ শব্দ, বন্য বানরের ডাক (যেমন কাল ডাকছিল আংকুয়া

জলপ্রপাতের বনে), অপূর্ব্বদর্শন বনাবৃত শৈলমালা, লৌহপ্রস্তরের বিশালকায় খনি—এ সব দেখবার শুনবার, উপভোগ করবার অভিজ্ঞতা যে কত দুর্লভ তা আমি জানি। সেইজন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ দিই, যিনি আমাকে এখানে এনেচেন।

আজ সকালে চা খেয়ে মোটরে রওনা হই গুয়াতে। গাড়ীর স্প্রিং ভেঙে গিয়েচে বলে জিনিস-পত্র কুলির মাথায় পাঠানো হোল গুয়াতে। মোটর ছেড়ে আসচি, পথে ঝর্ণার পথে কিছুদূরে আমাদের পাচক বিরশা চলেচে হেঁটে। কার্ডিনাল উল্‌সির কথা মনে হোল ওকে দেখে। আজ বনের পথে মোটর চলেচে, আমি ভাবছি প্রায় চারশো মাইল পথ অতিক্রম করে চাইবাসা গিয়ে ট্রেন ধরে আজই হয়তো রাত একটা-দেড়টায় বাড়ী পৌঁছে যাবো। খুব আনন্দ হচ্চে আজ সারা পথটি। তেনতারি ঘাটে কোইনা নদী পার হলুম। এখানে সাত-আটজন কুলি আমাদের গাড়ী ঠেলবার জন্যে অপেক্ষা করচে।

ঘন জঙ্গলের পথে যাবার দিনের সেই কুম্‌ডি রাস্তার মোড়ে এলুম। বরাইবুরু বলে যে গ্রামটি কারো নদীর ধারে সেটি ছাড়ালুম। গুয়া এলুম মিঃ রাসবিহারী গুপ্তের বাড়ী, সেখানে মহিলা সমিতির সভানেত্রী আশা দেবী ও আরও কয়েকটি মহিলা দেখা করতে এলেন আমার সঙ্গে। মিসেস্ গুপ্ত পরিতোষ করে আমাদের খাওয়ালেন। অনেকদিন পরে যেন সভ্যজগতে এসেচি বলে মনে হচ্চে। আমরা তিনটের সময়ে মোটরে রওনা হই, বরাইবুরুতে কারো নদী পার হয়ে জামদার পথে চল্লুম হাটগামারিয়া। আজ হাটবার গোপালনগরের, জগন্নাথপুরের হাট দেখে আমার সেকথা মনে পড়লো। পঞ্চা মাস্টার বেগুন বিক্রি করচে ইঁদারার ওপরে বসে। রোদ রাঙা হয়ে আসচে। পিছনে দেখা যাচ্চে কেউন্‌ঝর রাজ্যের পাহাড় ও বন, বামে কোল্‌হান ও সারেণ্ডার শৈলমালা। হাটগামারিয়া এসে পরেশবাবুর আপিসে আমরা চা খেলুম—তারপর কেঁদ্‌পোসি স্টেশনে এলুম ট্রেন ধরতে। আমি এখান থেকেই যাবো ঘাটশিলায়। আজই যাবার জন্যে মন উদ্বিগ্ন। মণীন্দ্র নন্দীর নাতি আলাপ করলেন। তিনি এখানে চীনামাটির খনির ম্যানেজার। 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' নাকি তাঁর খুব ভাল লেগেছে।

ট্রেনে উঠলুম, লেখা আছে ইন্টার ক্লাস, কিন্তু কাজে সেকেন্ ক্লাস। বেশ আরামে বিবেকানন্দের 'ভক্তিযোগ' পড়তে পড়তে এলুম—মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে ধূসর দিগন্তের দিকে চেয়ে ভাবি। এতক্ষণ হাট শেষ হয়ে গেল, লোকেরা সব বাড়ী ফিরচে। লিচুতলায় আড্ডা বসেচে। বিরশার সঙ্গে আবার দেখা চাইবাসা স্টেশনে। ডাক-আরদালি কামরায় এসে সেলাম করে বকশিশ চাইলে।

বড্ড দেরি করে ট্রেন টাটায় এল। রাঁচি এক্সপ্রেস ছেড়ে গিয়েচে—সারা রাত্তির ওয়েটিং রুমে চেয়ারে বসে কাটালুম। নৈহাটির এক গার্ড এখানে কি করচে, তার সঙ্গে সারারাত গল্প করি। দুজন ছোকরা ওয়েটিং রুমে আমায় চিনতে পেরে বসবার জায়গা করে দিলে।

রাত শেষ হয়ে গেল। ৬টায় ট্রেন এল, ভীষণ শীত। ঝিমুতে ঝিমুতে ঘাটশিলায় এলুম। মনে খুব আনন্দ। ষোল দিন পরে বাড়ী ফিরচি, ঘি ও ধুনো হাতে ঝুলিয়ে চলেচি। শাস্তু এসেচে বসে থেকে, প্ল্যাটফর্মে দেখা। ও গেল পুঁটুর কাছে। কল্যাণীরা ঘি দেখে খুব খুশি।

বাড়ী আসতে সবাই খুশি।

ঊষা চিঠি দিয়েচে কাশ্মীর থেকে, অজিতবাবু চিঠি দিয়েচেন রাঙামাটি (চট্টগ্রাম) থেকে—বাড়ী এসে পেলুম।

পরের দিন সন্ধ্যায় শচীন ও ফণির সঙ্গে বসে বসে চালভাজা খাচ্ছিলাম। সারেণ্ডাতে কত ভাল জায়গা দেখেচি তার একটি তালিকা ওদের কাছে বল্লাম। প্রথমে ধরি কুমডির পাশে কোইনা নদী। ২য়, শশাংদাবুরু; ৩য়, থলকোবাদ বাংলো; ৪র্থ, মাত্তি-সিরাং (Mat-Rock); ৫ম, ভানগাঁও ও বোনাই সীমান্ত; ৬ষ্ঠ, বাবুডেরা; ৭ম, বনশ্রী ও বাবুডেরা থেকে সামটার তেমাথার পথ, ৮ম, হেন্দেকুলি ক্যাম্প ও তৎপূর্ব্বের সামটা নালার loop; ৯ম, সিসিরদা জলা ও গুহাদ্বয়; ১০ম, থলকোবাদ বাংলো থেকে বনপথে কোইনা নদী ও তীরবর্ত্তী বনভূমিতে কোইনা নদীর loop; ১১শ, টোয়েবু জলপ্রপাত ও সেখানে যাবার বনপথটি; ১২শ, বিটুকেলসোয়া গ্রাম ও সেখানে যাওয়ার পথটি; ১৩শ, মহাদেবশাল ঝর্ণা ও কোল বোংগা গ্রাম; ১৪শ, নৃসিংহদাস বাবাজীর আশ্রম, মনোহরপুর; ১৫শ, হেন্দেসিরি; ১৬শ, ছোটনাগরা বাংলো; ১৭শ, সলাই বাংলো; ১৮শ, সলাই থেকে আংকুয়া যাবার পথ ও পাশে কোইনা নদীর পাষাণময় গর্ত্ত; ১৯শ, চিড়িয়া খনি; ২০শ, Lyall's look-out, বাঘদাঁতনের কাঁটালতা ভেঙে সেখানে গিয়েছিলাম; ২১শ, উম্বরিয়া ঝর্ণা; ২২শ, বড় বড় শালের preservation plot; ২৩শ, আংকুয়া জলপ্রপাত, ২৪শ, সেচনের পয়োপ্রণালী, ২৫শ, বড়ানাগরা ও ছোটানাগরা (ঢোল ছুটি ও অভিরাম টুং রাজার ভগ্ন মন্দির), ২৬শ, কোদলীবাদে যে কুটিরে মিঃ সিন্‌হা ১৯২৫ সালে ছিলেন।

অনেকদিন লিখিনি। কাল সন্ধ্যায় ইন্দুবাবুর গাড়ীতে ধলভূমগড় থেকে ফিরে এসেচি। ৫ই জানুয়ারী তারিখেও একবার গিয়েছিলুম। বড় ভাল লাগে ও জায়গাটা। মুক্তপ্রান্তরের মধ্যে এখানে ওখানে খড়ের ঘরের সারি—এরোড্রোমের লোকদের বাসস্থান। শাল, মহুল, হরীতকী ছাড়া বিদেশী কোন রোপিত ফুল-ফলের বৃক্ষ নেই, কোঠাবাড়ী এক-আধখানা ছাড়া বেশি নেই। বাঁদিকে দূরে চারচাকীর জঙ্গল দেখা যায়। শুকনো শালপাতার বেড়ার গন্ধ রোদ্র ঝাঁ-ঝাঁ দুপুরে ইসমাইলপুরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। চারচাকার বনটি অতি চমৎকার, সেদিন যখন জ্যোৎস্না উঠলো আর কোনো বাড়ী-ঘর দেখা যায় না—অত বড় বিরাট মুক্ত space যেন মায়াময় হয়ে উঠলো। যে কোনো সময় ঘরে বা বারান্দাতে বসে সামনে চোখে পড়ে তালকী পাহাড় ও তার পটভূমিতে খড়্গ খড়্গ সুদীর্ঘ শাল তরুশ্রেণী—কাল আবার মেঘ করাতে দৃশ্যটি এত সুন্দর হয়েছিল। নীল হয়ে উঠেচে শৈলমালা। এখানে যদি কলকাতার শৌখীন লোকেরা বাড়ী করে টাউন বানাতো, বাড়ীর নাম দিতো 'সন্ধ্যানিবাস' 'অলকা' 'বনবীথি' 'Hill view' 'অমুক নিলয়' 'Forest side' ইত্যাদি, বালিগঞ্জী ফ্যাশানে সামনে ঢাকা টানা বারাণ্ডা করতো কাঁচের প্যানেল বসানো, লম্বা জানালায় ফ্রেম বসানো, লতাপাতা আকারের লোহার রেলিং বসানো গেট্ বসাতো—তাহলেই এই শালবন ও শৈলশ্রেণী, লাল

মাটি ও কাঁকরের উচ্চাবচ টিবির সঙ্গে, এই রৌদ্রস্নাত দূর দিগন্তের সঙ্গে, এই লাল ধুলো মাখা সাঁওতাল মেয়েদের সঙ্গে আর কোনো যোগ থাকতো না। সে হয়ে উঠতো একটা টাউন—বালিগঞ্জের অক্ষম ও সক্ষম অনুকরণে। যেমন নষ্ট হয়েচে দেওঘর বা মধুপুর বা শিমূলতলায়। এবং নষ্ট হয়েচে খানিকটা ঝাড়গ্রামও।

ব্যারাকপুর গিয়েছিলুম ধান চাল গোছাতে। গেলুম সেদিন গুটকের সঙ্গে রাঁচী প্যাসেঞ্জারে। যাবার পূর্ব্বে দ্বিজুবাবুর বাড়ীতে বেদান্ত ও ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে কত আলোচনা করি —ফিরে এসে আর দেখা হয়নি। কলকাতায় যাবার বুকিং বন্ধ, অতি কষ্টে ব্রেকভ্যানে একটু জায়গা করে নিলুম। সকালে কলকাতায় পৌঁছে—রমেশ ঘোষালের বাড়ী গিয়ে 'তালনবমী' পুস্তকের contract হোল। সেখানে দেখলুম 'Indian arts and Letters' বলে পত্রিকা, যাতে আমার কথা লিখেচে। সেদিনই তিনটার ট্রেনে বনগ্রামে গিয়ে বন্ধুর বাসায় থাকি। টক্ক আছে এখানেই। ভীষণ শীত রাত্রে।• লিচুতলায় মনোজবাবু, যতীনদা', মন্মথদার সঙ্গে জমাট আড্ডা। মিতে এসে বল্লে 'স্বপ্ন বাসুদেব' বড় ভাল লেগেচে। অন্ধকারে মনোজবাবু ও আমি মিতের সঙ্গে এলুম সুরেনের বাড়ী। সন্তু এল অনেক রাত্রে। কত গল্প—বিশেষতঃ সারেণ্ডা বনভ্রমণের। সকালে উঠে নন্কুর আনা কেক্ ও pastry চা দিয়ে খাই। মিতের বাড়ী দুপুরে খেয়ে গৌরী ও মিতের সঙ্গে ভাগবদ্‌প্রসঙ্গ আলোচনা করলুম। তারপর ব্যারাকপুরে গেলুম। সজনে ফুলের গন্ধ সর্ব্বত্র। ইন্দু ও শ্যামাচরণদার বাড়ী বসে গল্প করি। পরদিন নদীতে স্নান করে বড় তৃপ্তি হোল। খেয়ে ঘুমিয়ে উঠে হারিকেন হাতে ইন্দু রায়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে বাজারে বা 'নগরে' গেলুম—যেমন ছেলেবেলায় দেখতুম অমৃত কাকাকে করতে। যেন আমি এই ব্যারাকপুরের একজন চাষীবাসী গৃহস্থ, খাজনা আদায় করে বেড়াই। বারিকের বাড়ী ধান ও খাজনা আদায় করতে গিয়ে রস খাই ও বেগুন নিয়ে আসি তপজলের বাড়ী থেকে কাপড়ে করে—ঠিক গ্রাম্য গৃহস্থের জীবন। এখনও ছোট এড়াঞ্চির ফুল গাছে গাছে—একরকম কন্টকলতার থোলো থোলো ফুলের কি সুবাস। সজনে ফুলের গন্ধ পথের বাতাসে।

বিকেলে মন্ত্র মাস্টারের বাড়ী গিয়ে বসলুম। মেলা স্কুলের ছেলেরা এল, ননী মাস্টার এল, শশধর মুহুরী এল। সারেণ্ডা ফরেস্টের গল্প করি ওদের কাছে; চা খেয়ে সন্ধ্যার আগে বাড়ী চলে এলুম। যুগল ময়রার দোকানে একটা লেডিকেনির দাম চার আনা—তাই খেয়ে একটু জলযোগ করি।

এই সেই সময়—যে সময় ১৯৩৭ সালে আমি পাটনা গিয়েছিলুম সভা করতে। শিবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী। মোজার্টের minuet in c minor শুনেছিলুম গঙ্গার ধারের বাগির চত্বার দিকে চোখ রেখে। উড়ে বেয়ারা তত্ত্ব নিয়ে এসেছিল খুকুদের বাড়ী—সে সব দিন অতীতের গহন কুজ্‌ঝটিকায় অস্পষ্ট হতে চলেচে। কোথায় আজ খুকু!

পরদিন সকালে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলুম, গাছে গাছে কুল পেকেচে—মনে আসচে

১৯০৪ সালের সেই ৺সরস্বতী পূজা। আমার একেবারে শৈশব তখন—অস্পষ্ট মনে হয় একটু একটু। কুঠীর মাঠের গাছপালা বনঝোপের কি চমৎকার শোভা। পেয়ারাতলায় বসে ভগবানের কথা চিন্তা করলুম। কাছিম কাটচে সাঁইবাবলা তলার ঘাটে। ওপারের ঘাটে গিয়ে স্নান করলুম। তারপর বুধো ঘোষের থামারে আমার ধান ঝাড়া ও মাড়া হচ্চে, সেখানে গেলুম। একজন হ্যাটপরা লোক যাচ্চে হরিপদদার বাড়ীতে—তাকে ডেকে এনে বসালুম। হাটে গেলুম বিকেলে—লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মুখ ব্যথা!

তিনটি ঘটনা বড় ভাল লাগলো এবার গ্রামে। বড় চারা আমগাছ তলায় নিবিড় ঝোপে শুধু পত্ররাশির ওপর একা বসে বনপুষ্প সুবাসের মধ্যে রোজ দুপুরে কত কথা চিন্তা করতুম, কত কি পাখি ডাকত বনে, ভগবানের দানের মত কোথাও আমড়া পড়তো, গান গাইতুম 'তব আসন পাতা এ বনতলে'—আমারই তৈরী গান, এবং ওর ওই একটিই লাইন। গান তৈরী করতে তো জানি না!

দ্বিতীয় ঘটনা—বিকেলে গিয়েচি ঘুমিয়ে উঠে বরোজপোতার বাঁশবাগানে বেড়াতে। শুকনো বাঁশের পাতা পড়ে আছে সর্ব্বত্র। হঠাৎ দেখি এক অপূর্ব্ব ছবি—সিঁদুর-কোটো আমগাছটার পাশে একটা চারা সজনে গাছের একটা মাত্র ডালে থোলো থোলো সজনে ফুল ফুটেচে, তারই পাশে সিঁদুর-কোটো আমডালে একটা চিল বসে আছে—ওদের ওপরে নীল আকাশ। যেন চীনা চিত্রকরের ছবি একখানা। কতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম, পা আর ওঠে না। ফিরে এলে ইন্দুর সঙ্গে সঙ্গে আবার বারিকের বাড়ী গেলুম চালকীতে। সূর্য্য অস্ত যাচ্চে, আমি ওর উঠোনে গরুর গাড়ীর ওপর বসে তামাক খাচ্চি কল্কে হাতে। তারপরে পাকা রাস্তার ওপরে মুচিপাড়ায় সজনে সাঁকোতে গিয়ে বসে আমজোবের গল্প শুনি ইন্দুর মুখে। তৃতীয় ঘটনা এইটিই। কোথায় টাটানগরের সভা সেদিনকার, কোথায় সারেণ্ডা বন কান্তারের শৈলমালা—আর কোথায় চালকী গ্রামে আমার প্রজা বারিকের বাড়ীতে গরুর গাড়ীর ওপর বসে তামাক খাওয়া!—

পরদিনও বিকেলে বারিকের বাড়ী যাবার আগে প্রমোদের বাবার সঙ্গে কথা বলি। তিনি তামাক খাওয়ালেন। অন্ন বলে মেয়েটির শ্বশুর। কত নিন্দে করলেন কুটুম্ব-বাড়ীর। উনি জ্বরে পড়ে আছেন, ওঁকে দেখে না—ইত্যাদি। বারিকের বাড়ী গিয়ে খুব বকাবকি করলুম ধান দিচ্ছে না বলে। ওখান থেকে সোজা চলে এলুম কুঠীর মাঠে অপূর্ব্ব বনপথে, কণ্টক-লতার পুষ্পের সুগন্ধের মধ্যে। আগে বসলুম নদীর তীরে নিবারণ ঘোষের বেগুন ক্ষেতের জমিতে, যেখানে আর বছর আমি আর কল্যাণী নতি শাক তুলতে আসতুম। তারপর এখান থেকে মাঠের মধ্যে জলার ধারে। রোদ একেবারে রাঙা হয়ে এসেচে, শিমুল গাছে মুকুল দেখা দিয়েচে, শীত আজ অনেক কম। কুল পেকেচে গাছে গাছে—অনেক পেড়ে খেলুম—কিছু নিয়ে এলুম ইন্দু রায়ের ছেলেমেয়ের জন্যে। ফিরবার পথে অন্ধকার সন্ধ্যায় আমাদের ঘাটে গিয়ে দাঁড়ালুম—ওপারে একটি মাত্র তারা জ্বল্ জ্বল্ করচে সন্ধ্যা আকাশে। যেন আমি ১৯৩৪ সালের বড়দিনের ছুটিতে বারাকপুর এসেচি, খুকু রোজ সন্ধ্যায় আমার

কাছে সেই পেন্সিল বই নিয়ে পড়তে আসে—আমি বসে বসে মেটে প্রদীপের আলোয় 'দৃষ্টিপ্রদীপ' লিখতুম।

শ্যামাচরণ দা'র বাড়ী বসে গল্প করে একদিন ওদের বাড়ীর খিড়কির পথে আমাদের পুরোনো ভিটের সামনে দিয়ে ফিরি। যেমন ফিরতুম বাল্যকালে, যখন মা ছিলেন, বাবা ছিলেন—আমাদের পুরোনো ভিটের বাড়ীটা বজায় ছিল। সে সব কত কালের কথা!

পরদিন আবার সকালে বড় চারা আমতলায় বসলুম বনের মধ্যে শুষ্ক পাতার রাশির ওপর গামছা পেতে। এই বনের মধ্যে নিভৃতে চুপ করে বসে বন-বিহঙ্গের কাকলী শুনতে আমার যে কি ভাল লাগে। জীবনকে গভীর ভাবে অনুভব করি এই নির্জ্জন বনতলে একা বসে। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি সর্ব্বাণি ভূতানি জায়ন্তে"—উপনিষদের বাণীর সার্থকতা ও সত্যতা এখানে বসে বুঝতে পারি।

হাটে গিয়ে পাটালি কিনলাম। ফিরে এসে সেদিন সন্ধ্যায় যে অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হোল—তা এ ক'দিনের সব অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে গেল। সন্ধ্যায় বনভূমিপ্রান্তে ক্ষীরপুলি গাছের পেছনটাতে একা বসেচি চুপ করে—সামনে ছোট এড়াঞ্চি ফুলে ভরা ঝোপ-ঝাপ, সাঁই বাবলা গাছের পত্রশীর্ষ, বনপুষ্প-সুবাস, পাখীর ডাক—সন্ধ্যায় অন্ধকার নেমে আসচে, বনভূমি আজও তেমনি স্বপ্নমাখা—কি সুন্দর মধুমাখা সন্ধ্যা! কল্যাণী আমায় বলতো—মানুষু, এখানে বসবো।

এই মাঠে।

সেকথা মনে পড়লো এই সন্ধ্যায়। তার চোখে অসীম নির্ভরতার দৃষ্টি।

কলকাতায় এলুম পরদিন গরুর গাড়ীতে। তিনু আমার সঙ্গে এল রানাঘাট স্টেশনে কচু কুমড়ো নিয়ে ওর দাদার শ্বশুরবাড়ীর জন্যে। মাঝের গাঁয়ে মহীতোষ দা'র সঙ্গে স্টেশনে দেখা অনেকদিন পরে।

কলকাতা থেকে আমতায় গেলুম শ্বশুরবাড়ী। সেই জাঙ্গিপাড়া স্কুলে যখন কাজ করতুম, গৌরী মারা গিয়েছিল—সেই সব শোকাচ্ছন্ন দিনের ছাপ আছে এই সব লাইনের গাছেপালায় মাঠে। সেই পথ দিয়েই আবার শ্বশুরবাড়ী যাচ্চি এতকাল পরে। খুব আশ্চর্য্য না?

কলকাতায় এবার দুজন লোকের সঙ্গে দেখা হোল বহুকাল পরে। খেলাত স্কুলের পুরোনো হেড্‌মাস্টার ক্ল্যারিজ সাহেব—আজকাল সে একজন ইহুদী স্কুলের হেড্‌মাস্টার বউবাজারে। একেই নিয়ে ক্লার্কওয়েল সাহেবের সৃষ্টি 'অনুবর্ত্তন'এ। আর ভাগলপুরের অম্বিকা ঘোষ যার সঙ্গে অনেকদিন আগে ভাগলপুর থেকে দেওঘর হেঁটে গিয়েছিলাম। 'অভিযাত্রিক'এ এ ঘটনার উল্লেখ করেচি। অম্বিকাকে একখণ্ড 'অভিযাত্রিক' উপহার দিলুম। ওর সঙ্গে ১৪/১৫ বছর পরে দেখা হোল—ও দেখতে তেমনিই আছে।

আজ সবাই মিলে চারখানা গরুর গাড়ী করে বনের পথে ধারাগিরি যাওয়া গিয়েছিল। সারাপথ এমন enjoy করেছি কি বলবো! কাশিদা ছাড়িয়ে লাল শামুক ফোটা সেই বড়

বিলটা, যেখানটার নাম চ্যাং-জোড়া, সেটা ছাড়িয়ে ধবলীর বন, তারপর বুরুডি গ্রাম, তা ছাড়িয়ে বুরুডি ঘাট অর্থাৎ পাস্, তারপর বাসাডেরা গ্রাম—একেবারে চতুর্দ্দিকে বন সমাচ্ছন্ন উপত্যকায় ঘেরা, সেখানে মুকুলবাবুর কর্ম্মকর্ত্তা শিরীশ বেশ চমৎকার একটি ঘর বানিয়েচে দেখলুম, দেখলে থাকতে লোভ হয় এই নির্জ্জন বনাবৃত উপত্যকায়। এই ঘরের সামনে দিয়ে মুকুলবাবুর তৈরি রাস্তা পাহাড়ের ওপর চলে গিয়েচে, নিশ্চয়ই জ্যোৎস্নারাত্রে বা ছায়াস্নিগ্ধ বৈকালে এই পথের বন্য আমলকী, আম, পিয়াল ও তেঁতুল তলায় বেড়ানো বড় মনোরম হবে। একদিন যাবো ওখানে ও রাত কাটাবো রমাপ্রসন্ন ও গৌর এখানে এলে।

আমরা ঘাট অর্থাৎ পাস্ পার হয়ে গেলুম পদব্রজে। সবাইকে গরুর গাড়ী থেকে নামতে বাধ্য করলুম। এই রাস্তাটার একটা নিবিড় বন্য সৌন্দর্য্য আছে, বাঁদিকে খাড়া পাহাড়ের দেওয়াল উঠেচে, ডাইনে ৬০০।৭০০ ফুট গভীর খাদ, তার তলা দিয়ে খরস্রোতা (নদীর নাম, বিশেষণ নয়) নদী উপলাস্তৃত বন্ধুর পথে বয়ে চলেচে, চারিধারে কত রকমের গাছপালা, কত মোটা মোটা লতা, বনফুলের মধ্যে এক রকমের কুচো কুচো নীল ফুল আর ছটবা (Indigofera Pulchera) ফুটেচে। বাঁদিকের পাথরের দেওয়ালের গায়ে—বনবিহঙ্গের কাকলী বনের শাখায় শাখায়, ঘাট অতিক্রম করে বাসাডেরা উপত্যকায় এসেই মুকুল চক্কত্তি কন্‌ট্রাক্টরের ওই ছোট্ট খড়ের ঘরটা দেখে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। এমন সুন্দর শান্ত, নিভৃত শৈলমালা ও বনানী বেষ্টিত উপত্যকায় থাকে কিনা মুকুল চক্কত্তির কর্ম্মচারী শিরীশ ? শিরীশকে আমি জানি, সে কি বুঝবে এই বনভূমির সৌন্দর্য্য ? সে সকালে উঠে বনের মধ্যে চলে যায় কাঠ কাটানোর জন্যে, কাঠ চেরাই করবার জন্যে—তারপর গাড়ী বোঝাই দিয়ে শাল-বল্লা পাঠায় ঘাটশিলা স্টেশনে—যে বনের গাছ কেটে ব্যবসা করে, বনলক্ষ্মী কি তার সামনে মুখাবগুণ্ঠন অপসারিত করেন ?

বেলা দেড়টার সময় আমরা ধারাগিরি পৌঁছে গেলুম। সঙ্গে এতগুলো মেয়েমানুষ ছিল, সবাই বড়লোকের বাড়ীর বৌ-ঝি, একবার কি কেউ বল্লে—জায়গাটা বেশ ভালো, কি বেশ, কি চমৎকার ! কিছু না, পয়সাই আছে, কিন্তু চোখ নেই। মেয়েমানুষগুলোর হাতে এক গোছা করে সোনার চুড়ি, কানে কানপাশা, কত রকমের সেজেছে—কিন্তু এসেই 'ওরে, অমুক ওদিকে যাস্‌নি', 'অমুক তোর ঠাণ্ডা লাগবে'—হৈ চৈ চীৎকার, গোলমাল, 'বকা কোথায় গেল ভাখ্‌ ভাখ্‌' (কুকুরের নাম)—এই সব ব্যাপার ! অমন চমৎকার বনপাহাড়ের সৌন্দর্য্যের দিকে কেউ চেয়েও দেখলে না, কেবল আমি আর প্রভাত দুজনে মুগ্ধ হয়ে বসে রইলুম কতক্ষণ। তারপর খিচুড়ি রান্না হোল, বটতলায় বসে ডাক্তার রক্ষিত, আমি ও প্রভাতকিরণ—তিনজনে খিচুড়ি খাওয়া গেল, তাস খেলা গেল, গল্পগুজব করা গেল। তারপর বেলা পড়লে ছায়াভরা বিকেলে সবাই পাহাড় থেকে ফিরলুম।

কাল বিকেলে ডুবলাবেড়া এলুম হলুদপুকুর থেকে। রাত্রে টাটানগরে ছিলুম, মিঃ ভর্মার বাড়ীতে। অনেকে দেখা করতে এল। রাত দেড়টা পর্য্যন্ত 'দেবযান' সম্বন্ধে গল্প।

সুশীলবাবুর মোটরে স্টেশনে এলুম ভোর ছ'টাতে। হলুদপুকুর স্টেশনে নেমে এক মাড়োয়ারি দোকানে চা ও খাবার খেয়ে বারোজ সাহেবের মোটর লরির জন্যে অপেক্ষা করলুম। বারোজ সাহেবের লোক বল্লে—রাত্রে যা বৃষ্টি হয়েচে, ও রাস্তায় গাড়ী আসা মুশ্‌কিল। শোনা গেল ডুবলাবেড়া এখান থেকে ষোল মাইল। দিনটি মেঘাচ্ছন্ন ও ঠাণ্ডা। হেঁটে বেরিয়ে পড়ি আমি ও মিঃ ভর্মা। কেমন কাঁকরের পথটি এঁকে বেঁকে আমাদের সামনে দূর থেকে বহুদূরে সুদূরে নীল শৈলমালা ও বনপ্রান্তরের দিকে চলে গিয়েচে। ঐ হোল রাইরঙ্কপুরের পথ—এ পথ চলে গেল বারিপদা হয়ে বালেশ্বর ও কটক। আমরা বনের দিকে অগ্রসর হচ্চি—ঐ শৈলমালার মধ্যে কোন এক অনাবৃত ছায়াভরা উপত্যকায় ডুবলাবেড়া গ্রাম। সেখান থেকে ভ্যালেডিয়ম ore আসচে।

প্রথমে পড়লো নড়সা নদী। পথের দুধারে কালো পাথরের পাহাড়, যেন পাথুরে কয়লার স্তূপ, এসব পাহাড় প্রায়ই অনুর্ব্বর, বৃক্ষলতাহীন—ক্বচিৎ কোন পাহাড়ে এক-আধটা শিবগাছ দণ্ডায়মান। হাঁড়িয়ালি বলে একটা গ্রামে এক বাড়ী থেকে শাঁকের আওয়াজ শুনে এক ছোকরাকে বল্লুম—এদের বাড়ীতে শাঁক বাজচে কেন?

—সত্যনারায়ণ পুজো হচ্চে।

—কি জাত এরা?

—মহারাণা।

—সে কি?

—জ্যোতিষ।

—ব্রাহ্মণ?

—ওই।

এদেশে হাঁ বলতে জানে না, বলে—'ওই'।

এ গ্রামের নিচেই হাঁড়িয়ালি বলে ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী। হেঁটে পার হয়ে গেলুম। রাস্তা হাঁটতে কি আনন্দই হচ্চে সকাল বেলাটা। ধু ধু করচে মুক্ত উচ্চাবচ ভূমিভাগ, যেন space-এর সমুদ্র, তার মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম, ছোট বড় কালো পাথরের পাহাড়, পলাশ, শিবরৃক্ষ, মহুল ও আসান। শালগাছ বেশী চোখে পড়লো না। একস্থানে পথের ধারে বড় গাছের তলায় একটা চওড়া পাথরে বাংলা অক্ষরে লেখা আছে—

মৃত্যু বাসেয়া সর্দ্দার।

সাং চাকড়ি, সন ১৩৪৩।

অর্থাৎ উক্ত গ্রামের ৺বাসেয়া সর্দ্দারকে অমর করবার চেষ্টা। এই গ্রাম পার হয়ে একটা পার্ব্বত্য নদী—নদীর নাম লুপুং, কিছুদূরে এই নামের একটা গ্রাম। পথের দুধারে আমের গাছ—এমন অদ্ভুত ধরনের বউল ধরেচে, আর তার কি ভরপুর সুবাস! একটা চারা আমগাছ দেখে মনে হোল গাছটাতে ফুল ধরেচে। নদীটার ধারে এক বিশাল সুপ্রাচীন অর্জ্জুন গাছের শাখা-প্রশাখার তলে আম্রমুকুলের সৌরভের মধ্যে কিছুক্ষণ বসে রইলাম।

বেলা হয়েচে, পথ হেঁটে খিদেও পেয়েচে। কররালাই গ্রামের পাশে একটা কালো পাথরের পাহাড়ের নিচে একটা কুলগাছ, অনেক কুল পেকেচে দেখে সেখানে কুল কুড়ুতে গেলাম। পথে কতকগুলি ছেলে স্কুলে যাচ্চে, কররালাই গ্রামে একটা পাঠশালা দেখে এলেটি বটে পথের ধারে। আমরা ছেলেদের নাম জিজ্ঞাসা করলুম। একজন বল্লে—তার নাম দিবাকর তাঁতি। একজনের নাম ধনুর্ধর বাকে।

—কি জাত?

—বাকে জাত।

এই সময়ে একটু একটু বৃষ্টি পড়তে লাগলো। আমাদের সামনে ডানদিকে জোড়ুভি শিখরদেশ (২০০০ ফুট) দেখা যাচ্চে, দূরে নারদা (১৭০৬ ফুট) শিখর। সামনের শৈলমালার ওপারেই ময়ূরভঞ্জ, অগণ্য বন্যহস্তী ঐ সব পাহাড়ে। দিন থাকতে থাকতে দুবলাবেড়া পৌঁছুলে বাঁচি। কোয়ালি গ্রামে পৌঁছে গেলুম তখন বেলা একটা। এক কুম্ভকারের বাড়ীতে আশ্রয় নিলুম বৃষ্টির সময়। তাদের খোলার চাঁলা, মাটির দেওয়াল। মেয়েদের হাতে রূপোর অলংকার। কপালে সিঁদুর। কথা বাংলাই—তবে বড্ড বাঁকা বাঁকা এবং একটু উড়িয়া-ঘেঁষা। ওরা মুড়ি খাওয়ালে তেলছুন দিয়ে মেখে এনে। হঠাৎ এক বৃদ্ধ উড়িয়া ব্রাহ্মণ এসে ভিক্ষা চাইলো। তার নাম বাইধর মিশ্র, বাড়ী পুরীর কাছে মালতী-পাতপুর। ওর বারো বছরের ছেলে বাড়ী থেকে আজ দু-তিন মাস ভিক্ষে করতে বেরিয়েচে এবং খবর পাওয়া গিয়েচে ছোকরা সিংভূমে এসেচে। তাই বাইধর খুঁজতে বেরিয়েচে ছেলেকে। হলুদপুকুর স্টেশনে গিয়ে নেমে গাঁয়ে গাঁয়ে বেড়াচ্চে। উড়িয়া ভাষায় বল্লে—কাল রাতে এক মণ্ডলের বাড়ী উঠেছিলুম, এমন ঝড়বৃষ্টি এল, ভাত রান্না করতে পারলুম না। কিছু খাইনি রাত্রে। ওকে আমরা কিছু পয়সা ও মুড়ি দিলাম। একটু তেল দিলাম, ও একটা ফাঁপা বাঁশের লাঠির মধ্যে তেলটুকু পুরে নিলে। কি সুন্দর সরল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। হেসে বল্লে—বাবু, বাড়িকে বাড়ি, চূড়াকে চূড়া। খুব খুশী।

আমরা কোয়ালি থেকে বৃষ্টি থামলে বেরিয়ে গুবুরা নদী পার হলুম। (রাখা মাইনসের সেই গুবুরা নদী, এখানে ছাৎনা পাহাড় থেকে বেরিয়েচে) তারপর বন ও জঙ্গলের পথে এলুম হরিনা গ্রামের মহাদেব স্থানে। এই বনের মধ্যে এক ভাঙা মন্দির, চারিদিকে বট, আমলকী, পলাশ, বিল্ব প্রভৃতি বৃক্ষরাজি, মানুষের হাতের নয়, স্বাভাবিক বন। দেবস্থান বলে লোকে কাটেনি। ওখানে একটু বিশ্রাম করে নিয়ে আবার পথে বেরুই। পথ চলার আনন্দ এমন একটা নেশা আনে মনে, ছোট্ট একটা বন দেখলেও মনে হয় অদ্ভুত জিনিস দেখছি। বাহ্যজগৎকে গ্রহণ করে যে মন, সে শুধু উপভোগ করে ক্ষান্ত থাকে না, সৃষ্টিও করে। গুবুরা নদী পার হবার পরে আর একটা ক্ষুদ্র নদী পেলুম, সেটা পার হয়ে বেগনাড়ি গ্রাম। সামনের পাহাড়ে খারিয়া জাতিরা ঝুম্ চাষ করচে বন কেটে, বোধ হয় সে বাঁকা জায়গাতে খড় হয়েচে, শুক খড়ের ক্ষেত রাঙা রাঙা দেখাচ্চে, বেগনাড়ি গ্রামের পাশ দিয়ে পাকী, অনেকগুলো বড় বড় গাছ পথের ধারে, বাঁশঝাড়, তেঁতুল, মহুয়া, অর্জুন। একজন

দেখছিলুম মেয়েদের সিঁথিতে সিঁদুর, পরনে শাড়ী—এখানে দেখলুম মেয়েদের মোটা হাত-বোনা কাপড় দু'টুকরো জড়ানো—হো বা সাঁওতালদের ধরনে। অনেক টোমাটো ক্ষেত পথের পাশে।

একটি বৃদ্ধ মহিষ চরাচ্চে, তাকে বল্লাম—দুবলাবেড়া কতদূর ?

সে বল্লে—সামনে মাগুরু আর নেংগাম লাগালাগি, নেংগাম আর দুবলাবেড়া ভিড়াভিড়ি।

নতুন ভাষা শিখলাম। 'ভিড়াভিড়ি' মানে কাছাকাছি, কিন্তু এখানেই গোলমাল। ১৪ মাইল পথ তখন হাঁটা হয়ে গিয়েচে, ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্তও বটে—সে অবস্থায় এ দেশের লোকের মুখে 'ভিড়াভিড়ি' শুনে খুব আশ্বস্ত হলুম না। এরা তিন মাইলকেও কাছাকাছি বলতে পারে। একটা পাহাড় দেখিয়ে বল্লে—ঐ পাহাড়টা দেখচিস্, ঐ পাহাড়টা ঘুরে যেতে হবেক। এ জায়গাটি চেয়ে দেখি বড় চমৎকার। তিনদিকে শৈলমালা ও নিবিড় বন আমাদের পথকে ঘিরেচে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে, অবিশ্যি দূরে দূরে। জোজুড়ি শিখরদেশ আর দেখা যায় না, নারদা **peak** ডাইনে বহু পিছনে অস্পষ্ট দেখা যাচ্চে, রোদ ফুটেচে পশ্চিম গগনে, অথচ বাঁদিকের ছাৎনা ও আটকুশী শৈলমালা সাদা কুয়াশার মত মেঘে ঢাকা। যেন দার্জ্জিলিংয়ের কুয়াশা। ঠাণ্ডা হাওয়া বইচে সেদিক থেকে।

একদিকে শাল কেঁদবন পথের পাশেই। বড় বড় শিলাখণ্ড সর্ব্বত্র। পাহাড়টা খুব উঁচু, ঘরে যাবার সময় বাঁ পাশে পর্ব্বতসানুতে বনশোভা বেশ দেখালো পড়ন্ত রোদে। পাকা ফল খেতে খেতে যাচ্চে একদল বন্য মেয়ে। দুবলাবেড়া তাঁবুতে পৌঁছুলাম বেলা পাঁচটাতে। পাহাড়ের নিম্নসানুর বন যেখানে শেষ হয়েচে, সেইখানেই তাঁবু পাতা। মিঃ বারোজ, তাঁবুতে বসে মিঃ সিন্‌হার সঙ্গে গল্প করচে। বল্লে—পথে বৃষ্টির জন্যে মোটর পাঠাতে পারিনি, এখন পাঠাচ্ছিলাম। চা ও খাবার খেয়ে ধড়ে প্রাণ এল।

রাত্রে একটু জ্যোৎস্না উঠলো। কি শোভাই হোল তাঁবুর পেছনের পর্ব্বতসানুর বনের। শালগাছ নেই এ বনে। কেঁদ, পড়াশি, শিবগাছ, ফুল, কম্‌প্রিটাম লতা, বড় বড় বিরাটকার শিলাখণ্ডের ওপর টেরি লতা ও মোটা মোটা চীহড় লতার ঘন ঝোপ, আমলকী, নিম ইত্যাদি নিয়ে জঙ্গলটা। বৈচিত্র্য আছে এ বনে, একঘেয়ে শালবন বড় খারাপ।

মিঠাই ঝর্ণার ওপারে লধাইভি গ্রামে খাড়িয়া জাতির বাস। তাদের মাদল বাজচে জ্যোৎস্না রাত্রে। এ একেবারে বন্য জায়গা, বারোজ বল্লে, বড় বুনো হাতীর উপদ্রব। গত বৎসর বন্য হস্তীতে নিকটের কেরু-কোচা গ্রামের একটা লোককে মেরে ফেলেছিল।' কি সুন্দর বনশোভা। জোৎস্না পড়েচে উপত্যকার ওপারের আটকুশী শৈলশ্রেণীর একদিকের ঢালুতে—এ যেন বনপরীর দেশটি। শিউলি গাছের জঙ্গল তাঁবুর পেছনে শৈলসানুতে। শরৎকাল হলে প্রস্ফুটিত শেফালীর সৌরভ ভেসে আসতো শীতল নৈশ বাতাসে।

এই যে লিখচি, সামনে পাহাড়ের মাথায় বর্ষার সাদা মেঘপুঞ্জ জমেচে। তাঁবুর দোর থেকে বড় চমৎকার দেখাচ্চে গাছগুলোকে। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের একটি কথা মনে পড়ে গেল, **"A nation's history has three stages. Success, then as a**

consequence of success, arrogance and injustice; then as a consequence of these, downfall."

কাল সারাদিন বৃষ্টিতে তাঁবুতে বসে। কোথাও বেরুতে পারিনি। তাঁবুর পেছনে লুদাম, করম ও ধ গাছ, একটা ধাতুপ ফুলগাছে প্রথম বসন্তের রাঙা রাঙা ফুল ফুটেচে। পাহাড়ের সানুতে জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় শিলাখণ্ড। যে কোনোটাতে আরাম করে বসে চিন্তা করা যায় বা লেখা যায়। কিন্তু বাদলাবৃষ্টিতে সব ভিজে। সন্ধ্যায় বারোজ সাহেবের বাংলোতে বেড়াতে গিয়ে বসলুম খানিকক্ষণ। পূর্ব্ব আকাশে পাহাড়ের ওপর দিয়ে ভাঙা মেঘের ফাঁকে পূর্ণচন্দ্র উঠলো। মিসেস্ বারোজ বন্য হস্তীর গল্প করলে। এক পেয়ালা কোকো পান করে এই শীতে বেশ আরাম করে বুনো হাতী ও মাতাল ভালুকের গল্প শোনা গেল। আর বছর মাগড়ু গ্রামের নিকটবর্ত্তী পথে একটা ভালুক পেট ভরে মহুয়া ফুল খেয়ে যখন গাছ থেকে নামলো—তখন সে ঘোর মাতাল, টলতে টলতে চলেচে।

রাত্রে ভীষণ ঝড় ও বৃষ্টি শুরু হোল। সারারাত্রি বৃষ্টি।

আজ সকালেও বৃষ্টি পড়ছিল। বেলা হলে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। আমরা বিকেলে মাগড়ু ও চেংশম গ্রামে বেড়াতে গেলুম। ডাইনের প্রকাণ্ড পাহাড়শ্রেণীর পাশ দিয়ে আসান পড়াশির বনের ছায়ায় পথ, বনে পিয়াল গাছে মুকুল ধরেচে, বাতাসে আম্র ও পিয়াল মুকুলের সৌরভ, কালোকালো পাথরের স্তূপের ওপর টেরির জঙ্গল, বামে পোটরী ও কুন্দরুকোটা পাহাড়—ওখানে নাকি একটা সোনার খনি ছিল, বিলিংহাম নামে এক সাহেবের। এখন খনির কাজ বন্ধ শুনলুম। ওই পাহাড়ের ওপর দিয়ে অস্ত আকাশের তলায় তলায় ময়ূরভঞ্জ যাবার পথ। আমরা যখন ফিরলুম তখন বেলা পড়ে এসেচে, বন্য কুক্কুট ডাকচে ডানদিকের শৈলসানুর গহন অরণ্যের মধ্যে।

রাত্রে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠলো। আমরা তাঁবুর পিছনের শৈলশ্রেণীর ওপরে একটা পাথরের চাতালে রাত দুটো পর্য্যন্ত বসে আগুন জ্বালিয়ে গল্প করলুম। ভালুক ও বন্য হস্তীর ভয়ে (এবং শীতের জন্যেও বটে) আগুন জ্বালানোটা নিতান্ত দরকার। আজ বিকেলেই দেখে এসেচি মাগড়ু গ্রামে লাখন মাঝি বলে একটা সাঁওতাল যুবকের একটা চোখ ভালুকে একেবারে উপড়ে দিয়েচে—অবিশ্যি ঘটনাটা ঘটেছিল মাগড়ু থেকে ডুবলাবেড়া যাবার পথে জঙ্গলের ধারে। লাখন টাঙি হাতে যাচ্ছিল ডুবলাবেড়া, ভালুক মহুয়াগাছ থেকে নেমে ওর ওপর এসে পড়ে, উভয়ে জড়াজড়ি ধস্তাধস্তি হয়, তার ফলে লাখনকে একটা চক্ষুর মায়া কাটাতে হয়েচে। পরশু রাত্রে বারোজ সাহেবের মুরগীর ঘরে বাঘ এসেছিল, সকালে আবার দাগ দেখা গিয়েচে। এই সব শুনে নির্জ্জন পাহাড়ের ওপর গভীর রাত্রে আমরা তিনটি প্রাণী বসে থাকবার সময় যে খুব নিরাপদ ভাবছিলুম নিজেদের এমন কথা বলে মিথ্যে বলা হবে।

কিন্তু সব বিপদকে অগ্রাহ্য করা যায় সে অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না রাত্রির শোভা দেখবার জন্যে। পাহাড়ের ওপরে শুকনো শালগা, দোকা (Odina wodier), অজস্র বন্য শিউলি, শিববৃক্ষ,

গোলগোলি, পড়াশি, বনতুলসী ও করম (Adina cordifolia) গাছের জঙ্গলে নিশীথ রাত্রির জ্যোৎস্না পড়েচে, সামনের উপত্যকা ও ওপারের আটকুশি ও পোটরা পাহাড়শ্রেণীতে বনে বনে সেই জ্যোৎস্না এক মায়ালোকের সৃষ্টি করেচে—যেন এই জনহীন নিশীথে বনদেব ও দেবীরা এখানে নামেন নিঃশব্দ পদক্ষেপে, তাঁদের মুখে মুখে ধ্বনিত হয় বিশ্বের অধিদেবতার নীরব জয়গান।

এই বনে (এ পাহাড়টি ছাড়া, এর ওপর বেশির ভাগ শুধুই শেফালি গাছ) এ সব গাছ তো আছেই আরও আছে তুন, লতা, পলাশ Butea Superba, বোংগা, সর্জ্জম লতা, শাল, আসান, পিয়াল, মহুয়া, অর্জ্জুন, বট, কদম্ব, কুসুম, ধওড়া, রাজ জেহল, কুজরি, রোহান (Soymida Febrifuga), বাঁশ, পিয়াশাল, চীহড়লতা, বেল প্রভৃতি গাছ আছে। অবিশ্যি কোনো একটা জায়গায় এত রকমের বৃক্ষ একসঙ্গে জড়াজড়ি করে থাকে না বা নেই ও মানুষের তৈরি বাগান ছাড়া। অরণ্যের প্রকৃতিই তেমন নয়, যেখানে যে গাছ আছে সেখানে সেটাই বেশি। শাল তো শালই, অর্জ্জুন তো অর্জ্জুনই—এমন রকম।

আজ সকালে তাঁবু থেকে বার হয়ে দুবলাবেড়া গ্রামের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ে উঠলুম। সুন্দর বনপথে উঠলুম। ঘাটশিলা থেকে ষোল মাইল হবে। দূরে ভাল্‌কি পাহাড়শ্রেণী দেখা যাচ্চে। এখন বেলা সাড়ে পাঁচটা। এখানে বসে এইমাত্র চা ও খাবার খেয়েচি। দূরে দূরে শৈলশ্রেণী, সামনে সমতলভূমি নীল কুয়াসায় অস্পষ্ট। একটা শিলাখণ্ডে বসে থাকবার সময় গাছপালার ছায়ায় বসে মনে হোল হিমালয়ের পর্ব্বতারণ্যে বসে আছি। পড়াশি বাঁশ, সোঁদাল প্রভৃতি গাছ। কাল সকালে আমাদের তাঁবুর পেছনে পাহাড়টার বড় পাথরের চাতালটাতে কতক্ষণ কাটিয়েচি। আকাশ ছিল সুনীল, তার তলায় শুকনো শালগাছ ও দোকা গাছের আঁকা-বাঁকা ডালপালার ভঙ্গি—সে একটা দেখবার জিনিস। একটা শিলাখণ্ডে রৌদ্রে কতক্ষণ শুয়ে রইলুম। রৌদ্রস্নাত দ্বিপ্রহরে চারিদিকে সে বন্য সৌন্দর্য্য আমাকে অভিভূত করে তুললে। সত্যই এ সৌন্দর্য্য যেন সহ্য করা শক্ত। প্রাণভরে ভগবানের শিল্প রচনা দেখি। বিকেলে আমরা ঘাটচুয়ার বনে একটি অতি চমৎকার স্থানে গেলুম, তাঁবু থেকে ৪ মাইল দূরে মুসাবনীর পথে। ছাতনাকোটা ও রাঙামাটিয়া নামে দুটি সাঁওতালি গ্রাম পথেই পড়ে—সাঁওতালদের মাটির ঘরগুলি দেখবার জিনিস বটে, পরিষ্কারভাবে লেপা-মোছা, রাঙা ও কালো মাটি দিয়ে চিত্তির করা দেওয়ালের গায়ে আলনার মত পাখি আঁকা, গাছপালা আঁকা। ঘাটচুয়ার জায়গাটাতে দুদিক থেকে দুটি শৈলমালা এসে ক্রমনিম্ন হয়ে শেষ হয়ে গিয়েছে—মধ্যে হাত পাঁচেক চওড়া সমতলভূমি, এক পাশে একটা পার্ব্বত্য নদী বড় বড় শিলাখণ্ডের ওপর দিয়ে বয়ে চলেচে। ঘন বন দু পাশে, বর্ণার ওপরে অনাবৃত শিলাস্তর থাকে থাকে কাৎ-ভাবে এসে পড়েচে—প্রায় একশো ফুট কি দেড়শো ফুট উঁচু। স্তরগুলো একটার পরে একটা সাজানো, একটি থেকে আর একটি গুনে নেওয়া যায়। দুটি গুহা আছে জলের ওপরেই, গত বৎসর নাকি এক খাড়িয়া পরিবার ওতে বাস করতো।

আমরা যখন ফিরলুম, তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেচে, সম্মুখে আঁধার রাত। বিভিন্ন পার্ব্বত্য নালার ওপরকার পাথর চোখে দেখা যায় না, কোনোরকমে হোঁচট খেতে খেতে পথ চলি। কিন্তু ঝক্‌ঝকে তারাভরা আকাশের মহিমময় রূপ দেখে সব কষ্ট ভুলে গেলুম। এদিকে বারোজ সাহেবের বাংলোতে ডিনার খাওয়ার কথা, রাত হোল প্রায় সাড়ে আটটা তাঁবুতে পৌঁছুতে। ডিনার খেয়ে ফিরতে এগারোটা বেজে গেল। বারোজ বল্লে, সন্ধ্যাবেলা তোমরা বাঘের ডাক শুনতে পেলে না সামনের পাহাড়ে! সাড়ে ছ'টার সময়ে খুব ডাকছিল বাঘ।

আজ সকালে উঠে চা খেয়ে মিঠাই স্বর্ণার কাছে চুকলু বাগাল গ্রামে খাড়িয়া জাতি দেখতে গিয়েছিলুম। ডুবলাবেড়া ছাড়িয়ে খানিকটা গিয়ে পথ উঠেচে পাহাড়ের ওপরে। ঘন বনের মধ্য দিয়ে পথ, একটা কি গাছের ডালে ঝুটো চিল বসে আছে। ওপরে উঠতে উঠতে পা ধরে গেল—তখন একটা বড় পাথরের ওপরে বসলুম. একটা বড় মহুয়া গাছ সোজা উঠেচে দূরের পাহাড় ও সমতলভূমির পটভূমিতে। ভগবানের নৈকট্য এসব জায়গায় যত অনুভব করা যায়, এত কি কলকাতা কি টাটানগরে বসে সম্ভব? টাটানগর কেন বললুম, সিংভূমের বনে বাস করে তাঁবুতে, টাটানগরের নাম করবো না এটা অন্যায়। আমরা চড়াইপথে চলেচি, বুনো বাঁশ, আমলকী, পাপড়া, কর্কট, পড়াশি, মহুয়া গাছের তলা দিয়ে, কোথাও পথের পাশে কুঁচ ফলে আছে ঝোপে, কোথাও এক রকম হলদে ঘাসের ফুল ফুটে আছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইচে, আকাশে কালো মেঘ।

পাহাড়ের ওপর উঠে দুজন খাড়িয়ার বাড়ী—তাদের মেয়েরা শুধু আছে, আমাদের দেখে সোজা পালালো। তারপর আমরা গেলুম চুকলু বাগালের বাড়ী। খড়ের ছাউনি, নিচু মাটির ঘর, এমন চমৎকার দৃশ্য চারিদিকে, শিলং কি কার্সিয়ং এর বড় লোকের বাড়ীও এমন জায়গায় হলে গর্ব্বের বিষয় হতে পারে। চুকলুর ছেলে আনন্দপুর স্কুলে পড়ে। কাল রাত্রে চুকলুর গরুটা নাকি বাঘে মেরেচে সামনের পাহাড়ে। সবটা খেয়েচে? আমরা জিগ্যেস্ করি।

সে বলে—উয়াকার মুড়িটা নিয়ে গেছে। বাকিটা ডুংরিটাতে রাখি গেলো!

এটার নাম চরাই পাহাড়, ২১০৬ ফুট উঁচু। হিমালয়ের মত দৃশ্য চারিদিকে। একটা উঁচু ডুংরির ওপর গিয়ে আমরা বসলুম, গ্রানিটের সূক্ষ্মাগ্র চূড়ার চারিপাশে ভাঙা ভাঙা গ্রানিটের **boulder**—ফাঁকে ফাঁকে খড়, দু-চার ঝাড় বন্যবাঁশ, একটা সাথীহীন মহুয়া। সামনের সমতল-ভূমির দৃশ্য এত উঁচু থেকে বড় চমৎকার দেখাচ্চে।

একটি সাঁওতাল তীরধনুক হাতে হঠাৎ এসে হাজির। তার নাম জিগ্যেস করলে নাম বলে না। জিগ্যেস করে জানা গেল ওর বাড়ী রাঙামাটিয়া গ্রামে, সে এবং তার দুজন সঙ্গী এসেচে বাঘে-মারা গরুটার অর্দ্ধভুক্ত দেহটা খুঁজে নিতে। এই গ্রানিট পর্ব্বতচূড়ায় আসলে সেটাই সে খুঁজতে এসেচে। আমাদের কৌতূহল পূর্ণ করবার অবকাশ নেই ওর।

আমরা বল্লাম—গরু খাস্ তোরা?

—ওই।

একটু পরে আমরা আমাদের গ্রানিট চূড়ায় বসে দেখচি, তিনজন সাঁওতাল অথবা হো নীচের বনে শুষ্ক শালের পাতার রাশির ওপর দিয়ে মচ্ মচ্ করে হাঁটতে হাঁটতে বনের সর্ব্বত্র আঁতিপাতি করে খুঁজচে কালকার সেই বাঘে-খাওয়া গরুর মৃতদেহটার জন্যে। ঘন্টাখানেক খুঁজবার পরে ওদের অধ্যবসায় সার্থক হোল, দেখি আমাদের চুড়া থেকে সামান্য উঁচু আর একটা ডুংরির মাথায় দুটি লোক মরা গরু বাঁশে ঝুলিয়ে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্চে।

আমাদেরও চা ও খাবার এই সময় দুবলাবেড়া থেকে এসে পৌঁছুলো। চা খেয়ে নিয়ে আমরা রওনা হই। নিচে নেমে একটা খাড়িয়ার কুটির। ওর মধ্যে আমরা ঢুকে দেখি—একটা মলিন চেটাই, কয়েকটি হাঁড়ি-কলসী, লাউ কেটে তৈরী একটা হাতা, চীহড় পাতার একটা ঠোঙা, দুটো শুকনো ধুঁধুল, একটা উদুখল—এই তার সমস্ত জাগতিক সম্পত্তি।

ঢুকলু বাগাল বল্লে—হাতীর ভয়ে আমরা দিই রাতে বাইরে শুই আজ্ঞে। নইলে ঘর ভাঙি দিবেক।

—তোরা হাতী এলে কি করিস?

—হাতী খেদবো।

এই গ্রামের নাম গামীরকোচা। আমার মনে হোল পড়ন্ত হলদে রোদে এই বন পর্ব্বত, দূরে দূরে অগণ্য শৈলমালা ও গ্রানিট শিখর, অরণ্যাবৃত সানুদেশ ও নিচেকার সমতলভূমির কিছু অংশ দেখে—যে, এই খাড়িয়া অধিবাসীরা খুবই গরীব হয়তো—কিন্তু অনেক শহরে বড়লোকের চেয়ে ভাল জায়গায় বাস করে এরা। দার্জ্জিলিং, কার্সিয়াং বা শিলংএর চেয়ে কোনো অংশে নিকৃষ্ট নয় এদের বাড়ীর মাটির নিচু দাওয়া থেকে চতুষ্পার্শ্বের পার্ব্বত্যদৃশ্য। যেদিকেই চাই—সামনের ময়ূরভঞ্জের দিকেই হোক্ বা বামে ভালুকি ও মুলাবনীর দিকেই হোক—শৈলমালার পেছনে শৈলমালা, তাদের পেছনে শৈলমালা, তাদের পেছনে আবার উচ্চতর শৈলমালা—সজল নীল কুয়াশায় অস্পষ্ট, কোনোটাতে হলদে রোদ, কোনোটার মাথায় মেঘের ছায়া, কোনোটা কুয়াশায় ধোঁয়া ধোঁয়া। এই সব দেখতে দেখতে ঘন বনের পথে নামলুম।

সন্ধ্যা হয়ে এসেচে, তাঁবুতে এলুম। একটু পরে শুনি সামনে পাহাড়ে বাঘের 'হাঁকোর হাঁকোর' আওয়াজ। দুবার তিনবার শুনলাম। একটু পরে বারোজ সাহেব তাঁবুতে বেড়াতে এল—সে বল্লে, কাল সন্ধ্যায় এমনি ডাকছিল বাঘ। রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছাড়া এমন আওয়াজ করবেনা। নির্জ্জন বন পাহাড়ের ধারে তাঁবু, অন্ধকার রাত্রি, এমনি বাঘের ডাকে ভয় যে না হোল মনে, তা বলতে পারিনে।

বারোজ বল্লে—খাড়িয়ারা সপ্তাহে একবার মাত্র ভাত খেয়ে থাকে গরমকালে। আর কিছু জোটে না। খাড়িয়া কুলি মেয়েরা পয়সা নিয়ে গেল মজুরির, তার পরদিন এল না ওরা খনিতে কাজ করতে। টাকা হাতে পেয়ে ভয় পেল।

বল্লে—এ সব টাকা আমাদের?

—হ্যাঁ।

—কত আছে ?

—দু টাকা। গুনতে জানিস না ?

—নেই জানি।

এত গরীব কিন্তু এত সরল !

ধলভূমের দৃশ্য যে এত wild ও এত ভালো তা আগে জানতুম না। ভগবানকে ধন্যবাদ যে তিনি দেখবার সুযোগ দিয়েছেন।

রাত্রি দশটা। ডায়েরী লিখতে লিখতে তাঁবুর বাইরে এসে দেখি কৃষ্ণা তৃতীয়ার ভাঙা চাঁদ অনেকটা উঠে গিয়েচে আকাশে—পেছনের পর্ব্বতসানুর দোকা, শালগা ও পাষড়া গাছ-গুলো ঈষৎ অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় কি সুন্দর দেখাচ্চে—মায়াময়, অপরূপ। এই সরু সংকীর্ণ উপত্যকার সবটা চাঁদের আলোতে আলো হয়ে উঠেচে। কতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে রইলুম বাইরে, কখনও চাই তারা-ভরা আকাশের দিকে, কখনও চাই জ্যোৎস্নাস্নাত দোকা ও শালগা গাছ গুলির দিকে।

আজ সকালে চা খেয়ে স্নান করে তাঁবুর সামনে পাহাড়টিতে উঠে সেই শিলাখণ্ডে বসলুম—এখুনি আজ চলে যাচ্ছি এই সুন্দর বনভূমি ছেড়ে। আবার কবে আসবো কে জানে ? একটু রোদ উঠেচে, এ পাহাড়ের মাথায় সব শুকনো গাছ, শিউলি বন শুকনো, দোকা গাছ-গুলো শুকনো শিউলি কি আমড়া গাছের মত, শুকনো বনতুলসীর জঙ্গল, নিষ্পত্র শিববৃক্ষ, নিষ্পত্র গাছে হলুদরঙের গোলগোল ফুল ফুটে আছে, কালো পাথরের ফাঁকে ফাঁকে শুকনো খড় বন। কি একটা শুকনো কাঁটা গাছ অজস্র—সব শুকনো গাছ এখানে, ভারি চমৎকার লাগে কালো পাথরের ওপর নিষ্পত্র শুকনো গাছের বন। ভগবানের আশ্চর্য্য শিল্প কি সুন্দর ভাবে এখানে ফুটেচে !

বেলা এগারোটাতে মোটর ছেড়ে প্রথমে পৌছুলাম মহাদেব শাল। বননিকুঞ্জের অন্তরালে পাপিয়া ও কত কি বনপাখীর কলকাকলি। বহুকালের পুরোনো পাথরের কালী প্রতিমা। একটা খড়ের চালাঘরে শিবলিঙ্গ পোঁতা আছে—গর্ত্তের মধ্যে মাথাটুকু মাত্র দেখা যায়। বড় একটা বট গাছ, অনেক আসান ও পলাশ গাছ, কোথা থেকে আম্রমুকুলের সৌরভ ভেসে আসছে, প্রাচীন দিনের মুনি-ঋষিদের তপোবন যেন। মেঘমেদুর প্রভাতের স্নিগ্ধ আকাশের তলে কি মনোরম ছবিই এঁরা রচনা করেছে ! মনে হোল আরও অনেকক্ষণ বসে থাকি এখানে—কিন্তু সময় ছিল না।

মহাদেব শাল থেকে বার হয়েই দেখি বারোজ সাহেব ওর মোটরে ফিরচে। আমাদের দেখে নামলো। ও বল্লে, মহাদেব শাল খুব পুরোনো স্থান, বারোজ এ অঞ্চলের অনেক সংবাদ রাখে। ওকে বিদায় দিয়ে আমরা আবার গাড়ীতে উঠলুম,—কোয়ালি গ্রামে সেদিনকার সেই বাড়ীটা দেখলুম, সেদিন যেখানে বসে মুড়ি খেয়েছিলুম। হলুদপুকুর পার হই। কালিকাপুর রেন্‌জ্‌ আপিসে মিসেস ভর্দ্ধার সঙ্গে দেখা হোল। কাপড়গাদি ঘাটের

কাছে দৃশ্য বড় সুন্দর—দুধারে পাহাড় ও জঙ্গল, বাঁদিক দিয়ে একটা পাৰ্ব্বত্য ঝর্ণা বয়ে চলেচে। সামনের পাহাড়ে আর বছর একদল হাতী দেখেছিলেন মিঃ সিন্‌হা বল্লেন। মিঃ সইয়ারের বাংলোটা পড়ে আছে রাখা মাইন্‌সে—ভূতের বাড়ী হয়ে। একটা কুল গাছ থেকে পাকা কুল পেড়ে খেলুম ভাঙা ক্লাব-বাড়ীটার পেছনে।

বাড়ী পৌঁছে চা খেয়ে টুটু, উমা ও বৌমাকে নিয়ে বুরুডি ও বাসাডেরা ঘাটের (hill pass) বনের মধ্যে মোটরে গেলুম বেড়াতে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসচে বনে, গম্ভীর দৃশ্য চারিদিকে। খড্ডের গভীরতা প্রায় ৫০০।৬০০ ফুট—সেখানে বহু নিচে দিয়ে খরস্রোতা নদী (খরসুতি নদী, এখানকার ভাষায়) বয়ে চলেচে, আমি, টুটু, বৌমা খরস্রোতার ওপরে দাঁড়িয়ে আছি- ওপারের পৰ্ব্বতারণ্যে ময়ূর ডাকচে। সন্ধ্যা হোল, আমরা পাহাড় থেকে নেমে শালবনের মধ্যে দিয়ে চলে এলুম, টুটুকে গান গাইতে বল্লেন মিঃ সিন্‌হা। আমরা সবাই সেই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলুম ও গান শুনলুম। তারপর ডাকবাংলোতে এসে চা খাই বৌমা, টুটু ও আমি।

পরদিন সন্ধ্যায় বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে দেখা রাজবাড়ীতে। আমি বল্লাম, হরিনা গ্রামের গভীর বনের মধ্যে যে মহাদেব শাল আছে, সেখানটা বড় সুন্দর তপোবনের মত। কিন্তু যাত্রীদের বসবার জায়গা নেই, ভাঙা মন্দিরেরও সংস্কার দরকার। আপনি রাজসরকার থেকে ওটা করে দিন।

অমরবাবুর বাড়ী গিয়ে গল্পগুজব করলুম রাত্রে।

কোথায় ডুবলাবেড়া, ঘাটশিলা—আর কোথায় বারাকপুর! এক দিনের মধ্যে কোথা থেকে কোথায় এসে পড়েচি—কোথায় চাকৃড়ি গ্রামে বাসেয়া সর্দ্দারের স্মৃতি-প্রস্তর, কোথায় চরাই পাহাড়ের শিখর! কোথায় দোকা ও শালগা বন! আজ এ বারাকপুরে আম্রমুকুলের ঘন সুবাস ভরা অপরাহ্নের বাতাসে জানালা খুলে দেখছি সামনের খুড়ীমাদের বাঁশঝাড়ের মাথায় রাঙা রোদ, কোকিল ও কত কি পাখী ডাকচে—আমি একা ঘরে বসে লিখচি। শুকনো বাঁশপাতা-ঝরা পথের ওপর বৈকালের ছায়া নেমে এসেচে, ঘেঁটুফুল ফুটেচে আমার উঠোনে, ওদের বাঁশতলায়, আমি বসে বসে দেখচি। কল্যাণী গিয়েচে ফকিরচাঁদের বাড়ী বৌভাতের নিমন্ত্রণ খেতে, মান্তু ও নগেন খুড়োর বৌয়ের সঙ্গে। এমন চমৎকার পরিপূর্ণ বসন্তের মধ্যে বারাকপুরে আসতে পারা একটা সৌভাগ্য। এত সুগন্ধ বাতাসে, এত ঘেঁটুফুল, শুকনো পাতা ছড়ানো বাঁশঝাড়ের তলায়। সকালের ঈষৎ শীতল বাতাসে যখন আম্রমুকুলের সৌরভ ভেসে আসে, পাখী ডাকে—তখন মনে হয় একটা যেন কিছু হবে, এমন দিনের শেষে বৃহত্তর কিছু, মহত্তর কিছু অপেক্ষা করে আছে যেন—আমার ছেলেবেলাতে ঠিক এই সময় মনের অকারণ উল্লাস অনুভব করতুম এমনি ধারা।

কাল বিকেলে কুঠীর মাঠের রাস্তা ধরে আসতে আসতে হঠাৎ এসে পড়লুম শাখারিপুকুরে বাঁশবনের ধারে। নক্ষত্র উঠেচে আকাশে, আকাশের শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদ জলজল করচে,

আম্রমুকুলের ঘন সুবাস সন্ধ্যার বাতাসে। কতকাল আসিনি শাঁখারিপুকুরের বাঁশবাগানে—ছিরেপুকুরের ওপাড়ের পথে—সেই ত্রিশ-বত্রিশ বৎসরের পুরাতন বাল্যদিনগুলি ছাড়া। বিশ্ব-শিল্পীর অপূর্ব্ব সৃষ্টি এই পৃথিবী, এই পৃথিবীর বসন্ত, এই মানুষের মন। আমি না যদি থাকতুম, এ বসন্ত শোভা, এ শুক্লাপঞ্চমীর জ্যোৎস্না কে আস্বাদন করতো? মানুষের মনের মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর সৃষ্টির লীলারস আস্বাদ করচেন। যে সমজদার, যে রসিক শিল্পীমনের অধিকারী সে ধন্য—কারণ ভগবান তার চোখ দিয়ে, মন দিয়ে সৃষ্টির সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন। সুতরাং সমজদারের চোখ ভগবানের চোখ, সমজদার রসিকের মন ভগবানের মন—যা সৃষ্টিমুখী হোলে একটা গোটা বিশ্ব সৃষ্টি করে ফেলতে পারে চক্ষের পলকে।

কি চমৎকার রাঙা ফুলে-ভর্ত্তি শিমুল গাছটার শোভা নদীর ধারে, কপি চক্কত্তির জমিতে। দুপুরে নীল আকাশের তলায় রোজ রাঙা ফুলগুলির দিকে চেয়ে দেখি স্নান করতে যাওয়ার সময়ে। চোখ ফেরাতে পারিনে। কাল আবার দুটো প্রজাপতি উড়ে উড়ে বসচে অত উঁচু গাছটার ফুলে ফুলে। প্রজাপতি—যার জন্ম শুঁয়োপোকা থেকে। শুঁয়োপোকাজীবন পরিত্যাগ করে প্রজাপতি জন্ম পরিগ্রহ করেচে, নীল আকাশের তলায় সৌন্দর্য্যলোকে বিচরণের অবাধ অধিকার লাভ করেচে। ঐ রাঙা ফুলে ভরা শিমূল গাছ, ঐ নীল আকাশ, ঐ উড্ডীয়মান রঙীন প্রজাপতি এসব যেন একটা বড় দর্শনের গ্রন্থ—শুধু যে ভাষায় ঐ গ্রন্থ লেখা তা সবাই পড়তে পারে না, বুঝতে পারে না। গভীর দর্শন-তত্ত্ব ও বইয়ে লেখা রয়েচে—লেখা রয়েচে আত্মার অমরত্বের গোপন বাণী, লেখা রয়েচে তার কামচর শক্তির অলেখা ইতিহাস। যে ঐ ভাষা বুঝতে পারে সে জানে।

কাল দুপুরে ছিরেপুকুরের ওপারের রাস্তা দিয়ে শাঁখারিপুকুরের মধ্যে দিয়ে স্নানের পূর্ব্বে খানিকটা বসলুম, তারপর বাঁশবনের ছায়ায় ঝরা-বাঁশপাতার পথ দিয়ে পুকুরের একস্থানে এসে দাঁড়ালুম, সেখানে ঘেঁটু ফুলের একেবারে নিবিড় ভিড়। তেতো সুবাস ছড়াচ্চে দুপুরের বাতাসে। ওখানে দাঁড়িয়ে মাঠের দিকে চাইতেই সেই উত্তর মাঠের রাঙা ফুলে-ভর্ত্তি বড় শিমূল গাছটা চোখে পড়লো। আমি সৌন্দর্য্যে যেন কেমন অভিভূত হয়ে পড়লুম, আর নড়তে পারিনে, অন্য দিকে চোখ ফেরাতে পারিনে। সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতি হোল—সে অনুভূতি এত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ যে, তার কথা আমি কাল সারাদিন ভুলিনি। এবং সেকথা' এখানেও লিখে রাখলুম এজন্য যে এইসব দুর্লভ অনুভূতিরাজি যখন অস্পষ্ট হয়ে যাবে, তখন এই ক'টি লাইন পড়লে কালকার অনুভূতির বাণী আমার মনে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

অনুভূতির প্রথম কথা হোল—মনের মধ্যে কে যেন বলে উঠলো—অভীঃ, ভয় নেই।

কিসের ভয় নেই? কোনো কিছুরই না। "ন মৃত্যু ন শঙ্কা" ভগবান যুগ-যুগান্তরে, কল্প থেকে কল্পান্তরে আমার এবং তোমার হাত ধরে চলেচেন, আনন্দ ও প্রেমের স্নিগ্ধ ধারার মধ্যে দিয়ে। সকল 'জন্ম-মরণ পার করে তিনি নিয়ে চলেচেন। জরা নেই, মৃত্যু নেই। এমন

কত বসন্ত দ্বিপ্রহরে কত ঘেঁটুফুল সুবাস বিতরণ করবে অনাগত জীবনদিনে কত প্রাণে—কত মাতা-পিতার স্নেহ আদর পরিবেশিত হবে, কত ভবিষ্যৎ রাত্রির জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল হবে সেই সুমধুর আয়ুকালগুলি, কত কোকিল ডাকবে, কত রক্তশিমুল-ফুল ফুটবে। জীবন ও জন্ম দুদিনের, ভগবান সখা ও সাথী অনন্ত কালের। জীবের ভয় কি? অবিনশ্বর তুমি, অবিনশ্বর আমি—আমরা ভগবানের চিরদিনের লীলাসহচর, ভগবান চিরদিন আমাদের লীলাসহচর।

কাল দুপুরে চিল-ওড়া নীল আকাশ থেকে এই আনন্দের বাণী নিঃশব্দে নেমে এল সেই ঘেঁটুফুলের বনের মধ্যে, ভগবানের নীরব আশীর্বাদের মত। মন অমৃতে পূর্ণ হয়ে গেল। শিরায় শিরায় সে কি জীবনস্রোত! কি উজ্জ্বল রস ও আনন্দের প্রবাহ।

কথাটা লিখেই রাখলুম, যদি ভুলে যাই। অন্য কেউ যদি এর পরে পড়ে, আশা করি সে এই নৈঃশব্দ্যের বাণীর গভীরত্ব বুঝতে পারবে, তারও জীবনে এই বাণী দেবে অমৃতের সন্ধান। জয়যুক্ত হোক আম্রমুকুল ও ঘেঁটুফুল সুবাসিত এই কাননের শান্ত দ্বিপ্রহরটি।

সকালে শাঁখারিপুকুরের ধারে বাঁশবনে ঝরা পাতার ওপর বসে ছিলুম। বাঁশবনের নিচে ছায়ায় ঘেঁটুফুল ফুটেচে, আম্র-মুকুলের সুবাসে বাতাস মদির, এখানে ওখানে মাঠে শিমুল ফুলের কি শোভা! চুপ করে বসে নসে নাপিতের আমবাগানের পুষ্পভারনত শাখা-প্রশাখাগুলির দিকে চেয়ে রইলুম। কোকিল ডাকচে, উষ্ণ মাটির গন্ধ বেরুচ্চে, শুকনো বাঁশপাতা হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে পড়চে, যেমন পড়তো আমার বাল্যকালে। ঘেঁটুফুলের ভেতো সুবাসে মনের মধ্যে আমার কেমন একটা আনন্দ আনে। ঝিনরনী পিসিমার সঙ্গে খেলা-ঘরের মধুর বসন্ত-মধ্যাহ্নগুলির কথা মনে হয়—ত্রিশ বৎসর আগেকার সেই অতীত ফাল্গুন দিনের বার্তা এই ঘেঁটুফুলের সুবাসে খানিকটা স্পষ্ট খানিকটা অস্পষ্টভাবে ফিরে আসে, আমি বাঁশগাছে হেলান দিয়ে বসে অবাক ভাবে দূর রোদ-ভরা মাঠের দিকে চেয়ে থাকি।

দুপুরে বসে 'অশনি সংকেত' উপন্যাসের একটা অধ্যায় লিখি। কল্যাণী গিয়েচে ও-পাড়ায় পাঁচী যুগিনীর কালীমার মন্দিরে। সঙ্গে গিয়েচে বুড়ী পিসিমা ও বাবু।

কাল পাঁচী এসে কতক্ষণ গল্পগুজব করলে। আমি এর কয়েকদিন আগে দোলের দিন রেডিও বক্তৃতা দিতে কলকাতা গিয়েছিলুম। সেখানে সুনীতি বাবু, মিঃ সিং প্রভৃতির সঙ্গে দেখাও হয়েছিল। কাল জগো ও ফুচুর সঙ্গে বেলতাতার একটা বাবলার ডাল আনতে গিয়েছিলাম। ঘোষেদের বাড়ীর পিছনে কি অপূর্ব ঘেঁটুফুলের সমাবেশ ও কি অদ্ভুত সম্মিলিত সুগন্ধ। এই ঘেঁটুফুল কেন যে আমাকে মাতিয়ে দেয়, তা কি করে বলবো। অজস্র ঘেঁটুফুলের সুবাস আমি এ বছর অন্ততঃ আর কোথাও দেখিনি। কোথায় লাগে সিনেমা থিয়েটার দেখার আনন্দ! ভগবানের কথা কেন যে এত মনে হয়! আইনদ্দির নাতি এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করলে, সেই ছোকরা, যে স্কুলে আমাদের ছাত্র ছিল, সম্প্রতি

গুরু ট্রেনিং পাশ করেচে। বড় চমৎকার লাগলো আজ ঐ ঘেঁটুফুলের শোভা। দুঃখের বিষয় কেউ এ সব দেখতে আসে না।

আজ অপরাহ্নে ছিরেপুকুরের ওপারে আমবাগানের তলায় ঘেঁটুফুলের ঘন বনের মধ্যে কতক্ষণ বসে রইলুম। এমন ফাল্গুন দিনে এমন ঘেঁটুফুলের সমারোহের মাঝখানে জীবন কোনদিন কাটাইনি। চিরকালই বিদেশে কাটিয়ে এসেচি। হয় ভাগলপুরে নয় কলকাতায়, কিংবা মানভূমে, ঘাটশিলায়, ঝাড়গ্রামে। আজ বসে আছি, ঘেঁটুফুলের বনের মধ্যে, ফুলের ঘন সুবাসের মধ্যে। ফুলে ভর্ত্তি ঘেঁটুবন আমার চারপাশে ঘিরে, লতাপাতার সুগন্ধ, সামনে গাছে তিত্তিরাজের আধ-কাটা ফলের থোলো ঝুলচে, কোকিল ডাকচে। ধন্য হোক ভগবানের নাম। ধন্য হোক সেই মহাশিল্পীর শিল্পসৃষ্টি।

ক'দিন ধরে গণি ও দয়ারামের মোকর্দ্দমার বিচার করচি পল্লীমঙ্গল সমিতির অধিবেশনে। কাল রাত্রেও চড়কতলায় অধিবেশন হয়ে গেল। এ গ্রামের ঝগড়াবিবাদ মিটবে না। যত চেষ্টা করি বিবাদ থামাতে, তত আরো বেড়ে যায়। কাল বিকেলে কুঠীর বাঁধানো গাঁথুনিতে কতক্ষণ বসে রইলুম—সব শুকনো লতা, পাতা, কাঠ, ডাল, তুঁতফল ইত্যাদির গন্ধ বেরোয় এ সময়। ভারি আরামের গন্ধটা। এ পারের মাঠে কতক্ষণ বসে একটা মূর্ত্তি কল্পনা করবার চেষ্টা করলুম নির্জ্জনে। সমিতির অধিবেশনের পূর্ব্বে গিরীনদার বাড়ী এসে দেবপ্রয়াগের কথা হয়। সে শুধু খাবার জিনিসের গল্প। খোয়ার লাড্ডু বানিয়ে কি ভাবে উনি পাণ্ডাদের খাইয়েছিলেন —সে গল্প। উনি বল্লেন—আবার চলো তুমি আমি বেরুই। আমি হবো স্বামীজী, তুমি প্রধান শিষ্য। ইন্দুর বাড়ীতে ইন্দু সুবর্ণপুরের দাসুবাবুর গল্প করলে। দাসুবাবু বলতো—আর কি খাই আজকাল? একটি রুই মাছের মুড়ো ও গাওয়া ঘি রোজ খাদ্য ছিল—ইত্যাদি। চড়কতলায় খুব মিটিং। মুসুরি ডালের ক্ষেতে কতটা মুসুরি খেয়েচে, তাই নিয়ে ঘোর তর্ক। দয়ারাম বলে— আড়াই মন মুসুরি হবে। ঘোর বিবাদ।

গভীর রাত্রে খুব ঝড়বৃষ্টি। কল্যাণী বলচে, ওগো, জানালা বন্ধ করো, ভেঙে যাবে যে!

ঘুমের ঘোরে ভয়ে বলচে।

কাল খুব ঝড়বৃষ্টি বিকেলে। রাধাবল্লভের জামাই কেষ্টর বাড়ী সন্ধ্যার পরে উপনিষদ ও গীতার ব্যাখ্যা হোল। অনেক লোক শুনতে এসেছিল, সতীশ ঘোষ, মতি দাঁ'র ছেলে যুগল, ললিত, লালমোহন, ফণিকাকা, গজেন, ফকিরচাঁদ ইত্যাদি। শান্তিপুরের এক অদ্বৈত বংশের গোস্বামী মশায়ও উপস্থিত ছিলেন। লালমোহনের বাড়ীর পিছনের যে পথটা দিয়ে আমি সকালে গেলাম সে পথে জীবনে কখনো যাইনি—নতুন দেখলাম। বারাকপুরেও এমন সব জায়গা লুকিয়ে আছে যা আমি জীবনেও কখনো দেখিনি।

রাত্রে এগারোটার সময় ফিরে এলুম। অনেক রাত্রে ভীষণ মেঘ গর্জ্জন, তার সঙ্গে

মুষলধারে বৃষ্টি। কল্যাণী চমকে উঠেচে ঘুমের ঘোরে।

এ খাতায় অনেকদিন পরে আবার 'বনগ্রাম' কথাটি লিখচি। পাঁচ বৎসর পরে আবার বনগ্রামে বাসা করেচি—জাহ্নবীর বাসার কাছেই। আবার পুরোনো দিনের মত সকালে উঠে খয়রামারি বেড়াতে যাই, সেই গাছপালায় বাঁকে বসে দাঁতন করি। পুরোনো দিনের পুনরাবৃত্তি বড় ভাল লাগে। কোথায় ঘাটশিলায় বনমধ্যস্থ হ্রদে সকালে স্নান করতে যাওয়া এই সময়ে, কোথায় নাকটিটাঁড়ের বন, ১লা বৈশাখ বরকেলা পাহাড়শ্রেণীর সামনে ভবানী সিংয়ের বাড়ীর কম্পাউণ্ডে বসে চা খাওয়া, বোরো নদীতে একসঙ্গে স্নান—হরদয়াল, আমি, ভবানী, সুবোধ ঘোষ, যোগীন্দ্র সিনহা—আর বছরই তো। সে কি মজা! চাইবাসায় সে ঘরদোর এখনও মনে পড়চে। কোল্‌হান পার্ক, মাঠা পাহাড়ের বাংলো—ইত্যাদি। কোথায় সেই চরাই পাহাড়ের শিখরদেশ। এসব থেকে কোথায় আবার সেই বনগাঁর বাসা। ঘড়ি বাজে ঢং ঢং করে, যতীন দা'র ও মন্মথ দা'র বাসায় আড্ডা দিচ্চি—ইউনিভার্সিটির খাতা দেখে উঠে বাজার করচি, ওপারের হাট থেকে গুড় কিনে আনচি, কয়লার দোকানে কয়লা কিনচি। এ সব জিনিস বহুদিন বনগাঁয়ে করিনি।

কাল কাপ্তেন চৌধুরীর মোটরে বিকেলে বিশ্বনাথ ও যতীন দা'কে নিয়ে বেনাপোল হরিদাস ঠাকুরের মঠে বেড়াতে গেলুম। আজ পাঁচ বছর আগে একবার এখানে এসেছিলুম। বুদ্ধদেব বাবুর সঙ্গে। আজ শুক্লা চতুর্দ্দশী, মন্দিরের চাতালে বসে আমরা হরিদাসের কাহিনী পাঠ শুনচি, প্রদীপের আলোয় বিশ্বনাথ পড়চে, ওদিকে চাঁদ উঠেচে, মন্দিরের চারি-পাশে ঘন বনে শান্ত স্তব্ধতা নেমে এসেচে—বড় ভাল লাগছিল। হীরা নটীর মূর্ত্তির সামনেও আরতির পঞ্চপ্রদীপ ঘোরানো দেখে আমি বিস্মিত ও অভিভূত হোলাম। কার কৃপায় পতিতা আজ দেবী হয়েচে? সেই বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বপালক ভগবানের ছাড়া আবার কার কৃপায়? এক বুড়ী আছে, সে প্রণাম করে বলে—জীবই শিব। এখানে বুড়ী আছে আজ ষোল বছর। ১৩১০ সালে এই মঠ ও মন্দির তৈরি হয়। ভোলানাথ গোস্বামী বলে এক সাধক ভক্ত, বাড়ী তাঁর বাড়ী মামুদকাটি, স্বপ্নে আদেশ পান এখানে হরিদাসের সাধনকুঞ্জের পুনরুদ্ধারের। এখানে এসে স্থানীয় নায়েব মহাশয়ের সাহায্যে ঘন জঙ্গলের মধ্যে এই তুলসী জঙ্গল ও আটখানা ইট আবিষ্কার করেন। তখন এখানে বাঘের আড্ডা ছিল। বুড়ীটি বড় অদ্ভুত, সে-ই এসব গল্প করলে। বড় ভক্তিমতী আর বড় বিনয়ী—বৈষ্ণব ধর্ম্ম এদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেচে, 'তৃণাদপি সুনীচেন' এই কথার সত্য এরা জীবনে আঁকড়ে ধরেচে, পালনও করেচে।

আজ বিকেলে পাঁচটার সময় কাপ্তেন চৌধুরীর গাড়ীতে গেলুম বারাকপুর। খিতে, মন্মথ দা, যতীন দা আমার সঙ্গে। কাপ্তেন চৌধুরী পথের পাঁচালীর দেশ দেখতে চেয়েছিলেন, তাঁকে বকুলতলা, সলতেখাকীতলা, ছিরেপুকুর, পুরোনো, ভিটে, বরোজপোতা, হরি রায়ের

পাঠশালা—সব দেখালুম। দেখে ভদ্রলোক খুব খুশি। তারপর ফণিকাকার বাড়ী এসে দেখি চড়কের 'শয়াল খাটা' হচ্চে। বাল্যকালে আমার মনে কি উন্মাদনার সৃষ্টি করতো এই 'শয়াল খাটা'। রামনবমী থেকে শুরু হোত, সেটা যেন একটা ফাঁকতাল্লা, তারপর চড়ক তার আনু-ষঙ্গিক কাঁটাভাঙ্গা, 'শয়াল খাটা' নীলপূজো, মেলা, গোষ্ঠবিহার, সং—পরে সকলের শেষে যাত্রা বারোয়ারী। এ আনন্দের তুলনা ছিল? আজও সেই 'শয়াল খাটচে' সন্ন্যাসীর দল, গ্রামের ছেলেমেয়ে সেই ভাবে জড় হয়েচে—কিন্তু আমার মধ্যে সে আনন্দ আজ নেই। মীনা, কেত্তো—সবাই দেখচে বসে দেখলুম। চড়কগাছ হবে বলে একটা কি গাছও কাটা হয়েচে চড়কতলার মাঠে। বেলা পড়ে গিয়েচে। ওখান থেকে বেরিয়ে গাঙের ধার দিয়ে কুঠীর কাছে এলুম। ভাঙা কুঠী দেখালুম কাপ্তেন চৌধুরীকে, যেমন বাল্যকালে আমাদের গ্রামে যে কেউ আসুক, তাকে কুঠী দেখাবোই। রামপদকে দেখিয়েছিলুম, বামনদাস মুখুয্যেকে দেখিয়েছিলুম। আজও দেখাচ্চি ১৩১০ সাল ১৩১১ সালের পরেও। কুঠী হয়ে গেলুম মোল্লাহাটি—বেলেডাঙা, নতি-ডাঙার পথ দিয়ে। অনেকদিন—প্রায় ৪১৬ বছর মোল্লাহাটি আসিনি। ডাকবাংলোটাতে গিয়ে বসলুম, মেমসাহেবের গোর দেখলুম—সাহেবদের নীলকুঠীর ধ্বংসস্তূপের ওপর প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় বেড়িয়ে বেড়ালুম—কোথায় আজ সেই লালমুখো, ফালমান সাহেবের দল, কোথায় তাদের বলদর্পিতা, গর্ব্বিতা মেমের দল। মহাকাল অন্ধকার আকাশে বিষাণ বাজিয়ে সব অবসান করে দিয়েচে।

সন্ধ্যায় ফিরে এলুম। মালপাড়ার কাছে হরিপদদা'র সঙ্গে দেখা। এসে রাত্রে আবার আড্ডা।

কাল সামটাতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলুম সতীনাথ মিত্রদের বাড়ী। প্রায় একমাস লিখিনি এ খাতায়। এর মধ্যে আমার স্ত্রী একটি মৃত কন্যাসন্তান প্রসব করলে, তার শরীরও অসুস্থ হয়ে পড়লো। এই সব কারণে লেখা হয়নি অনেকদিন।

কাল সামটায় যাবার পথে উলুসী গেলুম। কাপ্তেন চৌধুরীর গাড়ীতেই গেলুম। যে উলুসীতে মধুকানের বাড়ী, সেই উলুসী। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রভাতী বায়ু বাংলার পল্লী-অঞ্চলের নানা পুষ্প-সুবাসে সুরভিত। বিল্বপুষ্প, ঘেঁটুগাছের ছোট ছোট ফুল। পথের দুধারে ফুলে ভরা সোঁদালি গাছ যেন নুয়ে পড়চে।

কতকাল আগে মধুকান মারা গিয়েচেন, আজ এতকাল পরে তাঁর জঙ্গলে-ভরা ভিটে দেখতে প্রায় একশ বছর পরে আমরা এসেচি।

আমরা পল্লীকবির ভিটেতে দাঁড়িয়ে আছি, বৌ-কথা-কও পাপিয়ার ডাকের মধ্যে—একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক জল নিয়ে যাচ্চে। সে মধুকানের বংশের মেয়ে। তার মুখে আমরা মধুকানের গান শুনতে চাইলুম। সে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল আমাদের। আমরা বল্লুম—মধুকানের কোনো খাতা আছে ঘরে?

সে বল্লে—হাঁ।

[illegible] এল দুখানা খাতা। ১২৭৪ সালে মধুকান মারা গিয়েচেন। সেই সময়ের খাতা।

তিনি মদ খেয়ে পড়ে থাকতেন—সেই সময় মুখ দিয়ে যা বলে যেতেন—মুহুরীরা লিখে নিত। একটি বৃদ্ধ মধুসূদনের একটি গান গাইলে।

ওখান থেকে বেলা সাড়ে বারোটার সময় চলে এলুম ঘাটশিলাতে। রাধানাথ দা, ব্রজ এরা ছিল। ডাকবাংলোয় মোটর পাঠিয়েছিল বন্ধে আমার জন্যে। দুটি নিদ্রিত সুন্দর মুখের ছবি আমাকে সম্পূর্ণ অন্য এক ছবি মনে করিয়ে দিল।

ওদের বাড়ীর নীচে কচুরিপানায় বোজানো ব্যাতনা বা বেত্রবতী নদী বয়ে গিয়েচে। এ নদী এখন একেবারে মজা। একসময়ে নাকি স্টীমার চলতো। বিকেলে নারায়ণ ডাক-বাংলোতে ফিরে হাট দেখতে গেলুম বিজয়কে নিয়ে। বেত্রবতী নদীর পুলটার ওপর বসে বসে ভগবান সম্বন্ধে কেমন এক অদ্ভুত অনুভূতি হোল। সেই নিদ্রিত দুটি সুন্দর মুখের ছবি।

ক'দিন অতি ভীষণ গরম গিয়েচে। কাল যখন রাত্রে মন্মথ দা'র বাড়ীর আড্ডা থেকে ফিরি, তখন হঠাৎ হাওয়া বন্ধ হয়ে যে কি ভয়ংকর গুমট দেখা দিলে! আমার মনে হোল এ গুমটে রাত্রে মশারির মধ্যে কেমন করে শোবো। কিন্তু যেমন বাড়ী এসেছি—অমনি আকাশে মেঘ জমে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হোল। বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো। ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ জোলো বাতাসে। কল্যাণী বল্লে—বাদলা হবে। আমি বল্লাম—তা হোলে তো বাঁচি। কিন্তু আসলে বাদলা হোল না। আধ-ঘণ্টাটাক বৃষ্টি হয়েই থেমে গেল।

সকাল তখনও ভাল করে হয়নি, ভাইজাগ প্যাসেঞ্জার এসে ভুবনেশ্বরে দাঁড়ালো। আমি অন্ধকারের মধ্যে নেমে গিয়ে গাড়োয়ানদের সঙ্গে দরদস্তুর চুক্তি করে মহাদেববাবুকে নিয়ে গিয়ে গাড়ীতে তুললাম। অন্ধকার মাঠের মধ্যে দিয়ে গাড়ী চলচে, পথের দুধারে নক্তমালিকার জঙ্গল। একটু পরে ফর্সা হোল, গাড়োয়ান বল্লে—এই নালাটা ছাড়িয়ে এক মাইল গেলেই উদয়গিরি খণ্ডগিরি। একটু পরেই সাদা জৈন মন্দিরটি চোখে পড়লো সামনের পাহাড়টির ওপরে। গরুর গাড়ীও গিয়ে দাঁড়ালো পাহাড়ের তলায়। ঘড়িতে দেখলাম ভোর সাড়ে পাঁচটা।

সুন্দর পরিবেশটি। সামনে বনাবৃত পাহাড়, মাটির রং লাল, বড় বড় প্রস্তর যেন মাকড়া পাথরের চত্বর। পথের ধারে একটি জৈন ধর্মশালা। নিচে থেকেই দেখলুম পাহাড়ের গায়ে কাটা সরু সরু থামওয়ালা দর-দালান মত—অনেকদিন আগে নির্মল বসুর তোলা ফটো অ্যালবামে উদয়গিরির এই সব গুহার ছবি যেমন দেখেছিলুম। কিন্তু পাহাড়ের ওপর গিয়ে চারিদিকে চেয়েই মনে হোল এ পাহাড় দুটির সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আমাকে কেউ কোনো কথা বলেনি এর আগে। পাহাড়ের ওপরটা সমতল পাষাণ বেদিকার মত। বনে বনে পাখী ডাকচে, বড় যূথিকা ফুটে সুবাস বিতরণ করচে, মেঘমেদুর আকাশ, দূরপ্রসারী প্রান্তর, দূরে দূরে ছোট বড় পাহাড়। কত মুনিঋষির তপস্যাপূত মনোরম স্থানটি। ব্যাঘ্রগুম্ফাটি বড় চমৎকার, ঠিক

একটি বাঘের মুখ খুলে বার করেচে আস্ত পাহাড় কেটে। আমরা অনেকক্ষণ একটা পাথরের চাতালে বসে তারপর নেমে এলাম নীচে। একটা বৃদ্ধা বসে আছে একটা বাড়ীতে, ধর্মশালার পাশে, সে বল্লে, "আমি আচার, মুড়ি বিক্রি করি।

বল্লাম—কুলের আচার আছে?

—আছে।

তারপর যে আচার আনলে তা নুন মাখানো শুকনো কুল—তাকে আচার বলা চলে না। নিলুম না সে কুলের আচার। খণ্ডগিরিতে উঠলাম তারপরে—সেখানে নামবার পথে বনের দৃশ্য বেশ উপভোগ্য। ডাকবাংলোর বারান্দায় খেতে বসেচি, এমন সময় এল ঝড়বৃষ্টি। বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে গেল খুব। জৈন ধর্মশালায় চা বিক্রি হয় জানতাম না—সেখানে কয়েকটি লোককে চা খেতে দেখে গিয়ে বললাম—চা-ও পাওয়া গেল।

আবার ভুবনেশ্বর রওনা হলাম গরুর গাড়ীতে। পথের ধারে শুধুই নক্সভমিকার বন, আর একটা গাছ—তার নাম মহীগাছ। সেই বনবীথিকার নাম নাকি আঁধি কলি, এখানে ও-ফুল খায়। অবাধ দৃষ্টি কতদূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, থৈ থৈ করচে space-এর সমুদ্রে দূরের ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলির চূড়া যেন ডুবে আছে। মাটির রং রাঙা, তার পাষাণ বাঁধানো ওপরটা। গরুর গাড়ীর চাকা গিয়ে গিয়ে পাথর কেটে গিয়ে চাকার লিকের সৃষ্টি হয়েচে।

ভুবনেশ্বর পৌঁছতেই ছোট বিশ্বনাথ পাণ্ডার খপ্পরে পড়ে গেলুম। সে বিন্দু সরোবরের ধার থেকে আমাদের নিয়ে এল, তুললে এক ধর্মশালায়। গৌরীকুণ্ডে আমাদের স্নান করাতে নিয়ে গেল—স্নানান্তে দুধকুণ্ডের জল পান করে যেমন পিছু ফিরেছি, অমনি পাণ্ডার দল কেউটের মত পিছু লাগলো। কোনক্রমে তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ধর্মশালায় মধ্যাহ্ন-ভোজন করা গেল। তারপর মন্দির দেখতে বার হই। বহু অতীত দিনের আনন্দচ্ছন্দ যেন পাথর হয়ে জমে আছে সে বিশালকায় পাষাণ দেউলের বুকে। একটি নর্ত্তকী মূর্ত্তির কি ত্রিভঙ্গ দেহ, কি মুদ্রার সুষমা! পাষাণে খোদাই লিরিক কবিতা। নক্স-ভমিকার জঙ্গলে অতীতের ইতিহাস চাপা পড়ে যায়। কম্পা সিং, উজো গজ সিংয়ের কথা জানি নে।

স্টেশনে ফিরবার পথে আবার ভিখিরির দল গরুর গাড়ীর পিছু পিছু করুণ সুরে প্রার্থনা-বাক্য উচ্চারণ করতে করতে ছুটলো প্রায় এক মাইল রাস্তা। ট্রেন আসতে দেরি ছিল। হু হু সমুদ্রের হাওয়া বইচে, আমরা শুয়ে রইলুম প্ল্যাটফর্মে। চারটের সময় গাড়ী এল। ঐ দূরে উদয়গিরি, ঐ খণ্ডগিরির ওপর জৈন মন্দির। গাড়ী চলেচে—গাড়োয়ান ওবেলা দেখিয়েছিল খুরদা রোডের দুটি রাস্তা কাঁকরের পাহাড়, তার ওপর দুটি গাছ—সে পাহাড় ছুটো কাছে এল। খুরদা রোড স্টেশনে আর বছরে 'ক্রিটেকটিভ' নাটকের অভিনয়ে যে বেশ নাম করেছিল সেই ইন্দুবাবু এসে আলাপ করলেন। আবার সেই মালতীপাতপুরের নারিকেলকুঞ্জ ; যেন পাপুয়া নিউ হেব্রাইডিস্‌-এর বেলাভূমির ছবি। পুরী স্টেশন থেকে

ফিরবার পথেই বনগাঁর হরিবাবু ও তার ছেলে বামনের সঙ্গে দেখা হোল। আমরা ধর্মশালায় জিনিসপত্র রেখে জগন্নাথের মন্দিরে গেলুম দর্শন করতে। ঠাকুরের সিঙার বেশ দেখলুম। মন্দিরে বাইরের চত্বরে খোলা হাওয়ায় সুমথবাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলুম। ওঁর বছর আর এ বছর। সেই মন্দিরের নানাস্থানে ধর্মগ্রন্থ পাঠকের সম্মুখে কৌতূহলী ও ধর্মপিপাসু শ্রোতার ভিড়। এ দোকান ও দোকান ঘুরে সুমথবাবু খাবার জিনিস কিনতে লাগলো। রাত ন'টায় পর ফিরি। একসঙ্গে খেতে বসি—গৌরীশঙ্কর, সুমথ ও মহাদেববাবু। ওরা রাত্রেই চলে গেল।

নীল সমুদ্র! আবার সেই উত্তালতরঙ্গময় নীলসমুদ্রের গর্জন!

সকালে উঠে প্রথমেই গেলুম হরিদা'র বাড়ী। বামন বল্লে, তিনি বেরিয়ে গেলেন। আমি আর বছরের সেই বালিয়াড়ি ও শাল গাছ দুটির পাশ দিয়ে কতবার মঠে গেলুম, সেই শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি আবার দর্শন করলুম। পুরুষোত্তম মঠে সেই স্বামীজীর ধর্মোপদেশ শুনলুম। ফিরবার পথে ভূপেন সান্ন্যালের বাড়ী গেলুম। তাঁর স্ত্রী জলখাবার খাইয়ে তবে ছাড়লেন।

বড় রোদ চড়েচে। বালিয়াড়ির পথে আবার যাত্রা। সেই পলং গাছ পথে পড়লো। ধর্মশালায় ফিরে আর বছরের মত খিদেতে ছটফট করি। একটা বাজে, তিনটে বাজে, কোথায় মহাপ্রসাদ? এই আসে, এই আসে—কিছুই না। বীরেন রায় মশায় এলেন—আমরা আহারান্তে বসে গল্প করি। জানালা দিয়ে দেখি বাঁদিকের জানালায় ঢেউ-সঙ্কুল নীল সমুদ্র, ডানদিকের জানালা দিয়ে চোখে পড়ে জগন্নাথ দেবের বিশাল মন্দিরের চূড়া—পুরীর দুই বিরাট বস্তু।

'কাকে ফেলে কাকে রাখি কেহ নহে ঊন।'

বিকেলে হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ওয়াজেদ আলি ও অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করে সমুদ্র-তীরে অনেকক্ষণ বসে বসে হরিদা ও বীরেনবাবুর সঙ্গে চীনাবাদাম খেতে খেতে জ্যোৎস্নালোকে গল্প করি। ওখান থেকে উঠে ধর্মশালায় এসে দেখি 'দেশ' সম্পাদক বঙ্কিম সেন ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা করবেন। হরিদা'কে নিয়ে এসে বসালুম সভায়।

অনেক রাত পর্যন্ত জ্যোৎস্নালোকে সমুদ্রের শোভা দেখি ছাদ থেকে। জগবন্ধু আশ্রমের স্বামীজী পরিমল দাস ও আর একটি ছাত্র এসে গল্প করলেন। স্বামীজী একখানা বই দিলেন পড়তে—প্রভু জগবন্ধুর জীবনী। পুরীতে একটা সুবিধে, সব সময়েই ভগবানের কথা বলবার লোক মেলে। অনেক রাত হয়েচে, ঘুম আসে না চোখে। গরম নেই, হু-হু সমুদ্রের হাওয়া, শেষরাত্রে বেশ শীত ধরিয়ে দিলে।

সকালে উঠে হরিদাস মঠে গেলুম ও মলয়াবাস বলে একটা বাড়ীতে হরিদা'র সঙ্গে বসে চা খাই। প্রসাদ আসে না তখনো, সবাই খোঁজ নেয় কেন প্রসাদ এল না। বেনারাস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপক বেশি রকম খবর করলেন। তোপ কিনে খেলুম আনন্দবাজার

থেকে। পুরীর বাসনের দোকান থেকে একটি ঘটি কিনে পাইকপাড়া রাজবাড়ীতে সভা করি। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিয় চক্রবর্ত্তী উপস্থিত ছিলেন। চমৎকার জ্যোৎস্না ছিল। সুখময়-বাবুর বাড়ী চা খেতে গিয়ে নিরাশ হলুম। সেইসময় এল ঝড়বৃষ্টি। শেষরাত্রে ফস্‌ফরাসের দীপ্তিবিশিষ্ট আলোকোৎক্ষেপী ঢেউ যেন জ্বলচে অন্ধকারে। আমরা বিছানা ঘাড়ে করে স্টেশনে এলুম। ভোরবেলা ট্রেন ছাড়লো।

সারাদিন ট্রেনে, মাঝে মাঝে ভিড় হয়, মাঝে মাঝে ভিড় চলে যায়। কটক স্টেশনে কতকগুলি রাজবন্দী নেমে গেলেন, এঁরা বহরমপুর জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আসচেন। একজনের নাম কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, এঁরা ন' পুরুষ হোল উড়িষ্যায় বাস করচেন, পূর্ব্বে বাংলা দেশে বাড়ী ছিল। ভদ্রক স্টেশনে স্নান করলুম কলের জলে, তখন বেলা সাড়ে তিনটা। ধানমণ্ডল স্টেশন ছাড়িয়ে কেবল পাহাড়, সামনে ও দূরে। মাটির রং লাল, অনেক মনসাগাছ জঙ্গলে, ঝাটিজঙ্গলের বড় শোভা। যাজপুর রোডের কাছে এসে আমার মনে হোল এবার চক্রধরপুরের সমান্তরাল রেখায় এসে পৌঁছেচি—তখুনি একটা লোক বল্লে—এখান থেকে চাঁইবাসা চক্রধরপুর রোড আছে—এই দেখুন সেই রাস্তা। একটু পরে বৈতরণী নদী পার হলুম, সন্ধ্যার কিছু আগে সুবর্ণরেখাও পার হওয়া গেল। এই শেষ বড় নদী এ লাইনে। আগে সুবর্ণরেখা, তারপর বৈতরণী, তারপরে ব্রাহ্মণী, তারপরে মহানদী, তারপরে কাটজুড়ি। আর কোন নদী নেই এদিকে। আর যা আছে সে সব অনেক দূরে—যেমন গোদাবরী রাজমাহেন্দ্রিতে।

খড়্গপুর স্টেশনে ট্রেন এল রাত এগারোটা। মেচেদা স্টেশনে এল বৃষ্টি। ভোরবেলা আবার বৃষ্টি এল সাঁতরাগাছি স্টেশনে। নন্দীর সঙ্গে দেখা করবো বলেই এখানে নামলাম।

পুরী থেকে এলুম শুক্রবার, গেলুম গোপালনগরে হাজারি প্রামাণিকের ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহের নিমন্ত্রণে। শচীন মুহুরী ও আমি একসঙ্গে বসলাম বাড়ীর ভেতরে। জিতেন দফাদার বল্লে—কি রকম, পুরীর লোক এখানে কেন? এখানে কেমন বারোয়ারী যাত্রা হয়ে গেল, আপনি ছিলেন না।

ওরা ভাবলে আমি না জানি কতদিন পুরী গিয়েছিলাম।

বৌভাতের নেমন্তন্নে বেশ ভালই খাওয়ালে এ বাজারে। লুচি, পোলাও, মাছের কালিয়া, মুড়িঘণ্ট, ছ্যাঁচড়া, চাটনী, দই, পায়েস, সন্দেশ, রসগোল্লা, আম, কাঁটাল। হাজারি বল্লে—তোমায় বরযাত্র নিয়ে যাবার বড় ইচ্ছা ছিল ভাই। আমি দুঃখ প্রকাশ করলুম। পুরীতে ছিলাম, কি করবো। খাওয়ার পরে সেকেন পণ্ডিত ও মন্ন বাইরে এসে বসে কতক্ষণ গল্পগুজব করলে। স্কুলের চাকুরীর নিয়োগপত্র দিলে মন্ন। ২৬শে জুন চাকুরীতে যোগ দিতে হবে। আমার ইচ্ছে নেই, কিন্তু ওরা ছাড়ে না, কি করি'।

মাস্টারমশায় ও আমি হেঁটে চলে এলুম বেলা তিনটের সময়। কাল গিয়েছিলুম আবাদুর

হরিদাস ঠাকুরের পাটবাড়ীতে বেনাপোলে। কাপ্তেন চৌধুরী ডাকবাংলো থেকে লোক পাঠিয়ে আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন। ওঁর জিপ গাড়ী কাল কলকাতা পাঠানো হচ্চে সারানোর জন্তে, তাই আজ আমাকে নিয়ে চল্লেন হরিদাস ঠাকুরের পাটবাড়ীতে। আশ্চর্য্য ঠিক সেদিন যে সময় ভদ্রক যাচ্ছি বালেশ্বর থেকে, আজ সেই সময় বনগাঁ থেকে বেনাপোলে চলেচি। পুরীতে দেখে এসেছি সেদিন এই মহাপুরুষের সমাধি, আজ যশোর জেলার একটা অজ পাড়াগাঁয়ে বাঁশবন ঘেরা ক্ষুদ্র জায়গাটিতে তাঁর সাধনস্থান দর্শন করলুম। সন্ধ্যায় চাঁদ উঠলো, আরতি আরম্ভ হয়েচে, গুমট গরম। বেশ লাগচে এই পবিত্র নিভৃত তপোবনটি। যশোর জেলার গৌরব যে অত বড় মহাপুরুষ একদিন এখানকার মাটিতে জন্মেছিলেন, এখানকার জলে বাতাসে পুষ্ট হয়েছিলেন। নদীয়ায় যেমন শ্রীচৈতন্য, ঠিক তেমনি সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী জেলায় হরিদাস ঠাকুর।

সন্ধ্যার পর ফিরে এসে লিচুতলায় জ্যোৎস্নায় বসে মিতে, যতীনদা, শিবেনদার সঙ্গে আড্ডা দিলুম।

•

গোপালনগর থেকে প্রতিদিন মাঠের পথ ধরে যাতায়াত করি। আউশ ধানের ক্ষেতে বড় বড় ধানের সবুজ গোছা, গাছের মাথায় আকাশ লতার বড় ঝোপ, পাখীর ডাক—এসবের মধ্যে দিয়ে বিকেলে স্কুল থেকে ফিরি। সেদিন মেঘমেদুর সন্ধ্যায় নদীর জলে গা ধুতে নেমেছি, সন্ধ্যার বেশি দেরি নেই, কুঠির দিকে চেয়ে দেখি যতদূর চোখ যায়, মেঘলা আকাশ নেমে উবুড় হয়ে রয়েচে সবুজ মাঠের ওপরে।

কিন্তু যে দৃশ্যটা আমায় মুগ্ধ করলে, সেটা হচ্চে এই—সাঁইবাবলা গাছের ফাঁকে ফাঁকে জোনাকী পোকা জ্বলচে নিব্‌চে। তখনও রাতের অন্ধকার নেমে আসেনি, অথচ জোনাকির দল থেকে বেশ আলো ফুটেচে। সে যে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! ভগবানের হাতের শিল্প আর্টিস্টরূপী ব্রহ্মের প্রকাশ এর প্রতি রেণুতে রেণুতে…এ সত্যি দেখবার মত জিনিস। কতক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলুম। আজ পাড়াগাঁয়ের অখ্যাত, নিভৃত কোণে, এই মেঘভরা বাদল সন্ধ্যায় এতবড় সৌন্দর্য্য কারও দেখবার অপেক্ষা রাখচে না। এ আপনাতে আপনি মহান। এ জানিয়ে দেয় যে বিশ্বশিল্পীর চিত্রের পটভূমি হিসেবে বিশ্বের সকল স্থানই মহিমময় পবিত্র, —তাঁর নীরব বাণী এদের বাতাসে, ধূলিতে, পত্রের মর্ম্মরে, এই জোনাকী পোকাগুলোর জ্বলন্ত নিবন্ত আলোকপুঞ্জে…

সেই বারাকপুরের মেঘমেদুর দিনগুলি। বড় ভাল লাগে এরকম দিন। ঝোপে ঝোপে মটর লতার থোলো থোলো বুনো আঙুরের মত মটরফল ঝুলচে। ওপাড়ার ঘাটে ঘোলা নদীজল যেখানে তীরের ঘাসবন ছুঁয়েচে, সেখানে এমনি এক ঝোপে কি সুন্দর সাদা সাদা ঈষৎ সুগন্ধ ফুল ফুটে আছে, তার পাশেই সেই মটর ফল দুলচে। কয়েকদিন ধরে সকালে ওপাড়ার ঘাটে বেড়াতে যাই খুব ভোরে। রোজ সকালে সেই ফুলে-ভর্ত্তি ঝোপটির

সামনে দাঁড়িয়ে ওপারের সবুজ ধানের ক্ষেতের দিকে চেয়ে থাকি। ভগবানের আবির্ভাব এই নব প্রভাতের সজল বর্ষাশ্যামল বননিকুঞ্জে, ঐ দূরবিস্তৃত বননীল দিগন্তরে মেঘলা সকালে শাখায় শাখায় বনবিহঙ্গের কলকাকলীতে।

কলকাতায় মেসে থেকে যখন চাকুরী করি স্কুলে, তখন সুদীর্ঘ তেরো বছরের মধ্যে এই সব দিনে বারাকপুরের বর্ষাসিক্ত বনঝোপের বিরহ আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠতো। বাল্যে কত খেলা করেছি আমি কালী, ভরত, কচা এই বনতলে ঝোপের ছায়ায় ছায়ায়। কত কি পাখীর গান শুনেছি। কত পাকা মাকালফল তুলে এনেছি উত্তর মাঠের বন থেকে,—শাঁখারিপুকুরের ধারের গাছপালার ওপরে-ওঠা মাকাললতা থেকে—মনে হোত সেই রহস্যময় বিচিত্র বাল্য মনোভাব, সেই ঝোপের তলায় বেড়ানো, তখন বোধ হয় বনপরীরা সঙ্গে নিয়ে খেলে বেড়াতো—বুঝতাম না সংসারের কিছু, বুঝতাম শুধু তেলাকুচোর ফুল, বনকলমীর ফুলের বাহার হয়েচে কোন ঝোপে, কোথায় টুকটুকে মাকাল ফল ঝুলচে কোন গাছে—এই সব। বন-পরীদের সঙ্গী ছিলাম তখন। মনে এতটুকু ধুলো মাটি লাগেনি সংসারের। কি অপূর্ব্ব আনন্দে মন মেতে উঠতো যখন দেখতাম গাছে থোলো থোলো পটপটির ফল ফলে আছে। এ সব ফল খাওয়া যায় না, পাখীরও অখাদ্য কোনো কোনো ফল। সুতরাং রসনা তৃপ্তির লোভ নয়—এ সব ফলে খেলা হয় এইটেই ছিল তখন বড় কথা। দেখতে ভাল লাগে এইটেই ছিল বড় আনন্দের উৎস। খেলা আর আনন্দ। লীলাই সবচেয়ে বড় কথা। শেক্সপীয়র বুঝেছিলেন, তাই বলেচেন, "The play is the thing"…play! লীলা, খেলা। সংসার শাশ্বত মানবাত্মার লীলাভূমি। এখানে তারা আসেনি ঘরবাড়ী বানাতে, আসেনি ব্যাঙ্কে অর্থ জমাতে, আসেনি রায়বাহাদুর হয়ে, 'স্যার' হয়ে মোটর চড়ে বড় ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ডিরেকটর হতে। ওসব তাদের মনের ভুল, মায়া অথবা মোহ। নিজের রূপটি ভুলে যায় তাই ওসব করে।

তারপর যা বলছিলুম। ওই সব বাল্যসঙ্গী, বননিকুঞ্জ, ফুলফল, নদীতীরের সাঁইবাবলা ও কুঁচলতার ঝোপ, সূর্য্যাস্তের আভা-পড়া বেলেডাঙার মরগাঙ, বিলের টলটলে জল—এদের ছেড়ে কলকাতার অপকৃষ্ট এঁদো-পড়া মেসবাড়ীর নোংরা ঘরে বিদ্যার্জ্জন ও চাকুরীর জন্যে বাস করে কি কষ্টই না পেতুম। মনপ্রাণ হাঁপিয়ে উঠতো। ভাবতাম, এমন দিন কি কখনো আসবে না যখন আবার দেশে ফিরে যাবো? গ্রামে বর্ষাকাল কখনো কাটাইনি। বাল্যদিনের পরে চিরকালই স্কুল বোর্ডিংয়ে, কলেজ হোস্টেলে ও মেসে কাটচে ১৯১২ সালের পর থেকে। কখনো কি আবার ঢল-নামা বর্ষায় ইছামতীর ধারে কালো বনসিম-লতার ঝোপের ছায়ায় পা ছড়িয়ে বসবো না মনের আনন্দে, আর কি কখনো শুনবো না ঝুরে ঝুরে পত্রমর্ম্মর, গাঙশালিক ও কুকো পাখীর ডাক, বাঁশঝাড়ে জড়াপটি পাকানো বাঁশের কট্‌কট্‌ শব্দ?

এতকাল পরে সে স্বপ্ন আবার সার্থক হয়েচে, ফিরে পেয়েছি বাল্যকালের সেই বর্ষাসজল,

শ্যামল দিনরাতের স্বপ্ন……স্বপ্ন…। আজও তেমনি ঘটরলতা ঝোলে ইছামতীর তীরের বনে বনে, তেমনি পাখী ডাকে, তেমনি সুবাল বেরোয় নাটাকাটার হলুদ রংয়ের ফুলের থোকায় থোকায়। বিশ্বের অধিদেবতা যেমন সত্যি, এরাও তেমনি সত্যি, শাশ্বত সুন্দর।* মরে না, ঋতুতে ঋতুতে পনরাবর্তিত হয়, নবরূপে ফিরে আসে—যুগ যুগ ধরে চলেচে ওদেরও লীলা।

"The play is the thing…"

ইচ্ছে আছে এবার একটা বইয়ে হাত দেবো—নাম দেবো তার 'ইছামতী'। বড় উপন্যাস। তাতে থাকবে ইছামতীর ধারের গ্রামগুলির অপূর্ব জীবন-প্রবাহের ইতিহাস—বননিকুঞ্জের মরা-বাঁচার ইতিহাস, কত সূর্য্যোদয়, কত সূর্য্যাস্তের নিকিঞ্চন, শান্ত ইতিহাস—

কালই জন্মাষ্টমীর ছুটিতে কলকাতায় গিয়েছিলুম, অতুলকৃষ্ণ কুমার মহাশয়ের মোটরে কাল সারা সকাল ঘুরে বেড়িয়েছি। বাণী রায়দের বাড়ী গেলুম, দেবেন ঘোষ রোডের মেস থেকে পুত্র-শোকাতুর ভদ্রলোকটিকে নিয়ে মোটরে করে দু-এক জায়গায় ঘুরলুম। কলকাতায় বেশিদিন আর থাকতে পারিনে—ভাল লাগে না।

সজনী দাস এখানে নেই, ভাগলপুরে গিয়েচে বেড়াতে।

কাল স্কুল থেকে ফিরলুম মাঠের পথ দিয়ে। কি কালো নিবিড়কৃষ্ণ মেঘ করেচে সেই অপূর্ব ঝোপটির পেছনে মুচিপাড়ার দিকের আকাশে! একটা তেলাকুচো পাতার মস্ত বড় সবুজ ঝোপ আছে এ মাঠে। মস্ত তেঁতুল গাছ বেয়ে ঝোপটা উঠে গাছের মাথা ঢেকে দিয়েচে ঘন সবুজ উত্তরচ্ছদে।

আমি যখনই এপথে স্কুলে যাই, তখন দেখি এই ঝোপটা। মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি একদিন এই ঝোপের মাথাটা সাদা সাদা ফুলে ভরে দিও, আমি দুবেলা স্কুলে যাওয়া আসার পথে দেখতে দেখতে যাব। কি সুন্দর দেখাবে তখন, ভাবলেও আনন্দ হয়। কাল কোথায় যেন দেখলুম রেললাইনের ধারে কোন ঝোপে বনকলমী ফুল ফুটেচে। কিন্তু আমাদের গ্রামের মধ্যে যে যে ঝোপে বনে বনকলমীর ফুল ফোটে সেখানে গিয়ে দেখেচি, কোথাও ফোটেনি। এই শ্রাবণের শেষের দিকেই কিন্তু ও ফুল ফোটে।

আজ দেখি একটা বনবিড়াল ঝোপের তলা দিয়ে কালু মোড়লের ধানক্ষেতের দিকে যাচ্ছে। বেশ বড় বনবিড়াল, লেজের দিকটা ডোরাকাটা। আমি দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম, একদৃষ্টে দেখতে লাগলুম, সাড়া পেলেই লেজ তুলে এখুনি দৌড় দেবে। মিনিট খানেক পরে দিলেও তাই, কি করে আমার উপস্থিতি অনুভব করতে পেরেচে। এক দৌড়ে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হোল।

বাড়ী এসে চা খেয়ে মেঘলা বিকেলে বাঁশবনের দিকে বারান্দায় ইজি-চেয়ার পেতে আরাম করে বসে প্রিস্টলির 'Good Companions' পড়ি। কয়েক পাতা পড়তে না পড়তে বৃষ্টি এলো আর কোথায় আছি। সেই যে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামলো, চললো সারারাত।

আজ খুব ভোরে কল্যাণী ও আমি বৃষ্টির মধ্যে মাঠে বেড়াতে গিয়েছিলুম। শ্রাবণ মাসের ঘন বর্ষায় প্রাতঃকাল, সে কি শোভা হয়েচে উত্তর মাঠে, কি কালো কালো মেঘ বড় শিমুল গাছটার মাথায়, মাঠ ভরে গিয়েচে বৃষ্টির জলে, মাঠের ধারের ঝোপে ঝোপে নাক-জোঁয়াল ফুল (gladiolus lily) ফুটে আলো করে আছে। এই বর্ষা ভেজা হাওয়ায় মুক্তির স্বপ্নলোকে মন উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে···যে মুক্তি মেলে এমনি মেঘকজ্জল শ্রাবণদিনে টুপটাপ জল-ঝরা ছাতিম বনে, নটকান ফুলের বনে, পাপিয়ার ডাকে, দোয়েলের ডাকে। (আজ ভোরে যখন শুয়ে আছি বিছানায়, কি চমৎকার পাপিয়া ডাকছিল !) সেই বৃষ্টির একহাঁটু জলে আকাশ-ভরা কালো মেঘের তলে দাঁড়িয়ে মনে হোল ঋষিদের সেই পবিত্র গাথা :—

স্বজিয়া বিশ্ব করিয়া পালন প্রলয়ে নাশেন যিনি
শোভনা বুদ্ধি আমা সবাকার প্রদান করুন তিনি।

ছুটির দিনটা। সারাদিন বৃষ্টি হয়নি। হাজরী জেলেনী সকালে টাটকা রিটে মাছ দিয়ে গেল গাঙের। এখন ঘোলা জলে অনেক মাছ পাওয়া যায়, তার মধ্যে বেলে মাছ আর চিংড়িই বেশি। রিটে মাছ খুব তেলালো সুস্বাদু মাছ, ইছামতী ছাড়া অন্য কোন নদীতে বড় একটা পাওয়া যায় না। দেড় টাকা সের। যুদ্ধের আগে যে মাছ ছিল পাঁচ আনা সের, এখন তাই দেড় টাকায় পাওয়া ভার। কল্যাণী কাঁচা মাছ তেলঝোল করে বড় চমৎকার। আজও তাই করলে, আর চেঁড়স ভাতে। সাড়ে বারোটার সময়ে কল্যাণী ও আমি নদীতে স্নান করতে নামলাম। কি সুন্দর মাকাললতার ঝোপটা জলের ধারে। নাটাকাঁটার একটা সুগন্ধি ফুল তুলে কল্যাণীর হাতে দিলুম, ও খোঁপায় গুঁজলে।

বিকেলে হাবু ও ফুচুকে নিয়ে অপূর্ব্ব রঙীন আকাশের তলায় বাঁওড়ের ধারের বট অশথ গাছের ছায়ায় ছায়ায় চলে গেলুম মরগাঙে। অনেকদিন এদিকে আসেনি। পথে পথে সবুজ ঝোপ-ঝাপের কি ভরপুর সৌন্দর্য্য। বাঁওড়ে জল বেড়েচে অনেক, ডাঙার কাছে জলি ধানের ক্ষেতে বকের দল চরচে, ওপারের অস্তদিগন্তের পটভূমিতে পাটক্ষেতে চাষারা পাট কাটচে, কোথাও কোথাও জলিধান কাটচে, মাড়ল-গাজিপুরের কাওরারা শুওরের পাল চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে বাঁওড়ের কাঁদায় কাঁদায় (কাঁদা = তীর), শুওরের পাল মাটি খুঁড়ে মুথো ঘাস তুলে খাচ্চে, টাটকা মুথো ঘাসের শেকড়ের সুগন্ধ বেরুচ্চে।

মরগাঙের ধারে গিয়ে দেখি ফণিকাকা ইন্দু রায় মাছ ধরে ফিরচে। আমরা বল্লাম, কি পেলে ? ওরা ভাঁড় দেখালে। কিছুই পায়নি। কাঠের বড় কষ্ট হয়েচে, আমি এক বোঝা শুকনো কাঠ কুড়িয়ে কুড়িয়ে জড়ো করলাম। শুকনো বটের ডাল, যাঁড়ার ডাল, তিত্তিরাজের ডাল। কুঠীর মাঠের পথে এসে নিবারণের বেগুনক্ষেতের নীচে নদীতে স্নান করতে নামলুম। মাধবপুরের চরের ওপর আকাশের কি অদ্ভুত ইন্দ্রনীল রং ! তারই পটভূমিতে বড় একটা শিমুল গাছ, কাশবন, আউশ ধানের ক্ষেত মায়াময় দেখাচ্চে। নদীজলে সেই অদ্ভুত নীল রংয়ের প্রতিচ্ছায়া।

চাটগাঁ থেকে রেণুর পত্র পেয়েছি কাল। ওর সঙ্গে যোগ এতদিন পরেও ঠিক বজায় আছে। কোথায় চলে গিয়েচে খুকু, কোথায় গিয়েচে সুপ্রভা।

দুদিন মোটে বৃষ্টি নেই। খরতর রোদে পুড়ছি। কাল বহুকাল পরে নদীর ধারে পুরনো পটপটিতলায় বেড়াতে গিয়ে জলে নেমে কলমীশাক তুলে আনলুম। আমার বাল্যকালে এখানে সায়ের ছিল, আইনদ্দি কয়াল ধান মাপতো। তারপর বহুদিন মহু রায় এ জমি বন্দোবস্ত নিয়ে এখানে পটলের ক্ষেত করে। নদীর বাঁকের এ জমির সে অপূর্ব্ব শোভা নষ্ট করেচে, বাল্যের সে মটরলতা দোলানো শোভাময় ঝোপঝাপ, সে নিভৃত স্বপ্নভরা লতাবিতান কুড়ুলের মুখে অন্তর্হিত হয়েচে বহুকাল, কেন? না, মহু রায় বা তার পুত্রপরিবার পটলভাজা খাবে। এখন আর সে পটলের ক্ষেত নেই। তাই বেড়াতে গিয়েছিলাম। নদীর ধারে (একটা ছোট বিছে যাচ্চে, দেওয়াল বেয়ে উঠচে, কেন ওটা মারবো?) গিয়ে দাঁড়াই। ওপারে পাটকিলে ও খাঁটি সিঁদুরে রঙের মেঘের ছটা ঠিক সূর্য্যকিরণের ছটার মত অর্দ্ধেক আকাশ জুড়ে বিরাজ করচে। যেন কোনো বিরাট পুরুষ অনন্ত, অসীম বিরাট বাহু প্রসারিত করে সারা ব্যোম ছেয়েচেন। সেই অনাদ্যন্ত বিরাট পুরুষ যেমনি ঐ ক্ষুদ্র পুষ্পিত লতার মধ্যে প্রাণরূপী, তেমনি আবার ধারণাতীত বিরাটত্বের, বিশালত্বের মধ্যেও সমভাবে বিদ্যমান। তেঁতুল-তলার ঘাটে নদীর দিকের ঝোপটাতে সেই লতাটাতে সাদা সাদা ফুল দুলচে, মটরতলায় ফলের থোলো ঝুলচে—শ্রীঅরবিন্দের কথায় "সচ্চিদানন্দ যেমন বল্মীকস্তূপে তেমনি সূর্য্যমণ্ডলে।" 'সূর্য্যমণ্ডলে' কথাটা তিনি বলেন নি, বলেচেন "in the system of suns" অর্থাৎ বহু বিরাট সূর্য্যাকার নক্ষত্রসমূহ-দ্বারা গ্রথিত বিশ্বে।

মুক্তি! মুক্তি! মনের মুক্তি! আত্মার মুক্তি! এই সন্ধ্যার সীমাহীন আকাশের দিগন্তলীন অভ্র-বাহু যে দেবতার ছবি মনে আনে, তিনি আর তাঁর এই শ্যামল বর্ষাপুষ্ট বনকুঞ্জ সুবাসিত লতাপুষ্প মুক্তি দিতে সমর্থ। কিন্তু মুক্তি নিচ্চে কে? সবাই তুচ্ছ জিনিস নিয়ে ব্যস্ত। হে বদ্ধ জীব, সন্ধ্যার আকাশতলে দাঁড়িয়ে সেই পরিপূর্ণ, অবাধ সেই মুক্তির বাণী শ্রবণ কর। একমুহূর্ত্তে বদ্ধতা ছুটে যাবে (অর্থাৎ দূরে যাবে), অমরত্ব নেমে আসবে প্রাণে-মনে।

কাল রাত্রের ভীষণ গুমট গরমের পরে আজ নদীতে নামলুম স্নান করতে। অমনি ওপারের চরের দিকে চেয়ে দেখি নবনীল নীরদপুঞ্জ দিগন্তের নিচে থেকে ঠেলে উঠে ঝড়ের বেগে উড়ে আসচে এপারের দিকে, ভগবানের স্নিগ্ধ করুণার মতো। কেউ কি দেখেচে এমন কাজল কালো মেঘের সজল অভিযান, ঘন মেঘমালার এলোমেলো আলুথালু হয়ে উড়ে আসায় এ অপূর্ব্ব দৃশ্য? আমার মনে পড়লো ভাগলপুরের আজমাবাদ কাছারিতে ওই ভাদ্রমাসেই আমি একবার এ দৃশ্য দেখেছিলাম, সেও এই রকম সকালবেলা। বেনোয়ারী মণ্ডল পাটোয়ারীকে ডেকে তাড়াতাড়ি দেখালাম সে দৃশ্য। আর কাকে দেখাই? সেখানে আর কেউ ছিল না। বেনোয়ারী মণ্ডলকে প্রকৃতি-রসিক বলে আমি ডাকিনি, কাউকে ডেকে ভালো জিনিসের

ভাগ দেবো বলেই ভেবেছিলাম, মনে আছে বেলোয়ারী উত্তপ্ত মেঘপুঞ্জের দিকে খানিকটা চেয়ে থেকে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে বল্লে—হাঁ, বাবুজি, আচ্ছা হ্যায়। এই মাত্র সংক্ষিপ্ত comment করে সে এই বাতুল বাংগালী বাবুর পাশ কাটিয়ে কাছারি ঘরে খতিয়াল লিখতে ঢুকলো।

আজ কেন ওই মেঘপুঞ্জের দিকে চেয়ে আমার চোখে জল এল তা কে বলবে? ভগবানের কথা মনে করেই চোখে জল এল কি? তাঁর অসীম দয়ার কথা স্মরণ করেই কি?

হয়তো হবে…

কিন্তু এ সম্পূর্ণ অকারণ। আমি কি জানি নে এমন ঘর, উষর মরুভূমির দেশের কথা যেখানে মাসের পর মাস কেটে যায় ১২০°।১২৫° ডিগ্রী উত্তাপের মধ্যে, যেখানে একবিন্দু বারিপাতের সুদূর সম্ভাবনাও থাকে না।

তবু ভগবানের দান, ভগবানের দান। সর্ব্ব অবস্থায়, সর্ব্ব কালে, সর্ব্ব দেশে তাঁর অসীম করুণার দানকে যেন মাথা পেতে নিতে পারি। প্রাকৃতিক কারণে মেঘ সঞ্চিত হয়েচে আকাশে, উড়ে আসচে উর্দ্ধস্তরের বায়ুস্রোতে—এর মধ্যে 'ভগবানের দান' কি আবার রে বাপু? যতো সব সেন্টিমেন্টাল ন্যাকামি।

হে অনন্ত, হে অসীম, হে দয়াল তোমার বহু দূত, বিশ্বের সব দেশে কত চর—সব কিছুর পেছনে তোমার প্রকাশ, তোমার মহান অভ্যুদয়—এ সত্যকে যেন না ভুলি। সব রকম দানকে যেন তোমার হাতের অমৃত পরিবেশন বলে মেনে নিতে পারি।

আজ সকালে উঠলাম। মনে খুব আনন্দ। হয়তো বা শরতের রোদ ফুটবে খুব। পটুপটি-তলায় সায়েরে গেলুম নদীর ধারে, পূর্ব্বদিকে সামান্য কিছু মেঘ, আকাশ মোটামুটি বেশ পরিষ্কার। ওপাড়ার ঘাটে মুখ ধুয়ে ওপারের শোভা দেখি একমনে। সেই সাঁইবাবলা গাছ থেকে মটরলতা দুলচে, সেই সাদা ফুলে ভরা লতায় কিছু কিছু ফুল এখনও দেখা যাচ্চে। একটা নৌকো এসে লেগেচে—ছইওয়ালা নৌকো।

বল্লাম—কোথাকার নৌকো গো?

—আজ্ঞে বাবু, বাজিতপুরের।

—সে কোথায়?

—মাজদে'র সন্নিকটে।

—কি কিনবে?

—কাপড় কিনতে এসেচি গোপালনগরের বাজারে।

—কবে সেখানে গিয়ে পৌঁছোবে?

—আজ বেলা বারোটায় ছাড়লে কাল সন্দের সময় নৌকো আমাদের ঘাটে লাগবে।

বাড়ী আসতেই বৃষ্টি নামলো। সে কি ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি! দুটি ঘণ্টা ধরে একঘেয়ে অবিরাম ঝম্‌ঝমা বৃষ্টি! 'ঝম্মা' মানে অবিরাম মুষলধারে বৃষ্টি। হরিবোলার ছেলে নীলু এল একটা পাকা

তাল নিয়ে। বেশ সুন্দর তালটা। হাবু বসে 'উর্মিমুখর' পড়তে লাগলো। নীলু পড়তে লাগলো 'পথের পাঁচালী'।

আজ ওবেলা কলকাতায় যেতুম ১১টার ট্রেনে। কিন্তু যে বৃষ্টি! তা ছাড়া গুরুদাস ঘোষের ছেলের বিয়ের বৌভাতে নিমন্ত্রণ আছে দুপুরে। সে বিশেষ করে ধরেচে, না গেলে চলবে না।

কল্যাণী চিঁড়ে দই আমসত্ব দিয়ে কলা দিয়ে ফলার মেখে নিয়ে এল। এর যা আস্বাদ, কলকাতায় এ রকম পাওয়া যাবে না। ঘরের পাতা দইও নেই সেখানে। টাটকা চিঁড়েও পাওয়া যায় না সেখানে। এখানে গোলার ধানের চিঁড়ে, যত ইচ্ছে খাও।

•

কাল বিকেলে চারটার সময় উড়ে-আসা নীল মেঘের কোলে কোনো সাদা মেঘখণ্ডের দৃশ্য আর তার নিচে মেঘের ছায়ায় কালো গোপালনগরের বাঁওড়ের দৃশ্য আমায় একেবারে মুগ্ধ করেছিল। তারপর কাল রাত্রি থেকে নেমেছে ভীষণ বৃষ্টি। সারারাত ঘুমের মাঝে ফাঁকে ফাঁকে শুনেচি ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়চে···পড়চে। আজ সকালে ওপাড়ায় ঘাটে বেড়িয়ে এলাম—মহু রায়ের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে। সর্ব্বত্র জল আর জল—খানা, ডোবা, বিল, বাঁওড় জলে থৈ থৈ করচে। ইছামতী কূলে কূলে ভরা, সেই লতাটাতে সাদা সাদা ফুল ফুটেচে—ভরপুর বর্ষার দৃশ্য! কতকাল দেখিনি এ সব, কতকাল দেখিনি এই বর্ষণমুখর মেঘান্ধকার প্রভাতে ওপারের জলে-ভেজা নলখাগড়া বন, বক্তেবুড়োর বন, কতকাল দেখিনি বর্ষা-প্রভাতে ভাদ্র মাসের ইছামতীর কূলে কূলে ভরা অপরূপ রূপ! তার বদলে দেখে এসেচি মির্জ্জাপুর স্ট্রীটের বাড়ীর তেতলা থেকে নিচের রাস্তায় একহাঁটু জলের মধ্যে দিয়ে পাঁউরুটিওয়ালা ভোরে অদ্ভুত সুর করতে করতে চলেচে। "এক এক পয়সার রুটি লেও, দু' দু' পয়সার রুটি লেও—বোম্বাইয়ে রুটি লেও, বোম্বাইয়ে রুটি!" জল ছিটিয়ে বাস চলেচে একহাঁটু জলের মধ্যে, যেন স্টীমার চলেচে জলের মধ্যে দিয়ে। সারি সারি ট্রাম মৌলালির মোড়ে আটকে আছে··· কিংবা সারারাত্রি বৃষ্টির দরুন ট্রাম বেরোয়নি।···বাবুরা প্রাণের দায়ে আপিসে চলেচেন জুতো-জোড়া খবরের কাগজ মুড়ে বগলে নিয়ে হাঁটুর কাপড় তুলে···ট্রামে বাসে জানালা বন্ধ, লোক-জন বাদুড়ঝোলা হয়ে চলেচে, ভেতরে বাইরে অসম্ভব ভিড়। বহুক্ষণ ধরে দেখে দেখে ও দৃশ্য চোখ শ্রান্ত হয়ে গিয়েচে···আর ভাল লাগে না ওসব। এমন ভাদ্র মাসের মেঘ-কালো প্রভাত তার ভরা নদীজল ও বৃষ্টিস্নাত সাঁইবাবলার ও মাকাললতার ঝোপ এবং চরের নলখাগড়ার বন নিয়ে অক্ষয় হয়ে থাক জীবনে, মির্জ্জাপুর স্ট্রীটের ফিরিওয়ালা জলে ভিজে যত খুশি 'বোম্বাইয়ে রুটি' বিক্রি করুক গে।

ঠিক আজ তেমনি প্রভাত—তেমনি মেঘান্ধকার, শীতল, বর্ষণমুখর ভাদ্রের প্রভাত। ৭টা বেজেচে অথচ আমি ভাল করে খাতার লেখা দেখতে পাচ্ছি নে আধ-অন্ধকারে। যেমন কতকাল আগে আজমাবাদ কাছারীতে আমি সেই নকছেদী ভকতের দেওয়া বেলফুলের

ঝাড়ের পাশের চেয়ারে বসে 'পথের পাঁচালী' লিখতাম, মুহুরী গোষ্ঠবাবু বসে হিসেব যোকাতো, উত্তর বিহারের বন্যার জলে-ডোবা মকাইয়ের ক্ষেত আর কাশবন—সেই উদ্দাম ঘোড়ায় চড়া, সেই বটেশ্বরনাথ পাহাড়ের নীল দৃশ্য, সেই দিগন্তলীন মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট—সেই সব দূর অতীতের ছবি আজকার দিনে মনে জাগে। সে হোল আজ আঠারো বছর আগের কথা, মানুষের ক্ষুদ্র জীবনে আঠারো বছর—কত কাল!

কিন্তু এ দিনে আর একটি অদ্ভুত স্মৃতি জড়ানো আছে জীবনে। ১২ই ভাদ্র সেবার ছিল জন্মাষ্টমী, মনে পড়ে? মনে পড়ে সেই আকুল আগ্রহে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা, সেই মাটির প্রদীপ হাতে একটি কিশোরীর ছবি খড়ের দাওয়ায়? নাঃ—এসব কথা মনের গভীর গহনে সুগোপনেই থাকুক, এখানে লিখবো না কিছু।

শুধু সেই অপূর্ব্ব দিনটির স্মৃতির উদ্দেশ্যে আজকার এই ক'টি কথা লিখে রাখলাম।

পুরীতে যে মেয়েটি এই খাতাখানি আমায় দিয়েছিল, আজ ঘন সারেণ্ডা অরণ্যের মধ্যে বসে তার সে খাতাটিতে লিখচি। আজ ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪৬ সাল। বেশ শীত, থলকোবাদ বন-বিভাগের বাংলোতে বসে আছি, আগুন জ্বলছে ঘরে। আজ সকালে মোটরে মিঃ সিন্‌হার সঙ্গে সুরাগাঁও গিয়েছিলাম। পথে পড়লো জাটিসিরিং বলে একটা অপূর্ব্ব সুন্দর জায়গা, কোইনা নদীর গর্ভে। তিন বৎসর আগে জ্যোৎস্নারাত্রে এখানে এসেছিলুম, এমনি শীতের দিনে, রাত ১০টার পরে। এখানে বসে কিছু লিখেছিলুম মনে আছে। চারিদিকে ঘন অরণ্যভূমি, সামনে কেউনঝর স্টেটের পাহাড় ও বন, পেছনে বোনাইগড়ের বন, প্রায় ২০০০ বর্গ মাইল ব্যাপী বন অরণ্য ঘিরে রেখেচে আমাদের।

বড়দিনের ছুটিতে এখানে বেড়াতে এসেছি। মনোহরপুরের পাহাড়ের ওপর যে সুন্দর বাংলোটি আছে বনবিভাগের, সেখানে ছিলাম দুদিন। তারপর এলুম এখানে। নির্জ্জন বনপথে সেবার যেখানে বনমুরগী দেখেছিলাম, এবারও সেখানে সন্ধ্যার আগে বনমুরগী দেখা গেল। বাড়ীর পাশে চরে বেড়াচ্ছিল, মোটরের শব্দ শুনে উড়ে গেল। থলকোবাদ আসবার কিছু আগে বন্য ময়ূর দেখলাম, রাস্তার এ পারের বন থেকে ওপারের বনে ঢুকলো। আবার সেই থলকোবাদ বাংলো! সেই অরণ্যের সুগন্ধ, সেই নির্জ্জনতা।

কাল বাবুডেরা ও বলিবা থেকে ফিরবার পথে এই নির্জ্জনতা আমার বুকে এত বেশি যেন একটা গুরুভারের মত চেপে ধরছিল। শুধুই গাছ আর বন, আর লতা আর পাথর, আর পাহাড়। লোক নেই, জন নেই, লোকালয় নেই। আমি এখানে কতদিন একা থাকতে পারি? যদি ধরো বাবুডেরার পথে সেই পাহাড়টার ওপরকার তৃণভূমিতে, যেখানে মাদুর পেতে বসে আমি আর সিন্‌হা দুঘণ্টা গল্প করলুম ও লিখলুম—সেখানে আমাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় কিছু দিন থাকতে হয়, একটিও মানুষের মুখ না দেখে, একজনের সঙ্গেও একটি কথা না বলে? শুধু অন্ধকার বা আধ-জ্যোৎস্না রাত্রে মাথার ওপরকার আকাশে দেখবো পরিচিত কালপুরুষ বা সপ্তর্ষি নক্ষত্রমণ্ডল, তাদের চারিপাশে ছড়িয়ে আছে অগণ্য তারা, আর

নিচে আমার সামনে, পিছনে অন্ধকারাচ্ছন্ন শৈলমালা, অরণ্যের সীমারেখা, কচিৎ বা শুনবো বন্য হস্তীর বৃংহিতধ্বনি, বন্য কুকুরের ডাক, কখনো বা কোৎরার (barking deer) বিকট চীৎকার।

ওপরে বিরাট নীচেও বিরাট। ওপরে, নীচে, তোমার চারিপাশে বিরাটের গম্ভীর মূর্ত্তি থমথম্ করচে। বাংলা দেশের মাঠে মাঠে এ সময়ে ফুটেচে বনধুঁধুলের হলদে ফুল, ছোট এড়াঞ্চির সাদা সাদা থোকা থোকা ফুল—সেগুলো মিষ্টি, চমৎকার লিরিক কবিতা। মনকে মুগ্ধ করে, আনন্দ দেয়। এখানে প্রকৃতি এপিক কাব্য লিখে রেখেচে গম্ভীর অরণ্যাবৃত শৈলশিখরে, লৌহ-প্রস্তর দিয়ে বাঁধানো নদীকূলে, তারা-ভরা বিশাল আকাশপটে, বন্যজন্তু-অধ্যুষিত অরণ্য অন্ধকারে। সে গম্ভীর এপিক কাব্য সকলের জন্যে নয়—কাল রাত দুটোর সময় বাংলোর বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে সামনের অন্ধকারাচ্ছন্ন নিস্তব্ধ বনানী ও শৈলমালার দিকে তাকিয়ে দেখেচি—সে দৃশ্য সহ্য করতে পারা যায় না—মনকে স্তব্ধ করে, অভিভূত করে, ভয় এনে দেয়। বিরাটের উপাসনা সকলের জন্যে নয়, বাংলার পল্লী প্রকৃতি যেখানে ঠুংরি এখানে তা চৌতালের ধ্রুপদ—সকলের জন্যে নয় এ সব।

ওই বন ওদিকে পাথর বাৎনী, জেরাইকেলা থেকে আরম্ভ করে এদিকে ঝিনঝুং, লোয়ো কোদালিবাদ, ধরমপকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কি ঘন বন, কত মোটা মোটা শাল গাছ কোথায় কোন্ শূন্যে ঠেলে উঠেচে—কলের চিমনির মত। ১৫০।২০০ বছরের প্রাচীন বনস্পতি। এসব অঞ্চলে যখন সভ্য মানুষে পদার্পণ করেনি, রেল হয়নি, মোটর ছিল না, পথ ঘাট তৈরি হয়নি—তখন সেই সব বনস্পতি ঘন বনের মধ্যে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছিল। আমার প্রপিতামহ যখন শিশু তখন এই সব গাছ হয়তো ছিল সরু-শাল-বলা। আমার মায়ের যেদিন বিয়ে হয়েছিল সে-দিনটিতে এই গাছ এত বড়ই ছিল। এই সব ভেবে আমার মনে যে কি আনন্দ পাই, থলকো-বাদ গ্রামের পাশে বোনাইগড় আর রঙ্গনগাড়ার পথের ধারে যে বিশাল শালবৃক্ষটি আজ সন্ধ্যায় দেখলুম যার তলায় শাদ-বেড়ার সেই গাড়োয়ান ক'টি ভাত আর কচু দিয়ে কলাইয়ের ডাল রেঁধে খাচ্ছিল—দণ্ডের পর দণ্ড আমি ঐ গাছটির দিকে চেয়ে এই রকম চিন্তায় মশগুল হয়ে আপনহারা আনন্দে বিভোর হয়ে থাকতে পারি।

ইসমাইলপুর দিয়ার খড়ের কাছারিঘর থেকে যায় হয়ে এমনি শীতের রাত্রে হঠাৎ বাইরে গিয়ে দাঁড়াতুম মনে পড়ে। সেখানেও ছিল সামনে পিছনে নির্জ্জন বনভূমি আর ছিল সে কি তীব্র শীত। হাতের আঙুলগুলো জমে ঠাণ্ডা হয়ে যেতো—এতকাল পরে আবার এই ক'দিন সেই হারানো অনুভূতিগুলো ফিরিয়ে পাই রোজ রাত্রে। সেই নির্জ্জন, অন্ধকার আরণ্য-ভূমি, সেই তীব্র শীত, সেই সীমাহীন বিরাটের মুখোমুখি হওয়া, সেই স্তব্ধ ও মৌন বিস্ময়-ভরা আনন্দ! জয় হোক সে বিশ্বদেবতার যিনি আমাকে আবার এখানে এনেচেন!

ক'দিন থেকে বন্যহস্তীর উপদ্রবে এখানকার আক্রাকুসি অর্থাৎ কাঠচেরাইয়ের কুলিরা বড় বিব্রত হয়ে পড়েচে। কাল সন্ধ্যায় বনতুলসীর শুকনো জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের ওপরের

একটা ঝর্ণা পার হয়ে বোনাইগড়ের পথে এদের কাছে গিয়েছিলাম। একটা বিশাল শাল গাছের তলায় এরা বসে ডাল রান্না করছিল ঘটিতে। ভাত আগেই রান্না হয়ে গিয়েছিল। চারিধারে নির্জ্জন জঙ্গল। ভীষণ শীত।

জিজ্ঞেস করলাম—কি নাম? কোথা থেকে আসচো?

ওরা বাংলা বোঝে না। হো ভাষার মধ্যে উড়িয়া ভাষার ক্রিয়াপদ মিলিয়ে এদের কথা ভাষা। যা বল্লে, তার মানে যে তারা গাড়োয়ান, কাঠ বইবার জন্যে যদি গাড়ীর দরকার হয়, সেজন্যে জঙ্গলে কাজ খুঁজতে এসেচে।

সঙ্গে ওদের দেখলুম শুধু একখানা করে খেজুর পাতার বোনা চেটাই, একখানা পাত্‌লা রেজাই, একটা হাঁড়ি আর একটা ঘটি।

জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় শোবে রাত্রে?

—এইখানে। গাছতলায়।

—হাতীর ভয় আছে এখানে জানো? কাল রাত্রে আরাকুলিদের বড় বিব্রত করেচে।

—আগুন আছে বাবু।

—আগুন তো আরাকুলিদেরও ছিল, বুনো হাতী আগুন মানেনি। দাঁত দিয়ে ও-বছর একটা লোককে গিঁথে ফেলেছিল মাটির সঙ্গে। সাবধানে থাকাই ভালো।

—না বাবু, হাতীর ভয় করলে আমাদের চলবে না। কোথায় যাবো বাবু?

—এই ভীষণ শীতে শোবে এই গাছতলায়!

—আমরা চিরকালই তাই করি। আগুনের ধারে শুলে শীত লাগবে না।

এরা কিছুই গ্রাহ্য করে না, না বুনো হাতী, না এই দুর্দ্দান্ত শীত, না এই অন্ধকারে আরণ্য-রজনীর নির্জ্জনতা। এই সব বন্য অঞ্চলে এরা মানুষ, আজন্ম যাতায়াত করচে এই বনপথে, বৃক্ষতলে নিশি যাপন এদের দৈনন্দিন অভ্যেস। ওদের ডাল নামলো! শুধু ডাল আর ভাত শালপাতায় ঢেলে খেতে লাগলো। ডালের মধ্যে সাদা সাদা কি ভাসচে দেখে বল্লাম—ওগুলো কি ডালে?

—পেন্থুচি।

—সেটা কি?

—কান্দা।

—তাই বা কি?

বুঝলাম না জিনিসটা। মনে হোল কোনো জংলী ফলমূল হবে। পরে বনবিভাগের হিন্দি-জানা কর্মচারী নিকোডিম হোরোকে জিজ্ঞেস করতে জানলুম, জিনিসটা হোল মানকচু।

এই হোল ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষকে বুঝতে হোলে এই সব লোকের সঙ্গে মিশতে হবে। কি সামান্য এদের খাওয়া, কত তুচ্ছ এদের শোওয়া, শীতকে এরা শীত জ্ঞান করে না, বুনো-হাতী মানে না, বাঘ মানে না—রোজ হয়তো কি দেড় টাকা গাড়ীর ভাড়া মেলে। তবুও খায় মানকচু সিদ্ধ আর ভাত।

গাছের মাথায় সন্ধ্যা নামলো ফিরবার পথে। একফালি চাঁদ উঠেছে শালগাছের মাথায়। বনতুলসীর জঙ্গলের গন্ধ ভেসে আসচে ঠাণ্ডা বাতাসে। নিকটে পাহাড়ী উমুরিয়া নালার মর্মর শব্দ। বোনাই গড়ের পথ ঘন জঙ্গলের বাঁকে যেখানে অদৃশ্য হয়েছে, সেখান থেকে ধোঁয়া উঠচে। বোধ হয় ওখানে আড়াকুলি বা গাড়োয়ানেরা রাত্রিযাপন করচে।

পথের ধারে গাছের তলায় তলায় কত লোক আগুন জেলেচে, রান্না করচে। এরা সবাই জেনাইকেলা কিংবা বিসরা থেকে কাজ খুঁজতে এসেচে। কারণ এই জঙ্গলের মধ্যে এই গ্রামেই দুটি কাঠ-ব্যবসায়ীদের আড্ডা আছে। কাঠ কেটে ও চেরাই করে ২৫/২৬ মাইল দূরবর্তী রেলস্টেশনে পাঠাবার জন্ত 'আরাকুলি' দরকার, কুলি দরকার, গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান দরকার। তাই এখানে এত লোক আসে।

ওরাই আসবার সময় বলেছিল, রোজ রাত্রে হাতীতে তাদের বড় জালাতন করে। হাতীর উপদ্রবে ওরা পালিয়ে ফরেস্ট বাংলোর কম্পাউণ্ডে আশ্রয় নিয়েছিল পরশু রাত্রে।

গ্রামের লোকে বলেছিল হাতীর উপদ্রবে গাছের কলা থাকে না, ক্ষেতের কোনো ফসল থাকে না। সব খেয়ে যাবে। উঁচু মাচা করে তাই ওরা সারারাত ফসলের ক্ষেতে চৌকি দেয়। শীতকালে এখন ক্ষেতে কোনো ফসল নেই, কাটা হয়ে গিয়েচে, আছে কেবল কুরথি। যেখানেই পাহাড়ের তলায় কুরথি ক্ষেত, সেখানেই উঁচু কোনো গাছের ওপরে মাচা বাঁধা। রাত্রে ফসল পাহারা দিতে হবে।

খলকোবাদ বাংলোর পেছনে যে ছোট পাহাড়ী বন আর উঁচু রাঙামাটির ডাঙা তাতে শীতের দিনে একরকম ঘাস হয়েচে, খুব নরম, সরু সরু সাবাই ঘাসের মত। এই ঘাসের মাঝে মাঝে শুকিয়ে গিয়ে সোনালি রং ধরেচে।

আজ দুপুরের পর বাংলো থেকে বার হয়ে এই নির্জ্জন পাহাড়ে উঠে ঘাসের উপর একা বসলুম। আমার পেছনের ঢালুতে আসান, অর্জ্জুন, ধ, করম, শাল, পিয়াল, আমলকী গাছের বন। ওদিকে বনের মাথা ছাড়িয়ে আর একটা পাহাড় ঠেলে উঠেচে। কি যে অনুভূতি হয় এখানে বসে চুপ করে চোখ বুজে থাকলে। শুকনো ঘাসের ভরপুর গন্ধ। সোনালি রোদ। কত কি পাখীর ডাক। কান পেতে শুনলে শোনা যাবে পাহাড়ের বনে বনে এদিকে ওদিকে কত অজানা পাখীর ডাক। বাংলা দেশের পরিচিত পাখী এরা নয়। আমি এদেশের পাখীর সুর চিনি না। কেবল চিনি বনটিয়া আর ধনেশ পাখীর ডাক। পাহাড় ও বনের পটভূমিতে বুনো পাখীদের সঙ্গীত এই নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে শুধু মনকে বিরাটের দিকে নিয়ে যায়। তাঁর কথাই এখানে বসে ভাবতে ইচ্ছে করে। ধ্যানস্তিমিত নেত্র সেই মহান শিল্পীকে একদিন প্রত্যক্ষ করেছিল প্রাচীন ভারতের কোন অরণ্যের অভ্যন্তরে। এমনি নির্জ্জন দুপুরে।

একটু পরে মোটরে গেলুম বেড়াতে খলকোবাদ বাংলো থেকে চার মাইল দূরে একটা ঝর্ণা দেখতে। সন্ধ্যার দেরি নেই। মোটরের রাস্তা থেকে কিছুদূরে সেই ঝর্ণাটা। বড় বড় শিলাস্তৃত চাতাল সেখানে। কত লক্ষ বৎসর ধরে এই ক্ষুদ্র ঝর্ণাটি ওপরের নরম রাঙা মাটি

কেটে shale ও greisen পাথরের এই চাতাল তৈরি করেছে। কত লক্ষ বৎসর ধরে এই ঝর্ণা চলেচে এখান দিয়ে। সময়ের বিরাট ব্যাপ্তির কথা ভাবলে আমরা ক্ষুদ্র মানুষ আমাদের মাথা ঘুরে যায়।

সামনে সেই ক্ষুদ্র ঝর্ণাটি কুলকুল করে পাথরের ওপর দিয়ে বইচে। আমি ঘন বনের মধ্যে মোটা লতা দোলানো একটা বটগাছের তলায় শিলাসনে বসে আর একটা মস্ত বড় মসৃণ পাথর ডেস্ক দিয়ে লিখচি। সেই সব পাখীর ডাক। এ জায়গাটা বড় বেশি ঘন বনের মধ্যে। একে তো এই সারেণ্ডা অরণ্যই নির্জ্জন ও বহু বন্যজন্তু-অধ্যুষিত। তাতে এ জায়গাটা আবার থলকোবাদ থেকে চার মাইল দূরে বনের মধ্যে। বাঘ ও হাতীর ভয় এখানে খুব। মাঝে মাঝে সতর্ক দৃষ্টিতে পেছন দিকে চাইচি, শুকনো পাতার ওপর খস্ খস্ শব্দ হোলেই, মিঃ সিন্‌হা অদূরে আর একটা গাছের তলায় বসে আছেন।

এসব স্থানে বসে শুধু বিরাটের চিন্তা মনে আসে। লক্ষ্য বৎসর এখানে মাপকাঠি বিরাট আকাশ, অনন্ত নাক্ষত্রিক শূন্য, মহাকালের অনন্ত পথযাত্রা···মনের মধ্যে যে সুর বেজে ওঠে, পৃথিবীর ভাষায় সে সুর বোঝানো যায় না, সে অনুভূতি অমরত্বের আস্বাদ বহন করে আনে, তুলনা নেই সে ecstasyর—

আর শুধুই ছবি মনে আসে সে বিরাট দেবতার, কত ভাবে, কত দিক থেকে। বহু প্রাচীন দিনে ভারতবর্ষের এমনি কোন অরণ্যের শিলাতলে বসে ব্রহ্মসূত্রকার মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন 'রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্'—বিশ্ব রচনা দেখে মনে হয় এর মধ্যে কোন বিরাট শিল্পচেতনা সব সময়ে সক্রিয়।

সেই মহান, বিরাট শিল্পীকে বন্দনা করি। জয় হোক বিশ্বের সে অধিদেবতার। মহাকবি তিনি, অনাদ্যন্ত শাশ্বত যুগ ধরে এই রকম শিলাস্তৃত ঝর্ণার তটে, অনন্ত নীহারিকামণ্ডলী ছড়ানো আকাশপটে, বনকুসুমের পাপড়ির দলে, বিহঙ্গকাকলীতে, জাতির উত্থানে পতনে, চাঁদের আলোয়, তরুণীর নির্মল প্রেমের ব্যথায়, শোকে, বিরহের গানে, অগ্নিপুচ্ছ ও ধূমকেতুদলের যাতায়াতে, দেশ ও মহাদেশের অবনমন পুনরুত্থানে তিনি আপন মনে তাঁর বিরাট এপিক কাব্য লিখেই চলেচেন। কিন্তু অত বড় মহাকাব্য পাঠ করবার মত শক্তিধর পাঠক কোথায়? দু-একটা সর্গের এক-আধ পংক্তি কেউ হয়তো পড়ে, কেউ বোঝে কেউ বোঝে না।

আকাশে গোধূলি নেমেচে। বনের মধ্যে দিয়ে আমার এই বটতলায় শিলাসনে ওর রাঙা আলো এসে পড়েছে। জলের মর্মর কলতান যেন ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে চোখে। শীতও নেমেচে খুব।

বিজয় ড্রাইভার এসে বলচে—যাবেন না বাবু?

বুনোহাতী কিংবা বাঘ আর একটু পরে জলপান করতে আসবে এই ঝরণায়। যাওয়াই ভালো।

বাংলোয় ফিরলুম অন্ধকার গিরি-বনপথ ধরে। আশপাশের অন্ধকার জলের দিকে চাইলে প্রাণে ভয় আসে। এ এক আশ্চর্য্য জগৎ।

বাংলোয় ফিরে পাহাড়ের প্রান্তে বাংলোর কম্পাউণ্ডে বসে আছি। আমার সামনে অনেক নীচে উপত্যকাভূমি, তার ওপারে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বনাবৃত শৈলমালা। বাঁ দিকে কম্পাউণ্ডের বড় তুন গাছের মাথায় অষ্টমীর চাঁদ উঠেচে—দূরের অন্ধকার শৈলমালার ওপরে একটি নক্ষত্র জ্বলজ্বল করচে। সেদিকে চেয়ে মন আমার কোথায় কতদূরে চলে গেল। ওই তারার চারিপাশে কি আমাদের মত গ্রহরাজি কিছু আছে—যেখানে বাস করে আমাদের মত জীবকুল? এই রকম বনানীর সৌন্দর্য কি ওদের মধ্যে আছে? আমাদের মত সুখ দুঃখ, প্রেম বিরহের লিপি কি ওখানেও লেখা?

সেকথা জানি না জানি—এই কথাটা জানি যে বিরাটের আসন ওখানেও পাতা। তাঁর মহাকাব্যের ছন্দের ঝঙ্কারের মধ্যে ওদেরও স্থান রয়েচে।

Out beyond the shining of the furthest star
Thou art ever stretching infinitely far,
Yet the hearts of children hold, what worlds can not,
And the God of glory loves the lowly spot,

আমাদের গ্রামের ইছামতীর নদীর ধারে বন্যার ভাঙনে সেই হলদে তিৎপল্লা ফুলের মধ্যেও তিনি, বনসিমতলায় মাঠের সেই মাকাল লতার ঝোপে পাকা টুকটুকে মাকাল ফলের মধ্যেও তিনি।...

অনেক রাত্রে চাঁদ ফুটফুটে আলো দিচ্চে।

আবার পাহাড়ের ধারে বেঞ্চিতে গিয়ে বসলুম। দূরের সেই পাহাড়শ্রেণী, তার মাথার ওপরকার আকাশে অগণ্য তারা। কি মহিমা বিরাটের। তুমি আমাকে ভালবেসে এখানে এনেচ, তোমার এ বিরাট রূপকে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ দিয়েচ। কিন্তু আমি তোমার এ রূপের সামনে দিশাহারা হয়ে যাই, দেবতা। আমার সেই তিৎপল্লা ফুলের ঝোপই ভালো। বনসিমতলা ঘাটের সেই মাকাল ফলই ভালো। তোমার এ রূপ দেখে আমি ভয় পাই।

জ্যৈষ্ঠ মাসের বিকেল।

নদীর ধারের ঘন নিবিড় বন সেকেলে প্রাচীন আমগাছের তলায়। কুঁচলতা বেয়ে উঠেচে বৃদ্ধ আমগাছের ডাল। বাঁশগাছের আগা থেকে নেমে এসেচে বড়-গোয়ালে লতার কচি ডগা, এবার বোশেখ মাসের শেষে দিনকয়েক বৃষ্টি হওয়াতে লতাপাতা চারাগাছের এত বৃদ্ধি। যেখানে কিছুদিন আগে পরিষ্কার তৃণলতাশূন্য ভূমি দেখেছি—এখন সেখানে দশ বর্গহাত জমিতে গজিয়ে উঠেচে বুনো উচ্ছে, বুনো কয়লা, বড়-গোয়ালে লতা, করমচা লতা, বুনো সূর্য্যমনি ফুলের চারা, জামের চারা, তরমুজের চারা, আরও কত কত জানা অজানা বুনো গাছপালার চারা।

এখন বৃষ্টি নেই। আজ ক'দিন খুব গরম, খরসূর্য্য উঠেছে মেঘলেশশূন্য নীল আকাশে, দিক্‌দিগন্ত প্রখর রৌদ্রে জ্বলেপুড়ে যায়, অপরাহ্নে কিন্তু গহন ছায়া নেমে আসে মাঠে ঘাটে

পথে, বনযুঁইয়ের সুগন্ধে বাতাস হয় সুরভিত, বাঁশঝাড়ের মগডাল দুলিয়ে, আম্রবন-শীর্ষ কাঁপিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া ওঠে নদীর বাঁক থেকে, নদীর স্নিগ্ধ কালো জলে ঢেউ উঠে পানকলস শেওলার কুচো সাদা ফুলের সারিকে নাড়িয়ে দেয় ডাঙার দিকে, পানকৌড়িকে উড়িয়ে দেয় সাঁইবাবলার ডাল থেকে, শেফালি ফুলের হলুদ পাপড়ি ঝরিয়ে দেয় নিবিড় বনের তলায়, বর্ষাপুষ্ট তৃণভূমির তলে কিংবা নবোদ্গত চারা গাছের মাথায়। গোধুলির রাঙা আলো বনে, মাঠে, চরে, জলে, নলখাগড়া আর কষাড় ঝোপে, উড়ন্ত বকের সারির পাখায়। এই নিস্তব্ধ অপরাহ্ণে ছায়াগহন প্রাচীন আমবাগানে ঢুকে দেখছি বনের কোন্ কোণে তিনি পত্রশয্যায় ঘুমিয়ে আছেন। তাঁকে দেখেছিলাম এই নির্জ্জনে।

আমি অবিশ্যি দূর থেকে দেখেছি, কাছে যাইনি।

ছায়া-ঝোপের নিবিড় আশ্রয়ে তিনি শুয়ে ঘুমিয়ে আছেন। নারীর মত সুকুমার কমনীয় মুখে এক অপার্থিব ভাব মাখা, দীর্ঘ দীর্ঘ চোখ দুটি নিমীলিত দীর্ঘ কালো জোড়া ভুরুর তলায়। সুন্দরী নারীর মত লাবণ্যভরা মুখ। মুখ ছাড়া আমি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে ওঁর। ঝুর ঝুর করে ঝরা পাপড়ি ঝরে পড়চে সোঁদালি ফুলের ওঁর শয্যার ওপর। ডালে ডালে বনের পাখি নেচে নেচে উড়ে বেড়াচ্চে, কত কি বন্যলতার গাছ ওপরের ডাল থেকে নেমে এসে দুলচে ওঁর বুকের কাছে, মুখের কাছে। তিৎপল্লা ফুল ফুটে আছে একটু দূরে একটা ঝোপে, রঙিন প্রজাপতি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে সোঁদালি ফুলের ঝাড়ে ঝাড়ে, পিড়িং পিড়িং দুর্গাটুনটুনি ডাকচে, উঁচু গাছের মগডালে ডাকচে কুলো, কি সুন্দর গোধুলির রাঙা রোদ সাজানো বনকুঞ্জ, কি স্নিগ্ধ ছায়ানিবিড় বীথিতল!

কিন্তু হঠাৎ মনে হোলো তিলপল্লা ফুল তো এখন ফোটে না, ও ফোটে শীতের প্রথম মাসে দুপুরবেলা।

এখন ও ফুল কেন?

তা না, মনে হোলো মহাশিল্পী, মহাকবি উনি, নিজের অনন্ত শয্যার অস্তনিদ্রার স্থানটি নিজের ইচ্ছামত সাজিয়ে বোসবেন আমি যে সব ফুল ভালবাসি বা দেখেছি তাই দিয়ে। শুধু কি ফুল? কত কি সুদর্শন, সুকুমারাগ্র বন্যলতা, যা নিতান্ত এই বাংলার পল্লীপ্রান্তরে সুপরিচিত। নেই সেখানে অর্ক ও কোবিদার। নেই কুরুবক, অশোক পুন্নাগ ও চম্পক, বর্ষা-সাক্ষী নীপও চোখে পড়ে না। হে পূর্ব্বাচলের সবিতা, তোমার জবাকুসুম-সঙ্কাশ রশ্মির বিকীরণও এখানে তপস্যার অভাবে প্রবেশ লাভ করেনি। কি পুণ্য করেছিল এই প্রাচীন দিনের গাঙ্গুলী বংশের আমবাগান, কি তপস্যা করেছিল ইছামতীর তীর-তরুশ্রেণী?

ভালো করে চেয়ে দেখবার জন্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম সেই বনে।

কি সুন্দর অপরূপ স্নিগ্ধ ছবিখানা আমার সামনে।

বিপুল মহাসাগরে ইথারের মহাসমুদ্র, যেখানে কোটি তারা ডোবে জলে, তার মধ্যে ক্ষুদ্র একটি সবুজ ঘড়ের দ্বীপ পৃথিবী।

বিশ্বের রাজাধিরাজ পরম সৌম্য, পরম প্রেমী অধিদেবতা, যাঁর তৈরী আত্মবস্তুর এই জগৎ,

এই মহাজগৎ, সেই পরম রহস্যময় দেবতা আজ কেন শায়িত এই আমবাগানে! সোঁদালি ফুল ঝরচে তাঁর সুকুমার লাবণ্য-মাখা মুখের ওপর, সে মুখ দেখে তখনি ভালবাসতে ইচ্ছা করে—বিশেষ করে যখন মনে হয় জগতে ক'জনই বা ওঁকে জানে বা ওঁকে ভালবাসে বা ওঁর কথা ভাবে। উনি সব চেয়ে বেশি অবহেলিত জগতের মধ্যে। কচি কচি লতা দুলচে, একটু দূরে রঙিন প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে, সোঁদালি ফুলের ঝাড়ে ঝাড়ে, আবার নীল বনকলমি ফুলে ভর্ত্তি একটা লতা উঠেছে যাঁড়াগাছের মাথায়, অকালে একটা শিমুলের শাখায় রাঙা রাঙা ফুল ফুটে আছে, টুকটুকে মাকালফল ঝুলচে, লেজ-ঝোলা হলদে পাখী বসে আছে, যে ফুল কেউ দেখে না ও কেউ আদর করে না, তেমন ফুল ফুটে আছে তাঁর বনতলে, তাই দিয়ে রচিত হবে তাঁর পত্রশয্যা।

প্রণাম, হে খেয়ালী দেবতা, প্রণাম।

ছোট একটা লতা উঠেচে আমার রোয়াকের ঠেস্-দেওয়ালের পাশের নারিকেল গাছটা বেয়ে। আমার বাড়ীর ওদিকটাতে ঘন বনঝোপ। আগে যুগল কাকার ভিটে ছিল ওখানটাতে, ছেলেবেলায় তাঁর কাছে আমি কিছুদিন অঙ্ক কষতাম, কিন্তু তিনি মারা যাওয়ার পরে তাঁর ছেলেরা এ গ্রাম থেকে উঠে অন্যত্র বাস করচে, এখন সেখানে ঘন ছোট এড়াঞ্চি, গোয়ালে লতা, সোঁদালি গাঁধালে শাক, বনমৌরি ও আদাড়ে কাশের জঙ্গল।

আমি ঠেস্-দেওয়ালটাতে বসে বসে লিখি। হঠাৎ দেখলাম একদিন নারকোল গাছের গা বেয়ে একটা লতা উঠেচে। ভালো করে চেয়ে দেখলাম, বুনো তিৎপল্লার লতা, যারা জানে না তারা বলে তেলাকুচো। কিন্তু তেলাকুচো লতা একটু অন্য রকমের। ফুলের গড়ন তো সম্পূর্ণ আলাদা।

দিনে দিনে পাতাটি বেড়ে উঠে নারকোল গাছ বেয়ে ঠেলে উঠতে লাগলো। আমি অবাক হয়ে রোজ রোজ চেয়ে দেখি। ক্রমে তার ফুল হোল, যে ফুলের কুঁড়ি এ সব অঞ্চলের দুলে মেয়েরা নাকে নোলক করে পরে। আমরাও বাল্যে পরেছি। ফুলের সময়টাতে রঙবেরঙের কত প্রজাপতির বাহার। সুকুমার লতাগ্রভাগ নারকোলগুঁড়ি ছেড়ে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে দুলচে বাতাসে, তাদের গাঁটে গাঁটে সাদা সাদা ফুল আর ফুলে ফুলে হলদেডানা নীলডানা প্রজাপতিকুলের মুক্তপক্ষ-সঞ্চরণ। এরা বনান্তস্থলী একটি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মুখরিত করে রাখে সারা সকালবেলাটা। আমি লেখা ছেড়ে মাঝে মাঝে সেদিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি।

একদিন ওর ফলের জালি পড়লো। জালি পুষ্ট হয়ে তেলাকুচো আকারের ফলে পরিণত হোল। ক্রমে একদিন ফল পেকে টুকটুকে লাল দেখালো। ছোট্ট একটা দুর্গা-টুনটুনি পাখি এক শ্রাবণ অন্ধকারের মেঘমেদুর শ্যামলতা ও অতলস্পর্শ শান্তির মধ্যে দেখি ফলটার পাশের লতার ডগায় বসে মহা আনন্দে রাঙা ফলটি ভোজন করচে। কি অপূর্ব্ব আনন্দই না সেটুকু পুঁচকে পাখির খাওয়ার ভঙ্গির মধ্যে। তখনও দুলচে উপরের দিকের লতাগ্রভাগে কত

সাদা কুচো কুচো ফুল নোলকের মত, কত সবুজ কচি ফলের জালি।

ওর পিছনে বিশাল, প্রাচীন বকুল গাছটা। বর্ষার দিনে মেঘের ঘন ছায়ায় অন্ধকার হয়ে আছে ওর তলা। আর্দ্র লতাকোণে কি সুগন্ধ ফুল ফুটেছে—জলভরা বাতাসে তার সুবাস। এই শ্যামল বনানীর নিবিড় পটভূমিতে সেই তিৎপল্লার লতাটা কি সুন্দর দেখায়। ঠেস্-দেওয়ালে বসে বসে চেয়ে দেখতে দেখতে এক-একদিন কি আনন্দ যে পাই।

শুধু ঐ ক্ষুদ্র তিৎপল্লার লতা আর তার ফুল নয়, এক অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য জিনিস দেখি ওর মধ্যে। এ সামান্য বনলতা নয়। গভীর নিঃশব্দতার মধ্যে সন্ধ্যায় একমনে ওর দিকে চেয়ে থেকে দেখো। অসীমের মহিমময় বাণী এসে পৌঁছবে তোমার মনে।

কি বিপুল সমারোহ করতে হয়েচে ওই বুনোলতাকে বাঁচিয়ে রাখতে, ওর ফুল ফোটাতে, ওর ফল পাকাতে। সূর্য্যের বিশাল অগ্নিকুণ্ডটা আকাশের দূর প্রান্তে বসাতে হয়েচে ওর জন্যে, কত কি গ্যাস, কত রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করতে হয়েছে ওর জন্যে, কোটি কোটি মাইল ইথারের সমুদ্র ভেদ করে সূর্য্যরশ্মিকে পৃথিবীতে ছুটে আসতে হয়েচে ওকে বাঁচিয়ে রাখবার ব্যগ্র আগ্রহে। তবে আজ ওর ফুল ফুটেচে, ওর ফল পেকে লাল টুকটুক করচে।

ক্ষর-ব্রহ্মের প্রাণময়ী বার্ত্তা বহন করে এনেচে ওই বন্য লতা লোকলোকান্তরের অসীমতা থেকে। যে মহাশিল্পীর হাতের ও অতি সুকুমার শিল্প, সেই শিল্পীর স্বাক্ষর আছে ওর পাতায়, ফুলে, লাবণ্যময় দুলুনিতে। ওর মধ্যে দিয়েই তাঁকে প্রত্যক্ষ কর।

ঘাটশিলা থেকে আমি মনোহরপুর রওনা হই বেলা দুটোর ট্রেনে। গত পূজোর ছুটিতে দেশ থেকে ঘাটশিলায় এসেছিলাম বেড়াতে। বন্ধুবর অমর মিত্রের বাসার সামনে মাঠে একদিন জ্যোৎস্নারাত্রে বসে গল্পসল্প করছি, এমন সময়ে খবর পেলাম আমাদের দেশের স্কুল থেকে একটি ছেলে বেড়াতে এসে আমাদের বাসায় উঠেছে।

রাত্রে ছেলেটির সঙ্গে কথা হোল, সে এসেচে বন ও পাহাড় দেখতে। কখনো দেখেনি একটা বড় রকমের বন, বড় একটা পাহাড়। সেই রাত্রেই ভাবলাম ওকে সিংভূমের সব চেয়ে বড় বনের অর্থাৎ সারেণ্ডা অরণ্যের একটা অংশ দেখিয়ে দেবো।

অনেকে হয়তো জানে না, সিংভূমের অর্থাৎ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ছোটনাগপুরের মধ্যে দুটি বৃহৎ অরণ্যানী বর্ত্তমান। প্রথমে এ কথা বলা উচিত, ছোটনাগপুরের এ অংশকে প্রাচীন বাংলা পুঁথিতে ঝাড়খণ্ড বা ঝারিখণ্ড বলা হোত অর্থাৎ বনময় দেশ। এখন সভ্যতা বা রেলপথের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব সিংভূমের বন প্রায় নিঃশেষ হয়ে সেই জায়গায় হয়েছে স্বাস্থ্যান্বেষী বাঙালীদের উপনিবেশ, কল-কারখানা (যেমন টাটা, মৌভাণ্ডার) বা ফসলের ক্ষেত। বন যা এখনো পূর্ব্ব সিংভূমে আছে, তাও থাকতো না, যদি গভর্ণমেণ্ট থেকে বনকে কানুনের বেড়া দিয়ে ঘেরা না হোত। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়েছে আইনের গণ্ডী দিয়ে বনকে রক্ষা না করলে দু'বছরের মধ্যে (গড়পড়তা হিসাবে অবিশ্যি) একটা দশবর্গ মাইল ব্যাপী বনভূমি কাবার হয়ে যায় মানুষের কুঠারের সামনে।

পূর্ব্ব সিংভূমের মধ্যে কয়েকটি বড় উপনিবেশ গড়ে উঠেচে—ঘাটশিলা, গালুডি, চাকুলিয়া ও টাটা। শেষটির নাম জগৎ-বিখ্যাত। কারখানার জন্যেই এখানে অন্নসংস্থানের উপনিবেশ।

পূর্ব্ব সিংভূমে প্রকৃতির পূজারী-ভক্তেরা বন দেখতে পাবে না বিশেষ, যা দেখতে পাবে তা এমন কিছু নয়। কচিৎ দু-একটি স্থান ছাড়া। এমন একটি স্থান হোল ঘাটশিলার সাত মাইল উত্তরে ধারাগিরি নামক একটি ক্ষুদ্র জলপ্রপাত ও আশপাশের পাহাড় বনানী। আর একটি স্থান সুবর্ণ-রেখার ওপারের তামাপাহাড় ও সানুদেশ। এই সব বনেই অল্পবিস্তর বন্যহস্তী, নেকড়েবাঘ, ভালুক, ময়ূর ইত্যাদি দেখা যাবে। তবে এদের সংখ্যা এত কম যে পাঁচ বছর বনে বেড়িয়েও আমি এ পর্য্যন্ত একটা জ্যান্ত জানোয়ারকে আমার দৃষ্টি পথের পথিক করাতে সমর্থ হইনি—দুটি একটি শেয়াল বা কাঠবেড়ালি ছাড়া।

তা সত্ত্বেও আমি জানি জানোয়ার এখানে আছে।

আমার দু-একটি শিকারী বন্ধু এ বিষয়ে দুঃখময় অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন। যেমন গালুডির লুনা নার্সারির মোহিনী বিশ্বাস মহাশয়। ইনি ভালুক শীকার করতে গিয়ে রীতিমত জখম হয়েছিলেন ভালুকের হাতে। বেঁচে গিয়েছিলেন কোন রকমে কিন্তু একখানা হাত অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছে চিরকালের জন্য।

এখন বলবো পশ্চিম সিংভূমের কথা।

বন যা আছে, এখনো পশ্চিম সিংভূমেই আছে। এ অঞ্চলের বড় বন দুটি। সারেণ্ডা ও কোলহান। দুটিই রিজার্ভ ফরেস্ট। সারেণ্ডা অরণ্যানী বৃহত্তর, প্রায় ৪০০ শত বর্গ মাইল। ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ বনানী হচ্ছে এই সারেণ্ডা। আমি তিন বৎসর আগে একবার এই দুটি বনভূমি দেখবার সৌভাগ্যলাভ করেছিলুম বনবিভাগের বড় কর্ম্মচারী জে. এন. সিন্‌হার সমভিব্যাহারে ও তাঁর মোটরে।

সে অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতার কথা এমন বিচিত্র সৌন্দর্য্যের রেখাপাত করেছে আমার মনে যে তিন বৎসরেও তা এতটুকু ম্লান হয়নি। বাংলা দেশে ফিরে গিয়ে কতবার ভাবতাম সারেণ্ডা বনের নানা বিচিত্র সৌন্দর্য্যভূমির কথা, নানা জল-প্রপাতের কথা, নানা পাথরের বাঁধানো বন্য নদী ও ঝর্ণার কথা, নানা বনপুষ্পের সুরভিবাহী দক্ষিণ বায়ুর কথা, শিলাতলে বিছিয়ে থাকা বন্য শিউলির কথা, গভীর রাত্রে বন্য বিভাগের বাংলোঘরে শুয়ে আশপাশের বনে কোথাও বন্য হস্তীর বৃংহিত-ধ্বনি শুনবার কথা।

তাই ভাবলুম ছেলেটিকে নিয়ে এই সুযোগে আর একবার সারেণ্ডা অরণ্য দেখতে বেরুবো।

কিন্তু এর মধ্যে একটা কথা আছে।

পশ্চিম সিংভূমের এই অরণ্য-অঞ্চল মোটরযোগে ভিন্ন দেখা প্রায় অসম্ভব। চার শত বর্গ-মাইল-ব্যাপী এই বনভূমির কোথায় কি আছে তা সাধারণের জানবার কথাও নয়। সুতরাং বন-বিভাগের কর্মচারীদের সাহায্যও নিতান্ত প্রয়োজন। ট্রেনে উঠে এ বন দেখবার

সুযোগ প্রায় নেই, কেবল একটি উপায় ছাড়া।

সেই উপায়টি অবলম্বন করা গেল।

মনোহরপুরের স্টেশন থেকে একটা লাইট রেলওয়ে চলে গিয়েছে চোদ্দ মাইল দূরে চিড়িয়া পাহাড়ে। এই পাহাড় থেকে ইণ্ডিয়ান স্টীল করপোরেশন লৌহপ্রস্তর সংগ্রহ করে বার্ণপুরের কারখানায় চালান দেয়। রেল-লাইনটা ওদেরই। এই রেলপথ গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে প্রায় আট নয় মাইল কিম্বা আর একটু বেশি। এইটি সারেণ্ডা অরণ্যের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তদেশে।

সুতরাং যদি মনোহরপুর থেকে চিড়িয়া খনির রেলে চড়া যায় তাহলে বিনা মোটরে সাত-আট মাইল বন অনায়াসে দেখা যেতে পারে। চিড়িয়া রেললাইন খনিওয়ালাদের নিজেদের তৈরী, যাত্রী-বহনের উদ্দেশ্যে তা তৈরী হয়নি, বাইরের কোন লোককে উঠতে দেয়ও না। এজন্য বন-বিভাগের লোকের সাহায্য দরকার।

বেলা তিনটের নাগপুর প্যাসেঞ্জারে আমরা ঘাটশিলা থেকে উঠে সন্ধ্যের সময়ে চক্রধরপুর গিয়ে নামলুম। এই পর্য্যন্তই টিকিট করা হয়েছিল। এর পরেই পাহাড় জঙ্গলের বেশ ভাল দৃশ্য রেলপথের দুধারে পড়বে, কিন্তু নৈশ অন্ধকারে আমরা সে সব কিছুই ভালো করে দেখতে পাবো না। তার চেয়ে রাত্রিটা চক্রধরপুর স্টেশনে কাটিয়ে পরদিনের ভোরবেলা যে নাগপুর প্যাসেঞ্জার আসে, তাতে ওঠাই যুক্তিযুক্ত। সবটা দিনের আলোয় দেখতে পাওয়া যাবে।

চক্রধরপুর স্টেশনে ওয়েটিংরুমে গিয়ে বিছানাপত্র বিছিয়ে দিয়ে আমরা সটান্ শুয়ে পড়লাম। আত্রা প্যাসেঞ্জার এল একটু পরে। কয়েকটি ভদ্রলোক ওই ট্রেনে রাঁচি ও পুরুলিয়া থেকে এলেন। একটি ভদ্রলোকের নাম মিঃ দুবে। রেলপুলিসে কি কাজ করেন। আমার সঙ্গে দু-এক কথায় খুব আলাপ জমে গেল। পথে কি চমৎকার ভাবেই আলাপ জমে। আমি অনেকবার দেখেছি রেলে দূরদেশে বেড়াবার সময় রেল-কামরার মধ্যেকার যাত্রীরা পরস্পর আত্মীয় হয়ে গিয়েছে। এ ওকে জলপাত্র দিচ্ছে ব্যবহার করতে, ও ওকে সিগারেট দিচ্ছে, এ খাওয়াচ্ছে ওকে—ওদের মধ্যে শিখ আছে, পাঞ্জাবী আছে, বিহারী আছে, বাঙালী আছে। একটি সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব জেগে ওঠে ওদের মধ্যে, দেড়দিন বা দুদিনের জন্যে। এমন কি বিদায় নেবার সময় কষ্ট হয়, সবাই পরস্পরের ঠিকানা নেয় চিঠি দেবে বলে।

যদিও শেষ পর্য্যন্ত হয়তো চিঠি দেওয়া হয় না।

এখানে মিঃ দুবের সঙ্গে আমার এই ধরনেরই আলাপ হয়ে গেল। তিনি আমার সুবিধা দেখবার জন্যে কেন এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কি করে বলবো।

অনেক রাত্রে দেখি মিঃ দুবে আমায় ডাকাডাকি করচেন।

—ঘুমুলেন নাকি?

—না। কি বলুন।

—একটা পথের কথা আপনাকে বলে দিই। যখন আপনি পাহাড় জঙ্গল বেড়াতে ভালোবাসেন, রাঁচি থেকে একটি পথ লোহারডগা হয়ে যশপুর স্টেটের মধ্যে দিয়ে সম্বলপুর জেলার ঝার্সাগুড়া পর্য্যন্ত গিয়েছে। এই পথে রাঁচি থেকে মোটরবাস যায় যশপুর স্টেটের রাজধানী যশপুর নগর পর্য্যন্ত। সেখান থেকে অন্য এক মোটরবাসে কুঞ্জীগড় হয়ে ঝার্সাগুড়া আসা যাবে। কখনো যাননি এ পথে ?

যাওয়া তো দূরের কথা নামই শুনিনি, সন্ধানই জানিনে।

সেই রাতটি আমার কাছে বড় মূল্যবান। মিঃ দুবে আমায় উপকার করেছিলেন এ পথের সন্ধান আমায় দিয়ে। এই বিস্তৃত ভারতবর্ষের নানা স্থানে কত সৌন্দর্য্যস্থলী বিদ্যমান, কত নিবিড় পর্ব্বতকন্দরের অভ্যন্তরে, কত অরণ্যভূমির নিভৃত অন্তরালে, কত গোপন বন্যনদীর শিলাস্তৃত তটদেশে কে তাদের খবর রাখে! পথের কথা যে বলে দেয়, জীবনের বড় উপকারী বন্ধু সে।

আমি জানি হাওড়া স্টেশন থেকে দুশো মাইলের মধ্যে কত সুন্দর স্থান আছে, সেখানে নিবিড় বন আছে, পাহাড়ী ঝর্ণা আছে, বনলতার সৌন্দর্য্য আছে, জলজ লিলির ভিড় আছে ছায়াবৃত বন্যনদীতটে। দেখে অনেক সময় নিজেরই অবিশ্বাস হয়েছে কলকাতার এত কাছে এমন সুন্দর স্থান থাকতে পারে!

রাত ভোর হয়ে গেল। একটু পরেই নাগপুর প্যাসেঞ্জার এল। আমরা তাতেই উঠে মনোহরপুরের দিকে রওনা হলাম। চক্রধরপুর ছাড়িয়ে তিনটি স্টেশনের পরেই পোসাইতা স্টেশনের কাছে ঘন বন। এখানে একটা টানেল আছে, তাকে ভুলক্রমে রেলওয়ে গাইড বইয়ে বলা হয় 'সারেণ্ডা-টানেল'। কিন্তু প্রকৃত সারেণ্ডার সঙ্গে এই টানেলের পাহাড় ও বনভূমির কোনো সম্পর্ক নেই। এ স্থানটি কোলহান বিভাগের অরণ্যের অন্তর্ভুক্ত। সারেণ্ডা অরণ্য কোনো রেলপথের নিকটে নয়, ট্রেনে বসে এ লাইন থেকে সাধারণতঃ যে বনানী দেখা যায় তা হোল এই কোলহান অরণ্যভূমি, তারও খুব সামান্য অংশই রেলে চড়ে দেখা সম্ভব। আরও পশ্চিমে গিয়ে যে বন পর্ব্বত দেখা যায় সেগুলো হলো বামড়া, আনন্দগড় ও বোনাইগড় প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্ত। তার পরেই পড়ে সম্বলপুর জেলার রিজার্ভ ফরেস্টের পূর্ব্ব-উত্তর অংশ। তার পরে এল বিলাসপুর। বিলাসপুর ছাড়িয়ে নাগপুরের পথে অনেক দূর পর্য্যন্ত রুক্ষ, ঊষর, সমতল প্রান্তরের একঘেয়ে দৃশ্য চক্ষুকে পীড়া দেয়। তার পরে আসে দ্রুগ বা দুর্গ। এখান থেকে পুনরায় বন পর্ব্বতের দৃশ্য শুরু হলো, এই পথেই কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের বহু-বিজ্ঞাপিত সালকেশা অরণ্যভূমি। আমি একবার জ্যোৎস্নাময়ী গভীর রাত্রিতে আর একবার অস্তসূর্য্যের বিলীয়মান আলোয় এই বন-প্রদেশ দর্শন করি। নিঃসন্দেহে বলা যায় ট্রেনে বসে যে কেউ দুর্গ ও ডোঙ্গরগড়ের মধ্যে একটু কষ্ট করে চোখ মেলে চেয়ে থাকবেন, তাঁর কষ্ট সার্থক হবে।

তবে এখানে একটা কথা, সকলে কি সব জিনিস ভালবাসে! যার চোখ যে জন্যে তৈরী হয়ে গিয়েছে! সেজন্যে দোষ কাউকে দেওয়া যায় না।

বনানী ও পাহাড়পর্ব্বতের দৃশ্য, মুক্ত space-এর দৃশ্য যাঁর ভালো লাগে না—তাঁর সঙ্গে কি তা বলে ঝগড়া করতে হবে? তাঁর হয়তো যা ভালো লাগে, আমার তা ভালো লাগে না, সুতরাং তিনিও তো আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে পারেন তা নিয়ে।

মনোহরপুর নামলাম বেলা দশটার সময়।

একটা কুলীকে জিজ্ঞেস করলাম—ডাকবাংলো কোথায়?

—পাহাড়ের ওপরে। কিন্তু সে ডাকবাংলো নয়, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বাংলো।

—সে আমি জানি, তুমি পথ দেখিয়ে দিতে পারো?

—সোজা পশ্চিম দিকে চলে যান।

পাহাড়ের ওপরে উঠতে গিয়ে ডানদিকে দেখি বনবিভাগের আপিস। ভাবলাম চিড়িয়া পাহাড়ে যাবার একমাত্র উপায় হলো রেল। সে রেলে চড়তে হলে খনিওয়ালাদের অনুমতি দরকার। বনবিভাগের কর্ম্মচারীরা সে বিষয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন ভেবে আমি আপিসের দিকেই গেলাম। তা ছাড়া বনবিভাগের অনুমতি ব্যতীত তো পাহাড়ের ওপরের বাংলোতেও থাকা যাবে না। আপিসে জিজ্ঞেস করে জানা গেল শ্রীযুক্ত রাসবিহারী গুপ্ত বর্ত্তমানে এখানের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। রাসবিহারীবাবুকে আমি জানতাম খুবই, ১৯৪৩ সালে সারেণ্ডা বন পরিভ্রমণের সময়ে তিনি আমার সঙ্গী ছিলেন।

বল্লাম—রাসবিহারীবাবু আছেন?

একজন আরদালী বল্লে—না বাবুজী। তিনি বনের কোনো কাজে বেরিয়ে গিয়েচেন।

—কখন আসবেন?

—ঠিক নেই। দেরি হবে।

আমি তাদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে চিড়িয়া লাইট রেলের সাইডিংএ যাবো ভাবচি এমন সময়ে রাসবিহারীবাবুর বাসা থেকে একজন চাকর এসে বল্লে—আপনাকে মাইজী নিয়ে যেতে বলেচেন বাসাতে—

—কোন মাইজী?

—রাসবিহারীবাবুর স্ত্রী।

বাসাতে গিয়ে ভদ্রমহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনিও আমাকে জানতেন। চা ও জলখাবারের ব্যবস্থা করলেন। আমি এখুনি চিড়িয়া রেলে যেতে উদ্যত হয়েছি শুনে বল্লেন—এখন কেন যাবেন? সে ট্রেন ছাড়বার সময় হয়েছে। এখান থেকে সাইডিং একমাইল দূরে। গিয়ে গাড়ী পাবেন না। তার চেয়ে ধীরেসুস্থে স্নান করে নিয়ে বিশ্রাম করুন।

কথা শুনলাম না। আমার বন-ভ্রমণের তৃষ্ণা তখন অত্যন্ত বলবতী। মাইল খানেক ছুটতে ছুটতে গিয়ে আমরাও যেই সাইডিংএ পৌঁচেছি ট্রেনও ছেড়ে দিলে। বাধ্য হয়ে ফিরলাম। এসে দেখি রাসবিহারীবাবু কাজ থেকে ফিরেছেন। আমাকে দেখে খুব খুশি। দুজনে গল্প করতে করতে স্নান করে এলাম নদীতে। ওঁদের অতিথিপরায়ণতার কথা অনেক দিন মনে থাকবে।

বিকেলে তিনজনে বেরুলাম বেড়াতে।

রেলপথের ওপারে সুধীরবাবুর বাসা। সেবার এসে ওঁর সঙ্গে খুব আলাপ হয়েছিল। রাসবিহারীবাবুকে নিয়ে সুধীরবাবুর বাসায় গেলাম। তিনিও আমায় দেখে খুব খুশি। বিদেশে বাঙালীদের মধ্যে খুব হৃদ্যতা। আমাদের সন্ধ্যাবেলা চা খেতে বল্লেন, রাত্রেও তাঁর ওখানে না খেলে তিনি খুব দুঃখিত হবেন জানিয়ে দিলেন।

সুধীরবাবুর বাসা থেকে আমরা গেলাম নৃসিংহ বাবাজীর আশ্রম দেখতে। এই স্থানটি অতি মনোরম। কোয়েল নদীর পাষাণময় তটের ওপরে একটি শ্যাম কুঞ্জবিতান। কত কি ফুলফলের গাছ এখানে যত্ন করে তৈরি করা হয়েছে, বিশেষ করে ফুলের গাছ। বকুল, নাগকেশর, চাঁপা থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র সন্ধ্যামণি পর্য্যন্ত সব রকমের পুষ্প এখানে দেখা যাবে। ফুলের বাগান বলে মনে হয় না, মনে হয় ছায়ানিবিড় এক বনানী, মধ্যে মধ্যে ঘন বনের বুক চিরে পাথরের নুড়ি বিছানো সরু পায়ে চলার পথ পরস্পরকে কাটাকাটি করে সুবিন্যস্ত ভাবে সোজা এদিকে ওদিকে চলে গিয়েছে। আশ্রমের ফটক ছাড়িয়ে প্রথমেই একটা পাথর বাঁধানো চত্বরের চারিপাশে কতকগুলো ছোট বড় পাকাবাড়ী। সাধুসন্ন্যাসীদের থাকবার জন্য বড় বড় ঘর ও বারান্দা। এই ঘর বাড়ীর পেছনে আর কোন মানুষের বাসের ঘর নেই, ঘন বননিকুঞ্জের মাঝে মাঝে লতাপাতা ঢাকা ছোটি ছোট দেবমন্দির, তার কোনোটায় রামসীতা, কোনটাতে শ্রীকৃষ্ণ, কোনোটাতে শিবলিঙ্গ। অপেক্ষাকৃত বড় মন্দিরটি নৃসিংহদেবের। বনের মাঝে মাঝে পুষ্পবিতানের আড়ালে পাথরের আসন। বোধ হয় সাধুদের ধ্যানধারণার জন্যে, কিংবা যে কেউ বসে বিশ্রাম বা চিন্তা করতে পারে। সাধুর খুব ভিড় আছে বলে মনে হোল না, বরং মনে হয়েছিল সমস্ত আশ্রমটিতে লোক খুবই কম। এত নির্জ্জন যে বাগানের মধ্যে ঢুকলে ভয় করে, পথ হারিয়ে গেলে কেউ দেখিয়ে দেবার লোক নেই। সমস্ত আবহাওয়াটি অতি শান্ত ও পবিত্র। একটি সাধু ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন এক জায়গায়।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে।

নৃসিংহদেবের ঘণ্টাধ্বনি আশ্রমের নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করছে। মন্দিরে দীপ জ্বলছে। অনেকগুলি হ্যারিকেন লণ্ঠন এখানে ওখানে গাছের গায়ে ঝুলছে। আমার প্রথমেই মনে হলো এত কেরোসিন তেল আসে কোথা থেকে?

সাধুজী বোধ হয় আশ্রমের মোহান্ত।

আমরা সামনে গিয়ে বল্লাম—প্রণাম মহারাজ।

সাধুজী আমাদের আশীর্ব্বাদ করে বসতে বল্লেন। কিছু ধর্ম্মকথা শোনালেন। তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' থেকে কিছু বাণী উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা করলেন। আমাদের বিদায় নিয়ে চলে আসবার সময় সকলের হাতে হাতে প্রসাদ দিলেন, কলা আর কচুরি—আর একটা জিনিস এদেশে দেবমন্দিরে ভেট হিসেবে খুবই ব্যবহৃত হয়। এর নাম 'পান্‌জেরি'—জিনিসটা হলো ধনেভাজার গুঁড়ো আর চিনি একসঙ্গে মেশানো।

সুধীরবাবুর বাড়ীতে খেয়ে ফিরবার পথে রাসবিহারীবাবু সাইডিং-এ ফোন করলেন স্টেশন থেকে। পরদিন সকালে ট্রেন ছাড়বে, তাতে একটা সেলুন জুড়ে দিতে বলে দিলেন। সকালে গাড়ীতে চড়বার সময় 'সেলুন' এর অবস্থা দেখে আমার চক্ষুস্থির। একখানা মালগাড়ী, যাকে বলে covered wagon, তবে দুখানা কাঠের বেঞ্চি পাতা আছে তার মধ্যে এই যা।

পাঁচ মাইল গিয়েই ছোট গাড়া নিবিড় অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলো। আমি বড় ভালবাসি সারেণ্ডার এই অপরূপ নির্জ্জনতা। এত বড় বড় শাল ও আসান গাছও সিংভূমের অন্য অঞ্চলে দেখা যায় না। মোটা মোটা কাছির মত লতা এ গাছ থেকে ও গাছে জড়াজড়ি করে রয়েছে। বড় বড় কুরচি ফুলের গাছ। এত বড় কুরচি গাছ আমি তো কোথাও দেখিনি। বন্য শণের বড় বড় হলদে ফুল রেললাইনের দুধারে যেদিকে চোখ যায়, সেদিকে ফুটে আছে। বাঁ দিকে একটা পাহাড়ের সারি, হঠাৎ পাহাড়শ্রেণীর ফাঁক দিয়ে কখন পার্ব্বত্য নদী কোয়েল এসে মিশলো রেললাইনের পাশে। দুই তট শিলাস্তৃত, মাঝে মাঝে সাদা লিলির সঙ্গে মিশেছে হলুদ রং এর বন্য শণের (wild flax) ফুল, পাহাড়ের ওপারে বেগুনি রঙের দেবকাঞ্চন।

আমাদের গাড়ী এক জায়গায় হঠাৎ থেমে গেল। স্থানটি বড় বড় বনপাদপে ছায়ানিবিড়।

রাসবিহারীবাবু বল্লেন, আসুন বনের মধ্যে।

—কোথায় ?

—আপনাকে আমাদের শিমূল গাছের নার্সারি দেখিয়ে আনি।

—গাড়ী কতক্ষণ থাকবে ?

—সে ভয় নেই। যতক্ষন আমরা ফিরে না আসি।

অনেকদূর চললাম বনের মধ্যে। এক জায়গায় অনেকগুলো শিমূলের চারা সার দিয়ে পোতা। বনবিভাগ থেকে এখানে শিমুল গাছের আবাদ করা হয়েছে তাই একে বলা হয় শিমুল-চারার নার্সারি। এখান থেকে চারা তুলে অন্য জায়গায় রোপণ করা হবে। রাসবিহারীবাবু আমাদের সব বুঝিয়ে দিলেন। শিমুলগাছ নাকি বেশ দামে বিক্রী হয় দেশলাইএর কারখানার মালিকদের কাছে।

রাসবিহারীবাবু বল্লেন, সাবধানে থাকবেন, বড় বড় বাঘ আছে সারেণ্ডা ফরেস্টে।

—দিনমানে বেরোবে ?

—সব সময় বেরুতে পারে।

—লেপার্ড, না 'দি রয়েল বেঙ্গল' ?

—রয়েল বেঙ্গলই বটে।

—আপনি কখনো বাঘের হাতে পড়েছেন ?

—দুবার পড়েও বেঁচে গিয়েছি। চলুন সে গল্প আংকুয়া বাংলোয় বসে চা খেতে খেতে করা যাবে।

গাড়ী আবার ছাড়লো। আবার চলেছে বনের মধ্যে দিয়ে।

বন যেন নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়ে উঠেছে। কোনো লোকালয় নেই। বনের মধ্যেই ছোট্ট একটা স্টেশন। তার নাম লেয়ো জংলন। এখান থেকে ঘনতর বনের মধ্যে একটা লাইন বেঁকে পূর্ব্বদিকে অদৃশ্য রহস্যপথে অন্তর্হিত হোল, না জানি ওদিকে আবার কত বন, কত ঝর্ণা, কত বিচিত্র লতার দুলুনি, কত সৌন্দর্য্যময়ী বনস্থলী। মন যেন নেচে ওঠে, চোখ পিপাসিত দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে থেকে।

—ও লাইনটি কোথা গেল ?

—রাসবিহারীবাবু বল্লেন—হুধিয়া মাইন্স্।

—সে কতদূর ?

—তা এখান থেকে ন' মাইল।

—ওপথে যাওয়ার উপায় কি ?

—হেঁটে বা ট্রলিতে যাবেন ?

—নিশ্চয়ই যাবো। আপনি ব্যবস্থা করবেন ?

—যখন বলবেন, করে দেবো।

বেলা ন'টার সময় ট্রেন চিড়িয়াতে পৌছল। রেল লাইনের বাঁদিকে ৩০০০ হাজার ফুট উঁচু পাহাড় বুদ্ধবুরু ও অজিতাবুরু। বুদ্ধদেবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই এদের, এদেশী ভাষার নাম। পাহাড়ের ওপর থেকে লৌহপ্রস্তর কেটে নামানো হচ্চে, পাহাড়ের ওপর থেকে নীচু পর্য্যন্ত ট্রলি লাইন আছে। ছোট লাইনটা এখানেই শেষ হয়ে গেল। আশপাশের ছোটখাটো পাহাড়ের ওপর খনির ম্যানেজার, ওভারসিয়ার প্রভৃতির বাংলো। একজন বাঙালী ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হলো, তিনি এই খনির ডাক্তার, নাম ডাঃ কানাইলাল গাঙ্গুলী। ভদ্রলোক অতি অমায়িক, প্রথম আলাপেই আত্মীয়তা প্রদর্শন করে তাঁর বাংলোতে সেদিন আমায় নিমন্ত্রণ করলেন। আমাদের সময় কম ছিল বলেই তাঁর এ সদয় প্রস্তাবে আমরা রাজি হতে পারিনি।

বনপথে হেঁটে একটা পাহাড়ের পাশ দিয়ে ক্ষুদ্র একটি বনগ্রাম পার হয়ে আমরা আংকুয়া ফরেস্ট বাংলোতে এসে পৌছলাম।

কি সুন্দর এই আংকুয়া বাংলোটি, কি মনোরম এর পরিবেশ।

একটা ছোট পাহাড়ের মাথায় এই বাংলো, পাহাড়ের পাদমূল ধৌত করে বইচে একটি পাহাড়ী নদী, বাংলোর সামনে পাহাড়ের মাথায় সমভূমিতে চেয়ার পেতে আমরা বসলাম। ছোট টেবিল সামনে পেতে চা দিয়ে গেল বাংলোর চৌকিদার। সঙ্গে আমাদের খাবার ছিল। অমন জায়গায় বসে চা খাওয়ার অভিনবত্ব আমি ভালভাবে উপভোগ করবো বলে অদূরবর্ত্তী গভীর বনভূমির দিকে চেয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিই। কত রকমের গাছ চারিদিকে—অর্জ্জুন, আসান, শাল, খ ও পিয়াসাল। বাতাসে বনভূমির স্নিগ্ধ গন্ধ।

ডাকবাংলোর চৌকিদারের বৌ, একটি স্বাস্থ্যবতী হো রমণী, আমাদের জলটল এনে

দিচ্ছিল। জিজ্ঞেস করে জানা গেল মেয়েটি মিশনারী স্কুলে দিনকতক পড়েছিল, সুতরাং শাড়ী-ব্লাউজ পরে। সামান্য একটু ইংরিজীও জানে। এ অঞ্চলের অধিকাংশ হো ও মুণ্ডা জাতীয় লোক খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করেচে, অনেকে রাঁচি মিশনারী স্কুলের ফেরৎ।

আংকুয়া বাংলো থেকে যেন উঠতে ইচ্ছে করছিল না। এমন চমৎকার কানন-ভূমিতে এমন বাংলোতে বাস করা একটি বিশেষ সৌভাগ্য। তবে অরণ্যকে ভাল না বাসলে কেউ এখানে বাস করতে পারবে না। বাংলোর চৌকিদারকে বল্লাম—রাত্রে এখানে বাঘ আসে?

—রোজই হুজুর।

—হাতী?

—ওভি। ভালুক ভি বহুৎ আসে।

—তোমরা থাকো কি করে?

—কাঁড় নিয়ে বসে থাকি হুজুর। আগুন করি।

এই তো অবস্থা। যত বড় প্রকৃতির রসিকই হোক না কেন, এ নির্জ্জন অরণ্যভূমিতে কিছু-দিন বাস করতে হোলে নিছক প্রকৃতিরসিকতা ছাড়াও আর কিছু থাকা দরকার। সেটা হোল নির্ভীকতা, নির্জ্জনবাসের শক্তি, নিত্য নূতন বিলাসের লোভ-সম্বরণ। জীবন হবে এখানে সব রকম উপকরণের বাহুল্য-বর্জ্জিত, austere, অন্তর্মুখী। তবে এখানে আনন্দ, নতুবা একদিনের মধ্যে পালাই পালাই ডাক ছাড়তে হবে।

ফিরবার পথে চিড়িয়া থেকে ট্রেন পেলাম না। খনির লোকেরা আমাদের জন্যে ট্রলি করে দিলেন, চোদ্দ-পনেরো মাইল পথ বিকেলের ঘন ছায়ায় দুধারের বনভূমির মধ্যে দিয়ে ট্রলি করে আসার সে কি আনন্দ! এই আসার পথে একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল যা ভুলবার নয়। সারাপথ বাতাসে যেন গাজিপুরের দামী আতরের গন্ধ ভুরভুর করচে। বাড়িয়ে এতটুকু বলচি না। ট্রলির একজন কুলীকে জিজ্ঞেস করলাম, সে কি কানে আতরমাখা তুলো গুঁজেছে? সে তো অবাক। রাসবিহারীবাবুকে বল্লাম, তিনি কোন তেল মেখেচেন? রাসবিহারীবাবু বল্লেন, গন্ধটা তেল বা আতরের নয়, নানা বনকুসুমের সম্মিলিত সুবাস।

—কি ফুলের?

ট্রলি থামিয়ে থামিয়ে আমরা রেল লাইনের কাছাকাছি যত রকমের ফুল ফুটেছিল, সব তুলিয়ে আনিয়ে দেখলাম। ও-সব কোন ফুলেরই সুবাস নয়। দেবকাঞ্চন গন্ধহীন, বন্য শণের ফুল গন্ধহীন, অর্কিডের দু-একটা ফুল, যা চোখে পড়লো, গন্ধহীন। তবে কোন্ ফুলের গন্ধ? শালের ফুল এখন ফোটে না। কুরচি ফুলও তাই।

অথচ গোটা চোদ্দটি মাইল পথ সে সুবাসে আমোদ করতে লাগলো। ঘন, মিষ্ট, তীব্র সুবাস। রাসবিহারীবাবু এর কোনো সদুত্তর দিতে পারলেন না।

বন ছেড়ে আমাদের ট্রলি যখন মুক্ত প্রান্তরে বের হোল, তখন দূর দিগন্তে বোনাইগড় রাজ্যের শৈলশ্রেণীর পেছনে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে।